বৈজ্ঞানিক জগৎ

অনিলচন্দ্র রায়

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

বাস্তববাদ (realism) এবং জড়বাদ (materialism), এই দুই তন্ত্রই দর্শনরাজ্যের কথা। এরা উভয়েই সম্ভ্রান্ত দার্শনিক মতবাদ, কারণ এরা উভয়েই অতি প্রাচীন। কিন্তু এদের সঠিক অর্থ লইয়া সততই নানা বিভ্রাট ঘটিয়া থাকে। এদের মধ্যে গুরুতর পার্থক্য রহিয়াছে তাহা অনেকেই উপেক্ষা করিয়া থাকেন।

জড়বাদ বিশ্বসংসারকে ঘাটিয়া একটী মাত্র পদার্থকে বিশ্বের মূল উপাদান বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছে। সেই উপাদান হইল জড়ধাতু বা matter. চৈতন্য বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তুকে জড়বাদ স্বীকার করে না; চৈতন্য জড়ধাতুরই ক্ষণিক ও বিশিষ্ট প্রকাশ মাত্র। যে অশ্রান্ত জীবন-ধারা ও বস্তুপ্রবাহ অনাদিকাল হইতে বহিয়া আসিতেছে, তাহার আদিতে আছে প্রাণহীন জড়ধাতু। জড়বাদ এক বই দুই পদার্থের ধার ধারে না। কাজেই এক কথায় তাকে এক-বাদ (monism) বলা চলে। অর্থাৎ "জড়বাদী" একবাদ (materialistic monism).

বাস্তববাদ (realism) কিন্তু একবাদী না-ও হইতে পারে। বাহিরের জগৎ যে সত্য এই সহজ কথাটুকুই কেবল বাস্তববাদের বক্তব্য। চারদিক হইতে কঠিন পৃথিবী আমাদিগকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে, সে পৃথিবী সত্য কিংবা মিথ্যা? এই প্রাচীন প্রশ্নের জবাব দিয়া বাস্তববাদ আমাদিগকে জানাইয়াছে যে পৃথিবী মায়া নয়, পৃথিবী মরীচিকা নয় পৃথিবী অভ্রান্ত সত্তা। পৃথিবী ব্যতিরিক্ত অপর সত্তা কিছু আছে কিনা, তার জবাব বাস্তববাদ দুই রকমেই দিতে পারে। অর্থাৎ "আছে"ও বলিতে পারে, "নাই"ও বলিতে পারে। বাস্তববাদ যদি "নাই" বলে, তবে সে আর "বাস্তববাদ থাকে না; তার নাম হয় জড়বাদ। যখন বাস্তববাদ জড়াতীত সত্তাকে স্বীকার করে তখন বাস্তববাদ হয় দ্বৈতবাদী (dualistic). কাজেই বাস্তববাদকে স্বতন্ত্র দার্শনিক মতবাদ হিসাবে স্বীকার করিলে তাকে দ্বৈতবাদ বলাও চলে। বাস্তববাদ জড় এবং চৈতন্য, এই দুই দেবতাকেই নৈবেদ্য দান করিয়া থাকে। বাস্তববাদের এই অর্থই এই প্রবন্ধে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। এবং এই অর্থের ভিত্তিতেই বিজ্ঞানের আলোচনা করা হইবে।

দেখা যাইতেছে যে জড়বাদ এবং বাস্তববাদ এ বিষয়ে একমত যে বহির্জ্জগৎ সত্য। এই দুই দার্শনিক মতবাদই বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপরে দাঁড়াইয়া আছে বলিয়া দাবি করিয়া থাকে। এখন দেখা যাক্ বহির্জ্জগৎ সত্য এ কথার মানে কি। বিজ্ঞান বহির্জ্জগৎ বলিতেই বা কী বোঝে এবং বাস্তবতা বলিতেই বা কী বুঝিয়া থাকে, তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজন। মানুষের জীবনের সঙ্গে

বহির্জ্জগতের যোগ শক্তি নিবিড়। তাহার সমস্ত কর্ম্ম ও সমস্ত মনোরথ হাজার তন্তুতে বাঁধা রহিয়াছে বাহিরের জগতের সঙ্গে। বাহিরের জগতের স্বরূপ যে রকম হইবে, তাহা দ্বারা মানুষের আদর্শ, তাহার জীবনপ্রণালী গভীরভাবে প্রভাবিত হইবে । বাহিরের জগৎ যদি হয় সত্যি সত্যি স্বপ্ন, তবে মানুষের জীবন-যাপন হইবে প্রব্রজ্যা-মুখী। বাহিরের জগৎ যদি হয় বাস্তব, তবে মানুষ হইবে জগৎ-ধর্ম্মী। কাজেই বাস্তববাদের প্রশ্ন এবং জবাব আমাদের জীবনের জাগ্রত-সমস্যা, নেহাৎ বৃথা বিতর্কের কথা নয়। আদিম মানুষ এই প্রশ্ন করিয়াছে, সভ্যতার গোধূলি-কালে। আজ বৈজ্ঞানিক মধ্যাহ্নকালে প্রখর আলোকের মধ্যেও বিংশ-শতাব্দী এই প্রশ্নই করিতেছে। বহির্জগৎ সত্য, এ কথার অর্থ কি ? এ সম্বন্ধে বিজ্ঞান কী বলে !

বিজ্ঞানের যে যুগকে "যান্ত্রিক" (mechanistic) বলা হয় তাহার জের ১৯ শতক পর্য্যন্ত চলিয়াছে। যান্ত্রিক যুগে বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে যে ধারণা ছিল তাহা নিতান্ত কাটখোট্টা এবং অনড় ছিল। দ্রব্য, গুণ, দেশ, কাল ও কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সেই যুগের ধারণা ছিল স্পষ্ট এবং নিঃসংশয়। দ্রব্য-গুণ প্রভৃতির কাঠামোর মধ্যে জগৎটা স্থির হইয়া আছে, ইহাই ছিলো সেই যুগের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা সাধারণ লোকের পরিকল্পনা হইতে কোনো অংশে পৃথক ছিল না। বৈজ্ঞানিক এব প্রাকৃত জন, উভয়ের জগৎই সে যুগে এক এবং অভিন্ন ছিলো। এমন সময় দুইটী বিপ্লব ঘটিয়া এই জগৎ-পরিকল্পনা বিপর্য্যস্ত হইয়া গেলো। প্রাকৃত লোকের জগৎকে (commonsense world) বর্জ্জন করিয়া বৈজ্ঞানিক নতুন জগতের মানস ধ্যান সুরু করিল। সাধারণ লোকের সহজ আটপৌড়ে জগৎকে তখন রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিল। কারণ এই নবাগত বিপ্লব দুটী আমাদের সাধারণ আটপৌড়ে পৃথিবীকেই আঘাত করিল দুইদিক হইতে। এই বিপ্লবের ফলে বিজ্ঞানের অঙ্গণে আবির্ভূত হইল "গাণিতিক যুগ" (mathematical epoch).

কিন্তু একটা কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। সাধারণলোকের জগৎকে (common man's world) বাঁচাইবার একটা নতুন প্রচেষ্টা হইয়াছিল দার্শনিকদের মধ্যে। ১৯ শতকের শেষদিকে দার্শনিক চৈতন্যবাদের (Idealism) খুব তোড়জোড় চলিয়াছিল য়ুরোপে। তোড়জোড়ের অনিবার্য্য ফল হইয়াছিল আতিশয্য। চৈতন্যবাদের ক্ষেত্রে আতিশয্য মানেই বাহিরের জগতের ক্ষেত্রে উদাসীন্য এবং বাহিরকে ছাড়িয়া ভিতরকে লইয়া অতিশয় মাতামাতি। ফলে কারুর কারুর মনে চৈতন্যবাদের অতিরিক্ত ভাবালুতা সম্বন্ধে বিরূপতা এবং পরে বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। এই বিদ্রোহই সৃষ্টি করিল এক নতুন বাস্তববাদের অভ্যুত্থানকে। প্রাকৃতিক নিয়মে এই প্রতিক্রিয়া ঘটিল। বিংশ শতকের প্রথম দিকেই এই নব বাস্তববাদ মাথা তুলিয়া ঘোষণা করিল যে বহির্জ্জগৎ মিথ্যা নয়। চৈতন্যবাদ (Idealism) ১৯ শতক হইতেই স্পষ্টভাষায় বলিতেছিলো যে বহির্জ্জগৎ স্বতন্ত্র নয় ; চেতন মনের রঙে রাঙাইয়াই জগৎ তার চাক্ষুষ সত্তাকে পাইয়াছে। এ তার নিজস্ব অস্তিত্ব নয়, চিন্ময় মনের আপন সৃজন। বৈজ্ঞানিকরা যখন জগৎকে জড় ও যান্ত্রিক মানদণ্ডের দ্বারা মাপজোক করিতেছিল, বিজ্ঞানের চোখে পৃথিবী যখন নিরেট জড় বস্তু, সেই যান্ত্রিক যুগেও

দুঃসাহসী দার্শনিকরা সরবে ঘোষণা করিতেছিল, জড় পৃথিবীর স্বাতন্ত্র্য নাই, সে চিৎশক্তির প্রকাশ মাত্র। বহির্জ্জগৎকে তুচ্ছ করিতে যাইয়া এই চৈতন্যবাদ চরমে উঠিয়াছিল। ফলে, বাস্তববাদী প্রতিক্রিয়া দার্শনিকদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠিল। ইংলণ্ডে বাস্তববাদী আন্দোলনের প্রধান নেতা হইলেন প্রফেসর মূর (Moore) এবং বার্ট্রাণ্ড রাসেল (Bertrand Russell). এদের প্রাণপণ চেষ্টা হইল, আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ পৃথিবীকে (commonsense world) কোনো রকমে বাঁচানো। চৈতন্যবাদের আক্রমণ হইতে ষোল আনা বাঁচান সম্ভব হবেনা, একথা নিশ্চিত। কিন্তু যতোটুকু বাঁচান চলে তার জন্যে এরা উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

কিন্তু কিছুদিন যাবৎ দেখা গিয়াছে যে সহজ বুদ্ধির এই বাস্তববাদকে (commonsense realism) বাঁচান আর চলেনা। এই আন্দোলনের বাস্তববাদী নেতারা নিজেরাই স্বেচ্ছায় স্বকীয় মতবাদকে বদলাইতে বাধ্য হইয়াছেন।* বাস্তববাদের অগ্র-নেতা রাসেল পূর্ব্বমতকে বর্জ্জন দিয়া একেবারে নতুন মতবাদ গড়িয়া তুলিয়াছেন। নব-বাস্তববাদ (new-realism) যে জগতের পরিকল্পনা করিয়াছে সে জগৎ বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়-জ্ঞানের (sense-data) দ্বারা তৈরী। যাহাকে আমরা দৈনন্দিন পরিচিত জগৎ বলি (commonsense world) তাহার সঙ্গে এই নব-পরিকল্পিত জগতের কোনো সাদৃশ্যই নাই। বাস্তববাদীর বহির্জ্জগৎ আজ দিনে দিনেই ক্রমশঃ আমদের পরিচিত পৃথিবী হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা এর আগেই আলোচনা করিয়াছি।

বাস্তববাদীরা যে এই দৃষ্টিভূমির পরিবর্ত্তন করিয়াছেন তাহা তাহাদের খামখেয়ালী অকারণ খুশীর দরুণ করেন নাই। তাঁহারা বাধ্য হইয়াছেন এই পথ গ্রহণ করিতে। বাধ্য করিয়াছে পারিপার্শ্বিকের অনিবার্য্য শক্তি। বিজ্ঞানের নিত্য নূতন আবিষ্কার এমন অভূতপূর্ব্ব অবস্থার সৃষ্টি করিতেছে যে পুরাণ ধারণা লইয়া আর চলা সম্ভব নয়। নূতন জ্ঞানের সঙ্গে তাল মিলাইয়া বাস্তববাদকেও রূপান্তর স্বীকার করিতে হইয়াছে। এই নূতন জ্ঞানকে আহরণ করিয়া আনিয়াছে নতুন পদার্থবিজ্ঞান। দুই দিক হইতে এই নতুন জ্ঞান আসিয়াছে, যথা, পরমাণুর সংগঠন-তত্ত্ব (atomic structure) এবং আপেক্ষিকবাদ (Relativity).

পরমাণুর সংগঠন সম্বন্ধে বিজ্ঞানে যে বিপ্লব ঘটিতেছে ১৯২৫ সন হইতেই তাহা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আগেকার নিরেট, শক্ত পরমাণু আর নাই। পরমাণুর নতুন রূপ কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। এই পরিকল্পনা করিবার কৃতিত্ব বিশেষ করিয়া দুইজন জার্ম্মাণ দার্শনিকের। একজন হাইসেন্‌বার্গ (Heisenberg) এবং অপর শ্রোয়েডিংগার (Schroedinger)

আমরা সবাই জানি যে পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিষগুলি নানারকমের জিনিষের মিশ্রণে তৈয়ারী হইয়াছে। এই জিনিষগুলিকে বলা হয় যৌগিক পদার্থ (compound substance)। এইসব যৌগিক বা মিশ্র পদার্থকে বিশ্লেষণ করিলে পাওয়া যায় কতকগুলি মৌলিক উপাদান (elements) এই সব উপাদান কতকগুলি "অণুর" (molecule) সমষ্টি। "অণু" আবার কতকগুলি "পরমাণুর" (atom) দ্বারা তৈরী। যথা, হাইড্রেজেনের দুটা পরমাণু আর অক্সিজেনের একটা পরমাণু লইয়া গঠিত

হয় জলের একটা molecule বা অণু। আমাদের দেশেও মৌলিক উপাদান এবং পরমাণুর কথা দার্শনিকরা বলিয়া গিয়াছেন। পঞ্চভূত এবং ন্যায়-বৈশেষিকের পরমাণু-বাদের কথা সবাই জানে। য়ুরোপে ১৯ শতকে ড্যালটন (Dalton) পরমাণুবাদকে বৈজ্ঞানিক আকার দান করেন। আধুনিক রসায়ণ শাস্ত্রে ৯২টা মৌলিক উপাদানের কথা আছে। বিংশ শতকের প্রথম দিকে পর্য্যন্ত পরমাণুকেই শেষ unit বলিয়া সকলে মনে করিত।

কিন্তু পরমাণু সম্বন্ধে সকল ধারণা বদ্‌লাইয়া গেল একটীমাত্র প্রক্রিয়াবিশেষের অবিষ্কারের ফলে। এই প্রক্রিয়ার নাম "আলোক-বিকীরণ" (Radio-activity) যে সব বস্তু আলোক বিকীরণ করিতে পারে, তাদের অনবরত রূপান্তর হইতেছে। যেমন রেডিয়াম (Radum) আলোক বিকীর্ণ করিতে করিতে সীসায় (Lead) পরিণত হয়। এর কারণ কি ? অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে যে বিদ্যুৎ-কণিকা অনবরত রেডিয়াম হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। বিদ্যুৎকণিকাগুলির সংখ্যা কমিয়া যাওয়ায়ই রেডিয়ামের রূপ বদ্‌লাইয়া যায়। ইহাতে ধরা পড়িল যে এই সব "আলোক-বিকীরক" (Radio-active) বস্তুর পরমাণুগুলি যৌগিক পদার্থ এবং বিদ্যুৎকণিকা দ্বারা গঠিত। এর পরে পরমাণুর সংগঠন বৈজ্ঞানিকদের কাছে ধরা পড়ে। ইলেকট্রণ (Electron) এবং প্রোটোন (Proton) নামক দুইরকমের বিদ্যুৎকণিকার সমবায়ে পরমাণু (atom) তৈরী। রাদারফোর্ড (Sir Ernest Rutherford) পরমাণুর অন্তর্লোকের কাহিনী আমাদের সামনে উপস্থিত করিলেন। রাদারফোর্ড পরমাণু সম্বন্ধে যে ধারণা দিয়াছেন নীল্‌স্ বোর্ (Niels Bohr) নামক বৈজ্ঞানিক তাহাকে আরো পল্লবিত করিয়া পরমাণুর রূপ সম্বন্ধে একটা পরিপূর্ণ ছবি আমাদের দিয়াছেন। বোরের (Bhor) পরিকল্পনায় প্রত্যেকটী পরমাণু এক একটা সৌরলোকের মত। কিন্তু তার ভিতরে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।

পরমাণুর মধ্যে একটা কেন্দ্র আছে যেখানে কতকগুলি ইলেকট্রন ও প্রোটোন জড়াজড়ি করিয়া একসঙ্গে আছে। এই কেন্দ্রগত পুঞ্জকে (neucleus) ঘিরিয়া আরো কতকগুলি ইলেকট্রন অনবরত ঘুরিতেছে। এমন পরমাণু আছে, যার মাত্র একটী প্রোটোনকে ঘিরিয়া একটী ইলেকট্রন ঘুরিতেছে, যেমন হাইড্রোজেন পরমাণু। হাইড্রোজেন পরমাণুই সবার চাইতে সাদাসিধা।

বোর (Bhor), এর পরিকল্পনায় বাহিরের যে ইলেকট্রন ঘুরিতেছে তার কতকগুলি বিশেষ কক্ষ আছে। সেই সব কক্ষগুলিতেই ইলেকট্রণটী ঘুরিতে পারে। খুব কাছাকাছি যে কক্ষটী সেটী স্বভাবতই সবার চাইতে ছোট। ইলেকট্রণ এক কক্ষ হইতে অপর কক্ষে যাইবার সময়ে আকস্মিক উল্লম্ফনে কক্ষান্তরে যায়। একটা মজা হইল এই যে ইলেকট্রণ যতক্ষণ কেবল আপন কক্ষের চক্র পথেই ঘুরিতে থাকে, ততক্ষণ সে কোনই আলোক বিকীর্ণ করে না। কিন্তু যেই সে উল্লম্ফন করিয়া কক্ষান্তরে রওনা হয় তখনই ইলেকট্রণের মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায়। যখন সে বড়ো কক্ষ হইতে ছোট কক্ষে যায়, তখন খানিকটা আলোক বিকীর্ণ করিয়া যায় ; তবে কিছু শক্তিক্ষয় হয়। আবার

যখন বড়ো কক্ষে যায়, তখন সে কিছু আলোক আত্মসাৎ করিয়া রওনা হয়। এটা তখনই ঘটে যখন বাহিরের কোন শক্তির সংস্পর্শে ইলেকট্রণটী আসে।

এখন একটা মুস্কিল হইল এই যে ইলেকট্রনকে সত্যি সত্যি আমরা ধরিতে ছুঁইতে পাইনা। যখন এক ঝলক আলোক বিকীর্ণ করিয়া নিজের অস্তিত্বের পরিচয় দেয়, তখনই আমরা তার প্রকাশকে দেখিয়া তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লই। যে আলোক বিচ্ছুরিত হয় তার ফটোই কেবল আমরা ধরিতে পারি, কিন্তু আলোক-বিকীরণের কারণ হিসাবে ইলেক্ট্রন্‌কে কখনও দেখি না বা জানি না। কাজেই যখন তারা একই অবস্থায় থাকে এবং কোনো প্রকারের আলোক বিকীর্ণ করে না, সেই নিষ্ক্রিয় অবস্থা সম্বন্ধে আমাদের কোনোই জ্ঞান বা অনুভূতি নাই। কাজেই সেই সময়ে পরমাণুর অন্তর্লোকে যে কী ঘটে সে সম্বন্ধে আমরা একেবারে অন্ধকারে আছি।* বোরের মতে, পরমাণু যখন আলোক বিকীরণ করে না, তখনও সে চুপ করিয়া নিষ্ক্রিয় বসিয়া থাকে না। ততক্ষণ সে আপন কক্ষপথে কেবলি অবিশ্রাম ঘুরিতে থাকে। এইখানেই বোরের (Bohr) পরিকল্পনার ক্রটী ধরা পড়িতেছে। বোর আন্দাজী অনুমানের উপরে নির্ভর করিয়া আপন কল্পনায় এই পরমাণুর একটা স্বরূপের চিত্র আঁকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে প্রমাণ-হীন কল্পনার অংশই বেশী, পরীক্ষামূলক সিদ্ধান্তের ভাগ কম। যখন ইলেক্ট্রনের কোন প্রকাশই আমরা দেখি না, তখন সেই অদৃশ্য সত্বার ক্রিয়াশীলতা সম্বন্ধে কল্পনা করিবার অধিকার আমাদের নাই। তাই হাইসেনবার্গ এবং শ্রোয়েডিংগার রাদারফোর্ড-বোর-এর পরমাণুকে (Rutherford-Bohr Atom) বর্জ্জন করিয়া নতুন পরিকল্পনা হাজির করিয়াছেন।

ইহারা বলিতেছেন, পরীক্ষায় যতটুকু ধরা পড়ে সেই নিশ্চিত আলোক-বিকীরণটুকুই কেবল পরমাণুবাদের ব্যাখ্যা ও বিবেচনার বিষয় হইবে। ইহার বেশী নয়। আলোক বিকীর্ণ হইতেছে যেখান হইতে সেই অনির্দ্দেশ্য স্থানে কী আছে, সে সম্বন্ধে জল্পনা করিবার দরকার বা অধিকার আমাদের নাই।† হাইসেনবার্গ-শ্রোয়েডিংগার পরমাণুই আজ বৈজ্ঞানিক জগতে স্বীকৃত। রাদারফোর্ড-বোরএর পরমাণুর ক্রটীগুলি সংশোধন করিয়া তাহারা পরমাণুর নূতন পরিকল্পনা বৈজ্ঞানিক জগতে উপস্থিত করিয়াছেন। পরমাণুর এই নূতন পরিকল্পনার ফল হইয়াছে এই যে ইলেক্ট্রন্‌কে আর এখন কোন নির্দ্দেশ্য "বস্তু" (Thing) বলা চলে না। আর "বস্তু" (Thing) বলিতে কিংবা জড়ধাতু বলিতে এখন বুঝিতে হইবে কোনো অনির্দ্দেশ্য অজ্ঞাত লোক হইতে কতকগুলি বিচ্ছুরণ মাত্র।‡ "বস্তু" বা "দ্রব্য" বলিয়া আজিকার বিজ্ঞানে কিছু নাই; "দ্রব্য" কর্পূরের মতো শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে।

* "But we cannot know what goes on when the atom is neither absorbing nor radiating energy, since then it has no effects in surrounding regions......" (An Outline of Philosophy, pp. 110, B. Russell.)

† "......as to what there is where the radiations come from, we cannot tell......" (ibid. pp. 112).

‡ "The point for the philosopher in the modern theory is the disappearance of matter as a "thing". It has been replaced by emanations from as locality......" (ibid. pp. 112).

অনাগতের আহ্বান

ছায়া মিত্র

আকুল বিশ্ব ব্যাকুল পরাণে
পথপানে আছে চেয়ে—
তুমি কি আসিবে, ওগো অনাগত,
আঁধার পথটী বেয়ে ?
ধর্ম্মের ভাণে মানুষে মানুষে
রচে মহা ব্যবধান !
পাপের স্পর্দ্ধা সত্যেরে শুধু
করিতেছে অপমান ।
শাসনের নামে চলিছে শোষণ,
বিচারের নামে অবিচার !
রক্তহীনেরই রক্ত চুষিয়া
দৈন্যেরে করে দীনতর !

ওগো অনাগত, ন্যায়ের দেবতা,
বিশ্ব ডাকিছে তোমা ;
ভৈরব বেশে নাশো অনাচার,
পাপেরে করোনা ক্ষমা ।
ফুকারিয়া হেথা কাঁদে অসহায়,
শোষিতের ব্যথা জাগে ।
সত্য ও ন্যায়, শান্তি-সমতা
ব্যথিত পরাণে মাগে ।

পাশাপাশি

শান্তিসুধা ঘোষ

১

প্রকাণ্ড বাড়ী। সামনে পিছনে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ, মাঝখানে পরিপাটি সুদৃশ্য একটি দালান। অমিয় ও রেবা দক্ষিণের দুইটি কামরায় বসিয়া দুইজনে পড়াশুনা করে। খোলা জানালা দিয়া ফুরফুর করিয়া হাওয়া আসিয়া ঘরময় খেলা করে, ঝলকে ঝলকে রোদ আসিয়া ঘরখানি আলো করিয়া দেয়, আর রেবা মাঝে মাঝে বই হইতে চোখ তুলিয়া অকারণ পুলকে বাহিরের দিকে তাকায়। অমিয় ওঘরে টেবিলের ওপরে মোটা মোটা বই টানিয়া বাহির করে, আর পেন্সিল দিয়া যেখানে ওখানে জোরে দাগ দেয়, নোটখাতা খুলিয়া কখনও টুকিতে থাকে, আবার ওদিক হইতে রেডিওর ধ্বনি কাণে আসিতে হঠাৎ মেঝের উপরে তালে তালে পা ঠুকিতে আরম্ভ করে। দুটি ভাইবোন—ছোট্ট পরিবারে পিতামাতার নয়নমণি হইয়া বেশ আছে।

অমিয় একখানা খাতা হাতে করিয়া রেবার ঘরে আসিয়া ঢুকিল। "ছাখ্, আমি কি চমৎকার এক আর্টিকেল লিখে ফেলেছি! তোকে শুনিয়ে যাই। শোন্, বই রাখ্।"

রেবা বলিয়া উঠিল, "আরে, থাগ্‌গে বাপু এখন। আমার কলেজের বেলা হয়ে গেল, এক্ষুণি গাড়ী এসে পড়বে। টিউটোরিয়ালের টাস্ক্ শেষ হয়নি,—তোমার ঐ মাথামুণ্ডু শুনবার আমার একটুও সময় নেই।"

"ইস্, মাথামুণ্ডু হলো? জানিস্ কি বিষয়ে লিখেছি,—'ভারতবর্ষ ও কম্যুনিজম্।' তোর মাথা থাকলে তো বুঝবি! গাধা একটা!"

"বেশ বাপু, বেশ, এখন যাও দেখি! গণ্ডগোল করো না।"

অমিয় রেবার টেবিলের উপরে খাতাখানা রাখিয়া বলিল, "কলেজে নিয়ে যাস্, বুঝলি? অফ্ পীরিয়াডে পড়ে রাখ্‌বি। যদি বুঝতে না পারিস্, বিকেলবেলা আমি তোকে বুঝিয়ে দেব।"

দাদাটির বিদ্যাগৌরব রেবা সহ্য করিতে চাহিল না: ঠোঁট উল্‌টাইয়া বলিল, "ইঃ, হয়েছে তো! কতই না লিখেছেন, তা আবার বুঝতে পারবো না!"

যথাসময়ে রেবা উঠিল, স্নান করিয়া আহার সারিয়া সাজিয়া গুজিয়া কলেজের গাড়ীর জন্য প্রতীক্ষায় বসিল। মুখের মোটামুটি ফর্সা রংটিকে মাজিয়া ঘসিয়া আরও পালিশ করিয়া লইয়াছে। লাল টুক্‌টুকে একটি সিল্‌কের ব্লাউজের উপর একখানা লাল-শঙ্খ-পাড় সাদা মিহি মিলের শাড়ী ঘুরাইয়া পড়া, কাণে দুইটি হালকা কাণবালা দুলদুল্ করিতেছে।

লাল সুরকি-বাঁধানো লম্বা রাস্তায় কলেজের গাড়ী আসিয়া ঢুকিল, সিঁড়ির সামনে আসিয়া

ঘণ্টা বাজাইল, টুং টুং টুং ! রেবা আঁচল দুলাইতে দুলাইতে ফড়িংএর মত লঘুপায়ে টক্ করিয়া গাড়ীতে গিয়া উঠিল।

রাস্তার পাশে তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গা ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া দাঁড়াইয়া গাড়ীখানা, মেয়েগুলি, মেয়েদের শাড়ীচুড়ি হাঁ করিয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিল ; গাড়ী ছাড়িতেই ছেলেটা দৌড়িয়া পিছনে চাপিয়া বসিল। দুই হাতে সহিসের পা-দানীটা সজোরে আঁকড়াইয়া ধরিয়া পা দুইটি শূন্যে ঝুলাইতে ঝুলাইতে চলিল।

দূরে কল্‌তলা হইতে ত্রস্তস্বরে একটি বৌ ডাক দিল. "আরে নাম্, নাম্ খোকা !" খোকা পিছন ফিরিয়া একবার তাকাইল, কিন্তু নামিল না। গাড়ীচড়ার ও অবাধ্যতার আনন্দে হাসিতে লাগিল।

বৌ উদ্দেশে তাহাকে শাসাইয়া খুকী দুটিকে হাতছানি দিয়া কাছে ডাকিয়া বড়টির হাতে একটা বৃহদাকার কাঁসার ঘটি চাপাইয়া দিল। তারপরে জলভরা কলসীটির উপরে আর একটি জলভরা ঘটি বসাইয়া আপনি কাঁখে তুলিয়া ছোট্ট মেয়েটির হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

২

অমিয়দের বাড়ীর পিছন দিকে বড় একটি দীঘি। তাহার ওপারে কতকটা জমি। সেইখানে একঘর প্রজা। বৌটি ও তাহার স্বামী, চারটি ছেলেপুলে, আর বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী লইয়া সংসার।

দীঘির ওপারে দুইখানা নারিকেলগাছের গুঁড়ি দিয়া একটি ঘাট পাতা আছে। বৌটি একটি পিতলের গামলায় করিয়া চাল ধুইতে ঘাটে নামিল। এপারে বাঁধানো ঘাটে অমিয়র মা আসিয়াছিলেন স্নানে। বৌটি জলে চাল ঝাঁকাইতে ঝাঁকাইতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ক'টা বাজ্‌ল, মা ?"

"দশটা বেজে গেছে।"

"দশটা !!" চোখ দুইটি কপালে তুলিয়া বৌটি ত্রস্তে বলিল, "সর্ব্বনাশ ! আমার যে এখনও ডাল্ নামে নি।" দ্রুতহস্তে চালগুলি নাড়িয়া বৌটি তর তর করিয়া ঘাট বাহিয়া উঠিয়া গেল।

বড় মেয়েটি রান্নাঘরের দাওয়ার কাছে বসিয়া শনফুল আর লম্বা লম্বা দুর্ব্বা দিয়া তোড়া বাঁধিতেছে, পাশে ছোটটি একরাশি টগরফুল লইয়া মালা গাঁথিতে ব্যস্ত। মা বলিল, "খোকনটা কইরে দুলালী ?" তোড়ার প্রতি অভিনিবেশ না ভাঙ্গিয়া, মুখ না তুলিয়া দুলালী উত্তর দিল, "কে জানে ! ঐ তো ওখানটায় খেলা করছিল।" মা ঝাঁঝিঁয়া বলিলেন," "কে—জানে কি রে ছুঁড়ি ? ত্যাখ্, ত্যাখ্, শীগ্‌গির ত্যাখ্, কোথায় গেল। খাল, নালা, পুকুরের তো অন্ত নেই চারধারে। ওঠ শীগগির। বুড়ি ধাড়ী মেয়ে হয়েছিস্, ভাইটাকে যে একটু দেখবি, তাও না। বসে বসে ফুল নিয়ে খেলা হচ্ছে !"

দুলালী মুখ ভার করিয়া উঠিল। বৌটি রান্নাঘরের দুই হাত উঁচু দরজাটির কাছে ঘাড় নীচু করিয়া ওধারে ঢুকিয়া পড়িল।

দূর হইতে তারস্বরে ডকের বাঁশী শোনা গেল—এগারোটার বাঁশী। বৌটি আরও ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ... ...

ছেলেমেয়েগুলি রান্নাঘরের দাওয়ায় একখানা কাঁধতোলা থালার চারিদিকে চক্রাকার হইয়া বসিয়া হাপুষ হুপুষ করিয়া ভাত গিলিতেছে। ঘরের চালে যে কুমড়ালতাটি ঘনসন্নিবিষ্টভাবে জড়াইয়া আছে, তাহারই ডগা দিয়া ডাল রান্না হইয়াছে; আর উচ্ছে-বেগুন ভাজা। মেয়ে দুইটি পরম আগ্রহে তাহাই কাড়াকাড়ি করিতে ব্যস্ত, যে যতটুকু পারে নিজের কোলে টানিতেছে। বড় খোকাটি হাঁকিয়া বলিল, "মাছ দাও মা!"

ভিতর হইতে কর্ম্মব্যস্ত মা বলিলেন, "মাছ আজ নেই।"

খোকার স্বর উচ্চতরগ্রামে উঠিল, "দাও বলছি!"

"নেই তা কোত্থেকে দেব?"

খোকা ভাতের থালায় ধাক্কা মারিয়া ক্রন্দনসূচকস্বরে অনুনাসিক ধ্বনিতে বলিল, "তবে আমি খাব না।" এরূপ পালা প্রায় প্রত্যহই হইয়া থাকে। খোকার মাছ ছাড়া ভাত রোচে না; অথচ মাছ রোজ থাকে না—অর্থের অনটনের জন্যও কতক বাজার করিবার লোকের অভাবেও বটে। স্বামী ডকে কাজ করেন, রবিবার দিনটি মাত্র ছুটি। সপ্তাহে ঐ দিনটিতে নিয়মিত বাজার হয়। এছাড়া শনি মঙ্গলবার বিকালে সহরোপান্তে হাট বসে, ছুটির পরে স্বামী গিয়া মাছ তরকারী কিনিয়া আনেন। সুতরাং এই তিনটি দিন ছাড়া সপ্তাহে মাছ আসে না। বৌটি উহাই যত্ন করিয়া ভাজিয়া ভাজিয়া জমাইয়া রাখে, এমনি করিয়া তিনদিনের মাছে সাতদিন চলে। কিন্তু খোকার দুর্ভাগ্যক্রমে কাল মাছ ফুরাইয়া গিয়াছে।

মার তরফ হইতে কোনও সদুত্তর মিলিতেছে না দেখিয়া খোকা চেঁচাইতে সুরু করিল বোনেরা একাগ্রমনে উপুড় হইয়া ভাত খাইতেছে, তাহা খোকার আর সহ্য হইল না, পা দিয় থালাটাকে ঠেলা মারিয়া গাঁ গাঁ করিয়া বলিতে লাগিল, "অতগুলো মাছ কি হল—অতগুলো—"

খুকী দুইটি সন্ত্রাসে চেঁচাইয়া উঠিল, "দেখ মা কি করছে—!"

বৌটি ক্রুদ্ধ হইয়া খোকাকে এক চড় কসিয়া দিবার অভিপ্রায়ে রান্নাঘরের ভিতর হইতে বাহির হইল। সঙ্গে সঙ্গে মনিববাড়ীর প্রাচীরের দক্ষিণের মোড়ের কাছে প্রত্যাবর্ত্তনশীল স্বামী অবয়ব দেখা গেল। হঠাৎ রাগ সামলাইয়া খোকাকে নীচু গলায় শাসাইয়া বলিল, "ষাঁড়ের ম চেঁচাস নি বলছি।" তারপরে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া ভাঙ্গা এক টুকরা মাছের ল্যাজা হাত করিয়া আনিয়া থালার উপরে ফেলিয়া দিয়া সরোষে বলিল, "নে—খা।"

পরশুদিনের মাছ কাল দুবেলা খাইয়া আর কিছুই বাকী ছিল না সত্য। কিন্তু তাহা একখানা বৌটি গোপনে আলাদা করিয়া রাখিয়াছিল। স্বামী সমস্ত দিন খাটিয়া পিটিয়া ফেরেন, তায়, অম্বলের রুগী। একটু মাছ না হইলে তাঁহার তো আর চলে না। তাই

ও লাউশাকগুলিকে সে তাহার মধ্যে ঢুকাইল, আবার আস্তে পোঁটলাটি বাঁধিল। এবারে উঠিয়া বলিল, "যাই মা এখন, বেবাক্ কাম বাকী।"

বুড়ী যখন ঘাটের এককোণে দাঁড়াইয়া ভিজা কাপড়খানারই একপ্রান্ত নিঙড়াইয়া শনের মত মাথাটা মুছিতেছিল, তখন রেবা আর অমিয় টেনিস্ র‍্যাকেট হাতে করিয়া হন্ হন্ করিয়া পাশ দিয়া রাস্তায় নামিয়া পড়িল।

বুড়ী অর্দ্ধেক দেহ ভিজা কাপড়খানার একাংশে জড়াইয়া বাঁ হাতে ভিক্ষার ঝুলিটি ও ডানহাতে লাঠি লইয়া বাঁশবনের মধ্য দিয়া চলিল। দুলালীদের বাড়ীর পশ্চিমপ্রান্ত দিয়া যে স্বগভীর নালাটি চলিয়াছে, তাহারই ওপারে দুইপাশে বাঁশগাছের সারি-ছাওয়া মাটির পথ, তার পাশেই বুড়ীর ঘর। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে; অন্ধকার বাঁশবন পার হইয়া অন্ধকারতর কুঁড়েখানির আঙিনায় বুড়ী উঠিল। দুইটি হাড় বাহির করা উলঙ্গ বালক অদূরে প্রচণ্ড হাতাহাতিতে মাতিয়া আছে, শ্যাওলাভরা ডোবার পাশে বসিয়া বড় নাতিটি মাছ ধরিবার 'চাই' প্রস্তুত করিতেছে, আর বার বার মশার কামড়ে গা চুলকাইতেছে। ঠাকুরমাকে দেখিয়া সে একবার তাকাইল।

বুড়ী দাওয়ার উপরে ঝুলিটি নামাইতে নামাইতে শুনিতে পাইল, ঘরের মধ্যে রহমানের বৌএর কলকণ্ঠ কাহার উদ্দেশে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছে—সম্ভবতঃ রহমানেরই উদ্দেশে। নূতনত্ব কিছুই নাই, সদাসর্ব্বদাই ইহা ঘটিয়া থাকে, সুতরাং বুড়ী নিরুদ্বেগে ঘরের মধ্যে ঢুকিল। দেখে, মেঝেতে কম্বলের বিছানার উপরে রহমান শুইয়া আছে—যেমন প্রতিনিয়তই থাকে: তাহার একধারে পাঁচছয় বছরের বিকলাঙ্গ নাতিটি পড়িয়া পড়িয়া নিজের মনে হাত পা ছুড়িতেছে,—উঠিয়া বসিতে সে পারে না, ঘাড়ের কাছে হাড়টি তাহার জন্মাবধিই নাই। বুড়ীর নাকে বিষ্ঠার দুর্গন্ধ আসিয়া পশিল, অন্ধকারে অস্পষ্ট দেখিয়া বুঝিতে পারিল, রহমানের নিম্নার্দ্ধের কাপড়খণ্ড মলমূত্র বিজড়িত হইয়া আছে। বুড়ী আশ্চর্য্য হইল একটু ভয়ও পাইল। এরকম তো বড় একটা হয় না! বুঝিল, ইহাই বৌএর মেজাজের বর্ত্তমান হেতু।

বৌ স্কন্ধলগ্ন শিশুটাকে ধপ্ করিয়া মেঝেতে ফেলিয়া ডান হাতে একটা জলের ঘড়া নামাইতে নামাইতে তীব্রকণ্ঠে বলিতেছে, "মিন্ষের মরণ নেই!! দু' দু'টা ছাওয়ালকে কেড়ে নিয়ে গেল, এটাকে আল্লা চোখেও দেখে না!" রহমানের গা হইতে কাঁথা ও কাপড় টানিয়া লইয়া কোনমতে জল দিয়া তাহাকে পরিষ্কার করিয়া বৌ কাঁথাকাপড় লইয়া বাহির হইয়া গেল। রহমান নিঃশব্দে সেইখানেই ছেঁড়া মাদুরটার উপরে অ-নড় হইয়া পড়িয়া রহিল, মনে হইল যেন ভয়ানক একটি অপকর্ম্ম করিয়া ফেলিয়াছে।

বৌ বাহির হইয়া গেলে আস্তে আস্তে চোখ মেলিয়া বলিল, "আম্মা আইছ?"

বুড়ী কাছে আসিতে রহমান কাতরস্বরে বলিল, "আম্মা, জান্ যে যায়!"

বুড়ী তাহার মাথায় একটি হাত দিল, নিজের ভিজা কাপড়ের প্রান্ত দিয়া কপালটা মুছাইয়া দিল, তারপরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আসতেছি বাপ্‌জান, শুয়ে থাক্‌।"

ভিক্ষার ঝুলিটি তুলিয়া লইয়া পিছনের দাওয়ায়—যেখানে খুটার সঙ্গে একধারে গাইবাছুর দুইটি বাঁধা আর একধারে উনানে রান্না হয়—সেখানে গিয়া ভিজা কাপড়টা ছাড়িয়া বৌকে ডাকিয়া বলিল, "এই চাল রাখলাম বৌ। আর এই লাউশাকও আনিছি দুটো।"

কিন্তু লাউ-বেগুনের আনন্দ এতক্ষণ বুড়ীর মন হইতে উড়িয়া গিয়াছে।

*　　*　　*

এমনি করিয়া তিনটি পরিবারের বছরভরা দিন যায়—পাশাপাশি তিনটি বাঙ্গালী গৃহস্থ পরিবার। একটি দীঘির এপারে, একটি দীঘির পিছন পারে, আর একটি আরও একটু তফাতে, নালার ওধারে,—এইটুকু মাত্র ব্যবধান!

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া

অধ্যাপক অনাথগোপাল সেন

অর্থ পদার্থটীকে আমরা সবাই ভাল করে চিনি ও জানি। কিন্তু ইহা কোথা হইতে কি ভাবে আসে এবং কোথা দিয়া কি ভাবে সরিয়া পড়ে তাহা আমাদের অনেকেরই বুদ্ধির অগম্য। কেন যে জিনিষের চাহিদা ও মূল্য একদিন অকস্মাৎ বাড়িতে সুরু করে, আবার কেনই বা তাহাদের অধোগতি সুরু হয়—অনেকেই আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের অতি যত্নে সঞ্চিত অর্থপুঁটুলি ভাটার টানে অকস্মাৎ আমাদের হাতছাড়া হইয়া যায়; আবার কোথা হইতে জোয়ার আসিয়া আমাদের শূন্য তহবিলকে ভরিয়া দেয়। অকারণে একদিন আমাদের যে কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ও জমিজমার মূল্য কমিয়া অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছিল, তাহাই আবার ফাঁপিয়া উঠিয়া দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়ায়। আশা ও নিরাশার মধ্য দিয়া আমরা ইহার ফলমাত্র ভোগ করি, কিন্তু কারণ কিছুই ঠাহর করিতে পারি না। অর্থের এই রহস্যময় সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব যদি আমরা জানিতে চাই, বর্ত্তমান জগতের ব্যবসা-বাণিজ্য, আন্তর্জ্জাতিক কাজ কারবারের জটিল ও কুটীল পথে যদি প্রবেশ লাভ করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদিগকে আধুনিক ব্যাঙ্কের—সর্ব্বোপরি রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কের—স্বরূপ ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। কারণ বর্ত্তমান যুগে আর্থিক জগতের ভারকেন্দ্র প্রত্যেক দেশের বিশাল ব্যাঙ্ক-গুলিকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। পরের ধনে পোদ্দারী করিয়া ইহারাই আজ দুনিয়াটাকে মুঠার মধ্যে রাখিয়া পরিচালনা করিতেছে। প্রত্যেক দেশের অধিকাংশ আভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য এই সব ব্যাঙ্কের মারফতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। শুধু একই দেশের বহু লোকের মধ্যে নহে, বহুদেশের অগণিত লোকের মধ্যে আজ অবলীলাক্রমে যে ব্যবসা বাণিজ্য চলিতেছে, সমস্ত দুনিয়া যে আজ এত সহজে বেচাকেনার হাটে সম্মিলিত হইতে পারিয়াছে, এর জন্য পরস্পরকে চিনিবার বা জানিবার প্রয়োজন হইতেছে না, ইহা সম্ভব হইয়াছে বর্ত্তমান কালের পৃথিবীব্যাপী শক্তিশালী ব্যাঙ্কগুলির জন্য। ইহাদিগকে আশ্রয় করিয়াই জাহাজবোঝাই পণ্য দেশ হইতে দেশান্তরে চালান হইতেছে, লক্ষ লক্ষ টাকার লেনদেন সাতসমুদ্র তের নদীর উভয় তীরে বসিয়া কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তারে ও বেতারে সম্পন্ন হইতেছে। ক্রেতার পক্ষে এক ব্যাঙ্ক টাকা আদায়ের ভার গ্রহণ করিতেছে; বিক্রেতার পক্ষে আর এক ব্যাঙ্ক টাকা দিবার দায়িত্ব লইতেছে। ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে চেনা-পরিচয়ের প্রয়োজন হইতেছে না। এইভাবেই বিশাল আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসাবাণিজ্য গড়িয়া উঠিবার সুবিধা পাইয়াছে, কৃষি ও শিল্পের অসীম প্রসার ও উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে।

এই ব্যাঙ্কিং-জগতের রাজাধিরাজ হইলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। ইহাকে আমরা আর্থিক জগতের

ঠাকুর্দ্দা বলিয়াও বর্ণনা করিতে পারি। আধুনিক কালে প্রত্যেক উন্নত ও সুসভ্য দেশেই একটি করিয়া রিজার্ভ বা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক অব্ ইংলণ্ড, ব্যাঙ্ক অব্ ফ্রান্স, জার্ম্মাণ রেক্স্ ব্যাঙ্ক, ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইউনাইটেড ষ্টেট্স্ প্রভৃতি এই শ্রেণীর ব্যাঙ্ক। প্রত্যেক দেশের সরকারী তহবিল উহাতেই গচ্ছিত রাখা হয়। গবর্ণমেণ্টের যখন ঋণ করিবার প্রয়োজন হয় তখন তাহার ব্যবস্থাও ইহারাই করিয়া থাকে। ইহারাই দেশের মুদ্রা ও নোট সৃষ্টি ও নিয়ন্ত্রিত করে। দেশের স্বর্ণ তহবিল ও অন্যান্য সকল ব্যাঙ্কের নগদ তহবিল ইহাদের নিকটই গচ্ছিত থাকে। সেইজন্যই ইহাদিগকে "ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক" বলা হয়—কারণ ইহারা সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে অন্যান্য ব্যাঙ্কের ন্যায় কোন টাকা আমানত বা গচ্ছিত রাখে না। পণ্যের মূল্য, বিভিন্ন মুদ্রামধ্যে বিনিময়ের হার, দেশের আর্থিক প্রয়োজন ও বাণিজ্যের গতি (balance of trade) প্রভৃতির উপর দৃষ্টি রাখিয়া প্রয়োজনমত অর্থের পরিমাণ বাড়ানো-কমানো এই কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য। এখানে আমাদের একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অর্থ বলিতে আধুনিক সময়ে ধাতুর তৈরী মুদ্রা কিম্বা কাগজের তৈরী নোটই শুধু বুঝায় না; ধার বা ক্রেডিটমূলে যে বিরাট কাজকর্ম্ম আজ দুনিয়ায় চলিয়াছে তাহাকেও বুঝায়। মুদ্রা ও নোট যেমন রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সৃষ্টি করে, তেমনি ক্রেডিট সৃষ্টি করিয়া থাকে অন্যান্য ব্যবসাদারী যৌথ ব্যাঙ্কগুলি। সর্ব্বসাধারণকে টাকা ধার বা দাদন দেওয়া তাহাদেরই কাজ। এই ক্রেডিট বা দাদনের সহিত কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাকিলেও গৌণ-প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি মনে করে যে, যৌথ ব্যাঙ্কগুলি ক্রেডিট বা দাদন সঙ্গত পরিমাণে না দেওয়ায় সমাজের আর্থিক প্রয়োজন যথোচিত ভাবে মিটিতে পারিতেছে না এবং তদ্দরুণ অর্থাভাবে পণ্যমূল্য হ্রাস পাইতেছে ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষতি হইতেছে, তাহা হইলে ইহা তখনই বাজারে উপস্থিত হইয়া কোম্পানীর কাগজ, শেয়ার ও অন্যান্য সিকিউরিটী ক্রয় করিতে সুরু করিবে। ইহার ফলে বাজারে নূতন অর্থের আমদানী হইবে এবং তাহা যৌথ ব্যাঙ্কগুলির হিসাবে জমা হইয়া ব্যাঙ্কগুলির নগদ তহবিল বৃদ্ধি করিবে। তখন দাদন দিবার পক্ষে ব্যাঙ্কগুলির আর কোন বাধা বা প্রতিবন্ধ থাকিবে না। পক্ষান্তরে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক যদি মনে করে যে অন্যান্য ব্যাঙ্ক ক্রেডিট বা দাদনদ্বারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত নূতন অর্থ সৃষ্টি করিয়া দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থার মধ্যে একটা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছে এবং নিজেদের জন্যও বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে, তাহা হইলে ইহা একধার হইতে কোম্পানীর কাগজ, ট্রেজারী বিল, শেয়ার ও সিকিউরিটী বাজারে বিক্রয় করিতে সুরু করিবে এবং তখন এইসব সিকিউরিটী ক্রয় করিবার জন্য জনসাধারণ তাহাদের নিজ নিজ ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে আরম্ভ করিবে। বিপদ দেখিয়া ব্যাঙ্কগুলির তখন দাদন কমানো বা বন্ধকরা ভিন্ন উপায়ান্তর থাকিবে না। ফলে ক্রেডিটমূলে বাজারে যে অতিরিক্ত অর্থ সৃষ্টি হইয়া পণ্যমূল্য বৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক বিশৃঙ্খলা ঘটাইতেছিল তাহা প্রতিহত হইবে। তাই বলিতেছিলাম যৌথব্যাঙ্কগুলি ক্রেডিট সৃষ্টির প্রধান কেন্দ্র হইলেও এই বিষয়ে ইহারা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রভাব বা কর্ত্তৃত্ব হইতে একেবারে মুক্ত নহে। মুক্ত নহে বলিয়াই

দেশের প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে একটা সুনির্দ্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনা অনুসরণ করা সম্ভবপর হইয়াছে।

তাই আমাদের দেশে ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত, টাকার বাজারে একটা অনিশ্চিত ও খানিকটা বিশৃঙ্খল অবস্থা চলিয়া আসিতেছিল। কারণ প্রথমতঃ, নোট প্রচলন ও মুদ্রা সম্পর্কীয় যাবতীয় বিলি ব্যবস্থার ভার ছিল গবর্ণমেণ্টের হাতে, দ্বিতীয়তঃ ক্রেডিট বা দাদন সম্বন্ধে যৌথ ব্যাঙ্কগুলির ছিল অপ্রতিহত ক্ষমতা; তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল্, ব্যাঙ্ক অব্ মাদ্রাজ, ব্যাঙ্ক অব্ বম্বে প্রভৃতি প্রাদেশিক সরকারী ব্যাঙ্ক গুলির ও তৎপর তাহাদের স্থলবর্ত্তী ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের সহিত অন্যান্য ব্যাঙ্কের বা দেশীয় মহাজনগণের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল না।

তাঁহারই ফলে কোন সময়ে ব্যবসার অনুপাতে টাকার বাজারে অর্থাভাব ঘটিতেছিল, আবার কোন সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ বাজারে ছড়াইয়া পড়িয়া জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক অসুবিধা ঘটাইতেছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অভাবে এমন কোন কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না যাহা ধার (ক্রেডিট) বা সুদের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের ব্যবস্থা করিতে পারে। লড়াইয়ের পর ১৯২০ সালে ব্রুসেল্স্ নগরে যে আন্তর্জাতিক আর্থিক বৈঠক বসে, তাহাতে যে সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নাই সেই সব দেশে উহার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহযোগিতা ভিন্ন কোন দেশের আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া সম্ভবপর নহে, ইহাও ঐ বৈঠকে স্বীকৃত হয়। ইহার ফলে আমেরিকার ও ইউরোপের যে সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অভাব ছিল সেই সব দেশে কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষেও এইরূপ ব্যাঙ্কের অভাব বহুদিন হইতে অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। একশত বৎসর পূর্ব্বে ১৮৩৬ সালে সর্ব্বপ্রথম এইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব কয়েকজন ব্যবসায়ী উপস্থিত করিয়াছিলেন। তৎপর ১৮৩৭ সালে তিনটী প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে একত্র করিয়া একটি নিখিল ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব, ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গলের তৎকালীন সম্পাদক ডিক্সন সাহেব করেন। ১৮৯৮ সালে ফাউলার কমিটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। ১৯০১ সালে লর্ড কার্জ্জন এই বিষয়টী পুনরায় বিশেষভাবে বিবেচনা করেন। ১৯১২—১৩ সালে চেম্বারলেন কমিশনের স্বনামখ্যাত সদস্য কেইন্স্ সাহেব তিনটী প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক একত্র করিয়া একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুবিধাজনক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। এবং এইরূপ ব্যাঙ্কের একটী খসড়া পর্য্যন্ত প্রস্তুত করেন। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। অবশেষে ইউরোপীয় যুদ্ধাবসানের পর ১৯২১ সালে মিঃ কেইন্স্-এর প্রস্তাবানুযায়ী তিনটী প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের সমন্বয়ে ইম্পিরিয়্যাল্ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু ইম্পিরিয়্যাল্ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার দ্বারা শাখা ব্যাঙ্কিঙের প্রসার, উচ্চতর ব্যাঙ্কিং প্রথার খানিকটা প্রচার হইলেও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য সাধিত হয় নাই। সরকারী তহবিলের ও সরকারী

পৃষ্ঠপোষকতার সর্ব্ববিধ সুবিধা ইহা ভোগ করিতেছিল ; কিন্তু বেসরকারী ইংরেজ কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকায় ইহা হইতে ভারতবাসীরা যথোচিত সাহায্য ও সহানুভূতি পাইতেছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, নোট প্রচলন ও তৎসহ মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের ভার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ন্যায় ইহার হাতে দেওয়া হয় নাই। স্বর্ণমান তহবিল (Gold Standard Reserve) ও হোম চার্জ্জেস বাবদ ইংলণ্ডকে আমাদের যে দক্ষিণা দিতে হয় তাহা পাঠাইবার ভারও ইহার উপর ন্যস্ত হয় নাই। এই কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রধান কর্ত্তব্য দেশের ভিতর প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের বিলিব্যবস্থা ও নিয়ন্ত্রণ ইহার পক্ষে মোটেই সম্ভবপর ছিল না। একদিকে গবর্ণমেন্টের হাতে ছিল নোট প্রচলনের ক্ষমতা, নোট ও স্বর্ণমান তহবিল এবং হোম চার্জ্জেস-এর টাকা পাঠাইবার অধিকার ; অন্যদিকে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের হাতে ছিল ধার বা ক্রেডিট সৃষ্টির ক্ষমতা। ভারতের টাকার বাজারে এই দ্বিবিধ শক্তি কাজ করিতেছিল। ফলে পণ্যমূল্য স্থির রাখিবার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচন সম্ভব হইতেছিল না। এবং আর্থিক ব্যবস্থা একটা নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া দেশের কল্যাণার্থ পরিচালিত হইতে পারিতেছিল না। শুধু তাহাই নহে, বিদেশী মুদ্রা কেনা বেচা সম্বন্ধে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের উপর নিষেধ থাকায় ভারতের বহির্বাণিজ্যে প্রতি বৎসর যে ছয়শত কোটী টাকার আদান প্রদান হইয়া থাকে তাহার প্রায় চৌদ্দ আনা কাজই বিদেশী ব্যাঙ্কগুলি করিয়া বিশেষ লাভবান হইতেছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে "ব্যাঙ্কার্স ব্যাঙ্ক" বলা হয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। যদিও ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের নিকট অনেক ব্যাঙ্কের সঞ্চিত তহবিল গচ্ছিত থাকিত, কিন্তু তাহার পরিমাণ বেশী ছিল না এবং তজ্জন্য আইনসঙ্গত কোনরূপ বাধ্যবাধকতাও ছিল না। এইসব নানা কারণে ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে ও টাকার বাজারে পারস্পরিক সম্বন্ধ বিশিষ্ট একটা কেন্দ্রীয় শক্তি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত শক্তি পরস্পর স্বাধীন ভাবে কাজ করার ফলে এই কঠিন প্রতিযোগিতার দিনে আমাদিগকে পদে পদে আর্থিক বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন হইতে হইতেছিল।

নানারূপ পরীক্ষা ও অপ্রিয় অভিজ্ঞতার ফলে ভারত গবর্ণমেণ্ট অবশেষে ১৯৩৫ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবাসীর দীর্ঘ দিনের আশা পূরণ এবং ভারতে জাতীয় ব্যাঙ্কের সূত্রপাত করিয়াছেন। ১৯৩৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই ব্যাঙ্ক মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক অর্থের বিনিময় ও ভারত গভর্ণমেণ্টকে যে অর্থ ষ্টার্লিঙে দিতে হয় তাহা পাঠাইবার দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছে। স্বর্ণমান তহবিল ও নোট তহবিল ঐ সময় হইতে একত্র করিয়া এই ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃত্বাধীনে দেওয়া হইয়াছে। ভারত সরকারের নোট নিঃশেষিত না হওয়া পর্য্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিজের নোট প্রথম দিকে প্রচলন করে নাই। কিন্তু এক্ষণে এই ব্যাঙ্কের নিজস্ব নোট গবর্ণমেণ্ট নোটের স্থান অধিকার করিয়াছে। ১৯৩৫ সালের জুলাই মাসে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কগুলি তাহাদের ক্যাশ তহবিলের নির্দ্দিষ্ট অংশ এই ব্যাঙ্কে জমা রাখিবার পর ইহা মাতব্বর ব্যাঙ্ক হিসাবে দেশের দাদন বা ঋণ নিয়ন্ত্রণের ভার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিয়াছে। দেশের গরীব কৃষক সাধারণ যাহাতে

সহজে ও অল্পসুদে তাহাদের চাষের জন্য টাকা ধার পাইতে পারে তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান, গবেষণা ও প্রয়োজন হইলে ব্যবস্থা করিবার জন্য এক্ষণে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার গঠনপ্রণালী সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিয়া আমাদের কথা শেষ করিব। এই ব্যাঙ্কের নির্দ্ধারিত ও বিলিকৃত মূলধন ৫ কোটী টাকা। ইহাকে ৫টী এলাকায় নিম্নোক্তরূপে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে: কলিকাতা—১৪৫ লক্ষ; বোম্বাই—১৪০ লক্ষ; দিল্লি—১১৫ লক্ষ: মান্দ্রাজ—৭০ লক্ষ; রেঙ্গুন—৩০ লক্ষ। কতিপয় ধনীর হাতে যাহাতে সমস্ত শেয়ার জড় হইতে না পারে তজ্জন্য (১০০৲ টাকা মূল্যের) পাঁচটীর অধিক শেয়ার কোন প্রার্থীকেই বিলি করা হয় নাই।

উল্লিখিত পাঁচটী বিভাগের জন্য ৫টী লোক্যাল বোর্ড গঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের প্রত্যেকটীর জন্য আট জন সভ্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক এলাকার অংশীদারগণ নিজেদের মধ্য হইতে ভোট দ্বারা ৫ জনকে নির্ব্বাচিত করিবেন। অবশিষ্ট তিন জনকে সেণ্ট্রাল বোর্ড (যাহা ৫টী লোক্যাল বোর্ডের উপর সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বিরাজ করিবে) প্রত্যেক বিভাগের অংশীদারগণের মধ্য হইতে মনোনীত করিবেন। এইরূপ মনোনয়ন কৃষি বা সমবায় সমিতির স্বার্থ কিংবা অন্য যে সব আর্থিক স্বার্থের পক্ষ হইতে প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন নাই তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবে। নির্ব্বাচনের সময় পাঁচটি অংশের জন্য একটি করিয়া ভোট দিতে পারা যাইবে এবং কোন অংশীদারই —তাহার অংশের সংখ্যা যত বেশীই হউক না কেন—১০টির বেশী ভোট দিতে পারিবেন না। ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃত্ব যাহাতে কতিপয় ক্ষমতাশালী ধনী ব্যক্তির হাতে যাইয়া না পড়ে তজ্জন্য এরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অধিক লাভের লোভে জাতীয় স্বার্থ যাহাতে বিসর্জ্জিত না হয় সেই উদ্দেশ্যে সাধারণ অবস্থায় শতকরা ৫৲ টাকার বেশী লভ্যাংশ বিতরিত হইবে না, ইহাও নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

ব্যাঙ্ক পরিচালনার দায়িত্ব প্রধানতঃ সেণ্ট্রাল বোর্ডের উপরেই ন্যস্ত। লোক্যাল বোর্ড সেণ্ট্রাল বোর্ডের নির্দ্ধারিত ফরমাসী কাজ করিতে পারিবেন। স্থানীয় অবস্থা সম্পর্কে কোন কিছু জানিবার আবশ্যক হইলে সেণ্ট্রাল বোর্ড তৎসম্বন্ধে লোক্যাল বোর্ডের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিবেন এবং প্রয়োজন বোধ করিলে পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। এই সেণ্ট্রাল বোর্ড মোট ১৬ জন সভ্য লইয়া গঠিত। তন্মধ্যে একজন গবর্ণর, দুইজন ডেপুটী গবর্ণর, একজন উচ্চপদস্থ রাজ কর্ম্মচারী ও চারিজন ডিরেক্টার সপারিষদ বড়লাট বাহাদুর মনোনীত করিয়া থাকেন। এই গবর্ণর ও ডেপুটী গবর্ণরদ্বয় ব্যাঙ্কের মাইনে-করা সর্ব্বক্ষণের চাকুরে। গবর্ণরের মনোনয়ন ব্যাপারে বড়লাট বাহাদুর সেণ্টাল বোর্ড বা কেন্দ্রীয় সমিতির সুপারিশ যথাসম্ভব বিবেচনা করেন। অবশিষ্ট ৮জন সদস্যকে লোক্যাল বোর্ড নিজেদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত করিয়া পাঠান। তন্মধ্যে কলিকাতা, বোম্বাই ও দিল্লি লোক্যাল বোর্ড প্রত্যেকে দুইজন এবং মান্দ্রাজ ও রেঙ্গুন লোক্যাল বোর্ড প্রত্যেকে একজন নির্ব্বাচিত করেন। সেণ্ট্রাল বোর্ডে অংশীদার-নির্ব্বাচিত ও বড়লাট বাহাদুর মনোনীত সভ্যসংখ্যা সমান সমান হইলেও, ডেপুটী গবর্ণরদ্বয়ের ও সরকারী কর্ম্মচারীটির ভোট দিবার অধিকার না থাকায় ব্যাঙ্ক পরিচালনায় নির্ব্বাচিত বে-সরকারী প্রতিনিধিগণের ভোটাধিক্য বজায় রাখা হইয়াছে।

লোক্যাল বোর্ডের অধিকাংশ সভ্য অংশীদারগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, ইহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। অধিকন্তু রাজনৈতিক দলাদলি ও অনভিপ্রেত প্রভাব হইতে ব্যাঙ্ককে মুক্ত রাখিবার জন্য প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য কিংবা সরকারী আমলা কেহই ইহার ডিরেক্টার পদপ্রার্থী হইতে পারিবেন না, আইনানুযায়ী তাহার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মোটের উপর এই ব্যাঙ্ককে সরকারী, বে-সরকারী যে কোন শ্রেণী বিশেষের অসঙ্গত ও অহিতকর প্রতিপত্তি ও প্রভাব হইতে মুক্ত করিয়া সপারিষদ বড়লাটের অভিভাবকত্বে অংশীদারগণের প্রতিনিধিদের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যতটুকু স্বায়ত্তশাসন এই ক্ষেত্রে আমরা লাভ করিয়াছি দলাদলি না করিয়া তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে আমাদের ব্যাঙ্কিঙ্কের ভবিষ্যৎ অনেকখানি তাহার উপর নির্ভর করিবে। সর্ব্বক্ষেত্রেই একজন কর্ত্তা বা কাপ্তেনের দরকার। প্রত্যেক সংসারে একজন কর্ত্তা না থাকিলে যেমন নানা রকম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়, খেলার মাঠে—প্রত্যেক দলের খেলোয়াড়দের উপর একজন করিয়া কাপ্তেন না থাকিলে খেলোয়াড়দের মধ্যে যেমন সহযোগিতা জমিতে পারে না, এবং বিচ্ছিন্ন শক্তি পরস্পরকে সাহায্য না করিয়া অনেক সময় পরস্পর বিরোধী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠে,--টাকার বাজারে ও আর্থিক জগতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক-এর অভাবে আমাদের অবস্থাও হইয়াছিল তাহাই। এক্ষণে সে অবস্থা দূর হইয়াছে ভারতীয় ব্যাঙ্কিঙের ক্রমোন্নতির পথ সুগম হইয়াছে—আশা করা যায় আর্থিক জগতে আমরা আমাদের ন্যায্য স্থান ক্রমে অধিকার করিতে পারিব। *

* লেখক কর্ত্তৃক ১৯৩৯, ১০ই মে তারিখে প্রদত্ত বেতার বক্তৃতা--কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রকাশিত। বলা বাহুল্য ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা নহে। কারণ সংক্ষেপে ও যথাসম্ভব সহজে সাধারণকে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা দান করাই ইহার উদ্দেশ্য।

বরষার রূপ

ক্ষিতীশচন্দ্র রায়

আকাশে মেঘ করেছে কোথাও নাহি ফাঁকা।
বাতাসে দুলছে ঘন শালতমালের শাখা।
ঝরিছে বৃষ্টিধারা
বাঁধনহারা
জল ছুটেছে মাঠে।
ঝর ঝরানি গান শুনে আজ সারা বেলা কাটে॥

আসিছে জলের ছিঁটা ঘরের দাওয়াতে
পশিছে গন্ধ-লোটা পূবের হাওয়াতে।
ভুলেছে সকল খেলা
সারা বেলা
ঠাকুরমায়ের কাছে
ভা'য়ে বোনে গল্প শোনার নেশায় মেতে আছে।

ভিজিছে কাকগুলো ঐ সারাটি দিন ভরে'
গুঁজিছে ঠোঁট পালকে বসি চালের পরে
দুপহর এলিয়ে পড়ে
বাদলা ঝরে
আরো দ্বিগুণ জোরে
বেলা যে ভাই ফুরিয়ে এল জানব কেমন করে'।

চাষীরা ঘরেই বসে যায়নি কেহ মাঠে।
পথে আজ লোক দেখিনা চলেনা কেউ হাটে।
বেচারা পথিক একা
কিসের ঠেকা
এমন দিনে তার
বেরিয়ে এল মাথায় করে' বাদলা মেঘের ভার।

বধূরা নদীর ঘাটে কলসী পাশে থুয়ে
করেনা সখীর সাথে গল্প বসে' ভুঁয়ে।
ছেলেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে'
কলসী ধরে'
সাঁতার কেটে জলে
সোঁতের মুখে মনের সুখে ভেসে নাহি চলে!
তরুণী দাঁড়িয়ে আছে ঐ জানালা মূলে;

না জানি কখন গেছে ঘোমটাখানা খুলে।
নয়নে নাইরে পলক
হয়নি অলক
বাঁধা তাহার আজ
হুঁস নাহি তার নাই যে বেলা, হয়নি ঘরের কাজ

ছোঁয়াচ

প্রভাত দেব সরকার

আপনারা না'ও বিশ্বাস করিতে পারেন—

কিন্তু আমি বিশ্বাস করি, অমিয়া অশেষ বুদ্ধিমতী। সে সম্প্রতি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে।

অবশ্য আপনারা বলিতে পারেন, ইহাই যদি আমার বুদ্ধির তুলাদণ্ড হয় তো আমার বুদ্ধিকেই ধিক্! যেহেতু আপনাদের মতে আজকাল গরু-ছাগল-গাধা জাতীয় জীবই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া থাকে। অমিয়া তো দেখিতেছি তাদেরই একজন. প্রশংসা অপেক্ষা দেখিতেছি করুণার-ই পাত্রী!

আমি কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করি যে, যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা হয় এক একটি ছাগল. নয় এক একটি গরু, নয় এক একটি গাধা—ঘোড়ার সংখ্যা খুবই অল্প!

গাধা এবং গরুতে বিশেষ তারতম্য না-ও থাকিতে পারে! কিন্তু গরু-ছাগল-গাধা এবং তেজদীপ্ত, দুরন্ত-দামাল অনুসন্ধিৎসু মানব শিশুতে তফাৎ অনেকখানি এ কথা অস্বীকার করিয়া নবীনের কর্ম্মোদ্দীপনাকে উপহাস করিয়া প্রকারান্তরে মানব সমাজে কলঙ্ক লেপন করিতে চাহি না।...

বুঝিতে পারিতেছি, ইহাতেও নিষ্কৃতি নাই। মানবশিশু বুদ্ধিতে ইতর প্রাণী অপেক্ষা উচ্চ প্রমাণিত হইলেও প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উল্লেখযোগ্য এমন একটা কিছু করিয়া ফেলে না, যাহার নিমিত্ত তাহাকে সবিশেষণে অভিনন্দিত করিতে হইবে। বুঝিতেছি, আপনাদের আপত্তি (এবং আমার বিপত্তিও বটে!) ঐ অশেষ কথাটায়। বুদ্ধিমতীতে আপনাদের কাহারো আপত্তি নাই, কারণ ওটা ঘরোয়া কমপ্লিমেণ্ট,—সকল মেয়ে-ই বুদ্ধিমতী, যেহেতু একুনে নারী জাতিই বুদ্ধিমতী। অশেষ বলিলেই সবিশেষ বিবরণীর আবশ্যক হইয়া পড়ে; যেমন শ্রীমতী অমিয়া এ পর্য্যন্ত কি কি করিয়াছেন? কয়টি যুবককে নাচাইয়াছেন, কিন্তু নিজে নাচেন নাই; কয়টি পার্টিতে নায়িকার ভার লইয়াছেন, কিন্তু নায়ককে অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছেন;—কয়টি সাহায্য রজনীতে অভিনয় করিয়া সোজাসুজি বাড়ি না আসিয়া মোটরে ব্যারাকপুর পর্য্যন্ত 'ধরা দিলাম বলিয়া' অভিনয় করিতে করিতে শেষ পর্য্যন্ত মোটরের অধিকারীকে 'হৃদয় তাপের ভাপে' পূর্ণ করিয়া শূন্য মার্গে ছাড়িয়া দিয়া নির্বিঘ্নে সুস্থ শরীরে বাহাল তবিয়তে গৃহ-প্রত্যাগতা হইয়াছেন ??

ও সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি সম্পূর্ণ অসমর্থ, কারণ আমাদের অমিয়া আজ পর্য্যন্ত ও সকল কিছুই করে নাই। কেন না, তাহার অভিভাবকগণ আপন কন্যারত্নের বুদ্ধির দৌড় দেখাইয়া প্রতিবেশী যুবকদের প্রলুব্ধ করেন না।

তবে অমিয়াকে 'অশেষ' আখ্যা দিবার কারণ এই যে, তাহাকে একদিন হঠাৎ ঠাকুরমার আদেশে চতুর্থ শ্রেণীতেই স্কুল ছাড়িতে হইল; যেহেতু তিনি নাত্‌নীর চতুর্দ্দশ বৎসরের আশঙ্কা করিলেন এবং আশে-পাশে বকাটে ছোঁড়ার বক্রোক্তিতে বিরক্ত হইয়া সমধিক শঙ্কিত হইয়া রহিলেন। অমিয়া বিদ্রোহ করিল না; বাড়ীতেই আগামী দুই বৎসরের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিবার আয়োজন করিতে লাগিল। ঠাকুরমার দুশ্চিন্তা কাটিল, বাপেরও খরচ কমিল এবং এ পাড়ায় মেয়েস্কুলের 'বাসটির' ভেঁপুর আওয়াজ আর না হওয়ায় পাড়াটি দীর্ঘনিঃশ্বাসে ম্রিয়মান হইয়া পড়িল।

ইহাতেও যে ঠাকুরমা বিশেষ সুস্থ হইলেন, এমন বোঝা গেল না। নাত্‌নী ছাদে উঠিলে তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে তাহার পাশে গিয়া দাঁড়ান এবং বিশেষ চাতুর্য্যের সহিত গৃহের মুক্ত ছাদ এবং চতুর্দ্দশ বৎসরের যে একটি সাংঘাতিক সম্বন্ধ আছে তাহা জানাইয়া দেন। ঠাকুরমার প্রাতঃকালীন বায়ু সেবনের বাতিক এবং নাত্‌নীর রুগ্ন স্বাস্থ্যের নিমিত্ত উদ্বেগ আছে। তাঁহার বাতিক এবং অমিয়ার রুগ্নস্বাস্থ্য, দুই উপসর্গ মিলিয়া একই প্রতিষেধক লক্ষ্য করাতে ঠাকুরমা রাত থাকিতে নাত্‌নীকে এক প্রকার 'বগলদাবায়' করিয়া উষাকালের বহুপূর্ব্বে অক্সিজেনে পরিপূর্ণ হইয়া বাড়ি ফেরেন। রাস্তা চলিতে চলিতে নাত্‌নীটি যখন মনে মনে দুইটি সমান্তরাল রেখার সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে পর্য্যালোচনা করিতে থাকে, ঠাকুরমা তখন একালের বেহায়া মেয়েদের কার্য্যকলাপে অতিমাত্রায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের এবং তাহাদের অভিভাবকদিগের উদ্দেশ্যে মনে মনে শতমুখী উত্তোলন করিয়া শূন্যে উৎক্ষেপন করিতে থাকেন। নাত্‌নীর 'নিরুত্তরতায়' তিনি অনায়াসে আনন্দের সহিত ভাবিতে পারেন যে, তাঁহার নাত্‌নীটী একালের মুখে ঝাড়ু মারিয়া বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস কিঞ্চিৎ দীর্ঘ হইয়া-ই উদ্গত হয়।

এক একদিন পড়ার মাঝখানেই ঠাকুরমা 'স্বাধিকার' প্রবেশ করেন। নাত্‌নীটি তখন হয়তো ভিনাসের সমীপে মিলেনিয়মের প্রার্থনাটি আবৃত্তি করিতে করিতে কখন আপনার অজ্ঞাতে ভিনাসের হইয়া বরদান করিয়া ফেলিয়াছে। মিলেনিয়মের মনোবেদনা হয়তো তখন নাত্‌নীর আয়ত চোখে ভর করিয়াছে। ঠাকুরমা বিনা ভূমিকায় কহিলেন, 'ও বাড়ীর মেয়েটার কাণ্ড শুনেছিস্, অমি? কাল রাতে লেকের জলে ডুবে মরেচে—মুখে আগুন!"

অমিয়া ভয়ে কাঁপিতে থাকে, জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, কেন। ঠাকুরমা-ই বলেন, "ঝেঁটাপেটা কর অমন মেয়ের বাপমাকে,—চোখ-কান খাকির দল! গেল তো অমন জল-জ্যান্ত মেয়েটা? ছি ছি, কী কেলেঙ্কারী!"

অমিয়া তখন বিমনা হইয়া ও বাড়ীর মেয়েটির হাস্যোদ্ভাসিত মুখখানা স্মরণ করিতে থাকে ।—প্রাণ রসে উচ্ছ্বসিত সেই মেয়েটি, উদ্ভিন্নযৌবনা সেই সুন্দর মেয়েটি আর নাই। অমিয়ার যেন কোথায় বাজিতে থাকে।

ঠাকুরমা বলিতে থাকেন, "অতো বেহায়ার মত হাসতো,—বুঝ্‌তে পারতুম, ডুবে ডুবে জল খায়। যত সব নচ্ছার মেয়ে! ছি ছি, যত সব অনাছিষ্টির কাণ্ড! দিন দিন মেয়েগুলো কী হ'য়ে উঠ্‌ল !! ওই যে কিনা কী—ওদের গুষ্টির পিণ্ডি! মুখ পুড়িয়ে দিলে! ঢলানীপনার মুখে আগুণ, ছি, ছি!"

অমিয়া নিরুত্তরে বসিয়া থাকে। কুমারীদের দুষ্কৃতি তাহাকে বাজে কিনা, কে জানে। এত বড় কলঙ্কের পরও কুমারীরা দাঁড়াইয়া থাকিবে কী করিয়া, এ ভাবনা তাহার হয় কিনা, তাহাও বুঝা যায় না।

ঠাকুরমা মনে মনে বুঝিলেন, নাত্‌নীটি ওবাড়ীর মেয়েটির কীর্ত্তির নিমিত্ত লজ্জিত এবং আধুনিকাদের বেহায়া কার্য্যকলাপে বীতশ্রদ্ধ।

নাত্‌নীর খাওয়া-শোয়া, চলা-ফেরার উপর ঠাকুরমা চক্ষু-কর্ণ এমনকি নাসিকা পর্য্যন্ত সর্ব্বদা জাগ্রত রাখিয়াছেন। অমিয়ার আহারটি যদি প্রত্যহের মাপে কিঞ্চিৎ কম হয়, ঠাকুরমা অমনি চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিস্ময় প্রকাশ করিতেন, "রোগে ধ'রেচে দেখ্‌চি! নস্যি নেওয়া ধরেচো—বাতাস লেগেচে নাকি?"

কথাটা বুঝিতে না পারিয়া অমিয়া নিঃশব্দে আহার সমাপন করিয়া উঠিয়া পড়ে। ঠাকুরমা তাড়া দিয়া বলেন, "উঠলি যে বড়, কথাটা গেরাজ্জি হ'লো না বুঝি? খাওয়া কমান আজকালকার মেয়েদের ফ্যাসান! যত সব বেহায়ার দল! বস্‌। ও বৌমা, অমিকে আরো চাট্টি ভাত দিয়ে যাও, দুধ দিয়ে খাক্‌। আমি আচার এনে দিচ্ছি।...না খেয়ে খেয়ে মেয়ের চেহারা হচ্চে দেখনা, ফুঁ দিলে উড়ে যাবে—ডানা-কাটা পরী সব!"

বাধ্য হইয়া অমিয়াকে পুনর্ব্বার আহারে বসিতে হয়। বলিতে সাহস হয় না যে তাহার আর ক্ষুধা নাই। কারণ ঠাকুরমা হয়তো বলিয়া ফেলিবেন, ঐটাই আজকালকার মেয়েদের ফ্যাসান। আরো কত কি! তাহা অপেক্ষা নিঃশব্দে কিঞ্চিৎ অধিক আহার্য্য গলাধকরণ করা ভাল।

কিন্তু ইহাতেও পার পাইবার উপায় নাই। ঠাকুরমা অমনি বলিবেন, "এই তো এতো ক্ষিদে নিয়ে উঠে যাচ্ছিলি! বুঝতে পারিনা আর আমি, পড়ার ভয়ে কম খাওয়া! নিকুচি করেচে অমন পড়ার! পড়ে' পড়ে' চেহারাটা কালী হয়ে গেল, দেখচো না বৌমা?...তোমাদেরও বলিহারি যাই বৌমা, মেয়েটাকে মেরে ফেল্‌বার যোগাড় ক'রলে! তোমরা তো আর আমার কথা শুনবে না—মেয়ে জজ ব্যারিষ্টার হ'বে আর কি!...ছেলে তো আমার বাধ্য নয়, কাকেই বা বলি কেইবা শোনে?"

কথা প্রসঙ্গ ন্যায় শাস্ত্রের অনুশাসন গ্রাহ্যই করে না। সুতরাং অতি তুচ্ছ কথায় অতি বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ কথার উদ্ভব বিচিত্র নয়। কিন্তু এই সকল পুরাতন অভিযোগ ঠাকুরমা ইতিমধ্যে

অন্তত সহস্রাধিকবার করিয়াছেন এবং লক্ষবার মা ও ছেলে ইহা লইয়া মনোমালিন্য এবং কথা কাটাকাটি করিয়াছেন। বৌমা এবং অমিয়ার ইহা একপ্রকার গা-সওয়া। কাজেই নিরুত্তর হওয়া ছাড়া ইহার আর কোনো উত্তর নাই। ঠাকুরমার কিন্তু বিরক্তি নাই, নাত্‌নীটিকে একালের চতুর্দ্দিকে পাতা ফাঁদ হইতে সাবধান করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু নাত্‌নীর এবম্বিধ মৌনভাবে তিনি যতটা আশ্বস্ত হইতে পারেন, সময় সময় তাহার অধিক মাত্রায় শঙ্কিত হইয়া উঠেন। মনে মনে আপন আধিপত্য নাশের আশঙ্কায় ঝাঁঝিয়া ওঠেন, "অমন চুপ করে থাকার মানে আর আমি বুঝি না!—গ্রাহ্যই নেই! যেন কে ব'লচে তো ব'লচে! কোথাকার কে দাসী-বাঁদী! সব বজ্জাতি!"

অভিযোগটি আচমকা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় অমিয়া ঠিক করিতে পারেনা, তাহার কী বলিবার থাকিতে পারে, অমঙ্গল আশঙ্কায় এতটুকু হইয়া বিহ্বলভাবে ঠাকুরমার মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। দৃষ্টিটা কখনো কখনো এতই অর্থহীন হইয়া পড়ে যে ঠাকুরমা নিজেই লজ্জিত হইয়া অন্য কথার অবতারণা করেন। মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করেন যে তাঁহার নাত্‌নী পবিত্রই আছে,—একালের বেহায়া মেয়েদের কোনো বৃত্তিই তাহার মনে রেখাপাত করে নাই। তিনি বাঁচিয়া গেলেন যে, তাহার ষোড়শী নাত্‌নীটি এখনো নিষ্পাপ হাঁদা গঙ্গারাম—একেবারে তিনবছরের খুকী!...

ঠাকুরমা খুশী হইয়া তাড়াতাড়ি সহাস্যে নাত্‌নীর কাছে চিঠি লিখাইতে আসেন। যদিও মনে মনে তিনি একালের মেয়েদের বিদ্যাবুদ্ধি এবং সেই সঙ্গে চিঠি-চাপটার ভাষা এবং প্রকাশ ভঙ্গি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দিহান তথাপি অমিয়াকে তাঁহার লিপিকার না করিলেই নয়। উদ্দেশ্য ঠাকুরমার গূঢ়, যদি তাঁহার দৌলতে নাত্‌নী চিঠির ভাষাটা আয়ত্ত করিয়া লইতে পারে, লউক না কেন।

অমিয়া অশেষ বুদ্ধিমতী। সে ঠাকুরমার মনের কথাটা বুঝিয়া লইয়া পূর্ব্বাহ্ণেই শিরোনামায় লিখিয়া বসে—শ্রীশ্রীকালীমাতা শরণং, পত্রের বাঁ-কোণে সাবিত্রীসমানেষু এবং তন্নিম্নে, পরে—লিখিতে কখনো ভুল করে না। ঠাকুরমা বলিবার পূর্ব্বেই সে মন্ত্রমুগ্ধের মত ছোটকাকীমাকে লিখিত পত্রের প্রস্তাবনা গড় গড় করিয়া আবৃত্তি করিয়া যায়।

ঠাকুরমা নাত্‌নীর এবম্প্রকার পারদর্শীতায় চমৎকৃত হইয়া বলেন, "এই না হ'লে আবার চিঠি! মুখে আগুণ ওবাড়ীর বৌ-এর চিঠি লেখার ধরণে! একটা শিরনামা নেই, না আছে কোনো আশীর্ব্বাদ সংবাদ—কায়দা দেখনা দিন দিন! বলে, বেশী কথা লিখে কাজ কী?—ছোট করে লিখলে তো অল্প সময় লাগবে!...জীবটাই কী এত ছোট ভাবিস্? কেনরে বাপু, সময়ের যত অকুলান এই চিঠি লেখবার সময়! ছাদে উঠে পাইচারী করবার সময়, রাস্তায় বেরিয়ে হি হি করে হাস্‌বার বেলায় তো সময় খুব পাওয়া যায়! ঐ যে ওবাড়ীর মেয়েটা শুনলুম অজিতচন্দ্রকে পঁচিশ পৃষ্ঠা করে চিঠি লিখতো—তার বেলা তো দিব্যি সময় কুলোতো? যত সব বেহায়ার দল!!"

সুতরাং ঠাকুরমার মতে বেহায়াপনায় একালের মেয়েদের সময় খুবই প্রশস্ত, আর সময়ের যত অনটন সংসারের দুটো সুখদুঃখের কথার বেলায়।

এত কথার পরও নাত্‌নীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া ঠাকুরমার কেমন অবাক লাগে। আপনারাও ভাবিতেছেন মেয়েটি একেবারে গোবিন্দের মা। আসল ব্যাপার কিন্তু তাহা নয়, অমিয়া অশেষ বুদ্ধিমতী। তাঁহার দূরদৃষ্টি বহুদূর প্রসারিত। সে তাহার ঠাকুরমাকে যতটা চেনে আপনারা এতক্ষণে কিঞ্চিৎ চিনিয়া থাকিলেও তাহার তুলনায় সিকির সিকি বলিতে হইবে। কথায় কথা বাড়ে। অমিয়া তাহা জানে এবং জানে বলিয়াই চুপ করিয়া থাকে। তাহার উপর আসন্ন পরীক্ষার ভাবনা তাহাকে এমন একটি জায়গায় লইয়া গিয়াছে যেখানে শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ প্রভৃতি কোনো অনুভূতিরই বালাই নাই। ঋতুপরিবর্ত্তনের সময় আপনাদের শরীর এবং মনমেজাজের যেরূপ অবস্থা হয় আর কি! যাহা খাইলেন, কোনো আস্বাদ পাইলেন না,—যাহা ঘ্রাণ করিলেন কোনো গন্ধই পাইলেন না!...

অথচ আশ্চর্য্য, ঠাকুরমার নাত্‌নীর নিমিত্ত এই যে চিত্তোদ্বেগ ইহা শান্তির এত সহজ উপায় হাতের কাছে থাকিতেও তিনি অন্ধ হইয়া রহিলেন। আপনারা ভাবিতেছেন, আমিও কম ভাবি নাই, ঠাকুরমার কী দরকার ছিল রে বাপু এত হাঙ্গামা পোহাইয়া, ভয়ে এবং ভাবনায় আকণ্ঠ হইয়া, আশঙ্কা এবং দুর্ভাবনার কণ্টক শয্যায় শয়ন করিয়া?—নাত্‌নীটিকে তো চতুর্দ্দশ বৎসরের আশঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে পাত্রস্থ করিলেই সব চুকিয়া যাইত। তবে যতদূর মনে করিতে পারি, ঠাকুরমা নাত্‌নীর রুগ্নস্বাস্থ্যের নিমিত্ত বিশেষ চিন্তিত ছিলেন এবং এই জন্যই বোধ করি নাত্‌নীর প্রতি তাঁহার মায়া পড়িয়াছিল অধিক মাত্রায়। তিনি ছায়ার মত নাত্‌নীকে ঘিরিয়া থাকিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু তাহাকে একেবারে নজরছাড়া করিয়া একালের ছোঁয়াচ হইতে রক্ষা করিবার কল্পনায় কেমন যেন মনমরা হইয়া পড়িতেন। মনে মনে নিজেকে প্রবোধ দিতেন, নাত্‌নীর বয়সটা যদিও সর্দ্দা আইনের এলাকার বাহিরে এবং গৌরী-কাল উত্তীর্ণ হইয়া গার্গী-কালের সীমানায় উপনীত, তথাপি অমিয়ার বয়সোচিত 'বাড়' হিসাবে তাহা কী আর এমন বেশী! তাহার উপর একালের পাত্রদের উপর ঠাকুরমার বিশ্বাসটাও নিরেট (solid) নয়—অজিতচন্দর, অক্ষয়কুমার, উষাকান্ত প্রভৃতির কার্য্যকলাপ তাঁহাকে একেবারে হতাশ করিয়া দিয়াছে। ভালপাত্র যদিওবা দু'একটি কখন সন্ধানে আসে, কিন্তু তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বাজারের টাট্‌কা রোহিত মৎসের মত বড়বাড়ীর প্রস্তাবিত অধিক মূল্যে তাহা হাত ছাড়া হইয়া যায়। নীলামটা স্বরগ্রামের এত উচ্চধাপে উঠিতে থাকে যে তাঁহার মত কড়ি-কোমল অবস্থার পক্ষে গলাভঙ্গের পুরস্কার সার হয়। * * *

(এ গল্পের এইটুকুই ভূমিকা। এইবার আসল গল্পটুকু আরম্ভ করা যাউক।)

অমিয়া প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। সংবাদ পাইয়া সকলেই উৎফুল্ল হইলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, একালের মেয়েদের অতিমাত্রায় বেহায়াপনার মূল কারণ এবং প্রাচীন পবিত্র হিন্দুয়ানীর জাতিনাশের কালাপাহাড় সদৃশ যে বেয়াব্রু শিক্ষা, তাহাই যখন ঠাকুরমার একান্ত ইচ্ছার বিরুদ্ধে নাত্‌নীর কঠোর তপশ্চরণে তুষ্ট হইয়া বরদান করিয়া ফেলিল, তখন তিনি আনন্দে

একপ্রকার আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। আহ্লাদে, গর্ব্বে, প্রশংসায় তিনি যে কী করিবেন ঠিক করিতে না পারিয়া অমিয়াকে জড়াইয়া ধরিয়া সহস্রাধিক চুম্বন করিলেন। ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বাড়ী মাথায় করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চাকর ছুটিল পুরুতবাড়ি—দ্বারে ফিটন্‌গাড়ীর অশ্ব বার বার হ্রেষাধ্বনি করিয়া কালীবাড়ির কোনো পাণ্ডার দক্ষিণ চক্ষু নর্ত্তনের আভাষ দিল।

ইতিমধ্যে অমিয়ার মাতা শ্বশ্রূঠাকুরাণীর এই সকল আয়োজনের প্রতি কটাক্ষ করিয়া পরোক্ষভাবে কিঞ্চিৎ অসম্মতি প্রদর্শন করিলেন। ঠাকুরমা তাহাতে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "হৈ চৈ আমি আমার নিজের বাড়ীতে কোরচি, তা'তে পাড়াপড়শীর বলবার কী আছে? আর ঢাক কেন, আমি যদি কাওরা-ঢোল পিটি তাতে অপরের কী!!"

অমিয়ার মাতা কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন, "আপনি ওকথা ব'লচেন কেন? লোকে শুনলেই বা ব'লবে কী!" ঠাকুরমা স্বরের মাত্রা আরো উর্দ্ধে তুলিয়া কহিলেন, "বলবো না! একশো বার ব'লবো—ভয় নাকি? আমি আর বুঝিনা, এর মানে কি! আমার নাত্‌নী ভাল, আমার নাত্‌নী পাশ ক'রেচে—তাতেই সবার বুক ফেটে যাচ্ছে, না!! আমার নাত্‌নী তো আর গলায় দড়ি দেয় না, লেকে ঝাঁপ দেয় না,—পঁচিশ পাতা চিঠিও কাউকে লেখে না! তবু সে পাশ করে!—আমি আর বুঝি না, কচি খুকী!"

এত বড় মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পরও অমিয়ার মাতার বলিবার কিছু থাকা উচিত নহে। তিনি লোকলজ্জায় এতটুকু হইয়া তাড়াতাড়ি কাজের অছিলায় অন্যত্র সরিয়া পড়েন। শ্বশ্রূঠাকুরাণীর এবম্বিধ আচরণে তাঁহার কেমন যেন ধোঁকা লাগে? আজ তিনি সামান্য ব্যাপারে একি করিতেছেন? কলিকাতার মত স্থানে তাঁহার নাত্‌নী যুগধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া এমন কি অসাধ্য সাধন করিয়াছে, যাহার নিমিত্ত কেল্লা হইতে না-হউক নিজবাড়ীতেই কামান দাগিতে হইবে? মেয়েদের ম্যাট্রিকুলেশন পাশ এমনি কী অভিনব এবং অভাবনীয়? ছি, ছি একি করিতেছেন উনি!....

কিন্তু কে কাহার কথা শুনিবেন?

অমিয়ার আনন্দ অনির্ব্বচনীয় হইলেও ঠাকুরমা যে তাহাকে এতদূর বাচনিক করিয়া তুলিবেন, তাহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই। অথচ তাঁহাকে নিরস্ত করাও তাহার মত মুখচোরা মেয়ের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। একবার মাত্র সে ঠাকুরমাকে একলা পাইয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাক্‌মা এসব তুমি কী ক'রচো? লোকে যে হাসাহাসি ক'রবে!"

ঠাকুরমা হরিচরণকে বাজারে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া অন্যত্র যাইতে যাইতে তাড়া দিয়া কহিলেন, "তুই থাম না, তোকে কে খবরদালালী করতে বলেচে, শুনি? লোকে হাস্‌চে, তা হাসুক না তারা তাদের বাড়িতে বসে! আমাকে শোনান কেন? আমি এখন ওকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই কৈফিয়ৎ দিই আর কি! আমার বলে মরবার সময় নেই—।....

কিন্তু তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "এখনো দাঁড়িয়ে রইলি যে বড়? চেহারাটা দেখদেখি—একবার শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গেচে! কাপড়টাতে তো চিম্‌টি কাট্‌লে ময়লা ওঠে!

ভাল কাপড়-চোপড় পরতে হবে না ? গয়নাগুলো কি বাক্সেই তোলা থাকবে ? তপস্যা করে করে তো চুলগুলো শোন্ দড়ি হয়ে গেচে ! তেলটেল একটুআধটু লাগাতে হবে না ? তবু সেই দাঁড়িয়ে রইলি যে বড়—কথাগুলো গেরাজ্জি হলোনা ?...আচ্ছা তুই থাক্, আমিই আসচি—নিজহাতে সব করতে হবে, তোদের কর্ম্ম নয় !...হতেই হবে, যেমনি মা তার তেমনি মেয়ে !! আমার যেমন বরাত, উনি যাবার সঙ্গে সঙ্গে কেউ আমার বাধ্য হলো না।"

এত দুঃখেও অমিয়া হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আচ্ছা ঠাক্‌মা, ঠাকুরদা তোমার খুব বাধ্য ছিলেন, না ? তোমার কথায় নাকি তিনি তিনচার দিন জলটুকু পর্য্যন্ত খেতেন না—সকলে মাথা কাটলেও না ?" ইঙ্গিতটুকু ঠাকুরমা ধরিতে পারিয়া হাসিয়া কহিলেন, "ওরে, তবে নাকি তুই কথা জানিস্ না ! খেতেন-ই না তো, তুই তার কী বুঝ্‌বি ?—"

হঠাৎ পাশের বাড়ীর নব বধূটি আসিয়া পড়িতে তিনি কথাটা অন্য পথে ঘুরাইয়া দিলেন। এই যে, এস ভাই এস। দেখ দেখি জ্বালা, তোমরা পাঁচজনেই বল ভাই, আমার অমির কী আর এমন বয়েস হয়েছে যে গয়না পরতে লজ্জা করবে ? একটা পাশ করে' কী তুই এতই বুড়ী হয়ে গেছিস্ রে বাপু ! ঐ চুলোর 'পাশগুলো' কচি কচি মেয়েগুলোর সাধ-আহ্লাদ সব খেলে ! কী যে পড়া, নিকুচি ক'রেচে !!"

খবর শুনিয়া বধূটি ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল, "তাই নাকি, অমিয় পাশ হয়েচে! কখন খবর পেলেন ?" পাশ ব্যাপারটি তুচ্ছ এইরূপ ভাণ করিয়া ঠাকুরমা কহিলেন, "এই তো সবে পেলুম। কী নাকি ফাষ্টডিবিসনে পাশ হয়েছে ! বল না রে অমি, চুপ করে রইলি যে বড় !"

বধূটি হাসিয়া কহিল, "আমাদের এবার কিন্তু সন্দেশ খাইয়ে দিতে হ'বে !"

সহসা মুখ গম্ভীর করিয়া ঠাকুরমা কহিলেন, "ওকথা আর আমায় বোলো না ভাই, মা-মেয়ে ফোঁস করেই আছেন"—

বধূটি বুঝিল, ইহা ঠাকুরমার অভিমানের কথা। কহিল, "ওঁদের আর কী বলুন—আপনার মনের কথা কী আর বুঝ্‌বে !! পাশতো সবাই হয়, কিন্তু অমিয়ার মত দুবছরে কজন হয় শুনি ?" এই কথাতেই ঠাকুরমা পুনঃ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন : এই নিয়েই তো আমার সঙ্গে রাগ। আরে তুই পাশ করে'চিস্ বলে' কী আমি একেবারে দশোভুজো হয়ে'চি নাকি !...আমার খুসী, আমি লোক খাওয়াবো। না হয় ধরেই নিলুম, আমার কিছু নয় ! কিন্তু কটা মেয়ে আমার অমির মত হিঁদুয়ানী বজায় রেখে—মায় পুণিপুকুর, ইতুপূজো থেকে আরম্ভ করে' রোজ শিবপূজো করে' মাত্র দুবছরে পাশ দেয় শুনি ?"

কথাগুলি একনিঃশ্বাসে শেষ হইলেও প্রণিধানযোগ্য। তাহাদের অপূর্ব্ব যুক্তিযুক্ততা কাহারো মনে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ রাখেনা। নব বধূটি মুখ ফিরাইয়া মুচ্‌কি হাসিল, অমিয়া রাঙা হইয়া উঠিল।

ঠাকুরমা বলিতে লাগিলেন, "আরে লেখাপড়া করিস্ বলে কী তোদের চার পা গজায়

নাকি যে হিঁদুয়ানীকে জলাঞ্জলি দিতে হবে? না শিবপুজো, না ইতুপুজো! কেবল হা-হা, যত বেহায়ার দল! কেন, লেখাপড়া করলে কী আর ওসব করা চলে না? সময় নেই! জীবনটা কী এতোই ছোট ভেবেচিস্! কেন, আমার অমি পাশ হ'লো না? সব বজ্জাতি!!"

শেষটুকুই আসল। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অভিযোগগুলির বিরুদ্ধে কথা চলে না। আর কথ চালাইলেও যে বিশেষ সুফল ফলিবে, এমনটিও আশা করা যায়না। এক তরফা অভিযোগ আপনা হইতে শান্ত হওয়াই ভাল। তাই আধুনিক কালের প্রতীক নববধূটি কেবল স্মিতহাস্য করিল, অমিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল।

অতঃপর ঠাকুরমা আপন নাত্নীর পারদর্শীতা সম্বন্ধে আর কিছু উল্লেখ করিয়া একালের মেয়েদের কার্য্যকলাপ যে নেহাৎ-ই অযৌক্তিক, ইহা প্রমাণ করিবার পূর্ব্বেই সেকাল-পালিতা অমিয়া একাল-আশ্রয়ী নববধূটিকে একপ্রকার টানিয়া আপন ঘরে লইয়া গেল। ঠাকুরমা কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কার্য্যান্তরে যাইতে যাইতে কহিলেন, "যাও তো ভাই, ওকে একটু বুঝিয়ে সুঝিয়ে বল, গয়না-টয়নাগুলো পরুক। ফ্যাসন দেখনা একগাছা পুত্পুতে চুড়ি! ওতে কী মেয়ে মানুষের রূপ খোলে?"

মিনিট পাঁচ-সাত পরে অমিয়ার কানে গেল, ঠাকুরমা ইতিমধ্যে তাহার ছোট ভাই পুলক-কুমারের সহিত বাধাইয়া তুলিয়াছেন। নাতিটি বলিতেছে, "ভারি তো পাশ, তার জন্যে এতো! ওহো, তোমার নাত্নীটি কেবল পাশ করলে, না? তা' হ'লে তো বড়লাটকে লিখে দিতে হচ্চে, তিনি যেন তোপের ব্যবস্থা করেন, অন্ততঃ ডজনখানেক—কী বল? খরচাটা কিন্তু তোমাকে দিতে হ'বে, তা-বলে দিচ্ছি!"

ঠাকুরমা তারস্বরে প্রতিবাদ করিতেছেন "দেবোই তো, ভয় নাকি!...দেখা যাবে তোর বেলায়—এখনো দুবছর বাকি, তেজ দেখনা, মট্-মট্ করচেন!...পাশের তুই কী বুঝবি?"

পুলককুমার কহিতেছে, নাঃ "তুমিই যত বুঝেচ! পাশ মানে জান? If you wish a cow can pass: Do you?"

ইংরেজী কথার ব্যবহারে ঠাকুরমা খাপ্পা হইয়া উঠিলেন, "আমাকে গালাগাল দিলি? আচ্ছা, আসুক তোর বাপ!"

পুলককুমার আকাশ হইতে পড়িবার উপক্রম করিয়া কহিল, "বারে, গালাগাল দিলুম মানে? এই সামান্য কথাটা বোঝনা, আবার 'পাশ' নিয়ে লাফাও, হুঁ!"

ঠাকুরমা ছাদ ফাটাইয়া কহিলেন, "বেশ করবো, তোর কিরে ছোঁড়া? আমি নাচবো, তোর বাবার কী?"

পুলককুমার গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, "নাচতে যদি তোমার ইচ্ছে হয়ে থাকে, তুমি প্রাণ খুলে, পেখম তুলে নাচ ঠাকুরমা। কিন্তু খবরদার, বাপ তুল না বলচি—ভাল হবে না!"

ঠাকুরমা তাড়া দিয়া কহিলেন, "বেশ ক'রবো, একশ'বার ক'রবো—তোর কিরে ছোঁড়া ! ও বৌমা, দেখে যাও তোমার ছেলের কাণ্ডখানা—আমাকেই যা তা বলে—"

পুলককুমার সসম্মানে দৌড় দিল। ঠাকুরমা 'হরিচরণ-হরিচরণ 'করিয়া বাড়ির ভিতর ভিত কাঁপাইয়া তুলিলেন। অমিয়ার ঘরে বসিয়া নববধূটি মুচকি হাসিল, অমিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল।

দুপুর বেলার দিকটায় ঠাকুরমার গলার স্বরটা কিঞ্চিৎ লঘু হইয়া আসিল। অতিথি অভ্যাগতগণ একে একে বিদায় লইলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা এতদিন অমিয়ার নীরব সাধনার কথা জ্ঞাত ছিলেন না; যাঁহারা জ্ঞাত থাকিলেও বিশেষ গ্রাহ্যে আনেন নাই; এবং যাঁহারা গ্রাহ্যে আনিলেও তাহা লইয়া শিরঃপীড়ন করেন নাই, তাঁহারা সকলেই ঠাকুরমা কর্তৃক 'মিষ্টিমুখ' করিয়া মুখে অমিয়ার একাল-বিরাগ এবং বুদ্ধিমত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং মনে মনে কহিলেন, বাড়াবাড়ি দেখিয়া আর বাঁচি না—আদিখ্যেতায় গা জ্বলিয়া যায় !

সকলেই কৃতজ্ঞ বিদায় সংলাপে বিনয় প্রকাশ এবং অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়া ঠাকুরমাকে জানাইলেন যে, অতঃপর তাঁহারা সকলেই আপনাপন কন্যারত্নের শিক্ষা বিষয়ে ঠাকুরমা অনুসৃত পন্থা অবলম্বন করিবেন, যেহেতু তাঁহাদেরও মতে আজকালকার মেয়েরা অতিমাত্রায় বেহায়া হইয়া উঠিয়াছে এবং উঠিতেছে এবং তাহাদের বহিরভিযানের বেগ সামলাইতে তাঁহাদের অনেককেই আজকাল ট্রামে-বাসে দাঁড়াইয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে হয়;—সুস্থির হইয়া তাঁহাদের রাস্তা চলিবারও উপায় নাই, যেহেতু ঐসকল বাচাল আধুনিকার উচ্চহাস্যে রাস্তাগুলি দিন দিন অস্থির হইয়া উঠিতেছে। ......

ঠাকুরমা নিশ্চিন্ত হইলেন, কিন্তু অমিয়া বারে বারে প্রত্যেকের নিকট সবিশেষণে পরিচিত হইয়া হাঁপাইয়া উঠিল। বিদ্রোহ করিবার উপায় নাই, ঠাকুরমা তাহাকে বহুপূর্বে আপন কুক্ষিগত করিয়া ফেলিয়াছেন। .....

বেলা তিন চারিটা। ঠাকুরমা তখনো বড় ঘরে পা ছড়াইয়া বসিয়া প্রতিবেশিনী গুটিকয়েক বর্ষীয়সীর সহিত সংসারের সুখ দুঃখের কথা কহিতেছিলেন। অমিয়া নীচে নামিতে নামিতে শুনিতে পাইল: ঠাকুরমা বলিতেছেন, জান ভাই ন বৌ, আমার অমি কিন্তু সাত চড়ে কথা বলে না—যেমন শান্ত, তেমনি নিরীহ, কিছুটি বোঝে না —আজকালকার মেয়েদের মত বাচাল, ফাজিল নয়,—ষোল আনা হিঁদুয়ানীই বজায় রেখেচে, মুখে গেদা নেই, বিরক্তি নেই, তাচ্ছিল্য নেই। !"

ন'বৌ তাড়াতাড়ি কহিলেন, "আপনার নাত্নী, ওকি আর দেখতে হ'বে! আর দেখুন দেখি, আমাদের পাশের বাড়ির বাঙাল গিন্নীটি অহঙ্কারে মট্ মট ক'রচেন, কিনা ওঁর ধেড়ে মেয়ে হেঁটে স্কুলে যায়, বেণী দুলিয়ে ছাদের ওপর লাফালাফি করে!! গিন্নী বলেন, স্কুলে না গেলে কী মেয়েদের কিছু শিক্ষা হয়—পাঁচটা দেখবে শিখবে! বড়মান্সি দেখনা, গা জ্বলে যায়!"

ঠাকুরমা অনুপস্থিত বাঙাল বধূটিকে তর্ক যুদ্ধে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "কেন আমার অমি

আর পাশ হ'লো না? কই, ওঁর মেয়ে কোন স্কুলে গিয়ে পারুক দিকি ত্'বছরে! স্কুলে গিয়ে কী শিখবে? পঁচিশ পাতা চিঠি তো! মুখে আগুন!!"

অমিয়া মনে মনে হাসিয়া নীচে নামিয়া গেল। নীচে আসিয়া পুলক কুমারের পড়ার ঘরে আসিয়া দেখিল, ঘর খোলা—বাবু কোথা বাহির হইয়াছেন। অমিয়া বার কয়েক পুলকের বইগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিল। কিন্তু পাঠ্য পুস্তকগুলিকে কেমন যেন ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ বোধ হইল। যাহারা এই সেদিনও দুর্জ্জেয় দুরূহ মনে হইয়াছিল, তাহারা হঠাৎ কখন তাহার সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে সহজ এবং সরল হইয়া উঠিয়াছে—যাহারা ছিল বহু অগ্রে তাহারাই আজ নির্ব্বিবাদে করুণভাবে পথ ছাড়িয়া দিয়াছে। উহাদের নিমিত্ত অমিয়া এখন কোনো আগ্রহই বোধ করিল না। তাহার কেমন অবাক লাগিল। কিছুক্ষণ পরে সে উঠিয়া গিয়া সদর দ্বারে দাঁড়াইয়া উৎসুক দৃষ্টিতে প্রবহমান, অফুরন্ত যান বাহন লক্ষ্য করিতে লাগিল। আজ ইহাদের কেমন যেন নূতন বোধ হইল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে দৃশ্য উপভোগ করিতে পারিল না। ঠাকুরমার ভয় তাহাকে কেবলি অন্দর মহলে টানিতে লাগিল। দরজাটি বন্ধ করিতে গিয়া 'লেটার বক্সে' নজর পড়িতে সে থমকাইয়া দাঁড়াইল। বাক্সের ছোট ডালাটিকে খুলিয়া সদ্য আগত পত্রটি হস্তগত করিয়া সবিস্ময়ে লক্ষ্য করিল, পত্রের মালিক সে-ই। ক্ষীণ হাতটি থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার নামে পত্র দিল কে? কই, কখনো তো তাহার নামে পত্র আসে নাই—সে কালতো তাহার এখনো আসে নাই? হয়তো সে পড়িতে ভুল করিয়াছে। না ভুল নয়—স্পষ্টই শাদা খামের উপর তাহার নাম, শ্রীমতী অমিয়া দেবী। গোটা গোটা বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা। ভুল হইবে কেন? খামটি কি সে খুলিবে? ভয়ে ভাবনায় অমিয়া ঠক্ ঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। উত্তেজনায় দুই কর্ণমূল গরম হইয়া উঠিল, রগের দুই পার্শ্বে স্বেদবিন্দু দেখা দিল।

উপরের সিঁড়িতে ঠাকুরমা ও তাঁহার আলাপিতাদের পদধ্বনি পাইয়া অমিয়া তাড়াতাড়ি খামটি 'সেমিজের' মধ্যে লুকাইয়া ফেলিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। তারপর দ্রুতপদে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া উপরে উঠিতে উঠিতে ঠাকুরমার সহিত দেখা হইয়া গেল। ঠাকুরমা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর মুখটা অতো শুকনো কেন রে, অমি? কপালে ঘাম দিচ্ছে, জ্বরটর হলো নাকি! কাছে আয়তো দেখি—"

অমিয়া অপরাধীর মত কহিল, "না আমার কিছু হয়নি।"

ঠাকরমা ছাড়িবার পাত্রী নহেন, অমিয়ার গা দেখিয়া তবে ছাড়িলেন। কহিলে, "না, দিনকাল ভাল নয়—নতুন বর্ষার সময়, ঠাণ্ডা লাগতে পারে! খালি গায়ে বেড়াস নি—আমার মোটা চাদরটা গায়ে জড়িয়ে বসে থাক্‌গে যা—আমি যাচ্ছি।"

অমিয়া পলাইতে পারিলে বাঁচে। ঊর্দ্ধশ্বাসে নিজের ঘরে গিয়া কম্পিতহস্তে ভিতর হইতে অর্গল বন্ধ করিয়া দিল। দুরু দুরু বক্ষে খামটি বাহির করিল। কম্পিত শিথিল মুষ্টি হইতে খামটি মেজেয় পড়িয়া গেল। খামটি কুড়াইয়া লইয়া বারকয়েক ইতস্ততঃ করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল।

তারপর ঝাপসা দৃষ্টিতে আশ্‌মানি রঙএর চিঠির কাগজের এককোণে আপন নামের সম্বোধন দেখিয়া ভয়ে প্রস্তরমূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল হইয়া গেল। প্রিয় অমিয়া, এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই তাহার চক্ষু অধীরভাবে পত্রের দক্ষিণ কোণে কী যেন খুঁজিতে লাগিল। কিন্তু কই তারিখ ছাড়া ঠিকানার কোন উদ্দেশ নাই। কাহার এমন সাহস হইল তাহাকে 'প্রিয়' বলিয়া সম্ভাষণ করিতে? তাহার পরের কথাগুলি আরো ভয়ঙ্কর, আরো মর্ম্মান্তিক। অমিয়া বাষ্পাকুল নেত্রে পড়িয়া গেল।

"প্রিয় অমিয়া,

তুমি হয়তো আমায় চিনবে না, কিন্তু আমি তোমায় অনেক দিন থেকেই চিনি। দিদির মুখে তোমার কথা প্রায়ই শুনি, কী যে ভাল লাগে আমার!...সত্যিই আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেচি। ভাবি, তুমি যদি আমার মনের কথাটা জানতে! দু'জনে এতদূরে আছি, কিন্তু আমি তো একদিনও ভাবি না, আমরা ছাড়াছাড়ি হ'য়ে আছি। ভাবি, তুমি আমার কাছেই আছ। এই ভাল, কী বল?...তুমি পাশ হ'য়েচো এইমাত্র খবর পেলুম—কী আনন্দ যে হ'ল, তা আর সামান্য চিঠিতে কী জানাব!....ভেবেছিলুম, বিয়ে আর ক'রবো না, কিন্তু তোমার কথা শুনে অবধি ও ইচ্ছেটা প্রবল হ'চ্ছে আবার; অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে।...আদর্শ নারী তুমি... ঠিক আমার মনের মত। তোমাকে আমার—। আমার কথাটা মনে রেখ কিন্তু। ভালবাসাও নিও। পত্রের উত্তর দিও। ইতি,

আমি কে,

যদি বুঝ্‌তে পারো তো বুঝে নিও।"

আর কিছু নয়? অমিয়া বার বার চিঠিটি উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিল। না কোনোখানেই পত্র প্রেরকের হদিস্ নাই। চিঠির প্রতি ছত্র অমিয়াকে সাত-হাত বসাইয়া দিল। বজ্রাহতের ন্যায় সে স্থির হইয়া নিষ্পলক দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া রহিল। এই প্রথম সে অনুভব করিল, 'ভালবাসায়' ও জ্বালা আছে, দুর্ভাবনা আছে। কিন্তু কাহার এমন সাহস হইল, তাহাকে প্রিয় বলিয়া সম্বোধন করিতে? কে সে দুঃসাহসিক প্রেমিক? অমিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল। অনেক ভাঙ্গাগড়ার পর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া অমিয়া ক্ষিপ্রপদে, স্খলিত আঁচলে মায়ের ঘরে ছুটিল। মা মেয়ের বিলোল ভঙ্গি দেখিয়া চমকাইয়া গেলেন। মুখ-চোখের ছল ছল ভাব দেখিয়া অসুখের আশঙ্কা করিলেন। মেয়ের গায়ে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "না, কিছুতো হয়নি—অমন ক'রচিস্ কেন?

অমিয়ার বাক্‌নিষ্পত্তি হইল না। ভয়ে ভাবনায় তাহার কণ্ঠতালু শুকাইয়া কাঠ হইয়া গেছে। শুধু দুই গণ্ড বহিয়া ধারা নামিয়াছে। মা আর থাকিতে পারিলেন না, অতিশয় ব্যস্ত ভাবে কহিলেন, "বল, তোর কী হ'ল! কে কী ব'ললে?"

যন্ত্রপুত্তলির ন্যায় অমিয়া অঞ্চলের তলদেশ হইতে চিঠিটি বাহির করিয়া মায়ের হাতে দিল। নির্ব্বিকার চিত্তে সে খুনী আসামীর ন্যায় আত্মসমর্পণ করিয়া দণ্ডাদেশের প্রত্যাশায় রহিল। চিঠির ভাষায় মাও কম বিচলিত হইলেন না, কিন্তু মেয়েকে তিনি চেনেন, মুখে কিছু কহিলেন না। বোঝা গেল, তিনি পত্র-প্রেরকের বেয়াদপিতে রুষ্ট হইয়াছেন। মেয়ের নিরপরাধ করুণ মুখটি তাহাকে অতিশয় ব্যথিত করিল। সান্ত্বনা দিবার ছলে কহিলেন, "কোনো অসভ্য ছেলের কাণ্ড— নচ্ছার সব! তুই ভাবিস্ নি। বেয়াদপ পাজির দল!"

অমিয়া অনেক কষ্টে কহিল, "কিন্তু ঠাক্‌মা যদি—"

শ্বাশুড়ীর কথা মাও যে ভাবেন নাই, এমন নয়। এ ক্ষেত্রে কী যে কর্ত্তব্য হইবে, তিনি ঠিক্ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। একবার ভাবিলেন, পত্রটির প্রচার এইখানেই শেষ করিবেন; আবার ভাবিলেন, বেয়াদপ পত্রপ্রেরকটি যদি তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া পুনর্ব্বার পত্র লেখে এবং শ্বশ্রূঠাকুরাণী ঘুণাক্ষরে তাহা টের পান;—তাহা হইলে? কেলেঙ্কারীর আর অন্ত থাকিবে না। তাহা অপেক্ষা অচিরাৎ শ্বশ্রূঠাকুরাণীকে ব্যাপারটি জানাইয়া রাখাই ভাল। পরে তাঁহার আর সন্দেহের অবকাশ থাকিবে না।

অমিয়ার মাতা শ্বাশুড়ীকে ডাকিতে বাহিরে চলিয়া গেলেন। অমিয়া ফাঁসীর আসামীর ন্যায় সোফার এক কোণে নির্জীবের মত পড়িয়া রহিল।

ঠাকুরমা আসিয়া উড়ো চিঠিটি পাঠ করিয়া কিছুক্ষণের নিমিত্ত নীরব রহিলেন। মনে মনে খানিক্ষণ কী চিন্তা করিয়া, অবশেষে একেবারে ফাটিয়া পড়িলেন। কথাগুলি কিন্তু সকল-ই তৃতীয় ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন: আমার অদেষ্ট-ই এমনি—যেটুকু বাকি ছিল হ'য়ে গেল! দিন রাত ফুসুর-ফুসুর, গুজুর-গুজুর, আমি আর বুঝি না কচি খুকী!...ভিজে বেড়াল, মুখে রা-টি নেই! ঘেন্না ধরিয়ে দিলে! ভালো করে শেষটা কালো বেরুল! ঐ লেখাপড়া যেদিন ঢুকেচে, বুঝিচি পরকাল ঝরঝরে! আরে আমি কী তোর পেটে হ'য়েচি যে বুঝি না, অতো ভালো মানসীর মানে কী! মিটমিটে শয়তান! বংশের নাম ডোবালে!...আমার মেয়ে হ'লে আঁতুড়েই মুন খাইয়ে মেরে ফেলতুম, ছি, ছি! মেয়েতে ঘেন্না ধরিয়ে দিলে, পোড়াকপাল আমার!!

অমিয়া নির্ব্বাক। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বোধ করি অনুভূত হয় না। শূন্য দৃষ্টিতে ঠাকুরমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অমিয়ার মাতা এতগুলো রূঢ় কথার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া তাড়া খাইয়া চুপ করিয়া গেলেন।

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমরা সবাই ভাল, বেশ বুঝ্‌চি বাপু! আমায় কাশী পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলেই পার...তোমার মেয়ে তুমি দেখো মানা করতে আসবো না তখন...যে পাপ ঢুকেচে ...আমার কী তোমাদের ভালোর জন্যেই...ছি, ছি। চিঠিটা রেখে দাও, মেয়ের মাদুলী করে

দিও .আহা মরি বিবি আমার একটা পাশ হয়েচে—ওটা না হ'লে কী আর লেখাপড়া সার্থক হ'লো !.. চায় হাত এক করে.দাও, তপস্যা করে শিব আনচেন্, আর কি !"—

ইহার পরও ঠাকুরমা শান্ত হইতে পারিলেন না। রাগে ক্ষোভে এমন সব কথা তাহার মুখ নিঃসৃত হইতে লাগিল যে, যাহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে ভাষাতত্ত্ববিদগণ বরাবরই নীরব রহিয়াছেন, এবং যাহাদের উচ্চারণে সভ্য মানব সন্তান সঙ্কুচিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হইয়া জিহ্বা কর্ত্তন করিয়াছেন, কিন্তু প্রকাশ্য রাজপথে সকাল সন্ধ্যায় একটি মাত্র জলের কলকে বেষ্টন করিয়া যাহাদের প্রগাঢ় অনুশীলন চলিয়াছে প্রত্যহ। এক কথায় সেগুলি অশ্লীল এবং দুই কর্ণমূলে কনিষ্ঠার সংযোগে তাহাদের শ্রুতি নিবারণ করিতে হয়।

মা'ও মেয়ে স্তম্ভিত। বাড়ির চাকর বামুন কৌতুকস্পৃষ্ট হইয়া কেবলি উপরের এই ঘরটির দোর-গোড়ায় ঘোরাঘুরি করিতে লাগিল। সন্ধ্যার আকাশ লজ্জায় ম্লান হইয়া গেল। ঠাকুরমার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, তিনি এতবড় অনাচারের আশু বিহিত চান। ক্রমাগত হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া ভাঙ্গা কাঁসীর মত বাজিতে লাগিলেন। কিন্তু এ অনাচার এমনি যে হাতে পায়ে ধরিয়া মিটাইয়া লইতে চাহিলে মন মানিয়া লয় না, ক্ষোভ দূর হয় না। বিশ্বাস ভঙ্গের এতবড় আঘাত ভোলা যায়ই বা কী করিয়া ? ঠাকুরমার যতই মনে হইতে লাগিল যে, তাঁহার এতদিনের পরিশ্রম নিরর্থক হইয়াছে, আধুনিক কালের অনাচার তাঁহার চোখে ধূলা দিয়া তাহারই অন্দরমহলে প্রবেশ করিয়াছে, ততই আপন অনাবশ্যকতাটা তাহার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিতে লাগিল এবং তিনি ততই ক্ষিপ্ত হইয়া গলাবাজী করিতে লাগিলেন।—অকথ্য, অশ্রাব্য শব্দ সমষ্টির অনর্গল ধারা !!

রাত্রে অমিয়ার বাবা খাইতে বসিয়াছেন। ঠাকুরমা গম্ভীর মুখে দূরে বসিয়া তদারক করিতেছেন। অমিয়ার বাবা বুঝিলেন, ব্যাপার কিছু অস্বাভাবিক ঘটিয়াছে, না হইলে মা তাহার সহসা গম্ভীর হইবার ন'ন, বিশেষ করিয়া আজিকার দিনে। নাত্‌নীর পাশের জয়োল্লাস যে সহসা একটি দ্বিপ্রাহরিক অনুষ্ঠানে স্তিমিত এবং নিঃশেষ হইয়া যাইবে, ইহা তিনি কল্পনা করিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রকৃত কারণটি তিনি যতই অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিলেন, ততই দিশেহারা হইয়া পড়িতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, অমিয়ার মাতার সহিত কোনরূপ মনোমালিন্য হইয়া থাকিবে ; আবার ভাবিলেন, তাহাও বা কি করিয়া সম্ভব—অমিয়ার মাতা তো সে প্রকৃতির নয় ! তবে চাকর-বাকরের সহিত হইয়া থাকিবে ! কিন্তু মাতার আত্মসম্মান বোধ তো সেখানে কোনদিন খর্ব্ব হয় নাই ! তবে কী ? এদিকে ঠাকুরমা ক্রমশঃ অধিকমাত্রায় গম্ভীর হইয়া উঠিতে লাগিলেন।

অনেক ভাবিয়া যখন মায়ের এবম্বিধ গাম্ভীর্য্যের কোনো কারণ নির্দ্ধারিত করিতে পারিলেন না, তখন তিনি বিশেষ আগ্রহে আরম্ভ করিলেন, "অমির জন্যে হ্যামিলটনের বাড়ী থেকে ইয়ারিংএর পাথরটা এনেচি দেখেচো ?"

মা নিরুত্তর রহিলেন। অমিয়ার বাবা কিন্তু আগ্রহভরেই কহিলেন, "তোমার যদি পছন্দ না হয়, তাহা হ'লে ফেরৎ নেবে বলেচে। আর সেই যে তুমি বলেছিলে, দয়ারামের কী বাপু সাড়ি—মুটকেশে করে বিক্রী হয়, সেটাও এনেছি, তোমার পছন্দ হয়েচে?

ইহাতেও মা হাঁ-না কিছুই বলিলেন না। কথাগুলো যেন তাহার কানেই যায় নাই, এইরূপ ভাব করিয়া তিনি দুধের বাটিটা আনিতে নিজের ঘরে উঠিয়া গেলেন।

অমিয়ার বাবা মাকে কথা কহাইবার অন্য পথ ধরিলেন। হাসিয়া কহিলেন, "এ সব খরচ কিন্তু আমি এক পয়সাও দিতে পারবো না,—তোমার নাত্‌নী যখন, তুমি দেবে!"

ঠাকুরমা শুধু কহিলেন, "ওসব আমি আর কী দেখবো! যার জিনিষ তাকে দেখিও—গরীবকে নিয়ে টানাটানি কেন আর...আমায় কাশী পাঠিয়ে দাও।"

ব্যাপারটি আরো ঘোরাল হইয়া উঠিল। অমিয়ার বাবা অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "তোমার আবার হ'লো কী! হঠাৎ কাশী যেতে চাইচো?"

ঠাকুরমা নির্লিপ্তকণ্ঠে কহিলেন, "হ'বে আর কী! তোমাদের সংসার তোমরা এবার বুঝে নাও!—ঢের শিক্ষা হ'লো আমার, নাকে-কানে খৎ!"

অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া অমিয়ার বাবা চুপ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কী উপায়ে মায়ের রাগের প্রকৃত কারণটি জানিতে পারিবেন! হাওয়া যেরূপ উল্টা বহিতেছে, তাহাতে যে বিশেষ সুবিধা হইবে, এমনটি আশা করা যায় না।

অদূরে অমিয়ার মাতা নতমুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি স্বামীকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া নীরবে আসিয়া অমিয়ার পত্রখানি তাঁহার কোলের উপর ফেলিয়া দিলেন। পত্র পাঠে তাঁহার ভাবান্তর হইল। মায়ের রাগের কারণটি তাঁহার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু কিছু না বলিয়া খামটিকে বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পরে কাহাকেও না লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "এ চিঠি এলো কোত্থেকে? কখন এল?"

ঠাকুরমা আর থাকিতে পারিলেন না। কহিলেন, "আস্‌বে আর কোত্থেকে? তোমার ঐ ধিঙ্গি মেয়ে—জিজ্ঞেস্ করে' দেখ—"

অমিয়ার বাবা এবার হো-হো করিয়া হাসিয়া কহিলেন, "এতো দেখ্‌চি দিল্লী থেকে আস্‌চে—ছোটমামার কাণ্ড! কিছুদিন আগে অমিয়ার রোল নাম্বার দিয়ে তাঁকে খবরটা জান্‌তে দেই—তিনি তখন ক'লকাতায়, বোধ হয় দিল্লীতে তাঁর কোনো বন্ধু এতদিনে সে খবর জানিয়ে থাক্‌বেন, তাই এ উচ্ছ্বাস; কবি মানুষ!"

মেঘ কাটিয়া গেল। ঠাকুরমা দন্ত-বিরল হাসিতে উজ্জ্বল হইয়া কহিলেন, "অ্যাঃ,

শেখরটা নাকি! জানি, ওটা চিরকালই ঐ'রকম—বিয়ে থা করলে না, কেবল ঐ করে' বেড়াচ্ছে! দেখ দেখি আমার এমন মেয়েটা কেঁদে কেঁদে সারা হ'য়ে গেল। আমি জানতুমই আমার অমি সে রকম মেয়েই না, শত্রুরাও একথা বিশ্বাস করতো না! অ-বৌমা শিগ্‌গীর অমিকে ডাকো, এখানেই বসে' পড়ুক। ওঃ, তার আবার সর্দ্দি হ'য়েচে, ঠাকুরকে লুচি ভাজতে বল। অ-অমি, অ-অমি—মি-মি!"

অমিয়ার মাতা মনে মনে হাসিলেন। অমিয়ার বাবা হাসিয়া কহিলেন, "ছোটমামার দেখ্‌চি বিয়ের সখ হ'য়েচে, কিন্তু অমির কী তাঁকে পছন্দ হ'বে?"

অমিয়া কিন্তু কোন কথা না বলিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল, কারণ সে অশেষ বুদ্ধিমতী—সে মাত্র দুই বৎসরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে!—প্রেম-পত্র পাইলে সে বাতোদ্ধতা কদলীবৃক্ষের ন্যায় প্রকম্পিতা হয়!—আধুনিক কালকে সে ভয় করে। ঠাকুরমার আশ্রয়ের বাইরের জগৎ তাহার মনে ভয়ের সঞ্চার করে।

আপনা[illegible] অমি[illegible] অশেষ বুদ্ধিমতী কি না! —

বায়ুমণ্ডল (Atmosphere)

প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

পৃথিবীর চারদিক ঘিরে হাওয়ার একটী অদৃশ্য আবরণ আছে। কতগুলো স্বচ্ছ গ্যাস মিশে সৃষ্টি হয়েছে হাওয়া—নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, জলীয় বাষ্প, কার্ব্বনিক এ্যাসিড, আরগণ, নিয়ন, হিলিয়াম, জেনোন ও ক্রিপ্‌টন্ এসব গ্যাসীয় পদার্থই হাওয়ার উপাদান। এরা সব হাওয়ার ভিতর একত্রে আছে, অর্থাৎ মিশেছে কিন্তু এক হয়ে যায় নি। এদের প্রত্যেকের গুণ আলাদা দেখতে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর গায়ে হাওয়ার চাদর থাকায় তা দিনের বেলায় সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপ অনেকটা ঠেকিয়ে রাখে, আর রাত্রিতে শূন্য আকাশের প্রবল ঠাণ্ডাটাকে বাধা দিয়ে সৃষ্টি রক্ষা করে। হাওয়া না থাকলে সমস্ত পৃথিবী হোত নিস্তব্ধ কারণ শব্দের বাহন হচ্ছে হাওয়া। শব্দ ঢেউ খেলিয়ে চলে আসে হাওয়ার ভিতর দিয়ে, আমাদের কানের ভিতরকার পাতলা পর্দ্দায় আঘাত ক'রে এই শব্দের অনুভূতি জন্মায়। হাওয়া না থাকলে সূর্য্যের আলো ছড়াতে পারতো না, তাই অতি তীব্র আলো ও গভীর অন্ধকারের তীক্ষ্ণ পাশাপাশি রেখায় পৃথিবী বিভক্ত হোত, দিনের আলো বলে কিছু থাকত না, দুপুর বেলাও আকাশ হোত অন্ধকার রাত্রির মত ঘোর কালো। যেখানে সোজাসুজি সূর্য্যের আলো যেতে পারে না সেখানে আলো ছড়িয়ে দেয় হাওয়া, নইলে দিনের বেলায় ঘরের ভিতর আলো আসতো কী করে?

হাওয়ায় যে সকল গ্যাস মিশে আছে সেগুলি সবই স্বচ্ছ, কাজেই বায়ুমণ্ডলে যে স্তরের ভাগ আছে দেখে তা বোঝা যায় না। পরীক্ষায় জানা গেছে যে এর সংগঠন বেশ জটিল; বস্তুতঃ একে শুধু একটী মাত্র স্তর না ভেবে মনে করতে হবে অনেক স্তর পর পর সাজানো আছে। এর যে প্রথম স্তর পৃথিবীকে ঘিরে আছে য়ুরোপীয় ভাষায় তার নাম ট্রপোস্ফিয়র (Troposphere) বাংলায় বলা যেতে পারে ক্ষুব্ধ স্তর। সচরাচর পাঁচ থেকে দশ মাইলের বেশি এ স্তর উঁচু হয় না, তবে স্থান ও সময়ের উপর নির্ভর করে এর উচ্চতা। সমগ্র বায়ুমণ্ডলের তুলনায় ক্ষুব্ধ স্তরের উচ্চতা যদিও খুবই কম, তবু এর মধ্যেই আছে তার সমস্ত পদার্থের প্রায় ৯০ ভাগ, কাজেই অন্য স্তরের চেয়ে এই স্তর অনেক বেশি ঘন। পৃথিবীকে সম্পূর্ণ ঘিরে আছে বলে এই স্তর পৃথিবীর উত্তাপের পরিবর্ত্তন সমভাবে গ্রহণ করতে পারে। কোনো গ্যাসের ভিতর উত্তাপের বিভিন্নতা সৃষ্টি হলে তা কখনও স্থির থাকতে পারে না, কারণ উত্তাপের বৈষম্য সঙ্গে সঙ্গে অণুর দলের গতির বিভিন্নতা ঘটায়। ক্ষুব্ধ স্তরের নিম্নতম অংশ পৃথিবীর সংস্পর্শে আছে বলে তার উত্তাপ অন্য অংশের চেয়ে বেশি, তাই তাপের ফলে এই স্তরের হাওয়া চঞ্চল হয়ে চারিদিকে ছুটোছুটি করে। ঝড়, তুফান ও বৃষ্টি তাই এখানেই দেখতে পাওয়া যায়। ক্ষুব্ধ স্তরের উপরে

যে স্তর আছে সেখানে ঝড়—তুফান প্রবেশ করতে পারে না বলে হাওয়া যেখানে স্থির হয়ে আছে; ইংরেজীতে সে স্তরকে বলে trotosphere, বাংলায় শান্ত স্তর বলা যেতে পারে। নানারকমের হাল্কা ও ভারি গ্যাসীয় জিনিস মিশে তৈরি হয়েছে বায়ুমণ্ডল;- সব জায়গায় হাওয়া যদি স্থির থাকতো তাহলে পৃথিবীর আকর্ষণের বলে সব ভারি জিনিস মাটির কাছে নেমে আসতো, হাল্কা গ্যাস সব উঠে যেত অনেক উপরে। কিন্তু পৃথিবীর আবর্ত্তনে ও স্থানীয় উত্তাপ বিভিন্নতার জন্য ক্ষুব্ধ স্তরের হাওয়ায় ক্রমাগত নাড়াচাড়া চলছে, তাই হাল্কা ও ভারি গ্যাস এতে এমনভাবে মিশে আছে যে বিভিন্ন গ্যাসের পরিমাণে বিশেষ কোনো ভেদ এখানে দেখা যায় না।

আবার এই ক্ষুব্ধ স্তরেরও অনেক ভাগ আমরা কল্পনা করে নিতে পারি। এর সর্ব্বোচ্চ স্তরের উত্তাপ নিম্নতর স্তরের উত্তাপের চেয়ে ঢের কম। বেলুনে ও এরোপ্লেনে চড়ে দেখা গেছে যে পৃথিবী থেকে যত উপরে উঠা যায় হাওয়ার উত্তাপ ততই কমে আসে। এর কারণ জানতে হলে বাষ্পীয় পদার্থের একটী বিশেষ গুণের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। কোনো গ্যাসে চাপ দিলে সঙ্কোচনের সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তাপও বেড়ে যায়, আর চাপ থেকে মুক্ত হলে প্রসারিত হয়ে তার উত্তাপ যায় অনেক ক'মে। ফুটবল ও সাইকেল 'পাম্প্' করার সময় পাম্প্ করা যন্ত্রের ভিতরে হাওয়া পিষ্ট হয়ে কি রকম গরম হয়ে ওঠে হয়তো অনেকের তা জানা আছে।

ক্ষুব্ধস্তরের হাওয়া ক্রমাগত আলোড়িত হয়ে একবার যায় উপরে উঠে আবার আসে নীচে নেমে। উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার উপরকার চাপ যায় কমে, তাই প্রসারিত হয়ে এই হাওয়া ঠাণ্ডা হয়। আবার প্রবল ঝড় তুফানে উপর থেকে হাওয়া তাড়িত হয়ে ভূপৃষ্ঠের কাছাকাছি এলে উপরকার স্তরগুলির চাপে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়ে তার উত্তাপ যায় বেড়ে।

যতো উপরে ওঠা যায় হাওয়ার উত্তাপ প্রতি মাইলে প্রায় ১৮ ডিগ্রি করে কমতে থাকে। পৃথিবীর উপর হাওয়ার উত্তাপ যদি ৬০।৭০ ডিগ্রি হয় তাহলে দু মাইল উপরে জলীয় বাষ্প জমে যাবে বরফ হয়ে। এজন্য উঁচু পর্ব্বতের চূড়ায় সব সময়ে বরফ জমে থাকে; সমুদ্র থেকে ২২৩ মাইল উঁচুতেই এ সব বরফ সচরাচর দেখা যায়, অবশ্য ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এই চিরতুষার রেখার ও পরিবর্ত্তন হয়।

ক্ষুব্ধস্তরের যে সব প্রাকৃতিক উৎপাত ও বৈচিত্র্য দেখা যায় শান্তস্তরে তার কিছুই নেই এ ধারণা আগে বিজ্ঞানীদের মনে বদ্ধমূল ছিলো। তাঁরা ভাবতেন এই স্তরে যতই উপরে উঠা যাবে হাওয়ার ঘনত্ব ও উত্তাপ ততই কমে আসবে। অল্প কিছুদিন হোলো জানা গেছে যে আপাত দৃষ্টিতে এই স্তরকে শান্ত ও বৈচিত্রহীন বলে মনে হলেও এর ভিতর রয়েছে একটী উদ্দাম চঞ্চলতা; এর গঠন প্রণালীও অত্যন্ত জটিল। ১৮৯৮ সালে Tessereinc de Bort বেলুন উড়িয়ে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপের যে তালিকা প্রস্তুত করেন তার পরীক্ষা শেষে জানা যায় পৃথিবীর উপরে ৭।৮ মাইল পর্য্যন্ত হাওয়া ঠাণ্ডা হতে থাকে তারপর উত্তাপ কমা হঠাৎ একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, কিছুদূর পর্য্যন্ত আর কোনো পরিবর্ত্তন দেখা যায় না। তারপর যতই উপরে ওঠা যায় উত্তাপ

একটু একটু করে বাড়তে থাকে। প্রচলিত মত বিরোধী এই তথ্য বিজ্ঞানী মহলে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করলো ; de Bort'র পরীক্ষার ফল সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু এক বছরের মধ্যেই আরো অনেক পরীক্ষা থেকে এর চূড়ান্ত মীমাংসা হোলো, de Bort'র মতই পণ্ডিতেরা মেনে নিলেন।

শান্তস্তরে কিছুদূর পর্যান্ত কেন যে উত্তাপের কোনো পরিবর্ত্তন হয় না সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মতের পার্থক্য রয়েছে। যে মত অনেকেই মেনে নিয়েছেন তার কথা একটু বলবো। বায়ুমণ্ডলের কোনো অংশের উত্তাপ নির্ভর করবে তার তাপ শোষণ (absorption) ও বিকিরণ করার ক্ষমতার উপর, অর্থাৎ যে তাপ তার উপর পড়বে তা থেকে কতটা সে নিজে আত্মসাৎ করে নিতে পারবে, আর কতটাই বা ফিরিয়ে দিতে পারবে তার উপর। সূর্য্যের রশ্মি ও পৃথিবীর এক অদৃশ্য রশ্মি থেকে বায়ুমণ্ডলে তাপ প্রবেশ করে, এই তাপ থেকে বায়ুমণ্ডলের কোন অংশ কি পরিমাণ তাপ গ্রহণ করবে তা নির্ভর ক'রে সেই অংশের পদার্থের গুণ ও তাদের সংগঠনের উপর। যে পরিমাণ তাপ শোষিত হয় ঠিক সেই পরিমাণই যদি ছাড়া পায় অর্থাৎ এই নেওয়া দেওয়ার ভিতরে যদি কোনো ভেদ না থাকে তাহলে সেই স্থানে উত্তাপ বৈষম্য হওয়া অসম্ভব। অন্যান্য আরো অনেক কারণে বায়ুমণ্ডলের উত্তাপ পরিবর্ত্তন হতে পারে, কিন্তু তা নিয়ে কিছু বলতে গেলে যে সব জটিল প্রশ্ন উঠবে তাদের যোগ্য আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয় বলেই বাদ দিতে হোলো।

বায়ুমণ্ডলের খুব উঁচু স্তরের খবর জানতে হোলে আলো ও বৈদ্যুতিক ঢেউয়ের সাহায্য নিতে হবে। বৈদ্যুতিক ঢেউ সম্বন্ধে একটা কথা বলে রাখা দরকার, কোথাও যদি বিদ্যুতের কম্পন চলতে থাকে তাহলে সে স্থানকে কেন্দ্র করে বিদ্যুতের ঢেউ সৃষ্টি হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ; এই ঢেউয়ের গতিবেগ আলোর গতিবেগের একেবারে সমান, সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। আলো ও বৈদ্যুতিক ঢেউ শান্ত স্তরের ভিতর দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলাচল করে বলে পৃথিবীতে আসার সময় বায়ুমণ্ডলের অনেক আশ্চর্য্য খবর সঙ্গে করে আনে। সূর্য্যের শাদা আলোর ভিতর জড়িয়ে আছে সাতটি বিভিন্ন রঙের আলো। বেগুনে, অতিনীল, নীল, সবুজ, হলদে, নারাঙি ও লাল, এই সাতটা রঙ চোখে দেখতে পাই, কিন্তু এদের দুইপ্রান্ত পেরিয়ে এমন অনেক আলোর ঢেউ আছে যারা আমাদের চোখে ধরা দেয় না, কিন্তু স্বাক্ষর রেখে যায় ক্যামেরার প্লেটে। বেগুনী আলোর সীমা ছাড়িয়ে গেছে যে অদৃশ্য আলো তাকে বলা হয় বেগ্‌নীপারের আলো (Ultra-violet light), আর লাল পেরিয়েছে যে আলো তার নাম লাল-উজানী আলো (Infra red light)।

সূর্য্যের আলো বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে পৃথিবীতে আসার পর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কিছু আলো শোষিত হয়েছে তার থেকে, এই আলোর বেশির ভাগই বেগ্‌নীপারের আলো।

এই পরীক্ষার ফলে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে Hartley প্রথম অনুমান করেন যে সূর্য্যের আলো থেকে এই বেগ্নীপারের আলো অপহৃত হওয়ার মূলে রয়েছে ওজোন গ্যাসের একটি স্তর। বেগনীপারের আলো তিনটি অক্সিজেন পরমাণুর সংযোগ ঘটিয়ে ওজোনের একটি অণু সৃষ্টি করে, কিন্তু এই ওজোনের অণু আপন বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে এমন স্থানে যেখানকার তাপমাত্রা খুবই কম। বায়ুমণ্ডলের ক্ষুব্ধস্তরে উত্তাপ বেশি বলে সেখানে ওজোন তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার তার পরিণতি ঘটে অক্সিজেন গ্যাসে। খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়ে থাকা যেন ওজোনের স্বভাব বিরুদ্ধ, কারণ সূর্য্যালোক থেকে যতটা তেজ আত্মসাৎ করে, ফিরিয়ে দেয় তার চেয়ে অনেক কম, এই নেওয়া দেওয়ার ব্যাপারে এতোখানি অসামঞ্জস্য থাকায় অল্পসময়ের ভিতরেই এর উত্তাপ বেড়ে উঠে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যাতে ওজোন আর আপন অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারেনা, ভেঙে পড়ে তিনটি অক্সিজেন পরমাণুতে। শান্ত স্তরের খুব নিম্ন উত্তাপে ওজোন কিছুকাল স্থায়ী হতে পারে তাই এই স্তরেই ওজোন থাকা সম্ভব। ওজোন সূর্য্যের আলো শুষে নেয় বলে ওজোনমণ্ডলের উপরিভাগ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে; পরীক্ষায় জানা গেছে যে ২৫ মাইল উর্দ্ধে বায়ুরাশি প্রায় ফুটন্ত জলের মত তপ্ত।

সূর্য্য ও পৃথিবীর মাঝে তাহলে কোথাও আছে ওজোনের এক স্তর যা সূর্য্যের আলো থেকে শুষে নেয় বেগনীপারের আলো। সূর্য্যের আলোতে বেগনীপারের রশ্মি যা আছে তার বেশির ভাগই এই ওজোন স্তর আটক করে। এখন প্রশ্ন হোলো এই ওজোন স্তর কোথায় আছে, সৌরমণ্ডলে না পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে? সৌরমণ্ডলে এর স্থিতি হলে যে বেগনীপারের আলো পৃথিবীতে আসে তার পরিমাণে কখনো ভেদ দেখা যেতনা, কিন্তু পরীক্ষায় জানা গেছে যে আকাশে সূর্য্যের স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে এরও পরিমাণের কমি বেশি হয়। আকাশে সূর্য্যের স্থান ও বেগনীপারের আলোর প্রাখর্য্য এক অচ্ছেদ্য নিয়মে বাঁধা আছে। এই নিয়ম থেকে ওজোন স্তরের উচ্চতা স্থির করা হয়েছে। সাধারণতঃ পৃথিবী থেকে ১৫ মাইলের ভিতর এই স্তর থাকে; এর গভীরতা খুবই কম, কিন্তু বেগনীপারের আলো শুষে নেওয়ার ক্ষমতা আশ্চর্য্য রকম বেশি। সব শুষে নিতে পারেনা, আমাদের দেহপুষ্টির জন্যে যতটুকু দরকার তাই আসতে দেয় পৃথিবীতে। ক্রমবিকাশের ভিতর দিয়ে যে জটিল ও উন্নত দেহ মানুষ আজ পেয়েছে তা এর চেয়ে প্রখর বেগনীপারের আলোর তেজ সইতে পারেনা। কোনো কারণে বায়ুমণ্ডল থেকে আজ যদি ওজোন স্তর সরে যায় তাহলে যে তীব্র বেগনীপারের আলো পৃথিবীরে পৌছিবে তার তেজ কোনো প্রাণীই সইতে পারিবেনা, জীবজগতের লোপ অবশ্যম্ভাবী।

বেগনীপারের আলোর সাহায্যে অক্সিজেন থেকে ওজোন সৃষ্টি হয় বলে অনুমান করা হয়েছে, কিন্তু বিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় জানা গেছে যে মেরুপ্রদেশে ওজোন আছে খুব বেশি, আর ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিমাণের কমিবেশি দেখা যায় এই প্রদেশেই সব চেয়ে বেশি। বসন্তকালে দীর্ঘ মেরুরাত্রির অবসানে বায়ুমণ্ডলের উঁচুস্তরে ওজোনের প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হয়।

এই পরীক্ষা থেকে বলতে হবে শুধু বেগনীপারের আলোই ওজোন সৃষ্টির একমাত্র কারণ তা নয়, মেরুপ্রদেশে বায়ুমণ্ডলের উঁচুস্তরে বিদ্যুৎস্ফুরণের ফলেও ওজোন সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। ওজোনমণ্ডলের উপর ৪০।৫০ মাইল উর্দ্ধে বায়ুরাশি সম্বন্ধে খবর পাওয়ার একটি অতি আশ্চর্য্য উপায় জানা গেছে। মেরুপ্রদেশে বায়ুমণ্ডলের উঁচুস্তরে কখনো কখনো মেঘের আবির্ভাব দেখা যায়। এসব মেঘের উপাদান কি তা এখনো ঠিক জানা যায়নি। মেরুপ্রদেশে যখন রাত্রি, আকাশ অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন সূর্য্যের কিরণ এই মেঘের উপর পড়ে এক অপরূপ আলোকের সৃষ্টি করে। সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত এই মেঘমালার গতি পর্য্যবেক্ষণ করে উচ্চাকাশের এই অংশে বায়ুর গতিবেগ স্থির করা হয়েছে ; জানা গেছে ৪০।৫০ মাইল উর্দ্ধেও বায়ু সব সময় স্থির হয়ে নেই, এখানেও একটা বায়ুস্রোত আছে এবং তার বেগ ঘণ্টায় ৪০০ মাইল পর্য্যন্ত হয়।

(ক্রমশঃ)

ইউরোপের বর্ত্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি

বিজন ভট্টাচার্য্য

দক্ষিণ পূর্ব্ব ইউরোপে নাৎসী জার্ম্মাণীর রাজ্য সম্প্রসারণের পরিকল্পনা অবাঞ্ছিত হইলেও নাৎসী দাপট সমগ্র জগতে আজ একটা তোলপাড়ের সৃষ্টি করিয়াছে। আজ হয় ত জার্ম্মানীর এই পৈশাচিক রণোন্মাদনা সমগ্র জাতির মধ্যে একটা ত্রাসের সঞ্চার করিয়াছে, এতদিন পর আজ না হয় দেখিতেছি যে রয়েল এলবার্ট হলে আট সহস্র মহিলার এক সভায় মিঃ চেম্বারলেন সদম্ভ ঘোষণা করিতেছেন—'পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হইলে দাবানল প্রজ্বলিত হইবে', কিন্তু তবু ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌ-চুক্তির প্রশস্তি গাহিতে মিঃ চেম্বারলেন একটুও ভুলিয়া যান নাই। পর পর অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া ও মেমেল আত্মসাৎ করিয়া দুরন্ত বৃষের মত ডানজিগের বুকে শিং বসাইয়া নাৎসী জার্ম্মানি একটু দম লইতেছে মাত্র। জার্ম্মানি জানে বৃটেনের এই হুমকির অর্থ আর এই মন দেওয়া নেওয়ার গোপন রহস্য আমরাও একটু একটু জানি। জনমত উপেক্ষা করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বিনিময়ে সাম্রাজ্যবাদ আজ যে কারণেই হউক, এই দুর্ব্বার নাৎসী বৃষের পদলেহন করিতেছে তাহা সত্যই মর্ম্মন্তুদ। আসন্ন বিপ্লবের কুটিল ছায়া আজ ইউরোপের সমস্ত বড় বড় রাষ্ট্রের পাদপীঠে পরতে পরতে সঞ্চিত হইতেছে, নিষ্করুণ মৃত্যুর মত অনিবার্য্য সে সর্ব্বনাশ সুমহান্ ভিসুভিয়সের মত বহ্ন্যুদ্গীরণের অপেক্ষা করিতেছে মাত্র। দূর হইতে সেই ধ্বংসাবর্ত্তের মধ্যে ক্ষণিক প্রভা চকিতে কাঁপিতেছে। আর এই দুঃস্বপ্নই সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিষ্টবাদকে দিশাহারা করিয়া তুলিয়াছে—তাই দুয়ে এ মিতালি।

শান্তিরক্ষা করিবার অজুহাতে চোখের উপর মিঃ চেম্বারলেন স্পেন ও চেক গণতন্ত্রের সমাধি রচিত হইতে দেখিলেন। মিঃ হিটলার যে দিন বীরদর্পে মেমেল প্রবেশ করিলেন মিঃ চেম্বারলেন হয় ত সেদিন নিরপেক্ষ শান্তিবাদের পক্ষপুটচ্ছায়ে আর একটি মিউনিক অভিনয়ের তর্জ্জমা করিতেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ও ফ্রান্সের স্বেচ্ছাকৃত এই ভণ্ডামী ও কাপট্য শুধু আর একটি বিশ্বযুদ্ধ এড়াইবার জন্য। রাজনীতি ক্ষেত্রে বৃটেনের কর্ত্তৃত্ব আজও অবিসংবাদী। নাৎসী জার্ম্মানির এই সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার চরিতার্থতায় যদি না বৃটেনের প্রচ্ছন্ন সম্মতি থাকিত তবে জার্ম্মানির এই পররাজ্যলিপ্সার লোলুপতা ইউরোপে কখনই এতটা ভয়াবহ হইয়া উঠিত না। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্কে শান্তির বুলি আওড়াইয়া জার্ম্মানির শক্তি বাড়াইয়া দিবারই বা কি কারণ থাকিতে পারে! বিশ্বযুদ্ধের আতঙ্ক জার্ম্মাণি অপেক্ষা বৃটেনের কিছু মাত্র কম নহে। বরং বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইংলণ্ডের ঘরে-পরে অনেক জটিল সমস্যারই সৃষ্টি হইবে। সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের রাজ্য আজ এতই বিস্তীর্ণ ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে ভবিষ্যতে আর একটি বিশ্বযুদ্ধ

বাধিলে পূর্ব্বেকার মত এবার বৃটেন উপনিবেশ রাজ্যগুলির একনিষ্ঠ আনুগত্য লাভে বঞ্চিত হইবে, পরন্তু তাহারাও বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে পারে। বৃটেনের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল থাকিলেও যুদ্ধের সময় কাঁচামালের দুর্ভিক্ষ বৃটেনের বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইবে। অদূর ভবিষ্যতে বৃটেন যদি বিশ্বযুদ্ধে জড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে নিরপরাধ শক্তি হিসাবে আমেরিকা বৃটেনকে সামরিক সম্ভার ও খাদ্য-সামগ্রী দিয়া সাহায্য করিলেও সামরিক শক্তি দিয়া সাহায্য করিবে না। কারণ স্বেচ্ছায় আমেরিকা কিছুতেই নিজেকে বিশ্বযুদ্ধে জড়াইতে চায় না এবং এই জন্যই আমেরিকার প্রকৃত শাসক শক্তির প্রভাব রাষ্ট্রসঙ্ঘে ক্ষুণ্ণ করিবার জন্য রবার্ট-লা-ফলেট্ আমেরিকার গণতন্ত্রে লাড্‌লো সংশোধন আইন প্রবর্ত্তন করিবার জন্য সেনেটে প্রবল আন্দোলন সুরু করিয়া দিয়াছেন। এই সংশোধন আইনের মর্ম্মার্থ হইতেছে যে পপুলার রেফারেণ্ডাম ছাড়া অপর কোন মিত্র-শক্তির সাহায্যার্থ কংগ্রেস যুদ্ধ-ঘোষণা করিতে পারিবে না। আমেরিকার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে যাঁহারা বদ্ধপরিকর তাঁহারা মনে করেন যে গঠনতন্ত্রে এই সংশোধন আইন প্রবর্ত্তন করাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রশস্ত হইবে। আমেরিকার সংবাদপত্রসমূহে জনমতের যে অভিব্যক্তি পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যে বর্ত্তমানে আমেরিকা নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিবার পক্ষপাতীই বেশী। কারণ স্বতন্ত্রীরা মনে করেন যে আগামী বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা যদি জড়াইয়া পড়ে তাহা হইলে তাঁহাদের গণতান্ত্রিক আদর্শ একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। তবে আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি যতই জটীল হইয়া পড়িতেছে আমেরিকার জনসাধারণ ততই বহির্জ্জগতের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করিতেছে। সম্প্রতি আমেরিকার ভোট-গণনায় দেখা গিয়াছে যে আমেরিকার শতকরা ৭৬ জন ফ্রান্স ও বৃটেনকে যুদ্ধের সময় খাদ্য-সামগ্রী দিয়া সাহায্য করিবার পক্ষপাতী, আর শতকরা ৫২ জন সামরিক সম্ভার ও বিমানবহর দিয়া সাহায্য করিবার পক্ষপাতী। মাত্র শতকরা ১৭ জন ফ্রান্স ও বৃটেনকে সামরিকশক্তি দিয়া সাহায্য করিতে রাজী আছে আর শতকরা ৫১ জনই লাড্‌লো ওয়ার রেফারেণ্ডাম অ্যামেণ্ডমেন্টের পক্ষপাতী। যাহা হউক প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের প্রচেষ্টায় আমেরিকা ক্রমশঃ দৃঢ় পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করিতে বাধ্য হইতেছে। প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সকে সাহায্য করিবার পক্ষপাতী কারণ তিনি বিশ্বাস করেন যে ফাসিষ্ট পণ্য-বিনিময়-বাণিজ্য আমেরিকার ব্যবসা বাণিজ্যের পরিপন্থী। ইউরোপে হিটলারের বিক্রম যদি ক্রমাগতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে তাহা হইলে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট আমেরিকার জনমতের সমর্থন পাইবেন এবং তখনই তিনি ফ্যাসিষ্টবাদের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তি বৃটেন ও ফ্রান্সকে সামরিক শক্তি দিয়া সাহায্য করিতে পারিবেন। মোট কথা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রদ্বয়ের উপর আমেরিকার মনোভাব যাহাই হউক না কেন যুদ্ধের সময় তাহারা আমেরিকার নিকট হইতে প্রচুর সাহায্য পাইবে।

আর একটী বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ও নাৎসী জার্ম্মানীর পক্ষে সমান ভয়াবহ। আর্থিক স্বল্পতা ও খাদ্য-সামগ্রীর অপ্রচুরতার জন্য নাৎসী জার্ম্মাণী না হয় বৃটেনের পূর্ব্বেই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। পরাক্রমশালী নাৎসীবাদ নিজের আগুনে নিজেই হইবে ভস্মীভূত। সম্প্রতি

যদিও হিটলার জার্ম্মানির আয়তন ও শক্তি কিছুটা বাড়াইয়া ফেলিয়াছেন তথাপি আসন্ন যুদ্ধে তাহার এই সমৃদ্ধি বিশেষ কোন কাজে লাগিবে বলিয়া মনে হয় না। গণতান্ত্রিক চেকোশ্লোভাকিয়া যদি ফ্রান্স এবং বৃটেনের সাহায্য পাইত তাহা হইলে জার্ম্মানির পক্ষে কখনই চেকগণতন্ত্রকে ধ্বংস করা সম্ভব হইয়া উঠিত না। চেকোশ্লোভাকিয়াকে নিরুপায় হইয়াই হিটলারের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। আগামী যুদ্ধের সময় চেকোশ্লোভাকিয়া যদি জার্ম্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহা হইলে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই থাকিবে না বরং সুযোগ পাইলেই সুপ্রাচীন চেক-গণতন্ত্র স্বাধিকার ঘোষণা করিবে বলিয়া মনে হয়। জার্ম্মানির অধিবাসিগণ আজ একরূপ বাধ্য হইয়াই হিটলারের এই নাৎসী শাসন পদ্ধতি স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সরকারী ভাবে হিটলারের নীতি সমর্থন করা ছাড়া তাহাদের ত কোন উপায়ই নাই; এমনকি নিভৃতেও তাহারা তাহাদের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর নিকট মনের দুঃখ ব্যক্ত করিতে ভরসা পায় না। গোয়েন্দা বিভাগ এমনি সুনিয়ন্ত্রিত যে নাৎসী উৎপীড়নের প্রতিবাদে তাহাদের মুখ দিয়া টু শব্দ বাহির করিবার উপায় নাই। সকলের মনেই ভীতি ও সংশয়। তাহারা জানে না যে এই দুর্দ্দান্ত ফ্যাসিষ্টবাদ তাহাদিগকে কোন্ অজানা ভবিষ্যতের দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। বিনা রক্তপাতে সম্প্রতি হিটলারের এই বিজয় গৌরব তাহাদের সেই সংশয়কে হয় ত কথঞ্চিৎ পরিমাণে শিথিল করিয়া দিবে, কিন্তু সন্দেহ তাহাদের থাকিবেই। যে রাজনীতি বিচার বুদ্ধি সাপেক্ষ নহে, একমাত্র হিংসাত্মক ভাব-প্রবণতা দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইয়া আসিতেছে জনসাধারণ তাহাতে কিছুতেই তাহাদের পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারে না। খাদ্যদ্রব্যের অপ্রচুরতাও আজ জার্ম্মানিতে বিশেষ প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বাধ্যতামূলক কর তাহারা আর বহন করিতে পারিতেছে না। কিন্তু কে শুনিবে তাহাদের অভিযোগ—কে করিবে তাহার প্রতিকার? আর আট কোটী নাৎসীবাদের সংহত শক্তির বিরুদ্ধে জনসাধারণই বা কি করিতে পারে! ইতিপূর্ব্বে জার্ম্মাণীতে যে নিষ্করুণ ইহুদি দলন হইয়া গেল তাহাতে জার্ম্মাণ অধিবাসী মাত্রেই সন্তপ্ত। এমন কি নাৎসীবাদীরাও ইহাতে নিজদিগকে গর্ব্বিত মনে করে না। সৈন্য-বাহিনীর মধ্যেও একদল অপর দলের উপর দোষারোপ করিয়া নিজকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করে—মানবতার জন্য নির্ম্মম জহ্লাদের প্রাণও কাঁদিয়া ওঠে। এমনি অসহ্য সে অত্যাচার! অর্থ-নৈতিক দিক দিয়াও কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। দৈনন্দিন ব্যবহার্য্য জিনিষের মূল্য এত উচ্চহারে বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে যে জনসাধারণের পক্ষে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করাও একরূপ দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মানির লোকেরা এইরূপ নিরালম্ব জীবন চাহে না।

ধনতন্ত্রবাদের স্বাভাবিক অবস্থার একমাত্র লাভ খতাইয়াই উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা হইয়া থাকে। যুদ্ধবিগ্রহের সময়ও তাহাই; যুদ্ধের সময় লাভকারীরা বরং বেশী লাভই করিয়া থাকে। তফাৎটা হইতেছে যে যুদ্ধবিগ্রহের সময় লাভকারী ধনিকশ্রেণী উৎপাদন প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করে না মাত্র। রাষ্ট্রই এই উৎপাদন প্রণালী নিয়ন্ত্রণ করে। তবে ধনিকশ্রেণীকে তুষ্ট রাখিবার জন্য রাষ্ট্রই তাহাদের স্বার্থ রক্ষা করে। যুদ্ধমান রাষ্ট্রের পক্ষে এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করা ছাড়া আর কোন

গত্যন্তর নাই। জাপানে আজ এই ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হইয়াছে। টাকা পয়সা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যাপার একমাত্র সামরিক রাষ্ট্র কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ১৯৩২ সালের ক্যাপিটাল ফ্লাইট প্রিভেনসন ল'এর সহিত ১৯৩৭ সালের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ আইন ও ধন নিয়ন্ত্রণ আইনের সংযোগ স্থাপন করা হইয়াছে। ইহাতে বৈদেশিক বাণিজ্য বিনিময় ও দেশে টাকা খাটানো প্রভৃতি ব্যাপারে সামরিক রাষ্ট্রই নিজ হস্তে সমস্ত ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছে। জাপানে আজ সমস্ত শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সামরিক রাষ্ট্রই পরিচালিত করিতেছে। জাপানের উৎপন্ন দ্রব্য ও আমদানী এখন আর জাপানী ধনিকশ্রেণীর লভ্যাংশ খতাইয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয় না, সামরিক রাষ্ট্রকর্ত্তৃক পরিচালিত হইতেছে। ধনিকশ্রেণী কিছু মুনাফা পায় মাত্র। কিন্তু এই মুনাফার সহিত জিনিষের মূল্যের কোন আনুপাতিক সঙ্গতি নাই। প্রত্যেক ধনিকে রাষ্ট্র তাহার নজর সেলামী বাবদ কিছু ধরিয়া দেয় মাত্র। জার্ম্মানি যদিও আজ কোন সত্যিকারের যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয় নাই তথাপি তাহার আবশ্যক সামরিক আয়োজন এতই তীব্র যে জার্ম্মানি ইতিমধ্যেই জাপানের অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। বৈদেশিক বিনিময়, বৈদেশিক বাণিজ্য ও টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করার ভার সামরিক রাষ্ট্রই নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছে। জিনিষপত্রের মূল্য রাষ্ট্র নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে— প্রয়োজন থাকিলেও তাহার কমবেশী হইবার উপায় নাই। আর যখন তখন টেক্স কমানো হইতেছে। এই টেক্স হইতে যাহা আয় হয় তাহা প্রায় গবর্ণমেণ্টের মোট আয়ের এক তৃতীয়াংশ। দক্ষিণ পূর্ব্ব ইউরোপে ব্যবসা বাণিজ্যের দিক দিয়া জার্ম্মানির প্রায় একচেটিয়া অধিকার থাকা সত্ত্বেও জার্ম্মানি দক্ষিণ পূর্ব্ব ইউরোপ হইতে খাদ্যসামগ্রী ও কাঁচামালের মধ্যে মাত্র শতকরা তের ভাগ আমদানী করিয়া থাকে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন যে অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মানির পক্ষে ইহার বেশী আমদানী করা সম্ভব হইয়া উঠিবে না। যদিও ইউরোপে দক্ষিণ-পূর্ব্ব রাষ্ট্রগুলি জার্ম্মানির সহিত পণ্য বিনিময় ও মুদ্রানিয়ন্ত্রণ বাণিজ্যিক চুক্তি দ্বারা আবদ্ধ তথাপি জার্ম্মানি এখনও পূর্ণ স্বাবলম্বী নহে। গত বৎসর জার্ম্মানির মোট আমদানীর মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগের বেশীই দক্ষিণ-পূর্ব্ব ইউরোপও ভিন্ন দেশ হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। তাহার মধ্যে আবার ৪৪ ভাগই সমুদ্রের অপর তীর হইতে আমদানী করা হইয়াছিল। রপ্তানির দিক দিয়াও ইউরোপের দক্ষিণপূর্ব্ব রাষ্ট্রগুলি জার্ম্মানির রপ্তানি বাজার সমস্যা সমাধান করিতে পারে নাই। গত ১৯৩৮ সালে জার্ম্মানি হইতে মাত্র শতকরা ১০.৪ ভাগ মাল উক্ত রাষ্ট্রগুলিতে রপ্তানী করা হইয়াছিল। কাঁচা মালের দিক দিয়াও দক্ষিণ পূর্ব্ব রাষ্ট্রগুলি জার্ম্মানির সমস্ত চাহিদা পূরণ করিতে পারিতেছে না। আর এই কাঁচা মালের চাহিদা জার্ম্মানিতে এত বেশী যে ভবিষ্যতে জার্ম্মানি যদি কোনদিন সোভিয়েট ইউক্রেন অধিকার করিতেও সমর্থ হয়, তথাপি কাঁচামালের হাহাকার জার্ম্মানির থাকিয়া যাইবেই। জার্ম্মানিতে চাষ আবাদের এপর্য্যন্ত কিছুমাত্র উন্নতি হয় নাই। উৎপন্ন শস্য জার্ম্মানির পক্ষে নিতান্তই অপ্রচুর। ইহার উপর এখন জার্ম্মানিকে আবার অধিকৃত রাষ্ট্রগুলির খোরাক যোগাইতে হইতেছে। অবশ্য অষ্ট্রীয়ার লৌহখনি ও সুদেতেন বনাঞ্চল জার্ম্মানির সমৃদ্ধি কিছুটা বাড়াইয়া

দিয়াছে। কিন্তু জার্ম্মানি আপাততঃ এই সমস্ত সম্পদের পূর্ণ সুবিধা ভোগ করিবার ব্যবস্থা করিয়া করিয়া উঠিতে পারিতেছে না। তারপর এই ব্যাপক সামরিক তোড়জোড় করিতেই জার্ম্মানি আজ মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। কৃষক-কর্ম্মিগণকে জমি ছাড়াইয়া—গোলাবারুদের কারখানায় স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। ১৯৩৩ সাল হইতে এ পর্য্যন্ত আট সহস্র কৃষককে জমিছাড়া করা হইয়াছে। অল্প মজুরী ও বেশী খাটুনির জন্য শ্রমিকগণের মধ্যেও বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। রাইনল্যাণ্ডের শ্রমিকগণের মধ্যে আজ অল্পবিস্তর বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে। সঙ্গীনের মুখে তাহারা আজ হয় ত সমস্ত লাঞ্ছনা ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে বাধ্য হইবে; কিন্তু এই ব্যবস্থা ত আর বেশী দিন চলিতে পারে না!

ঘরে-বাহিরে এতগুলি সমস্যা উপেক্ষা করিয়া জার্ম্মানি স্বেচ্ছায় যুদ্ধ বাধাইয়া বসিবে বলিয়া মনে হয় না। প্রশ্ন হইতেছে যে তবে জার্ম্মানিকে বৃটেনের এত ভয় করিবার কারণ কি? আর মিঃ চেম্বারলেনই বা হিটলারের মনস্তুষ্টি করিবার জন্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির উপর শান্তিজল ছিটাইয়া নাৎসী যূপকাষ্ঠে বলি দিতেছেন কেন? মধ্য ইউরোপে হিটলারের আধিপত্য বিস্তারের সহায়তা করিয়া মিঃ চেম্বারলেনেরই বা স্বস্তি কোথায়! বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী নীতির সহিত মিঃ চেম্বারলেনের এই আত্মঘাতী নীতির কি করিয়া সামঞ্জস্য হইতে পারে? অবশ্য মিঃ চেম্বারলেনের সুরে সুর মিলাইয়া বলা যাইতে পারে যে বৃটেন শান্তিবাদী—যুদ্ধ চাহে না; হইতে পারে যে তথাকথিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ, বিশেষভাবে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন অন্তর্বিপ্লব আশঙ্কায় সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধের সম্ভাবনা নিজস্বার্থ ক্ষুন্ন করিয়াও দাবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু আজ ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে জার্ম্মানির সহিত বৃটেনের নীতিগত পার্থক্য থাকিলেও সাম্রাজ্যবাদ ও ফাসিবাদের প্রাণশক্তি এক। এই দুইটি গঠনতন্ত্রের গর্ভস্থিত স্ফটিকস্তম্ভের মণিকোঠায় সযত্নে লালিত একই ভ্রমর-ভ্রমরী পরস্পরের প্রাণ রক্ষা করিতেছে। তাই মিঃ চেম্বারলেন আজ ভেক লইয়া শান্তিবাদী সাজিয়া বসিয়াছেন। মিঃ চেম্বারলেন যতই কূটরাজনীতিজ্ঞ হউন না কেন এবং শান্তিবাদের ধুয়া তুলিয়া বৃটেনের মূল সমস্যাটিকে যতই তিনি ধামাচাপা দিবার চেষ্টা করুন না কেন তাহাতে তিনি নিজেই প্রতারিত হইবেন। সুচতুর হিটলার মিঃ চেম্বারলেনের এই দৌর্ব্বল্যের সুযোগ গ্রহণ করিতে ভুলিয়া যান নাই। আর নিরুপায় মিঃ চেম্বারলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির স্বকীয়তা বিনষ্ট করিয়া হিটলারকে উপঢৌকন দিতেছেন। ডানজিগ্ লইয়া আর একটি মিউনিক অভিনয়ের অবতারণা করা হইবে কি না কে জানে! আর বিপ্লবাতঙ্ক শুধু কি মিঃ চেম্বারলেনেরই একার? যুদ্ধ করিলে বৃটেন অপেক্ষা জার্ম্মানিতেই বিপ্লব অনিবার্য্য হইয়া উঠিবে। মিঃ চেম্বারলেন হিটলারকে কি এতই বোকা ঠাওরাইলেন যে সম্মিলিত গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের বিরোধিতা উপেক্ষা করিয়া হিটলার ইউরোপে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া বসিতেন? আদপে মিঃ চেম্বারলেনের শান্তিবাদের মর্ম্মার্থই অন্যরূপ! শুধু মহাযুদ্ধ এড়াইবার জন্যই গণতন্ত্রী বৃটেন ও ফ্রান্স নিরপেক্ষ নীতির অজুহাতে যে হিটলারের মনস্তুষ্টি করিয়া আসিতেছে তাহাই নহে, মধ্য ও পূর্ব্ব ইউরোপে ফ্যাসিবাদকে যথেচ্ছাচারের স্বাধীনতা

দিয়া বলশেভিকবাদকে ধ্বংস করাই হইতেছে। তথাকথিত গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির নিরপেক্ষ নীতির তাৎপর্য্য। শুধু বিপ্লব এড়াইবার জন্যই নহে, বিপ্লবের উৎস বলশেভিকবাদকে ফ্যাসিবাদের সাহায্যে সমাধিস্থ করিবার জন্যই ফ্রান্স ও বৃটেনের এই হীন চক্রান্ত। সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্ম্মানিকে মধ্য ইউরোপে শক্তিশালী করিয়া তুলিবার জন্যই মিউনিক চুক্তির অবতারণা করা হইয়াছিল এবং আজও সেই কারণে মিঃ চেম্বারলেন সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত এখনও একটা মিটমাট করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। কিন্তু 'দ্রাং নাখ অস্তেন' সমাধা করিয়া জার্ম্মানি সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করিবার পূর্ব্বে যে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অভিযান করিবে না তাহার কি প্রমাণ আছে!

জনমতের চাপে পড়িয়া মিঃ চেম্বারলেন আজ বৃটেনে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। মিঃ চেম্বারলেনের এই উদ্যমে ফ্রান্স বিশেষ আনন্দপ্রকাশ করিতেছে আর রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড ও গ্রীসের জনসাধারণের মধ্যেও সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। এদিকে জার্ম্মানির সংবাদপত্রসমূহ তারস্বরে প্রচার করিতেছে যে বৃটেনের এই অস্বাভাবিক উদ্যমে ভীত হইবার কোন কারণ নাই—ও একটা হুমকি বৈ আর কিছু নহে। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের উত্তরে হিটলারের সহযোগী সিনর মুসোলিনী ঘোষণা করিয়াছেন যে বর্ত্তমান ইউরোপীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে আমেরিকা ওয়াকিবহাল নহে; সুতরাং প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের উক্তির কোন অর্থই হয় না। শান্তি ও মৈত্রী স্থাপনের জন্য ইটালী ও জার্ম্মানি এখনও উৎগ্রীব হইয়া বসিয়া আছে। ইতিমধ্যে জার্ম্মানি রুজভেল্টের উক্তি অমূলক প্রতিপন্ন করিবার জন্য সুইজারল্যাণ্ড লিথুয়ানিয়া, হল্যাণ্ড ও ফিনল্যাণ্ডকে জিজ্ঞাসা করিয়াছে যে সত্যই তাহারা প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের উক্তি সমর্থন করে কি না। 'না' বলা ছাড়া তাহাদের ত আর গত্যন্তর নাই, কিন্তু তাহারা নিজদের নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্য আজ যেরূপ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিয়া তাহাদের এই সভয় উক্তির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিতে কাহারো বিলম্ব হইবে না।

জার্ম্মানি ও ইতালী যুগোশ্লাভিয়াকে বকলান মৈত্রী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। যুগোশ্লাভিয়ার রিজেণ্ট পল একজন বিশেষ সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি নাৎসীও নহেন ফ্যাসিস্ত ও নহেন। কিন্তু তিনি বলশেভিক আতঙ্কে সব সময়ই সন্ত্রস্ত। যুগোশ্লাভিয়ায় বলশেভিকদের কিন্তু নাম গন্ধও নাই। যুগোশ্লাভিয়ার দুর্ভাগ্য যে এই সঙ্কটকালে একটি দুর্ব্বল শাসকশক্তি তাহার শাসন কার্য্য চালাইতেছে। সার্বস ক্রোটস্ শ্লোভেন্সদের মধ্যে চিরন্তন দ্বন্দ্বের এখনও অবসান হইল না—সাময়িকভাবে বর্ত্তমানে একটা রফা করা হইয়াছে মাত্র। রাজনৈতিক মহলে গুজব যে যুগোশ্লাভিয়ার গবর্ণমেণ্ট নাকি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা করিতেছেন। যাহা হউক আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির গুরুত্ব-উপলব্ধি করিয়া যুগোশ্লাভিয়া এখন নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিয়াছে। তবে ফাসিস্ত শক্তিদ্বয় যুগোশ্লাভিয়াকে দলে ভিড়াইবার জন্য চেষ্টার ত্রুটী করিবে না। বিশেষ প্রিন্স রিজেণ্ট পল আবার একনায়কত্ববাদের প্রতি

অনুরক্ত। গণতন্ত্রী বৃটেন ও ফ্রান্স যখন বর্ত্তমানে ফ্যাসিবাদকে প্রতিহত করিবার সঙ্কল্পই গ্রহণ করিয়াছে দেখা যাইতেছে, তখন বলকান রাষ্ট্রসমূহের তথা সমগ্র ইউরোপের নিরাপত্তা রক্ষার দিক দিয়া এ বিষয়ে তাহাদের দায়িত্ব সুদূর এংলো সোভিয়েট প্যাক্টের গুরুত্ব অপেক্ষা কিছুমাত্র ন্যূন নহে।

বলকান মৈত্রী পুনর্গঠন করিয়া তুরস্ক যে নূতন একটি ব্লক তৈয়ার করিবার পরিকল্পনা করিয়াছে বুলগারিয়ায় তাহাতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। বিগত কুড়ি বৎসর যাবৎ বলকান মৈত্রী বুলগারিয়াকে দলে টানিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে; কিন্তু বুলগেরিয়া তাহাদের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বরাবরই তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া আসিয়াছে। তাই তুরস্কের এই উদ্যমে বুলগেরিয়ার এই উল্লাস বিসদৃশ মনে হয়। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় বুলগেরিয়া দায়ে পড়িয়া বলকান মৈত্রীর সহিত সহযোগিতা করিতে পারে। সম্প্রতি যুগোশ্লাভিয়া, বুলগারিয়া ও গ্রীসকে লইয়া রোম-বার্লিন মৈত্রী যে স্বাধীন ম্যাসিডোনিয়ান রাষ্ট্রগঠন করিবার প্রস্তাব করিয়াছে তাহাতে বুলগারিয়া নিজ অংশ বাঁচাইবার জন্যই তুরস্কের এই পরিকল্পনা সমর্থন করিয়াছে। অবশ্য বুলগারিয়া তাহার এই সহযোগিতার বিনিময়ে দানিয়ুব ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যস্থিত দক্ষিণ পূর্ব্ব রুমানিয়ায় দব্রুজার দক্ষিণাঞ্চল প্রত্যর্পণের দাবী করিতে পারে। বুলগারিয়ায় এই দাবী রুমানিয়া যদি পূরণ না করে তাহা হইলে বুলগারিয়ার জাতীয় মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবে এবং বুলগারিয়ার সীমান্ত-সমস্যা কোনদিনই সমাধান হইবে না। এই অঞ্চল প্রত্যর্পণ করিলে রুমানিয়ার বিশেষ ক্ষতি হইবে না। দূরদর্শী রাজা কেরল বলকান মৈত্রী পুনর্গঠনের জন্য বুলগারিয়ার এই সামান্য দাবীটুকু স্বীকার করিয়া লইবেন বলিয়া মনে হয়। সম্প্রতি উক্ত অঞ্চল লইয়া রুমানিয়া ও বুলগারিয়ার মধ্যে গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছে। বুলগারিয়া আবার রোম বার্লিন মৈত্রীর সহিত যোগদান করিবে বলিয়া হুমকি দিয়াছে। তবে রুমানিয়া যদি এখনও বুলগারিয়ার দাবী পূরণ করে তাহা হইলে বুলগারিয়া ফাসিস্ত শক্তিদ্বয়ের শরণাপন্ন নাও হইতে পারে।

সম্প্রতি সুপ্রিম কাউন্সিল অব দি ন্যাশন্যাল ফ্রণ্টে রুমানিয়ার প্রধান মন্ত্রী ক্যালিনেস্কু রুমানিয়ার নিরাপত্তা রক্ষার জন্য জনসাধারণকে সংহত হইতে আবেদন জানাইয়াছেন। সম্মিলিত নিরাপত্তা রক্ষার জন্য রুমানিয়া পোল্যাণ্ড ও বলকান মৈত্রীর সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিবে।

ইতালী কর্ত্তৃক আলবানিয়া অধিকৃত হইবার পর হইতে গ্রীসে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। গ্রীসের প্রধান মন্ত্রী জেনারেল মেটাক্সাস্ ঘোষণা করিয়াছেন যে গ্রীসের নিরাপত্তা রক্ষা করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন। কিন্তু ওয়াকিবহাল মহলে গুজব যে ইতালী আড্রিয়াতিক উপকূলে কর্ফু দ্বীপটি দখল করিবার জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া আছে। ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তারের পক্ষে এই কর্ফু-দ্বীপটির বিশেষ সামরিক গুরুত্ব আছে। গ্রীসের স্বাধীনতা তথা সমগ্র বলকান রাজ্যগুলির নিরাপত্তা রক্ষা করিতে হইলে জিব্রাল্টার, মাল্টা, কর্ফু,

সাইপ্রাস, ও হাইফা প্রভৃতি দ্বীপগুলিকে লইয়া একটি দৃঢ় সামুদ্রিক অবলম্বন গঠন করিতে হইবে।

বলকান রাজ্যগুলির এহেন দুর্দ্দিনে ইঙ্গতুরস্ক-চুক্তির বিশেষ গুরুত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। ইতিমধ্যেই বলকান-রাজ্যগুলিতে নূতন জীবনের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। তুরস্ক এখন অনায়াসে দার্দ্দেনেলস্ অবরোধ করিয়া কৃষ্ণসাগরে ইঙ্গফরাসী নৌবহর চালনা করিতে পারে। রুমানিয়াকে দলে ভিড়াইবার জন্য রোম-বার্লিন মৈত্রী এখন আর তাহার উপর জুলুম করিতে পারিবে না। রুমানিয়ার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ব্রিটেন্ ও ফ্রান্সের প্রতিশ্রুতির মর্য্যাদাও হয়ত এখন অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইঙ্গতুরস্ক চুক্তির দ্বারা জার্ম্মাণী শুধু তুরস্কের সাহায্যলাভেই বঞ্চিত হইল না; অধিকন্তু নিকট ও সুদূর প্রাচ্যে জার্ম্মাণির রাজ্যবিস্তারের পরিকল্পনা ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তুরস্কের অধিনায়কত্বে বলকান রাজ্যগুলি এখন দুর্ব্বার নাৎসী ও ফ্যাসিস্ত শক্তির প্রতিকূলে দাঁড়াইয়া সংগ্রাম করিবে।

ইঙ্গ-তুরস্ক-চুক্তির একটি বিশেষ সর্ত্ত হইতেছে যে বৃটেন সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত অনুরূপ একটি চুক্তি করিবার চেষ্টা করিবে। বৃটেনের সহিত রাশিয়ার এ পর্য্যন্ত অনেক গবেষণাই হইয়া গেল কিন্তু কার্য্যকরী কিছুই এখনও হয় নাই—হইবে বলিয়াও স্থিরতা নাই। বৃটেন সোভিয়েট-রাশিয়ার সহিত এতাবৎকাল যে অর্থহীন আলোচনা করিয়া আসিতেছে তাহা সত্যিই একটা হাস্যাস্পদ ব্যাপার। সোভিয়েট-রাশিয়া ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট প্যাক্টের মত বৃটেনের সহিত অনুরূপ একটি চুক্তি করিতে ইচ্ছা করে। যুদ্ধবিগ্রহের সময় পারস্পরিক সাহায্য বিনিময়েও সোভিয়েট-রাশিয়া সম্মত আছে। আর বৃটেন চাহে রাশিয়া বৃটেনের মত পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়াকে পৃথক্ প্রতিশ্রুতি দিক্। বৃটেনের এই প্রস্তাবের তাৎপর্য্য হইতেছে যে পোল্যাণ্ড অথবা রুমানিয়া যদি নাৎসী জার্ম্মাণিকর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় অথবা তাহাদের ফাসিস্ত শাসকশক্তি যদি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া জার্ম্মাণির নিকট আত্মসমর্পণ করে তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে বৃটেনের বাধ্যবাধকতা কিছুই থাকিবে না। একা সোভিয়েট রাশিয়াকে তখন এই সংহত ফাসিস্ত-শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হইবে তবেই না বহুবর্ষব্যাপি বৃটেনের এই চক্রান্ত সার্থক হইবে।

দাও পূজা অধিকার

অরুণা সিংহ

অন্তরে জাগে যে গভীর ব্যাকুলতা,
অন্তরযামি শুনিছো, কী সেই কথা ?
লুকানো হৃদয় ব্যেপে
যে ভাষা উঠিছে কেঁপে,
ঝটিকাক্ষুব্ধ আহত জীবন-লতা ;
অন্তরতম বুঝেছ কী সেই কথা ?
অনেক চোখের জল,
সুখের মধুর হাসি
তোমারে দিয়াছি কত
অকথিত ভাষারাশি—
তুমিতো লওনি, সে আমার উপহার ;
চরণে লবে কী স্তব্ধ হৃদয়-ভার ?
সকলি ভুলায়ে প্রিয়,
তোমারে চিনায়ে নিয়ো
সব ছাড়াইয়া তোমার দেউল দ্বার
—মুক্ত রাখিয়া ঘুচাও হৃদয়ভার ।

গৃহ আঙিনার তলে,
আনমনে ছিনু যবে—
বাঁশরী বাজিল তব
এবার ফিরিতে হবে ।
তাই কী আঘাত হানিলে সে নীড়ে মম—?
হৃদয় টুটিল ব্যথায় তীক্ষ্ণতম ;
বাঁধন কাটিলে যদি
এইবারে অনুরোধি,
কঠিন হিয়া যে কঠোর পাষাণ মম
তারি পরে রাখো চরণ কমলসম ।

বিপ্লবী নায়িকা মাদাম কামা

দিগিন্দ্র নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বর্গীয়া মাদাম কামার জীবন সম্বন্ধে কিছু বলিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে এই কথাটিই মনে পড়ে যে, বিপ্লবী মন লইয়া যাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন, ঘরের ক্ষুদ্র বন্ধন তাঁহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে না। গতানুগতিকতার মধ্য দিয়া যাহারা জীবনটাকে কোনরকমে কাটাইয়া দিতে পারিলেই রক্ষা পায়, মাদাম কামা ছিলেন তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির লোক। তিনি জীবনের অধিকাংশ কাল নির্ব্বাসনে কাটাইয়াছেন; কিন্তু স্বদেশের কথা তিনি তিলেকের জন্যও বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। ভারতের মুক্তির বাণী তিনি ইউরোপের দেশ হইতে দেশান্তরে প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছেন—পরাধীনতার গ্লানি তাঁহার চিত্তকে অশান্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতের এই বীর রমণীর দুর্জ্জয় সঙ্কল্প, অদম্য উৎসাহ, অসীম সাহসিকতা এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার অপূর্ব্ব স্বদেশ প্রেমের কথা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বোম্বাইর এক সম্ভ্রান্ত পার্শী পরিবারে মাদাম কামার জন্ম হয়। ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়েই তাঁহার শৈশব কাটে এবং যৌবনে আসিয়াও তিনি এক বর্দ্ধিষ্ণু পরিবারের মধ্যেই পড়েন। বোম্বাইর একজন বিশিষ্ট ব্যবহারজীবির সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। এই পরিবারে বিলাস ব্যসনের কিছুমাত্র অভাব ছিল না—ইচ্ছা করিলে আর দশজনের মতই মাদাম কামা সুখে-স্বচ্ছন্দে, আরামে-বিরামে তাঁহার জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার বিপ্লবী মন ইহাতে সাড়া দিল না। স্বদেশ সেবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বামীর আভিজাত্য এ পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল। কামা তাহা নত মস্তকে মানিয়া লইতে পারিলেন না। সংসারের কোন বন্ধনই তাঁহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না। স্বামীর সহিত তিনি বিবাহবন্ধন ছেদ করিয়া নিজের স্বদেশ সেবার পথকে প্রশস্ত করিয়া লইলেন।

মাদাম কামা

বোম্বাইতে একবার প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দেয়। মাদাম কামা তখন নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া রোগীদের শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করেন। সেবার মধ্য দিয়া এই বীর রমণীর অন্তর

হইতে সেদিন যে করুণার উৎস প্রবাহিত হইয়াছিল তাহাতে বোম্বাইবাসীরা একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু বেশীদিন তিনি পারিলেন না, দুরন্ত মহামারী তাঁহাকেও ধরিল। স্বাস্থ্য তাঁহার ভাঙ্গিয়া পড়িল। চিকিৎসকগণের পরামর্শে তিনি ইউরোপ যাইতে বাধ্য হইলেন।

ইউরোপ যাইয়াই মাদাম কামার প্রকৃত বিপ্লবী জীবনের সূচনা হয়। ইউরোপে ভারতের যে সকল বিপ্লবী নেতা ছিলেন, ক্রমশঃ মাদাম কামার সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠতা হইতে থাকে। কামা সমগ্র ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মনও তাঁহার বিপ্লবী হইয়া উঠে। মাদাম কামা ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিপ্লবের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। কিছুকাল ইউরোপে থাকিবার পর তাঁহার ইচ্ছা হইল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যাইয়া তিনি প্রচারকার্য্য চালান। তাঁহার যেমন সঙ্কল্প তেমন কাজ। সাগর পাড়ি দিয়া তিনি মার্কিন মুলুকে যাইয়া পৌছিলেন। আমেরিকার কাগজগুলি তাঁহাকে 'ভারতের জোয়ান অব আর্ক' বলিয়া আখ্যা দিল। কামা নানাস্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ; সংবাদ পত্রে গরম গরম শিরোনামায় সেগুলি প্রকাশিত হইতে লাগিল। কামা কিন্তু আত্মপ্রচারে মোটেই সচেষ্ট ছিলেন না, প্রকৃত বিপ্লবীর মত অন্তরালে থাকিয়াই কাজ করিতে তিনি পছন্দ করিতেন। কিন্তু বক্তৃতা যাঁহারা করেন লোকচক্ষুর গোচরে তাঁহাদের না আসিয়া উপায় নাই। তাই ইচ্ছা না থাকিলেও মাদাম কামার নাম দেখিতে দেখিতে সমগ্র মার্কিণ মুলুকে প্রচারিত হইয়া পড়িল। সুবক্তা তিনি ছিলেন না, কথার যাদুতে তিনি লোক ভুলাইতে পারিতেন না, কিন্তু সরল, সহজ ও স্পষ্টভাবে প্রাণের কথাকে তিনি এমনভাবে ব্যক্ত করিতে পারিতেন যে লোক তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যাইত। তাঁহার বক্তৃতায় ভাষার ভোজবাজী ছিল না, ছিল বিপ্লবের বহ্নিশিখা। সেই বহ্নিশিখায় শ্রোতৃমণ্ডলীর প্রাণে বিপ্লবের দাবানল জ্বলিয়া উঠিত, শত্রুর হৃৎকম্প উপস্থিত হইত। মনে হইত, বুঝি আগ্নেয়গিরির গহ্বর হইতে ধরণীর অন্তরের জ্বালা উত্থিত হইতেছে।

স্বদেশপ্রেমে এই রমণীর অন্তর ছিল ভরপূর। কোন সংস্কারের তিনি ধার ধারিতেন না ; কিন্তু স্বদেশের আচার ব্যবহারকে তিনি প্রাণমন দিয়া ভালবাসিতেন। তিনি যে ভারতবাসী, তাঁহার চাল-চলনে, পোষাক-পরিচ্ছদে এই ভাবটী সর্ব্বদা পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। জীবনের অধিকাংশ কাল ইউরোপে থাকা সত্ত্বেও তিনি ভারতের শাড়ী ছাড়া অন্য কিছু পরিধান করেন নাই। পার্শী সমাজে তাঁহার জন্ম, কাজেই পর্দ্দার আপদ বালাই তাঁহার কোন দিনই ছিল না। স্ত্রী পুরুষে ভেদাভেদ তিনি মানিতেন না। কর্ম্মক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমকক্ষ বলিয়াই তিনি বিশ্বাস করিতেন। ধর্ম্ম বা দর্শনের কচকচি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। বিপ্লবই ছিল তাঁহার একমাত্র চিন্তা। কি প্রাচ্যের, কি প্রতীচ্যের, সকল সমাজের মধ্যেই তিনি মিশিতে পারিতেন। জাতীয়তাবাদী মিশরীয় যুবকগণ তো তাঁহাকে দেখিলেই শ্রদ্ধায় মস্তক নত করিত। তাহাদের উপর এই বিপ্লবী নায়িকার প্রভাব ছিল অসীম।

কামার চলার পথ ছিল সহজ ও সরল। বাঁকা পথে যাহারা চলিত তাহারা ছিল তাঁহার

দুই চক্ষের বিষ। কৃষ্ণ বর্ম্মার মত পণ্ডিত ও খ্যাতনামা বিপ্লবী নেতাকেও তিনি একদিন স্পষ্ট ভাবে শুনাইয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার অত ঘোরপ্যাচ তিনি বোঝেন না—কাজেই তাঁহাদের উভয়ের চলার পথ স্বতন্ত্র। পাণ্ডিত্যাভিমানীকে তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। সোজা পথে যাহারা চলে এবং চরিত্র যাহাদের দৃঢ়, তাহারাই ছিল তাঁহার শ্রদ্ধার পাত্র।

ইউরোপে কেবল যে ভারতীয় বিপ্লবী নায়কদের সঙ্গেই মাদাম কামার পরিচয় হইয়াছিল এমন নয়; রাশিয়া, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশের বহু বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতার সহিতও তিনি ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত হন। রাশিয়ার সন্ত্রাসবাদী নেত্রী ভিরা ফিগ্‌নার, স্পেনের বিপ্লবীনায়ক ফ্রান্সিস্কো ফেরার প্রভৃতির সহিত তাঁহার পরিচয় ঘটে। ফরাসী সমাজতন্ত্রীদের সহিতও তাঁহার ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁহার জীবনের প্রধান কাজই যেন ছিল বিপ্লবী নায়ক নায়িকাদের সান্নিধ্যে আসা। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ভারতের কয়েকজন যুবক রাশিয়ার বিপ্লবী ও সন্ত্রাসবাদীদের নিকট বোমা প্রস্তুত করিতে শিখে।

ইউরোপের বিপ্লবী নায়কগণ মাদাম কামাকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। বিখ্যাত ফরাসী সমাজতন্ত্রীনেতা জীন জারেস এবং জীন লঙ্গেট উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে মাদাম কামার প্রশংসা করিতেন। রাশিয়া হইতে নির্ব্বাসিত বিপ্লবী নায়ক ভ্‌ল্যাডিমির বোর্টজেফ্‌ও কামাকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন।

ব্রুসেলসে জাতীয়তাবাদী মিশরীয়দের যে কংগ্রেস হয় মাদাম কামা তাহাতে আমন্ত্রিত হইয়া জ্বালাময়ী ভাষায় এক বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া যায়। বক্তৃতায় তিনি বলেন, "আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে মিশরের স্থান কোথায় হইবে তাহা লইয়া চুলচেরা বিচার করিয়া কি হইবে? বিদেশী প্রভুত্বের সমুচিত উত্তর দেওয়া যায় একমাত্র বোমা-পিস্তলের সাহায্যে।" মাদাম কামা কেবল বক্তৃতাই দিতেন এমন নয়, জেনেভা হইতে তিনি 'বন্দেমাতরম্' নামে একখানি কাগজও বাহির করেন। বিখ্যাত পণ্ডিত ও বিপ্লবী নেতা লালা হরদয়ালই ছিলেন কার্যতঃ উক্ত কাগজের সম্পাদক। এই পত্রিকার সাহায্যে ভারতের বিপ্লবের বাণী প্রচারিত হইত। বঙ্কিমচন্দ্রের অমরমন্ত্র 'বন্দেমাতরম্' যে মাদাম কামাকে কতখানি উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল তাহা তাঁহার পরিচালিত পত্রিকার নাম হইতেই বুঝা যায়।

১৯০৮ সালের আগষ্ট মাসে জার্ম্মাণীর অন্তর্গত ষ্টাট্‌গার্ট নামক স্থানে আন্তর্জ্জাতিক সমাজ-তন্ত্রী কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় জীন জারেসের অনুরোধে মাদাম কামা তাহাতে ভারতের প্রতি-নিধিরূপে যোগ দেন। উক্ত কংগ্রেসে র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড (ইনি লণ্ডনের শ্রমিক প্রতিনিধিরূপে যোগ দিয়াছিলেন) প্রভৃতির বিরোধিতা সত্ত্বেও মাদাম কামার চেষ্টায় ভারত সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়ঃ—

"ভারতে বৃটিশ শাসন চলিতে দেওয়া যে ভারতবাসীদের স্বার্থের পক্ষে সম্পূর্ণ অনিষ্টকর ও অকল্যাণকর তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। অতএব জগতে যত স্বাধীনতাপূজারী আছেন তাহাদের উচিত, যেদেশে জগতের একপঞ্চমাংশ লোকের বাস, সেই নির্য্যাতিত দেশের মুক্তি আন্দোলনে সাহায্য করা; কারণ সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র মাত্রেরই আদর্শ হইল, কোন লোক যেন কোনরূপ পীড়নকারীর শাসনযন্ত্রের চাপে পড়িয়া না নিষ্পেষিত হয়।"

মাদাম কামা সেই কংগ্রেসে সর্ব্ব প্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। ইউরোপে প্রকাশ্যে ভারতের জাতীয়পতাকা ইতিপূর্ব্বে এভাবে আর কোথাও উত্তোলিত হয় নাই। ইহার আগে প্যারীতে যখনই স্বদেশ প্রেমিক ভারতীয়গণ মিলিত হইতেন তখনই তাঁহারা টেবিলের উপর একখানি জাতীয় পতাকা রাখিয়া দিতেন; কিন্তু প্রকাশ্যে জনসভায় ভারতের জাতীয়পতাকা উত্তোলন ইউরোপখণ্ডে এই প্রথম। মাদাম কামা নিজে এই পতাকার পরিকল্পনা করেন। তিনি এই পতাকা চিহ্নিত একটি পদক সর্ব্বদা অঙ্গে ধারণ করিতেন। ষ্টাটগার্টে পতাকা উত্তোলন করিয়া তিনি যে আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন তাহার প্রতিটী ছত্রে গভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। তীব্র অনুভূতি না থাকিলে এমন প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা কেহ দিতে পারেনা। কিঞ্চিৎ আভাষ দিতে হইলে তাঁহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। তিনি বলেন,—

"বন্ধু, সহকর্ম্মী ও সমাজতন্ত্রিগণ, ইংরেজ ধনপতিগণ এবং বৃটিশ সরকারের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হিন্দুস্থানের লক্ষ লক্ষ মূক জনসাধারণের পক্ষ হইতে আমি আজ আপনাদের সমক্ষে কিছু বলিতে আসিয়াছি। আপনারা কল্পনাও করিতে পারিবেন না যে, সে দেশের লোক কত গরীব। মাথাপ্রতি তাহাদের দৈনিক গড়ে আয় মাত্র তিন ফার্দিং—মাত্র তিন ফার্দিং! বলুন, অন্যকোন দেশের সহিত কি তাহার তুলনা চলে? জগতের আর কোথাও এমন দুরবস্থা নাই। প্রশ্ন করিতে পারেন, এমন দারিদ্র্যের কারণ কি? ইহার উত্তর হইল, ভারত হইতে প্রতিবৎসর যে ৩৫ কোটি পাউণ্ডেরও অধিক অর্থ বাহির হইয়া যায় তাহাই ভারতের এমন দারিদ্র্যের কারণ। টাকা যাইতেছে কোথায়? যায় ইংলণ্ডে। তাহার প্রচুর আছে, আরও তাহার চাই। এদিকে হিন্দুস্থানে আমরা খাইতে না পাইয়া লক্ষ লক্ষ লোক মরিতেছি। হিন্দুস্থান অর্থাৎ জগতের একপঞ্চমাংশ লোকের যেখানে বাস! সমাজতন্ত্রী ভাইসব, আমি মানবতার দোহাই দিয়া আপনাদিগকে বলিতেছি, সেই হিন্দুস্থানের কথা একবার আপনারা ভাবিয়া দেখুন। আপনারা আগাগোড়া উপনিবেশগুলি লইয়াই মাথা ঘামাইতেছেন; কিন্তু পরাধীন দেশগুলি সম্বন্ধে আপনাদের বক্তব্য কি?

"সর্ব্বপ্রথমে আপনাদের নিকট আমার এই প্রশ্ন, সমাজতন্ত্রে কি পরাধীন দেশ বলিয়া কোন শব্দের স্থান আছে? যেখানে সবল দুর্ব্বলকে পিষিয়া মারিতেছে তাহাকে কি শ্রেণীসংগ্রাম বলিবনা? সমাজতন্ত্রী ভ্রাতা ও ভগিনীগণ, ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করুন, সমাজতন্ত্রীদের প্রত্যেক অধিবেশনে ভারতকে প্রধান আলোচ্য বিষয় করুন। ভারত হইতে কেহ আসিয়া ইহা আপনাদিগকে বলিবে, আপনারা কী সেই আশায় আছেন? সেই নির্য্যাতিত নিপীড়িত দেশ হইতে একাজে কাহারও আসা সম্ভব নয়। যে দেশে স্বাধীনতা বলিয়া কোন জিনিষ নাই সেই দেশ হইতে এরূপ কোন প্রতিনিধি আপনারা আশা করিতে পারেন না।

"বন্ধুগণ, আজ আমি আপনাদের সমক্ষে ভারতের এই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতেছি। ভারতের সমগ্র

জাতির হইয়া আজ আমি আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, আপনারা ন্যায়ের দিকে চাহিয়া সংগ্রাম করুন। * * উপসংহারে আমি একথাই বলিব, জীবদ্দশায়ই আমি ভারতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতে পাইব বলিয়া আমার আশা। আপনাদের সাহায্যে আমার সেই আশা ফলবতী হইয়া উঠুক। বন্দেমাতরম্।"

ইউরোপে স্বচ্ছন্দে থাকিবার মত পুঁজি মাদাম কামার ছিল না, কাজেই সেখানে তাঁহাকে অনাড়ম্বরেই জীবনযাপন করিতে হইত। তদুপরি বীর সাভারকরের মামলায় বিস্তর অর্থ সাহায্য করিয়া তিনি একরূপ নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ইউরোপে যখন যুদ্ধ লাগে মাদাম কামাকে তখন ফ্রান্সের অন্তর্গত ভিসি নামক স্থানে অন্তরীণ করা হয়। ফ্রান্সের তিনি কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণও করেন নাই বা জার্ম্মাণীকে তিনি সমর্থনও করেন নাই। তাঁহার নিকট হইতে ফরাসী সরকারের ভয়ের কোনই কারণ ছিল না; তথাপি তাহাকে অন্তরীণ হইতে হয়। তবু ভাল যে ফরাসী সরকার তাঁহাকে তখন বৃটিশ প্রভুদের হাতে তুলিয়া দেন নাই; ইচ্ছা করিলেই তাঁহারা তাহা করিতে পারিতেন। এই সময় মাদাম কামার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ফরাসী সমাজতন্ত্রী নেতা জীন লঙ্গেট কামার মুক্তির জন্য বহুবার ফরাসী সরকারের নিকট আবেদন করেন; কিন্তু তাহাতে কোনই ফল হয় না। খুব সম্ভব বৃটিশ সরকারের ইহাতে হাত ছিল; মিত্রশক্তি বৃটেনকে খুসী রাখিবার জন্য ফ্রান্স তখন মাদাম কামাকে মুক্তি দিতে রাজী হয় নাই।

যুদ্ধ শেষ হইবার পর মাদাম কামাকে প্যারী নগরীতে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি দেওয়া হয়। প্যারীতে পূর্ব্বে তিনি যে বোর্ডিংএ ছিলেন সেখানেই আবার তিনি ফিরিয়া আসেন। প্যারীতে পৌঁছিয়া তিনি সর্ব্বপ্রথমে এই বোর্ডিংএ উঠিয়াছিলেন এবং ত্রিশ বৎসরকাল তিনি এইখানেই কাটাইয়া গিয়াছেন। এই বোর্ডিং কত লোকের হাতবদল হইয়াছে, কিন্তু মাদাম কামা কিছুতেই ইহা ছাড়িয়া অন্যত্র যান নাই।

মাদাম কামা একবার মোটর দুর্ঘটনায় পড়েন এবং তাহাতে তাহার মাথায় বিষম চোট লাগে। তিনি দেহ ও মস্তিষ্কের সুস্থতা হারান। এই দরুণ তিনি দীর্ঘকাল যন্ত্রণা ভোগ করেন; কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাকে কখনও হা-হুতাশ করিতে কেহ শোনে নাই। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্যারী নগরীতেই তাঁহাকে এক দিন শেষ-শয্যা গ্রহণ করিতে হইবে এবং সেই জন্যই তিনি পেরে-লা-চেজ নামক গোরস্থানে খানিকটা জায়গাও কিনিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি সেখানে একটি স্মৃতিফলকে লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন—"অত্যাচারের প্রতিরোধ করাই হইল ভগবানের আদেশ প্রতিপালন করা।"—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের মূল নীতি।

বিদেশে সমাধি রচনা করিলে কি হইবে, যাঁহার প্রতিটী রক্তবিন্দু ছিল স্বদেশপ্রেম বিজড়িত, তাঁহার নশ্বর দেহ স্বদেশেরই ধূলিকণার সহিত মিশিয়া যায় এই ছিল ভগবানের অভিপ্রায়। তাই

মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে মাদাম কামা স্বদেশে ফিরিবার অনুমতি পাইলেন। ১৯৩৬ সালে তিনি স্বদেশে ফিরিলেন। ফিরিয়া বেশী দিন বাঁচিলেন না। অশান্ত সন্তান যেমন দিবাশেষে শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে মায়ের কোলে আসিয়া ঘুমাইয়া পড়ে, মাদাম কামাও তেমনি সারাজীবন সংগ্রাম করিয়া জীবন-সায়াহ্নে আসিয়া ভারতজননীর অঙ্কে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

মাদাম কামা যে পথের পথিক ছিলেন, ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ সেই পথ পরিত্যক্ত। স্বরাজলাভের পথে সে পথকে আজ আর কেহ প্রশস্ত বলিয়া মনে করে না। কিন্তু যে তীব্র দেশাত্মবোধ মাদাম কামার জীবনকে চির অশান্ত করিয়া রাখিয়াছিল—তাঁহাকে সকল প্রকার বিপদের সম্মুখীন করিয়াছিল—সেই দেশাত্মবোধের নিকট ভারতবাসীরা শ্রদ্ধায় চিরকাল মস্তক অবনত করিবে—মাদাম কামার নাম ভারতের জাতীয় ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

কংগ্রেস শুদ্ধি

গুণাগুণ

সুশীলা দাশগুপ্তা

দেলিয়ার মনে হচ্ছে এ যেন বড় ডনিকন ও গির্জা ঘড়ির পাল্লা দিয়ে চলা। একই দমে এদের চলা সুরু. দু'একটি টিক্‌টিকের পরই ডনিকনের একটু দ্রুতগতি তারপর ব্যগ্রতা ও ঔৎসুক্যের আতিশয্যে মন্থরতা প্রাপ্তি এবং গির্জার ঘড়িটি স্থির ও গভীর দোলন-চাপে শেষের দিকে ডনিকনকে পিছু হটিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। ট্রেনটি ধীরে চলার সাথেই তার এরূপ চিন্তা মনে আসল। একের সহিত যেন অন্যের দ্বন্দ্ব। এক দিকে আ-প্রাণ প্রচেষ্টা, অন্য দিকে তারই নিষ্করুণ প্রতিরোধ। তা নয় কি ?

সে খুব মন দিয়ে শুনল। ব্রেক কসা হয়েছে, ঘড়ির ঢঙ্ ঢঙ্ আওয়াজ আর শুনা যাচ্ছে না এ কি সত্য সত্যই ঘড়ির না তার অন্তরের প্রতিধ্বনি ? সেই প্রয়াস, সেই ব্যর্থতা, সেই নিঃশেষতা। এ ভাবতেই সে একটু কেঁপে উঠল, মুখে আর কোন কথা আসল না। ঠিক সে সময় এক জন মোটা-সোটা প্রৌঢ়া তার কামরায় ঢুকছিল। পরণে ভাল ছাঁট দেওয়া গাঢ় নীল রঙের জামা, তুলতুলে ফার দিয়ে গলা জড়ান। পায়ে তক্‌তকে জুতো, হাতে শুভ্র দস্তানা। মুখখানা নিষ্প্রভ, বার্দ্ধক্যের ছাঁপ না পড়লেও গভীর রেখাঙ্কিত। গাড়ীর এক কোনে তিনি যায়গা নিলেন। ঠিক উল্‌টো দিকে শ্রমিকের মত এক জন লোক বসে নিশ্চল, নিষ্পলক দৃষ্টিতে দেলিয়ার দিকে তাকাচ্ছিল, অন্য বেঞ্চে আরেকটি যুবক বসে ছিল। মাথায় পাত্‌লা ফুরফুরে চুল। পোষাক পুরাতন হলেও পারিপাট্য সহকারে ইস্ত্রী করা।

দেখলেই মনে হয় সদ্য কলেজ ছেড়ে শিক্ষকতা করতে কোথাও যাচ্ছে। হাঁসের পালক হস্তে জল ঝরার মত লোকটি দেলিয়ার দৃষ্টি হতে খসে পড়ল। বয়সে সে দেলিয়ার ছোট। তার এ এক অদ্ভুত স্বভাব, ভিন্ন বয়সী পুরুষের উপর সে অত্যন্ত উদাসীন থাকত। সমবয়সীকে সে বহুর মধ্য হতে চিনে নিতে পারত, যেমন নিপুণতার সহিত সে পারত কৌটা হতে সার্ডিন উঠাতে। ডেভিডের সাথে বিবাদ, তার পূর্ব্বে বেণীর সঙ্গে প্রণয় ইত্যাদি ব্যাপারেও সে তার এ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। মিসেস ড্‌গ্লাস তার লিপিকাধার খুলে এক তোড়া নোট বের করে নিলেন। নারী-শ্রমিকদের কোন অধিবেশনে বক্তৃতা করতে তিনি চলেছেন। একদম বেকার মেয়েরা তাদের ছেলেপিলের চরিত্র গঠন কিভাবে করতে পারে তাহা-ই তার বক্তব্য বিষয়। তাঁর প্রতিভা শুধু এই ক্ষেত্রেই নিবদ্ধ ছিল না। আই, এল, বি,-তে যুক্তিবাদ সম্বন্ধে আলোচনা অথবা কান্তিকলায় মতামত জ্ঞাপন, কোন বিষয়েই তিনি অপারগ ছিলেন না। স্থূল অঙ্গুলীর সাহায্যে তিনি নোটগুলি উল্‌টাচ্ছিলেন, সে সঙ্গে বিশেষ শব্দচয়নও হচ্ছিল। সামনের লোকটি নিবদ্ধ নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকে দেখে নিচ্ছিল।

নেহাৎ অতর্কিতভাবে এ ক'টা লাইন তার মনে আসল। 'গোপন মাধুর্যে ভরে ওঠে মন, মেনে নিতে আসে যেন বাধা।' তার বর্ণহীন, বৈচিত্র্যহীন মুখ-মণ্ডল এতে কিছুটা রক্তিমাভ হয়ে উঠল। ভাবল এ লাইন ক'টা লিখে রাখে, কিন্তু গাড়ীতে বসে এ করা বোকামীর চূড়ান্ত। তা হলে সবই প্রকাশ পাবে। বেণীর উপস্থিতিতে তার অভ্যস্ত সংযমের বাঁধন অনেকটা ঢ়িলে গেছে।

অভূতপূর্ব ভাব, চিন্তা ও উপলব্ধি তার মনে জেগে উঠল। মধুর অথচ ঈষৎ লজ্জাকর চিন্তা তাকে অপ্রতিভ করে দিল।

এর মধ্যে কোণে বসা শ্রমিকটি পরিষ্কার গলায় বলে উঠল, আমি অধঃপতন হতে রক্ষা পেয়েছি, কাজেই এ আমি করতে পারব না।

মিসেস্ ডুগুাস তাঁর নোট খাতা রেখে দিলেন। ফ্রান্সিস, দেলিয়া প্রভৃতি অনেকেই তাঁর দিকে তাকাল। নিরুদ্বেগে লোকটি বসে আছে, সামনের দিকে মুখ রেখে। শ্রমিকের কর্মসহিষ্ণু হাত আঁটা পাজামায় ঢুকান ছিল। গলায় লাল রুমাল জড়ান, মাথায় টুপী।

গত সপ্তাহের ননকরফরমিষ্ট মহিলা সম্মেলনে মিসেস ডুগুাস বক্তৃতাবলে শত শত না হলেও অন্ততঃ আট দশটি আত্মার পরিত্রাণ সাধন করেছেন। ইহা বাস্তবিকই একটা বড় রকমের সাফল্য। লোকের মনে কি আছে চট্ করে তিনি বুঝে নিতেন। দেখেই মনে করলেন ও মেয়েটির মত যদি তাঁর জীবনযাত্রা সার্বজনীন প্রেমে সমৃদ্ধ ও মহীয়ান হত, যার প্রভাবে তিনি সাধারণ ত্রুটি বিচ্যুতি অভ্যাস ও অবস্থার বাইরে যেতে পারেন। কুমারীর বেশে যেন মিসেস ডুগুাস বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াতেই চুম্বকের শক্তি বিকীরণের মত যেন সার্বজনীন প্রেম বিতরণ করছেন। সে যে কি অদ্ভুত ব্যাপার। তিনি কেঁদে ফেললেন। স্পষ্টই মনে হল তাঁর জীবনে এমন সংবেদনার মুহূর্ত আর আসে নি। এমন টিকিট বিক্রী (১৭ পাউণ্ড) তার আর কোন বক্তৃতায় হয়েছে? মানবাত্মার এমন উন্নয়ন সাধন তিনি কোথায় করেছেন?

এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর আমন্ত্রণ তিনগুণ বেড়ে গেল। কাজেই শ্রমিকটির মুখে আত্মত্রাণ ও আত্মনিয়ন্ত্রণের কথা শুনে সার্বজনীন প্রেমনিঃসৃত আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে গাড়ীর অভ্যন্তর ব্যাপ্ত করার প্রবর্তনা ও আত্মসংহাত মিসেস ডুগুাসের মনে স্বতঃই জেগে উঠল। এ প্রেমের প্রভাবে লোকটি এককালে রক্ষা পেয়েছে। আজ যদিও মুক্তিমার্গ ছেড়ে বিপথে পা ফেলতে প্রস্তুত তবু সে একবারে বিবেকহীন নয়। তার দৃষ্টি বেশ সতেজ ও সচেষ্ট নৈতিক স্থৈর্যও আছে; অধিকন্তু সে সঙ্কোচপরায়ণ, শক্তিমান ও প্রাণবন্ত। দেলিয়া এর প্রভাব অনুভব করল। তার অন্তঃস্থল শূন্য করে কি যেন একটা গলে পড়ছিল। সে মিসেস ডুগুাসের দিকে তাকাল, কিন্তু ভাল জুতো ও ফার সুসজ্জিতা মিসেস তখন গাড়ীর কোণে শিশুচরিত্র গঠন সম্বন্ধে নোট নিয়ে ব্যস্ত। গাড়ীর অভ্যন্তর পরিব্যাপ্ত করার জন্য কোন প্রেমের বহির্বিকাশ হলনা। শ্রমিকটি আত্মানুশোচনায় কোন বাইরের সাহায্য পেল না। এর কারণ কি সে শুধু একজন শ্রমিক? সে মিসেস ডুগুাসের সার্বজনীন প্রেমের অধিকারী কি ভাবে হবে? এও হতে পারে মিসেস ডুগুাস আগামী অভিভাষণ নিয়ে

অত্যন্ত ব্যস্ত বা সমস্ত নারীশ্রমিকদের নিকট বক্তৃতা করার আত্মপ্রত্যয় সঞ্চয় করছিলেন। কারণ তার শ্রোতাগণের উৎসাহ ও করতালি ছাড়াও তাদের সুখ, দুঃখ প্রীতিভালবাসা ও ভবিষ্যৎ জীবন অনেকখানি ঐ বক্তৃতার উপর নির্ভর করছে। না, এখানে প্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই বলে তিনি নিশ্চেষ্ট। কারণ যা'ই থাক আমাদের বিশেষ কিছু আসে যায় না। উপস্থিত আমাদের বক্তব্য বিষয় হচ্ছে ডুগুাসের আভ্যন্তরীণ অপঘাত। এবং তার নিরুদ্ধ প্রেম যা আপন স্বাভাবিক প্রকাশের জন্য উন্মুখ ছিল।

মিসেস ডুগুাস চমকে উঠে তার নোট লেখা ক্ষান্ত করলেন। তাঁর চোখ এক অননুভূত অশ্রুতে ভরে গেল। ফ্রান্সিস্ বাইরে নিদ্রালস ভেড়া ও ইতস্ততঃ সঞ্চারী গরুবাছুরের দিকে তাকিয়েছিল। তার মনে হল কেউ বা জীবনকে খণ্ডিত ও ব্যক্তিগত ভাবে নিয়ে বাহিরে পূর্ণতা দিচ্ছে। জীবনের দুর্বার স্রোতের মধ্যে যাঁরা দিন দিন উৎকর্ষতার দিকে চলেছে তাদের গভীর উপলব্ধি এই যে জীবন অখণ্ড ও বর্ণবৈভবে বিচিত্র. শুধু গোলকধাঁধায় গড়া নয়। সব অসঙ্গতিই পূর্ণতর জীবনে সমন্বয় লাভ করেছে। পূর্ণতর জীবন, হাঁ তাই ঠিক।

শ্রমিকটি আবার বলে উঠল, আমি এ পারবনা, আমার পরিত্রাণ নিশ্চয়ই এজন্য নয়।

গাড়ীতে তিনটি প্রাণী ছট্‌ফট্ করতে লাগল। দেলিয়া হাঁ করে দেখছে। শ্রমিকের কথায় হিজিবিজি কি যেন আছে। কি হতে সে রক্ষা পেয়েছে, এখনই সে কি চায়? তার আভ্যন্তরীণ অবস্থায় এমন কিছু এসেছে যার ফলে অন্য কিছু আচ্ছন্ন হয়ে আছে?

তার জীবন বর্ণবহুল, অনুভূতিতে বিচিত্র ও কবিতায় মধুর। কিন্তু সবকিছুই দারিদ্র্যের কঠোর ও নির্মম আঘাতে ক্লিষ্ট। ছেলেমেয়ের অশান্তি এবং জীবনব্যাপী মহাদলনের মধ্যে অফুরন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনা দিয়ে স্বামী নামক পুরুষটিকে রক্ষা ও তার সন্তুষ্টিসাধন করা ইত্যাদি সব কিছু মিলে তার জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। গির্জা ঘড়ীর গুরুগম্ভীর শব্দ ও ডনিকনের কোমল অনুচ্চ আওয়াজ তার জীবনের দুর্বহতাকে আরো মূর্ত করে তুলছিল। এদের পালা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। জীবনের অতীত স্মৃতি, তার উদ্দামময় আবেগ, অনুভূতি এবং কাব্যোচ্ছাস যেন বেণীর সান্নিধ্যে সব ফিরে এসেছে। ডেভিডের চেয়ে বেণীকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করার ইচ্ছে তার বরাবরই বেশী ছিল, কিন্তু কেন সে হল না?

প্রত্যাখানের কিছুদিন পরে সে বেণীকে দেখেছিল। একবারে মুস্‌ড়ে পড়া সে চেহারা। সঙ্গে সঙ্গে দেলিয়ার আপন সত্তা, তার প্রকৃত, সত্য ও সজীব জীবন কোথায় যেন অতলে ডুবে গেল!

মিসেস্ ডুগুাস ভাবছেন কেন এরূপ হয়? কিন্তু কোন সদুত্তর তাঁর মনে আসল না। কাজ করে তাঁর হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত ক্ষয় হয়ে গেছে। বাস্তবিক পক্ষে না হলেও তিনি মনে মনে মানবকল্যাণের জন্য শরীর পাত করেছেন, কিন্তু প্রতিদানে কি পেয়েছেন? জীবন তাঁকে কি দিয়েছে? শুধু অভিঘাত, প্রত্যাখ্যান। অন্যকে উন্নত করার প্রত্যেক প্রচেষ্টায় জীবন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছে। ইহা যেন বাইরের কোন হস্তক্ষেপ পছন্দ করে না এবং মিসেস ডুগুাসকে এমন জায়গায় টেনে নিতে

চায় যেখানে আত্মসমর্পণ ভিন্ন তাঁর কোন উপায় থাকে না। তাঁর পারিবারিক জীবনই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মেয়ে গ্লাড়িস নার্সের কাজ নিয়ে বিদেশে আছে, কিন্তু এ কি সত্য? ছেলে ডিক্, সে ত অল্পদিনের মধ্যে সুন্দর ছোট পৈত্রিক দোকান খুইয়ে অতিরিক্ত পানদোষে মারা গিয়েছে। অন্য ছেলে ডেরেক এক বিবাহিতা নারী নিয়ে চম্পট্ দিয়েছে। আর স্বামী, সে ত মরে বহু কলঙ্ক হতে রক্ষা পেয়েছে। সব কিছুই তার বিরুদ্ধে, হাঁ, সব কিছু।- জীবন তাঁর কাছে একটা হযবরল। কাজের মধ্যে ডুবে না থাকলে এতদিন নিশ্চয় তার স্নায়বিক অপঘাত হত। দেশবিদেশে ভ্রমণ, অন্য মেয়েদের সন্তান লালনে শিক্ষাদান, দাম্পত্যজীবন প্রেমে সফল ও মহীয়ান করে তোলার আদর্শ প্রচার এসব তাঁকে রক্ষা করেছে। কাজের ভিতর না থাকলে তাঁর দেহমন দু'ই ভেঙ্গে যেত। জীবনের সব সঞ্চয়, সব সামর্থ্য আজ বিস্রস্ত ও বিক্ষিপ্ত। শ্রমিকটির গর্বোক্তি তাঁর শেষ সম্বল ধূলিনত ও নিঃশেষিত করে দিয়েছে।

মিঃ ফ্রান্সিস এ তিনটি প্রাণী ও তীরবেগে চলন্ত গাড়ী হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতে ছিলেন। বিভিন্ন অংশগুলির উৎকর্ষতা ও সমন্বয় সাধনেই কি জীবন সুষ্ঠু ও সম্পূর্ণ হয়? তিনি জীবনকে বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, এর স্থানে সংগ্রাম চালিয়ে বিচ্ছিন্ন খণ্ডগুলিকে অখণ্ড আকার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন; কিন্তু সে হল কোথায়? কালস্রোতে জীবন চলেছে এক দুর্বার গতিতে। এ গতিধারায় তার জীবনের খণ্ডিত অংশগুলি কি সত্য সত্যই অখণ্ড সম্পূর্ণতা লাভ করেছে? তা'ত নয়। কি যেন তাকে বাধা দিচ্ছে, পথরোধ করে দাঁড়িয়ে। এ ভাবতেই তাঁর অন্তরাত্মা শুদ্ধ কেঁদে বলল, 'কেন আমার এত বাধা?' কিন্তু অন্তরের সেই তুষ্ণীম্ পুরুষ এর কোন জবাব দিল না। বিদ্রূপের হাসি হেসে বিমূঢ়ের মত তাঁকে রেখে গেল নিজের জবাব নিজে জোগাতে।

কোণের শ্রমিকটি আবার বলে উঠল, 'আমি এ পারবনা, এজন্যই শুধু আমার জীবন নয়।

হঠাৎ দেলিয়ার মনে হল ঘুমের মধ্যে সে এসব বলছে, অনেকের ন্যায় সেও বোধ হয় চোখ খুলে ঘুমায়। যদিও মনে হয় তারা সব কিছু দেখছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তারা থাকে অচেতনলোকে।

দেলিয়া আবার বলল 'লোকটি বোধ হয় ঘুমের ঘোরে আছে।'

'হাঁ, তাই ত' বলে মিসেস ডুগ্লাস ফার কোট ঝেড়ে উঠে পড়লেন। তবে ত সে তাঁকে লক্ষ্য করে কিছু বলে নি। সে স্বপ্নে বক্‌ছিল, কিন্তু তা' হলেই বা কি আসে যায়?

মিঃ ফ্রান্সিস ও দেলিয়া পরস্পর হাসলেন। দেলিয়া ভাবল কি সুন্দর লোকটির চোখ। মনে নিশ্চয়ই তার স্ত্রী এবং মার কথা। আবার একটু ক্লান্ত ও নিস্তেজ দেখাচ্ছে। পরিবার পালনের জন্য সুদীর্ঘ জীবন সংগ্রামে তার বিশ্রাম ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ সবই নষ্ট করেছে। জীবনের প্রত্যন্তদেশে এসে সত্য সত্যই এদের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা আজ ভাবছে। লোকটি আবার দেলিয়াকে অন্য চোখে দেখছে।

'আমার অনুমান সত্য হলে মহিলাটি জীবনের একদিকে সুসঙ্গতি দিতেই প্রায় নিজেকে ফতুর করেছেন কিন্তু অন্য দিকের কি সঞ্চয় করেছেন ?'

এ ভেবে সে আবার দেলিয়ার সাদা, ফেকাশে ও সদাগম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝছিল এর সাথে কোন তার কোন মিল নেই। 'মহিলাটি নিশ্চয়ই তার ইচ্ছানুরূপ বিশেষ দিকের সুষ্ঠুতা সাধন করতে জীবনের অন্যদিক বাদ দিয়েছে, কিন্তু আমি..., আমি জীবনের সব দিকেই সমান মূল্য ও দৃষ্টি দিয়ে আস্‌ছি।'

এ সত্য না হলেও সে এরূপ ভাবতে খুব ভালবাসত। 'যদি এগিয়েই না যাওয়া যায় তবে এ চলার সার্থকতা কোথায় ?'

দেলিয়া পাফের কৌটা খুলে নাকের ডগায় পাউডার লাগাল। প্রচণ্ড শব্দে গাড়ী চুলেছে; দেরী পূরণ করতে অপেক্ষাকৃত একটু দ্রুত গতিতে। পাফটি নাকে ছোঁয়াতেই ছুই বিরুদ্ধ ও বিপরীত গুঞ্জন তার কানে আসল। একের আঘাতে অন্য প্রতিহত। কল্পনাময় বেণী, অতীতের রঙীন রূপায়নী বাল্যজীবন ও বর্ত্তমানের চিন্তাক্লিষ্ট দুর্বহ গিন্নিপণা ও তার অবসাদকর অসন্তোষ মনের একই পটভূমিতে ফুটে উঠছিল। সে যেন চলছে বেণীর সাথে এক মধুময়, রূপময় অভিসারে। বেণীর উপর পুনরাসক্তি যদি প্রহত না হয়ে প্রভুত্ব লাভ করত তবে সে কোন লোকে চলে যেত কে জানে ? মুক্তি ও অভিযানের পথে ?

পাফটি রেখে কোঁকড়ান চুলে একটু চিরুণী লাগাল। গাড়ী সশব্দে চলছে। গুঞ্জনের প্রতিকূলে গুঞ্জন, শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি। একদিকে সংবেদন ও কল্পনার ইন্দ্রধনু অন্যদিকে জড়ের একটানা বর্ণহীনতা একদিকে জীবনের গতানুগতিকতা মেনে নেওয়া অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বেণীর সাথে জীবনের সত্যিকার সম্ভাবনাকে প্রবুদ্ধ করা। গির্জাঘড়ীর ঢং ঢং শব্দে ডনিকন আবার নীরব হল। একদিকে মানবজীবনের হিংস্র নিষ্পেষণ অন্যদিকে মানবাত্মার চিরন্তন স্বাধীনতা। সে হঠাৎ চমকে উঠল। একটা পাথর যেন তার কণ্ঠরোধ করে বসে আছে, ঢোকেও না, বেরিয়েও আসে না। সে তখন অনেকটা আপনার ভিতর ফিরে এসেছে। আবার এখন অন্যের পালা। কেউ বা বাঁচবে, কেউবা মরবে, কিন্তু কার ভাগ্যে কি সে জানত না। উভয়ই তার নিকট সমান ভয়ের, দু'এর জন্য তার আতঙ্ক আবার দু'ই তার নিকট ঘৃণিত। একটা অপ্রীতিকর বাসনা নিয়ে একাত্মমনে সে গাড়ীর শব্দ শুনছিল, দু'এর মধ্যে কে জয়ী হয় বুঝতে। শব্দ ধীরে ধীরে থেমে গেল। গাড়ীর গতি মন্থর হল। ষ্টেশন নিকটেই, মিসেস ডুগ্লাস শিশুচরিত্র গঠনের জন্য লেখা নোট রেখে দিলেন। তিনি মুখে কোন প্রসাধন প্রয়োগ করতেন না। কান্তি রক্ষার্থে বৃষ্টির জল দিয়ে মুখ ধুতেন। অভ্যর্থনার জন্য মিসেস সিটন ষ্টেশনে আসবেন বলে তাঁর ধারণা ছিল এবং সে সঙ্গে কমিটির অন্যান্য সাধারণ ও অল্প শিক্ষিতা মহিলা সভ্যগণ আসবে। এরা সকলেই তাকে সভয় ঔৎসুক্যে দেখত, তার সম্বন্ধে জানতে চাইত ও তার নিকট করুণা ভিক্ষা করত।

মিসেস ডুগ্লাস হঠাৎ অগাধ জলে আত্মহারা হলেন। সেই ঘৃণ্য লোকটি চক্ষুশূলের মত

সামনে বসে তার ব্যর্থ জীবনের কাহিনী স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে ঠিক সে মুহূর্তে যখন অন্যকে সাহায্য করতে এসব ভুলে থাকা একান্ত দরকার। এক ভীষণ মুহূর্তের জন্য লোকটির প্রতি ঘৃণায় তার মন ভরে উঠল। কিন্তু তিনি কি ভুলতে পারেন তাঁর হৃদয় শুধু ভালবাসার জন্য। সপ্তাহ শেষের সম্মেলনে তাঁর সাফল্য, সুনাম, ভগ্ন প্রাণে আশা সঞ্চার করা ও মানব সমাজকে একাগ্র লক্ষ্যে পরিচালিত করার মত একান্ত প্রয়োজন সব কিছুরই নির্ভর স্থল হল তাঁর অন্তরের স্বতঃনিসৃত উদার প্রেম ও সে প্রেমের মহান আলোকোৎস যেখানে ভগ্নহৃদয় ও ভগ্নদেহ অবগাহন করে শীতল ও শান্ত হতে পারে এবং অধিবেশনান্তে সুস্থমন ও বুকভরা আশা নিয়ে যথাস্থানে ফিরতে পারে।

মিসেস ডুগ্যাস অন্তরে প্রেম জাগ্রত করার প্রয়াস পেলেন কিন্তু এবার প্রেমের স্বাভাবিক নিঃসৃতি হল না। তিনি আবার সে চেষ্টা করলেন কিন্তু মন সহগমনে অনিচ্ছুক কুকুরের মত কোন কথা শুনল না। চারিদিকের বিরাট অসঙ্গতি, অশান্তি ও আতঙ্কের মধ্যে তিনি আত্মহারা হয়ে আবার প্রেমে প্রবুদ্ধ হতে চেষ্টা করলেন। এই নিদারুণ মুহূর্তে তাঁর মনে হল প্রেমের রাজ্যে তিনি দেউলিয়া, কাজেই চলার পথে নিঃসম্বল। অল্পক্ষণের মধ্যে সে ভাব কেটে গেল। ধীরে ধীরে আবার তিনি প্রেমের আবির্ভাব অনুভব করলেন। প্রথমে ইহা মৃদু রসক্ষরণের মত মনে হল। এ উপলব্ধির সাথেই তিনি একে আঁকড়িয়ে ধরে পালের ন্যায় অন্তরাকাশে খুলে দিলেন, সবার দৃষ্টি যেন আকৃষ্ট হয়। এ পরিমণ্ডলের জ্যোতিচ্ছটা গাড়ীর অভ্যন্তর ব্যাপ্ত ও বিকশিত করে বাইরের প্লাটফরম এবং সাগ্রহে প্রতীক্ষারত মিসেস সিটন ও তার কমিটিকে পর্য্যন্ত উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই শ্রমিকটি জেগে আরক্ত মুখমণ্ডল মুছে চারিদিক তাকাল।

মিসেস্ ডুগ্যাস একটু সম্মুখে ঝুঁকে তার শুভ্র হাত লোকটির হাঁটুতে রেখে বললেন, 'প্রলোভনের বিরুদ্ধে দাঁড়াও, যে সত্যিকার যোদ্ধা তার কখনই শক্তির অভাব হয় না। সব সময় ভাল কাজ করে যাও। আমরা জানি ভাল হওয়ার প্রয়াস তোমাদের কত। ভাল করার ভিতর দিয়েই মন্দ বিনষ্ট হয়। আমাদের কর্মানুরূপ পরিণতি। ভাল করলে নিশ্চয়ই ভাল হবে। কাজের ভিতর আত্মবিকাশ লাভ কর।'

মিঃ ফ্রান্সিস্ তড়িতাহতের মত মিসেস্ ডুগ্যাসের দিকে তাকালেন। মহিলাটি বলছেন কর্মানুরূপ পরিণতি, তাই না?

কথাগুলি যেন গণ্ডীর মধ্যে ইতস্ততঃ সঞ্চারী হাঁসের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তিনি মিসেসের উপদেশগুলি শুনে কলার বাকলের মত ছাড়াতে লাগলেন। হাঁ, আমাদের একজন উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপাচ্ছে। আমার মতে অনুভূত অংশগুলিকে একত্র করে অখণ্ডভাবে চলাই জীবনের পূর্ণতা কাদের? তোমার, না অন্যের? সে কারো নয়। পরার্থপরতা ও মহানুভবতা যদি পূর্ণ-জীবনের কোন ক্ষুদ্রতম অংশও না হয় তবে তোমার পক্ষে পূর্ণজীবন সম্ভব। তা না হলে নয়। মহিলাটি বলছে কর্মানুরূপ সবার পরিণতি। ব্যষ্টি জীবনে পূর্ণতা লাভকে কখনও প্রথম স্থান দেওয়া উচিত নয়। দিতে যদি হয় তবে সমষ্টির......।

তাঁর মাথা ভোঁ ভোঁ করা সত্ত্বেও তিনি ইহা শেষ পর্য্যন্ত বুঝতে চেষ্টা করলেন! এ সঙ্গে জীবনের পূর্ণতা ইত্যাদি তত্ত্বমূলক কথা বাদ দিয়ে লোকহিতার্থে কাজ করার আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রবল হল। কিন্তু কাজের ভিতর দিয়ে জীবনের বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে ঐক্য সূত্রে বাঁধার গোপন ইচ্ছেও এতে কিছু ছিল। প্রশ্ন হচ্ছে, আরম্ভ কি ভাবে করবে। এ গাড়ীতে লোকের উঠানামা, ভীড়ও উৎসুক দৃষ্টির মধ্যে, এখন তিনি কি করতে পারেন? তিনি উঠে মিসেস ডুগ্গাসের বিছানাপত্র গাড়ী হতে নামিয়ে দিলেন। পরিবর্ত্তে মহিলাটি তাকে ধন্যবাদ জানাল কিন্তু সে সঙ্গে চোখে দীপ্তি, দেহে রক্তিমা ও হাসির রেখায় মুক্তা-শুভ্র দাঁতগুলি ফুটে উঠল। তিনি গাড়ী হতে নামার জন্য উঠে দাঁড়ালেন, সুদর্শন যুবকটিও তখন দেলিয়ার পেটিকার কাছে এসে পড়ল। দেলিয়ার অসাবধানতা বা খারাপ তালার জন্য অথবা দুষ্টগ্রহের চক্রান্তেই হউক বাক্সের ডালাটি হঠাৎ খুলে তার সব জিনিষ গাড়ীর ভিতর ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ল।

'বেশ ত মশাই' বলে দেলিয়া একটু উঠে বসল। তার কোলে করসেট ও মেঝে আটা পোষাকটি তখন লুটান ছিল।

আঃ! বলে মিসেস্ ডুগ্গাস্ গাড়ীর প্রত্যেককে সবিনয় সম্বর্দ্ধনে আপ্যায়িত করে মেঝের উপর ছড়ান মোজা, টেলকাম পাউডার ইত্যাদির পাশ দিয়ে লঘু পদক্ষেপে গাড়ীর দরজায় পৌঁছিলেন। অঙ্গরাগের ন্যায় প্রেম তার চারিদিক আলোকিত করল। মিসেস্ সিটন ও কমিটি-সভ্যাদের দিকে তিনি হাত বাড়ালেন এবং ভাবলেন সবার সানুনয় দৃষ্টি তার উপর নিবদ্ধ।—"ভগ্নিগণ, এ সপ্তাহ আমাদের অভূতপূর্ব সাফল্য দিয়েছে।"

ভয়-বিহ্বলচিত্তে মিঃ ফ্রান্সিস তার বদলগাড়ী প্ল্যাটফরমের অন্যদিকে ঢুকতে দেখিল। এ গাড়ীতে তার যেতেই হবে। ওদিন আর অন্য গাড়ী নেই—ভোরেই তাকে স্কুলে যোগ দিতে হবে। দেরী হওয়াটা অত্যন্ত দোষের তাকে এ গাড়ী ধরতেই হবে।

কিন্তু এ ছড়ান জিনিষপত্রের উপর দিয়ে সে কি ভাবে যাবে? মহিলাটি তো কোন সাহায্যই করবে না। কতগুলি জিনিষ রাগ করে অধৈর্য্যভাবে বাক্সের ভিতর ঢোকালো। তার মনে হ'ল মহিলাটি কাঁদছে।

'আপনার কি হোয়েছে?'

অশ্রুসিক্ত মুখ তুলে মহিলাটি বললো—'সে যে কি তা ঠিক বুঝছি না!'

তখনই তার চোখে পড়ল—ডেভিডের হাত ধরে দু' ছেলে তাকে প্ল্যাটফরমে খুঁজছে। তারা ক্রমেই নিকটে আসছে এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে মনে হ'ল—কে কাকে জয় করেছে—জীবনের কোন্ দিক্ জয়ী—কোন্ দিক্ বিনষ্ট হোয়েছে—

"প্রিয়তম" বলে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠ্‌লো। তার ইচ্ছে হ'ল—সে মুহ্যমান অবস্থায় মহিলাটিকে রেখে ওখান হতে লাফিয়ে পালায়--কিন্তু তা পারলো না। সে ঐ ছড়ান জিনিষ-

পত্রের জন্য দায়ী। মহিলাটির চোখে একটি কাতর মিনতি আসে। তার বোধ হয় তাকে কিছু বলার আছে।

'—কাঁদবেন না—আমরা যতটা মনে করি তত মন্দ কিছুই নয়।' ঠিক সে সময় ডেভিড গাড়ীর খোলা দরজায় এসে দাঁড়ালো। ক্রন্দনরতা দেলিয়া—এবং তার জিনিষপত্র একটি অপরিচিত ভদ্রলোককে বাঁধতে দেখে ডেভিড প্রথমে একটু আশ্চর্য্য, পরে বেশ বিরক্তির ভাব দেখাল।

"দেলিয়া নাকি! ছুটিটা বোধ হয়—ভালই কেটেছে। মা কেমন?" একটু রুক্ষ ভাবেই এ কথাগুলি বলে তাকে একটা অনুষ্ণ চুম্বন দিল।

রসির জামা ছেঁড়া ও ময়লা। জিম্পের সারা শরীরে হামের মত কি! এগিয়ে আবার বাইরে ঘুরছে। ছেলেদের এ অবস্থা দেখে দেলিয়া ত্রস্তভাবে তাদের বুকে জড়িয়ে ধরল। তার চোখ তখনও অশ্রুপূর্ণ।

তাকে দেখে ছেলেরা অন্ততঃ খুসী হোয়েছে। আনন্দে তারাও কেঁদে উঠলো। ডেভিড রাগের চোটে কিছুই বুঝলে না। দেলিয়া ভাবলো এ জন্যত বাড়ীতে লঙ্কাকাণ্ড বাঁধবে, তাকে ত আবার তার মন যোগাতে হবে। গাড়ী প্লাটফর্ম ছেড়ে যাচ্ছে। সুদর্শন যুবকটিও চলে গেছে। প্রসাধনের জিনিষ তখনও সব কুড়ানো হয় নি। যাওয়ার সময় যুবকটিকে সামান্য ধন্যবাদ জানাল।

ডেভিডকে বলল—সুটকেসের তালা খোলা ছিল—এ জন্যই এ বিপদ—কিন্তু তার মন তখন চলন্ত গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ শুনছিল। গুরুগম্ভীর রব এক ক্ষীণ ধ্বনিকে নিষ্ঠুর ভাবে রোধ করছে। বহু দিনের পুঞ্জীভূত অভ্যাস, সংস্কার ও বীতরাগ এসে আঘাত দিয়েছে—এক গতিচঞ্চল স্বপ্নময় লোকে সেখানে দু'এক দিনের পরিচয়—তার চেয়ে অল্পস্থায়ী স্মৃতি এবং তারপর চিরকালের বিস্মৃতি।

নেহাৎ গোবেচারির মত সে ডেভিড ও ছেলেপিলেদের নিয়ে ষ্টেশন ছেড়ে চলে গেল।

ষ্টেশনের অন্য দিক্ তখন খালি হয়ে গেছে। যুবকটি গাড়ী পায় নি। ভয়জনিত আশঙ্কায় তার মনে হল মহিলাটির জিনিষপত্র নামাতে গিয়ে নিজের বাক্সই গাড়ীতে ফেলে এসেছে। জনশূন্য ষ্টেশনের এক কোণে—অত্যন্ত বিপন্ন ভাবে গালে হাত দিয়ে সে বসে রইল।

পেনিষ্টান চাপম্যান লিখিত Virtue গল্প হতে।

ভারতীয় প্রবাসী

রেণু সেন

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও বিভিন্ন দেশে প্রবাসী ভারতীয়গণের সংখ্যা ২,৪৩২,১৭৪ কিন্তু কোথাও এদের স্বার্থ ও জাতীয় অধিকার অক্ষুন্ন নেই। সর্বত্রই এরা লাঞ্ছিত, বিতাড়িত। কঠোর দমন মূলক আইনের সাহায্যে ভারতীয় প্রবাসীর পথ রোধ করাই প্রায় প্রত্যেক গবর্ণমেণ্টের বিশেষ লক্ষ্য। দক্ষিণ আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানে আজ বহু বছর ধরে সে প্রচেষ্টা চলছে। কাজেই প্রবাসী ভারতীয়গণের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে যথোচিত আলোচনার একান্ত প্রয়োজন।

ভারতীয়গণের ব্যাপকভাবে বিদেশ যাত্রা সুরু হয় ১৯ শতকের প্রারম্ভে। ১৮৩৪ সালে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর ঐসকল দেশের ক্ষেত্রজ ও খনিজ সম্পদ exploit করার জন্য শ্রমিক দরকার হয়। নিকটে বলে ভারতবর্ষের উপরই সেজন্য দৃষ্টি প্রথমে পড়ে। ১৮৩৪-৩৭ সালের মধ্যে মরিসাসে চিনির কলওয়ালাগণ অন্ততঃ ৭০০০জন কুলি কল্‌কাতা হতে আমদানী করে। এ সকল কুলিদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হত। এ নিয়ে ইংলণ্ডে আন্দোলনের ফলে ১৮৩৭ সালে ভারত গবর্ণমেণ্ট এমিগ্রেসন এক্ট্ প্রণয়ন করে। কুলি চালান আইনের সাহায্যে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হল এবং শুধু মরিসাসে, বৃটিশ গায়না ও অষ্ট্রেলিয়ায় ভারতীয় কুলি প্রেরণ করা যেত।

এ আইনের চক্ষে ধূলি দিয়ে কুলিদের প্রতারণা করা খুব সহজ ছিল এবং প্রকৃত পক্ষে তা হত। এজন্য ১৮৪২ ও ১৮৪৪ সালের আইন আরো কঠোর হওয়ার ফলে মরিসাস, ট্রিনিডাড, জেমেইকা ও বৃটিশ গায়না ভিন্ন অন্য কোন দেশে কুলি প্রেরণ বন্ধ হয়। ১৮৫৮-৬০ সালের মধ্যে সেণ্ট লুসিয়া, সেণ্ট ভিন্সেণ্ট্, নেটাল ও সেণ্ট কিট্‌স প্রভৃতি উপনিবেশগুলিতে আবার কুলি প্রেরণ অনুমোদিত হয়। ১৮৬৪ সালের এক্ট বিশেষ উল্লেখযোগ্য; কারণ পূর্ববর্ত্তী আইন ও তার ধারাগুলি এ এক্টের ফলে বিশেষ ভাবে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়ে ব্যাপকত্ব লাভ করে। ১৮৭০ সালে বৃটিশ গায়নায় ভারতীয়দের উপর লাঞ্ছনা ও উৎপীড়নের ফলে এক কমিশন বসে। সে রিপোর্ট অনুসারে ভারতীয়দের স্বার্থ ও অধিকার কিছুটা সংরক্ষিত হয়। ট্রিনিডাড্ ও অন্যান্য উপনিবেশগুলিতে পরে এ সকল আইন প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৭১-১৯২২ সাল পর্য্যন্ত বহু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে ভারত গভর্ণমেণ্টের তরফ হতে, কিন্তু যখনই শ্বেতাঙ্গ স্বার্থে আঘাত পড়েছে তখনই এ আইনগুলি কার্য্যকরী হয় নাই। ফলে ভারতীয়গণ নানাভাবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হয়েছে। ১৯১৫ সালে মেকনিয়েল ও চিমন লাল ডেপুটেশনের রিপোর্টে বহু আভ্যন্তরীণ গলদ প্রকাশ পায় এবং চুক্তির সাহায্যে কুলি

প্রেরণ প্রথার বিরুদ্ধে রিপোর্টে তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হলে ভারত সচিব তাদের সুপারিশ অনুযায়ী ১৯১৬ সালে সর্তবদ্ধ কুলি চালান বন্ধ করে দেয়।

উপনিবেশগুলিতে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে শেতাঙ্গ আন্দোলনের প্রধান কারণ অর্থনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। ভারতীয় শ্রমের সাহায্য ভিন্ন কোন উপনিবেশ ধনসম্পদে উন্নত হয় নাই, কিন্তু সে ধন-সম্পদে ভারতীয়দের কোন দাবী শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীগণ স্বীকার করতে রাজী নন। প্রতিযোগীতায় ভারতীয়দের পরাজিত করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় নাই। কাজেই আইনের মালিক শ্বেতাঙ্গ প্রভুগণ আইনের সাহায্যে ভারতীয়দের সকল প্রকার অধিকার খর্ব্ব করা শ্রেষ্ঠ পথ মনে করলেন। এজন্য প্রথমেই ভারতীয়দের নাগরিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হল। কারণ নাগরিক অধিকার বিলুপ্ত হলে উপনিবেশগুলিতে ভারতীয়দের রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক বা সামাজিক কোন ব্যাপারে কোন ক্ষমতা থাকবে না। শুধু পরবাসী সাধারণ শ্রমিকের সামান্য দাবী ও অধিকার নিয়ে ওদের বসবাস করতে হবে।

নাগরিক অধিকার বিচ্যুতি, বর্ণ বৈষম্যমূলক দমননীতি ও মানবতা বর্জিত কঠোর আইন কানুনের বিরুদ্ধে ১৯১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়গণ মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করেন। এ আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করলে আফ্রিকান্ গবর্ণমেণ্ট একটু সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আবার মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে এরূপ অশান্তি অন্যান্য দেশেও সংক্রামিত হতে পারে আশঙ্কায় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা একান্ত প্রয়োজন মনে করে। ফলে গান্ধী-স্মাট্‌স্ চুক্তি-পত্রে আপোষ রফা হয়। কোন আপোষ রফাই দীর্ঘস্থায়ী হয় না যেখানে বিরুদ্ধ স্বার্থের সংঘাত বর্ত্তমান। কাজেই এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না।

ভারতীয়দের দাবী ও অধিকার কতখানি তা নিয়ে বহু কনফারেন্স্, ডেপুটেশন প্রভৃতি হয়েছে কিন্তু প্রস্তাবের সংজ্ঞাগুলি এত দ্ব্যর্থবোধক ও পরস্পর বিরোধী যে কিছুতেই এরা কার্য্যকরী হতে পারে না। ১৯২১ সালের ইম্পিরিয়েল কন্‌ফারেন্সে ভারতীয়দের অধিকার সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে এরূপ ধারণা আরো বদ্ধমূল হয়।

'The conference re-ffirms that each Community of the British Commonwealth should enjoy complete control over the composition of its own population by restricting immigration from any part of the other communities, but recognises that there is incongruity between the position of India as an equal member of the Empire and the existence of disability upon British Indians lawfully domiciled in some parts of the Empire and this conference, therefore, is of opinion that in the interests of the solidarity of the Commonwealth it is desirable that the rights of such Indians to citizenship should be recognised.'

ভারতীয় প্রবাসী

দেশের নাম	ভারতীয় লোক সংখ্যা	কোন সালে নেওয়া হয়
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য		
১। সিংহল	৬৫৯,৩১১	১৯৩৬
২। ব্রিটিশ মালয়	৬৫৭,৭২০	'৩৬
৩। হংকং	৪,৭৪৫	'৩১
৪। মরিসাস	২৬৪,২১১	'৩৬
৫। সেচেলিচ	৫০[illegible]	'৩১
৬। জিব্রাল্টর	৮০	'৩২
৭। নিগেরিয়া	৩১	'৩১
৮। কেনিয়া	৩৮,৩২৫	'৩৬
৯। উগাণ্ডা	১৫,০০০	'৩৬
১০। নিয়াছাল্যাণ্ড	[illegible],৫৫৮	'৩৬
১১। জাঞ্জিবার	১৪,২৪২	'৩১
১২। টাঙ্গানিকা	২৩,৪২১	'৩১
১৩। জামাইকা	১৮,৪০৭	'৩৫
১৪। ট্রিনিদাদ	১৫১,০৩৬	'৩৬
১৫। ব্রিটিশ গায়না	১৩৮,৩০৪	'৩৫
১৬। ফিজি দ্বীপ	৮৫,০০২	'৩৬
১৭। উত্তর রোডেসিয়া	১৭৬	'৩১
১৮। দক্ষিণ ,,	২,১৮৪	'৩৬
১৯। কানাডা	১,৫৯৭	'৩১
২০। অষ্ট্রেলিয়া	২,৪০৪	'৩৩
২১। নিউজিলেণ্ড	১,১৬৬	'৩২
দক্ষিণ আফ্রিকা ঃ—		
২২। নেটাল	১৮৩,৬৪৫	'৩৬
২৩। ট্রান্সভাল্	২৫,৫৬১	'৩৬
২৪। কেপ প্রভিন্স	১০,৬৯২	'৩৬
২৫। অরেঞ্জ ফ্রি ষ্টেট্	২৯	'৩৬
২৬। দঃ আফ্রিকান প্রটেক্টরেটস্	৪০৯	'৩৬
২৭। দঃ পশ্চিম আফ্রিকা	১৪	'৩৬
২৮। মালদ্বীপ	৫৪০	'৩৩
২৯। ব্রিটিশ নর্থ বোর্ণিও	১,২৯৮	'৩১
৩০। এডেন	৭,২৮৭	'৩২

দেশের নাম	ভারতীয় লোকসংখ্যা	কোন সালে নেওয়া হয়
৩১। ব্রিটীশ সোমালিলেণ্ড	৫২০	'৩১
৩২। যুক্ত রাজ্য	৭,১২৮	'৩১
৩৩। মালটা	৪১	'৩১
৩৪। গ্রেনাডা	৫,০০০	'৩২
৩৫। সেণ্ট লুশিয়া	২,১৮৯	'৩১
৩৬। ব্রিটিশ হণ্ডুরাস	৪৯৭	'৩১
ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মোট	১,৩১৮,৪৩৮	
বিভিন্ন দেশ ঃ—		
৩৭। ডাচ্ ইষ্ট ইণ্ডিস	২৭,৬০৮	'৩০
৩৮। সায়াম	৫,০০০	৩১
৩৯। ফ্রান্স ইন্দো চায়না	৬,০০০	৩১
৪০। জাপান	৩০০	৩১
৪১। বাহারিন	৫০০	৩৩
৪২। ইরাক	২,৫৯৬	৩১
৪৩। মাসকাট	৫৪১	৩৩
৪৪। পর্তুগীজ ইষ্ট আফ্রিকা	৫,০০০	৩১
৪৫। মাডাগাসকার	৭,৯৪৫	৩১
৪৬। রিইউনিয়ন	১,৫৩৩	৩১
৪৭। আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্র	৫,৮৫০	৩০
৪৮। ডাচ গায়না	৩৭,৯৩৩	৩২
৪৯। ব্রেজিল	২,০০০	৩১
৫০। অন্যান্য পাশ্চাত্য দেশে	১,০০০	
বিভিন্ন দেশের মোট	১০৩,৭০৬	

১৯২৬ সালে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকান গভর্ণমেণ্ট এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। উদ্দেশ্য দঃ আফ্রিকায় ভারতীয় সমস্যার কোন সম্মানজনক মীমাংসা করা, কিন্তু তার প্রধান বিচার্য্য বিষয় হবে পাশ্চত্য জীবন পদ্ধতি, রীতি-নীতি কি ভাবে অক্ষুণ্ণ রেখে তা সম্ভব। ভারতীয়গণ পাশ্চাত্য জীবনযাত্রায় অনভ্যস্ত। তাদের আয়ও খুব বেশী নয়। কাজেই ইউরোপীয়দের হাল ফ্যাসনে উঁচু ধরণের জীবনযাত্রা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ইউরোপীয় সভ্যতা ভারতীয়দের সংস্পর্শে বিপন্ন হতে পারে।

এ ধুঁয়ো তুলে সব ব্যাপারে ভারতীয়দের দূরে রাখাই হল প্রত্যেক আইনের উদ্দেশ্য। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকান গবর্ণমেণ্টের মধ্যে গোল টেবিল বৈঠকের ফলে ১৯২৭ সালে কেপটাউন চুক্তি

চুক্তি হয়। চুক্তির পূর্বে নাকি explore করা হয়েছিল 'all possible methods of setting Indian question in the Union in a manner which would safeguard the maintenance of western standard of life in South Africa ?

কেনিয় উপনিবেশে ভারতীয় স্বার্থহানিকর বহুবিধ আইন প্রণয়ন হয়। এতে ভারতীয়দের মধ্যে খুব বিক্ষোভ সৃষ্টি করে। আফ্রিকার বিভিন্ন উপনিবেশগুলির মধ্যে ঐক্য বন্ধন দৃঢ় করার জন্য ১৯২৭ সালে উইলসন কমিশন বসে। ভারতীয় প্রবাসীদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ভারতবর্ষ হতে গভর্ণমেণ্ট শ্রীনিবাস শাস্ত্রীকে পাঠায়। মাননীয় শাস্ত্রী ১৯২৯ সালে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর কতগুলি বিষয় সুপারিস করেন, কিন্তু কার্য্যত বেশী কিছু হয় নাই, বরং ইউরোপীয়ানগণ নিজেদের ভিতর সংহতি স্থাপনের জন্য 'অরুসা'তে এক কনফারেন্স করে এবং 'জয়েন্ট কমিটি'র বর্ণ-জাতির পক্ষে যাবতীয় সুপারিশ যাতে প্রত্যাহার করা হয় তার চেষ্টা করে।

ফিজি দ্বীপে ১৯১৭ সাল পর্য্যন্ত এমিগ্রেশন বন্ধ ছিল। ১৯১৯ সালে ফিজি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ ডেপুটেশনে ভারত গভর্ণমেণ্ট লোক পাঠাতে রাজী হয় ; কিন্তু সর্ত্ত ছিল 'the position of the emigrants in their new home will in all respects be equal to that of any other class of His Majesty's subjects resident in Fiji.'

১৯২০-২১ সালের মধ্যে ফিজি গবর্ণমেণ্টের শৈথিল্যে, সর্ত্তের মৌলিক অংশই অমান্য হয়। ফলে ফিজিতে ভারতীয় শ্রমিক গণ্ডগোল সুরু হয় ও ভারত গবর্ণমেণ্ট ফিজিতে কুলি প্রেরণ বন্ধ করে দেয়। এই গণ্ডগোলের ফলে বহু লোক একেবারে দুস্থ অবস্থায় ফিজি হতে বিতাড়িত হয়ে ভারতে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এর পর আজ পর্য্যন্ত ফিজিতে ভারতীয়দের ন্যায্য দাবী ও অধিকার গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করেনি।

বৃটিশ গায়নার অধিকাংশ ভারতীয়ই শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত। নানা দুর্দশার মধ্যে এদের জীবন ওখানে কেটেছে। চিনির কলে শ্রমিক গণ্ডগোল সুরু হলেই ১৯৩৫ সালে কমিশন বসে কিন্তু তার ফলাফল আজ পর্য্যন্ত প্রকাশ পায় নাই।

জাঞ্জিবারের লোক সংখ্যা ২৩৫,০০০। এর ভিতর ভারতীয় ১৫,০০০ এবং লবঙ্গের প্রকাণ্ড ব্যবসা এরাই চালাত। ১৯৩৪ সালে বহু আইন প্রণয়ন দ্বারা জাঞ্জিবার গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় স্বার্থ ও অধিকার ধ্বংস করার চেষ্টা করে। এ নিয়ে ভারতে লবঙ্গ বর্জ্জণের ফলে এত ব্যাপক আন্দোলন হয় যে জাঞ্জিবার গবর্ণমেণ্ট আপোষ রফা করিতে বাধ্য হয়।

বর্ত্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের আইন পরিষদে বর্ণবৈষম্যমূলক এশিয়েটিক বিল অস্থায়ীভাবে উপস্থিত করা হয়েছে। এ বর্ণ-বৈষম্য স্থাপনের আন্দোলন ১৯১৮ ও ১৯২০ সালে আরো হয়েছে। ১৯২০ সালের এসিয়েটিক তদন্ত কমিশন পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য দিয়েছে। ১৯২৭ সালে ইউনিয়ন ও ভারত গবর্ণমেণ্টের মধ্যে একটি সম্মানজনক চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও আবার এবিলটি পরিষদে উত্থাপিত করা হয়েছে। নেটালের ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি স্বামী ভবানী

দয়াল দক্ষিণ-আফ্রিকায় প্রবাসী ভারতবাসীদের দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ এ দেশে প্রকাশ করছেন। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ সম্প্রতি যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতেও ভারতীয় প্রবাসীদের অবস্থা কত সঙ্কটাপন্ন বুঝা যায়। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ ও ষ্টাণ্ডিং এমিগ্রেশন কমিটির সদস্য মন্নুসুবেদার স্বতন্ত্রীকরণ বিলের বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন? আফ্রিকান পণ্য বর্জন দ্বারা অর্থ নৈতিক চাপ না পড়িলে ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট কোন কিছুতে কর্ণপাত করবেনা সকলেই জানে।

কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য মোহনলাল শকসেনা এমিগ্রেশন কমিটির বৈঠকে স্পষ্টভাবেই বলেছেন; যে ভারত গবর্ণমেণ্ট যুক্তি, অনুরোধ, উপরোধ দ্বারা বুঝাইবার সমস্ত উপায় নিঃশেষ করেও ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টকে ট্রান্সভাল এসিয়াটিকস্ ল্যাণ্ড এণ্ড ট্রেডিং বিল দ্বারা ভারতীয়দিগকে পৃথক রাখার ব্যবস্থা যে অন্যায়, এ স্বীকার করাতে পারবেনা'।

ভবানী দয়াল

সম্প্রতি স্বামী ভবানী দয়াল ভাইসরয়ের নিকট এক খোলা চিঠিতে লিখেছেন 'History of Indians in South Africa form 1885 is a tale of oppression & repression, breaches & assurances pledges & aggreements........ Assisted Emigration, Repatriation, Colonisation & Segregation are some of the weapons in their armoury with which they strike voiceless Indians in South Africa'

ভারতীয় প্রবাসীদের জন্য কংগ্রেসের কর্ত্তব্য অনেকখানি। শুধু প্রস্তাব পাশ দ্বারা কিছু হবে না, পিছনে সমর্থনযোগ্য কোন শক্তি না থাকলে। আফ্রিকান পণ্য বর্জন দ্বারা অর্থনৈতিক চাপ না দিলে ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট সব চুক্তিই 'scrap of paper' এর মত বিবেচনা করবে নিঃসন্দেহ। এসিয়াটিক বিল পরিষদে পাশ হইবার পূর্ব্বেই এই বৈষম্যমূলক আইনের প্রতিবাদ মিঃ হফমেয়ার মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেছেন। তার এই প্রতিবাদ, বিলটি যে কত মানবতা-বর্জ্জিত, তার প্রমাণ।
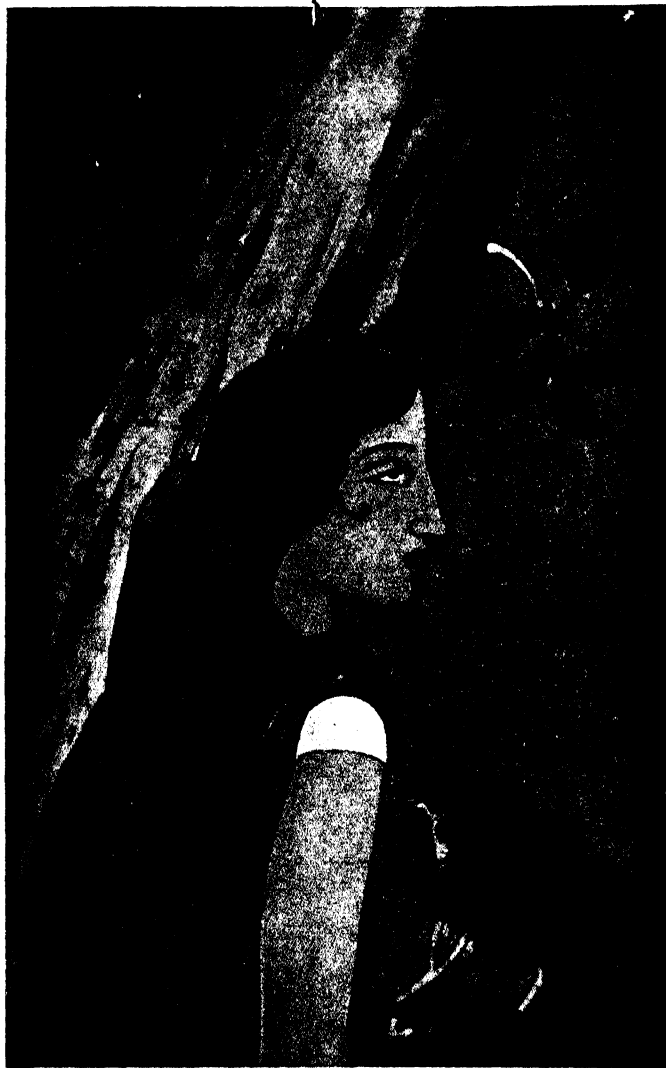
শিল্পী—শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়ের সৌজন্যে

অর্ঘ্য

পৌরাণিক গীতি-নাটিকা

সংলাপ ও কাহিনী—শ্রীনিখিলেশ রুদ্রনারায়ণ সিংহ

সঙ্গীত রচনা—শ্রীমতী মায়া সিংহ ও শ্রীনিখিলেশ রুদ্র নারায়ণ সিংহ

পরিচিতি

মগধের রাজা অজাতশত্রু।
ঐ সভাসদ দেবরাত।
বৌদ্ধ-ভিক্ষু সুদর্শন।
লিচ্ছবী-রাজকুমার উদয়ন।

ও

মগধ-রাজকন্যা দেবমিত্রা।
ঐ সহচরীগণ আরতি
দীপালি
চিত্রালী
পারুল ইত্যাদি।

প্রস্তাবনা

সময়—কাল ভোর। [একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু সঙ্গীত দিয়ে উদ্বোধন করলেন]

গান

তন্দ্রা ভাঙি' জাগো জাগো
আনো আলো—আনো আলো।
ভেঙে ফেলো—লুপ্ত করো
অন্ধ তিমির কালো॥
মাটির বুকে যে সুর লাগে
জাগাও তারে আজি

রুদ্ধ হিয়ায় ছন্দ টুটি
উঠুক তাহা বাজি'।
লুপ্ত করো মরণ-জরা
আনো আলো তিমির-হরা
সবুজ গীতে মাটির বুকে
অমৃত রস ঢালো ॥

প্রথম খণ্ড

[সিংহাসনে অজাতশত্রু। পার্শ্বে সভাসদ দেবরাত দণ্ডায়মান। চারণগণ বন্দনা গাচ্চে]

গান

নিখিল-বন্দিত, প্রকৃতি-রঞ্জন
নৃপতি মহান্ নমো।
অখিল-নন্দিত, অশিব-ভঞ্জন
জয়তি ভূপাল নমো ॥
দিগন্ত মুখরিত তব জয়গীতে
জয় গাঁথা রঞ্জিত জনগণ চিতে
বরাভয় দান করো বলহীন ভীতে
সুযশ-ভাসিত, কীরিতি সুন্দর
নন্দন-ইন্দ্র নমো ॥
নিখিল-বন্দিত, প্রকৃতি-রঞ্জন
নৃপতি মহান্ নমো ॥

[গান শেষ হোয়ে এসেচে—আচম্বিতে নেপথ্যে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু কণ্ঠে]

গান

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,
ধর্মং শরণং গচ্ছামি,
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি ॥

[কিছুক্ষণের জন্যে সভা সচকিত রইলো। অজাতশত্রু ভীষণ ক্রুদ্ধভাবে প্রতিহারীকে]

অজাতশত্রু

আমার পুরীতে পাষণ্ডের প্রশংসা ধ্বনি। এতো স্পর্ধা কার?

প্রতিহারী

মহারাজাধিরাজ! ভগবান বুদ্ধদেবের শিষ্য লিচ্ছবী রাজকুমার উদয়ন ভিক্ষুসহ রাজপুরীতে সমাগত।

অজাতশত্রু

কী! ভিক্ষু উদয়ন? লিচ্ছবী কুমার উদয়ন! উদয়ন! উদয়ন! আমার কন্যাকে—আমার মিত্রাকে প্রত্যাখ্যান কোরে বিবাহ দিনে যে ভিক্ষুসঙ্ঘে আশ্রয় নিয়েচে উদয়ন! সেই উদয়ন আমার প্রাসাদে? উঃ! কী অপমান! শোনো আমার আদেশ, স্বয়ং ভগবান বুদ্ধদেবেরও আমার প্রাসাদে প্রবেশের অধিকার নেই! যাও—

আর, শোনো! ঘোষণা কোরে দাও, মহারাজাধিরাজ অজাতশত্রুর সাম্রাজ্যে—হ্যাঁ, মগধে বৌদ্ধ ভিক্ষুর প্রবেশ নিষেধ! [প্রহরী প্রস্থান।

[রাজপ্রাসাদের বাইরে উদয়ন গাচ্চে]

গান

তাপিত ব্যথিত প্রান্তর পরে
বেদনার শত লীলা।
তাই তো আকাশ আমার মাঝারে
হোয়ে থাকে শুধু লীলা॥
নিশিদিন শুধু কোরে যাই খেলা
নিমেষে নিমেষে কেটে যায় বেলা
আমার প্রাণের গোপন ভবনে
ভুবনের শত খেলা॥
তাইতো আকাশ আমার মাঝারে
হোয়ে থাকে শুধু লীলা॥

দেবরাত

সম্রাট! ভগবান বুদ্ধদেবের প্রতি এ বিতৃষ্ণায় কী সাম্রাজ্যের মঙ্গল হবে?

অজাতশত্রু

মঙ্গল আর অমঙ্গল! আমি ও সব কিছু বুঝিনে দেবরাত, বুঝতেও চাইনে! ঘরে ঘরে উঠেচে হাহাকার; কতো জননীর একমাত্র সন্তান, কতো অন্ধ পিতার একমাত্র নয়নের মণি ভিক্ষু-ধর্ম্মের মোহে সংসারে ত্যজেচে আর্তনাদ! একে যদি তুমি মঙ্গল বোল্‌তে চাও, সংসারে তা হোলে অমঙ্গল কাকে বোল্‌বে?

দেবরাত

মহারাজাধিরাজ! ভগবান বুদ্ধের জয়গানে আজ জগত মুখরিত হয়ে উঠেচে! লক্ষ লক্ষ মূকপ্রাণীর রক্তস্রোত একদিন যজ্ঞভূমিতে প্রবাহিত হত—ভগবান বুদ্ধদেবের প্রভাবে সে স্রোত হয়েচে রুদ্ধ। জগতে বইবে শান্তির স্রোত।

অজাতশত্রু

কাকে তুমি শান্তি বল্‌তে চাও, দেবরাত? তুমি কী দেখতে পাচ্চো না, মানুষের হৃদয়ের রক্তস্রোত হয়ে চলেচে রুদ্ধ! একদিন লক্ষ লক্ষ মূক প্রাণীর রক্ত-স্রোত বয়ে যেতো মানি কিন্তু আজ? আজ মানুষের মুখর অন্তরের রক্তস্রোত রুদ্ধ হয়ে তাকে করে তুলেচে মূক—বুঝেচো দেবরাত!

দেবরাত

সম্রাট! সাম্রাজ্যে ভিক্ষু প্রবেশ নিষেধ করলেও তার কী প্রতিকার হবে?

অজাতশত্রু

রাজা আমি। আমার কর্তব্য প্রজার মঙ্গল চিন্তা করা। ভিক্ষুধর্ম সাম্রাজ্যে নিয়ে এসেচে অমঙ্গল! কতো স্নেহময়ী মাতার—কতো প্রেমময়ী পত্নীর চোখের জলে সাম্রাজ্য আমার ভেসে যাচ্চে, এর আর কী প্রতিকার রয়েচে, বলো? ভিক্ষুধর্মে সংসারের গতি পেয়েচে বাধা—দেশে করেচে অকর্মার সৃষ্টি!

দেবরাত

মহারাজাধিরাজ! নিষ্কাম সেবাব্রত যে ভিক্ষুধর্মের প্রধান অবলম্বন!

অজাতশত্রু

নিষ্কাম সেবাব্রত? নিষ্কাম সেবাব্রত। ঘরে মাতা পিতা যার অনাহারে মরচে, তার আবার সেবাব্রত? কারো কথা আমি শুনতে চাইনে। আমার আদেশ, মগধে বৌদ্ধের স্থান নেই! উঃ! আমার কন্যা দেবমিত্রা! না-না-না! এ অপমান অসহ্য! দেবরাত-দেবরাত। তুমি জানো না, কী সে জ্বালা! সেদিনের স্মৃতি আজও যেন আমার সর্বাঙ্গে বৃশ্চিকদংশন করে! ভুল্‌তে পারিনে, ভুল্‌তে পারিনে আমি! আমি যে কন্যার পিতা দেবরাত!

[ভিক্ষুসহ সুদর্শন। বেরিয়েচে ভিক্ষায়; এক সঙ্গে গাচ্চে]

গান।—

বাতাসের মাঝে যে দোলা লেগেচে
সে দোলা লেগেচে প্রাণে।
নিখিল চিত্ত নিকুঞ্জ ছেয়ে
মরমের শত গানে॥

বাতাসের দোলে যে বাণী পেয়েচি
জীবনের দিনে দিনে।
সে কথা মোদেরে নিয়েছে আজিকে
গোপন ভুবনে জিনে॥

[প্রতিহারী এগিয়ে ভিক্ষুদের গতি রোধ করলে]

প্রতিহারী।—

ভিক্ষুগণ! মহারাজাধিরাজ অজাতশক্রর আদেশে আমি তোমাদের গমনে বাধা দিচ্চি।

সুদর্শন।—

[বিস্মিত হোয়ে] রাজার আদেশে! মহারাজাধিরাজ অজাতশক্রর আদেশে?

প্রতিহারী।—

হ্যাঁ। মহারাজাধিরাজের আদেশে। রাজপুরীতে বৌদ্ধ-ভিক্ষুর প্রবেশ নিষেধ।

সুদর্শন।—

ভগবান বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য মহাভাগ মহারাজধিরাজ বিম্বিসারের সাম্রাজ্যে আমাদের প্রবেশ নিষেধ! বিশ্বাস হয় না!

প্রতিহরী।—

ভিক্ষুবর! ভুল করেচো—বিম্বিসার নন—অজাতশক্র। মহাভাগ অজাতশক্র মগধের সম্রাট। মহারাজাধিরাজের আদেশে দেবী ভবানীর আশ্রিত এ সাম্রাজ্যে ভগবান তথাগতের জয়ধ্বনি নিষেধ। যাও, তোমরা অবিলম্বে মগধের সীমা ছেড়ে চলে যাও।

জনৈক ভিক্ষু।—

কী স্পর্ধা।

সুদর্শন।—

শান্ত হও, ভাই! উষ্মাপ্রকাশ ভিক্ষুধর্ম নয়। শোনো প্রহরী! ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে আমরা এখানে আসি নি। অভুক্ত নরনারীর ক্ষুধার-অন্ন ভিক্ষা করতে এসেচি।

প্রতিহারী।—

এ-রাজ্যে হবে না!

সুদর্শন

রাজার কাছে আমাদের আবেদন জানাতে দাও। শ্রাবস্তীপুরে দুর্ভিক্ষ,—নরনারী অন্নহীন ক্ষুধাশীর্ণা জননীর বুকে আজ শিশুর মুখে দে'বার এক ফোঁটা দুগ্ধ নেই। দেশ জুড়ে জ্বলচে চিতা। আমরা ভিক্ষা চাইছি। পুরবাসীর মুষ্টি ভিক্ষায় আমরা দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা মেটাতে এসেছি।

প্রহরী।—

অসম্ভব! নিস্ফল তোমার আবেদন। রাজরোষ ভিক্ষুককে ক্ষমা করবে না!

সুদর্শন।—

[ওপরের দিকে চেয়ে] প্রভু বুদ্ধ! বুদ্ধং শরণং—

প্রতিহারী।—

[বাধা দিলে] বুদ্ধের জয়ধ্বনি নয়। মৌনভাবে রাজপুরী ত্যাগ করতে হবে।

সুদর্শন।—

বেশ। [ওপরের দিকে চেয়ে] তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

সাধারণ রাস্তায় ভিক্ষুগণ গাইচে :—

গান!—

ওগো সুন্দর! একী অপরূপ
লীলা খেলা তব আজ।
মুক্তো-আধার শূণ্য পরিয়া
আলু থালু সব সাজ॥
পথের ধুলো গায়ে লাগে আসি
ঝড়ে দু'-নয়নে বাদলের রাশি
আঁখি ধারা সারে একী উৎসব
এ কী লীলা খেলা আজ॥
পথের ধুলায় পেতেচো আসন
আলু-থালু করি সাজ॥

দ্বিতীয় খণ্ড

[রাজপ্রাসাদের অপরাংশ ; ভবানী মন্দির।
আরতি, দীপালি, চিত্রালী আর পারুলের গান ;
দেবমিত্রার আরতি নৃত্য।]

গান।—

বিশ্বপ্রেমের নাচন জাগে
কালো মেয়ের চরণ ঘিরে।
রুদ্র তালের ঢেউ লেগেচে
পারাবারের আকুল তীরে॥

আপন ভালো পাগ্‌লী মেয়ে
　　দিশেহারা নির্ণিমেষ ;
বিলিয়ে দেওয়ার আজকে বুঝি
　　নাইকো সুরু, নাইকো শেষ।
(ওমা) নৃত্যে তোমার মুক্তি ঝরে
　　কটাক্ষে মা মরণ মরে ॥
মুক্তি-মায়া-সৃজন-গীতি
　　নিখিল ভুবণ মন্দিরে ॥

দেবমিত্রা—

আরতি, বাসন্তী-পূর্ণিমার মহোৎসবে আজ প্রাসাদ মগ্ন। দেবী ভবানীর আননে যেনো আজ আনন্দের লহরী খেল্‌চে প্রচুর। তোরা মঙ্গল-ডালা নিয়ে আয়, ভাই !

[সকলের প্রস্থান।—

উদয়ন।—

[অন্য দ্বার দিয়ে উদভ্রান্তবেশে উদয়নের প্রবেশ]

গান।—

আলোর মাঝে পথ হারায়ে।
　　গেলেম তোমায় ভুলে।
চোখ গেলোমা চেয়ে চেয়ে
　　শূন্যে নয়ন তুলে ॥
ঘুরে বেড়াই অকারণে
হারায়ে গেলো কোন্ সে ক্ষণে
অন্ধকারের ইসারা হায়
　　তোমার পায়ের মূলে ॥
তাই বুঝি মা এলে তুমি
　　মধুর ভোরের রাতে
পরিয়ে দিতে কালো কাজল
　　আমার আঁখির পাতে।
তোমার আশিস লাগ্‌লো প্রাণে
লাগ্‌লো আমার স্বপন-গানে
ঘুচ্‌লো আমার শংকা তরাস্
　　আগল গেলো খুলে ॥

উদয়ন।

এই তো ভবানী মন্দির। ভবানী বিশ্বের জননী। কৈ, তাঁর মুখে তো রক্তলোলুপতার লেশ মাত্র রেখা ফুটে ওঠে নি! তবে? তবে কেন এই বিরাট আড়ম্বর? [এগিয়ে এসে] তুমি? ও, তুমিই পূজারিণী! বেশ, বলতো, ঐ মৃন্ময়ী প্রতিমার মুখে কী বাণী ফুটে উঠবে? চেয়ে দেখনা, চেয়ে দেখো,—আমার দিকে নয়; ঐ আননে কী করুণার স্রোত বয়ে চলেছে, নয়?

দেবমিত্রা।

তরুণ সন্ন্যাসী। এ যে মহাশক্তি ভবানীর মন্দির। আপনি কে?

উদয়ন।

জানি। তাইতো এসেছি। যাঁর পরিতৃপ্তির জন্যে লক্ষবলির ভীষণ রক্ত স্রোত বয়ে যায়, অসহায় মেষ শিশুর রক্তে যাঁর বিকট উল্লাস, তাঁকে, সেই ভবানীকে আমি দেখ্‌তে এসেচি!

দেবমিত্রা।

মহাশক্তির তৃপ্তির জন্যেই তো বলির বিধান! এ যে মঙ্গলের চিহ্ন, সন্ন্যাসী। তা হোলে তুমি কী বৌদ্ধ ভিক্ষু?

উদয়ন।

হাঁ, আমি ভিক্ষু। আমি মানুষ—আমি মানুষ, পূজারিণী, পূজারিণী! মাটির দেবতার পূজোয় তুমি নৈবদ্যের স্তূপ সাজিয়ে দাও, আর বিশ্বজননীর কোটি কোটি অভুক্ত সন্তান তোমারই দুয়ারে কেঁদে মরচে। আজ বসন্ত পূর্ণিমাতে ভবানীর মন্দিরে তোমাদের চলেচে মহোৎসব! আর দেশে দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার জ্বালায় ছট্ ফট্ করচে কোটি কোটি নর-নারী। ভাব্‌তে পারো? উপলব্ধি কোরবার মতো ক্ষমতা আছে কী?

দেবমিত্রা।

দেশের মঙ্গলের জন্যেই ভবানীর পূজো। আপনি কী ভবানীকে মিথ্যা বোল্‌তে চান?

উদয়ন।

বিশ্বজননী ভবানীর চাইতে রক্ত-মাংসের মানুষই আমার কাছে ঢের বেশী সত্য হোয়ে ওঠে।

দেবমিত্রা।

[ঈষৎ তীব্রকণ্ঠে] কে আপনি? রাজপুরীতে বৌদ্ধভিক্ষুর প্রবেশ নিষেধ, একী তুমি জানো না, বাতুল?

উদয়ন।

[পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে] আমি? আমি—আমি ভগবান তথাগত বুদ্ধদেবের দীন শিষ্য ভিক্ষু উদয়ন!

দেবমিত্রা

[অত্যন্ত বিস্মিত আর রূঢ় ধাক্কা খেয়ে] উদয়ন! ভিক্ষু উদয়ন! লিচ্ছবী রাজকুমার? তুমি—তুমি, রাজকুমার উদয়ন? উঃ!

[হঠাৎ যেন চকিত আর ব্যথিত অস্ফুট চীৎকার করে বেগে প্রস্থান]

উদয়ন

একি! এ আমি কোথা? আমি রাজপুরীর মধ্যে? আমি ভবানীমন্দিরে? পূজারিণী কুমারী কী তবে রাজকন্যা দেবমিত্রা? আর আমি? আমি লিচ্ছবী রাজকুমার উদয়ন? না—না—না! এ দুর্বলতা, ভয়ংকর দুর্বলতা! আমি ভিক্ষু, ভগবান বুদ্ধের দীন ভিক্ষু উদয়ন! ভগবান বুদ্ধের—

আরাধনা মোর বেদনার খেলা
চঞ্চল দোল মাঝে।
যা চাহিবার চাহিতে পারি না
তাই তো মরেছি লাজে॥

[প্রস্থান]

—উদ্যানের অপরাংশ—

[দেবমিত্রা বসে' গাইচে। অদূরে অম্বরের কোলে প্রভাত সূর্য।]

গান

মিছেই আমার গাইতে যাওয়া
পরাণ আমার হারিয়ে গেছে।
সুরের মধু পান কোরে আজ
হিয়ায় আমার ঘুম লেগেছে॥
আকাশের ঐ সুরের মায়া
মরমে মোর ধরলো কায়া
তারই নেশায় কণ্ঠ আমার
সকল গীতি আজ ভুলেচে॥

হিয়া মোর পাগল পারা
নিবিড় সুখে চেতন হারা
সুরের নেশাই আজ্‌কে আমার
কণ্ঠ থেকে সুর হরেচে ॥

[আরতির প্রবেশ]

আরতি

মিত্রা, তোকে আমরা খুঁজে মর্‌চি, আর তুই রয়েচিস্ এখানে? আজ যে বসন্ত উৎসব! তোর মনে নেই বুঝি?

দেবমিত্রা

আরতি, ভাই! উৎসব আমার জন্যে নয়।

আরতি

এ কী ভাই! তোর চোখে জল?

দেবমিত্রা

বোল্‌তে পারিস্ বোন, জগতে সুখ-দুঃখের এতো দ্বন্দ্ব কেন? একের স্বার্থের জন্যে অন্যের সর্বনাশ কেন?

আরতি

মিত্রা! তুই মহারাজাধিরাজ অজাতশত্রুর প্রিয়তমা কন্যা! তোর এ উদাস ভাব কেন, ভাই?

দেবমিত্রা

আরতি! আজ আমার চোখ ফুটেছে। আজ আমি পথের সন্ধান পেয়েছি। তুই ভুল বুঝিস্ নি! তাই উৎসবের মত্ততায় মন আমার মেতে উঠ্‌তে চাচ্চে না।

আরতি

তোর কী হোয়েছে বল্, বোন! আনন্দের রাণী তুই, তোর কণ্ঠে বিষাদের সুর আমায় বিস্মিত কোরে তুলেচে।

দেবমিত্রা

বিস্মিত হোস্‌নে, আরতি! ভবানীর মৌন আনন্দের বাণী আমি শুনতে পেয়েচি। মার নির্বাক ভাষায় রয়েচে অসহায়ের করুণ আর্তনাদ। রক্তস্রোতের বিভীষিকায় মার মৃণ্ময়ী নিরেট পাষাণ বুকও আতংকে শিউরে ওঠে!

আরতি

মিত্রা! তোর বাবার সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের স্থান নেই। তুই কী সে জানিস্ নে?

দেবমিত্রা

জানি, বোন। আর এও জানি,—আমারই জন্যে মগধ থেকে বৌদ্ধধর্ম আজ নির্বাসিত। আমারই জন্যে অন্যায় অত্যাচারে ভিক্ষুরা আজ অকারণে নির্যাতিত।

আরতি

ন্যায়-অন্যায়ের তুলাদণ্ডে লোকমানের বিচার চলে না, ভাই। আঘাতের প্রতিঘাত ন্যায়-অন্যায় বিচার করে না।

দেবমিত্রা

জানি। বাবা তাঁর মর্মের আঘাতের প্রতিঘাত করচেন। আমারই জন্যে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠে বাবাকে আমার যে দগ্ধ কোরচে, বোন—তাঁর মেয়ে হোয়ে এ আমি কী কোরে সইবো?

আরতি

জানি নে, বোন, এর পরিণাম কী! ওদিকে শ্রাবস্তীপুরে দুর্ভিক্ষের আর্তনাদ উঠেচে! কুমার উদয়ন এদিকে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে রাজপুরীতে! কিন্তু রাজার রোষবহ্নি! আতংকে প্রাণ শিউরে ওঠে বারবার!

দেবমিত্রা

আতংক কিসের, আরতি? আমরা উৎসবে মেতে থাকবো। ভুলে যাবো সে সকল কথা! আমাদের পুরীর কক্ষে কক্ষে মণি-মাণিক্যের দীপ্তি সূর্যের আলোকে করে দেবে ম্লান। সে দীপ্তিতে আমাদের হৃদয় হোয়ে উঠবে দীপ্তিময়, চোখ্ যাবে ঝলসে। জগত যাবে আমাদের চোখে মরীচিকার মায়ার মতো ডুবে। অশোকবন, আমাদের নূপুর নিক্কণে আর কোকিল পাপিয়ার গানে যাবে ভেসে! আরতি, আজ আমাদের বসন্ত উৎসব! চল আরতি! ঐ যে বসন্তের বাঁশী বেজে উঠ্‌চে। চল্-চল্-চল্—

[উন্মত্তার মতো বেগে প্রস্থান।

—উৎসবের অপরাংশ—

[পারুল, দীপালি, চিত্রালী—সকলে নৃত্যরতা]

গান

ধরার বুকে সুবাস দিয়ে
ফুট্‌ছে কতো ফুল!
সেই ফুলেরই গন্ধ মেখে
ভাঙ্‌ছে হিয়ার ভুল॥

হাস্‌নাহানা—বেলির কুঁড়ি
কোর্‌ছে কাহার হৃদয় চুরি
ফুল কুড়ায়ে নিত্য মোরা
গড়্‌বো কানের দুল ॥

দীপালি

পারুল ! মিত্রা আর আরতি এখনো আস্‌চে না কেন রে ?

[আরতির প্রবেশ]

দীপালি ! উৎসব বন্ধ করো !

দীপালি

কেন ? কেন ?

চিত্রাঙ্গী

কেন ? কেন ?

পারুল

কেন ? কেন ?

আরতি

কাকে নিয়ে উৎসব হবে ? উৎসবের যে প্রাণ. সে আজ উন্মাদিনী ! আমাদের মিত্রা—রাজকুমারী দেবমিত্রা আজ উন্মাদিনী প্রায়। চল্ চল্ চল্, আমি তাকে ভবানীমন্দিরে রেখে এসেছি।

[সকলের প্রস্থান : অন্য দ্বার দিয়ে উদয়নের প্রবেশ]

উদয়ন

গান

কোন্ লগনে তুমি ঠাকুর
আঁধার মনে জ্বালবে আলো।
একা আমার আঁধিয়ারে
লাগ্‌ছে না যে কিছুই ভালো ॥

অন্তরে মোর ঘোর তমসা
যায় না সেথা দীপের শিখা
নয়ন মেলি দেখলে সেথা
যায়না যে গো কিছুই দেখা।

দূর করো গো তুমিই প্রিয়,
মনের আমার এ ঘোর কালো ॥

এই তো কুঞ্জ! রাজার সুরম্য-কানন, রাজকুমারীর উৎসব-নিকেতন! আর আমি? না-না-না! এ দুর্বলতা কেন? আমি ভিক্ষু! কোনো বাঁধন তো আমার নেই! ভবিষ্যতের কবে গড়া এক স্বপ্ন কোন্ অতীতে মিশে গেচে। লৌকিক বাঁধন তো তাতে পড়ে নি! রাজার আদেশ, অবিলম্বে রাজপুরী পরিত্যাগ করতে হবে। তবু—তবু কেন আমি ফিরে আসি?

[দ্রুতপদে দেবমিত্রার প্রবেশ]

দেবমিত্রা

কই, ওরা সব গেলো কোথা? উৎসবের বাঁশি বাজচে না কেন?

উদয়ন

রাজকুমারি!

দেবমিত্রা

অ্যা! রাজকুমার! উদয়ন! তুমি এখানে? রাজকুমার—না-না, ভিক্ষুবর?

উদয়ন

মিত্রা! আশ্চর্য হোয়ো না, আমি এখানে। আজ সংশয় দোলায় মন আমার দুল্‌চে। ভিক্ষুধর্ম আমার আজ মায়ায় আচ্ছন্ন।

দেবমিত্রা

ভিক্ষু! বিশ্বের সেবা না তোমার ধর্ম? নিষ্কাম সেবায় সংসার তোমরা না ত্যাগ কোরেচো। রাজপুরীতে—রম্যকুঞ্জে সে বিশ্বাস কে তোমার ভেঙে দিলে! তুমি কী জানো না আমরা সংসারী?

উদয়ন

রূঢ় হোয়ো না, মিত্রা! মাটির মানুষ আমি, মাটির মানুষদের ভুলে কী আমি কখনো থাক্‌তে পারি? সংসার আমায় টানচে। আমি—আমি সংসারে ফিরে যেতে চাই, রাজকুমারি!

দেবমিত্রা

[রূঢ় হাস্য কোরে] ভিক্ষু! রাজাদেশ কী তুমি শোনো নি? তোমার সহচর বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এ রাজ্য থেকে বিতাড়িত; আর তুমি—তুমি এখনো এখানে দণ্ডায়মান?

উদয়ন

সত্য—সবই সত্য। তবু মনে হয়—এপথ আমার নয়। রাজকুমারি! যে সংসার আর যে দেবমিত্রা আমি বিতৃষ্ণায় ছেড়েচি,--সে সংসার আর সে দেবমিত্রা আজ আমার চোখে স্বর্গের মোহ নিয়ে এসেচে!

দেবমিত্রা

[শান্তভাবে] কুমার ! তুমি ভিক্ষু—তোমায় এ মোহ থেকে তোমার ভিক্ষুধর্ম রক্ষা কোরবে !

উদয়ন

মিত্রা ! তুমি আমার পথে এসে দাঁড়াও। সংসারে—বন্ধনের মাঝে আমরা মুক্তির স্বর্গ গড়ে' তুল্‌বো।

দেবমিত্রা

সে আর হয়না, কুমার ! তোমার মধ্যে অন্য এক পথের সন্ধান আমি পেয়েচি। তুমি আমার ভুল ভেঙে দিয়ো না ! জীবন আমার ব্যর্থ নয়। তোমার ইঙ্গিতে তোমার পথ চলার ইসারায় আমার জীবনে সার্থকতা এসেচে—ব্যর্থতা আসেনি !

উদয়ন

না-না-না, মিত্রা ! আমায় তুমি প্রায়শ্চিত্ত কোরতে দাও !

দেবমিত্রা

প্রায়শ্চিত্ত কিসের কুমার ? মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা ভিক্ষুধর্ম নয়। ভবানীর মৃণ্ময়ী প্রতিমার মুখে তুমি কী বাণী খুঁজে পেয়েছিলে ? যূপকাষ্ঠে অসহায় ছাগ শিশুর মরণ নিনাদে তুমি বিশ্বজননীর আর্তনাদ শুনতে পাও—আর মানুষের বুকের রুদ্ধভার বুঝ্‌তে পারো না ? বন্ধনের মাঝে মুক্তির স্বর্গ গড়ে তুল্‌তে চাও ? কুমার, তোমার ভিক্ষু-ধর্ম যে বন্ধন মুক্ত—

[বেগে প্রস্থান।

উদয়ন

মিত্রা—মিত্রা ! যেয়ো না, শুনে যাও—শুনে যাও— [প্রস্থান।

—উৎসবের পূর্বাংশ—

আরতি

দীপালি ! মহারাজ আজ মস্ত ভুল কোরে বোসেচেন।

দীপালি

কিসের ভুল, আরতি ?

আরতি

শুধু ভুল নয়, ভাই ! এ ভুলে যে সর্বনাশের ঢেউ উঠেচে—তার পরিণাম যে কী হবে, ভেবে পাইনে। আবাল্য আমি মিত্রার সঙ্গে ছায়ার মতো আছি। আমি তার হৃদয়, মন ভালো কোরেই জানি ; কিন্তু মহারাজ পিতা হোয়েও তাকে বুঝে উঠ্‌তে পারেন নি !

দীপালি

আমি কিছুই বুঝে উঠ্‌তে পারচি নে ভাই ! ভিক্ষুদের প্রতি মহারাজের এ আক্রোশের কারণ কী ? মিত্রার এ উদাস ভাবই বা কেন ?

আরতি

তার কারণ আমি জানি। তাই তো বল্‌চি—বৈশালির কুমারের সঙ্গে মিত্রার বিবাহ স্থির কোরে মহারাজ ভুল কোরেচেন !

দীপালি

সত্যি ভাই ! যেদিন ভিক্ষুসঙ্ঘ এ পুরীতে প্রবেশ কোরেচে, সেদিন থেকে মিত্রার এ ভাবান্তর !

আরতি

ভিক্ষুকুমার উদয়ন তার কারণ, দীপালি ! উদয়নের ওপর প্রতিশোধ তুল্‌তে গিয়ে মহারাজের ভিক্ষুদের ওপর এ আক্রোশ !

পারুল

বুঝেচি, ভাই ! কিন্তু মিত্রার এ ভাবান্তর কেন ? ফুটন্ত গোলাপ কেন শুকিয়ে গেচে ! যার চোখে মুখে—গোটা আননে হাসির লহর অবিরাম খেলা কোরে বেড়াত, তার মুখে আজ রাজ্যের কালিমা এসে বাসা বেঁধেচে কেন ?

আরতি

পারুল ! এরও কারণ কুমার উদয়ন। দেবমিত্রা উদয়নকে ভোলে নি। যদিও লৌকিক বাঁধন জীবনে ছুটো ফুলকে এক সূতোয় বাঁধে নি, তবুও চলার পথে যে মাঙ্গলিক ধ্বনিত হোয়েছিলো তার রেশ আজও লেগে রয়েচে। থেমে যায় নি —হয় তো যাবেও না !

দীপালি

এর কী কোনো প্রতিকার নেই ? যা হবার নয়, যা হোয়ে গেচে তার জন্যে মিছিমিছি এ লাঞ্ছনা কেন ?

আরতি

প্রতিকার নেই। তাই তো গভীর আশংকায় আমার মন উদ্বেল হোয়ে উঠ্‌চে। মহারাজ কন্যার অন্তরের আঘাতে দূর কোরতে যেয়ে কোন সর্বনাশ কোরে বসেন, এই আমার আশংকা, দীপালি !

দেবমিত্রা

(নেপথ্যে গান।)

ফাগুন সেদিন মাতাল হোয়ে
বনে বনে দেছে সাড়া।
কুসুমে-কাননে মাঠে ও আকাশে
ছুটেছিলো মদিরা ধারা॥

আরতি

ঐ মিত্রা গাইচে। চল্ দেখে আসি। [সকলের প্রস্থান।

—সঙ্গীতাংশ—

বনে গায় পিক্ হাসে চারিদিক্
তারি পানে চেয়ে ছিনু অনিমিখ
তোমার লিপির বারতা আমারে
কোরেছিলো দিশে হারা ॥
প্রথম যেদিন কুসুমে-কাননে
কোয়েলা দেছে গো সাড়া ॥

[গান শেষ হওয়া মাত্র ব্যগ্রভাবে অজাতশত্রু,
পেছনে দেবরাত ও একজন প্রতিহারীর প্রবেশ।]

অজাতশত্রু

প্রতিহারী! আমার আদেশ, উদয়নকে যেখানে যে অবস্থায় পাবে—তাকে কোরবে বন্দি! তার শাস্তি—অনাহারে আ-মৃত্যু কারাবাস! হাঁ, আমৃত্যু কারাবাস! যাও—আর শোনো—একবিন্দু জল পর্যন্ত যেনো তাকে খেতে দেওয়া না হয়। যাও!—

দেবরাত! আমার কন্যা আমার মিত্রা আজ উদাসিনী। তুমি বুঝতে পারবে না, কী আগুণ আমার বুকে আজ জ্বলে উঠেচে। আজ আমি কঠোর—সত্যই আমি কঠোর!

(পটক্ষেপ।)

তৃতীয় খণ্ড

পারুল-দীপালি গান কোরচে।

স্থান—উৎসব প্রাঙ্গন।

গান

মনের কোণের গোপন গাথা
এই যে মেঘের সারি।
কোন্ সে পবন দিয়ে দোলা
ঝরায় শাওন বারি ॥

হাসি কী তার শিউলি মাখা ?
হবে বুঝি ছায়ায় ঢাকা !
মালা খানা পরিয়ে দেবো
　　চরণ চুমে' তারি ॥

[প্রস্থান ।

আরতির প্রবেশ

মিত্রা গেলো কোথা ? বসন্ত-বিদায়ে কুঞ্জবীথি শুক্‌নো। প্রাসাদেরও আজ এই দশা ! রাজার ছুলালি মিত্রা, আজ সে সত্যি পথের ভিখারিণী। যে আশংকায় এতো দিন ভীত হোয়ে ছিলুম, আজ তা রূঢ় সত্য হোয়ে দাঁড়িয়েচে। কুমার উদয়ন আজ কারারুদ্ধ ! জীবন মরণ সন্ধি-স্থলে আজ তার অবস্থান। প্রিয়তমা মেয়ের মর্মবেদনা দূর কোরতে যেয়ে পিতার কি কঠোর মূর্তি ! কী কঠোর প্রতিজ্ঞা ! ওঃ ভগবান !

[চিত্রালীর প্রবেশ ।]

চিত্রালী

আরতি ! কী হবে ভাই ! মিত্রা যে উন্মাদিনী !

আরতি

উন্মাদিনী ! ভালোই হোলো, চিত্রালী ! উন্মাদের বুকে তো আঘাত লাগে না !

চিত্রালী

মহারাজের এখনো কী মত পরিবর্তন হবে না ?

আরতি

হবে না, চিত্রালী। তুই জানিস্‌নে, আঘাতের পর আঘাতে তা কঠোর থেকে কঠোর হোয়ে উঠ্‌চে। এ কঠিন পাষাণ কিছুতেই ভাঙ্‌বেনা। নিয়তির লিপি অলক্ষ্যে কী লিখেচে, কেউ কী তা জান্‌তে পারে ?

চিত্রালী

আরতি, কুমার উদয়ন আজ এক সপ্তাহ অনাহারে, আর মিত্রা উন্মাদিনী ! সেও যেন আরও কঠোর ! নির্বাক্ মূক হোয়ে উঠেচে !

আরতি

চিত্রালী ! আমার বুক ফেটে যায় ! তবু সকল দেখ্‌তে হবে। সকল সইতে হবে। আর তো কোনো উপায় নেই। রাজার আদেশ বজ্রের মতোন্ কঠিন ! বজ্রের মতোন্ কঠোর !

চিত্রালী

মিত্রা যদি মহারাজের কাছে যাচ্ঞা করে—তা হোলেও কী এখনোও এর প্রতিকার হয় না ?

আরতি

চিত্রালী ! রাজা অজাতশত্রুকে তুই এখনোও বুঝিস্ নি। আরোও বুঝিস নি পিতার হৃদয় ! মিত্রা পিতার করুণা যাচ্ঞা কোর্‌বে ? তার বিষাদমূর্তির মৌনবানী যে আজ বিশ্বের করুণা যেচে বেড়াচ্চে। এ যাচ্ঞা মুখের বাণীর চাইতেও মর্মান্তিক !

[নেপথ্যে দেবমিত্রার গান]

চিত্রালী

ঐ যে মিত্রা এদিক্ পানেই আস্‌চে।

[গীতকণ্ঠে গৈরিক বেশে দেবমিত্রার প্রবেশ।]

গান

ওরে আজ ভোরের পাখি
উতল ডাকে কী জানালো
কী কথা কইলো আজি
পূব আকাশের নোতুন আলো ॥
বাতাসের চঞ্চলতা
আনিলো কোন্ বারতা
পাখিদের সঙ্গে সে আজ
কী সুরে সুর মিলালো ॥
কুঁড়িদের উপবনে
কিসের আজ কানাকানি
বনানির বুক দুলিয়ে
সে আসে নাই জানি
শুনি যে নোতুন গীতি
মালতির কানন বীথি
গায় আজ কণ্ঠ ছেড়ে
'পিতম্ এলো,'—'পিতম্ এলো' ॥

এই যে চিত্রালী, আরতি ! আজ আমার বিজয় উৎসব। দীক্ষা নিতে চোলেচি !

আরতি

মিত্রা ! তোর এ সন্ন্যাসিনী বেশ কেন ? কিসের দীক্ষা নিতে তুই চোলেচিস্ !

আরতি ! যে দীক্ষা নিলে মানুষ মানুষের কাছে মানুষরূপেই ধরা দেয়। আমি সে দীক্ষা নিতে চোলেচি। সে দীক্ষায় মানুষ নিজকে ভুলে যায়—সে নিজকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে !

আরতি

মিত্রা ! তুই রাজার নন্দিনী ! সন্ন্যাসব্রত কী তোর সইবে, ভাই ?

দেবমিত্রা

তুই ভুল বুঝেছিস্, আরতি ! সন্ন্যাসব্রত নিতে যাচ্চিনে আমি। মানুষের ব্রতেই আমি দীক্ষা নোবো। সংসার ছাড়া সন্ন্যাসিনী আমি নই। সন্ন্যাসে আসে বিতৃষ্ণা, আসে বিরাগ ! কিন্তু আমার যে তৃষ্ণা মেটে নিকো, আরতি ! সংসারকে যে আমি ভালোবাসি ! ধরিত্রীর প্রতিধূলিকণা আমার অতি প্রিয় !

চিত্রালী

কার কাছ থেকে তুই সে দীক্ষা নিবি, মিত্রা ? এমন মন্ত্র যদি জগতে কেউ প্রচার কোরতো, তা হোলে জগত যে স্বর্গ হোয়ে উঠ্‌তো, বোন !

দেবমিত্রা

চিত্রালী ! লোকচক্ষুর অন্তরালে, অথচ বিশ্বের সম্মুখে বিশ্বের জন্যে আমার দীক্ষাগুরু তিলে তিলে প্রাণ দিচ্ছে ! সে যে আঁধারের অতল তলে বসে দীক্ষামন্ত্র রচনা কোরে আমার প্রতীক্ষায় রোয়েচে ! তার আহ্বান আমি স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্চি, আরতি ! অরুণ কিরণে আলোর রথে নেমে আসে তার আবাহন। ফুলের হাসিতে দেখি তার হাসি। বাতাস দেয় কাণে কাণে তার আগমন বার্ত্তা। পরাণ আমার অসহ্য পুলকে শিউরে ওঠে ! আজ আমার দীক্ষা, আরতি ! তোরা সব উৎসব কর্—উৎসব কর্, উৎসব কর্—

[গান গাইতে গাইতে উন্মাদিনীর মতোন চলে গেলো।]

গান

ওগো সুন্দর ! বুঝেচি এবার
　　কেন তব এতো আবাহন।
বুকের দুয়ার খুলেচে এবার
　　আলো-স্রোতে ভাসে মন ॥

হাতের বীণার ছিঁড়িয়াছি তার
মনের বীণায় ওঠে ঝংকার
বুকের কুসুম উঠিচে বিকশি'
ফেলে দিছি আভরণ ॥
প্রভাতে কুসুমে দেহবেদীঘিরে
ছিলো যতো আবরণ ॥

[কারাকক্ষ। আলো আর আঁধার : এর মধ্যে রোয়েছে উদয়ন শুয়ে। অদূরে প্রহরী পায়চারি কোর্‌চে।]

প্রহরী

ভিক্ষুবর !

উদয়ন

প্রহরী ! এতোটুকু দুঃখ নেই, বন্ধু ! আমি ভিক্ষু ! আমি মরণজয়ী বুদ্ধদেবের শিষ্য ! আমি মুক্তি পথের পথিক ! মরণেই আমার জয়, বন্ধু !

প্রহরী

কী কঠিন তোমার প্রাণ ! স্বেচ্ছায় কারামুক্তি পায়ে ঠেল্‌লে ! সভাসদ দেবরাতের কাতর অনুনয় শুন্‌লে না ; এক বিন্দু জল পর্য্যন্ত—

উদয়ন

প্রহরী ! এযে আমার জীবন-সাধনা ! তিলে তিলে জীবন দিয়ে জীবন দেবতার অর্ঘ্য রচনা কোরেচি। তার যে কী আনন্দ, সে তুমি, বন্ধু, কী কোরে অনুভব কোর্‌বে ? সে আনন্দ আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূর কোরে দিয়েচে ! কিন্তু আমি যে একজনের প্রতীক্ষায় রোয়েচি, প্রহরী ! সে কী আস্‌বে না ? আমি যে আর সহ্য কোর্‌তে পার্‌চিনে এই ধূলি-মলিন পৃথিবীকে !

[দূর থেকে আলোর রেখা ভেসে আস্‌চে। সেই আলোর রেখার মধ্যে থেকে দেবমিত্রার আবির্ভাব।]

ঐ যে আলোর রেখা, এদিকেই আস্‌চেনা, বন্ধু ?

[দেবমিত্রার ইঙ্গিতে প্রহরী কারাকক্ষের দরজা খুলে দিলে।]

ঐ যে সে এসেচে। রাজকুমারি ! রাজকুমারি ! আমার প্রতীক্ষা সার্থক হোয়েচে ! আমি যে তোমারই প্রতীক্ষা কোরেছিলাম, মিত্রা ! মিত্রা—আঃ !

দেবমিত্রা

কুমার ! একদিন আমাকে বন্ধনের মাঝে মুক্তির স্বর্গ রচনার দীক্ষা দিতে তুমি চেয়েছিলে। আজ তার সময় হোয়েচে, ওগো জীবন-দেবতা আমার ! আমায় তুমি দীক্ষা দাও !

উদয়ন

[অস্ফুট স্বরে] মিত্রা—রাজকুমারি ! সত্যই আজ তার সময় হোয়েচে ? জীবন দিয়ে সে দীক্ষার অর্ঘ্য রচনা কোরতে হয়। মিত্রা, যে ব্যর্থতায় একদিন তোমায় আঘাত দিয়েচি, সে ব্যর্থতা আজ পূর্ণতা নিয়ে আমায় প্রতিঘাত দিতে ফিরে এসেচে। আমার এমন শক্তি নেই, তাকে প্রতিহত করি। আজ আমার সকল দ্বন্দ্ব ঘুচে গেচে ; কিন্তু মিলনের পথ ধরিত্রীর বাইরে, আকাশের ও-পারে।

দেবমিত্রা

তুমি আমায় হাত ধ'রে নিয়ে চলো। তোমার মন্ত্রে জীবন আমার উদ্বুদ্ধ কোরে তোলো ! তুমি যে আমার দীক্ষাগুরু ! আমার জীবনে ব্যর্থতা আসে নি। তোমার প্রত্যাখ্যানে একদিন যে আঘাত পেয়েচি, সে আঘাত আজ হৃদয়ে আমার সোনার রেখায় ফুটে উঠেচে ! তোমার পরশ্-কাঠির ছোঁয়ায় জীবন আমার সার্থক হোয়ে উঠেচে।

উদয়ন

মিত্রা ! আর সময় নেই। আমাদেব মিলনের পথ ধরণীর বাইরে। একের বদলে বিশ্বের মাঝে আমাদের মিলন। মিত্রা ! রাজকুমারি। আজ পূর্ণিমা নয় ? ঐ যে আলোর রথে চড়ে' নেমে আস্চেন ভগবান বুদ্ধদেব ! মিত্রা—এই নাও, আমাদের মিলনের অর্ঘ্য।

[হাতড়িয়ে পাশ থেকে ভিক্ষাভাণ্ড নিয়ে মিত্রার হাতে দিলে।]

বিশ্বের অনাথ-আতুরের আর্তনাদের মাঝে এই ভিক্ষাভাণ্ড তোমার চলার পথের সন্ধান দেবে। বলো—মিত্রা, বলো—

সর্ব-পাপসস্ অকরণং
কুশলসস্ উপসম্পদা
সচিত্ত পরিয়োদপণং
এসং বুদ্ধাসাশনম্ ॥

[একটু থেমে, আবার]

বলো

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
ধমং শরণং গচ্ছামি ॥

আঃ ! ভগবান বুদ্ধ—

[আবৃত্তি শেষে উদয়ন টলে উপাদানের ওপর প'ড়ে গেলো। আলোটা হঠাৎ নিবে গেলো।]

শেষাংশ

[অনেক আগে পার্বত্য পথ ধরে চোলেচে দেবমিত্রা ; পেছনে গান গাইতে গাইতে চোলেচে সুদর্শন]

গান

আলোক রোয়েচে সুচির-বন্দি
রাতের অন্ধকারে।
শত ঝরণার কলগীতি হারা
উচ্ছল পারাবারে॥
ধরণীর লাগি মাতোয়ারা মন
তাই আকাশের এতো জাগরণ
বিরহের বুকে শত মিলনের
গোপন-অশ্রু ঝরে॥
এ-পারের সাথে ও-পার বাঁধা গো
যেনো সঙ্গীত সুরে॥

যবনিকা

কবি ও শিল্পী

ত্রৈলোক্য বিশ্বাস

নির্যাতিতের করুণ হাসি
ফুটুক তোমার তুলির রেখায়
তাদের বুকের বিষের জ্বালা
তোমার বুকের কোণায় কোণায়
জ্বালুক নিত্য নূতন শিখা।
সেই আলোতে তুলির কবি—
হোক না তোমার কাব্য লিখা।

আমার হাতে লিখন তখন
সেই কবিতার মর্মতলে
নূতন রসের হদিশ পেয়ে
গায় যদি গান প্রলয় রোলে
শিল্পী কবির সমন্বয়ে
বসুন্ধরায় নূতন জগৎ
আসবে সেদিন, আনবো জেনো,
আসছে দেখো ভবিষ্যৎ।
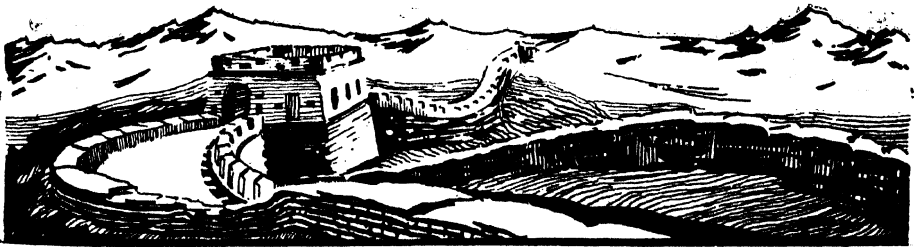
ইতিহাসের পুনরাবর্ত্তন।

প্রমীলা গুপ্তা

শোষণ ও সাম্রাজ্য-লিপ্সা ১৮৭৬—১৯১৩
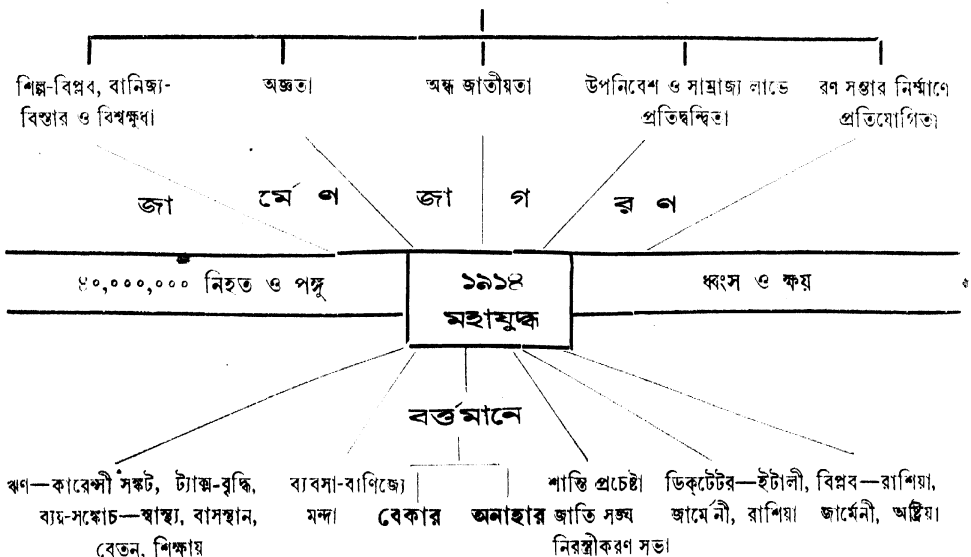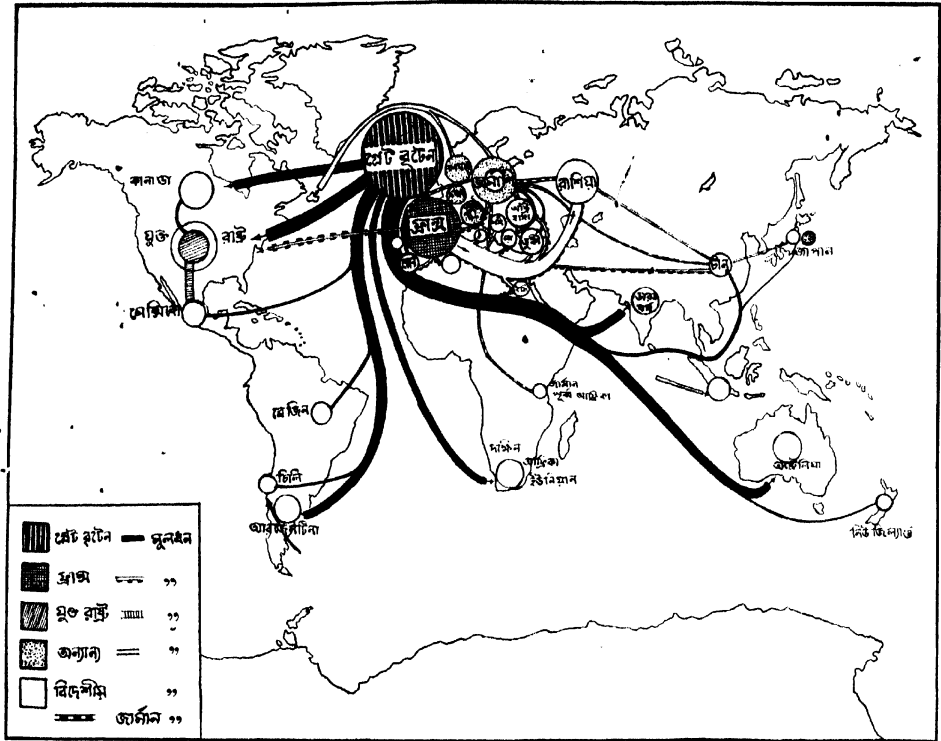
শোষণ ও সাম্রাজ্য-লিপ্সা ১৯১৪—৩০
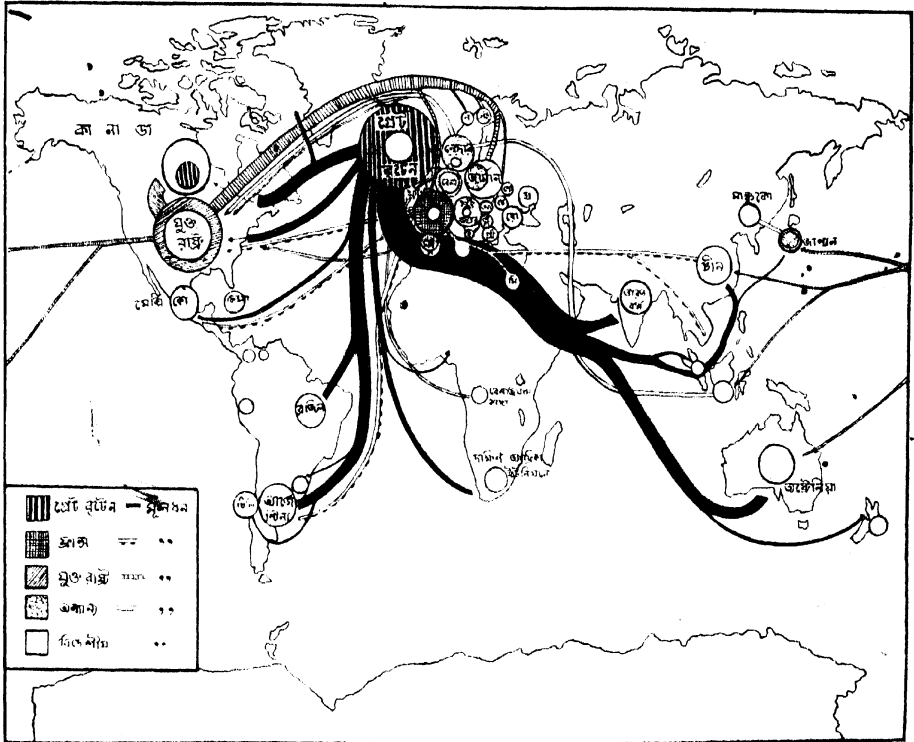
বাণিজ্য বিস্তার ও বিশ্ব ক্ষুধা | প্রপাগাণ্ডা | অন্ধ জাতীয়তা | উপনিবেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা | রণ সম্ভারের আয়োজন

বাণিজ্য বিস্তার ও বিশ্ব ক্ষুধা
প্রপাগাণ্ডা
অন্ধ জাতীয়তা
উপনিবেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতা
রণ সম্ভারের আয়োজন
না জি জ ম্
ফা সি জ ম্
হুমকি।
রোম-বার্লিন অক্ষদণ্ড।
লণ্ডন-প্যারিস ,, ।
লণ্ডন-প্যারিস অক্ষদণ্ডের মিত্র
রোম-বার্লিন অক্ষদণ্ডের প্রতি আকৃষ্ট।
গ্রেট বৃটেন
ডানজিগ
লিথুয়ানিয়া
হুমকি
লণ্ডন
বেলজিয়াম
জার্মানী
পোল্যাণ্ড
লণ্ডন প্যারিস অক্ষদণ্ড
প্যারিস
রোম-বার্লিন অক্ষদণ্ড
সোভিয়েট রাশিয়া
হাঙ্গেরী
রুমানিয়া
সুইজারল্যাণ্ড
ফ্রান্স
যুগোশ্লাভিয়া
ইটালী
বুলগেরিয়া
হুমকি
স্পেন
গ্রীস
তুরস্ক
ভূ ম ধ্য
সা গ র
ফরাসী সিরিয়া
ইরাক
মরক্কো
এলজেরিয়া
লিবিয়া (ইটালী)
জিবুতি
সুয়েজ

১৯—?
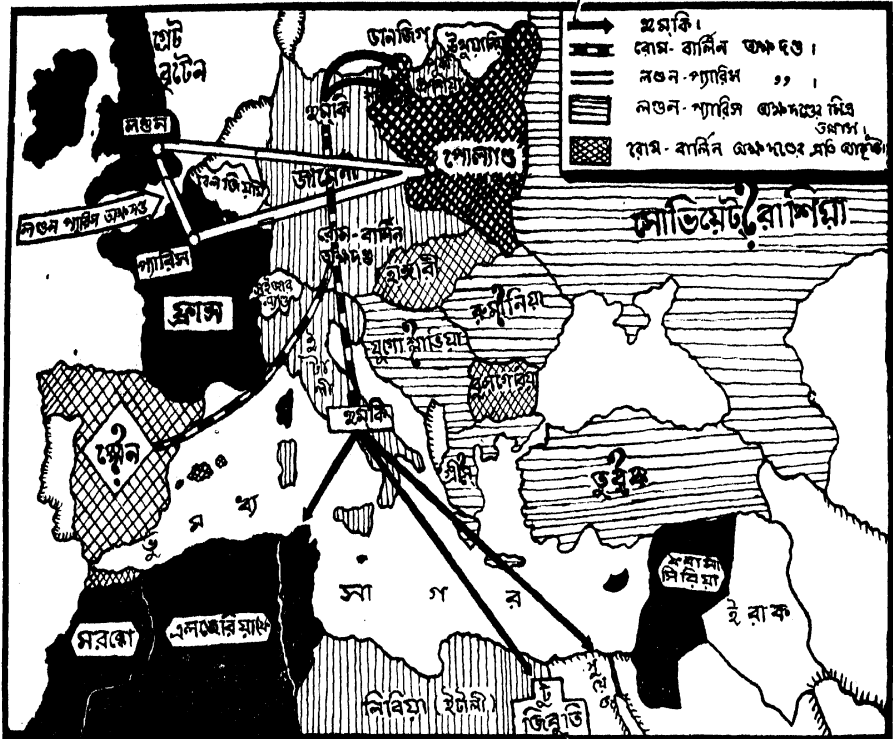
বিশ্বভারতীর কথা

নরেন সেনগুপ্ত (প্রাক্তন, শিক্ষাভবন—বিশ্বভারতী)

ও

কুমারী ব্রজেশকুমারী লালজী (প্রাক্তনা, সঙ্গীতভবন—বিশ্বভারতী)

কলকাতা থেকে প্রায় শ'-খানেক মাইল উত্তর-পশ্চিমে বীরভূম জেলার এক নিভৃত-অংশে যে ক্ষুদ্র বিদ্যায়তনটি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে তার স্বল্প-আয়োজনে গড়ে উঠেছিল, আজ বিশ্বের আসরে সে যে এতোখানি সম্মানলাভ করবে, তা সেদিন কেউ হয়ত জানতো না। শিক্ষা, সৌন্দর্য ও সংস্কৃতির জগতে এর দান যে অপরিমেয় তা আজ রণোন্মত্ত-যুগের অনেকে উপলব্ধি করতে না-পারলেও অনেক মনিষীই পেরেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেকে পারবেন। প্রকৃতির রম্য নিকেতন এই শান্তিনিকেতন নোতুন দর্শকের মনে সত্যিই অপূর্ব বিস্ময় ও শ্রদ্ধা এনে দেয়। এ-যেন অনেকটা আমাদের দেশের সেই পুরণো যুগের তপোবন বা আশ্রম। অবিশ্যি এর আদর্শ অনেকটা সে-ভাবের হলেও এর ভেতরের ও বাইরের অনেকখানি অঙ্গ কালের ধারাকে ও সভ্যযুগের বিজ্ঞান-সম্মত রুচির বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। কে-একজন এই শিক্ষা-নিকেতন দেখে বলেছিলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা-কাননে শান্তিনিকেতনই সুন্দরতম ফুল। কথাটি নিছক সত্যি। এদিক থেকে বিচার করে দেখলে বুঝতে পারা যাবে যে, শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কবি মনের বাস্তব অভিব্যক্তি। কর্মের সাথে চিন্তার, কল্পনার সাথে বাস্তবের এমন সুন্দর সুষ্ঠু সমন্বয়, সত্যিই অপূর্ব। কোনও দেশে, কোনও কালেই এমনটি আর হয়নি!

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

বিগত শতাব্দীর ষষ্ঠপাদে রবীন্দ্রনাথের পূজনীয় পিতৃদেব স্বর্গীয় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে প্রকৃতির মুক্তদানের ঐশ্বর্য দেখে মুগ্ধ হন। শান্তিনিকেতন তখন—যাকে বলা যায়—একটা ছোট বন ছিল। মহর্ষি এই মনোরম নির্জন স্থানটি বেছে নিলেন তাঁর সাধনার জন্যে।

এখানে তিনি একখানি বাসভবন নির্মাণ করিয়ে তার নাম দিলেন "শান্তিনিকেতন"। সংক্ষেপে এই হলো শান্তিনিকেতনের জন্ম। তারপর কবি দেখলেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যর্থতা, এর পদ্ধতির পঙ্গুতা। তাঁর হৃদয়ে এ-সব গভীর রেখাপাত করলো। (অবিশ্যি তাঁর স্বল্পকালের ছাত্রজীবনের করুণ অভিজ্ঞতাও হয়ত তাঁর উপলব্ধির সহায়তা করলে)। তিনি চাইলেন, এমন একটি শিক্ষায়তন যেখানে ছাত্রছাত্রীরা "প্রকৃতির মুক্ত আবহাওয়ায় শিক্ষালাভ করবে"—"যে শিক্ষা জীবনের সাথে সংযোগহীন নয়"। স্বাধীনমনা কবি কল্পনা করলেন স্বাধীন শিক্ষা,—যা পর-মুখাপেক্ষী নয়, বাজারদরে যার মূল্য বিচার হয় না। তাই জীবনের সকল ভীরুতা ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কবি বর্তমান শিক্ষায় বিদ্রোহ জানালেন। কবি-কল্পনা রূপলাভ করলো। ১৯০৪ সালে "শান্তিনিকেতন বিদ্যায়তন" (Santiniketan School) এর স্থাপনা হলো।

তারপর ক্রমে ক্রমে এর আয়তন হলো বর্দ্ধিত। আদর্শের পরিধি বিস্তৃতিলাভ করলে। সমগ্র বিশ্বে এর আহ্বান পৌছল। কতো মনিষী কবির আহ্বানে সাড়া দিলেন। দলে দলে তাঁরা এলেন। দেশীয় ও বিদেশীয় মনিষীর সম্মিলিত চেষ্টায় এই ক্ষুদ্র শিক্ষা-নিকেতন বিশ্ব শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হলো। কবি এর নাম দিলেন "বিশ্বভারতী"। এর আদর্শ সম্বন্ধে কবি নিজে বলেছেন,—

শান্তিনিকেতনে অধ্যাপন

"ভারতের আত্মার ঐশ্বর্যের প্রতিভূস্বরূপ বিশ্বভারতী ভারতের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ও শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির দান জগতের জন্যে মুক্ত করে রাখবে, এবং বিশ্বভারতী জগতের অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতির দান গ্রহণ করবার দাবী ভারতের পক্ষ থেকে সশ্রদ্ধমনে স্বীকার করবে।" *

* "Visva-Bharati represents India where she has her wealth of mind, which is for all. Visva-Bharati [illegible] India's obligation to offer to others the hospitality of her best culture and India's right to accept from others their best".

বিশ্বভারতী দুইটী প্রতিষ্ঠানে বিভক্ত। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন। শ্রীনিকেতন শান্তিনিকেতন থেকে একমাইল দূরে। শান্তিনিকেতনে সম্প্রতি নিম্নলিখিত বিভাগগুলো আছে।

১। পাঠভবন (School)

২। শিক্ষাভবন (College, স্কুল ও কলেজ দুইশাখায় বিভক্ত। একটী শাখায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশিকা থেকে বি, এ, অনার্স অবধি পড়ান হয়; অপরটীতে বিশ্বভারতীর নিজস্ব faculty degree দেওয়া হয়।)

৩। কলাভবন (School of Art and Crafts. শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সুযোগ্য তত্বাবধানে এই বিভাগটী আর এর সংলগ্ন মিউজিয়ম ও আর্ট গ্যালারি জগতের শিল্পভাণ্ডারে এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। বলাবাহুল্য ভারতের প্রসিদ্ধ অনেক শিল্প-অধ্যাপক এই কলা-বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র।)

৪। বিদ্যাভবন (Institute of Research. পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী ও কাশী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ অধিকারীর অধিনায়কত্বে এই বিভাগটী প্রভূত প্রশংসনীয় কাজ করছে।)

৫। সঙ্গীতভবন (School of Music and Dance. স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবির পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা ঠাকুরের নেতৃত্বে এই বিভাগটী স্থাপিত ও পরিচালিত হয়ে এসেছে। আজকাল নানাদেশের অনেক নৃত্যশিল্পী ও সঙ্গীতাধ্যাপক এখানে নিযুক্ত আছেন।)

৬। চীনাভবন—সম্প্রতি প্রায় দুবছর হলো এই বিরাট সৌধটীর স্থাপনা হয়েছে। কবিবরের সম্মানীয় বন্ধু চীনের বিখ্যাত জননায়ক চিয়াং-কাই-শেকের অনুপ্রেরণা ও দানে এই বিভাগটী খোলা সম্ভব হয়েছে। চিন-ভারত-সংস্কৃতি-সমিতির সম্পাদক টান-ইয়ান-সেন মহোদয়ের তত্বাবধানে এই বিভাগটী পরিচালিত। এই ভবনের উদ্বোধনকালে মহাত্মাজী বাণী প্রেরণ করেছিলেন, "এই ভবন আমাদের ভারত ও চীন এই দুই মহাদেশের মৈত্রীর জাগ্রত প্রতীক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকুক।" এতে চীন-সরকার একলক্ষ বই ও প্রভূত অর্থদান করেছেন। কয়েকজন চীনা ও ভারতীয় শিক্ষার্থী এখানে গবেষণায় রত আছেন।

৭। হিন্দীভবন—এই বিভাগটীও সম্প্রতি বিশ্বভারতীর সুযোগ্য বন্ধু দীনবন্ধু এ্যাণ্ডরুজ কর্তৃক উদ্বোধিত হয়। এই ভবনটী হিন্দীশিক্ষার কেন্দ্র হিসেবে একটি বিরাট গ্রন্থাগার ও অনুসন্ধানের (research) ব্যবস্থা করেছে।

ভারতের অগণিত নিরন্ন দেশবাসীর করুণ অবস্থা কবি নিজ চক্ষে অনেকবার দেখেছেন। তিনি যখন জমিদারি দেখতেন, বা পদ্মাতীরে ছিলেন তখন গ্রাম্য-প্রকৃতির সহজ সৌন্দর্য ও অনাবিল

মুক্ত আনন্দ যেমন তাঁকে তৃপ্তি দিয়েছিল, তেমনি গ্রামবাসীদের নিরক্ষরতা, মর্মন্তুদ অভাব, দিনের পর দিন মৃত্যুর প্রতীক্ষা করে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে কালাতিপাত করবার অবর্ণনীয় দুঃখভার তাঁর কবি মনকেও আঘাত দিয়েছিল। তাই সৌন্দর্য-পিপাসী রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন স্থাপনা করলেন, তখনও মনে মনে তিনি ভেবেছিলেন দুঃখদৈন্যভারনত গ্রামবাসীদের কথা। অর্থের অভাবে কল্পনা তাঁর কল্পনাই রয়ে গেল। তারপর দেখা হলো আমেরিকায় ইংরেজ ধনকুবের এল্‌মহার্ষ্ট সাহেবের সঙ্গে। উদার-চেতা তিনি। কবির আবেদন তিনি শুনলেন, কবির ব্যথা তিনি বুঝলেন। তারপর এই এল্‌মহার্ষ্ট সাহেবের কায়িক পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থসাহায্যের আনুকূল্যে কবি গ্রাম-সংগঠন বিভাগের (Institute of Rural Reconstruction) প্রতিষ্ঠা করলেন অদূরবর্তী সুরুল
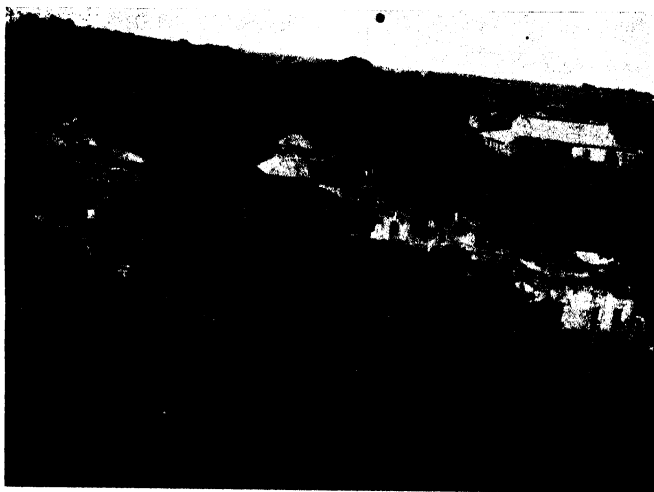
শ্রীনিকেতনের দৃশ্য

পল্লীতে। নাম দিলেন শ্রীনিকেতন। আজও শ্রীনিকেতন প্রতিবৎসর এলমহার্ষ্ট সাহেবের কাছ থেকে বহু অর্থসাহায্য লাভ করে। শ্রীনিকেতন এখন বহু বিশিষ্ট কর্মী (দেশীয়, বিদেশীয় ও বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত) দ্বারা পরিচালিত। এর অনেকগুলো বিভাগ আছে। যথা—

(১) কৃষিবিভাগ (Agriculture)

(২) পশুচায-বিভাগ (Poultry & Dairy)

(৩) বয়ন-বিভাগ (Weaving)—সুইডিস, জাপানী ও ভারতীয় এই তিন পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হয়।

(৪) শিল্প-বিভাগ (Arts & crafts including leather-works, celluloid works, cane works, lac works, etc.)

(৫) গ্রাম স্বাস্থ্য সমিতি (Rural Health Society)

(৬) গ্রাম শিক্ষা-সমিতি (Rural Educational Society)

(৭) ব্রতবালক ও ব্রতবালিকা বিভাগ (Rural Defence Party)

(৮) লোকশিক্ষা বিভাগ (Training Camp)

সম্প্রতি শ্রীনিকেতন ২০।২৫টী পাশাপাশি গ্রাম নিয়ে কাজ করছে। ভারতের অন্য কোনও কেন্দ্রে শ্রীনিকেতনের মতো এমন সর্বাঙ্গীন কাজ হয়নি বা হচ্ছেনা। বিশ্বভারতী ভারতকে পথ দেখিয়েছে। প্রত্যেক প্রাদেশিক সরকারের উচিত তাদের জাতি-সংগঠন কার্যের (Nation building program) সহায়তার জন্য বিশ্বভারতীর সাহায্য নেওয়া ও সাহায্য করা। এতে উভয় পক্ষই লাভবান হবেন এবং বাঙ্‌লা ও অন্যান্য প্রদেশের মধ্যে সংস্কৃতিগত সংযোগের আর একটি উপায় নির্ধারিত হবে।

যে কোনও Residential Universityর সুবিধা ও সুযোগ বিশ্বভারতীতে পূর্ণমাত্রায় আছে এবং এখানকার সমাজ অন্যান্য যে কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ থেকে অনেকাংশে বেশী লোভনীয়। পৃথিবীর সব রকম জাতি থেকে এখানে ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপক অধ্যাপিকাগণ আছেন। তাঁদের সকলের সম্মিলিত সমাজ—যাকে শান্তিনিকেতন সমাজ বলা যায়—এক অভিনব বস্তু। কতো রকমের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতির এক সুষ্ঠু সমন্বয় ও ঐক্যের ওপর এর বিশিষ্ট সমাজ গড়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষদর্শী না-হলে দু-এক কথায় তা বলা চলে না। রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন—"এই আশ্রমে আমি একটি সম্পূর্ণ জীবনের আদর্শ গড়ে তুলতে চেয়েছি—ছাত্র এবং অধ্যাপক মিলে একটি সমগ্র সত্বা সৃষ্টি করে তুলবো এই আমার লক্ষ্য।" (প্রাক্তনী)

বিশ্বভারতী সম্বন্ধে বিশেষ করে বাঙ্‌লা দেশে নানারকম আপত্তিসূচক মন্তব্য শোনা যায়। আশ্চর্যের বিষয় এই আপত্তি যাঁরা করেন, তাঁদের মধ্যে কারোই বিশ্বভারতী সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই। এতে দু'পক্ষেরই বিশেষ দোষ আছে। এক পক্ষের দোষ বলা যায়,—নিছক কাহিনী প্রচারের আনন্দ; আর অন্যদিকে বিশ্বভারতীর তত্বাবধায়কগণের ঔদাসীন্য। সত্যিই দেখে দুঃখ হয়, যে-দেশের কবি রবীন্দ্রনাথ, যে-দেশের কতিপয় ছাত্র এর গোড়া পত্তন করে গেছে, যে-দেশের ভূমিতে এর বিরাট সম্মানিত আসন, সেই দেশের ছাত্রছাত্রীই আজ সেখানে দিন দিন কমে আসছে। আর "পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা—দ্রাবিড়ের" সংখ্যা বেড়ে চলেছে। তাদের সংখ্যা বাড়ুক,—খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু 'বঙ্গের' সংখ্যা কম্‌ছে—সত্যিই দুঃখের কথা। রবীন্দ্রনাথ আশা করেছিলেন,—"মনে হয়েছিল এই অনুষ্ঠানকে অবলম্বন করে বঙ্গদেশব্যাপী এক পরম আত্মীয়তার যোগ স্থাপিত হবে, বাঙ্‌লার নাড়ীর সঙ্গে শান্তিনিকেতনের গভীর যোগ হবে। তারপর সৌভাগ্যক্রমে এই আশ্রমের সঙ্গে নানা দেশ বিদেশের যোগ হলো, এর পরিধির বিস্তার হলো।" কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্‌লার নাড়ীর সঙ্গে এর যোগ দিন দিন ছিন্ন হতে যাচ্ছে। বাঙ্‌লার উন্নতিকামী নেতাদের কি এ বিষয়ে

ভাববার কথা নয়? বিশ্বভারতীর সম্পাদকগণও কি তাঁদের ঔদাসীন্য ত্যাগ করে কার্যব্যবস্থা অবলম্বন করবেন না যাতে করে বাঙ্‌লার ছেলে, বাঙ্‌লার মেয়ে দলে দলে সেখানে গিয়ে শিক্ষালাভ করতে পারে? অনেককে বলতে শুনেছি বিশ্বভারতীর সম্পাদনার অযোগ্যতার কথা। কে জানে, হয়ত কিছুটা সত্যিও বা। কিন্তু তাঁদের কি উচিত নয়, 'যোগ্যতর ব্যবস্থার জন্য পথপ্রশস্ত করবার উপায় নির্ধারণ করা? সব প্রতিষ্ঠানেই কিছুটা ক্রুটী আছে, কবি নিজেও বলেছেন,

"মনে রেখো এমন কোনও সৃষ্টি নেই যার মধ্যে ক্রুটী না আছে—অনেক সময় সেইটাই বেশি করে আমাদের চোখে পড়ে, তারই আমরা বেশী মূল্য দেই" (প্রাক্তনী)। রবীন্দ্রনাথের এই অনুষ্ঠানের দীনতার দিকটাই বড়ো করে না-দেখে এর আদর্শের ধারাটী সর্বদা প্রাণবান্ করে রাখবার জন্যে সুযোগ্য কর্মীরা এখানে আসবেন। যোগ্য হতে যোগ্যতরের হাতে পড়ে এর দীনতা যাবে ঘুচে, অকলঙ্ক মহিমায় এর ঔজ্জ্বল্য দিন দিন সভ্যজগতকে আলোকিত করবে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের পথ দেখিয়েছেন। এখন দেশবাসীর কর্তব্য, ভারতের এই নবজাগরণের দিনে রুধিরোন্মত্ত জগতের সামনে ভারতের আদর্শ তুলে ধরা,—"শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্" এর আদর্শ—ভারতের চিন্তাধারার আদর্শ,—ভারতের ধর্মের আদর্শ,—সমস্ত তুচ্ছ ক্রুটী দূরে আত্মগোপন করবে। এই বিরাট জাগরণে কবির আশা সার্থক হবে, কবি-স্বপ্ন মূর্ত হয়ে উঠ্‌বে।

পথে প্রবাসে

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

যতীশচন্দ্র সেন

বাসায় ফিরে এসে অনেকক্ষণ পা ডুবিয়ে রেখে বসে রইলাম। তাতে বেশ আরাম বোধ হোলো, বেদনাটাও অনেকটা কমে গ্যালো। তারপর তাড়াতাড়ি পোষাক বদ্‌লে আবার বাইরে বেরোলাম। এবার সটান্ ৯নং রু দ্য সমেরোর্ডে গিয়ে বেল টিপ্‌তেই একটী চাকরাণী বেরিয়ে এলো, তাকে ভারতীয় ছাত্রদের কথা জিজ্ঞাসা করাতে সে আমাকে দোতালায় নিয়ে গ্যালো—সেখানে একটা ঘরের দরজায় টোকা মার্ত্তেই এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন ও আমাকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন আমি কি চাই। আমার প্রয়োজন বলাতে তিনি আমাকে তাঁর ঘরে নিয়ে বসালেন। পরস্পরের পরিচয় হলো। আমি তাঁর নামটী নানা কারণে এখানে দিলাম না। ছদ্মনাম ডাঃ রায়, আমাদের দেশের কোন বিখ্যাত নেতার দৌহিত্র, ইনি অনেকদিন ধরে প্যারিসে ও সুইজারল্যাণ্ডে লেখাপড়া উপলক্ষে আছেন। তিনি জেনিভা থেকে ডাক্তারী পাশ করে এম, ডি উপাধি পেয়েছেন, এবং কিছুদিন সুইজারল্যাণ্ডে প্রাক্‌টিস্‌ও করেছিলেন। সে সময় প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের হাস্‌পাতালে চর্ম্মরোগ সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হ'বার জন্য পড়ছিলেন। তাঁরই কাছে শুনলাম যে তিনি এক রাশিয়ান মহিলাকে বিয়ে করেছেন। ডাঃ রায় সেই সময়ে একাই প্যারিসে ছিলেন, তাঁর স্ত্রী ও দুবছরের মেয়ে জেনিভাতে ছিলেন। দুপুরবেলা আমার মোটেই খাওয়া হয় নি শুনে ভদ্রলোক বল্লেন যে তা'হলে তো আপনার বড় কষ্ট হ'য়েছে—তা' চলুন আমরা এখনই একটী নিরামিশ রেঁস্তোরাতে খেতে যাচ্ছি। একটু পরেই ভদ্রলোকের শ্যালক এলেন, এঁরা রাশিয়া থেকে পালিয়ে এসেছেন, বলাবাহুল্য প্যারিসে এইরকম রাশিয়ান অনেক আছে এবং বলশেভিক্ আমলের আগে এঁদের অনেকেই রুশ দেশের শীর্ষস্থানীয় লোক ছিলেন। ভাগ্যচক্রে এদের অনেককেই এখন খানসামা ও মোটর ড্রাইভার প্রভৃতি অমর্য্যাদাকর কাজ করে কায়ক্লেশে দিন কাটাতে হচ্ছে—প্রকৃতির পরিহাস ছাড়া একে আর কি বোল্‌বো। আমরা তিনজনে সেই নিরামিশ রেঁস্তোরার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়্‌লাম। এখানে একটা কথা বলা দরকার মনে করি। বিদেশে বেড়াবার সময় যেখানেই বাঙ্গালীর সঙ্গে দেখা হ'য়েছে ২।৪ জন ছাড়া তাঁদের প্রায় সকলেরই বেশ একটু মুরুব্বিয়ানা ভাব দেখেছি। তাদের ব্যবহারে আন্তরিকতার অভাবে আমাকে ভয়ানক আঘাত দিয়েছে। যেন আমাকে একটু সঙ্গ দিয়ে বা নিতান্ত অনিচ্ছুকভাবে কোন রাস্তা বা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে ভাবভঙ্গীতে এই বোঝাতে চেয়েছেন "বাপুহে তোমার জন্য যেটুকু কর্ল্লুম তা' নিতান্ত বাধ্য হয়ে এবং সেটা তোমার চোদ্দপুরুষের না হোক্ অন্ততঃ সাতপুরুষের ভাগ্যি।"

জানি না আমার এ তিক্ত অভিজ্ঞতা অন্যকোন ভদ্রলোকের ভাগ্যে ঘটেছে কিনা। এ'সম্পর্কে আমি বল্‌তে বাধ্য যে অন্য যে কোন জাতির ভারতীয় ছেলেদের কাছ থেকে এর চেয়ে অনেক ভাল ও ভদ্র ব্যবহার পেয়েছি। রেঁস্তোরাতে পৌঁছে আলুভাজা, মামলেট, পালংশাকের ঘন্ট ও কাচামটরশুটীর ডাল ইত্যাদি বেশচমৎকার ও সুস্বাদু খাবার খাওয়া গ্যালো, দক্ষিণা লাগ্‌লো ৪½ ফ্রাঁ, বক্‌শিশ নিয়ে ৫ ফ্রাঁ। আগেই বলেছি যে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট আইন করেছেন যে খদ্দের যত খরচ কর্ব্বেন—তার শতকরা ১০ ভাগ পরিবেশনকারীরা বক্‌শিশ পাবে। এর জন্য কোন গোলমাল হয় না। বকশিশের ব্যবস্থা থাকার দরুণ অনেক রেঁস্তোরা বা কাফের খানসামা ইত্যাদি কম মাইনে পায়, বকশিশের বহরে মজুরী পুষিয়ে যায়। খাওয়া দাওয়া সেরে ১৭নং রু দ্য সমেরার্ডে গেলাম—সেখানে ডাঃ বসুর সঙ্গে দেখা হোলো। ইনি হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, কল্‌কাতার কাছেই কোথাও প্রাক্‌টিস্ কর্ত্তেন, প্যারিসে এসেছেন ডাক্তারী ডিগ্রী নিতে। এঁর বয়সও খুব বেশী নয়। ৩০ এর নীচেই। ইউরোপের যে কোনও দেশে ডাক্তারী কর্ত্তে হ'লে আগে ডাক্তারী পরীক্ষা পাশ কর্ত্তে হয়, তারপর এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি যার যে মতে ইচ্ছা সেই মতে প্রাক্‌টিস্ কর্ত্তে পারে। ইনি বেশ ধীর, স্থির, শান্তপ্রকৃতির। কোনরকম মাতব্বরী চালও দেখ্‌লাম না। ছাত্রসমিতির উঠে যাবার কারণ যা বল্লেন তা আমাদের দেশের চিরকাল যা হ'য়ে থাকে তাই। দলাদলি ঝগড়া ও টাকাকড়ির অভাব। দলাদলি আমাদের জাতীয়তার ভিত্তিতে চিরকাল ঘুণ ধরিয়েছে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি শুনে মনে বড় ব্যথা পেলাম। বস্তুতঃ এ'সবের জন্যে বিদেশে আমাদের কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থায়ীত্ব লাভ কর্ত্তে পারে নেই। তাঁকে ডাঃ রায়ের কথা বলাতে তিনি অন্য কথা পাড়লেন, তাতে বুঝলাম যে ডাঃ রায়ের সম্বন্ধে তাঁর ভাল ধারণা নেই। ডাঃ সরকারের সঙ্গে আমার অল্পক্ষণের আলাপে যে রকম মাতব্বরী ও বড় বড় কথা শুনতে পেয়েছিলাম তাতে বুঝেছিলাম যে তিনি আমাদের মত নগন্য লোকদের সঙ্গে অত্যন্ত দয়াকরে কথাবার্ত্তা বলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা কইবার যে সুযোগ আমরা পেয়েছি তাঁর ভদ্রতা ও মহত্ব ভিন্ন তা একেবারেই সম্ভবপর হতো না। যাক্, ডাঃ বসুর সঙ্গে একটা কাফেতে গিয়ে একটা লেমনেড্ পান কর্ল্লাম। আগেই বলেছি, এইসব কাফে বা রেঁস্তোরাতে গিয়ে কিছু খরচ কর্ল্লেই ঘন্টার পর ঘন্টা কাটান যায়। কেউ খোস গল্প কচ্ছে, কেউ খবরের কাগজ পড়্‌ছে, কেউ বা তাস, দাবা ইত্যাদি খেল্‌ছে। অবশ্য খেলা বা গল্পের মাঝে খাবার বা পানীয়ের জন্য প্রায় সকলেই কিছু না কিছু খরচ ক'রে, তবে বাঁধাবাঁধি নেই। কাফে থেকে ৮৸৹টা ৯টার মধ্যেই বাসায় ফিরে গেলাম। মিঃ কাথির সঙ্গে সে রাত্তিরেই আলাপ হোলো। তিনি জাতিতে আইরিশ, তা আগেই বলেছি। বার্লিনে ইণ্টারন্যাশানাল লেবার অফিসে চাকরী কর্ত্তেন, জার্ম্মাণীতে নাৎসী আন্দোলনের জন্য তাঁদের অফিস্ তখন প্যারিসে উঠে এসেছিল। বল্‌তে গেলে এদের একরকম পালিয়ে আস্‌তে হয়। সোসালিষ্ট, ইহুদি ও কমিউনিষ্টদের উপর অত্যাচার স্বচক্ষে দেখে ভদ্রলোক জার্ম্মাণদের উপর ভয়ানক খাপ্পা। তাঁর একজন কমিউনিষ্ট বন্ধুকে নাৎসীরা লোহার তারের বেত দিয়ে এমন সাঙ্ঘাতিক মেরেছিল যে বেচারার চোখের তারা

ফেটে বেরিয়ে আসে। তিনি আরও যে সব অত্যাচারের কথা বল্লেন তা' শুনলে সমস্ত জার্ম্মাণজাতিটার সম্বন্ধে খুব উঁচু ধারণা রাখা অসম্ভব। অনেক রাত হওয়াতে, ও বড় ক্লান্ত থাকায় তাড়াতাড়ি শুতে গেলাম। সকালে উঠেই মুখ হাত ধুয়ে মিঃ কার্থির ঘরে গেলাম। তিনি পাঁচতলায় থাক্তেন, দেখ্লাম তখনও তিনি শুয়ে আছেন। আমাকে অভ্যর্থনা করে বসালেন, রুটী, মাখন, চিনি ও মিনারাল ওয়াটার খাওয়ালেন। তিনি আমাকে বল্লেন যে প্যারিসের জল বড় খারাপ। পান করা মোটেই নিরাপদ নয়। আমাশা বা পেটের অসুখ হ'তে পারে, সেজন্য মিনারাল ওয়াটার পান করা উচিৎ। প্যারিসের লোকেরা এবং ফরাসীরা বলে যে জল হচ্ছে ঘোড়ার পানীয়, মানুষের জন্য অন্য ব্যবস্থা।' সেইজন্য প্রায় সকলেই মদ, কফি প্রভৃতি পান করে থাকে। ফরাসীদেশে মদ ইত্যাদি খুব সস্তা এবং গভর্ণমেণ্ট মদের উপর কোন শুল্ক বসান নি। মিঃ কার্থি আমাকে রুটী, মাখন, চিনি ও কিছু ফল ও মিনারাল ওয়াটার কিনে রাখতে পরামর্শ দিলেন। বল্লেন যে সকালের জলখাবারের ব্যবস্থা এইসব দিয়েই যেন করি। তা'হলে খরচটাও খুব কম পড়বে এবং বেশ পুষ্টিকর খাবারও খাওয়া হ'বে। আবার জার্ম্মাণীর কথা উঠ্লো। মিঃ কার্থি বল্লেন যে একসময়ে তিনি জার্ম্মাণীর খুব ভক্ত ছিলেন, কিন্তু নাৎসীদের অত্যাচার ইত্যাদি নিজের চোখে দেখে জীবনে কখনও জার্ম্মাণীতে ফিরে যাবার ইচ্ছা আর তাঁর নেই। তিনি বল্লেন যে ওরা রক্তমাংসের মানুষ নয় কলের মানুষ। একটা গল্প বল্লেন একদিন ট্রেণ ২ মিনিট লেট হওয়াতে একটি বৃদ্ধা চীৎকার করে বল্তে লাগ্লো যে নিশ্চয়ই বিপ্লব আরম্ভ হ'য়েছে, সময়ও শৃঙ্খলা জ্ঞান এদের এত। নাৎসীরা ক্ষমতা পাবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক ইহুদি সুইজারল্যাণ্ডে পালিয়ে যায় এবং সেখানে জার্ম্মাণ মার্ক ভাঙ্গাতে তখন অনেক সময় শতকরা ৫০ ভাগ বাট্টা দিতে হ'য়েছে। মোটকথা মিঃ কার্থি দেখলাম জার্ম্মানদের উপরে হাড়ে চটেছেন। মিঃ কার্থি বল্লেন যে বিকালে তিনি আমাকে প্যান্থিয়ন (Pantheon) দেখাতে নিয়ে যাবেন। বিদেশী এবং একদম অপরিচিত এই ভদ্রলোক আমার জন্য যে রকম পরিশ্রম ও কষ্টস্বীকার করেছিলেন খুব কম আপনার লোকেও তা'করে থাকে। মিঃ কার্থির অফিস থাকায়, আমি রাস্তায় বেরিয়ে পড়্লাম। বেলা প্রায় ১১টার সময় বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দুটি ভারতীয় ছেলের সঙ্গে দেখা। আমাকে দেখেই একজন আমাকে জিজ্ঞাসা কর্লেন যে আমি ভারতীয় ছাত্রসমিতির অফিস চিনি কিনা। দুজনের মধ্যে একজন পাঞ্জাবী ও একজন মাদ্রাজী। তাঁদের নিয়ে ৯নং রু দ্য সমেরার্ডে গেলাম। সেখানে গিয়ে শুন্লাম যে সবাই (Sortie) সর্ত্তি—অর্থাৎ কেউ বাসায় নেই। দুপুর বেলা ক্ষুধার উদ্রেক হওয়াতে রাশিয়ান রেস্তোঁরাতে খেতে গেলাম। মিঃ কার্থিই আমাকে ওখানে খেতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। সেখানে ডাঃ বসুর সঙ্গে দেখা হোলো—তিনি আমাদের কোন কোন যায়গা দেখা দরকার বলে দিলেন এবং সে সব যায়গায় যাবার রাস্তাও যতদূরসম্ভব বাত্লে দিলেন। রাশিয়ান রেস্তোঁরা বলসেভিকদের আমলে পলাতক রাশিয়ানরা চালাচ্ছে। খাবার দাবার ব্যবস্থা খুব ভাল, খরচও খুব বেশী না। সে সময় ৬।৭ ফ্রাঁ খরচ কল্লে চমৎকার খানা পাওয়া যেতো। আমাদের

টেবিলে একটী ইংরাজী জানা মেয়ে পরিবেশন কর্ত্তো—তার বাপ ছিল জর্জ্জিয়ান, মা রাশিয়ান—আমেরিকানদের মত ইংরাজী বলে। তার জন্যে আমাদের কোনও অসুবিধা হোত না। মোট-কথা আমরা যে ক'দিন প্যারিসে ছিলাম প্রায় রোজই দু'বেলা রাশিয়ান রেস্তঁারাতেই খাওয়া নাওয়া কর্ত্তাম। মাদ্রাজী ভদ্রলোক গ্লাসগোতে থাক্‌তেন, মাদ্রাজ ইলেকট্রিক কোম্পানীতে কাজ কর্ত্তেন, ডিপ্লোমা নিতে ছুটী নিয়ে পড়্‌তে এসেছিলেন, তাঁর বয়স তখন প্রায় ৩৭।৩৮ বছর ছিল। পাঞ্জাবীটী খুবই কমবয়সী, বছর পঁচিশের মধ্যে, আমেরিকা থেকে ডাঃ অফ ফিলজফি হ'য়েছেন। দেশে ফিরে যাবেন। মাদ্রাজী ভদ্রলোকও দেশে ফিরে যাচ্ছেন বল্লেন।

খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা ডাঃ বসুর নির্দ্দেশমতে এফেল টাওয়ার দেখতে গেলাম। আমরা প্যারিসের আণ্ডারগ্রাউণ্ড বা মাটির তলা দিয়ে যে গাড়ী যায়—সেই টিউব ট্রেণে চড়লাম ৭০ সেন্টিম (১০০ সেন্টিমে ১ফ্রাঁ) দিয়ে টিকিট কিন্‌লে আরোহীর যেখানে ইচ্ছা একেবারে শেষ পর্য্যন্ত যেতে পারে, তবে একবার টিকিট দিয়ে বেরিয়ে এলেই সেই টিকিট বাতিল হয়ে গ্যালো। নতুন টিকিট ভিন্ন আর ভেতরে ঢুক্‌তে দেবেনা। এফেল টাওয়ারের টিউব ষ্টেশন হচ্ছে ত্রোকাদেরো—সেখান থেকে টাওয়ার ২।৩মিনিটের রাস্তা। এফেল টাওয়ারে ওঠবার জন্য বৈদ্যুতিক লিফ্‌টের বন্দেবেস্ত আছে, চারতালা বা স্তর এক এক তালার জন্য আলাদা আলাদা লিফ্‌টের বন্দোবস্ত। জনপ্রতি ১০ ফ্রাঁ নেয় উপরে উঠবার জন্যে। এক এক তালায় ১০।১৫ মিনিট করে অপেক্ষা কর্ত্তে হয় একটা লিফ্‌ট ওঠে ও একটা নামে। চারিদিকের দৃশ্য অতি চমৎকার। সহর এবং সহরের বাইরেও অনেক যায়গা দেখ্‌তে পাওয়া যায়। যদিও এফেল টাওয়ার পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্য্যের মধ্যে একটি, কিন্তু টাওয়ারটী অত্যন্ত বিশ্রী দেখ্‌তে। প্যারিসের মত সুন্দর সহরের উপরে এরকম অশোভন একটী স্তম্ভ বস্তু বেমানান ও বিশ্রী দেখা যায়। সিন নদী পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে, স্তম্ভের পাদমূলে খুব সুন্দর ও প্রকাণ্ড একটী বাগান। প্রত্যেক তলায় ২।৪টা দোকান ঘর, রেস্তোঁরা ইত্যাদি। এসব দোকানে এফেল টাওয়ারের নানা রকম প্রতিমূর্ত্তি, ছবি ইত্যাদি ও পেন্সিল বা কলমের গোড়ার দিকটা গর্ত্ত করে তাঁর মধ্যে খুব ছোট্ট একটা ফটো রেখে তার উপর ছোট একটা ম্যাগ্নিফাইং লেন্স দিয়ে মুখটা ঢেকে দেয়। লেন্সের ভেতর দিয়ে ছোট্ট ছবিটা অনেকটা বড় দেখা যায়—এই সব জিনিষ বিক্রী হয়।

(ক্রমশঃ)

বিনয় ঘোষ

দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সোরগোল পড়ে গেছে। শান্তি, মৈত্রী ও ঐক্য স্থাপনের আলাপআলোচনার মধ্যেও দৈনিক যেসব ব্যাপার ঘটছে তা আপাতঃদৃষ্টিতে উপেক্ষণীয় হলেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন ভারতবর্ষ থেকে ভূমধ্যসাগর ঘুরে ইউরোপে মালপত্তর পাঠাবার ইন্সিওরেন্সের হার প্রায় আটগুণ বেড়ে চারআনা থেকে ছু'টাকা হয়েছে। গত সেপ্টেম্বরের সঙ্কটের সময় এই হার দ্বিগুণ বেড়েছিল। আর একটি সংবাদ হচ্ছে যে সব বৃটিশ বাণিজ্যপোত বৃটিশ বন্দর থেকে অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ ও সুদূর প্রাচ্যে যাত্রা করবে তারা ভূমধ্যসাগরের ভিতরে প্রবেশ না করে' কেপ্ রুট্ ধরে যাবে। তাছাড়া গত ২২শে এপ্রিল 'P & O Company'র 'Viceroy of India' নামক যে জাহাজ বোম্বে অভিমুখে যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত ছিল, গবর্ণমেণ্টের আদেশানুসারে তার সমস্ত যাত্রীকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে বৃটিশ সৈন্যদের স্থান সঙ্কুলানের জন্য। হয়তো পরে সৈন্যবহনের অসুবিধা হবে বলে ভারতবর্ষের জন্য এই সৈন্যপ্রেরণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। হয়তো বা জিব্রালটরের দুর্গরক্ষার জন্য এই সৈন্যের প্রয়োজন হ'তে পারে। ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিস্ত স্পেন থেকে ইতালীয় সৈন্য ও জার্ম্মাণ কামাণের আক্রমনের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য প্রায় একশ'রও বেশী ইঞ্জিনিয়ার জিব্রালটরের নর্থ ফ্রন্টে ব্যারিকেড্ গঠনে ব্যস্ত। সূর্য্যাস্তের পর মোটর বা বাসে দুর্গের বাইরে যাওয়া বা ভিতরে প্রবেশ করা নিষেধ। এদিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নৌবিভাগ থেকে যে নৌবহর আত্লান্তিকে নৌ-পরিদর্শনের জন্য এবং নিউ ইয়র্ক ওয়াল্ড ফেয়ার পরিভ্রমণ করার জন্য যাত্রা করেছিল তাদের প্যাসিফিকে ফিরে আসার জন্য আদেশ করা হয়েছে। এইসব ছোট ছোট দৈনন্দিন ঘটনার সঙ্গে বাধ্যতামূলক সামরিক আইন এবং অস্ত্রোৎপাদনের শশব্যস্ততা যোগ দিয়ে যদি দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে অবশ্যম্ভাবী বলা যায় তাহ'লে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সে-ঘোষণাকে অযৌক্তিক আখ্যা দেওয়া যায় না। যুদ্ধ যখন হবেই, তখন এই যুদ্ধের জন্য দায়ী কে? কে কার পক্ষে ও বিপক্ষে যুদ্ধ করবে? যুদ্ধের ফল কি হবে। যুদ্ধ প্রতিরোধের কোন উপায় আছে কি না?

ডান্‌জিগ্ সমস্যা নিয়ে একটু বিরক্ত হ'য়ে হিট্‌লার একমাসের জন্য নিরিবিলিতে অবসর গ্রহণ করে তাঁর পরবর্ত্তী কর্ম্মসূচী সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। কিন্তু জার্ম্মাণ কূটনীতিকরা আলস্যে দিন কাটাচ্ছেন না। সম্প্রতি তুরস্কের কাছ থেকে কোনই সাড়া না পেয়ে তাঁরা বল্‌ক্যান সম্বন্ধে আরও বেশী তৎপর হয়েছেন। সোফিয়ার জার্ম্মাণ রাজদূত হেরভন্ রিশ্‌শোফেন্ কিছুদিন পূর্ব্বে বুলগেরিয়ার রাজা বোরিস্‌এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন এবং শোনা গেছে তাঁদের আলোচনার বিষয় ছিল রোম-বার্লিন 'অক্ষে'র সঙ্গে সামরিক চুক্তি। গ্রীস্ ও তুরস্কের নূতন হাবভাব এবং দার্দানেলজ্-এ বৃটিশের প্রভাবের বৃদ্ধি দেখে রোম-বার্লিন অক্ষের, বিশেষ করে ইতালীর প্রয়োজন হয়েছে আদ্রিয়াতিক দিয়ে আলবেনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখায় এবং সেইজন্য একান্ত প্রয়োজন যুগোশ্লেভিয়াকে 'neutralise' করা; প্রিন্স পল এইজন্যই ইতালী যাত্রা করেছিলেন। ভন্ রিশ্‌শোফেন্ স্পষ্টই বুলগেরিয়ার রাজাকে জানিয়ে দিয়েছেন যে যুদ্ধ বাধলে এ্যাক্সিস্ সৈন্যবাহিনী উত্তর আল্‌বেনিয়া থেকে কন্‌স্ট্যান্‌টিনোপোলের দিকে যাত্রা করবে এবং সেইজন্য বুলগেরিয়ার রাষ্ট্রীয় মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে তাঁরা সক্ষম হবেন না। কিন্তু বুলগেরিয়া যদি তাঁদের সঙ্গে সামরিক চুক্তি করে তা হ'লে জার্ম্মাণীর কাছ থেকে তার পরিবর্ত্তে সীমান্তের রিভিশন্ পাওয়া সম্ভব হবে এবং গ্রীসের সঙ্গে বুলগেরিয়ার সীমান্তকে এমনভাবে সংস্কার করা হবে যাতে গ্রীক্ মেডিটারেনিয়ান উপসাগর পর্য্যন্ত পৌঁছান যায়। বুলগেরিয়ার রাজা কি উত্তর দিয়েছেন এখনও জানা যায় নি, তা হ'লেও তিনি যে রাজী হবেন তা কতকটা অনুমান করা যায় কারণ তাহ'লে ইউরোপীয় কর্ম্মক্ষেত্রে বুলগেরিয়ার প্রাধান্য কিছু স্বীকৃত হবে। সম্প্রতি জার্ম্মাণ নাৎসী চরদের উস্কানিতে হাঙ্গেরীও ৩৯টি শ্রমিক সিণ্ডিকেট্ এবং হাঙ্গেরীয়ান্ সোশ্যালিষ্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করেছে। তাহ'লে অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, যুগোশ্লেভিয়া আলবেনিয়া এখন ফ্যাশিস্ত অক্ষের আয়ত্তাধীনে এবং হিট্‌লারের পক্ষে প্রাচ্যাভিযানও এখন সুবিধাজনক।

ওদিকে পোল্যাণ্ডের অবস্থা কি? ডানজিগ্ ও পলিশ্ করিডর সম্বন্ধে হিট্‌লারের শেষ কথার উত্তরে পোল্যাণ্ড তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বটে, কিন্তু কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত কর্ণেল বেকের ইউরোপে নাৎসী চর বলে খুব খ্যাতি ছিল। অবশ্য ডানজিগ্ হারালে পোল্যাণ্ডের বিশেষ ক্ষতি হবে, এমন কি পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা পর্য্যন্ত বজায় রাখা কঠিন হ'য়ে উঠবে। ডাঃ হেন্‌রি ষ্ট্রাজ্‌বুর্গার তাঁর "The Danzig Question" নামক পুস্তকে বলেছেন (p. 33) –"We are profoundly convinced that the loss of Danzig would not only mean a temporary eclipse, but it would inevitably involve the loss of Pomorze, (the greatest part of Polish Corridor) and of the independence of Poland." এই মত অনেক পোলই পোষণ করেন, কিন্তু তা হ'লেও ডান্‌জিগের তৃতীয় রাইখের অন্তর্ভুক্ত হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। যদি পোল্যাণ্ড একবার তাদের অর্থনৈতিক দাবী সম্বন্ধে

জার্ম্মাণীর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পায় এবং হিট্‌লার যদি ডান্‌জিগ্‌কে পোল্যাণ্ডের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ধ্বংস করার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করবেন না এই প্রতিশ্রুতি দেন, তা হ'লে পোলাণ্ডের দিক্ থেকে গররাজি হবার শেষ পর্য্যন্ত হয়তো কিছু নাও থাকতে পারে। আরও একটা বিষয় এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য। পোল্যাণ্ড জানিয়েছে যে ডান্‌জিগ্ ও করিডরের কোন 'unilateral change' তারা বরদাস্ত করবে না অর্থাৎ 'bilateral change-এতে তাদের আপত্তি নেই। সুতরাং একটা সন্তোষজনক রফার সম্ভাবনা পোল্যাণ্ডের দিক্ থেকে নেই এ-কথা বলা চলে না এবং ধুরন্ধর হিট্‌লার যে তার সদ্ব্যবহার করবেন সে বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

বিনা রক্তপাতে ঐন্দ্রজালিক শক্তি প্রয়োগ ক'রে অষ্ট্রিয়া চেকোশ্লোভাকিয়ার মত ডান্‌জিগ্ জয় করার আরও সুবিধা হচ্ছে হিট্‌লারের, কারণ 'Peace Front' গঠনের জন্য সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সকে নিয়ে একটি ত্রিশক্তি চুক্তি করতে গ্রেট্ বৃটেনের দ্বিধা এখনও দূর হয় নি। পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও গ্রীসকে গ্রেট্ বৃটেন ফ্যাশিস্ত আক্রমণ থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, কিন্তু কার্য্যতঃ সে প্রতিশ্রুতি পালন করা বৃটেনের পক্ষে সম্ভব নয় রাশিয়ার সহায়তা ব্যতিরেকে। এ-কথা লয়েড্ জর্জ্জ কমন্স সভায় বলেছেন : "The Prime Minister and his Government have guaranteed to go to the aid of Poland, Rumania and Greece ....Without Russia these three guarantees to Poland, to Rumania and to Greece are the most reckless commitments that any country has ever entered into......Did the General Staff advise the Government before they entered into these commitments that they were safe, that they were redeemable, and that there was the slightest chance of achieving victory? If they ever did, they ought to be removed from the War Office and confined to a lunatic asylum. They are utterly impossible without Russia."

বৃটেনের সমরবিভাগের কর্ম্মকর্ত্তাদের পাগলা-গারদে পাঠান উচিত কিনা সে-কথা পরে বিবেচ্য, কিন্তু তাঁরা যে পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও গ্রীস্‌কে নিজেদের খেয়ালে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন সে-কথা সত্য। বৃটেন রাশিয়ার সঙ্গে যে চুক্তি করতে না চায় তা নয়, কিন্তু এই চাওয়ার মধ্যে অনেক ভেজাল আছে। এই ভেজালের জন্যই এত আলোচনার পরও আজও কোন চুক্তি হওয়া সম্ভব হয় নি এবং মোলোটভ্ তাঁর সর্ত্তগুলি পরিষ্কার ভাষায় পেশ করেও বৃটেনের দিক্ থেকে কোন সন্তোষজনক জবাব পাচ্ছেন না। বৃটেন চায় রাশিয়ার উচিত পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়া সম্বন্ধে প্রতিশ্রুতি দেওয়া যেমন বৃটেন ও ফ্রান্স দিয়েছে এবং এই সর্ত্তে বৃটেন ত্রিশক্তি চুক্তি করতে রাজী আছে। রাশিয়া চায় আরও বৃহত্তর সর্ত্তে চুক্তি করতে। রাশিয়া চায় তার উত্তরের প্রতিবেশী বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলিকে গ্রেট্ বৃটেন ও ফ্রান্স ফ্যাশিস্ত আক্রমণ থেকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিক্ এবং

তার পরিবর্ত্তে সে পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়াকে প্রতিশ্রুতি দেবে। এক কথায় ইউরোপের শান্তিরক্ষার্থে যে সব প্যাক্ট্ হয়েছে তারই সুদৃঢ় ভিত্তি হিসাবে গ্রেট্ বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে একটা বৃহত্তর চুক্তি হোক্ এই হ'ল রাশিয়ার ইচ্ছা। অর্থাৎ রাশিয়া চায় 'reciprocity', কিন্তু গ্রেট্ বৃটেন তা চায় না। রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ড সম্বন্ধে রাশিয়ার কাছ থেকে পৃথক্ প্রতিশ্রুতি গ্রহণের উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে গ্রেট্ বৃটেন জানে যদি রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ডের উপর আক্রমণ হয়, নিজের স্বার্থের দিক্ থেকে এবং আত্মরক্ষার জন্যও বটে রাশিয়াকেই প্রথমে তা হ'লে অস্ত্র ধরতে হবে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে। বর্ত্তমান ইউরোপের অবস্থার দিক্ থেকে রাশিয়ার গ্রেট্ বৃটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য একটা চুক্তি করার আবশ্যকতা আছে স্বীকার করি,.কিন্তু এ-কথাও ঠিক যে আগামী সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে রাশিয়া অহেতুক নিজের ক্ষতি স্বীকার ক'রে জড়িত হ'তে যাবে না। সে-কথা ষ্ট্যালিন অনেকবারই পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং গ্রেট্ বৃটেন, ফ্রান্স ও রাশিয়ার মধ্যে একটা ত্রিশক্তি চুক্তি হবার কোন নিকট সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না, কারণ চেম্বারলেনের "all the support in Britain's power"—এ-কথার বুনানি আদৌ ঠাসা নয়, এর মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক আছে। নাৎসী প্রেস্ এর মধ্যেই 'encirclement'-এর কলরব তুলেছে এবং চেম্বারলেনও বলেছেন "We have to consider not only what we wish but also what other people are willing to do." এই 'other people' কারা? নিশ্চয়ই আক্রমণকারীরা, কারণ শান্তিকামী ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির কি ইচ্ছা তা বিবেচনা করার কিছু নেই। তা ছাড়া চেম্বারলেনই বলেছেন যে তাঁর প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষা করবেন "in the event of any action clearly threatening the independence of Greece or Rumania which the Greek and Rumanian Governments decide to resist." এইখানে 'clearly' কথাটি এবং 'which the Greek and Rumanian Governments decide to resist' এই বাক্যাংশটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার আছে। গ্রীস ও রুমানিয়ার স্বাধীনতা 'পরিষ্কার ভাবে' বিপন্ন হবে এবং 'যা গ্রীক্ ও রুমানিয়ান্ গবর্ণমেণ্ট প্রতিরোধ করতে দৃঢ়সঙ্কল্প হবে', এ-সব কথার অর্থ এক চেম্বারলেনের অভিধানে পাওয়াই সম্ভব। মোদ্দা কথা আজও বাক্যনবাবি ছেড়ে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন সাহেব প্রাঞ্জল ভাষায় কথাবার্ত্তা বলতে রাজী নন। সুতরাং আমরাও ইউরোপে গ্রেট্ বৃটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট্ রাশিয়ার মধ্যে একটা ত্রিশক্তি চুক্তি করে 'Peace Front' গঠনের যে চেষ্টা চলেছে তার পরিণাম সম্বন্ধে যদি ব্যর্থতার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ি তা হ'লে বোধ হয় খুব নিন্দনীয় নৈরাশ্যবাদী ব'লে আমাদের কেউ অপবাদ দেবে না।

বাধ্যতামূলক সামরিক আইন প্রবর্ত্তন করে' বৃটিশ ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্ট আত্মরক্ষা ও ফ্যাসিস্ত আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করছে। ২৫ বছর আগে যে শ্লোগান তুলে, (আপনার রাজা এবং আপনার দেশ আপনাকে চায়) দেশের জনসাধারণকে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল, আজও ঠিক সেই রকম চেষ্টা চলেছে। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে শান্তিরক্ষার জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি

প্রবর্ত্তন করছেন একথা বৃটিশ শ্রমিকেরা বিশ্বাস করে না। বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির সঙ্গে দেশের জন্য অর্থদানও বাধ্যতামূলক করা হোক্ এই মর্ম্মে এক সংশোধন প্রস্তাব উঠিলে সদস্যদের মধ্যে বিদ্রূপের ধ্বনি ওঠে। বিদ্রূপত হবেই, কারণ কামানের খোরাক্ হবে বৃটিশ জনগণ আর ধনিকদের মুনাফার হার দিনের পর দিন বেড়েই চলবে। সম্প্রতি বৃটেন ও রুমানিয়ার মধ্যে যে বাণিজ্য চুক্তি হয়েছে তাঁতে বৃটিশ অস্ত্রকারখানা ও তৈল কোম্পানীগুলি বিশেষ লাভবান হবে। অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মানের জন্য ফ্যাসিস্ত শক্তিগুলির নিকট খনিজ ও রাসায়নিক দ্রব্য বিক্রয় করে' বৃটিশ ধনিকগোষ্ঠী প্রভূত লাভ করেছেন। অথচ চেম্বারলেন গবর্ণমেণ্টের উপর ভুল বিশ্বাস লেবর পার্টির আজও যায় নি। সম্প্রতি সাউথপোর্ট কনফারেন্সে লেবর পার্টি বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির বিরোধিতা করবার একটি প্রস্তাব বাতিল করে' দিয়েছে এবং লেবর, লিবারেল ও কম্যুনিষ্ট পার্টির সহযোগিতায় ন্যাশনাল গবর্ণমেণ্টকে বিতাড়িত করবার জন্য ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপ্‌স্ যে একত্রীভূত দলসমষ্টি গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাও সেদিন পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করা হয়েছে কিন্তু এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে চেম্বারলেন সাহেব বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তিকে "as the thin end of the wedge to introduce boiled-shirt fascism" হিসাবে ব্যবহার করতে চান এবং লেবর পার্টির নির্ব্বুদ্ধিতার আজও যখন অবসান হয় নি তখন লেবর পার্টি যে গবর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়ে সোভিয়েট্ রাশিয়ার প্রস্তাব স্বীকার করে নিতে বাধ্য করাবে তা বিশ্বাস হয় না। বৃটেনে যদি আজ পপুলার ফ্রণ্ট্ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হয় তা হ'লে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তি প্রবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন হবে না এবং বৃটেন, ফ্রান্স ও সোভিয়েট রাশিয়াকে নিয়ে একটি ত্রিশক্তি চুক্তি করে' শান্তি-মোহড়া গঠনও সম্ভব হবে। কিন্তু চাবিকাঠি রয়েছে লেবর পার্টির হস্তে এবং এ বিষয়ে লেবর পার্টির চেতনা সম্বন্ধে আমরা গত মহাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকেও অনেকখানি অবগত আছি। তাই মনে হয় ইউরোপে ত্রিশক্তি চুক্তির উপর ভিত্তি গড়ে' ফ্যাশিস্ত বিরোধী শান্তি-মোহড়া গঠনের আশা সুদূর-পরাহত।

ফ্যাশিস্ত আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা দিন দিন যতই পিছিয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীব্যাপী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির আধিপত্য ততই বেড়ে চলেছে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের চীন-শোষণ ও লুণ্ঠন পূর্ণোদ্যমে চলেছে। আজ পর্য্যন্ত গ্রেট্ বৃটেন, ফ্রান্স, ও আমেরিকা জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য বিশেষ কিছু চেষ্টা করে নি। জাপান যখন মাঞ্চুকুও ও উত্তর চীন থেকে এক জাপানী ভিন্ন অন্যসব ব্যবসাবাণিজ্য বন্ধ করে' দিলে এবং সাংহাই-এর দিকে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল তখনও এরা সব নীরব ছিল। তারপর হাইনান দ্বীপ অধিকার করে ইন্দোচীনের দ্বার পর্য্যন্ত এগিয়ে গেল জাপান। তারপরই অধিকার করলে স্প্র্যাট্‌লে দ্বীপ। জাপানের এই ঔদ্ধত্যের কারণ হচ্ছে সুদূর প্রাচ্যে ইঙ্গ-আমেরিকান্ প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং বৃটিশের রুষ-বিদ্বেষ। সম্প্রতি ইউরোপে শান্তি-মোহড়া (peace front) গঠনের প্রস্তাব ও আলোচনা আরম্ভ হওয়ায় এবং চীনে জাপানী অস্ত্রশস্ত্র আমদানী বন্ধ হওয়ায় চীনেরা জাপানের উপর প্রতিআক্রমণ সুরু করেছে। চীনা সৈন্যবাহিনী

উত্তর ছুপে প্রদেশের উপর প্রতিআক্রমণ করে' শত্রুপক্ষের অর্থাৎ জাপানীদের বহু ক্ষতি করেছে। ইতিমধ্যে জাপাম কুলাংসু দ্বীপের অন্তর্জ্জাতিক এলাকা আক্রমণের চেষ্টা করেছিল সাংহাই ও তিয়েনৎসিন পর্য্যন্ত অভিযানের পথ পরিস্কার করার জন্য। মিউনিসিপ্যাল্ কাউন্সিলের কাছে জাপান কতকগুলি দাবী পেশ করে এবং সেই দাবী যাতে গ্রাহ্য হয় সেই জন্য একদল ব্লু জ্যাকেটস্ সেখানে প্রেরণ করা হয়। মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল, বৃটিশ, ফরাসী ও আমেরিকানদের সঙ্গে যুক্তি করে' জাপানের দাবী অগ্রাহ্য করে এবং কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধজাহাজ থেকে বৃটিশ, ফরাসী ও আমেরিক্যান্ সৈন্যবাহিনী সশস্ত্রে সেই স্থানে পৌছায় এবং জাপানীরাও বেগতিক দেখে হটে যায়। এই হ'চ্ছে সর্ব্বপ্রথম তিনটি শক্তির জাপানের বিরুদ্ধে মিলিত প্রতিরোধ। ভবিষ্যতে কতদূর এই মনোভাব বজায় থাকবে তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে বর্ত্তমানে শান্তি মোহড়া গঠনের জন্য যে ইঙ্গ-ফরাসী সোভিয়েট্ আলোচনা হ'চ্ছে তার পরিণতির উপর। ত্রিশক্তি চুক্তি যদি সম্ভব হয় এবং শান্তি-মোহড়া গঠন সম্ভব হয় তাহ'লে জাপানের সাম্রাজ্যবাদী অভিযানেরও যবনিকা পতন হবে।

ওদিকে ইউরোপে 'Peace Front', এদিকে ভারতবর্ষে 'Forward Bloc'। 'শান্তি-মোহড়া' প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাশিস্ত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে, 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গান্ধীবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসসাইট্দের বিরুদ্ধে। উভয়ই যুক্তিসঙ্গত ও সমর্থনযোগ্য এবং উভয়েরই সাফল্য আমরা আন্তরিক কামনা করি। তবে 'ফরোয়ার্ড ব্লক্' সম্বন্ধে একটু বলা উচিত কারণ ইউরোপের' 'শান্তি ফ্রন্ট' ও আমাদের 'ফরোবার্ড ব্লকের' মধ্যে প্রভেদ খানিকটা আছে। ফরোয়ার্ড ব্লক্ 'non-violent non cooperation,' 'office acceptance' প্রভৃতি সমর্থন করে, কংগ্রেসের বাইরে কোন বিরুদ্ধ দলও নয়, শুধু যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের বিরোধিতা করার পদ্ধতি তার পৃথক। ন্যরীম্যান্ আগামী ২০শে জুন বোম্বেতে একটি নিখিলভারত ফরোয়ার্ড কনফারেন্স আহ্বান করেছেন। এই কনফারেন্সে ফরোয়ার্ড ব্লককে শক্তিশালী করার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হবে এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি কর্ম্মসূচী ঠিক করা হবে। স্বরাজ পার্টির মত প্রত্যেক প্রদেশে ফরোয়ার্ড ব্লকের কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ফরোয়ার্ড ব্লক্ কংগ্রেসের মধ্যে বিরুদ্ধবাদী দলের (opposition) কাজ করবে যেমন প্রত্যেক গণতান্ত্রিক দেশে বিরুদ্ধবাদী দল করে থাকে। একটি সুসংবদ্ধ বিরুদ্ধবাদী দলের অভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে এবং সেইজন্যই Congress High Command-এর মধ্যে ডিক্টেটরী মনোভাব জেগেছে। সুতরাং ফরোয়ার্ড ব্লক্ সমস্ত প্রগতি পন্থী দলগুলির সহযোগিতার একটি সুসংহত বিরুদ্ধ দল হিসাবে গড়ে উঠুক এ প্রত্যেক স্বদেশের শুভাকাঙ্ক্ষীই ইচ্ছা করেন। কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টি যোগ দেবে না জানিয়ে দিয়েছে এবং এতে যথেষ্ট ক্ষতি হবে। Opposition Partyর parliamentary Function সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকলে কংগ্রেস সোশ্যালিষ্ট পার্টির এ সিদ্ধান্তকে বিবেচনাহীন বল্লেও অন্যায় হবে না। সেই দিক থেকে দেশবাসীর ফরোয়ার্ড ব্লককে সমর্থন করা কর্ত্তব্য এবং আমরা ইউরোপের শান্তিফ্রণ্টের সঙ্গে ভারতের ফরোয়ার্ড ব্লকের সত্বর সাফল্য একান্ত কামনা করি। [৭ই জুন, ১৯৩৯, কলিকাতা]।

গ্রন্থ-পরিচয়

The Industrial worker in India

—B. Shiva Rao, Allen & Unwin, 1939, 10/6d.

আলোচ্য গ্রন্থে ভারতীয় শ্রমজীবিদের দৈনন্দিন জীবন কারখানায় ও বাইরে কি ভাবে কাটে তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক বস্তুনিষ্ঠ ভাবে বেতন, খাওয়া পড়া, বাসস্থান, ঋণ, কুলিসংগ্রহ, শ্রমিক আইন প্রণয়ণের জন্য কাপড় ও পাটের কলে এবং খনিতে কি পরিবর্ত্তন এসেছে তা আলোচনা করেছেন। ১৯২৯ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে আভ্যন্তরীণ গোলমালের পর, চমনলাল, শিবরাও প্রমুখ ক'জন ট্রেডস ইউনিয়ন ফেডারেশন স্থাপন করেন। ট্রেডস ইউনিয়নে সাম্যবাদের ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাব ও আতঙ্ক এ ঝগড়ার মূলে অনেকখানি ছিল। গ্রন্থকার উদারনৈতিক মতবাদ ও গবর্ণমেণ্ট ঘেঁষা মনোভাব নিয়ে ভারতের শ্রমিক সমস্যা আলোচনা করেছেন। কাজেই সমস্যাগুলির মৌলিক বিশ্লেষণ করা তার প্রতিকার কল্পে কোন সবল নির্দেশ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয় নি।

তার মতে সমরোত্তর কালে ভারতবর্ষে ট্রেড্ ইউনিয়মিজম্ সুরু হওয়ার কারণ হল: রাজনৈতিক আন্দোলন, জাতীয়তার আদর্শ, জিনিষ পত্রের মূল্য বৃদ্ধি ও মহামারীর ফলে জন সাধারণের দুর্গতি ইত্যাদি। এগুলি খুব ভাসাভাসা কথা। ট্রেড ইউনিয়ন দ্বারা শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের মূলে গভীর অর্থনৈতিক কারণ আছে একথাটা স্পষ্টভাবে স্বীকার করার মত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রন্থকারের একান্ত অভাব। যন্ত্রশিল্প, কৃষি, জন সংখ্যা, স্বাস্থ্য, খাদ্য সরবরাহ, শ্রমিক সংগঠন, ধর্ম্মঘট, সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায় আলোচনা করেছেন।

শ্রমিক আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অনেক আছে, কারণ অর্থনৈতিক সমস্যাই এখন ভারতের বড় সমস্যা। এ সমস্যা দিন দিনই জটিল আকার ধারণ করবে! কাজেই 'This movement is bound to gain strength' এবং ব্যাপক শ্রেণীসংগ্রামে পরিণতি নিবে! এ সংগ্রাম ভবিষ্যতে কিরূপ নিবে এবং line-up কি ভাবে হবে লেখক উপসংহারে তার আভাষ দিয়েছেন।

'The struggle, in fact, must sooner or later assume a new aspect. Landlords, millowners, industrial magnets, whether British or Indian, will all be drawn closer together to fight the growing power of the working classes in India whether the struggle will end in a peaceful readjustment of the social & econmic order without serious dislocation or bloodshed will depend on the willingness of the 'haves 'to make the necessary sacrifice.'

The Military Strength of the Powers :

Max Werner, Gollancz. 7/6d.

ইউরোপীয় রাজনীতিতে সোভিয়েট্ রাশিয়ার 'লালফৌজ' (Red Army) একটী বিশিষ্টস্থান অধিকার করেছে। আলোচ্য গ্রন্থে রাশিয়ার সৈন্যবল, তার সংগঠন, সমরায়োজন ও সেনানায়কদের রণচাতুর্য্য (Strategy) সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ১৯৩০ সালের জাতীয় বাহিনীরূপে যে সেনাদল শুধু বহিরাক্রমণ হতে রাশিয়াকে রক্ষা করার জন্য সংগঠিত হয়েছিল, তা আজ অপ্রমেয় শক্তি হিসাবে ওদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইহা এত পরাক্রান্ত ও সমর কৌশলে সুনিপুণ হয়েছে যে পৃথিবীর যে কোন শক্তির আক্রমণ হতে রাশিয়াকে রক্ষা করতে পারে।

জাতির সমর শক্তি ('war potential') গ্রন্থকারের মতে নির্ভর করে, যুদ্ধোপকরণ তৈরী করার কারখানা ও সেজন্য কাঁচামাল, সৈন্যদের খাদ্য সরবরাহ, এবং যুদ্ধ ঘোষণার পূর্বে রণসম্ভার ও সৈন্য সমাবেশে তৎপরতা। উক্ত যে কোনও বিষয়ে সোভিয়েট্ রাশিয়া নাৎসী জার্ম্মেণীর চেয়ে অগ্রগামী কিন্তু অন্য তিন দিকে জার্মেণীর শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদী। জার্ম্মেণীর অর্থ সম্পদ্ অধিক কেন্দ্রীভূত, সহজপ্রাপ্য এবং সাড়া দেশে বিস্তৃত নয়। অধিকন্তু সমর বিদ্যায় জার্ম্মেণীর বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও ইতিহাস রয়ে গেছে। কিন্তু জার্ম্মেণীর এসকল সুবিধা নষ্ট হয় তার খনিজ সম্পদের অভাবে। রাশিয়ার ন্যায় তেল, লোহা, এলুমিনিয়াম, প্রভৃতি অপর্য্যাপ্ত কাঁচামাল জার্ম্মেণীর নেই। তদোপরি 'লাল ফৌজ' যা 'in 1938 even without its special Far Eastern forces—had more than a twofold superiority in aeroplanes and tanks over German army.'

সমর নীতি সম্বন্ধে যে সকল বিশেষজ্ঞের মতামত উল্লেখ করেছেন 'mechanised total time-table war' উল্লেখযোগ্য। এ মতানুসারে ট্যাঙ্ক ও বিমান বহরের সাহায্যে বর্ত্তমান

রণকৌশল ও আক্রমণ পদ্ধতি একবারে বদ্‌লে গেছে। পরিখায় আত্মরক্ষা করে আজকাল আর যুদ্ধ চলে না, কারণ গ্যাস্ ও বিমানের আক্রমণ সর্ব্বত্রই চলে। শত্রুকে নিঃশেষিত করাই বর্ত্তমান যুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য। শুধু 'battle-front' বিধ্বস্ত হলে সে চরম বিলোপ হয় না, শত্রুর আভ্যন্তরীণ প্রদেশগুলির ধ্বংস করা উচিত। বর্ত্তমান যান্ত্রিক সমর কৌশল 'permit the simultaneous defeat of the enemy along the whole of his battle front and throughout the whole depth of his position.' এ সবকিছুই পূর্ব্বে plan করে বোমা, ট্যাঙ্ক ও গ্যাসের সাহায্যে ঘড়ীর কাঁটায় কাঁটায় সম্পন্ন করা। এ বইখানা জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) প্রকাশিত 'Armament Year Book' এরই অনুপূরক। বর্ত্তমান সমরায়োজন সম্বন্ধে অনেক তথ্যপূর্ণ বিষয় এতে আলোচিত হয়েছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক পড়লে উপকৃত হবেন নিঃসন্দেহ।

বলাকা

৩য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, মে, ১৯৩৯। সম্পাদক—দুর্গাপদ দাশ

বলাকার মে সংখ্যা আমরা পেয়েছি। 'সাহিত্যিক প্রগতি'-শীর্ষক প্রবন্ধটি বুদ্ধদেব বাবুর সুরমা উপত্যকা প্রগতি লেখক সম্মেলনে পঠিত অভিভাষণের পুনর্মুদ্রণ। এ প্রবন্ধটি বেশ সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক ও অনেক প্রগতিশীল লেখকের বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

কবিতাগুলি যুগধর্মের কাঠিন্য ও কচি-সংসদের হা-হুতাশের অপূর্ব সংমিশ্রন হলেও প্রগতি-সাহিত্যসৃষ্টির অনুকূল হবে কিনা সন্দেহ। 'এই তো জীবন'-শীর্ষক গল্পটিতে 'passive suffering' আছে কিন্তু সাহিত্য ও গল্প দু'য়েরই এতে অভাব।

রিভিয়ু (পুস্তক-পরিচয়) গুলি মন্দ হয় নি। প্রগতি-সাহিত্যসৃষ্টি দ্বারা বলাকা সত্যিকার 'বলাকা' হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক অভিপ্রায়।

শৈলেশ রায়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীঅনিলবরণ রায়। ১ম খণ্ড ৮৹; ২য় খণ্ড ১৶৹।

ভারতীয় দর্শনে গীতার স্থান কি, সে আলোচনা আজ পুরোণো হয়ে গেছে। এতোবার এতো রকমের বিচার-বিবেচনা এ বিষয়ে হয়েছে যে তার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মানুষের জীবনে প্রশ্নের অবধি নেই। কিন্তু তার মধ্যে দার্শনিক প্রশ্ন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে এমন লোক

আজকাল বিরল। খেয়ে-পরে বাঁচবার সমস্যা আজ নিষ্ঠুর ও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। শুধু বেঁচে থাকবার তাড়নায় মানুষের অস্থিরতার অন্ত নেই। তাই আজকালকার ভারতে এই গভীর ও গম্ভীর শাস্ত্রের চাহিদা কমে গেছে। তবু এমন লোক আছে যাঁদের মস্তিষ্কে চিন্তার কীট-দংশন অহরহ জ্বালা সৃজন করে থাকে; যাঁরা জীবন-মৃত্যু নিয়ে, ভূত-ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত হন। এমন লোক যাঁরা তারাই মানুষের চিন্তানায়ক। তাঁরা সন্ধানী-দৃষ্টি নিয়ে জীবন-মরণের তলদেশে অভিযান করেন। গীতাশাস্ত্র যিনি সৃজন করেছেন তিনিও চিন্তানায়ক হয়ে বিবিধ প্রশ্নের অবতারণা ক'রে তার সমাধান উপস্থিত করেছেন। এ সমাধান কি, তাই নিয়ে আমাদেরও সমস্যা। কারণ গীতাকারের সমাধান নিয়ে পণ্ডিতেরা একমত হতে পারেন নি। মধ্যযুগীয় বিভিন্ন সম্প্রদায় তাদের স্ব স্ব ধারণা অনুযায়ী গীতার মতবাদের ব্যাখ্যা করেছেন। বেদান্তী ও বৈষ্ণবী ব্যাখ্যা, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী কিম্বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা, কর্ম্ম, জ্ঞান, বা ভক্তিমূলক ব্যাখ্যা—ইত্যাদি ব্যাখ্যার ওপরে আবার আধুনিক মনিষীদের ব্যাখ্যা রয়েছে, যথা, বঙ্কিমী ব্যাখ্যা, তিলকের ব্যাখ্যা, গান্ধীয় ব্যাখ্যা এবং শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা। আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোকেদের এই নানা ব্যাখ্যার বৈচিত্র্যে বুদ্ধিবিভ্রাট উপস্থিত হয়। অথচ দার্শনিক সমুদ্রের গহন জলে যাঁরা নাব্‌তে চান, তাঁদের এই সব ব্যাখ্যার সঙ্গেই পরিচয় রাখ্‌তে হবে। না রেখে উপায় নেই।

শ্রীঅরবিন্দ বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় মনিষী। তাঁর "Essays on Gita"কে দর্শন ও সমাজতত্ত্বের একখানা ক্লাসিক বলা চলে। এতে ক্রমবিকাশতত্ত্ব, জন্মান্তরবাদ, নিয়ন্ত্রণবাদ (Determinism), সমাজ-বিবর্ত্তন, যুদ্ধসমস্যা, হিংসা-অহিংসাতত্ত্ব, জাতিভেদ, ইত্যাদি নানা সমস্যার অনুপম বিচার রয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ একটা বিশিষ্ট দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের প্রতিনিধি ও প্রতীক্। ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সমাজগঠনে তাঁর মতবাদের ব্যাপক মূল্য আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে লেখা হয়েছে। মাত্র দুটো অধ্যায় এই দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এই হিসেবে ১৮ খণ্ডে বইখানা শেষ হবে মনে হচ্চে। এই বইখানা যে-প্রণালীতে লেখা হোয়েছে তাতে বাঙালী জিজ্ঞাসুদের অপরিমিত উপকার হবে সন্দেহ নেই।

অরবিন্দ-ভাষ্যের মূল কথা হলো ভক্তিবাদ। কিন্তু এই ভক্তি কেবল নির্বিশেষ ও অবিমিশ্র ভক্তি নয়। এ হলো জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রবর্ত্তিত ভক্তি। জ্ঞান-কর্ম্ম-সমুচ্চয়-বাদ এবং পুরুষোত্তম-বাদ, এই দুটো বিশিষ্ট মতবাদের ভিত্তিতে এ ব্যাখ্যান রচিত হয়েছে। শাঙ্কর মায়াবাদের বিরুদ্ধে শ্রীঅরবিন্দ প্রবল প্রতিবাদ উত্থাপিত করেছেন। মায়াবাদের সৃষ্টি হলো সন্ন্যাসবাদ এবং সন্ন্যাসবাদই ভারতের জনগণকে ইহবিমুখ, সংগ্রাম-কাতর অমানুষে পরিণত করেছে। তাই তিনি সমুচ্চয়-বাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু বিনয়ের সহিত আমরা একটা জিজ্ঞাসা উত্থাপন করছি শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় মহাশয়ের কাছে: শাঙ্কর বেদান্ত কি সত্যিসত্যি জগৎটাকে উড়িয়ে দিতে চায়? ভারতের জনসাধারণ কি মায়াবাদের অপব্যাখ্যার দ্বারাই প্রভাবিত হয়ে পৃথিবী-বিমুখ মনোভাবকে বরণ করে নি?

"সদসদ্‌ভ্যাম্ অনির্ব্বচনীয়ং"—এ কথার মানে কি? জগৎটাকে যে সদ্বস্তু বলা চলে না, এ কথা অনিলবাবুও স্বীকার করেছেন। যথা ৬৯ পৃষ্ঠায় আছে, "তেমনিই আমরা প্রকৃত সদ্বস্তু দেখিতে পাই না। যাহা দেখি তাহা সেই সত্য বস্তুরই ভ্রান্ত, বিকৃত রূপ" ইত্যাদি। তেমনি শাঙ্কর মতে জগৎটাকে "অসৎ" বলাও হয় নি। শশবিষাণ, আকাশ-কুসুম প্রভৃতির মত জগৎটাকে "অলীক" বলা শাঙ্কর মতে অন্ততঃ চলে না। জগৎটা হচ্চে মায়াবাদীয় পরিভাষায়,—"মিথ্যা"। এই "মিথ্যাত্ব" শব্দের অর্থ কি? যার তিন কালে অস্তিত্ব আছে তাকে বলা হয়েছে "সৎ"। যার তিন কালেও অস্তিত্ব নেই, তাকে বলা হয়েছে "অসৎ"। মিথ্যা এবং অসৎ কিন্তু এক অর্থ নয়। "মিথ্যা" হলো সেই সব পদার্থ যাদের "সৎ"-ও বলা চলে না, "অসৎ"-ও বলা চলে না। জগৎটা সৎ বা নিত্যকালীয় নয়; অসৎ বা অলীক বা অস্তিত্বহীন নয়। জগৎ হচ্চে "মিথ্যা", মানে এর খণ্ড ও সাময়িক অস্তিত্ব আছে। কাজেই শাঙ্কর মতে জগতের "পারমার্থিক" সত্তা নেই, কিন্তু "ব্যবহারিক" সত্তা রয়েছে।

আমরা এই ভাবেই শাঙ্করবাদকে বুঝেছি। শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণণও শাঙ্কর মায়াবাদকে বাস্তব-বাদ (Realism) বলে অভিহিত করেছেন। যে মতবাদ বলে, জগৎটার অস্তিত্ব নিতান্ত অস্মদীয় (subjective), তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলে থাকে "দৃষ্টিসৃষ্টিবাদ"। এ হলো একেবারে অমিশ্র Solipsism. কিন্তু শাঙ্করবাদ solipsistic নয়, এ কথা বোধ হয় আজকাল বহুস্বীকৃত।

আরেকটী কথা উল্লেখযোগ্য। "স্বধর্ম্ম" শব্দটা গীতায় সর্ব্বত্র ছড়ানো আছে। কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতামতের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই শব্দটীর ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসুদের কাছে অতি প্রয়োজনীয় বলে বোধ হয়। "স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা", ইত্যাদি স্থানে "স্বধর্ম্মের" তেমন আলোচনা গ্রন্থখানিতে নেই। নিজস্ব বা স্বকীয় ধর্ম্ম বলে কিছু যদি থেকে থাকে তার মানে কি? যাকে 'স্ব' বলি তার অনেকখানিই 'স্ব' নয় এ কথা অদ্যকার বিজ্ঞান বলেছে। এর কিছুটা হলো দেহায়তনের সৃজন, অর্থাৎ genetically determined; এবং কিছুটা হলো বহির্জ্জগতের সৃজন। কাজেই স্বধর্ম্মের 'স্ব'টী কে? এ বিষয়ে জননতত্ত্ব (Genetics), মনোবিকলন-তত্ত্ব (Psycho-analysis), সমাজতত্ত্ব (Sociology), মনস্তত্ত্ব (Psychology) ইত্যাদি সবারই দান করবার আছে। আমরা অনিলবরণ বাবুর কাছে এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আশা করি। কারণ পরেও "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়" ইত্যাদি বিখ্যাত শ্লোকে এর অর্থ-জটিলতা মুস্কিল সৃষ্টি করেছে। গীতায় বর্ণাশ্রমধর্ম্মের সমর্থন আছে। বর্ত্তমান যুগে গান্ধীজীও বর্ণাশ্রম-সমাজের পুনঃ প্রতিষ্ঠা চান। এই বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদ-প্রথার সঙ্গে এই "স্বধর্ম্ম"-সমস্যার নিকট সম্বন্ধ রয়েছে। প্রাচীন ভারতে যে কর্ম্মানুযায়ী জাতিবিভাগ প্রথা ছিল, তার প্রশংসা ৮৩ পৃষ্ঠায় যেন রয়েছে মনে হয়। "সমাজের

কেবল এক বিশিষ্ট অংশ, বিশিষ্ট সম্প্রদায়ের উপর যুদ্ধকার্য্যের ভার অর্পিত ছিল"—। কুলধর্ম্ম ও বংশমূলক সমাজব্যবস্থা সম্বন্ধে গ্রন্থকারের প্রশংসা দেখে মনে হয় জাতিভেদ সমর্থিত হয়েছে। এ সম্বন্ধে যথাযোগ্য স্থানে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার আশায় আমরা থাক্‌বো।

গ্রন্থখানা সব দিক্ দিয়ে অতি প্রশংসনীয় উদ্যম। এই ধরণের আলোচনামূলক শাস্ত্রব্যাখ্যান আমাদের বাংলা ভাষায় বেশী নেই। আধুনিক জগতে যে সব দার্শনিক ও সামাজিক সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে, যে সব মতবাদের সংঘর্ষ মানব-মনকে উৎক্ষিপ্ত করে তুলেছে, সেই সব তাজা সমস্যা ও জীবন্ত মতবাদের প্রাসঙ্গিক আলোচনা ও বিচার এই গ্রন্থখানিতে থাকলে আজকালকার ভারতীয় সমাজ বহুল ভাবে উপকৃত হবে। সুপণ্ডিত গ্রন্থকারকে এই অনুরোধ জানাচ্ছি। বইখানায় সুস্পষ্ট জোরাল মতামত বিশেষ তৃপ্তিজনক। যুদ্ধ ও অহিংসা সম্বন্ধে দৃঢ় ও নিসংশয় আলোচনা, দুঃখ ও সংগ্রাম সম্বন্ধে সবল দৃষ্টিভঙ্গী সংশয়জর্জ্জর মানুষকে স্থৈর্য্য ও সামর্থ্য দান করবে। আমরা আশান্বিত হয়ে পরের খণ্ডগুলোর প্রতীক্ষায় রইলাম।

অনিল চন্দ্র রায়

সম্পাদকীয়

জয়শ্রীর কথা

জয়শ্রী এবার আষাঢ় মাসে অষ্টম বর্ষে পদার্পণ কোরলো। সাতটা বৎসরের উপর দিয়ে অসংখ্য ঝড় ঝাপ্টা চলে গেছে। কতো ক্ষতি, কতো নিপীড়ন, কতো বিয়োগ, কতো আঘাত এই একটা যুগকে দুঃখে সমৃদ্ধ ও সংগ্রামে সমুজ্জ্বল করে রেখেছে! জয়শ্রীর কতো কর্ম্মী জেলে গেলো, কতো সাথি মৃত্যুর অন্ধকারে ডুবে গেলো! চক্রপথের একটা অংশ অতিক্রম কোরে জয়শ্রী আজ নূতনযুগের দ্বার প্রান্তে এসে উত্তীর্ণ হয়েছে। পিছনটা কণ্টকে সমাকীর্ণ আর সুতীক্ষ্ণ স্মৃতির বেদনায় আবছায়া। সাম্নে গর্জ্জমান সমূদ্রের ডাক্। সমস্যা-সঙ্কুল নবযুগ আজ আহ্বান পাঠিয়েছে। শঙ্কাহীন দৃঢ় চিত্তে জয়শ্রী সেই অমোঘ আহ্বানে সাড়া দিয়েছে।

সমস্ত পৃথিবী জুড়ে বিরামহীন সংগ্রাম চলেছে। ভারতবর্ষের সংঘর্ষও সেই সংগ্রামেরই একটা রক্তাক্ত অধ্যায়। এই অধ্যায়কে রচনা করতে জয়শ্রীও তার সমস্ত শক্তিকে সংহত কোরে সবার সঙ্গে মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছে। অপরাপর সহযাত্রিদের সৌহার্দ্য জয়শ্রীর যাত্রাপথকে সহজ ও শুভযুক্ত কোরবে, এ আশা আছে।

ভবিষ্যৎ সমাজ কি রকম হবে, এ নিয়ে আজ মত সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে। সমূহ-বাদ (কম্যুনিজম্), সমাজতন্ত্রবাদ (সোস্যালিম), ফ্যাসিস্ত্-বাদ (ফ্যাসিজ্‌ম) ও গান্ধীবাদ, এই চারটে মতবাদের প্রচার ও প্রভাব আজকালকার জগতে রয়েছে। জয়শ্রী এই মতসংঘর্ষের মধ্যে একটা বিশিষ্ট সামাজিক আদর্শ বা মতবাদের প্রতিনিধি। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জয়শ্রী সমাজতন্ত্রের সমর্থক। কিন্তু কৃষ্টির ক্ষেত্রে অবিমিশ্র ও একঘেয়ে জড়বাদী বা আর্থিক ব্যাখ্যানের পক্ষপাতী জয়শ্রী নয়। সমাজবিবর্ত্তনের মূলে কেবল আর্থিক নয়, আর্থিক এবং আত্মিক উভয়ই আছে। অন্তর ও বাহির এই দুইয়ের মধ্যে সহযোগিতায় ইতিহাসের অগ্রগতি হচ্চে। অর্থাৎ একবাদ নয়, অনেক বাদই হলো ইতিহাস-ব্যাখ্যানের গোড়ার কথা।

দর্শনের ক্ষেত্রে জয়শ্রী জড়বাদের ও নাস্তিক্য-বাদের বিরোধী। বিশেষতঃ ডায়ালেকটীক জড়বাদ নামক মার্ক্সীয় দর্শন বহুদোষ-দুষ্ট। কারণ একদিকে বিজ্ঞান জড়বাদ বর্জ্জন করতে চলেছে, অন্যদিকে দর্শন বহুদিন হলো হেগেলীয় ডায়ালেকটীক নামক নীতিকে প্রত্যাখ্যান করেছে। সমূহবাদ (কম্যুনিজম্) ধর্ম্মকে, অতীন্দ্রিয় উপলব্ধিকে সমাজ ও ব্যক্তির জীবন থেকে ছেঁটে ফেলতে

চায়। সমাজ থেকে ধর্ম্মকে উচ্ছেদ করা এদের আবশ্যকীয় অঙ্গ। জয়শ্রীর পরিকল্পিত সমাজে কিন্তু ধর্ম্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার্য।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জয়শ্রী গণ-সংগ্রামকে স্বাধীনতা-লাভের একমাত্র পন্থা মনে করে। শ্রমিক-আন্দোলন, কৃষক-আন্দোলন, ছাত্র ও যুব আন্দোলন, কংগ্রেস আন্দোলন, নারী-আন্দোলন, এই সকলের সমবেত সংহতিতে যে সংগ্রাম গড়ে উঠবে তাকেই বলা চলে গণ-সংগ্রাম। এই গণ-সংগ্রামকে বাস্তব কোরে তুলতে হলে আদর্শ ও মতামতের ওপরে দলগঠন প্রয়োজন। জয়শ্রীর মতে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক দল নয়, আদর্শ-কেন্দ্রিক দলই বর্ত্তমান যুগের অপরিহার্য প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন এই সব বিবিধ-পন্থী দলগুলির সদৃশ কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে সংহতি গঠন; অর্থাৎ জয়শ্রী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঐক্যে (Anti Imperialst front) বিশ্বাস করে।

উপরোক্ত সূত্রগুলো জয়শ্রী সমাজ-দর্শনের মূল কথা। এই বিশিষ্ট মতবাদের আলোচনার প্রচার জয়শ্রী সাধ্যমত করেছে এবং ভবিষ্যতেও কোরবে। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিচার জয়শ্রীর পৃষ্ঠার সর্ব্বত্রই থাক্‌বে।

ভারতবর্ষে বারবার কৃষ্টি সঙ্কট ঘটেছে। গ্রীক্ আক্রমণের যুগে, বৌদ্ধ বিদ্রোহের যুগে, ইস্‌লামীয় প্রভাবের যুগে' পাশ্চাত্য সংস্পর্শের যুগে—বারম্বার এসেছে সংস্কৃতি বিপ্লব। আজ বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে পৃথিবীব্যাপী সঙ্কটের মধ্যে ভারতবর্ষ ও অক্ষত ও নির্লিপ্ত নেই। প্রাচীন আদর্শের সঙ্গে নবযুগের কালধর্ম্মের বিরোধ ও সংঘর্ষ উপস্থিত হোয়েছে। এ সংঘর্ষ থেকে কতোখানি অমৃত উঠবে, আর কতোখানি উঠবে বিষ, তার হিসাব ইতিহাস কোরবে একদিন। অদ্যকার এই সংঘর্ষে ভবিষ্যৎ হিসাবকিতাবের সৌকর্য্যার্থে আমাদের সাহায্য কোরতে হবে ইতিহাসকে। ইতিহাসের এই দাবি। এই দাবিকে জয়শ্রী সানন্দে ও সবিনয়ে স্বীকার কোরেছে। ভারতবর্ষের কল্যাণ যাঁরা কামনা করেন তাঁদের শুভেচ্ছা জয়শ্রী কামনা কোরেছে তার নববর্ষের যাত্রারম্ভের প্রাক্কালে। "সংগচ্ছধ্বং, সংবদধ্বম্" এই আজ জয়শ্রীর অন্তরের কথা।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

রাজনৈতিক মতদ্বৈধতা ও জাতীয় সঙ্কটে দেশবন্ধুর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের অভাব আজ বিশেষ করে জাগছে। একদিন যিনি সমগ্র ভারতীয় রাজনীতির পুরোভাগে অধিষ্ঠিত হয়ে আমাদের জাতীয় সংগ্রামের পথে চালিত করেছিলেন, বর্তমান ভারতে রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের সূচনা-কালে তাঁরই মত একচ্ছত্র নেতার সুদৃঢ় ও সংহত শক্তি আমাদের জাতীয় আন্দোলনকে সাফল্য ও অভ্যুদয়ের পথে নিয়ে যেত নিঃসন্দেহ।

সমগ্র দেশের বিক্ষুব্ধ অন্তরে যে নব জাগ্রত স্বাধীনতা বহ্নি ধূমায়িত হয়ে উঠছে তাকে সংহত, সঙ্ঘবদ্ধ ও ঐক্যের পথে এনে জাতির অন্তরের আদর্শকে রূপায়িত করার ক্ষমতা তাঁর ছিল, তাই তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে চিরস্মরণীয় আত্মার উদ্দেশ্যে আমাদের শোকশুদ্ধ অন্তরের বেদনা নিবেদন করছি।

জওহরলাল

গত নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের পর হতেই কংগ্রেস গান্ধীবাদের কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। ফলে বিশিষ্ট দেশকর্মীদের মধ্যে দ্বিধা, সংশয় ও চিত্তদৈন্য এমন ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়েছে যে জওহরলালের মত বিপুল ব্যক্তিত্ব আজ আত্মবিশ্বাস হারিয়ে বলছে, 'আমার মত লোক নেতা হওয়ার অনুপযুক্ত' (It is not out this stuff that leadership comes), 'যে উৎস হ'তে সব কাজে প্রাণ ও জীবনীশক্তি আসে তা যেন শুকিয়ে গেছে' ('the springs that give life and vitality to that functioning seem to dry up). পণ্ডিতজীর ধারণা এ নৈরাশ্য ও আত্মশক্তিতে নষ্ট বিশ্বাসের কারণ নিহিত 'মনের ও আত্মার গভীরতর প্রদেশে অথবা অবচেতন মনে।' (The trouble lies deeper in the inner recess of the mind and the spirit or even in the sub-conscious) কাজেই তাঁর এত অন্ধ আত্ম-অন্বেষণ। অন্ধ আত্ম-সন্ধানের অনিবার্য ফল ব্যর্থতা, কর্মহীনতা ও মানসিক ক্লীবতা। জওহরলালের মধ্যেও এ সব এসেছে। তাই তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন 'আমি আজ নীরব, অকর্মণ্য ও পঙ্গু' (quiet, more or less inactive...disabled) জওহরলালের মত যুক্তিপ্রবণ চিন্তাশীল লোকের পক্ষে চিন্তাহীন অভ্যাস-নিষ্ঠতা সব সময় সম্ভব নয়। মাঝে মাঝে তাঁকে বলতে হয় 'আমার যা বুদ্ধির অগম্য, সে ক্ষেত্রে আমি কাজ করতে অক্ষম' (I cannot function where I do not understand) কিন্তু কিছুতেই তিনি সঠিক বুঝবেন না যত দিন তাঁর বুদ্ধি ও মন গান্ধীজীর নিকট mortgage (আবদ্ধ) থাকবে।

কাজেই তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, বিহ্বল চিত্ত। 'যুক্তির সহিত সামঞ্জস্যহীন পরস্পর-বিরোধী সিদ্ধান্ত নির্বিচারে মেনে নেওয়া, না বিরোধিতা করা বা নিষ্ক্রিয় বসে থাকা' (The choice is of unthinking acceptance of decisions which sometimes contradict each other and have no logical sequence or opposition or inaction). এ তিনের মধ্যে চিন্তাহীন ভাবে আত্মসমর্পণ ভিন্ন তাঁর অন্য উপায় নেই, কারণ তিনি গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের নিকট আত্মবিক্রয় করে আছেন। সত্যাগ্রহের সেনাপতিও সে সুযোগ নিয়ে সাধারণ সমর-নায়কের মত তাঁর সৈন্যদের বলছেন 'Theirs not to make reply, theirs but to do and die'. 'আমি সব সময়ই কর্মীদের আমার উপর মনপ্রাণ ও বিচারহীন

বিশ্বাস দাবী করে আসছি ও ভবিষ্যতে আরো করব, যেখানে তোমরা আমাকে বুঝতে পারবে না সেখানে বিশ্বাস ভিন্ন আর অন্য উপায় নেই' (I have always tried to carry conviction to my co-workers, to carry their hearts and their reasons with me. I shall go doing so always, but where you cannot follow, you will have faith.

গান্ধীজীর উপর শুধু বিশ্বাস রাখলে চলবে না, তাঁর অন্তরের 'ঐশবাণী'তে (Inner Voice) একনিষ্ঠ আস্থা চাই, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ জওহরলাল এত দূর যেতে পারেন না। তাঁর যুক্তিপ্রবণ মন তাতে বাঁধা দেয়, স্তিমিত লোকের ঐশ আহ্বানে সাড়া দিতে সঙ্কোচ বোধ করে। কাজেই ব্যহত হয়ে তাকে আবার বাস্তবজগতে ফিরে আসতে হয়। বিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণ দ্বারা কোন কিছু গ্রহণ বা বর্জন করতে হয়। জওহরলালের মধ্যে বিচার আছে কিন্তু বিদ্রোহ নেই। এ জন্য তাঁকে বার বার গান্ধীজীর নিকট ফিরে আসতে হয় আত্মসমর্পণের জন্য ; বলতে হয় 'Alas ! two souls live in me'. এ 'two souls' কে কে ? একটি হচ্ছে সত্যিকার জওহরলাল, অপরটি প্রচ্ছন্ন গান্ধী। জওহরলাল এ কথা বুঝেও বুঝছেন না। এ বুঝবার ও জানবার অনিচ্ছা (this refusal to learn and understand) হতে এসেছে তাঁর নৈরাশ্য ও আত্মদমনের ভাব ['a sense of frustration and suppression')

গান্ধীব্যক্তিত্বের সম্মোহন হতে মুক্ত না হলে নব্য ভারতের অন্যতম প্রতীক্ জওহরলাল একটি Political Hamletএ পরিণত হবেন ইহাই বড় দুঃখের বিষয়। ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে এ ট্র্যাজেডির অভিনয় বন্ধ করতে পারেন শুধু মোহমুক্ত আত্মস্থ জওহরলাল। আমরা আশা করি জওহরলাল তা করবেন।

কংগ্রেসের তন্ত্র পরিবর্তন

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দুর্নীতি দূর করবার উদ্দেশ্যে হরিপুরা কংগ্রেসের পর থেকে কমিটি গঠিত হোয়ে আসছে। নিখিল ভারতরাষ্ট্রীয় সমিতির কলিকাতা অধিবেশনে যে কমিটি এই উদ্দেশ্যে গঠিত হোয়েছিল বোম্বাইয়ের বৈঠকে তারা কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছেন।

কংগ্রেস শাসনতন্ত্র গ্রহণ করবার পর থেকে সভ্যসংখ্যা অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেসের জেনারেল সেক্রেটারী তাঁর ১৯৩৮-৩৯ সালের রিপোর্টে বলেছেন যে কংগ্রেসের সদস্য সংখ্যা মোট ৪৪,৭৮৭২০ অর্থাৎ ১৯৩৫-৩৬ সালের সভ্য সংখ্যার প্রায় নয়গুণ। এই বিপুল সংখ্যার মধ্যে ক্ষমতালিপ্সু স্বার্থান্বেষী অনেক সভ্য রয়েছে তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু কংগ্রেসে অনাচারের আতঙ্ক এত প্রচারিত হয়েছে যেন কংগ্রেসের আগাগোড়াই দুর্নীতিগ্রস্ত।

দুর্নীতি সম্বন্ধে সচেতন থাকা ও আত্মসমালোচনা দুটোই দুর্নীতি নিরাকরণের সহায়ক।

কিন্তু কংগ্রেস একনায়কত্বের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর, পরমতঅসহিষ্ণুতা শুদ্ধিযজ্ঞে আত্মতৃপ্তি লাভ কোরবে এই সন্দেহ অনেকের মনেই হোয়েছিল। গঠনতন্ত্র সাবকমিটির একটি প্রস্তাবে সেই সন্দেহ ঘনীভূত হোয়েছে।

বর্তমান গঠনতন্ত্রের ৫ (গ) ধারায় আছে "যাঁহারা কোন নির্বাচনমূলক কংগ্রেস কমিটির সদস্য তাঁহারা কোন সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের বা ঐরূপ কোন কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না"। সাব-কমিটির রিপোর্টে এই ধারায় নিম্নলিখিতরূপ সংশোধন প্রস্তাবিত হোয়েছে—"যাঁরা কোন সাম্প্রদায়িক **বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের** সদস্য তাঁহারা কোন কংগ্রেস কমিটির সদস্য হইতে পারিবেন না।, এই "অন্য কোন"র ছিদ্রপথে প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করবার আয়োজন হোতে পারে এই আশঙ্কা শুধু আমাদের নয় ; কমিটির দুইজন বিশিষ্ট সভ্য পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও. আচার্য্য নরেন্দ্র দেও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। পণ্ডিতজী তার স্বতন্ত্র মন্তব্যে লিখেছেন যে এই সংশোধন অপব্যবহার (mis-used) হোতে পারে। আচার্য্য দেও আরও স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন যে শ্রেণীগত প্রতিষ্ঠার অথবা কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অন্যান্য দলগুলিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যও এই ধারাটির অপপ্রয়োগ হোতে পারে। এই আশঙ্কা সত্যে পরিণত হোলে জাতীয় সংহতির দুর্দিন উপস্থিত হবে। কংগ্রেস পঙ্গু হোয়ে পড়বে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে সভ্যগণ বর্তমানে Single Transferable Voteএ নির্বাচিত হন। রাষ্ট্রবিদ্‌দের মতে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্ব সংরক্ষিত হওয়ার এ একমাত্র উপায়। যেখানে রাষ্ট্রে ছোট ছোট সংখ্যালঘিষ্ঠ উপদল অথবা সম্প্রদায় আছে সেখানেই এ ব্যবস্থার প্রচলন। কমিটির প্রস্তাবানুযায়ী তিন-চতুর্থাংশ সভ্য নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে আর এ ব্যবস্থায় নির্বাচিত হবেন না। নূতন ব্যবস্থায় সংখ্যালঘিষ্ঠদের নির্বাচনের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। কংগ্রেসের বর্তমান আভ্যন্তরীণ অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতিনিধিত্বের পথে বাঁধা সৃষ্টি করবার জন্যই এই আয়োজন। গণতন্ত্রের মূলসূত্র অনুযায়ী এবং সাম্রাজ্যবিরোধী সংগ্রামের প্রাক্কালে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তিগুলি কংগ্রেসের নীতি ও পদ্ধতি নিরূপণ করার পূর্ণ সুযোগ থাকা উচিত, কিন্তু এ-ব্যবস্থা তার পরিপন্থী।

গান্ধীজীর "নূতন আলোক"

রাজকোটে নূতন 'অধ্যায়ের' সূচনা কোরে গান্ধীজী "নূতন আলোকের" সন্ধান পেয়েছেন। রাজকোটের উপবাস ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল রাজকোট অধ্যায়ের পরিণতি ও তেমনি বিস্ময় বিমূঢ়তা সৃষ্টি করেছে। ঐশী আহ্বানের নির্দেশে উপবাস, বড়লাটের হস্তক্ষেপ, মরিসগায়ারের মধ্যস্থতা, ভায়াত ও মুসলীমদের বিক্ষোভ, রাজকোটের সংগ্রাম থেকে বিরতি ও সর্বশেষ গায়ারের মধ্যস্থতা প্রত্যাখ্যান ও ঠাকুর সাহেবের শুভবুদ্ধির উপর

রাজকোটের ভাগ্য ছেড়ে দিয়ে অহিংসার ব্যাখ্যা—আনুপূর্বিক এই ঘটনাগুলি দেশবাসীর নিকট চিরকাল দুর্বোধ্য হয়ে থাকবে। এমন কি দেশীয় রাজ্যে আন্দোলন তথা রাজকোটের পদ্ধতি সম্পর্কে পণ্ডিত জহওরলালের উক্তিতেও সেই বিভ্রান্তি প্রকাশ পেয়েছে। ঐশী আহ্বানে ভক্তিমার্গ অবলম্বন করতে দেশীয় রাজ্যের কর্ম্মীদের আহ্বানভরে গান্ধীজী বলেছেন "......where you can not follow—You will have to have faith "দুর্বোধ্য হোলে বিশ্বাসের আশ্রয় নিবে"। রাজনীতির ক্ষেত্রে ঐশী আহ্বান অচল এ কথার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। ঐশী আহ্বানের জটাজাল যে জটিলতার সৃষ্টি করেছে, তার ফলেই দেশীয় রাজ্যে পৌর স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অধিকার অধিকতর বিপন্ন হচ্ছে।

গান্ধীজীর 'নূতন আলোক' প্রাপ্তিতে ত্রিবাঙ্কুর ষ্টেটে (১) অনিশ্চিত কালের জন্য সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখতে হবে (২) কতৃপক্ষের সঙ্গে সম্মানজনক সর্তে রফা করবার জন্যে নিজেরা অগ্রসর হোয়ে আলোচনা সুরু করতে (৩) যে সকল সত্যাগ্রহী জেলে আছেন তাদের উদ্বেগ প্রকাশ না করতে এবং (৪) প্রয়োজন হলে দাবী কমিয়ে আপোষ আলোচনা চালাতে হবে। অদূর ভবিষ্যতে কোন স্থানে সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করবার পরামর্শ ও তিনি দিবেন না। একমাত্র ১৯২০ সালের চতুর্বিধ গঠন মূলক কার্য ও চরকাই সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করবার যোগ্যতা দিতে পারে—এই অভিমত তিনি প্রকাশ করেছেন। এই যোগ্যতা অর্জন অসাধ্য সাধনের নামান্তর। গান্ধীজীর 'নূতন আলোক' কোন নূতন পথের সন্ধান দেয় নাই; জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে বহু পূর্বের আবেদন নিবেদনের পরিত্যক্ত পথে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়েছে।

রাহুলজীর প্রয়োপবেশন

দু'শো বিয়াল্লিশ ঘণ্টা প্রায়োপবেশন করার পর রাহুলজীকে কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্টের কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, পণ্ডিত-প্রবর লোকমান্য শ্রমণকে বঞ্চিতের অধিকারের জন্য সত্যাগ্রহের সাহায্য গ্রহণ করে কংগ্রেসী কারাগারের দুঃসহ কষ্ট বরণ কর্ত্তে হ'য়েছিল, গবর্ণমেণ্টের পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট গ্লানিকর কিন্তু কর্ত্তব্যচ্যুতির ও আত্মদোষস্খালনের অনিয়ন্ত্রিত আগ্রহ লজ্জাহীনতার চরমে উঠ্‌লো সেদিন যেদিন গবর্ণমেণ্টের তরফ হ'তে একটি কমিউনিকে রাহুলজীকে অবিবেচক বুদ্ধিভ্রংশ গোঁয়ার সত্যাগ্রহীরূপে চিত্রিত করে প্রচার করা হো'লো। সত্য ও অহিংসার নামে যাঁরা ভূঁয়া শাসনভার গ্রহণ করেছে প্রতিপক্ষকে অবনমিত করার ব্যাপারে যুক্তি ও ন্যায় ধর্মকে বাদ দেওয়া যায় একাধিক ব্যাপারে এরূপ পরিচয় আমরা পেয়েছি। রাহুলজীর বিরুদ্ধে উদগীর্ণ বিদ্বেষ এর নবতম উদাহরণ মাত্র। কিন্তু জয়প্রকাশনারায়ণ ও রাহুলজীর স্বীয় বিবৃতি দ্বারা গবর্ণমেণ্টের বিজ্ঞপ্তির শূন্যগর্ভতা শুধু প্রমানিত হয়নি গবর্ণমেণ্ট যে ইচ্ছা করেই কদর্য ঘটনা-বিকৃতি ও

সত্যাপলাপের আশ্রয় গ্রহণ কর্তে কুণ্ঠিত হয়নি তাও সন্দেহাতীত রূপে সপ্রমাণ হ'য়েছে। আসল কথা, কিষাণ সত্যাগ্রহীরা রাজনৈতিক বন্দী বলে গণিত হ'বে কিনা রাহুলজীর দাবী ছিলো তাই। চম্পারণ বরদোলীর কিষাণ আন্দোলন অসহযোগ আন্দোলনের পরম গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় এবং অতীতে এ দুই কিষাণ আন্দোলন যে জাতীয় আন্দোলনের গতি কী ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে আজ তা কারও কাছে অজানা নেই। অথচ কংগ্রেস পরিচালিত প্রদেশে বন্দীর শ্রেণীবিভাগ কালে কিষাণ সত্যাগ্রহীরা রাজনৈতিক বন্দীর সম্মান থেকে বঞ্চিত হবে এবং তাই নিয়ে কর্তে হ'লো প্রয়োপবেশন। ইহা কি ক্ষমতা লিপ্সু প্রতিক্রিয়াশীল গবর্ণমেণ্টের চরম অধঃপতনের সূচনা নয়।

বৃন্দাবনের অধিবেশন

গান্ধীবাদীরা ত্রিপুরী-পর্বের পর হ'তে নিজেদের শক্তি সংহত কর্বার চেষ্টা কর্ছে কারণ বামপন্থীরা যে ইতিমধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'য়েছে এ সম্বন্ধে সন্দেহ মাত্র নেই। বৃন্দাবনে গান্ধীসেবাসঙ্ঘের অধিবেশনকে একারণে গুরুত্বসূচক অনুষ্ঠান বলা যেতে পারে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির কলিকাতা অধিবেশনের অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত হওয়ায় আমরা দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক মতবাদের ধারা ও কার্যক্রম সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট না হোক্ চলন-সই পরিচয়ও পেয়েছি। সাংবাদিকের প্রবেশ ছিলোনা এবং যেটুকু সংবাদ বাইরে পাঠাবার হুকুম দেওয়া হ'তো তাও কর্ত্তৃপক্ষের অহিংস সেন্সরের সতর্ক ছাঁকুনীর ভেতর দিয়ে গলে আস্তো, গান্ধীনীতি কালধর্মে দিবালোকের প্রকাশ্যতা ছেড়ে রুদ্ধ-কক্ষ কূটনীতিকদের মন্ত্রনাসভার সাহায্য গ্রহণ কর্তে বাধ্য হ'য়েছে। শুদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের এ প্রকার আচরণে অসঙ্গতি কিছু নেই, কিন্তু সেবাসঙ্ঘের মতন মিশ্রপ্রতিষ্ঠান এবং গান্ধীবাদের প্রধানতম ঘাঁটিতে এ প্রকার অননুমোদিত গুপ্তির প্রয়োজন হ'য়ে পড়্লো তা দেখে একটু আশ্চর্য্য হ'তে হয়! রাজেন্দ্রপ্রসাদজী গান্ধী সেবা-সঙ্ঘের রাজনৈতিক রূপ অস্বীকার করেছেন অন্ততঃ সুভাষ বাবু যেভাবে বলেছেন তার প্রতিবাদ তিনি জানিয়েছেন। প্রত্যুত্তরে বাংলাদেশের দৈনিকে সঙ্ঘ-সম্পাদকের স্বাক্ষরিত সার্কুলার প্রশ্নপত্রের নমুনা প্রকাশিত হ'য়েছে যাতে করে প্রমাণ হ'য়ে গেছে যে সঙ্ঘ-কর্ম্মীরা শুধু বিশিষ্ট রাজনৈতিক মতবাদীই থাক্‌বেনা মতের একনিষ্ঠতা বজায় রাখবার জন্যে সঙ্ঘ সর্বদা তৎপর থাক্‌বে। সর্দার প্যাটেল গান্ধী অনুগত্যের শপথ সভায় পেশ কর্লেন এবং তিনি নিজে যা করেন তা গান্ধীজির ইচ্ছায়ই করেন বা অন্ততঃ তার মত নিয়ে করেন, ভক্তিবিনম্র সঙ্ঘীদের তা জানিয়ে দিয়েছেন। রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক দিয়ে বৃন্দাবনের এই অধিবেশন উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, কিষাণ ও মজুর আন্দোলনের প্রতি সঙ্ঘের কর্তব্য কি হ'বে তার আলোচনা হ'য়েছে। সর্দারজী ও ভুলাভাই জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীদের তীব্র ভৎর্সনা জিনিয়েছেন। ক্লাস-কোলাবরেশন-বিশ্বাসী

পরিবর্তন শঙ্কিত রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতির অপূর্ব সমন্বয় তাদের এই শ্রমিক ও কৃষক সমস্যার সমাধানের পন্থা বামপন্থীদের শ্রেণীসংঘর্ষের উপযোগিতা ও অবশ্যম্ভাবিতার বিরুদ্ধে যুক্তির জোরে না হোক্ কংগ্রেসী রাজ্যের সহায়তায় অধিকতর ভাবে প্রয়োগ হ'বে সন্দেহ নেই। কিন্তু যুগযুগ-সঞ্চিত অসন্তোষ ঘনায়িত হ'য়ে যে আকার ধারণ করেছে অপোষ-রফার ছিটে-ফোঁটায় তা কি শান্ত হ'বে ?

চাকুরী বণ্টন সমস্যা

১৯৩৮ সালের ২৪শে আগষ্ট মিয়া মহাম্মদ আব্দুল হাফিজ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করেন সরকারী চাকুরীতে নিম্নলিখিত হারে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হোক—মুসলমান শতকরা ৬০; তপশীল শতকরা ২০; বাকী শতকরা ২০। এই প্রস্তাবের উপর নির্ভর করে প্রধানমন্ত্রী হক্‌সাহেব এ বৎসর গভর্ণমেন্টের তরফ হ'তে এ ব্যাপারে একটা মীমাংসায় উপনীত হবার জন্য একটী নোট প্রচার করেন, তাতে মুসলমানদের জন্য ৫৫ ভাগ, তপশীলীদের ১৫ ভাগ এবং অন্যান্য জাতির জন্য ৩০ ভাগ সংরক্ষিত করবার সুপারিশ করা হয়। হিন্দুমন্ত্রীদের তরফ থেকে নলিনীবাবু পাল্টা নোট দেন যে উচ্চতর ও দায়িত্বসম্পন্ন পদের জন্য এই সংরক্ষণ নীতি বর্জিত হোক এবং মুসলমানদের জন্য সাধারণ ভাবে শতকরা ৪৫ ভাগ চাকুরীর ব্যবস্থা থাকুক। শোনা গিয়েছিল যে এই ব্যাপারে হিন্দুমন্ত্রীদের দৃঢ়তা শাসনসঙ্কট সৃষ্টি করে তুলেছিলো। হিন্দু জাতির পক্ষ থেকে এ নিয়ে প্রবল আন্দোলন হয় এবং রবীন্দ্রনাথকে পুরোধা করে গভর্ণরকে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ দ্বারা চাকুরী বণ্টনের প্রস্তাবিত নতুন ব্যবস্থা নাকচ করবার জন্য এক আবেদন করা হয় এবং বর্ধমানের রাজার নেতৃত্বে হিন্দুনেতাগণ দার্জিলিংএ গবর্ণর সকাশে এক ডেপুটেশন প্রেরণ করেন। সম্প্রতি গবর্ণমেন্টের নীতি ঘোষিত হ'য়েছে শতকরা ৫০ ভাগ চাকুরী মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাক্‌বে।

এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য এই যে, হারাহারি করে যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করার কোনোপ্রকার ব্যবসায় আমাদের সম্মতি নেই। বিশেষ করে উচ্চতর, দায়িত্বসম্পন্ন ও টেক্‌নিক্যাল বিভাগ যেখানে একমাত্র যোগ্যতা ছাড়া নিয়োগের অন্য কোন মানদণ্ড থাক্‌তে পারে না সে সব ক্ষেত্রে এই ভয়াবহ আশ্রিতবৎসল নীতির অপপ্রয়োগ বিষময় ফল উৎপন্ন করবে। রুটিন-কেরানী বিভাগে যেখানে গতানুগতিক কর্মধারার দায়িত্ব ও নিজের ইনিসিয়েটিভ্-এর অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রয়োজন সে সব বিভাগে বণ্টনানুযায়ী নিয়োগের ক্ষেত্র প্রশস্ততর হোক তাহাতে আপত্তি করবার কিছুই নেই। হিন্দু যুবক কেরানী-গিরির সহজলভ্য তিরিশটি টাকার মোহ কাটিয়ে ব্যবসাবাণিজ্যে শ্রমশিল্পে জীবিকার্জনের উন্নততর সংস্থান খুঁজে নিক জাতির হিতৈষী

চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাই চেয়ে থাকেন। কঠিন আঘাতে কাল-সঞ্চিত আলস্য ও দ্বিধা মন থেকে যদি কেটে যায়, জীবিকার্জনের নতুন পথের নিশানা যদি মিলে তবে প্রতিক্রিয়াশীল হক-সরকার দেশের ধন্যবাদভাজনই হবেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন বিল

বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে কর্পোরেশন বিল নির্ভাবনায় পাশ করানো হ'লো, একটি সংশোধন প্রস্তাবও টিক্‌লোনা। পৃথক নির্বাচন, হিন্দু কাউন্সিলারের সংখ্যা কমান, মনোনয়ন প্রথার পরিবর্তন ইত্যাদি গণতন্ত্রবিরোধী জাতীয়তা-পরিপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল মনোবৃত্তির পরিচায়ক। শুধু কংগ্রেস পার্টিকে কর্পোরেশনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে বঞ্চিত কর্বার জন্য এই লজ্জাহীন প্রচেষ্টা সমস্ত যুক্তি ও ন্যায়কে অস্বীকার করেছে। লোকসংখ্যায় যারা প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং আদায়ী মিউনিসিপ্যাল শুল্কের যারা শতকরা ৮০ ভাগ বহন করে আস্‌ছে শুধু গায়ের জোরে তাদের নাগরিক অধিকার হরণ করে নেওয়া কোন যুক্তিকেই আশ্রয় করে চল্‌তে পারেনা। মনোনীত সদস্য সম্পর্কে ব্যবস্থাপক সভায় অপ্রত্যাশিতভাবে যে সংশোধন প্রস্তাবটি পাশ হ'য়েছে তাতে করে নিশ্চিত সংখ্যা-গরিষ্ঠতা সম্বন্ধে প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সন্দেহ উপস্থিত হ'য়েছে তাই মৌঃ আক্রাম খাঁ তাঁর 'আজাদে' প্রস্তাবের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত মুসলমানদের আহ্বান করেছেন জেহাদ ঘোষণা কর্বার জন্যে। মুস্লিম জগতের ২৫ বৎসরের সাধনা নাকি নিষ্ফল হ'য়েছে এই প্রস্তাব দ্বারা। একাধিক-বার বরেণ্য কংগ্রেস নেতাদের মুখ থেকে এমনকি রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় সুভাষবাবুর মুখ থেকেও আমরা শুনে আস্‌ছি প্রয়োজন হ'লে বাংলাদেশ কর্পোরেশন ব্যাপার নিয়ে এমন আন্দোলন সৃষ্টি কর্বেন যা ইতঃপূর্বে কখনও হয়নি। আসন্ন বিপদে হিন্দু নগরবাসীরা যে ভাবে সাড়া দিয়েছে শ্রদ্ধানন্দপার্কের বিপুল জনসমাবেশ দেখে আমরা তার কিঞ্চিৎ পরিচয় পেয়েছি।

ব্যবস্থাপরিষদে মহাজনী বিল

মহাজনী বিলের আলোচনা যে মন্থর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে তার একমাত্র কারণ স্থিতস্বার্থ বণিক ও ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতিকূলাচরণের ভীতি। প্রথমে শ্বেতাঙ্গ ও মাড়োয়ারী প্রতিনিধি-গণের পরিচালিত আক্রমণে সিলেক্ট কমিটি হতে প্রাপ্ত বিলকে প্রত্যাহার করা ব্যতীত গবর্ণমেণ্টের গত্যন্তর ছিলোনা, আল্টাভায়ার্স বা ক্ষমতা-বহির্ভূত এবং ভারতশাসন আইনের অননুমোদিত বলে খৈতান সাহেব যে প্রবল আন্দোলন চালালেন তাতে ওয়াকিবহাল মহলে বিলের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দারুণ সন্দেহ ঘোষিত হ'য়েছিল। দুর্বল গবর্ণমেণ্টের যা হ'য়ে থাকে এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কায়েমী স্বার্থের যূপকাষ্ঠে বিলের মাঙ্গলিকবিধান সমূহকে বলি দেওয়ার পালা

সুরু হ'য়েছে। প্রথমে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক, নোটিফায়েড্ ব্যাঙ্ক এবং ক্রমে সমবায় বীমাসমিতি, সমবায় সমিতি বীমা কোম্পানী, জীবনবীমা কোম্পানী, মিউচুয়্যাল বীমা কোম্পানী, প্রভিডেণ্ড বীমা কোম্পানী, প্রভিডেণ্ডফণ্ড, বিল্ডিং সোসাইটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান সমূহের দাদনী কারবার বিলের আঁওতা থেকে বাদ পড়লো। জনসাধারণকে কালসঞ্চিত ঋণভার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্যে যে বিলের প্রয়োজন তাকে সঙ্কীর্ণ করে শুধু গ্রাম্য মহাজনের ব্যবসাসম্পর্কে ব্যবস্থা হ'তে চলেছে। মন্দের ভাল হিসেবে এটুকু সমর্থনযোগ্য। এই সঙ্গে একটা কথা ও ভেবে দেখা দরকার যে এম্নিতেই বেঙ্গল এগ্রিকাল্‌চার্‍্যাল্ ডেটর আইন দ্বারা মফঃস্বলে কৃষকের ক্রেডিট অর্থাৎ ঋণ পাবার ক্ষমতা মারাত্মকভাবে সঙ্কুচিত হ'য়েছে তার ওপর মহাজনী আইন পাশ হ'লে কৃষককে কে ঋণ দেবে? সেই দুঃসময়ে কৃষকের অবশ্যপ্রয়োজনীয় ঋণের যোগান কোথা থেকে আস্‌বে গবর্ণমেণ্ট কি সে বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত আছেন? ভালো কর্বার আগ্রহেই হোক্ কী বাহাদুরী নেবার নেশায়ই হোক যে আপাত-রম্য-বিধান ষ্টাট্যুট্ বইতে স্থান পেতে চলেছে প্রয়োগক্ষেত্রে তার ফল অবাঞ্ছিত হ'য়ে না দাঁড়ায়। মহাজনী আইনের উপযুক্ত ফল আশা কর্লে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে সুলভ ঋণদান প্রতিষ্ঠানেরও ব্যবস্থা কর্তে হবে।

ডিগবয় ষ্ট্রাইক

সুদীর্ঘ-কাল যাবৎ ডিগবয়ের তৈলখনির শ্রমিকেরা যে অসামান্য দৃঢ়তার সহিত ধর্মঘট চালিয়ে আস্‌ছে তাতে ভারতের সুদূর উত্তর পূর্বসীমান্তের শ্রমিক-সংহতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে। শ্বেতাঙ্গ মালিকদিগের ইচ্ছানুসারে প্রচলিত নিয়মে ধর্মঘটকারীদের ধর্মঘট পরিত্যাগ কর্তে পুলিস ও মিলিটারী নিয়োজিত হয়নি—আসামগবর্ণমেণ্ট এ ব্যাপারে যে অভূতপূর্ব্ব সাহসিকতা দেখিয়েছেন তা অপরাপর কংগ্রেস প্রদেশের শিক্ষনীয়। ধর্মঘটের প্রারম্ভে অসহায় শ্রমিক ও শ্রমিক আন্দোলন সহানুভূতিসম্পন্ন তিনটি অমূল্যজীবন পুলিশের গুলিতে নষ্ট হ'য়েছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের তদন্ত এ ব্যাপারে যা হ'য়েছে তা জনসাধারণের মনঃপূত হয়নি, নিরপেক্ষভাবে যাতে একটা জুডিশিয়াল তদন্ত হয় তার জন্যে কংগ্রেস পার্টি ও নিখিলভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য শ্রীযুক্ত বিধান বাবু সুপারিস করেছেন। আসা করা যায় সত্যোদ্ঘাটনের জন্য জুডি-শিয়্যাল তদন্ত প্রকৃত ব্যাপারের উপর আলোকপাত কর্তে সমর্থ হ'বে। অন্ততঃ ক্ষুব্ধ জনমতকে শান্ত করবার জন্যেও এ তদন্ত অনেকটা সহায়তা কর্বে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, ডিগবয় ব্যাপারে মন্ত্রীও দায়িত্ব সম্পন্ন স্থায়ী গবর্ণমেণ্ট চাকুরে এবং মিলিটারী কর্তৃপক্ষদের পরস্পরের প্রতি গভীর অসহযোগিতা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিলো যে একসময়ে এই নিয়ে একটা বড়োরকমের শাসন-সঙ্কট দেখা দিতে পার্তো। জনসাধারণের তরফ থেকে ডিগবয় সমস্যাকে সর্বভারতীয় সমস্যা বলে স্বীকার করে নিয়ে প্রবল আন্দোলন সুরু কর্বার জন্য দাবী করা হ'য়েছে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদজী আপোষ মীমাংসার জন্য কল্‌কাতায় এসেছিলেন দু'বার কিন্তু শ্বেতাঙ্গ মালিকদিগের আপোষ সর্তের

প্রতি ঔদাসীন্য দেখে তিনি প্রেসের মারফত যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে সমস্যার আশু সমাধানের কোনো সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছেন। বোম্বাইয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সভা আসন্ন। আমরা আশা করি বাংলার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ বোম্বাই অধিবেশনে এ সমস্যাকে সর্বভারতীয় আকার দানের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেবেন।

বন্দিনী নাগারাণী গুইদালো

নাগারাণী গুইদালোকে মুক্তি দেওয়ার জন্য জনসাধারণের দাবী বহুবার সরকারের নিকট গিয়েছে। প্রাদেশিক শাসন কর্তৃত্বের বহির্ভূত (excluded areas) বলে আসাম গবর্ণমেণ্ট গুই-দালোর মুক্তি সম্বন্ধে শুধু ভারত গবর্ণমেণ্টএর নিকট সুপারিশ পাঠিয়েছে। গবর্ণমেণ্টের তরফ হতে জানান হয়েছে গুইদালোকে মুক্তি দেওয়া হবেনা, কারণ বন্দিনী একজন জঘন্য ধর্মান্ধ নরঘাতী যাদুকরী, রাজনৈতিক কোন অপরাধ তার নেই। স্বার্থের জন্য লোক চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করা ইংরেজজাতির নূতন নয়। ভারতের ইতিহাসে তার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত রয়েছে। অতীতের কথা বাদ দিলেও দেখা যায় বৃটিশ মনোবৃত্তির এ বিষয়ে কোন পরিবর্তন হয় নেই। মিঃ ডিভেলারা একসময়ে ছিলেন ইংরেজের চোখে একজন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত জঘন্য চরিত্রের অপরাধী, আজ তিনি আয়র্লেণ্ডের সর্বজনপূজিত প্রেসিডেণ্ট।

সরকারের তরফ থেকে গুইদালোকে 'যাদুকরী' বলা হয়েছে। বিংশ শতাব্দীতেও যাদু বিদ্যা (?) আইনে দণ্ডনীয় হতে পারে আমাদের জানা নেই। মিঃ ম্যাকডোনাল্ড গুইদালোকে যাদুকরী বল্লেও দেশবাসী তাঁকে অন্য চোখে দেখে। ইংরেজের কৃপায় দেশপ্রেমিকা জোয়ান অব্ আর্ক ও যাদুকরী আখ্যা পেয়েছিলেন; কাজেই এ উক্তি যে নিছক স্বার্থ প্রণোদিত বলা নিষ্প্রয়োজন।

এসিয়াটিক বিল

দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন ব্যবস্থা পরিষদে এসিয়াটিক বিল (Asiatics Land and Trading Bill) পাশ হয়েছে। এ যদিও নামে এসিয়াটিক প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় প্রবাসীরাই তার লক্ষ্যস্থল। যদি কোন অঞ্চলের শতকরা ৭৫ জন ইউরোপীয় অধিবাসী কোন ভারতীয়কে তথায় থাকা অপছন্দ করে তবে তার সে অঞ্চল ত্যাগ করতে হবে। হিটলারের ইহুদী দলনে বর্বরতা আছে কিন্তু গোপনতা নেই। আফ্রিকান গভর্ণমেণ্টের বর্বরতা 'ভদ্রবেশী', কাজেই আইনের অবচ্ছায়ই তার আশ্রয়স্থল।

ভারতীয় প্রবাসী একটি বিরাট সমস্যারই অঙ্গ। সাময়িক চুক্তি, মীমাংসা, সর্ত্তবন্ধনে বা খণ্ডভাবে এ সমস্যার সমাধান হবে না। সমগ্রভাবে দেখতে গেলে এ সমস্যাটির উদ্ভব হয়েছে

সাম্রাজ্যবাদের ফলে এবং বিকৃতরূপ নিচ্ছে কায়েমী স্বার্থের প্ররোচনায়। কাজেই এর মৌলিক প্রতিকার নির্ভর করছে ভারতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের উপর। ভারতবাসী বৃটিশ শাসনের নাগ পাশ হতে মুক্ত হলেই শুধু প্রবাসীদের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন হতে পারে।

ইউরোপের সমস্যা

ইঙ্গরুষ আলোচনার পরিণতি এতদিনেও ঘটে উঠ্‌লো না। এত সহজেই যদি আক্রমণ বিরোধী সংহতি বানানো যায় তাহ'লে চেম্বারলেন-হোর-সাইমন ত্রিমূর্তির মর্যাদা বজায় থাকে কেমন করে? পার্লামেণ্টে চেম্বারলেন স্পষ্টই বলেছিলেন,—চুক্তি ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করা কোন কাজের কথা নয়, মেওয়া ফলাতে হলে সবুর করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। প্রবচনে আছে,—অতিবুদ্ধির নাকি অপঘাতে মৃত্যু। চেম্বারলেনের বাহাদুরী—দুনিয়ার গণতান্ত্রিক চেতনাকে তিনি অপঘাতের পথে টান্‌তে পেরেছেন। শ্যাম এবং কুল উভয় বজায় রাখার অসাধ্য সাধনায় বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতির অধ্যবসায়কে তারিফ না করে উপায় নেই। চেম্বারলেনের ধারণা—মারণ, উচাটন, বশীকরণ মন্ত্র তিনি সুন্দরভাবে আয়ত্ত করেছেন এবং মন্ত্রবলেই দুনিয়ায় শান্তি আস্‌বে। মন্ত্রকে সাধন করবার এবং তার জন্যে শরীর পাত করবার দরকারও যে থাক্‌তে পারে, চেম্বারলেনী স্মৃতিতে তার উল্লেখ নেই। বার বার ধাক্কা খেয়ে নিবৃত্তিনীতি (appeasement policy)র নেশা হয়ত কেটে গেছে, হয়ত সংহত আক্রমণবিরোধ-নীতিকে না স্বীকার করে পথ নেই। ফ্রান্সের বিধাতানির্দ্দিষ্ট পুরুষ (Man of Destiny) দালাদিয়ের চিকিৎসা পদ্ধতি হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রসম্মত। রোগ সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ নেই, লক্ষণগুলোকে দমন করতে পারলেই তাঁর হাতযশ। অতএব আন্তর্জাতিক চিকিৎসালয়ে তাঁর নিদানতত্ত্বের ব্যবহারিক মূল্য কি হবে বলা কঠিন নয়। চেম্বারলনী আঁচলে গেরো বেঁধে সাতপাক ঘুরে মন্ত্র উচ্চারণ করা ছাড়া তাঁর গতি আছে বলে মনে হয় না, কিন্তু অদৃষ্টে সহমরণ লেখা আছে কিনা কে জানে? পৃথিবীর পরিবর্তনের সঙ্গে যে রাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী এ কথা ফ্রান্সের রাষ্ট্রনিয়ামকদের বোঝানো কঠিন।

সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে একটা রফা করার ব্যবহারিক মূল্য যে আছে, ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের তাতে সন্দেহ নেই। পোল্যাণ্ড এবং রুমানিয়াকে বাঁচতে হলে সোভিয়েট সাহায্য যে কতটা দরকার ফ্রান্সের তা বুঝতে বাকী নেই। পোল্যাণ্ডের হয়ত গায়ের জোর কতকটা আছে, হয়ত তার চেয়েও বেশী আছে পিল্‌সুড্‌স্কী-বেক্-স্মিগলী রীজ্ প্রবর্তিত মনের জোর। কিন্তু রুমানিয়া আশ্রয়হীন হলেই উপায়হীন। বল্‌কানে সোভিয়েটই প্রকৃতপক্ষে শক্তির ভারসাম্য রক্ষা করছে এবং একথাও ঠিক যে বল্‌কানের স্থিতি সম্বন্ধে সোভিয়েটের আগ্রহ কম নেই। ইঙ্গ-তুরস্ক চুক্তি ব্যাপারেও সোভিয়েটের উৎসাহ বিশেষভাবেই লক্ষ্য করা গিছ্‌লো।

ফ্রান্সের আশা আছে ইংরেজ সোভিয়েট সর্তের হয়ত শতক্‌রা আশীভাগ মেনে নিয়ে শেষ

পর্য্যন্ত চুক্তিতে রাজী হবে। এতে করে মোটামুটি রকমের একটা সংহতি তৈরী হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু চুক্তিকে কার্যকরী করতে হলে আন্তরিকতা চাই। তাছাড়া শুধু সামরিক রফাতেই যে কর্তব্য শেষ হোলো তা নয়। "a collective peace system is poor sense if it means no more than a military alliance. The important work of building peace must begin and not end with the Russian agreement," সোভিয়েট সাহায্য সম্বন্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের আভ্যন্তরিক কোলাহল বড় কম হয় নি। বিচার্য বিষয়টা সম্বন্ধে কোলাহল-কারীদের মধ্যে যে সুষ্ঠু ধারণা আছে সেকথা ভাবা ভুল। রাজনীতিতে শক্তি সাম্যের আইনও এঁদের অপরিজ্ঞাত। আদর্শবাদের কল্পিত ভূত ঘাড়ে করে এঁরা বাস্তব রাজনীতিক্ষেত্রে মূর্খের মত গলাবাজী করছেন। "They have strayed into the realms of 'right' and 'left', make-belief occupying themselves with wish-fulfilling fancy", আদর্শের অসাম্য স্বীকার করে সোভিয়েটকে মিত্র সম্বোধন করার মধ্যে যে রাজনৈতিক শুভবুদ্ধি আছে, ক্ষীণদৃষ্টি চেম্বারলেনকে তা বোঝানো সহজ নয়। সোভিয়েটের দাবীতে অযৌক্তিক কিছু নেই। সমতা স্বীকার এবং পারস্পরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি জার্মানীর পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্তের অসহায় দেশগুলিসম্বন্ধে আক্রমণ বিরোধী অঙ্গীকার খুবই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব। কিন্তু প্রথম ও শেষোক্ত প্রস্তাবের উত্তরে ইংরাজের মনোভাব প্রসংশনীয় নয়। আক্রমণ-বিরোধী অঙ্গীকারটা যেন প্রথম থেকেই একটা ধাপ্পাবাজীর ওপর প্রতিষ্ঠা করা হচ্চে—সন্দেহকে অমূলক বলা যায় না।

এ্যাক্সিস শক্তিগুলোর গর্জ্জন যত, ভেতরের ক্ষমতা ঠিক ততটা কিনা সে নিয়ে রাজনৈতিক জুয়াখেলা অনেক রাষ্ট্রধুরন্ধরেরই মনের মধ্যে অহরহ চল্‌ছে। এ্যাক্সিসের মধ্যে গোপনে ভাঙন ধরেছে—এ খবরটা বড় বড় হরফে খবরের কাগজে মাঝে মাঝে কেন পাওয়া যায় তা বোঝা শক্ত নয়। বিশেষতঃ মুসোলিনীর তুরিন্ বক্তৃতার পর বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে একটী উৎসাহের সাড়া পড়ে গিছ্‌লো। ডান্‌জিগ্, পোল্যাণ্ড, ইঙ্গ-তুর্কী সন্ধি, ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দাবী—সব কিছুই শিকেয় তোলা রইল দেখে কেউ কেউ জামার হাতায় মুখ লুকিয়ে হাস্‌লেন। তারপর এলো মিলান্-চুক্তি এবং সামরিক-চুক্তি। হর্ষে বিষাদ হোলো। "শান্তি চাই কিন্তু তার সঙ্গে চাই বিচার।" "এদিকে রাজনৈতিক চক্ষু যাঁদের আছে তাঁরা বুঝেছেন ভিল্‌হেল্‌ম্‌স্‌হাভেনের বক্তৃতায় হিট্‌লার নাৎসী-প্রোগ্রামের এক নূতন ধূঁয়া ধরেছেন। আগে ছিল 'Valkstum'—জার্মাণ জাতির সংহতির চাহিদা; নতুন সুর হোলো 'lebensraum'—'জাতির মাথা গোঁজবার ঠাঁই'। এদিকে গোয়েবল্‌স্‌এর কৃপায় জাতির আবালবৃদ্ধবনিতা বুঝছে,—তথা-কথিত গণতন্ত্রগুলোর একমাত্র নীতি হচ্ছে জার্মানীকে ঘিরে ফেলা (encirclement)। ভবিষ্যত যুদ্ধের দায়িত্ব (war-guilty) সম্বন্ধে হয়তো আগে থাক্‌তেই সাফাই গেয়ে রাখা হোলো। এ্যাক্সিস্ শক্তির সামরিক তোড়জোড়গুলোও চোখ রাঙিয়ে এক দ্বিতীয় মিউনিখ্ চুক্তি আদায় করা ছাড়া আর কিছুই নয়—এমনতরো কল্পনা-বিলাসী একদল উটপাখী প্রায়ই করে থাকেন। জার্মানীর

পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব-প্রান্তে, লিবিয়া ও ইজিপ্টের সন্ধিস্থানে, ডোডেকানীজ্ দ্বীপে, স্পেন ও তদাশ্রিত মরক্কোয় সৈন্যসমাবেশ, ইটালীয় ও জার্মান নৌবহরের গতিবিধি ইত্যাদি সবই একটা চোখ-রাঙানীর ভূমিকা—একথা মনে করা কঠিন।

চেম্বারলেনী দোটানার গোড়ার গলদটা হচ্ছে ফাশিস্ত গোষ্ঠীর হালচাল-গুলোকে ঠিকমত বুঝতে না পারা। আদর্শের সংঘাত সম্বন্ধে আশঙ্কাও সহজ পথে চলার একটা বিরাট বাধা। তার পরে রয়েছে পররাষ্ট্রনীতির মামুলি জড়তা। নিষ্ক্রিয়তাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা চলেছে ফাঁকা আওয়াজ আর ফাঁকি দিয়ে। কথার পর কথা বাড়্ছে কাজ এগোচ্ছেনা। পার্লামেণ্ট-সদস্যদের সম্বন্ধে পিলসুড্স্কীর মনোভাব মনে পড়ে। "Even the flies cannot bear your prattle, gentlemen, and when they try to spread their wings they fail half dead from boredom." ফাশিস্ত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে আজ সারা দুনিয়ায় একটা moral passion (নৈতিক বিক্ষোভ) জেগে উঠেছিল। "ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তি" ব্যর্থ হলে সে জাগরণ আপাততঃ নিষ্ফল হবে।
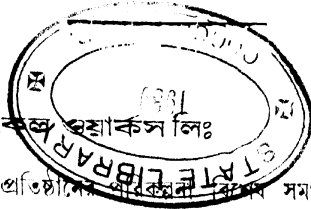
উৎকল সল্ট ও কেমিক্যাল্স্ ওয়ার্কস লিঃ

কটকে এই দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা বিশেষ সমর্থনযোগ্য। বাঙ্গলা, বিহার ও উড়িষ্যা ১৪০ লক্ষমণ লবন প্রতি বছর আমদানী করে। কাজেই এসকল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়। আমরা এ সাধু উদ্দেশ্যের সাফল্য কামনা করি।

বেঙ্গল পাব্লিসিটি সিণ্ডিকেট্

মুক্ত রাজবন্দী পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানটি আজ একবৎসর যাবত বেশ কৃতিত্বের সহিত কাজ করে আস্ছে। প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে অনেক বিশিষ্ট নাগরিক উপস্থিত ছিলেন। দেশবাসীর সাহায্যও সহানুভূতি পেয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি উত্তোরত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা।
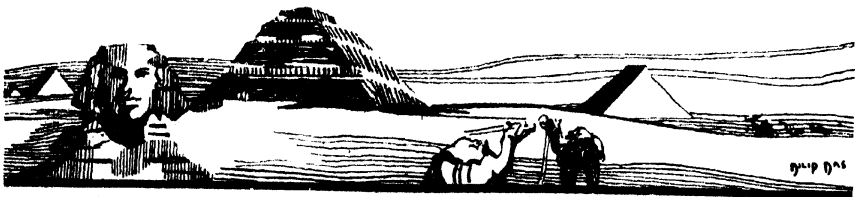
অষ্টম বর্ষ | শ্রাবণ ১৩৪৬ | দ্বিতীয় সংখ্যা

অঞ্জলি

শৈলবাসিনী দেবী

প্রদোষের অন্ধকার থেকে
যে নৈবেদ্য প্রতি দিন তোমার অলক্ষ্যে গেছি রেখে
কজ্জল রজনী মাঝে লিখা
কম্পমান হাতে জ্বালা তৈলহীন ধূম্রলীন শিখা।

বসন্ত সন্ধ্যায় মোর আষাঢ়ের জলভরা সাঁঝে
হৃদয় উদ্বেল করি প্রত্যহের তুচ্ছতম কাজে
যে ধ্বনি বেজেছে অবিরাম
ভুবন আড়াল করি জাগায়েছে রূপ অভিরাম।
কি ছিল নিখিলে মোর কি ছিল জীবনে
যদি জল সম্ভূত প্রত্যুষ পবনে
সীমাহীন বেদনার সিন্ধু করি পার
সুদূর দিগন্তে নাহি প্রকাশিত মূরতি তোমার।

নিমেষে উজ্জ্বল করি বিশ্বপটভূমি
যে দিন দাঁড়ায়েছিলে তুমি
শূন্য এ হৃদয় মাঝে অন্ধ এই নয়ন সম্মুখে
সব সুখে দুখে
লাগে তীব্র স্পর্শখানি কার
মাটির মূর্ত্তিতে মোর সে প্রথম জীবন সঞ্চার
সে দিন প্রথম লাগে ভালো
সপ্তপর্ণ কিশলয়ে প্রভাতের আরক্তিম আলো
সে দিন সহসা চিত্তে মম
বিশ্বের ঐশ্বর্য্য এলো বল্গাহীন তুরঙ্গম সম।
আপনার দুরন্ত আহ্বানে
বেদনা অমৃত হয়ে হৃদয়ে মাধুরী ভরে আনে।
তখন ভেবেছি মনে প্রসাদ ফিরিয়া নাহি চাব
অদৃশ্য মন্দিরে তব অমলিন অঞ্জলি পাঠাব
যদি সেই বরমাল্যে ম্লান আজ দেখো কোন ফুল
সে আমারি দৈন্য প্রভু আমার ভাগ্যের তাহা ভুল
তবু তুমি ফিরে চাও তবু তুমি ফিরায়োনা মুখ —
অতল বিরহ মাঝে নিয়ত উন্মুখ
কেন কাঁদে ক্ষুধা
বনপুষ্প রন্ধ্রচারী পতঙ্গের মত খুঁজে সুধা।
কেন তৃষ্ণা তারি তরে ঘুরে
যে অলব্ধ সরে যায় দূর হতে দূরে
ঢালি শুধু স্বপ্ন সুধা তার —
যৌবন বিশীর্ণ মম বহি সেই সীমাহীন ভার —
বিনিদ্র রজনী কেন, জানিনা কি লাগি জেগে থাকি
হৃদয় দেহলী পরে প্রত্যাশার পুষ্প কেন রাখি ?
কেন ভুল করি
আমার যা নহে তাহা নিত্য খুঁজে মরি —
তবু তুমি ফিরে চাও তবু তুমি ফিরায়োনা আঁখি
সবার অলক্ষ্যে যাহা রাখি

শ্রীহীন স্বরূপ মোর আনি সেই ভুলে ভরা প্রাণ
উন্মুক্ত প্রকাশে হোক এ চরম পূজা অবসান
সে শুধু আনন্দ নহে নহে শুধু সুস্নিগ্ধ প্রণতি
সন্তপ্ত সলিলময় নহে শুধু বেদনার জ্যোতি।
সমস্ত জীবন মম নিয়ে তার তুচ্ছতম ভার
তোমার চরণে দেব পরিপূর্ণ অঞ্জলি আমার
মিথ্যা হোক সব গর্ব মম
ম্লান যদি লাগে অর্ঘ্য গোধুলির সূর্য্যালোক সম
তবু ফেলে সব লজ্জা ফেলে দিয়ে ক্ষীণতম আশা
প্রত্যহ পাঠাব মোর বেদনা-নিমগ্ন ভালবাসা।

বিবাহ ও প্রেম

অনিল চন্দ্র রায়

বিবাহ ও প্রেম সম্বন্ধে আধুনিক মানুষের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে। আমাদের দেশেও এ প্রশ্ন উঠিয়াছে। সমাজতন্ত্রের দিক হইতে এ সমস্যা সম্বন্ধে আমাদের বাংলা সাহিত্যে বিচারমূলক আলোচনা তেমন হইয়াছে বলিয়া জানিনা। "নারীর মূল্য," "নারীর কথা" ইত্যাদি কয়েকখানা সুচিন্তিত বই বাহির হইলেও, এই গুরুতর বিষয়ে যথোচিত আলোচনা হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। "কবিতা" নামক পত্রিকার পৃষ্ঠায় সম্পাদক শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া এই সম্বন্ধে সমাজতাত্ত্বিক বিচার উত্থাপন করিয়াছেন। এই ধরণের বিচারমূলক প্রবন্ধ সর্ব্বদাই আদরণীয়। এই প্রবন্ধে উল্লিখিত মতামত সম্বন্ধে আমরা কিঞ্চিত আলোচনা করিব।

বিবাহ ও প্রেম সম্বন্ধে বুদ্ধদেব তাঁহার আদর্শ বিবৃত করিয়াছেন। আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্গে বিবাহ ও প্রেমের গভীর সম্বন্ধ রহিয়াছে; সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিবাহ ও প্রেম হইবে শৃঙ্খল-মুক্ত। কারণ নরনারী হইবে সমান, সামাজিক এবং আর্থিক ব্যবস্থায়, মর্য্যাদায় এবং অধিকারে। এই পর্য্যন্ত আমাদের কোন আপত্তি নাই, কারণ যে কোন সাম্যবাদী বিবাহ ও যৌন সম্বন্ধকে আর্থিক সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। সমাজতান্ত্রিক সাম্যে অর্থের নিপীড়ন লুপ্ত

হইবে। পুরুষের অর্থনৈতিক প্রাধান্য লুপ্ত হইলে নরনারীর যোগ্যতর সম্পর্কের একটা প্রথম নম্বরের বাধা অপসারিত হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতেই প্রেম ও বিবাহ সর্ব্বাঙ্গীন মুক্তি লাভ করিবে একথা যৌক্তিক নয়। যাহারা প্রত্যেকটী সামাজিক অনুষ্ঠানের আর্থিক ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন তাঁহারাই বলিয়া থাকেন যে আর্থিক বাধা অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে সকল ব্যাভিচার ও বিকৃতির ছিদ্রপথ রুদ্ধ হইয়া যাইবে। মানুষের জীবনে বুভুক্ষা-বৃত্তি এবং যৌন-বৃত্তি এই দুই-ই অতি প্রবল এবং প্রাথমিক। কোন বুভুক্ষ-নির্ব্বানের ব্যবস্থা ঘটিলেই যৌনসমস্যার আত্যন্তিক সমাধান ঘটীবে, একথা একদেশদর্শী। একদা ইংলণ্ডের জেম্‌স্ হিন্টন্ (James Hinton) প্রচার করিয়াছেন যে নারীসমস্যার সমাধান হইলেই সকল রকমের সমাজ-সমস্যার চূড়ান্ত সমাধান হইবে। অপর পক্ষে জার্ম্মানীর অগাষ্ট বেবেল (August Bebel) আবার প্রচার করিয়াছেন যে আর্থিক সমস্যার সমাধানেই নারীসমস্যার সমাধান আসিবে। বর্ত্তমান কালেও মার্ক্সবাদীরা বলেন যে অর্থনীতির জট খুলিয়া ফেলিতে পারিলেই যৌন-জীবনের সকল জটীলতার অবসান হইবে। অপর পক্ষে ফ্রয়েডীয়-গণ বলেন যে যৌন-জীবনের সমাধান করিলেই সমগ্র জীবনের সকল প্রশ্নের সমাধান ঘটিবে। আমাদের মতে এই দুই মতই একদেশদর্শী এবং অসম্পূর্ণ। যুক্তিবাদী বার্ট্রাণ্ড রাসেলও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। *

দ্বিতীয়তঃ, যন্ত্রবিপ্লব ও বণিকবিপ্লব হইতেই ব্যক্তির, অতএব প্রেমের মুক্তি য়ুরোপে ঘটিয়াছে, একথা ষোল আনা ঠিক নয়। যন্ত্রবিপ্লব পুরান সমাজের বন্ধনকে শিথিল করিয়া ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়াছে আর্থিক ক্ষেত্রে। এই আর্থিক বন্ধনমোচন মানুষের সামাজিক জীবনের অন্যান্য বহু ক্ষেত্রেই তাহার প্রভাবপাত করিয়াছে। সমাজজীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র পরস্পরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগে যুক্ত। এক ক্ষেত্রে আঘাত স্বভাবতই অন্য ক্ষেত্রে প্রতিঘাত সৃষ্টি করে। আর্থিক ব্যবস্থায় একটা বড় রকমের ওলট পালট ঘটিয়া গেলে সমাজ জীবনের অন্যান্য ব্যবস্থায়ও নাড়া পড়িবে, ইহা সমাজনীতির মৌলিক নীতি মাত্র। কাজেই যন্ত্রবিপ্লব বা বণিকবিপ্লব যে সে যুগের মানুষের যৌন জীবনেও তার প্রভাব ছড়াইয়া দিবে, তাহা অতি স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলিয়া সে যুগের যৌন জীবনের সকল বিপর্য্যয়ই একমাত্র যন্ত্র-বা-বণিক বিপ্লবের সৃজন, একথা স্বীকর্য্য নয়। ম্যাক্স বেবার (Max Weber) নামক সমাজতাত্ত্বিক মার্ক্সীয় ক্রমের বিপরীত ক্রমের (causal sequence) ভিত্তিতে সমাজবিবর্ত্তনকে বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁর মতে "cultural phenomena are neither the result nor a mere function of economic phenomena........" তাঁহার বিখ্যাত গবেষণার প্রতিপাদিত তত্ত্ব হইল মার্ক্সীয় তত্ত্বের বিপরীত তত্ত্ব। ধর্ম্ম বা নীতির

* I do not myself adhere to either school, since the interconnections of economics and sex do not appear to me to show any clear. primacy of the one over the other from the point of view of causal efficacy,"

(Marriage and Morals)

প্রভাবেই অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, ইহাই তাঁহার মূল প্রতিপাদন। বণিকবিপ্লবের বা যন্ত্র বিপ্লবের মূলে আছে নীতিগত পরিবর্তন। মানুষের জীবন যাপনের নীতিতে আগে ঘটিয়াছে গভীর পরিবর্ত্তন, এবং তারই ফলে পরে সম্ভব হইয়াছে আর্থিক ক্ষেত্রে যন্ত্রবিপ্লব *। এই নৈতিক বিপ্লব ঘটাইয়াছে প্রোটেষ্টাণ্ট্ ধর্ম্ম। প্রেটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মের যে ব্যবহারিক নীতি — যা বেবারের ভাষায় "Vocational ethics",—তাহাই তদানীন্তন যুগের মানুষের মনোবৃত্তিকে যন্ত্রবিপ্লবের উপযোগী করিয়া গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। কাজেই আগে নৈতিক বিপ্লব, পরে যন্ত্রবিপ্লব। ধনতন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে প্রটেষ্টাণ্টীয় নীতির গোমুখী হইতে। মার্ক্স যেমন ঘোষণা করিয়াছেন যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন রীতি হইতেই প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম জন্ম লইয়াছে, বেবার তেমনি ঘোষণা করিয়াছেন যে প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মই হইল ধনতন্ত্রের জননী। তেমনি যৌন জীবনকেও কেবলমাত্র যন্ত্রবিপ্লব বা অন্য কোন আর্থিক ঘটনাচক্রের কার্য্যফল বলিয়া ব্যাখ্যা করাও সমাজতত্ত্বের অনুমোদিত কার্য্য-কারণ-ক্রম নয়। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের মতে যন্ত্রবিপ্লবের গোড়ায় কাজ করিয়াছে প্যুরিটানদের নৈতিক বিশুদ্ধি এবং যৌন সংযম। প্যুরিটানীয় নৈতিক মনোভাব ব্যতীত ধনতন্ত্রের উদ্ভব কঠিন হইত। †

তৃতীয়তঃ, প্রেম এবং যৌনসঙ্গম পরস্পর বিরোধী, এই ধারণাকে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু শৈশব-সুলভ এবং অবাস্তব বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রাচীন এবং মধ্যযুগে প্রেম এবং যৌনসঙ্গম বিচ্ছিন্ন এবং বিরোধী হইয়াছিল এবং আধুনিক যুগেই কেবল ইহাদের মিলন ঘটিয়াছে বিবাহ অনুসন্ধানে। বুদ্ধদেবের এই মত অনৈতিহাসিক। শরীর-রহিত প্রেমের ধারণা পৃথিবীর সকল সমাজেই পরিচিত। শুধু প্রাচীন বা মধ্যযুগে নয়, অদ্যতন কালেও এই ধারণা নানা আকারে পৃথিবীতে প্রচলিত রহিয়াছে। প্রাচীন কালে যেমন, তেমনি মধ্যযুগেও যৌনসঙ্গমবিরহিত বিশুদ্ধ প্রেমের প্রভাব সমাজে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। আজকাল ও যে ইহার প্রভাব হইতে মানুষ মুক্ত হইয়াছে তাহা বলা চলে না। এই ধারণার জন্ম হইয়াছে মানুষের আধ্যাত্মিক প্রবণতা হইতে, বিশেষ ধরণের একটা নৈতিক সংস্কৃতি হইতে। কিন্তু এই শ্রেণীর প্রবণতা সার্ব্বজনীন ব্যবহারে পরিণত হয় নাই কোনো কালেই। নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক মানুষের মধ্যেই এই আধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিকতা আবদ্ধ ছিলো চিরকাল। অপর লোকে এই অশরীরী প্রেমকে প্রশংসার চোখে দেখিয়া আসিয়াছে কিন্তু সমাজ-জীবনে ব্যবহারিক ভাবে এই ধরণের প্রেম ব্যাপকভাবে ফলবান্ হয় নাই। মিষ্টিকদের একচেটীয়া সম্পত্তি হইয়াই চিরদিন রহিয়াছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম বা বৈষ্ণবী পরকীয়া সমাজগত বা সার্ব্বজনীন আকারে সমষ্টির ব্যবহারে পরিণত হয় নাই কোনো যুগেও। গ্রীক

* "........because a rational technique and rational law, as well as an economic rationalism, in their origin are dependent on the capacity and predisposition of men to a certain kind of a practical manner of living........" (Weber).

† "........no doubt, the industrial revolution has had and will have a profound influence upon sexual morals but conversely the sexul virtue of the puritans was psychologically necessary as a part cause of the industrial revolution."

(Marriage & Morals)

সমাজের জীবনাদর্শ ছিল শরীরামোদী, একান্ত ভাবে দৈহিক এবং স্থুল ঐশ্বর্য্যে সমৃদ্ধ। তবে কোনো বিশেষ অবস্থা সজ্ঘাতের পরিণামে সেখানেও এককালে বিবাহ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল প্রেম-বহির্ভূত। সেই কালে বিবাহের গণ্ডীর বাহিরে মানুষ রচনা করিত তাহাদের প্রেমের ক্ষেত্র। অতৃপ্তিজনক বিবাহবন্ধন মানুষকে তাড়াইয়া লইয়া যাইত বিবাহ-ব্যতিরিক্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে, প্রেমের সন্ধানে। কিন্তু এই প্রেমও শরীর-রহিত প্রেম নয়, দেহাসক্ত প্রেমই বটে। এই যুগেও প্রেম যৌন-সঙ্গম-বিরোধী, একথা ঠিক নয়।

রোমীয় যুগেও প্রেম এবং যৌনসঙ্গমের বিচ্ছেদ ঘটে নাই। বিবাহ এই যুগে পোক্ত ইমারতের মত গড়িয়া উঠিয়াছে, বিধিবদ্ধ ব্যবস্থায়, শক্ত পারিবারিক বন্ধনের মধ্যে বিবাহ ভাবজীবন এবং যৌনজীবনকে একত্র বাঁধিয়া রাখিয়াছে। সাধারণ অর্থে প্রেম বলিতে একটা মিশ্র মনোভাবকেই বোঝায়; প্রেমের মধ্যে জড়াজড়ি করিয়া আছে দুইটী ভিন্ন মনোভাব: একটী দেহাভিসারী (physical), অপরটী ভাবানুসারী (psychological)। একটী দৈহিক, অন্যটী মানসিক। প্রাকৃত দৃষ্টিতে একটি অন্যটীর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু মিষ্টিক-গণ এই প্রেম হইতে দৈহিক অংশকে ছাঁটিয়া ফেলিয়া অশরীরী প্রেমের সাধনাকে সজোরে ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিভাষায় তাই কাম এবং প্রেম পৃথক, কারণ কাম দৈহিক এবং প্রেম শুধুই মানসিক, নিছক ইন্দ্রিয় প্রীতিই কাম। আর অতীন্দ্রিয় যে প্রীতি তাহাই প্রেম। এই মিষ্টিক প্রেমের সাধনা হইল কামোত্তর। ইহার অর্থ এই নয় যে কাম এবং প্রেমের মধ্যে দুস্তর বৈরীতা রহিয়াছে। দেহ ও মন যেমন অচ্ছেদ্য তেমনি অচ্ছেদ্য এই কাম এবং প্রেম। প্রকৃত প্রস্তাবে কাম এবং প্রেম একই শক্তির দুইমুখী রূপ। শক্তি এক অদ্বিতীয় এবং অবিচ্ছেদ্য। তাহারই রূপবিভেদে দৈহিক এবং মানসিক ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে। কাজেই মিষ্টিকের সাধনা শক্তির রূপান্তর মাত্র। কামকে ছিঁড়িয়া লইয়া বর্জ্জন করিয়া প্রেমসাধনা নহে; যে শক্তি জীবন-বিলাসের উৎস তাহাকেই রূপান্তরিত করিয়া প্রেমে পরিণত করা; দৈহিকের স্তরকে ছাড়াইয়া বিদেহী স্তরে উত্তীর্ণ করা। কাজেই ঘরে ব্রাহ্মণী আছেন বলিয়াই "কামগন্ধ নাহি তায়", একথা নয়। কারণ ব্রাহ্মণী থাকিলেও রজকিনী প্রেমে কামসঞ্চার করা সম্ভব হয়। প্রাচ্যে, পাশ্চাত্যে, অতীতে, বর্ত্তমানে, সর্ব্বকালে ও দেশে লাম্পট্যের, গণিকাবৃত্তির ও ব্যাভিচারের অভাব নাই, একথা বুদ্ধদেব বসুই নির্দ্দেশ করিতেছেন। এসব ক্ষেত্রে ঘরে ঘরে রোরুদ্যমানা, অথবা গর্জ্জমানা ব্রাহ্মণীগণ বিবাহব্যাতিরিক্ত ক্ষেত্রে কাম সঞ্চারে বাঁধা উৎপাদন করিতে পারেন নাই। কস্মিন কালেও পারিবেন না। কাজেই "পরস্ত্রী সঙ্গম সুসাধ্য নয় বলেই য়ুরোপের রোমান কাব্যে ও আমাদের বৈষ্ণবকাব্যে প্রেম সম্বন্ধে একটী অশরীরি বাস্তববিমুখ আদর্শবাদ পাওয়া যায়",—একথা ভিত্তিহীন। আদর্শানুরক্তির জন্যই এই কামগন্ধহীন প্রেমের পিছনে মানুষ গিয়াছে, নিরাপদ বলিয়া নয়; কারণ কামানুরক্ত মানব আপদের মুখে প্রবেশ করিতে দ্বিধা করে না, ইহা দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ ঘটনা।

মধ্যযুগের পূর্ব্বে য়ুরোপে অন্ধকার যুগ অবতরণ করিয়াছিল। সেই যুগে খৃষ্টধর্ম্ম এবং বর্ব্বর

প্রাধান্য, এই দুইয়ে মিলিয়া যৌনজীবনের অধঃপতন ঘটাইয়াছিল। বিশেষতঃ খৃষ্টধর্ম্মের কঠোর বৈরাগ্য-যোগ দেহকে, তথা যৌনসঙ্গমকে, ঘৃণা করিতে শিখাইল। পাদ্রীদের মধ্যে অসম্ভব কদর্য্যতা ও ব্যভিচার সমস্ত মধ্যযুগ ভরিয়া মহামারীর মত ছাইয়া গিয়াছিল। এই অবস্থায় যৌনক্রিয়ার উপর অশ্লীলতার কলঙ্ক আঁটিয়া বসিয়াছিল। যৌনক্রিয়াকে নরকের পথ বলিয়াই সর্ব্বসাধারণ মনে করিত। অতি স্বাভাবিক যে, প্রেমাস্পদের সহিত যৌনক্রিয়াকে সংশ্লিষ্ট করিতে লোকের তখন ঘৃণা হইত। ফলে প্রেম হইয়া দাঁড়াইল কাল্পনিক এবং প্রতীক-প্রবণ (symbolistic)। অবশেষে প্রেমের পরিণতি হইল প্রাণহীন, রক্তহীন কাব্যিকতায়, যাহাকে বলা যায় Platonic। কবি প্রেমব্যাকুলতা প্রকাশ করেন কিন্তু মিলনেচ্ছা নাই। প্রেম শেষপর্য্যন্ত একটা সাহিত্যিক রীতিতে মাত্র পর্য্যবসিত হইল। ইতালীতেই বিশেষ করিয়া এই পরিণতি দেখিতে পাই। ফরাসী ও বার্গান্ডীতে নাইটদের প্রণয়রীতি একটু অন্যরূপ হইয়াছিল। অতৃপ্ত কামনাকে প্রণয়ের কেন্দ্র তাহারা করেন নাই। বেশীদিন অন্যত্রও এই অস্বাভাবিক পরিণাম টিকিয়া থাকে নাই। রেনেসাঁসের সঙ্গে প্লেটোনিক প্রেমের বদলে নতুন রোমাণ্টিক প্রেমের অভ্যুদয় হইল। ১৯ শতক পর্য্যন্ত এই রোমাণ্টিক প্রেম মানুষকে আন্দোলিত করিয়াছে। রোমাণ্টিক যুগের প্রেমে শরীর আপনার আসল ফিরিয়া পাইয়াছে। দেহ এবং বিদেহ মিলিয়া মানব-প্রেম পরিপূর্ণতার নির্বাধ আনন্দে ফিরিয়া আসিয়াছে।

মধ্যযুগে একটা বিশেষ কারণে প্লেটোনিক প্রেম নামক্ এক প্রকারের সাহিত্যিক প্রণয় য়ুরোপে গজাইয়া উঠিয়াছিল। সে সময়ে কাগজে-কলমের এই প্রেমের সঙ্গে যৌনসঙ্গমের কোন সম্পর্ক ছিল না। থাকিবে কি করিয়া? এ নিতান্তই কৃত্রিম সৃজন এবং সাধারণের বিপুল জীবন-স্রোতের সহিত ইহার লেশমাত্র যোগ ছিল না। মুষ্টিমেয় নাইটকে সেই যুগের নরনারীর যৌন এবং ভাবজীবনের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিলে গুরুতর ভুল করা হইবে। এদিক হইতে বলা চলে যে, জনসাধারণের জীবনেও বিবাহে প্রেম এবং যৌনবৃত্তির সঙ্গম ঘটে নাই, একথার প্রমাণ নাই। জনগণের জীবনে প্রেম এবং যৌনসঙ্গমের বিরোধ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর মতে বর্ত্তমান যুগেই আধুনিক বিবাহে প্রেম এবং যৌন-বৃত্তির সত্যি সত্যি সঙ্গতি হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রেম এবং যৌনসঙ্গম আজকালই বরং প্রবলতর ভাবে বিরোধী হইয়া পড়িতেছে। জন্মসংরোধ (Contraceptive) এবং জননতত্ত্ব (Eugenics) এই দুইয়ের বৈজ্ঞানিক প্রভাব বিবাহ অনুষ্ঠানে বিপ্লব ঘটাইতেছে। রাসেলের মতে সতীত্বের প্রয়োজনই নাই; একনিষ্ঠতাও নিতান্ত নিরর্থক। বন্ধুত্বের সঙ্গে সঙ্গে যৌন সঙ্গমও পতিপত্নী ছাড়াও বহুসংখ্যকের মধ্যে ব্যাপ্ত হওয়া উচিত। উপযুক্ত সন্তানের জন্য পত্নী বা পতিকে বরণ করিবে, কিন্তু আনন্দের খোরাক জোগাইবার বেলায় পত্নী বা পতিই যোগ্যতম ব্যক্তি না-ও হইতে পারেন। কেবল আনন্দ সংগ্রহের তরে পত্নী বা পতি ব্যতীত অন্যান্য বান্ধব-বান্ধবীদের সঙ্গে

রতিক্রিয়া প্রশস্ততর ব্যবস্থা।* কাজেই আধুনিক যুগেই দেখিতেছি প্রেম এবং যৌন সঙ্গম পরস্পর বিরোধী হইবার উপক্রম হইতেছে এবং এই বিরোধ ঘটাইতেছে বিজ্ঞান। ইহাছাড়া গণিকাবৃত্তি যতদিন সমাজে রহিয়াছে ততদিন প্রেমে এবং যৌনসঙ্গমে বিচ্ছেদও রহিয়াছে। ইহা কেবল মধ্যযুগের অপরিণত মনোভাবের জন্য নয়; ইহা মানবপ্রকৃতির অনিবার্য্য অঙ্গ বলিয়া। প্রেমহীন রতিক্রিয়া আধুনিক রুচিতে পাপ বই আর কিছুই নয়। কিন্তু কেবল মাত্র দৈহিক প্রয়োজনও মানুষকে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত করে, এ কথা কে অস্বীকার করিবে? নাবিকরা বহুদিন সমুদ্রে কাটাইয়া তীরের বন্দরে আসিলে, তাহারা নিছক শারীরিক প্রয়োজনে প্রবর্ত্তিত হইবে। অপরিচিত ভূমিতে প্রেম প্রণোদিত হইয়া নারী তাহাদের সমীপে উপগত হইবে, এই জন্য তাহারা ধৈর্য্য ধরিয়া প্রতীক্ষা করিবে মানসীর আশায়, ইহা অসম্ভব। রাসেল তাই বলেন, 'I donot think that prostitution can be abolished wholly" এসব ক্ষেত্রেও প্রেমহীন রতিক্রিয়া নিবারণ করা দুঃসাধ্য।

তাহা ছাড়া আধুনিক (অত্যাধুনিক?) কালেরই বরং এই মনোবৃত্তি বহুল পরিমাণে দেখা যায় যে প্রেম বস্তুটাই নিছক কবিকল্পনা এবং অসম্ভব। বর্ত্তমান যুগের বিজ্ঞান, বিশেষ করিয়া বায়োলজি, এণ্ডোক্রিনোলজি (Endrocrynology) এবং সাইকলজি, প্রেম নামক কোনো রোমান্টিক বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করে না, এই রকমের কথা একদল লোকের মুখে অহরহই ধ্বনিত হইতেছে। মহাযুদ্ধের পরে য়ুরোপ, আমেরিকার তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এই মনোভাবের প্রবল প্রভাব দেখা গিয়াছে। প্রেম বলিয়া কোন বিশেষ অনুভূতি মানব জীবনে নাই; যাহা আছে তাহা হইল অবিমিশ্র যৌন অনুভূতির দৈহিক প্রতিক্রিয়া মাত্র। বিহেভারিষ্টরা (Behavourist) তো মনকেই স্বীকার করে না, প্রেম নামক কোন মানসিক বৃত্তির অস্তিত্ব তো দূরের কথা। আধুনিক রাশিয়ায়ও বিপ্লবোত্তর যুগে প্রেমকে "physiology" তে পরিণত করিবার প্রয়াস দেখা গিয়াছিল। আধুনিক পৃথিবীতে বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষিত হইতেছে; কাজেই প্রেম এবং যৌন সঙ্গমের সামঞ্জস্যমূলক যে বিবাহকে বুদ্ধদেব বসু আধুনিক আদর্শ বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন সেই ধরণের প্রতিষ্ঠাকে সাংঘাতিক লোক আজকাল সেকেলে বলিয়া বর্জন করিতেছে। কাজেই প্রেম এবং যৌন সঙ্গম বিরোধী, এই ধারণা অপরিণত মানসিক অবস্থা নিতান্ত সেকেলে মনোভাব হইতে জাত, একথা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণে টিকে না।

শ্রীযুত বুদ্ধদেবের চতুর্থ প্রস্তাব হইল ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের ইতিহাস সংক্রান্ত। এলিজাবেথ যুগ হইল বিবাহের ক্ষেত্রে সমাজব্যবস্থার উপর ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের জয়ের যুগ। তাঁহার মতে সেই যুগ হইতে ১৯ শতক পর্য্যন্ত আগাগোড়াই ব্যক্তির বিজয়ের কাল। কিন্তু আমাদের মতে ১৯ শতক বা ভিক্টোরীয় যুগ ব্যক্তির উপর সমাজব্যবস্থার বিজয়ের যুগ। সারা ভিক্টোরীয় যুগ

* "There will therefore, be no very cogent reason why a women should choose as the father of her child the man whom she prefers as a lover or a companion." (Rusell: Marriage & Morals).

ভরিয়া বিবাহ সম্বন্ধে যে ধারণা পাই তাহাতে ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোন স্থান বা মূল্য নাই। বিবাহ ও প্রেমকে লৌহবন্ধনে বাঁধিয়া সমাজ জগন্নাথের রথ চালাইয়া দিয়াছে ব্যক্তির অধিকার ও মর্য্যাদাকে ধূলিধূসরিত করিয়া। নারীর মর্য্যাদা এই যুগে বৃহৎ একটি শূন্যতে পর্য্যবসিত। বিবাহক্ষেত্রে এই যুগ হইল পৈত্রিক শাসন ও নির্ব্বাচনের (Parental choice) যুগ। কাজেই ১৯ শতককে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যের বিজয়ের যুগ বলা ঐতিহাসিক নহে। আর্থিক ক্ষেত্রে সারা ১৯ শতক ব্যক্তিবাদের যুগ। ধনতন্ত্র এ যুগে বহু শাখায় পল্লবিত হইয়া নিরঙ্কুশ পরিণতি পাইয়াছে। এই যুগ অব্যাহত ব্যক্তিবাদ (Individualism), তথা উদারনীতির (Liberalism) যুগ। আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যক্তিবাদ জয়লাভ করিলেও বিবাহ ও প্রেমের ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এই যুগে জয়লাভ করিতে পারে নাই। সমাজ শাসন এবং সমষ্টির নিয়ন্ত্রণ এইকালে প্রবলতম—শেলীর মতন রোমাণ্টিক কবিরা দু'চার জন সমাজের বিরুদ্ধে যতই না কেন বিদ্রোহ-সূচক কাব্যগুঞ্জন তুলুক। এই ধরণের অসঙ্গতিতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। সমাজজীবনের রীতি এমনই বিচিত্র। সমুদ্রের ঢেউয়ের ওঠানামার রীতিরই মতন তাহার উত্থানপতনের রীতি। ঢেউয়ের একদিকে উচ্চ শীর্ষের সঙ্গে সঙ্গে থাকে অপরদিকের অবনমন (depression)। সামাজজীবনেও একই যুগে এক ক্ষেত্রে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জয়ের পাশাপাশি অপর ক্ষেত্রে বৈজয়ন্তী উড়িতে থাকে নিষ্ঠুর সমাজ শাসনের। ১৯ শতকে আর্থিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির বিজয় ঘটিল, কিন্তু বিবাহক্ষেত্রে রহিল সমাজের (collectivism) অব্যাহত প্রতিপত্তি। আবার বিংশ শতকের মধ্যভাগে আর্থিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্রের যুগ আগত হইতেছে কিন্তু এ যুগের প্রেম ও বিবাহের আদর্শ হইল নিতান্ত ব্যক্তিতান্ত্রিক। আর্থিক ক্ষেত্রে সমাজের আদর্শ যখন সমাজতন্ত্র, বিবাহের ক্ষেত্রে আদর্শ তখন ব্যক্তিতন্ত্র। মহাযুদ্ধের পর হইতেই বিশেষ করিয়া এই ব্যক্তিতন্ত্র প্রসার লাভ করিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে, বিবাহের ক্ষেত্রে অন্ততঃ, ব্যক্তিতন্ত্র আগত হয় নাই। বিবাহে মার্ক্সীয় মতবাদও ব্যক্তিতান্ত্রিক।

পঞ্চম প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু আধুনিক বিবাহের পরিকল্পনা বিবৃত করিয়াছেন। তাঁহার মতে বিবাহ হইবে পুত্র বর্জ্জিত, কারণ পুত্রাকাঙ্ক্ষা নিতান্তই বর্ব্বর মনোভাব। যৌনকামনা হইতে পুত্রকামনা তিরোহিত হইবে, ইহাই তাঁহার মতে ভবিষ্যতে আদর্শ। এ বিষয়ে কোন বৈজ্ঞানিক তাঁহার সহিত একমত হইবেন না। আমরাও তাহার সঙ্গে একমত নই। বিবাহের মধ্যে আছে চারটী অঙ্গ (১) ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি (২) স্বামী-স্ত্রীর সাথিত্ব ও বন্ধুত্ব (৩) নানা প্রকার আনুষঙ্গিক সুবিধা (৪) সন্তান-কামনা। ইহার ভিতরে সন্তানের প্রয়োজনীয়তা সকল রকমেই বিবাহের অনিবার্য্য অঙ্গ। কেবল অর্থোপার্জ্জনের সুবিধার জন্যই পুত্রের প্রয়োজন মানুষ বোধ করিয়া থাকে, একথা সমাজতত্ত্ব বা মনস্তত্ত্ব কেহই সমর্থন করে না। মানুষ সন্তান কামনা করে আনন্দের জন্য, আত্মবিস্তারের জন্য, আপন ব্যক্তিত্বের সার্থকতার জন্য।* ইহা ছাড়া বিবাহ কেবলি

* "Children increase the happiness of married life........" (Westermarck),

ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, ইহার সামাজিক সার্থকতা রহিয়াছে সন্তান-সন্ততির সমৃদ্ধিতে। এলেন কাই'র (Ellen Key) মতে মাতৃত্ব চিরকালই পবিত্র ও গৌরবের "responsible motherhood is always sacred"। নিরবলম্ব প্রেমই কেবল বিবাহের ভিত্তি হইবে, এই ধরণের উগ্র ব্যক্তি-তান্ত্রিক আদর্শ বৈজ্ঞানিক নয় মোটেও।* রাসেল, হ্বেষ্টারমার্ক, হ্যাবেলক ইলিস্ প্রমুখ সমস্ত বৈজ্ঞানিকই বিবাহকে, কেবল ব্যক্তিগত নয়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন। "আধুনিক সভ্য মানুষের চোখে বিবাহে প্রেমই প্রধান—সন্তান প্রাসঙ্গিক," এই দুর্ব্বার ব্যক্তিবাদ বিজ্ঞানের চোখে অচল এবং আধুনিক সভ্য মানুষের উপরে বুদ্ধদেব বসুর এই আরোপ কল্পিত ও যুক্তিহীন। এতদ্ব্যতীত আধুনিক বিবাহ একপত্নীক, একপতিক, একনিষ্ঠ,—এই মতও সর্ব্বজন স্বীকৃত নয়। বহু আধুনিক মতবাদও আছে যাহারা বিবাহে একনিষ্ঠাকে সেকেলে মনে করেন। মার্ক্সীয় মতবাদও একনিষ্ঠার বিশেষ প্রশংসক নয়। "দয়িতের বিচ্ছেদ মৃত্যুর মতই মর্ম্মান্তিক" এবং প্রিয়মিলনের জন্য মৃত্যুও বরণীয় এবং "প্রেমেই প্রেমের সার্থকতা"—ইত্যাদি রোমাণ্টিক প্রেমমূলক আদর্শবাদকে কি বুদ্ধদেব "আধুনিক" বলিতে চাহেন? মার্ক্সীয়গণ কিন্তু বলিবেন না। বুদ্ধদেব নিজে মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গিতেই বিবাহ ও প্রেমকে দেখেন কিনা জানিনা; তবে অনেক স্থলেই মার্ক্সীয় মতবাদ তাঁহার বক্তব্যের উপরে ছায়াপাত করিয়াছে। মার্ক্সীয় মতানুযায়ী বিবাহের আর্থিক ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া বুদ্ধদেব উপনীত হইয়াছেন রোমাণ্টিক প্রেমের কল্পলোকে। রোমাণ্টিক প্রেমের মূল্য যাহাই হোক্ বুদ্ধদেবের উক্তিতে স্ববিরোধ রহিয়াছে এবং তাঁহার অনেক উক্তির সহিত আমরা একমত নই।

---

* "Marriage is something more serious than the pleasure of two people in each other's company; it is an institution which, though the fact that it gives rise to children, forms part of the intimate texture of society........."

(Marriage & Morals).

কংগ্রেসের প্রেক্ষা ও পট

অতীন্দ্রনাথ বসু

ত্রিপুরীর রঙ্গমঞ্চে পটভূমির অন্তরালে পর্যুদস্ত দক্ষিণীদল যখন নেতৃত্বোদ্ধারের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলো। সমাজতন্ত্রী বামপন্থীরা তখন পরমোদার চিত্তে নেতৃত্বসমস্যাকে পশ্চাতে রেখে কার্যসূচীর খসড়া গড়ছিলো, জওহরলালের পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের 'জাতীয় দাবীর' প্রস্তাব স্বীকৃত হলো। কংগ্রেস গ্রহণ করলো তাঁদের সংগ্রামনীতি—রাষ্ট্রীয় সংগ্রাম আর সত্যাগ্রহের সংকীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকবে না,—অর্থাৎ মুষ্টিমেয় নেতৃবর্গ ও বুদ্ধিজীবির করতল হতে সংগ্রামের বাধামুক্ত প্রবাহ ছড়িয়ে পড়বে অগণ্য গণসমাজের মধ্যে। জাতীয় দাবীর জন্যে সংগ্রামকে যথার্থ 'জাতীয়' করে তুলতে হবে, দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলন থেকেও কংগ্রেস আর বিচ্ছিন্ন থাকবে না—কংগ্রেস গ্রহণ করলো এই শপথ।

শান্তির পর্ব শেষ হয়েছে, মুক্তির রণ আসন্ন, আর এই মুক্তির রণে মহাত্মার ও তাঁর মনোনীত শিষ্যদের একাধিকার থাকবে না, কিষাণমজুর তার প্রাত্যহিক দাবী নিয়ে এতে যোগ দেবে—কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তে সমাজতান্ত্রিক বামদলের জয় বিঘোষিত—তা নেতৃত্ব যাঁর হাতেই থাকুক না কেন, নেতৃত্বদ্বন্দ্বে বহু ত্যাগ স্বীকার করে যুযুধান জাতীয় শক্তিগুলির সংহতি প্রতিষ্ঠা করে সমাজতন্ত্রীরা আশান্বিতচিত্তে কার্যক্ষেত্রে ফিরে এলেন।

কলিকাতায় দক্ষিণপন্থীদের অখণ্ড নেতৃত্ব অর্জনে বামদলের এই আদর্শগত আধিপত্য পরাহত হয় নি। 'জাতীয় দাবী' অব্যাহত রইলো। অধিকন্তু স্বীকৃত হলো যে সাম্রাজ্যতন্ত্রী প্রত্যাসন্ন সমরে ভারতের জাতীয় শক্তি আপ্রাণ বিরুদ্ধাচারণ করবে।

ক্রমশ দেখা গেলো নেতাদের শৈথিল্যে ভোটের প্রস্তাব লিপিখণ্ডে পর্যবসিত হয়, দক্ষিণীরা আদর্শকে বর্জন করে ব্যক্তিগত বিজয়ে তুষ্ট থাকবার পাত্র নয়। ত্রিপুরী, কলিকাতা, বোম্বাই পর পর তাদের গুটানো ছবির ফিতা খুলে ধরছে—দৃশ্যে দৃশ্যে প্রেক্ষাগৃহে চমক লাগছে—কিন্তু দূরদর্শীর কোন দিনই সন্দেহ থাকার কথা ছিলো না—'অতঃ কিম্'?

প্রগতিশীল প্রজা-আন্দোলনের জন্যে সত্যাগ্রহের মহানায়ক (generalissimo) তাঁর 'নতুন পন্থা' উদ্ভাবন করলেন। সত্যাগ্রহের রণনীতি অনুসারে রাজকোট সংগ্রামের সমস্ত দায়ীত্ব তিনি নিজের স্কন্ধে নিয়েছিলেন। ঠাকুর সাহেবকে দিয়ে অঙ্গীকার রক্ষণের জন্যে তিনি অনশন গ্রহণ করলেন, সিমলার আসন চঞ্চল হলো, যুক্তরাষ্ট্রের বিচারপতি মধ্যস্থতা করে তাঁর পক্ষে রায় দিলেন, কিন্তু ধূর্ত রাজকোট দরবার ভায়াত ও মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক দাবী প্ররোচিত করে তাঁর সমস্ত কৌশল ব্যর্থ করতে লাগলো।

অকস্মাৎ একদিন মহাত্মাজী দিব্যদৃষ্টিতে আবিষ্কার করলেন তাঁর এই পরাজয়ের হেতু

-তাঁর আন্দোলনে হিংসার কালিমা লেগেছে, ঠাকুর সাহেবের শুভবুদ্ধিকে জাগরিত না করে তিনি তাঁর ওপর বাইরের চাপ প্রয়োগ করেছেন।' এই হিংসাকলুষিত সত্যাগ্রহে প্রজা-আন্দোলন সফল হবে না।

"আমি যে ঠাকুর সাহেবকে বাধ্য করিবার জন্য ঈশ্বরের পরিবর্তে বা ঈশ্বর ব্যতিরেকে বড় লাটের উপর নির্ভর করিয়াছি ইহা আমার পক্ষে নিছক হিংসার কাজ হইয়াছে এবং কোন প্রকারেই এই হিংসার প্রকাশ বা প্রয়োগ অনশনের উদ্দেশ্য ছিল না"—হরিজন, জুন ২৪।

সুতরাং রাজকোটের প্রজা-আন্দোলন স্থগিত রাখবার আদেশ হলো। দরবারকে মহাত্মা সকরুণ আবেদন করলেন প্রজার অধিকার রক্ষা করতে। সমস্ত দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের বললেন তাঁদের দাবীর মাত্রা নামিয়ে দিতে রাজশক্তির সঙ্গে দরবার করে যথালভ্য প্রাপ্য ভিক্ষা করতে,—আর সংগ্রাম যদি করতে হয় সম্পূর্ণ নিজের দায়ীত্ব ও নিজের ওপর ভরসা রেখে করতে হবে।

মহাত্মার এক কথায় ত্রিপুরীর প্রস্তাব বাতিল হয়ে গেলো—কংগ্রেস হরিপুরার প্রজা-আন্দোলন বর্জন নীতিতে ফিরে গেলো। গাংপুর, তালচর, সর্বত্র বিপর্যস্ত রাজশক্তি আবার নিশ্চিন্ত মনে শাসনদণ্ড হাতে নিয়ে বসলো—ত্রিবাঙ্কুর, মহীশূর, হায়দ্রাবাদে প্রজাদমনের নতুন অধ্যায় সুরু হলো।

সত্যাগ্রহের মল্লীনাথ ডাক্তার পট্টভি 'নবপন্থা'র ব্যাখ্যায় বল্‌ছেন—

"মহাত্মাজীর পন্থা, কার্যক্রম ও সিদ্ধান্তগুলি আমরা নিছক যুক্তির বলে বিচার করিতে চাই। বুদ্ধির কাছে আবেদন না থাকিলে আমরা তাঁর সিদ্ধান্তগুলির প্রতি দোষারোপ করি, কিন্তু আমরা প্রত্যেকে জানি যে গান্ধিজীর অনুভূতি ও মনস্থির হয় স্বভাব প্রেরণায় এবং আমাদের কর্তব্য তাঁর মনস্থ কার্যক্রমকে প্রয়োজন মত যুক্তি তর্ক দিয়া সমর্থন করা। অবশ্য এই জন্য গান্ধিবাদে অবিসংবাদী বিশ্বাস থাকা আবশ্যক।"

এই সমস্ত ব্যাপারে ক্ষুব্ধ হয়ে পণ্ডিত বিশ্বম্ভর দয়াল ত্রিপাঠী উক্তি করেছেন—"ভারতের সমর-ক্ষেত্র গান্ধি খেয়ালের পরীক্ষাগারে পরিণত হইয়াছে।"

চক্ষুষ্মানের কাছে গোপন থাকবে না যে আপাতদৃষ্টিতে যা গান্ধিজীর খেয়াল বলে বোধ হয় তা বস্তুত সংগ্রামবিমুখ ধনতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের দার্শনিক অভিব্যক্তি। সাম্রাজ্যবিরোধী জাতীয় সংহতিতে গণচেতনার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে স্থিতস্বার্থ তার পালা শেষ করে বিদায় নিচ্ছে—'নবপন্থার' পরবর্তী ঘটনা পরম্পরা এই কঠিন সত্যকে এড়াবার পথ রাখে নি।

"কংগ্রেস দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ পরিচালনার উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান আজ আর নয়। ইহার আয়তন আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে—ইহাতে কলুষ ও অবাধ্যতা প্রসার লাভ করিয়াছে—এবং প্রতিপক্ষ দলের আবির্ভাব হইয়াছে যাহারা সংখ্যায় অধিক হইলে কংগ্রেসের কার্য্যসূচী আমূল পরিবর্তন করিবে।"

মহাত্মাজীর এই সরল উক্তির মধ্যে ভুল বোঝার অবসর নেই। বোম্বাইয়ে রাষ্ট্রীয় মহাসভা

যে ত্রিপুরীর সংগ্রাম প্রস্তাবে ও রাষ্ট্রীয় সমস্যা আলোচনায় মনোনিবেশ না করে কংগ্রেসের শোধন ক্রিয়ায় ব্যাপৃত হবে এ নিতান্তই স্বাভাবিক।

বামদলের সম্মিলিত প্রতিরোধ সত্ত্বেও গঠন-সংশোধন কমিটীর দুইটী গুরুতর প্রস্তাব রাষ্ট্রীয় মহাসভায় গৃহীত হয়েছে। প্রথম—তিন বৎসর ক্রমান্বয়ে সভ্য না থাকলে কেহ কংগ্রেসের কোন নির্ব্বাচিত পদ লাভ করতে পারবে না। এই রক্ষণশীল বিধির বলে জাগ্রত গণশক্তির ভেতর থেকে নেতৃত্ব বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি হয়ে রইলো। একবৎসর ধরে কংগ্রেসের খাতায় নাম না থাকলে সভ্যদের ভোটাধিকারও থাকবে না এক অখ্যাতনামা দক্ষিণীর এই সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করে নবাগত সভ্যদের শক্তি আরো খর্ব করা হলো। দ্বিতীয়, ডেলিগেট নির্বাচনের ভিত্তি হবে জনসংখ্যা,—সভ্যসংখ্যা নয়। একলক্ষ অধিবাসীর তরফ থেকে একজন ডেলিগেট নির্বাচিত হবে। এর ফলে সহরের প্রতিনিধির সংখ্যা কমে গেলো, রাষ্ট্রীয় মহাসভায়, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে, প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয়সভায়, সর্বত্র রাষ্ট্র-সচেতন শ্রমিক শ্রেণীর প্রভাব নষ্ট করবার ব্যবস্থা হলো।

কিন্তু জাতীয় সংগ্রামকে বন্ধ করে নিয়মতান্ত্রিক নীতি অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে এতেই ক্ষান্ত হলে চলে না। রাষ্ট্রীয় মহাসভায় দক্ষিণী মন্তব্য গৃহীত হলো যে প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভা মঞ্জুর না করলে কোথাও কংগ্রেসীরা সত্যাগ্রহ বা আন্দোলন করতে পারবে না। কংগ্রেসের মধ্যে সংঘনিষ্ঠা ও ঐক্য অপ্রতিহত রাখবার জন্যেই নাকি এ ব্যবস্থা। কিন্তু ত্রিপুরী প্রস্তাব অনুযায়ী সংগ্রামের নির্দ্দেশ দিয়ে তারপর এই বিধান অবলম্বন করলে সংগ্রামশীল দলের কোন সন্দেহ জন্মাতো না।

১৯১৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কংগ্রেসের মুক্তিসংগ্রাম স্থানকালের পরিবেষ্টনে খণ্ড ছিন্ন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে পুষ্টিলাভ করেছে।—নেতার নির্দেশে, কেন্দ্রীয় শক্তির পরিচালনায় এই সামরিক শক্তিগুলি সংহত হয়েছে মাত্র—তাদের উদ্ভব হয়েছে অনিবার্য পারিপার্শ্বিক তাগিদে। মহাত্মা যখন আরুইন সন্ধির পর গোল টেবিল বৈঠকে ভারত শাসন সমস্যার সমাধানের সর্ত ঘোষণা করছিলেন,—সেই শান্তির দিনেও যুক্তপ্রদেশের নিগৃহীত চাষীরা কর বন্ধ করেছিলো,—জওহরলাল সেদিন কৃষক সত্যাগ্রহকে পরিচালনা করেছিলেন।

"ধরুন আমরা প্রতিবাদ সমারোহে বাহির হইলাম। পুলিশ আমাদিগকে ১৪৪ ধারায় নিষেধাজ্ঞা জানাইল! আমরা কি তখন পুলিশের আদেশ মান্য করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিব এবং প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সভার অনুমতি প্রার্থনা করিব?"

সুভাষচন্দ্রের এই সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি দক্ষিণীদের বিচলিত করতে পারে নি। তাঁরা তাঁদের চরম উদ্দেশ্য সাধন করেছেন কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের শাসন থেকে মুক্ত করে। মহাত্মার উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এই মন্ত্রীস্বাধীনতার প্রস্তাব সহজ বোধ্য হবে—

"একথা মানিতেই হইবে যে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা মোটের ওপর উদারভাবেই শাসনকার্যে অংশ লইয়াছেন। মন্ত্রীদের কার্যে তাঁহারা খুব কমই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু কংগ্রেসীদের এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলির তরফ হইতেই কখনো কখনো বিরক্তিকর প্রতিবন্ধক আসিয়াছে।

......কংগ্রেসীদের দাবী ও বিরুদ্ধতা মিটাইতেই মন্ত্রীদের প্রায় সমস্ত শক্তিসামর্থ ব্যয় হইয়াছে।"

জনসাধারণের দাবীর মুখে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের আক্ষেপোক্তি সেদিনও শোনা গিয়েছে যে দমনশীল আইন গুলির প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি বিলম্বিত হচ্ছে শুধু প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ও আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধতায়। আজ মন্ত্রীরা এবং দক্ষিণীদল বুঝেছেন যে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের প্রদত্ত এই দমননীতি তাঁদের হাতে রাখতে হবে আন্তর্দেশিক প্রতিপক্ষকে বিধ্বস্ত করবার জন্যে। তাই আমলাতন্ত্র ও শাসনকর্ত্তাদের সঙ্গে তাঁদের আর বিশেষ মতভেদ নেই।

বোম্বাইর মন্ত্রীত্ব অবস্থান ধর্ম্মঘট বে-আইনী ঘোষণা করেছে। মাদ্রাজের মুনগোলার কিষাণরা জমিদারকে তার প্রতিশ্রুতি পালন করাবার জন্য আন্দোলন করেছিলো, তার ফলে তাদের নৃশংস প্রহারে জর্জরিত ও গ্রেপ্তার হতে হলো। পাটনায় ১৪৪ ধারা ও বিহারিজী মিলের সত্যাগ্রহীদের ওপর লাঠিচালনা হলো,—তাদের কারাদণ্ড হলো। সীমান্ত প্রদেশে চাষীদের উদ্বাস্ত করে জেলে পোরা হলো—এবং প্রধান মন্ত্রীর পুত্রও সে ভাগ্য থেকে অব্যাহতি পেলেন না। মধ্যপ্রদেশে উমরেরের সত্যগ্রহীরা প্রহৃত ও কারারুদ্ধ হলেন। যুক্তপ্রদেশে আমলাতন্ত্রের ভেতর এক গোপন সার্কুলার প্রচারিত হলো,—যে শ্রেণীসংঘর্ষের ফলে মিল-এ হরতাল ও শ্রমিক-মালিকে বিবাদ বেড়ে উঠেছে—সেই শ্রেণীসংঘর্ষের প্রচারকদের জন্য অতঃপর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সংক্রামকদের মত ১৫৩-এ ও ১০৭ ধারায় দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা হবে।

মাদ্রাজের 'ইণ্ডিয়ান প্রেসের' ৩৯ জন শ্রমিক গ্রেপ্তার হয়েছে। বিহারে 'বকস্ত্' সত্যাগ্রহের দমন চলছে। শ্রীরাহুল সংকৃত্যায়নকে সাধারণ কারাবাসীর অধিকার অর্জন করার জন্যে বার বার অনশনের আশ্রয় নিতে হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী কাগজগুলির উল্লাস ও সম্বর্ধনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। উড়িষ্যায় ও মধ্যপ্রদেশে জমিদার শ্রেণী প্রস্তাবিত প্রজাস্বত্ব-আইনের ওপর যথেচ্ছ দরকষাকষি করছে।

সিমলায় বিভিন্ন প্রদেশের স্বরাষ্ট্র সচিবদের সম্মেলনে ধার্য হয়েছে যে যুদ্ধের উদ্যোগপর্বে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ রাখতে হবে, এবং কিষাণমজুরদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে সবাই 'আইন ও শৃঙ্খলা' রক্ষা করে চলবে। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মৌনভাবে সম্মতি দিয়ে এসেছেন।

রাষ্ট্রপতি বোম্বাইয়ে মহাসভার উদ্বোধন করতে গিয়ে বলেছেন "কয়েক মাসের মধ্যেই বিশ্বময় সমরানল জ্বলিয়া উঠিতে পারে।.........সম্ভবত ভারতবর্ষকে ইহার মধ্যে জড়াইবার প্রয়াস হইবে। ব্রিটিশ সরকার ইহার আয়োজন করিতেছেন এবং ভারতশাসনবিধির প্রস্তাবিত সংশোধনে যুদ্ধকালে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সকল ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার ব্যবস্থা হইতেছে......অতএব আমাদের সাম্রাজ্যবাদীর শোষণচক্রে পড়িবার গুরুতর আশঙ্কা রহিয়াছে। এই সঙ্কটে আমাদিগকে যুদ্ধে টানিবার সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া কংগ্রেসের বহু বিঘোষিত নীতিকে আমাদের সার্থক করিতে হইবে।" পুনশ্চ—"ভারতের অবস্থা এক নিশ্চল স্থানুত্বে আসিয়া ঠেকিয়াছে যাহা প্রগতির

প্রতিকূল। যদি আমরা দ্রুত অগ্রসর না হই তাহা হইলে অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। ব্রিটিশশাসন আমাদের পৃষ্ঠে যুক্তরাষ্ট্রের ভার চাপাইলে' পরে আমরা যুদ্ধ করিব এই ভরসায় নিরস্ত থাকিলে চলিবে না। ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপের উপর নির্ভর না করিয়া আমাদিগকে পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে।"

এ পন্থা কোথায় নির্ধারিত হলো—সিমলায় স্বরাষ্ট্র-সচিব-সম্মেলনে না বোম্বাই এ রাষ্ট্রীয় মহাসভায় ?

প্যাটেল সামঞ্জস্য করে দিয়েছেন। সঙ্ঘকে শক্তিশালী ও ঐক্যবদ্ধ করলেই হবে—যুদ্ধের আবশ্যক হবে না। বিনাযুদ্ধে শাসনক্ষমতা এসে পড়বে।

বোম্বাইএর প্রস্তাব,—মন্ত্রীদের কোন সমালোচনা কংগ্রেসের ভেতর থেকে প্রকাশ্যভাবে হতে পারবে না। ৯ই জুলাই,—যেদিন সম্মিলিত বামশক্তি বোম্বাইএর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ অনুষ্ঠান করছিলো,—সেদিন জওহরলাল 'ন্যাশনাল হেরাল্ডে' যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধ সমালোচনা করেছেন, কিন্তু সঙ্ঘের নিয়মভঙ্গের জন্যে তিনি বামসংহতিকে ভৎর্সনা করতে ক্রুটী করেননি—যুক্তপ্রদেশে অনুষ্ঠানে যোগদানকারীদের কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেছেন। তাঁর বোঝবার ক্ষমতা হলো না,—যে সমাজতন্ত্রীরা জাতীয় সংহতির জন্যে বহু আদর্শগত ত্যাগ স্বীকার করে এসেছে তারা আজ প্রতিবাদে মুখর হয়েছে দক্ষিণীদের সংগ্রামবিমুখতা দেখে আর বামদলকে কংগ্রেসের ভিতর থেকে উচ্ছেদ করবার প্রচেষ্টা দেখে। অন্ধের মত তিনি গালি দিয়েছেন—"এই কি জাতীয় সংহতির পথ অথবা গণশক্তির সংগ্রামের পথ—যে সম্বন্ধে এত বড় বড় কথা বলা হয় ?" অথচ জওহরলাল অস্বীকার করেননি যে দক্ষিণীরা এই প্রস্তাবগুলি প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করতে পারেন। বোম্বাই এ প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে তিনি বক্তৃতা করেননি ভোটের সময় তিনি নিঃশব্দে উঠে এসেছিলেন। গান্ধিজীর সঙ্গে জওহরের, জওহরের সঙ্গে সমাজ-তন্ত্রীদের, সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে সাম্যবাদীদের পর পর বাঁধা জটিল যোগসূত্রের ভেতর দিয়ে ত্রিপুরীর পর থেকে এক মর্মান্তিক প্রহসনের অভিনয় হয়ে আসছে।

কিন্তু চরম দুঃখের কথা এই যে এত দেখেও এত ঠেকেও বামদলের সংহতি হলো না। বাম-সংহতিসভায় রায়পন্থীরা ৯ই জুলাইর প্রতিবাদ সিদ্ধান্তে সমর্থন জানালেন—রায় অসম্মতি জানিয়ে জওহরলালকে তার করলেন। নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদের মৌলিক অধিকার সমর্পণ করে রায় আত্মপক্ষ সমর্থনের বৃথা চেষ্টা করেছেন।

বাম সংহতি সভার আরো চিন্তা করবার অবসর ছিলো। কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ গঠনমূলক কোন সংস্কার প্রতিক্রিয়াশীল হলে তার প্রতিবাদ করতে পারে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠানগুলোই—কংগ্রেস বহির্বর্তী জনসাধারণ নয়। আর নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সভার কোন কার্যের প্রতিবাদ করতে হলে তার যোগ্যতম অধিকারী রাষ্ট্রীয় সভার প্রতিনিধিদের নির্বাচক ডেলিগেটরা। এই ডেলিগেটদের নিয়েই প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়।

প্রাদেশিক কার্যকরী সভার পরিবর্তে এঁদের কণ্ঠ হতে আপত্তি ঘোষিত হলে আরো পরাক্রান্ত হতো। কংগ্রেসের নিম্নতম সভ্য থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও কংগ্রেস সেবীর এই প্রতিক্রিয়াশীল প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মতপ্রচারের অধিকার আছে, কিন্তু এই মতভেদকে কংগ্রেসের বাইরে টেনে আনলে শত্রুপক্ষ তার সুযোগ নিতে পারে।

আগামী আগষ্ট মাসে আবার প্রতিবাদ-সপ্তাহ পালিত হবে, কিন্তু প্রতিবাদের পরে কি হবে সেই চিন্তায় বামপন্থীদের মনোনিবেশ করা উচিং। দক্ষিণপন্থীদের বাদ দিয়ে জাতীয়সংগ্রামের অবতারণা ও পরিচালনা করবার শক্তি বামদলেরা এখনও অর্জন করেনি এ নিঃসন্দেহ। ব্যর্থ আক্রোশ ও বিক্ষোভ প্রকাশ এবং ত্রিপুরীর প্রস্তাবের দোহাই—দুইই সমান নিষ্ফল। জাতীয় সংগ্রাম আসন্ন ক'রে তুলতে হোলে অধস্তন কর্মক্ষেত্রে গিয়ে বিপ্লবের ক্ষেত্র রচনা করতে হবে। প্রগতিশীল কর্মপন্থা ও আদর্শ দিয়ে intellectual cadre ও revolutionary cadre গড়বার দুরায়ত্ত দায়ীত্ব বামদলগুলির ওপর পড়েছে। বুদ্ধির দাসত্ব ও কর্মের জড়ত্ব থেকে দেশকে মুক্ত করার সাধনা এখনো বাকি এবং এই সাধনার পথে প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংহতি সংগ্রামনিপুণ হোয়ে উঠবে, দক্ষিণশীল ধীরে ধীরে জাতির রণক্ষেত্র থেকে বিদায় গ্রহণ করবে।
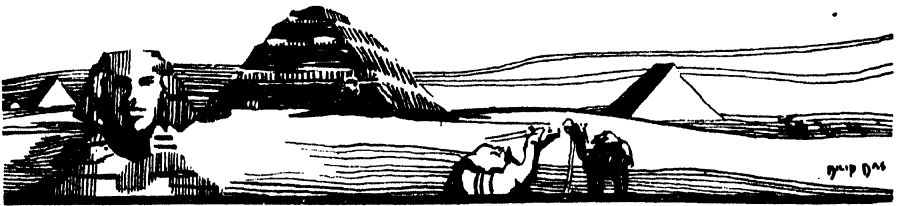
সাগর-স্বপন

(নাটিকা)

ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়

নাটিকার নর ও নারী

উত্তীয়

দেবদত্ত

নাবিকগণ

মঞ্জুলা

সাগর বীণা

বিপাশার কূলে, ঘন কাশের বনে, বীণার তন্ত্রীতে
সুর তুলে যেতো তরুণ-শিল্পী —
নাম তার সাগর।

সে-সুরে মুগ্ধা-নারী, তরুণের প্রেমে উন্মনা
রাজকন্যা, দূর প্রাসাদের কক্ষে কাটায়
বিনিদ্র-রজনী — নাম তার উর্ম্মি।
উর্ম্মির চিত্ত ছেয়ে বসন্ত-বনানীর রঙিন স্পর্শ,
রক্ত-দোলায় তার সুরার চঞ্চলতা।...

দুঃখী-শিল্পীর পায়ে রাজার দুলালী দেয় নিজেকে বিকিয়ে...
কিন্তু, রাজার শাসন —
সে-শাসন সাগর-বক্ষে উর্ম্মির সহজ-দোলাকে
করে-না স্বীকার।

শিল্পীর ঘটলো নির্ব্বাসন।…
উর্ম্মিকে হতে হবে স্বয়ম্বরা কোন্ এক শত-যুদ্ধবিজয়ী
রাজপুত্রের সঙ্গে।…

শৈলজার তপস্যাঘন-মূর্ত্তিই হলো রাজকন্যার
কামনার ধন।
অকলঙ্ক-কৃচ্ছ্রতায় জয় কোরল সে রতি দেবীর চিত্তকে।
খুশী হয়ে বললেন তিনি —
অক্ষয় হয়ে থাকবে তোমার প্রেম।
যুগ যুগ অশরীরী হয়ে
রইবে তুমি লীনা
সাগর-বক্ষে।…

উর্ম্মি হলো পলাতকা।
পৃথিবী খুঁড়ে-ও খোঁজ পেলে-না সম্রাট
আপন কন্যার।…
হাওয়ায় ভর কোরে উর্ম্মি চলেচে আকাশের
বুক চিরে — ও যেন নীল-অম্বরে ভেসে-চলা
শুভ্র মেঘ-লিখন!…

…বিন্ধ্যগিরির অরণ্যতল থেকে উঠে আসচে
অপূর্ব্ব বীণাধ্বনি।
ভেসেভেসে উর্ম্মি এসেচে সেথায়।
গান পৌঁছল মর্ম্মের নিভৃতে।
চিত্ত তার আকুলিত হয়ে উঠল
যুগের পিপাসা নিয়ে —
এ-যে সাগর-গীতিকা!…

নেবে এল উর্ম্মি প্রিয়তমের মধু-সান্নিধ্যে।
প্রিয়ার পরশখানি পেয়ে
বিরহী-সাগর
বীণা-তন্ত্রী জুড়ে সৃষ্টি কোরে চলল
সঙ্গীত — আদি-অন্তহীন অনাহত-সঙ্গীত।

তখন হিসেব ছিল-না সময়ের।
বাতাসে জড়িয়ে ছিল বিহ্বল-করা সুগন্ধ।
চন্দ্রালোকে বোনা ছিল অজস্র-স্বপন।
শাখায়-শাখায় মর্ম্মর ধ্বনি।
তখন
বনের অন্ধকারে নেবেছিল ঘুম,
মহুয়ার মর্ম্মকোষে গোপনে জেগেছিল
সংরাগ-শিখা।...

অনাদি-কালের তরুণ-তরুণী,—
মিলন-লগনে তাদের
রচিত হলো যে-রসকল্পনা
সমগ্র সৃষ্টির চৈতন্যে,
সে-কল্পনার পথ বেয়ে
চিরন্তন-প্রেমের প্রতীক রূপে
এ-দু'টি তরুণ-তরুণী
শুরু কোরলো তাদের অন্তহীন-চলা
অনন্ত-কালের লাগি।
অশরীরী-মূর্ত্তি ধোরে আজো
বেড়ায় তারা ঘুরে।
বীণা-তন্ত্রী জুড়ে আজো
গান ওঠে তাদের স্তব্ধ-গভীরতায়।
সে-গানের সুর বেয়ে আজো
ঝরে পড়ে তাদের কল্যাণ-কামনা,
মৌন আশীর্ব্বাদের মতো,
তাদেরই উদ্দেশে,
যারা
পেয়েচে প্রেমকে
নিবিড়তম তপস্যায়।

সাগর-স্বপন

[বজরার মস্ত বড় ছাদ। দক্ষিণে মাস্তুল, তাহাতে চতুষ্কোণ একটি পাল খাটান রহিয়াছে, সুতরাং সে-প্রান্তের অনেকখানি আকাশ ও সমুদ্র ঢাকা পড়িয়াছে। বামপার্শ্বে হাল। হালের পশ্চাতে কয়েক ধাপ সিঁড়ি, এবং উহা বাহিয়াই বজরার পশ্চাদ্ভাগের উঁচু ছাদের উপর উঠিতে হয়।...অনন্ত সাগর-বক্ষে বজরার যাত্রা।...নাটিকা আরম্ভকালে চারজন ব্যক্তি উক্ত ছাদে অবস্থান করিতেছে। দেবদত্ত হাল ধরিয়া দণ্ডায়মান। উত্তীয় সুমুখ-ভাগে পাটাতনের উপর মঞ্চে নিদ্রামগ্ন। দুইজন নাবিক মাস্তুলের কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, মাস্তুলের গায়ে একটি বীণা ঝুলিতেছে।]

প্রথম নাবিক

জনহীন এ বিরাট সমুদ্রে বহুকাল ধরে আমাদেরকে আনা হয়নি কি?

দ্বিতীয় নাবিক

উঃ, কতো যুগযুগ ধরে যেন!

প্রথম নাবিক

সপ্তাহের পর সপ্তাহ পেরিয়ে গেচে — আমরা না-দেখলুম তীরের সামান্য রেখা, না-পেলুম কোনো বজরার অস্পষ্ট আভাস।

দ্বিতীয় নাবিক

আমি ভেবেছিলুম, এ-সমুদ্র-যাত্রা থেকে কিছু পয়সা কোরবো। তারপর, জীবন-পথের একটা সহজ দিক খুঁজে নেব, যার গতিতে উঠা-নাবা নেই।

প্রথম নাবিক

আর কুমার জীবনে, ভাই, এতো ক্লান্ত হয়ে পড়েচি যে, ঠাক্‌মার গল্পের কানা-ডাইনীটাকেও এখন প্রেম বিলোতে পারি।

দ্বিতীয় নাবিক

[একটু হাসিয়া] আচ্ছা, কোনো ভেল্‌কি লাগিয়ে-ও কি এ-লক্ষ্মীছাড়া ঢেউগুলোকে মেয়েমানুষের রূপ দেয়া যায় না? তা' হলেও তো, ছাই, ওতে-ই ডুবে মরতুম।

প্রথম নাবিক

[গম্ভীর হইয়া] বরং, চল, বাড়ি ফেরা যাক। বজরা সে-পথেই চালাও। তা উত্তীয় যেতে চাক, আর না-ই চাক। নয়তো, যখন সে ঘুমিয়ে থাকবে, তখন তাকে সমুদ্রে ফেলে দেয়া যাবে।

দ্বিতীয় নাবিক

[আরো গম্ভীর হইয়া] উঁহু, তা পারবো না। ওর বীণার তারগুলোতে যদি যাদু না

থাকতো তবে তোমার কথায় সায় দিতুম। কিন্তু ও যখন বীণায় ঝঙ্কার তোলে তখন কতো অদ্ভুত জীব চোকের সুমুখে ভেসে বেড়ায়, কানের কাচে শব্দ করে।

প্রথম নাবিক

তাতে ভয় কোরবার কী আচে?

দ্বিতীয় নাবিক

মনে আচে সে পূর্ণিমায় যখন ছোট বজরাটাকে ডুবিয়ে দি?

প্রথম নাবিক

সারা রাত ভরে সে বীণা বাজিয়েছিল।

দ্বিতীয় নাবিক

চাঁদ ডুবে যাওয়া পর্য্যন্ত। যখন তাকালুম যারা ডুবে গেচে তাদের মৃতদেহগুলো দেখবার আশায়, তখন দেখি, গাঙচিলের মতো ধূসর-রঙা কতগুলো পাখী! আমি চাইতে-ই তারা মণ্ডলাকার হয়ে অদ্ভুত শব্দ কোরতে কোরতে পশ্চিম দিকে উড়ে গেল! তারপর থেকে মাথার উপর বহুবার শুনেচি তাদের ডানার ধ্বনি।

প্রথম নাবিক

তোমার মতো সে-রাতে আমিও তাদের দেখেছিলুম। কিন্তু সেটা মনের দুর্ব্বলতা। পানাহার সেরে খুব কষে ঘুম লাগানোর পর, কৈ, আমার তো কোনো ভয় রইল না?

দ্বিতীয় নাবিক

আরে শুধু কি তা-ই? পরশু রাতেও উত্তীয় যখন বীণায় ঝঙ্কার তুল্‌লে তখন কী সুন্দর একযোড়া তরুণ-তরুণী মস্ত একটা শাদা ঢেউ-এর মাঝ থেকে উঠে এল! তাদের চেহারা দেখে মনে হল, শাশ্বত চিরন্তন মানুষ তারা — কোন্ অমরার আনন্দ থেকে ভেসে এসেচে যেন।

প্রথম নাবিক

তাদেরও এক রাতে দেখেচি। উত্তীয় বাজিয়ে যাচ্চে তার বীণা — আর তারা পালের পেছন থেকে শুনচে সে-সঙ্গীত। বিভল-উত্তীয় তাদের দেখছিল না। আমি কিন্তু হাত বাড়িয়েছিলুম তরুণীকে ধরবার জন্যে।

দ্বিতীয় নাবিক

[বিস্ময়ে] এতো সাহস?

প্রথম নাবিক

আরে, ও তো একটা ছায়া — হাত থেকে ফস্‌কে গেল।

দ্বিতীয় নাবিক

[অধিকতর বিস্ময়ে] তোমার ভয় পেল না?

প্রথম নাবিক

কেন ?

দ্বিতীয় নাবিক

জান, ওরা সাগর ও উর্ম্মি ? কাম ও রতির ভ্রাম্যমাণ অনুচর ? সকল প্রেমিক-প্রেমিকারাই ওদের আরাধনা করে ?

প্রথম নাবিক

তাতে কী হয়েচে ? ছায়ার সঙ্গে তো আর হেতের থাকে না ?

দ্বিতীয় নাবিক

দেখ, আমার মা বলতেন, সাগর-ঠাকুরের মতো অমন ভীষণ আর কেউ নেই। তাঁদের কালের বহু পূর্ব্বে সে নাকি কোন্ রাজার অন্তঃপুর থেকে উর্ম্মিদেবীকে বার কোরে আনে, তারপর এক বনে ফুলের প্রাসাদে পাঁপড়ির স্তূপের মাঝে তাকে লুকিয়ে রাখে। — ওর পর থেকেই দু'জনে ছায়া হয়ে আকাশে-আকাশে ঘুরে বেড়ায়। যারা ভালোবাসতে জানে না, ও-সাগরঠাকুর তাদের এতোই ঘৃণা করে যে ও-সব লোকের পক্ষে সে এক ভয়ানক জীব হয়ে উঠেচে।

প্রথম নাবিক

আমি শুনেচি, সাগর-যাত্রীদেরকে সে ঘৃণা করে না। শুধু যারা ঘরমুখো বা যাদের ভালোবাসা নেই অথচ স্বামী-স্ত্রীর দাবী নিয়ে বসবাস করে তাদের উপর-ই সে অতো চটা।

দ্বিতীয় নাবিক

[চিন্তিত হইয়া] মনে হয়, উত্তীয় ওর ফাঁদে পড়েচে। আর, সমুদ্রের মাঝে তাই অমন ঘুরপাক খাচ্চে।

প্রথম নাবিক

ও-সব ফাঁদ-টাদ বুঝিনে, সুবিধে পেলেই ওকে জলে ফেলে দেব।

দ্বিতীয় নাবিক

উঃ, ওর মৃত্যু হলে বাঁচব। [একটু চিন্তিত হইয়া] কিন্তু বজরা চালাবে কে ? নক্ষত্র-গুলো চিনে, পথ ঠিক কোরবে কে ?

প্রথম নাবিক

তা'-ও ভেবেচি। দেবদত্তকে বাগাতে হবে। ওর ও-সব তথ্য জানা আচে। [দেবদত্তের দিকে অগ্রসর হইয়া] আমাদের নায়ক হওনা, দেবদত্ত ? — আমি ঠিক কোরেচি, ঘুমুলে পর উত্তীয়কে সমুদ্রে ফেলে দেব। সবাই এতে খুসী হবে। এর পর তুমি আমাদের নিয়ে যাবে দেশের দিকে, পথ ঠিক কোরে।

দেবদত্ত

[বিস্ময়ে ও চাপা-উষ্মায়] টাকা তো কম খাওনি ?

প্রথম নাবিক

কী হবে সে-টাকা দিয়ে যদি এম্‌নি কোরেই জীবন কাটাতে হয়? যারা সোয়াস্তিতে ঘর কোরচে তাদের থেকে পেতুম যদি অনেক বেশি কোরে নারীর সঙ্গ, সুরার পেয়ালা — তা' হলে-ও হয়তো আপশোষ করতুম না। — কিন্তু এ কী জীবন-যাত্রা?...যাক্‌, তুমি আমাদের সঙ্গে এসো। অধিনায়ক বলে তোমায় মেনে নিচ্চি আমরা। এমন সমুদ্রে নিয়ে চল যেথায় মানুষের চলাচল আচে — এ নির্জ্জন সিন্ধু-কারায় যে বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেচি, দেবদত্ত।

দেবদত্ত

তোমাদের সঙ্গে? দেবদত্ত যাবে তোমাদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র কোরতে উত্তীয়র বিরুদ্ধে? শিশুকাল থেকে যাকে প্রভুর মর্য্যাদা দিয়ে এসেচি, সে-উত্তীয়কে হত্যা কোরবো আমি?...যাক্‌, বেশি কথা নয়। মনে রেখ, কৃপাণ কোষ-মুক্ত কোরেচো কি প্রত্যুত্তর দিয়েচি।

প্রথম নাবিক

[বিরক্তি ভরে উত্তীয়র দিকে ইসারা করিয়া] আঃ, ওকে-ই জাগিয়ে দিলে।

[দ্বিতীয় নাবিকের প্রতি] চল, সরে পড়ি। এ-সুবিধে নষ্ট হল।

[নাবিকদের প্রস্থান]

উত্তীয়

[হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে ব্যস্ত হইয়া] পাখীর ঝাঁক চলে যেতে দেখলে, দেবদত্ত? — তোমার কণ্ঠ শুনলুম ... সঙ্গে, আরো কাদের স্বর ভেসে আসছিল যেন?

দেবদত্ত

[অভিমানের সুরে] আমি কিছুই যেতে দেখিনি।

উত্তীয়

ঠিক জান? — আমিতো কাঁচা ঘুমে উঠিনে। তবে ভাবছিলুম, ওরা বুঝি চলে গেল। ওরা-ই যে আমায় পথের সন্ধান দেয়। ওদেরই যদি হারিয়ে বসি তবে তো যে-শান্তি আমার তরে মঞ্জুর হয়ে আচে তা' দূরেই থেকে যাবে।...ক'দিন ধরেই পাখীদের দেখচিনে। কিন্তু প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই তো পৃথিবীর বুকে কতো মানুষ মরচে, তারপর পাখীর রূপ ধরে অশরীরীর দল আনন্দ-ভূমের উদ্দেশে উড়ে আসচে?

দেবদত্ত

[ঈষৎ উষ্মার সহিত] দেখ, ও-সব আজগুবী চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমার কথা শোনো, নাবিকেরা তোমাকে মেরে ফেলবার ষড়যন্ত্র কোরচে —

উত্তীয়

[শান্তভাবে] কেন, ওদের কি আশার অতিরিক্ত সম্পদ দিই নি? — আর আমি যখন আমার একটি মাত্র কামনাকে রূপ দিতে যাচ্চি, তখন তারা কোরবে বিরুদ্ধতা —

দেবদত্ত

[বাধা দিয়া] জনহীন এ-মহাসমুদ্রে তুমি কী কামনায় রূপ দিচ্ছ ?...এখানে না-চলচে একটা বজরা, না-দেখি জীবন্ত কিছু ! শুধু আসচে মানুষের মাথা-সমেত কতগুলো পাখী — যাদের জানা রয়েচে, এখানেই পৃথিবীর সমাপ্তি !

উত্তীয়

পৃথিবীর সমাপ্তি দেখে চম্‌কে উঠচ কেন ? ওতে মনের রঙ্‌ ফিকে হয়ে আসচে কেন ? — এখানে-ই তো পরিপূর্ণ হয়ে মন উপলব্ধি করে কতো অলৌকিক বিস্ময়, অপূর্ব্ব ভাবোন্মেষতা, অসম্ভব আশার রোমাঞ্চ ! — এরাই তো সকল অস্তিত্বের ভিত্তি, সকল প্রেরণার উৎস, সকল সৃষ্টির বনিয়াদ !

দেবদত্ত

[হতাশ কণ্ঠে] কে জানে, হয়তো ছায়াদের মায়ায় তুমি ভ্রান্ত ? অশরীরীদের খেলার পুতুল হয়ে বৃথাই তুমি ঘুরে মরচ ?

উত্তীয়

[করুণ কণ্ঠে] তোমারও সংশয় এসেচে ? ষড়যন্ত্রে তুমিও যোগ দিয়েচ ?

দেবদত্ত

না না, ও কথা বোলোনা, উত্তীয় ! তুমি তো জান, তোমার বিরুদ্ধে হাত তোলা আমার পক্ষে কতো অসম্ভব ?

উত্তীয়

তুমিই-বা বিশ্বস্ত রইবে কেন ? — সংশয় তো এসেচে ?...

দেবদত্ত

[গাঢ়কণ্ঠে] তুমি আমার প্রভু ! তুমি আমার বন্ধু ! — তোমার বিরুদ্ধে হাত তুলবো — অসম্ভব।

উত্তীয়

[স্বগত] হয়তো সংশয় আসা স্বাভাবিক। [কিছুক্ষণ মৌনতার পর দেবদত্তের প্রতি] আচ্ছা, দেবদত্ত, তোমার কি তেমন বিষাদ এসেচে যাকে সুরার পেয়ালা, নারীর চুম্বন বা যুদ্ধ-জয়ের নেশাও দূর কোরে দিতে পারে না ?

দেবদত্ত

কী যে বোলচ বুঝলুম না !...তবে জেনো, আমার মন এখনও ভেঙ্গে যায়নি।

উত্তীয়

বন্ধু, তোমার মনের সবটুকু তন্ময়তা দিয়ে একবার আমায় দেখ। তোমার ও আমার ধাতে রয়েচে আকাশ-ভূমি ব্যবধান।...সত্যি আমি অদ্ভুত। — আমার পরিবর্তন আনতে পারে শুধু এই

সীমাহীন সাগরের অফুরন্ত বারিরাশি। ওর অন্তরের আহ্বানে আমি হব জীবন-মুক্ত, সংসারের মিথ্যে হতে পাব একান্ত নিষ্কৃতি।...

কী সে মিথ্যে তার খবর রাখ? মিথ্যে হচ্ছে তা-ই, যার দিকে মানুষ নিয়ত ধাওয়া কোরচে প্রভূত-সম্পদ, তৃপ্তি ও সুখ পাবে বলে — এবং যখনই নিজের চাওয়াকে সে পায়, তখনই দেখে, তৃপ্তি মিথ্যে, সুখ মিথ্যে, সম্পদ মিথ্যে। — কিন্তু সেখানেই সে ক্ষান্ত হয় না — আবার আরোর দিকে যায় তার লুব্ধদৃষ্টি।...এমনি কোরে অসন্তোষের পেছনেই সে জীবনভর ঘুরে মরে। অন্তিমকালে বুঝতে পারে, জীর্ণঝুলি তার শূন্য। সে অসহায়, কাঙাল।

দেবদত্ত! বন্ধু! কতো স্বপন-প্রবাহ নানা রঙের বিস্ময় লাগিয়ে আমাকে অভিভূত, মুগ্ধ কোরে তুলচে। ওরাই যেন চিরন্তন জীবন সঙ্কেত হয়ে পৃথিবীর বীণায় সোনার তন্ত্রী জুড়ে দিচ্চে। আর, সে-তন্ত্রী থেকে ঝরে পড়চে গান — যে গানের দানসত্রে রূপ, রস ও গন্ধের অনাহত উৎসব যাচ্চে রচিত হয়ে।

দেবদত্ত

কোনো নারীকে যদি ভালোবাসতে

উত্তীয়

এ কথাও বোলচ? [একটু স্তব্ধ থাকিয়া তার পর ধীর-কণ্ঠে] তুমি তো অলৌকিক স্বর অনেকবার শুনেচ? ও কা'দের?...যাদেরকে ওরা ছায়া বলচে, তারা সাগর আর ঊর্ম্মি। নিবিড়তম ভালোবাসার তারা প্রতীক। তাদের আশপাশে আরো ছায়া হয়তো দেখে থাকবে। তারাও এমন মানুষেরই অশরীরী-রূপ যাদের ভালোবাসায় পরম-জ্ঞান ঘটেচে।...যাক্, আমার মনের কথা তো শুনলে। আমি চাই অনাবিল প্রেম — যা' শাশ্বত অনির্ব্বচনীয়, আজকের পৃথিবীতে যার জোড়া নেই।...

দেবদত্ত

[অবিশ্বাসের হাসি টানিয়া] তবু এখনো পৃথিবী ভরে যথেষ্ট সুন্দরী রয়েচে। মানুষ তাদের সংস্পর্শে এসে আনন্দও পাচ্চে।

উত্তীয়

কিন্তু তাদেরকে যারা ভালোবেসেচে সে-মানুষদের প্রেমে রয়েচে স্থিতি-স্বল্পতা, অলীক আশার মোহ, অন্তর্নিহিত দুর্ব্বলতার কলঙ্ক।...তুমি দেখো, বন্ধু, প্রেমের প্রাচুর্য্য যাকে নিয়ে কল্পনায় ভিড় কোরে আচে বলে মনে হচ্চে, সেও শরাব-ভরা পেয়ালার মর্য্যাদাই পায়। পান শেষে পাত্র থাকে ধূলোয় গড়িয়ে।...

দেবদত্ত

যারা ভালোবেসেচে তারা এমনি কোরেই ভালোবেসেচে — এ-ছাড়া ভিন্ন পথ নেই।

উত্তীয়

আরো দেখবে, প্রেমকে গোপন কোরে, নির্য্যাতন কোরেই মানুষ চলেচে। তাকে বলি দিয়েচে যতো বন্ধ্যা-যুক্তি ও ভ্রান্ত-অনুশাসনের পায়ে।...নর-নারী প্রেম-রসে বিহ্বল, কিন্তু প্রথা বা দেশাচারের ভয়ে তারা লুকিয়ে চলেচে তাদের বুকের গানটুকু। তাতে অন্তরে জেগেচে বেদনা, চোখে নেবেচে বন্যা। কিন্তু, ক্রমে, অনায়াসে নত হয়ে স্বীকার কোরে নিয়েচে তারা মানুষের দণ্ডকে, যে-দণ্ড নির্দ্দয়-কণ্ঠে বলেচে প্রেমকে—আমি তোমার 'চেয়ে অনেক বড়, এই হানলুম আঘাত তোমার ঔদ্ধত্যে।

দেবদত্ত

যৌবনের কথা বলচ ? — তা' প্রৌঢ়-জীবনে মানুষ কিন্তু প্রেমের সত্য-রূপটিকে চিনতে পারে। স্বপন যতো যায় উধাও হয়ে — উচ্ছ্বাস, মোহ, অতিরিক্ত তীব্রতা হতে মুক্ত হয়ে সে রচনা করে একটি শান্ত-ভালোবাসা।

উত্তীয়

স্বপ্ন নয়, উচ্ছ্বাস নয় — সত্যিকার বাস্তবই জ্বালিয়ে তোলে সংরাগ-বহ্নি। ওর আগুন-যে সূর্য্যের মতো উজ্জ্বল। সে-বহ্নিই সৃষ্টি করে পরিপূর্ণ-প্রেমের জ্বলন্ত-জ্যোতিষ্ক। — পৃথিবীর লক্ষ-কোটি মানুষের তৃষিত-ওষ্ঠ যে-প্রেমপাত্রে চুম্বন চাইচে, তার মাঝে কি মোটেও মধু থাকবে না ?...কিন্তু দুঃখ, আপন-চাওয়াকে নিঃশঙ্ক-চিত্তে প্রতিষ্ঠিত করার সামর্থ্য কারোই নেই।...

দেবদত্ত

কী হেঁয়ালিই যে বক্‌চ, বুঝিনে। হয়তো চিরন্তন যে, তার কাচেই ধরা দেয় প্রেমের অমন রূপ সবার চেয়ে বড় ও সত্য হয়ে।...কিন্তু নশ্বর মানুষ ওর খোঁজ রাখবে কী কোরে, বল ?

উত্তীয়

অবিনশ্বরের কৃপা হলে সকল মানুষই ওর খোঁজ পেতে পারে।

দেবদত্ত

নাঃ, সত্যি ও-ছায়ারা তোমায় বুদ্ধি-ভ্রান্ত কোরেচে। আমার মনে পড়চে সেই গল্প — ঐ যে, কোথাকার কোন্ রাখাল সারারাত ধরে কোন্ দেবলোকের দেবতাদের সঙ্গে খেলা কোরেছিল, বাঁশী বাজিয়েছিল। এবং পরদিন জেগে উঠে নাকি দেখ্‌ল, তার শয্যায় স্পষ্ট হয়ে অঙ্কিত রয়েচে কাদের পদচিহ্ন, ঘরময় ছড়িয়ে আচে কোন্ নন্দন-বনের সুগন্ধ।...তোমারও দেখচি ও-দশাই ঘটেচে --

উত্তীয়

সে-রাখালের কথাই-বা মিথ্যে হবে কেন ? নীরব-নিশীথে ঘুমের অন্তরালে ওসব অশরীরীদের সঙ্গে কি তার মিলন ঘটতে পারে না ?

দেবদত্ত

[একটু বিরক্তিভরে] তা' সত্যি-মিথ্যে ওর স্ত্রী-ই জানে। সারাটা রাত মড়ার মতো তারই পাশে পড়েপড়েতো নাক ডাকাচ্ছিল! কখন গেল সে দেবলোকে? আর কখনইবা বাজাল বাঁশী? — স্বপ্নের যতোসব আজগুবী গল্প।...

উত্তীয়

[উদাসকণ্ঠে] অমন স্বপনের গভীরে যদি সবাই ডুবে যেতে পারতুম। পৃথিবীর মিথ্যে-বাস্তবের মোহ থেকে ঐ ছায়ালোকের অবকাশে যদি সত্যি লুকিয়ে যাবার সন্ধান জানতুম।... অন্তরতমের বাঞ্ছিত যে-আকাঙ্ক্ষা তার সংবাদটুকু আনে ঐ স্বপনের ধ্যানমগ্নতা। আর ঐ ধ্যান-মগ্নতায় যে-প্রেমের জন্ম তা' কী গভীর, কী অনবদ্য। তার সঙ্গে অশ্রুর পরিচয় থাকলেও সে-বস্তু যে আনন্দের।...বন্ধু, শুধু স্বপনের হেঁয়ালিই দেখলে, ওর অন্তর্নিহিত সত্য-মূর্ত্তিখানার দিকে তাকালে না?...

দেবদত্ত

মানুষের দেহ ধরে যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ ওসব বোঝা অসম্ভব।

উত্তীয়

[গভীর কণ্ঠে] তবু আমি ভাবতে পারিনে, ওরা আমায় মৃত্যুর পথে নিয়ে চল্‌চে।... জাননা, আমায় যে ওরা তেমন প্রেমেরই সন্ধান দিতে চেয়েচে যে-প্রেম চিরায়ুষ্মানের, যে-প্রেমের অধিকার সে-ই পেয়েচে যার চিত্তে আদি হতে অন্তকালের শাশ্বত-বাণীর সুরটি ধরা পড়েচে।... ওরা আমার কল্পনালোকের আদর্শ, আমার চলমানের জীবন-শক্তি।...বিস্মৃত কোন্ অতীতের প্রেমিক-প্রেমিকা সাগর ও উর্ম্মি! — ওরাই আজ এ-অনন্ত-সমুদ্রে আনন্দে ভেসে চলচে, নৃত্যে জেগে উঠচে। ওদের আশীষটুকু কি মিথ্যে হবার?...বন্ধু, আমার মতো কোরে একবার নির্নিমেষে তাকিয়ে দেখেচ কি ওদেরকে? — দেখনি দু'জনার ঠোঁটের লেখায় কেমন রঙিন বিভা? চলার ছন্দে কেমন অভিনব কুশলতা? আয়ত-বিশাল আঁখির ছায়ে কেমন দীপ্তি-শিখা?...

উত্তীয়

মৃত্যুর পথে-যে তোমায় তারা টেনে নিচ্চে, এ নিশ্চিত। যে-ধ্যানমগ্ন উপলব্ধির কথা কইচ তা' যারা মরে গেচে, অথবা যারা কোনোদিনই জন্মায়নি, তাদেরই জানার বস্তু।...উত্তীয়! বন্ধু! তারা তোমার অদ্ভুত-পাখীগুলোর পেছনেপেছনে ঘুরাচ্চে। আর তুমিই তো বলেচ, অলৌকিক এ পাখীগুলোর যাত্রা মৃত্যুলোকে?...

উত্তীয়

যদি মৃত্যুলোকেই চলে থাকি, তাতেই বা কী ক্ষতি? সেখানে বা অন্য কোথাও নিশ্চয়ই আকাঙ্ক্ষিত আমার প্রেমের সঙ্গে তারা পরিচয় ঘটিয়ে দেবে।...এক আনন্দময়ী চিরন্তনীর দেখা আমি পাব — তারপর দু'জনায় পৃথিবীর একটি নিভৃত-কোণে গৃহ রচনা কোরবো। প্রেমে, রসে,

সংরাগে পরিপূর্ণ হয়ে এমন রূপ ও গন্ধের বিস্ময় জাগিয়ে তুলবো আমাদের একখানি মিলনে, যা' সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত শুধু একখানি ছন্দে, একখানি স্পন্দনে ও একখানি পুলক-শিহরণে মধুর হয়ে রইবে।

[ত্বরিত ক্ষেপে একদল নাবিকের প্রবেশ]

প্রথম নাবিক

দেখ, দেখ, ঐ কুয়াশার ভেতর দেখ। একটা মশলা-বোঝাই বজরা আসচে যেন। আমরা ওর সঙ্গে ধাক্কা খেলুম বলে।...

দ্বিতীয় নাবিক

চন্দন আর অম্বরী তামাকের গন্ধ না পেলেতো আমরা ওর অস্তিত্বই টের পেতুম না।

প্রথম নাবিক

না না, দারুচিনি আর গুগ্‌গুলের।

উত্তীয়

[দেবদত্তের হাত হইতে হাল গ্রহণ করিয়া]

মৃত্যুঞ্জয়ীরা আমার মনস্কামনা হয়তো পূর্ণ কোরলো। আর, মুহূর্ত্তের বিলম্ব না-সয়ে তোমরাও বোধ হয় পুরস্কৃত হলে।

দেবদত্ত

[দূরের অস্পষ্ট বজরার দিকে চাহিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে] ও-দড়াটা তুলে নাও শীগ্‌গির... আমাদের বজরা জোরে চালাও.. আক্রমণ কর ওদেরকে...আক্রমণ কর —

প্রথম নাবিক

ওতে যেন রাজা ও রাণীর মতো দু'জনকে দেখা যাচ্চে? — আঃ, একজন মেয়েমানুষ যখন আচে, তখন আরো তো থাকবেই—

দেবদত্ত

চুপ। আস্তে কথা কও, ওরা শুনবে।

প্রথম নাবিক

না না, শুনবে না। দেখচনা দু'জনে কী মশগুল-ই-না হয়ে রয়েচে!...দেখ, দেখ, রাজা কেমন কোরে তরুণীকে চুমু খাচ্চে —

দ্বিতীয় নাবিক

মেয়েটা যখন দেখবে, আমরা ভালোভালো অনেক প্রার্থী এখানে রয়েচি, তখন শেষটায় আর দুঃখ কোরবে না।

প্রথম নাবিক

উঁহু, দেখো, বুনো বেরালের মতো কেমন মরীয়া হয়ে ওঠে। এ-সব রাণীরা সোনা-রূপোর

তাদের মধ্যে বসে থাকতে ভালোবাসে, আর রাজারাজড়াকে বিয়ে কোরে খুব সম্মান ও প্রতিপত্তি পেতে চায়।...ওরা আমাদের মতো সুস্থ-সবল কর্ম্মঠ লোকদেরকে তো পছন্দ কোরবে না —

দেবদত্ত

[উত্তেজিত ব্যস্ততায়] দৌড়ও, শীগ্‌গির দৌড়ও, নাবিকগুলো ঘুমিয়ে থাকতে ওদের আক্রমণ কর...

[এ বজরার নাবিকেরা ত্বরিতে চলিয়া গেল]

[মুক্ত-কৃপাণের ঝন্‌ঝনা ও উচ্চ চীৎকার-ধ্বনি অপর বজরা হইতে আসিতে লাগিল। এ বজরার বিস্তৃত পালের জন্য কিছুই দেখা যাইতেছিল না]

কণ্ঠ ধ্বনি

উঃ, মেরে ফেল্‌লে...মেরে ফেল্‌লে...

অপর কণ্ঠধ্বনি

ওঠ, ওঠ সবাই...

অপর কণ্ঠধ্বনি

ঘুম ভাঙলে কেন ?

প্রথম কণ্ঠধ্বনি

উঃ, কৃপাণ সেঁধিয়েচে...মেরে ফেল্‌লে....মেরে ফেল্‌লে...

[অনেকের গোঙানী শ্রুত হইতেছিল]

উত্তীয়

[হাল ধরিয়া দণ্ডায়মান]

[স্বগত] ঐ ! ঐ ওরা আসচে !...সাগর বলাকা, গাঙচিল বা পানকৌড়িই হয়তো — কিন্তু মানুষের মতো মুখ তাদের। নর ও নারীর অনিন্দ্য-মুখচ্ছবি নিয়ে তারা মাস্তুলের উপরকার আকাশটার বুকে ভেসে বেড়াচ্চে, হয়তো বন্ধুদের অপেক্ষায়। ওরা এলেই সবাই মিলে আবার যাত্রা কোরবে তাদের গোপন-পথের রেখা ধরে।...ঐ যাচ্চে যুগল হয়ে, দল বেঁধে যাচ্চে ;— আমি তাদের কথা শুনবো। হাঁ, ঐ-ত ধ্বনি আসচে। কৈ, ভাষাতো পড়তে পারচিনে ! — নাঃ, এবার স্পষ্ট হয়ে উঠেচে ...একজন বলচে — 'আঃ, কী হাল্‌কা হয়েই না গেচি, পাখীর ছন্দ পেলুম গতির ভঙ্গে।'...আর একজন উত্তর দিলে, 'হয়তো বোঝামুক্ত হয়ে এবার আমরা পাবো অন্তরের চিরকাম্যকে।' তারপর একজন অপরকে শুধোচ্চে কি কোরে তার মৃত্যু হল, সে বলচে—'ঘুমের মাঝে কার কৃপাণ-ফলা এসে আমার বুকে সেঁধিয়ে গেল।'...হাঁ, হঠাৎ ওরা গতি ফিরিয়ে উল্টো দিকে উড়ে চল্‌ল, ক্রমেই উঁচু, আরো উঁচুতে উঠতে লাগ্‌ল।...এরপর এল এক মন্থরগামী পাখী, তার মুখখানা নারীর। সে আপন মনে কইতে লাগ্‌ল — 'কৃপাণ-আঘাতে আমার মৃত্যু হ'ল।

এখন চলেচি আমার প্রিয়তমের কাচে, বাতাসের স্বচ্ছ-রথে। এ-রথ ছুটে যাবে মহা উর্দ্ধের অবারিত মুক্তি-সভায়। 'প্রভাতী-বায়ুর অঞ্চলতলে তার সাথে হবে আমার অনন্ত-মিলন।'.. কিন্তু ওরা মাস্তুলের উপর অমন বৃত্তাকারে শুধুই উড়চে কেন? গোপন আনন্দলোকে যাবার তাড়া থেকে এমন কী লোভের বস্তু হেথায় এখনও ওদেরকে আকর্ষণ কোরচে?— মাথার উপর অমন কোরে ঘুরে বেড়ানর কি কোনো গূঢ় অর্থ রয়েচে?...কিন্তু কী সে অর্থ? [চীৎকার করিয়া] ওগো, তোমরা কার অপেক্ষায় আচ?— কেমন সুন্দর ডানা হয়েচে তোমাদের, কেন উড়ে যাচ্চনা আপন কল্পনালোকে? [কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল] [আবার স্বগত]...উর্দ্ধে, বহু উর্দ্ধে তারা ব্যস্ত হয়ে আচে — আমার কণ্ঠ সেথায় পৌঁছয় না।...কিন্তু কী অর্থ ওদের অমন কোরে ঘুরে বেড়ানয়?...

[নাবিকেরা প্রত্যাগমন করিল, সঙ্গে বন্দিনী মঞ্জুলা]

উত্তীয়

[পশ্চাতে মুখ ফিরাইল, এবং বন্দিনীকে লক্ষ্য করিয়া বিস্ময়ে]

একি! আমার দিকে অমন কোরে চাইচ কেন?...তুমিতো ধরিত্রীর শ্রেয়সী নও। তুমিতো আমার মানস-বনের লক্ষ্মী-মূর্ত্তি নও। না না, কিছুতেই না। পাখীদের নীরব-ভাষার ও অর্থ নয়। উঁহু, বিশ্বের শ্রেয়সী তুমি? হতেই পারে না।

মঞ্জুলা

[উদ্ধত-স্বরে] আমি সম্রাজ্ঞী। তুমি কৈফিয়ৎ দাও, কেন এরা আমার স্বামীকে হত্যা কোরেচে! কেন আমায় বন্দী কোরে এরা নিয়ে এসেচে?—

[নাবিকদের বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া উহাদেরই উদ্দেশে] সরে দাঁড়াও!—

উত্তীয়

তোমার ছায়া পড়চে কেন? তুমিতো মৃত্যুঞ্জয়ী অশরীরী হয়ে আসোনি?...কোথা থেকে এলে, বল? এ জনহীন সমুদ্রে কে তোমায় আনলে?...উঁহু, তারাতো এমন কাউকে পাঠাতে পারে-না যার ছায়া পড়বে — তুমি কী কোরে হবে আমার কল্পলোকের চিরন্তনী? আমার ভাবনা রাজ্যের প্রেয়সী?

মঞ্জুলা

যে বিপুল ঝঞ্ঝা উঠে আমার সপ্ত-ডিঙা ডুবিয়ে দিলে, বিশ্বজয়ের গর্ব্বোদ্ধত চিহ্নস্বরূপ লুণ্ঠিত অমূল্য-সম্পদ যতো সাগর-বক্ষে তলিয়ে দিলে — তারই দুরন্ত-বাত্যায় আমিও নিঃশেষে ধ্বংস পেতে পারতুম।— কিন্তু, যখন বেঁচে গেচি, যখন ঝড়ের ঝাপ্‌টা খেয়ে হেথায় এসে পড়েচি অদৃষ্টের পুঞ্জীভূত দুঃখকে জেনে নেবার জন্যে, তখন সাম্রাজ্ঞীর মতোই অকুণ্ঠিতকণ্ঠে তোমায় আমি আদেশ দাচ্চি — যারা আমার স্বামীর বিরুদ্ধে হাত তুলেচে, তাদেরকে দণ্ডিত করো।

উত্তীয়

[উদাসকণ্ঠে] এ জনহীন-সমুদ্রের বক্ষস্পন্দন ধ্যান-ঘনতায় জেনে নেবার জন্যে কতো অশরীরী ভেসে বেড়াচ্চে। জীবনের পরম-জ্ঞান তারা উপলব্ধি করেচে। সত্যের দীপ্ত জ্যোতি-লিখা তাদেরকে গোপন-বাণী শুধোচ্চে। তারা জানে, বিশ্বের অস্তিত্ব ধূলোর সাথে মিশেল হয়ে পূর্ণতা পায়। তারা জানে, সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর সম্পদ-গৌরব শিশিরকণার মতো শুকিয়ে গিয়ে ক্ষণিকের চমক ক্ষান্ত করে।...পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে থাকে শুধু অশ্রু আর হাসি। মৃত্যুর পর প্রত্যেক আত্মা আপন কর্ম্মফল নিয়ে চলে যায় কোন্ অজানায়। মাটির বুকে লুটিয়ে থাকে সব কিছু, যা' জীবনভর তারা আঁকড়িয়ে ছিল।...

মঞ্জুলা

হেঁয়ালি ছাড়া কিছুই তো বলচ না।—ঠিক কোরে বল, আমার প্রতিহিংসায় সাহায্য দেবে কিনা ?...

উত্তীয়

[অন্যমনে] পরম-সত্যের আভাস যদি পেয়ে থাক, নারী, তবে তোমায় আমি ছাড়ব না।... কিন্তু তা কি পেয়েচ ?...

মঞ্জুলা

কী কইচ অবোধ্য ভাষায় ?...আমায় ছাড়বে না ?...জানো, আমি রাজার মহিষী ?

উত্তীয়

[কি যেন গভীরভাবে ভাবিতে ভাবিতে] নারী, তোমায় যদি মুক্তি দি', আপন তরী খুলে নিজের রাজ্য অভিমুখে যদি তুমি যাত্রাও করো — তবু জেনো, আকাশ জুড়ে এমন ঝড় উঠবে যার প্রচণ্ড উচ্ছ্বাসে ঊর্দ্ধে লক্ষ তারার মালাখানি ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, নিম্নে উন্মত্তের প্রলয়-নৃত্য সাগরের বুকখানাকে খ্যাপা কোরে তুলবে — আর তুমি, তুমি হাওয়ার আচম্কা টানে আমারই পাশে এসে এমনি কোরেই দাঁড়াবে।...

মঞ্জুলা

উন্মত্ত তরুণ, এ জনহীন সমুদ্রের আর্ত্ত-বাতাস আর মত্ত-তরঙ্গধ্বনি তোমায় কি বাতুল কোরে তুলেচে ?

উত্তীয়

না, সম্রাজ্ঞী, আমি ঠিকই বলচি।

মঞ্জুলা

তবু তুমি কইচ, বাতাস আর বিপুল জলরাশি আমার বিরুদ্ধে কোরবে বিদ্রোহ ?

উত্তীয়

[অন্যমনস্কতায়] উন্মত্ত হইনি অশরীরী আত্মারা আমায় এ তথ্য জানিয়েচে।

মঞ্জুলা

তাদের আদেশেই কি আমায় বন্দী কোরেচ ?

উত্তীয়

দু'জনেই তো বন্দী হয়েচি, বালা!...ওদের আদেশেই তো বাতাস উঠলো জেগে, আর উড়িয়ে আনলো সে তোমাকে আমার বক্ষদোলার পাশে। ওরাই বলেচে, আমি আমার চিরন্তনীকে পাবো, আমার জন্ম-জন্মান্তরের প্রিয়তমাকে জেনে নেব। — আর সে-জন্যেই তো এ বীণাখানি তুলে দিলে ওরা আমার হাতে কতো অনুরাগে!— এর অনবদ্য ঝঙ্কারের কাচে যে হার মানে চন্দ্র-সূর্য্যের সকল সামর্থ্য, নক্ষত্রপুঞ্জের সকল ক্ষমতা! এ-সম্পদ আমায় কোরেচে অসীম শক্তির অধিকারী। আমার কাছ থেকে তোমায় কেড়ে নেবে এমন কে আচে, বল ?...

মঞ্জুলা

[প্রথমে শিহরিয়া উঠিল। তারপর আত্মসম্বরণ করিয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিতে হাসিতে]

ও-সব অলৌকিকের ইঙ্গিত আর বীণার সামর্থ্য নিয়ে যতো খুসী উন্মাদ হয়ে ওঠ। কিন্তু, মনে রেখো, আমি রাজার নন্দিনী, রাজার মহিষী। আমায় তোমার শয্যা-সঙ্গিনী কোরবে — এ একান্ত অসম্ভব।...

উত্তীয়

তোমার অন্তরের নারী যতক্ষণ-না আমায় আপন বোলে জানবে, ততক্ষণ তোমায় তো স্পর্শও কোরবো না।

মঞ্জুলা

আমার চোখের সুমুখে আমার সম্রাট, আমার স্বামী রক্তাক্ত দেহে ধূলোয় গড়িয়ে পড়ল — আর আমি কিনা এখন তোমার কাচে বসে শুনবো প্রেমের রসাল-উচ্ছ্বাস ?...

উত্তীয়

কী ঝড়-ই-না উঠেছিল, নারী! অমনটি কখনো দেখেচ ?...এক রুদ্র-নর্ত্তনে প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তের বুকে লেগেচে বিপ্লব। তাই মহাকালের যোগসূত্র গেচে ছিন্ন হয়ে। প্রত্যেকটি ক্ষণ, পৃথক হয়ে পড়েচে এবার। প্রেয়সী, পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তের জন্যে পর-মুহূর্ত্তের কোনো দায়িত্ব নেই। তুমিও ভুলে যাও তোমার অতীতের স্থূল কথা। সত্যের চিরন্তন সুরটিকে শুধু আঘ্রাণে জেনে নাও।... যুগযুগ ধরে তুমি ভালোবেসে আসচ তোমার প্রিয়তমকে। কখন, কোন্ রূপে সে এল তার বিচার নিয়ে থাকলে তো তোমার বুকের সত্যকে হেলায় কোরবে নত, প্রিয়তমের বিরহী আঁখি জুড়ে আনবে অসহ্য রোদন।...

মঞ্জুলা

বুঝলুম। তোমার বীণায় যাদু লেগেচে। তুমি মায়াবী!...যখন তন্ত্রী ভরে ঝঙ্কার তুলবে তখন সাগর থেকে হয়তো উঠে আসবে এক মন্ত্রমুগ্ধ-দৈত্য যার যাদু-দণ্ডের পরশে আমার চিত্তে ঘটবে বিভ্রান্তি, আমিও হয়তো ব্যগ্র হয়ে উঠবো তখন তোমার বক্ষে চুম্বন জানাবার জন্যে!...

উত্তীয়

তোমার ওষ্ঠের চুম্বন তো আমি চাইনে। আমি চাই তোমার অন্তস্তলের চুম্বন।

মঞ্জুলা

[স্বগত] উঁহু, ভীতা হইনি। ফাঁসির রজ্জুর অভাব ঘটেনি। বিপুল সাগরের বারিরাশিও শুকোয়নি। — কী ভয়?....কথা আমার শেষ হয়েচে। বলার কিছুই আর নেই। [অত্যন্ত নিবিষ্টতায়] ভয় পেলুম কি? না না। মন, তুমি নিঃশঙ্ক হও। *

ক্রমশঃ

* ইয়েট্‌স্‌এর 'Shadowy waters' এর একান্ত অনুসরণে
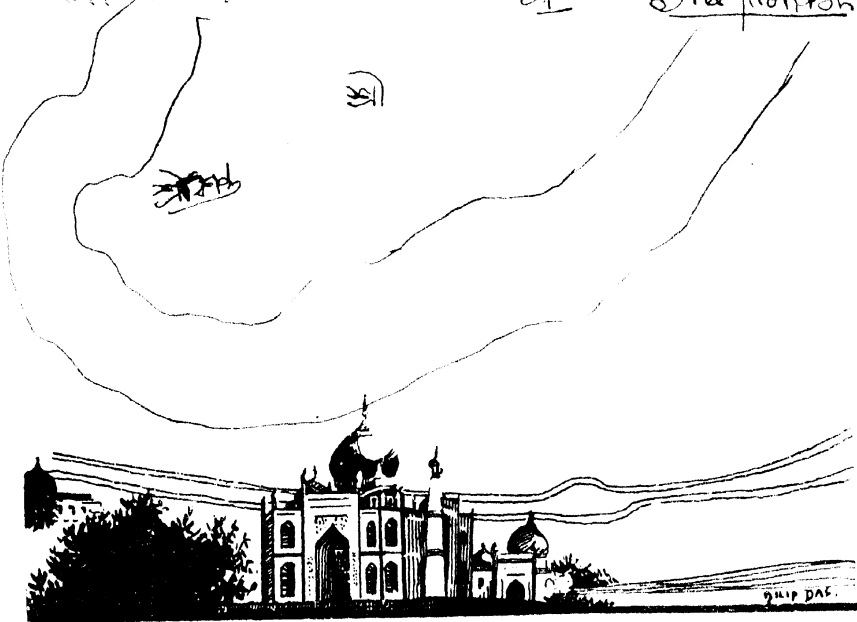
রাশিয়ার পরিবার

সুশীলচন্দ্র ঘোষ

কম্যুনিষ্ট ম্যানিফেষ্টোতে মার্কস লিখেছেন, বুর্জোয়া বিয়ের উচ্ছেদ চাই। বুর্জোয়া বিয়ে কি এবং অ-বুর্জোয়ো বিয়েই বা,কি, এ বিষয়ে কোথাও তাঁর স্পষ্ট উক্তি নেই। তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু এঙ্গেল্‌স 'ফ্যামিলি' নামক গ্রন্থেও এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। প্রতিধ্বনি করেছেন মাত্র, কিন্তু ভাবী পরিবার-প্রথা যে কি রূপ নিবে, সে বিষয়ে তিনিও নীরব এবং অনিশ্চিত। এঁদেরই ভাষ্যকার এবং নিধনের পূর্ব পর্যন্তও মার্কসীয় মতবাদের শ্রেষ্ঠতা ব্যাখ্যা বুখারিন অবশ্য স্পষ্ট করেই লিখেছেন, বর্তমান পরিবারেরই উচ্ছেদ চাই।* সবাই জানেন, বর্তমান পরিরার-প্রথা এক-পতি-পত্নী মূলক বা monogomous. কাজেই এই পরিবার-প্রথা উচ্ছেদ করে অপর কিম্বিধ পরিবার অথবা পরিবার-হীনতা প্রতিষ্ঠিত হবে সে সম্বন্ধে কম্যুনিষ্ট মনিষীরা নিজেরাই অনিশ্চিত, অস্পষ্ট এবং পরস্পর বিরোধী মতাবলম্বী।

চিন্তাজগতের এই অস্পষ্টতার ছাপ ব্যবহারিক জগতেও দেখা যাচ্ছে। তাই আজকের রাশিয়ায় যে পরিবার-প্রথা গড়ে উঠেছে, সেখানে মার্কসীয় পরিকল্পনার স্থান অপরিসর। একে বরং বর্তমান এক-পতি-পত্নী মূলক পরিবার-প্রথারই সংস্কার-প্রাপ্ত প্রতিরূপ বলা চলে।

নব্যরুষে নিত্যনূতনভাবে যে পারিবারিক সংগঠন-সংস্কার চলছে, আজ সমগ্র জগতের উৎসুক দৃষ্টি পড়েছে সেই দিকে। কিন্তু ভবিষ্যতে যে সাম্যবাদের আদর্শানুযায়ী পরিবারের সংগঠন রাশিয়াতে হবে, সে বিষয়ে বামপন্থীরা খুবই আশাবাদী। সোভিয়েট রাশিয়ার বিচারক কমিউনিষ্ট ব্রানডেনবার্স্কি বলেছেন, "বর্তমানে স্বামী-স্ত্রী, পিতামাতা এবং পুত্র কন্যাদের ভেতর বাধ্যবাধকতা এবং অধিকারের ওপর যে পরিবার গঠিত হয়েছে, তা' অবশ্যই একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, এবং তার স্থলে সৃষ্ট হবে এমনি একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান যা' সমাজের শিক্ষা ও কল্যাণ নিয়ন্ত্রিত করবে। কিন্তু যে হেতু এখন পর্যন্ত এটা বাস্তবে পরিণত হয়নি সেজন্যই বর্তমানে রাষ্ট্র কর্তৃক পরিবারের মধ্যে পারস্পরিক বাধ্যবাধকতার প্রবর্তন হয়েছে।" তাই কার্যতঃ আমরা দেখছি, রাশিয়ায় প্রথম বিপ্লব-তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে যে উদ্দাম উশৃঙ্খলতা চলছিল, আজ তা প্রশমিত হয়ে যে আকার নিচ্ছে তা অন্ততঃ পরিবার-হীনতার দিকে নয় এ নিশ্চিত। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে সোভিয়েট রাষ্ট্রে প্রথম বিবাহ আইন প্রবর্ত্তিত হয়। এতে শুধু সিভিল ম্যারেজই অনুমোদন লাভ করে। তখন বিবাহ সম্বন্ধীয় ধর্ম্ম উৎসবাদি বন্ধ করবার জন্য কোন প্রকার চেষ্টা করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে অধিকাংশ কৃষকশ্রেণী এবং নাগরিকবৃন্দ চার্চে গিয়ে বিবাহের কাজ সেরে আসত। কিন্তু ধর্ম্মযাজকগণ রেজিষ্ট্রেশন অফিসের সার্টিফিকেট ছাড়া কারও বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পাদন করতে রাজী হোত না।

বর্তমানে যে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত আছে তাতে বর এবং কনেকে নিজ নিজ পরিচয় জ্ঞাপক পত্র রেজিষ্ট্রেসন অফিসে দাখিল করতে হয়। তারপর বর এবং কনে প্রত্যেকে স্বেচ্ছায় বিবাহ করছে কি না সে বিষয়ে একটি লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্রে উভয়ের নিজ নিজ নাম ঠিকানা লিখে অফিসের নিকট পেশ করতে হয়। কাজটুকু করতে কুড়ি মিনিটের বেশী সময় নেয় না। এরূপ রেজিষ্ট্রার্ড বিয়ের ফলে চার্চ্চে গিয়ে বিয়ে করতে যে সময় এবং অর্থের অপব্যয় হ'তো, তা থেকে জনসাধারণ অনেকটা বেঁচেছে।

কিন্তু মানুষের মন নিছক একটা formalityতে তৃপ্ত হয় নি। আনুষ্ঠিকতা তার মজ্জাগত। বিয়েতে তাই অনুষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হল। নইলে বিয়ে যেন নিতান্তই হালকা খেলো হয়ে দাঁড়ায়। এর ফল স্বরূপ গড়ে উঠল "red weddings" (লাল বিয়ে)। এরকম বিবাহ কারখানাগুলোর মধ্যে খুব দ্রুত প্রচলিত হচ্ছে। বিয়ের সময় বর এবং কনে একটি লালরঙ্গের মঞ্চের উপর বসে; তাদের কারখানার সহকর্মীরা এবং নারী সমিতির কয়েকজন সভ্য সেখানে উপস্থিত থাকে। কারখানার প্রধান ব্যক্তি বিয়ের পৌরোহিত্য করেন। বর ও কনে দুজনকেই সবার উপস্থিতিতে প্রতিজ্ঞা করতে হয় এই বলে যে তারা উভয়েই কারখানার উৎপন্ন দ্রব্যের প্রসারের জন্য কাজ করে পরস্পরকে সাহায্য করবে। এ অনুষ্ঠান টুকুর শেষে জলযোগের ব্যবস্থা করা হয় এবং তাতে উপস্থিত সবাই যোগদান করে। এই হলো বর্তমান সোভিয়েট রাশিয়ার বিবাহ-পদ্ধতির মোটামুটি বিবরণ।

বিয়ে ছাড়াও ছেলেমেয়ের নামকরণের সময় উপরোক্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবারও কারখানার অধ্যক্ষই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। সন্তানকে রাষ্ট্রের নিকট উৎসর্গ করার পর্ব শেষ হলে পর সন্তানের নাম করণ হয়। পূর্বে এই অনুষ্ঠানের নাম ছিল "ক্রিশ্চেনিং", বর্তমানে একে বলা হয় "অক্টোব্রিনা"। অর্থাৎ খৃষ্টের সম্পর্ক বর্জন করে অক্টোবর বিপ্লবের স্মারক নামই গৃহীত হয়েছে। যেমন কোন সাধু সন্ন্যাসীর নামে সন্তানের নাম রাখা হতো, এখন আর সেরূপ হয় না। এখন রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত কয়েকটি নামের মধ্যে একটি নাম রাখতে হবে। সন্তান যদি মেয়ে হয় তবে তার নাম রাখতে হবে "লেনট্রোজিনা" অথবা 'এরা'। আর যদি ছেলে হয় তবে তার নাম রাখতে হবে 'রেম' (Rem বা Revolution) বা ইলেকট্রিফিকেশন' (Electrification) বা মস্কো অথবা '২৫শে অক্টোবর"।

পূর্বে নিয়ম ছিল যে, স্বামী স্ত্রী বিবাহের পরে একটি সাধারণ নাম গ্রহণ করবে, অথবা স্বামী কিংবা স্ত্রীর যে কোন জনের নামানুসারে দুজনেই নাম ব্যবহার করবে। কিন্তু বর্তমানে এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে। এখন স্বামী স্ত্রী একটি সাধারণ নাম গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু স্বামীর বা স্ত্রীর নামানুসারে কোন নাম রাখতে পারবে না। 'সাধারণ' নাম না রাখলে বিয়ের আগে যে নাম ছিল সে নামই ব্যবহার করতে পারবে।

আদালত কর্তৃক বিবাহবিচ্ছেদ আইন কানুন রাশিয়াতে প্রচলিত আছে। অবশ্য বিবাহ

বিচ্ছেদের জন্য কতগুলি যুক্তিযুক্ত কারণ থাকা চাই। বিয়ের সময় ছেলের বয়স যদি ১৮ এবং মেয়ের বয়স ১৬র নিচে হয় এবং বিয়ের পরে যদি সেটা জানা যায়, তবে সে বিয়ে রদ হয়ে যায়। তাছাড়া এটাও যদি পরে জানা যায় যে বিয়ের সময় ছেলে অথবা মেয়ে স্বইচ্ছার বিরুদ্ধে চাপে পড়ে বিয়েতে মত দিয়েছে অথবা বিয়ের সময় ছেলে অথবা মেয়ের মানসিক অবস্থা প্রকৃতিস্থ ছিল না, তা হলে সে বিয়েও বাতিল হয়ে যায়। বহু বিবাহ রাশিয়ায় আইন বিরুদ্ধ।" কেহ যদি একবার বিয়ে করার পরও প্রথম বিবাহের কথা গোপন রেখে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে এবং সেটা যদি গভর্ণমেণ্ট জানতে পারে, তবে সে ব্যক্তির আদালত কর্তৃক শাস্তি হবে। শারীরিক এবং মানসিক দুর্বল ব্যক্তির বিবাহ অগ্রাহ্য হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ করা রাশিয়াতে খুব সহজ ছিল। স্বামী স্ত্রী উভয়েই যদি বিবাহ বিচ্ছেদের সম্মতি দেয় তা হলে রেজিষ্ট্রেসন অফিসে গিয়ে কাগজে কলমে একটু লিখে দিলেই তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকৃত এবং অনুমোদিত হত। কিন্তু যদি শুধু একপক্ষ বিবাহ বিচ্ছেদ করতে চায় তা হলে আদালতের স্মরণ নিতে হবে। অবশ্য এস্থলে শিশু সন্তান থাকলে তাদের ভরণ পোষণের ব্যবস্থার জন্য আদালত হতেই আদেশ দেওয়া হত।

কিন্তু ১৯৩৬ সালে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর আইন করা হয়েছে। এখন আর আগের মত এটা 'জল ভাত' হয়ে রয়নি। বিশেষত বহুসন্তানের জননীকে রাষ্ট্রকর্তৃক যে পুরস্কার দেবার রীতি প্রচলিত হয়েছে, তাতে বিবাহ বিচ্ছেদের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়েছে।

বিয়ের পর স্ত্রীর অধিকার মোটেই সঙ্কুচিত হয় না। বিয়ের পর স্বামী স্ত্রী উভয়েরই নাগরিক অধিকার অক্ষুণ্ণ থাকে। স্বামী যদি তাহার বাসস্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়, তবে স্ত্রীকেও যে তার সাথে যেতে হবে এমনটি বর্তমানে হতে পাবে না। বর্তমান আইন কানুন প্রবর্তিত হবার আগে সেখানে বিয়ের দ্বারা কোন বিশেষ স্বত্বাধিকারিত্বের সৃষ্টি হতো না। স্বামী এবং স্ত্রীর মিলিত স্বত্বাধিকার সম্পর্কিত সাধারণ চুক্তিই ন্যায়তঃ চলিত ছিল এবং এভাবে সে চুক্তি অনুমোদিত হতো যাতে কোন পক্ষেরই কোন বিষয়ে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা ছিল না। স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েই পরস্পরের সুখ-সুবিধার জন্য দায়ী থাক্‌তো। এ নিয়মটা বিবাহবিচ্ছেদের পরেও যতদিন পর্যন্ত দুপক্ষেরই জীবিকার্জনের উপায় ঠিক না হতো ততদিন পর্যন্ত চলতো।

সোভিয়েট সন্তানদের নামকরণ এবং ধর্ম্মাভিষিক্ত করবার উদ্দেশ্যে একটি আইন তৈরী হয়। এই আইনের বলে বর্তমান শাসন তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে সন্তানদের নাম এবং ধর্ম ঠিক করা পিতামাতার উপর ন্যস্ত ছিল। পিতামাতা যদি এ বিষয়ে একমত হতে না পারতেন তাহলে আদালত উহার মীমাংসা করতেন। আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ধর্ম যদি পিতামাতার মনঃপূত না হতো তবে সন্তান সাবালক না হওয়া পর্যন্ত কোনও ধর্মসম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত বলে পরিগণিত হতো না। সন্তান সাবালক অর্থাৎ ১৪ বৎসরে এসে পৌঁছলে সে নিজেই তার ইচ্ছামত ধর্মগ্রহণ করতে

পিতামাতার উপরই সন্তানের লালন পালনের ভার ছিল। পিতামাতাই সন্তানের সকল রকম মানসিক এবং শারীরিক যত্ন নিয়ে তাকে কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে বাধ্য ছিল। এরূপ আইন ছিল যে পিতামাতা সন্তানকে সকল সময়ই সাথে সাথে রাখবেন এবং সন্তানও বড় হয়ে অসহায় এবং অসুস্থ পিতামাতার সাহায্য করবে। অবশ্য পিতামাতা যদি সরকার হতে কোন সাহায্য না পায়, শুধু সে ক্ষেত্রেই সন্তানের জন্য উক্তরূপে ব্যবস্থা রয়েছে। বর্তমান শাসনেও এরূপ ব্যবস্থা প্রায় রয়েছে, তবে সামান্য একটু অদল বদল হয়েছে মাত্র।

বর্তমান শাসনে রাশিয়াতে মৃত স্বামীর স্ত্রী এবং অন্যান্য পোষ্যবর্গের মধ্যে মৃতের সম্পত্তি দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়। পূর্বে এনিয়ম ছিল না। তখন মৃতের স্ত্রীকে (মৃতের সম্পত্তি যতই থাক না কেন) দশ হাজার রুবলের অধিক দেওয়া হতো না। কিন্তু গত ১৯২৬ সালে উক্ত আইন সংশোধন করে এই সর্তে উত্তরাধিকারীকে সমস্ত সত্বের মালিকানা দেওয়া হয়, সে সম্পত্তির মুল্য যদি পাঁচলক্ষ রুবলের বেশী হয়, তা হলে গভর্ণমেণ্ট উক্ত সম্পত্তির উপর শতকরা ৯০ রুবল হারে কর ধার্য্য করবেন। এতে ফল এই হয় যে বহু সম্পত্তির মালিক হয়েও কেহ একেবারে ধনিক শ্রেণীতে পরিণত হতে পারে না।

রাশিয়ার জনসাধারণের নৈতিক উৎকর্ষের জন্য কোনও বাধাধরা আইনকানুন নেই সত্য কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের নৈতিক উৎকর্ষের জন্য নিজেরাই কাজ করে। সমাজের ভিতর এমনি প্রচার কার্য্য সব সময়ই চলেছে। দেশের সবগুলো লোককে মানবতার আদর্শে গঠন করবার জন্যে অবিরাম চেষ্টা চলেছে। সমাজের, রাষ্ট্রের মানুষও যাতে স্বেচ্ছাচার এবং অসাম্যের বিরুদ্ধে সব সময়ই একতা বদ্ধ হয়ে থাকে, সেজন্য জোর প্রচার কার্য্য চলেছে। সেখানে সমাজ জীবনকে নৈতিকতার দিক দিয়ে বলিষ্ঠ এবং পূর্ণ করবার জন্য গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক বারটি আদেশনামা প্রবর্ত্তিত হয়েছে। এ আদেশ গুলো 'বার আজ্ঞা' নামে পরিচিত। এই বার আজ্ঞার অনুসরণ করেই রাশিয়ার সমাজ এবং রাষ্ট্রের মধ্যে সুস্থ নৈতিকতার প্রচার কার্য্য চলেছে। অপরিণত বয়সে জনসাধারণের মধ্যে যৌন জীবনের বিকাশ যাতে না হ'তে পারে সে জন্য চেষ্টা করা; বিবাহের পূর্বে পূর্ণ ইন্দ্রিয়-সংযম এবং পরিণত বয়সে বিবাহ করা ইত্যাদি নৈতিক উপদেশ সবার মধ্যে প্রচার হচ্ছে।

প্রথম দিক দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়ার সন্তানের জন্ম হবার পরই সে রাষ্ট্রের নিকট উৎসর্গীকৃত হতো এবং তখন সন্তানের জন্য পিতামাতার কোনও দায়িত্ব থাকতো না, গভর্ণমেণ্টই তার সব কিছু ভার নিতেন। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল যে এতে সন্তানের মঙ্গলের চাইতে অমঙ্গলই হয় বেশী। কারণ এতে শিশু পিতামাতার স্বাভাবিক স্নেহপ্রীতি হতে বঞ্চিত হয়ে থাকতো। সে জন্য শিশু জীবনের পূর্ণতার পক্ষে একটা অন্তরায় সৃষ্টি হতো। পিতামাতার কাছে থেকে যে স্নেহ প্রীতি সন্তান পেয়ে থাকে, সন্তানাগারের ধাত্রীর কাছ থেকে তা পাওয়া সম্ভবপর নয়। কিছুদিন পরে গভর্ণমেণ্ট যখন দেখলেন এ নিয়ম চলবার মত অবস্থার সৃষ্টি

এখনও হয় নি, তখন শিশু সন্তানদের লালনপালনের ভার পুনরায় পিতামাতার উপরই ছেড়ে দিলেন।

রাশিয়ার পরিবারের যে বিকাশ দেখা যাচ্ছে, ভবিষ্যতে সেখানে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতেই সমস্ত পরিবার গুলো গঠিত হবে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রথম দিক দিয়ে তেমন সফল হতে পারে নি। শুধু দেশের তৎকালীন প্রতিকূল মতবাদের জন্যই। প্রথম অনেকেই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে ভুল দৃষ্টিতে দেখেছিল। তারা মনে করেছিল যে, এরূপ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ফলে সমাজ-জীবন হয়ে উঠবে বিষময়, কেউ সমাজের অনুশাসনে চলতে চাইবে না, তার ফলে শুধু যে সামাজিক দিক্ দিয়েই একটা অশান্তি অরাজকতার সৃষ্টি হবে তা নয়, তার ফলে রাষ্ট্রের উপরও একটা ঝড় ঝাপ্টা এসে পড়বে, যার ফলে রাষ্ট্রে উপস্থিত হবে বিশৃঙ্খলা, তার অনুশাসন শিথিল হয়ে পড়বে। কিন্তু এটা যে একটা ভুল ধারণা তা এখন সকলেই বুঝতে পেরেছে। সে জন্যই বর্ত্তমানে রাশিয়ায় চলেছে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার অত আয়োজন।

অবশ্য একথাও অস্বীকার্য্য নয় যে ব্যক্তির ওপর সমাজেরও অধিকার, দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য যথেষ্ট রয়েছে বাস্তবিক পক্ষে ব্যক্তিও সমাজে কোন বিরুদ্ধ সম্পর্ক নেই। উভয়েই উভয়কে নিয়ে। পরিবার এ দুয়েরই অবলম্বন। পরিবারের ভিতর দিয়েই গড়ে ওঠে ব্যক্তি, সবল হয় সমাজ। বস্তুতঃই পরিবার সমাজের স্তম্ভ। পরিবার কোন দিনই সমাজের প্রতিবন্ধক নয়, বরং সহায়ক। মনস্তাত্বিকগণ গবেষণা করেছেন, পরিবারের প্রীতি যাদের বেশী, সমাজও স্বদেশের আকর্ষণ তাদের ততোধিক। জাপানী, স্কটলণ্ডবাসী ও পূর্ববাংলার "বাড়ী মুখো বাঙালদের" পরিবার-প্রীতি প্রবাদের মতো। অথচ এদের স্বদেশ-প্রীতি আজ জগৎখ্যাতি অর্জন করেছে।

ব্যক্তি ও সমাজের সামঞ্জস্যকারী নারীও পুরুষের সমাধিকারী যে পরিবার প্রথা, ভাবীযুগ তারই প্রতীক্ষায় উন্মুখ হয়ে আছে।

বাতায়ন

কামাক্ষী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

মেঘ ছিঁড়ে গ্যাছে, ইথারের দেশ ছুটে
আলোর কনারা সাঁৎরিয়ে চলে এলো,
বাঁধানো পথেতে বাষ্পও দেখি ওড়ে
পৃথিবীর জল বাতাসেতে এলোমেলো।

বেলা পড়ে আসে, বাতায়ন পাশে
বই পড়ি শুয়ে শুয়ে ;
দিনখানি আসে নুয়ে।
ঝক্‌ঝকে আলো সূর্য্যের কাছে
সাঁৎরে ফেরত যায়,
তরল আকাশ সবুজ হয়েছে গম্ভীর গাঢ়তায়।

ভাঙা ছেঁড়া মেঘ, ঝিলিমিলি বক
চুপ্‌চাপ্‌ ভেসে গ্যাল ;
ইথারের দেশ ছুটে
আলোর কনারা সূর্য্যের কাছে এলো।

আলো চাই নাকি ? না-না থাক্‌ থাক্‌
ঝাপ্‌সা বিকেলখানি
ভারি ভালো লাগে। বাতায়ন পাশে
সিগারেট শুধু টানি।

ঝিলিমিলি বক, ভাঙা ছেঁড়া মেঘ
নির্জ্জন চুপ্‌চাপ্‌ :
খাবো নাকি চা, তামাটে-তরল নিটোল একটি কাপ ?

কত লোক গ্যাল, মেয়েটি তো বেশ
ফুরফুরে ঝিরঝিরে,
দ্রুত ধাবমান গাড়ীর ভেতরে শাড়ীখানি তার ওড়ে।
আলো চাই না তো, বেশ আছি আমি
বাতায়ন পাশে শুয়ে,
ঝাপ্‌সা বিকেল কোমল হয়েছে
দিনখানি আসে নুয়ে।

মুক্তার মত টল্‌টলে তারা মুক্তির ভাষা নিয়ে
ফানুসের মত দেখি আকাশেতে ভাসে :
কলে জল যায়, আলো জ্বলে ওঠে
ধীরে ধীরে রাত আসে।

সময়ের ধ্বনি শুনেছি শুনেছি
পাণ্ডু অন্ধতায়,
গম্ভীর স্রোত ছুটে চলে ওই
খোঁজে সে পূর্ণতায়।
বুদ্‌বুদ ফোলে, বুদ্‌বুদ ফাটে
মৃতদেহ খাটে ওঠে,
নতুন শিশুর কান্নার মাঝে
জীবনের ভাষা ফোটে।
আকাশ এখানে গম্ভীর নীলে
জীবন স্বপ্ন বোনে,
ঝাপ্‌সা বিকেলে বাতাস শুধু
বাঁচ্‌বার ভাষা শোনে।
সৃষ্টির ঝুঁটি কঠিন মুঠিতে
সময় ঝাঁকানি দেয়,
কঠিন বাঁধন সিথিল হয় না
হিসেব মিলিয়ে নেয়।

ভাঙা ছেঁড়া মেঘ, ঝিলিমিলি বক
চুপ্‌চাপ্‌ ভেসে গ্যাল :
ইথারের দেশ ছুটে
আলোর কনারা সূর্য্যের কাছে এলো।

আলো চাই নাকি ? না-না থাক্ থাক্
ঝাপ্‌সা বিকেলখানি
ভারি ভালো লাগে। বাতায়ন পাশে
সিগারেট শুধু টানি।

সেই মুখ

প্রতিমা দাশগুপ্তা

আমি কে?

সে গুরু গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলো।

চারিদিক নির্বাত। প্রশ্নের রেশ ধীরে ধীরে নির্মল নিথর আকাশে মিলিয়ে গেলো। তার বড় অস্বস্তিবোধ হচ্ছিলো যেন একটা বেফাঁস কথা সে বলে ফেলেছে।

স্পর্দ্ধার সহিত ভাবলো আর যাই হোক আমি বোবা নই। বড় জোর স্মৃতিবিভ্রম ঘটেছে।

সে মুখের উপর হাত বুলালো; মুখমণ্ডল মসৃণ, এর বেশী আর কিছু তার মনে হোল না।

মাথার পিছনটা অনবরত টন্‌টন্ করছিলো—যেন একটা অসঙ্গত ভার লেগে রয়েছে।

সে শপথ করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু ক্ষণকাল পূর্বের অস্বাভাবিক উক্তি স্বতঃস্ফূর্ত্ত ইচ্ছাকে দমিয়ে দিলো।

দৃষ্টিরেখা স্পর্শ করে নিকটেই রেল লাইনের উচু রাস্তা চলেছে। ধাতুরাশির তপ্ত নিঃশ্বাসে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে।

'আমি কি গাড়ীতে আছি, না লাফ দিয়ে কোথাও পড়ে গেছি, না কেউ আমাকে ফেলে দিয়েছে?' টেলিগ্রাফের তার হতে মধুর গুঞ্জন ধ্বনি বাতাসের সহিত শূন্যের বুকে মিশে যাচ্ছে। তারই সাথে সুনীল উদার আকাশের গায়ে উঁচু পোষ্টএর উপর একটি ভরত পাখী আপন মনে গান গাইছে।

'এটা কী পাখী, আমি কি শুধু এর নামই ভুলে গেছি, না আরো কিছু?' ক্ষণিকের জন্য সে দাঁড়ালো। অদৃষ্টবাদী বুর্জোয়ার মত ঠিক একই পথে চটুল গতিতে পাখীটি উড়ে গেল।

'পাখীটি ত বেশ।'

মাথার যন্ত্রণা যেন একটু কমে গেছে। বিশ্রস্তভাবে সে উঁচু রাস্তায় উঠে চারিদিক তাকালো। প্রান্তরগুলি সমতল, বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় সমুজ্জ্বল। এ দৃশ্য তার বেশ ভাল লাগছিলো। 'আমি যেই হই, আমার কাছে এর অনেকখানি নূতন।'

'ধীর ও শান্ত দৃষ্টিতে সে সব দেখে নিলো।' চৌকোনা ছোট ছোট নিবিড় মাঠ। বৈশাখের পল্লব ঘন গুল্মকুঞ্জ। জলহীন পুকুরের ধারে দু'চারটি গরু ভেড়া চরছে। বড় গাছের নীচে একটা সাদা ঘোড়া বাঁধা। এক সারি ঝাউ গাছ মাথায় জটাজালের বোঝা নিয়ে মূর্তিমান জড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। খরগোষ, জালালি পায়রা, চকচকে শালিক তাদের কালো ছায়া পাশে রেখে বসে আছে। আরো কত কি।

এ দৃশ্যের বিশেষত্ব হোল এ অভ্যস্ত, প্রত্যাশিত ও নিরাপত্তায় পরিবৃত এবং আপনার

অন্তরালে আপনি অবলুপ্ত। তার কাছে এ সব অত্যন্ত অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক ঠেকেছিলো। তার এ আবেগোদ্বেল অনুভূতিতে প্রথম সংরাগের অভিনবত্ব ও দুর্দম আতিশয্য ছিলো।

সে বলে উঠলো, 'এই দৃশ্যটিই আমার কাছে এক পেয়ালা চায়ের মতো উপভোগ্য।' রেল লাইনে কাঠের উপরে গা ছেড়ে বসে পড়লো।

আমি কে ?

তার সেই সর্বাশ্রয়ী প্রশ্ন ও বিবশ মস্তিষ্কের মধ্যে চলছিলো এক আধ্যাত্মিক বিপর্যয়, যা অদৃশ্য কিন্তু তাপচ্ছটার মতো উত্যক্তকর। চারিদিকের মৌন প্রশান্তি তার বড় ভালো লাগছিলো, মাথা যেন আপনি এর কাছে নত হয়ে আসে, এ ভাব তাকে পেয়ে বসলো, তার ইচ্ছা হোল সব কিছুই চিন্তা করে দেখে, কিন্তু চিন্তার প্রধান সূত্রগুলি সূচনাতেই ঘুলিয়ে যায়।

তাজমহলের উদাসীন অনিবিষ্টতার মধ্যে মনোসংযোগ যেমন কঠিন তার পক্ষেও একাগ্রচিত্ত হওয়া তেমন দুরূহ।

একটু চেষ্টা করেই সে প্রকৃতির অজস্র প্রাচুর্য হতে চোখ ফিরিয়ে নিজের কালো পুরাণো জুতার দিকে তাকালো। তাদের মধ্যে একটা একটানা প্রত্যয়বোধ ছিলো, তারাও তার জীবনের অঙ্গীভূত, তার নিজস্ব। এ নিজস্ববোধই অখণ্ডধারাবাহিকতার সাথে যুক্ত রাখে।

আমার! হ্যাঁ তাই.........অতীতের অসংখ্য তুচ্ছতা হতে তার মন হঠাৎ সুদূর জনশূন্য দ্বীপে চলে গেলো। পরিত্যক্ত নাবিকগণ ফিরে এসে ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েই পকেটে হাত দেয়, নিজের সম্বল কত জেনে নিতে।

সেও তাই করলো। তার পকেটে একটী পেন্সিল, দেশলাইহীন এক প্যাকেট সস্তা দামের সিগারেট, ভাঁজকরা একখানা দৈনিক কাগজ, চারটি পাউণ্ড নোট এবং সামান্য খুচরা ভিন্ন আর কিছু ছিলো না। তার এ নিজস্ববোধ একান্তই নিজস্ববর্জ্জিত।

সে তার কোটটি খুলে নিলো। জামা ঝোলাবার টেপ ছিঁড়ে গেছে; তার পরিচিতির কোন চিহ্ন নেই, পুরাণো পোষাক বিক্রেতা হতে তার কোট কেনা।

রেল লাইনের স্লিপারে বসে সে আবার খবরের কাগজে চোখ বুলাতে লাগলো, মনের অভ্যন্তরে কোথাও এর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলো, কাগজটা পড়ে তার মনে হোলো এখন আগষ্ট মাস। পর্ত্তুগালে বিপ্লব হয়েছে, 'লারউড' শত্রুর হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি, একটী ব্যবসায়ীকে সাদা 'ডা-ক' কাপড়ের সুট পরতে দেখা গিয়েছে, কোন বৃটিশ কোম্পানী 'সিম্বেলিন' ফিলিম্ করার জন্য সালিসবাড়ী প্রান্তরে গিয়েছে, যুবকদের সুযোগ দেওয়া উচিত, আপন স্ত্রীকে খুন করার অপরাধে পুলিশ একজন একাউণ্টেটের সন্ধানে ফিরছে, সমুদ্রতীরে ছুটী উপলক্ষে অত্যন্ত ভীড়, একজন নবীন কেরাণীর জন্য তার প্রভু কিছু সম্পত্তি রেখে গেছে, স্কার্টের ছাঁট ছোট হয়েছে। সে যেন গোগ্রাসে এ সব খবর ও তার আনুষঙ্গিকগুলি লুফে নিলো। মনের নিভৃত কোণে এক বিশীর্ণ বিশ্বাস তাকে বারবার বলছিলো যে খবরের কাগজটী তার অত্যন্ত দরকারী। সিগারেট, পেন্সিল,

পাউণ্ড শিলিং ইত্যাদির ন্যায় তার অতীত জীবনের সাথে এ কাগজটীর যেন কোন একটা সম্বন্ধ আছে। বিক্ষিপ্ত চিন্তারাশির মধ্যেও এ সম্বন্ধ তার কাছে অনেকটা নিকট, অনেকটা অন্তরঙ্গ ও অর্থপূর্ণ। সে বুঝতে পেরেছিলো সাধারণ নিয়মের বাইরে অন্যান্য বিষয়ের চেয়ে কেন এটা তার স্মৃতির মধ্যে রয়ে গেছে।

সে কাগজের উপর বারবার চোখ বুলাতে লাগলো, মনটাকে একবারে খালি করে স্মৃতির জঞ্জাল ঝেড়ে ফেললো, যেন এরা তার আত্মবিস্মৃত 'আমি'কে আর উত্যক্ত করতে না পারে। সহজাত বুদ্ধির স্তিমিতলোকে নিজেকে নিয়ে গেলো, শুধু এ ভাবেই সে গোলকধাঁধার ভিতর দিয়ে স্মৃতির রাজ্যে পৌছতে পারবে এ তার ধারণা। বহুবার কাগজটী পড়লো, কিন্তু তার বিশ্বাস একটুও নষ্ট হোল্ না। এ পত্রিকার কোন খবরের সঙ্গে তার ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে এ প্রত্যয় ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট আকার নিল। অনুমান, আঁশা ও স্মৃতি যার সাহায্যেই হোক সে পত্রিকার মাঝখানে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করলো।

মাঝখানটা ছোট ছোট জীবন নাট্যে বিচিত্র ও বাঙ্ময়। সে ভাবলো এর ভিতর তার স্থান কোথায়? বহু লোকের মধ্যে কেউ মারা গিয়েছে কেউ বা জেল খাটছে, আর যারা আছে তাদের ভিতর কেউ তার বর্তমান অবস্থার সাথে ভাগ্য বদল করতে চাইবে না।

তার উপলব্ধির মধ্যে পত্রিকার এদুটী কোলাম সবচেয়ে বেশী জাগরূক। কারণ এদের আলো সম্পাতেই তার অতীত জীবন কিছুটা বোধগম্য। একটিতে আছে একজন চার্টার্ড একাউনটেন্ট তার স্ত্রীকে হত্যা করেছে, হত্যাটী পূর্ব হতে সব ঠিকঠাক করে করা হয়েছে। আততায়ী নিরুদ্দেশ। তাকে ধরার কোন খবরের জন্য পুলিশ পুরস্কার ঘোষণা করেছে। কোলামের শেষে আততায়ীর বর্ণনা ও সুস্পষ্ট ফটো আছে। সাধারণ যুবকের মুখ। হত্যাকারীর অল্প গোঁফ ছিল, বর্ণনায় আরো আছে যে তার মুখ পিঙ্গলা, বয়স ত্রিশ, দেহ ৫ ফিট ৯ ইঞ্চি। তার পরিধানে কি ছিল জানা নেই। উপরের ঠোঁটে হাত বুলিয়ে সে ভাবলো, গোঁফ না থাকলে আমিই হতে পারতুম অন্ততঃ পিঙ্গলে চুল থাকলে। এ অদ্ভুত চিন্তা মনে আসতেই সে চোখের কাছে আপন চুল টেনে দেখতে চেষ্টা করলো, কিন্তু চুল অত্যন্ত ছোট থাকায় তাও সম্ভব হোল না। একটী আয়না থাকলে হোত। তা কোথায় পাবে? সে তো ঠিক করে জানেও না এ দেখতে কিরূপ, তাছাড়া দ্বিতীয় কোলামের জন্যও একটী আয়না দরকার ছিল কারণ তাতেও ফটো ছিল। ফটোটী সেই যুবক কেরাণীর যে তার খেয়ালী মনিবের সম্পত্তি পেয়েছে। সে এখনও তার সৌভাগ্যের কথা শুনেছে বলে মনে হয় না, কারণ মনিবের মৃত্যুর পূর্বেই সে দেশ ভ্রমণে চলে গিয়েছে, তার বর্তমান ঠিকানাও কেউ জানে না, কোন দৈহিক বর্ণনা নেই। তার বয়স আটাশ এবং টেনিস খেলায় সে পটু। ফটোটা পুরাণো, মুখ কোমল, রুটীর ন্যায় নিরেট ও বিশেষত্ব বর্জ্জিত, চুল কালো, চিবুক শ্মশ্রুবর্জ্জিত।

এ দেখেই তার মন যেন নতুন সংচেতনায় স্পন্দিত হয়ে উঠলো, তার মাথা ভোঁ ভোঁ করতে লাগলো, এ যদি আমি হতুম তবে কি সৌভাগ্যই হোত।

কোন শিশু পার্শেল দেখে যেমন না বলে পারে না, 'এ কি আমার জন্য ?' তেমনি সেও সলজ্জ কম্পিতকণ্ঠে বল্লে ফেললো, শিশুর মতো তার কথাতেও কোন সঙ্কোচের লেশমাত্র ছিল না। সহজ-বুদ্ধি বলে আপনাকে সে চিনে নিলো, এ বৃত্তিই তার সম্বল।

দূরে গাড়ীর শব্দ মৃদু ও মধুর হাওয়ায় স্পন্দিত হোচ্ছিলো। লৌহবর্ত্মের স্পন্দনে তার মেরুদণ্ডের অন্তদেশ কেঁপে উঠলো। লোকটী হঠাৎ দাঁড়িয়ে তার মহামূল্যবান কাগজটী ভাঁজ করে পকেটে পুরলো। তারপরে অতি কষ্টে উঁচু বাঁধ হতে নামলো। অদূরে 'বীচ' বনানির নবীন শ্যামলিমা ছেড়ে রেলগাড়ী ভোঁস ভোঁস শব্দে অতিমাত্রায় আত্মপ্রাধান্য প্রচার করে চলছে। গাড়ী বঙ্কিম-ভঙ্গীতে তার দিকে আসতে দেখে সে খুব উৎফুল্ল হয়ে হাতপা ছুঁড়ে কুকুরের মত অসংলগ্ন ধ্বনিতে আনন্দ প্রকাশ করছিলো। জানালার ফাঁক দিয়ে কৌতুকচঞ্চল বিবর্ণ মুখগুলি তার নিকট মানুষের মতই মনে হোলো কিন্তু সবই যেন অভিনব, অদ্ভুত ও বিস্ময়কর। তার নিকট সারা দুনিয়ায় আজ কিছুই চিরাভ্যস্ত বলে মনে হয় না। আরোহীগণ শূন্য ক্ষণিক দৃষ্টিতে তার কিছুটা আঁচ করে নিলো, গাড়ী মুহূর্তে সর্পিল বাতাস-এর বুক চিরে দূরে চলে গেলো। সে তখন একা।

লোকটী আবার উঁচু বাঁধে উঠলো। যেদিকে খুসী যাওয়া যায় ভেবে ট্রেণের বরাবরই সে চললো।

শ্লিপারের উপর দিয়ে পা ফেলে চল্‌তে তার অত্যন্ত বিরক্তি ও কষ্টবোধ হচ্ছিল।

গতিভঙ্গী দেখেই মনে হয় আনন্দে ভরপুর হয়ে দিগন্তের মোহে সে চলছে। 'ক্লভারে'র গন্ধ, কাঠ-গোলাপ বীথি ও চোখ ঝলসানো জে ফুল, সবার মধ্যেই যেন বৈশাখ পল্লীশ্রীর উদ্‌ভ্রান্ত মাদকতা ছিলো। তার মাথা ঘুরতে সুরু করলো।

এ ঠিক আমার মনের মত যায়গা। আমাকে কিছুদিন এখানে থাকতে হবে, কিন্তু থাকাটা আইন সঙ্গত হবে কিনা সে ভাবতে বসলো।

এভাবে আরো এক মাইল গেলো। রেল লাইন ধরে 'ফার' বনের মধ্য দিয়ে সে চলেছে। বনানী ছায়াশীতল, গাছের উঁচু ডালে কপোত কলরব করছে। বনের স্তব্ধ মাধুর্য ভেদ করে একটা সবুজ রংয়ের কাঠঠোক্‌রা সৃষ্টিছাড়া শব্দ করে উড়ে গেলো। স্নিগ্ধ ছায়ায় লোকটী হাসি-মুখে চলতে লাগলো।

বনের অন্য দিকে একটী ছোট পুল।

ওখানে রেল লাইনের মধ্যে একটী গলি এসে মিশেছে।

আমি আর শ্লিপারের উপর হাঁটতে পারছি না। এখন গলি ধরে হাঁটলে হয় না ?

কিছুদূরেই বীচ ও চেস্‌নাট্‌ আপনাদের শ্যামল প্রাচুর্যে ধূসর গির্জার চৌফলা চূড়া আচ্ছাদন করে আছে।

গাছের ফাঁকে ফাঁকে বাড়ীর ছাদ দেখা যাচ্ছে। দেখে মনে হয় ছোট্ট গ্রাম, গলিটিও ওখানে পড়েছে। উঁচু রাস্তা ছেড়ে গলি ধরে গির্জার দিকে দ্রুত পদক্ষেপে সে চললো। তখনও তার নিকট সব কিছু বিচিত্র ও মধুময়। ছোট ছেলেপেলের মতো ধূলো উড়াতে উড়াতে সে চলেছে। জুতো ধূলোতে অদ্ভুত রকমে সাদা হয়ে গেছে। জুতোর মাথায় অনেক যায়গায় ভাঁজ পড়েছে। ভাঁজের ফাঁকে কালীর আঁচড় দেখে সত্যসত্যই তার খুব ভাল লাগছিল।

এখন তার মনে হোল সারা জীবনই সে সহরে কাটিয়েছে। এরূপ ধূলো বালি কখনই আর সে দেখে নাই। সে অসম্ভব উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। ষড়যন্ত্রলিপ্ত একজন পূর্বসহচরের সাথে দেখার আগ্রহ জন্মালো, এ অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কাহিনী অন্যের নিকট প্রকাশ করার ইচ্ছে হোল কিন্তু সব কিছুর চেয়ে তার বড় প্রয়োজন ছিলো, কেউ তার এ অবস্থান্তরের সম্বন্ধে দ্বিধাহীন হয়। নিজে অবশ্য সে নিঃসন্দেহ, খবরের কাগজটাই তার বাস্তব জগতের সঙ্গে একমত্রে যোগসূত্র। চিন্তার এ ছিন্নসূত্রগুলি তাকে ধীরে ধীরে বাস্তব ও আত্মমুখী করে তুললো। ইচ্ছার সাহায্যে সন্দেহ দূরীভূত করল। মানসিক নির্লিপ্ততার জন্য তার অনুমান ক্রমে ক্রমে বিশ্বাসে রূপান্তরিত হল। স্মৃতিবিলুপ্ত লোকটীর এখন দৃঢ়বিশ্বাস হন যে সে নিজেই ঐ নিরুদ্দেশ কেরাণী ও সম্পত্তির অধিকারী। সানন্দে সে অগ্রসর হতে লাগলো।

রাস্তার মোড়ে একটী পুলিশের সাথে তার দেখা। পুলিশটী সাইকেলের উপর ঝুঁকে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিলো। লোকটী তার কাছে এসে সন্ত্রস্ত ও সাগ্রহের হাসিতে গ্রামের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করলো।

ঈষৎ কৌতুহলের সহিত তার দিকে তাকিয়ে পুলিশ বলল "উইটেনডেন।"

ধন্যবাদ, আজ বড়ো গরম, লোকটী কথা বলার জন্য যেন আই ঢাই করছিলো।

পুলিশটী বিজ্ঞের মতো বললো, হ্যাঁ তাই। কর্তব্যের আহ্বানে সাধারণ অবস্থার উর্ধে উঠতে পারে এরূপ ভাব দেখিয়ে সে তার পাগড়ি মাথায় দিলো।

হঠাৎ তার অস্পষ্ট ধারণা হোল এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে পরস্পরের বিরুদ্ধভাব আরো প্রকাশ পেয়ে যাবে। সে তার জীর্ণ ফেল্ট হ্যাটটী খুলে কপালের ঘাম মুছলো। পুলিশম্যান তখন সবে ক্ষিপ্রতার সহিত সাইকেলে উঠছিলো। এরূপ ক্ষিপ্রতার অভ্যাস এখনো তার রয়ে গেছে, কারণ সুদূর পল্লীগ্রামে পিছন হতে অতর্কিত আক্রমণ করার রীতি বেশ প্রচলিত ছিলো।

মাথা হতে টুপি খুলে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো, ষ্টেজে সেক্স্পীয়ার নাটকে সৈন্যদলের মতো কতগুলি অস্পষ্টভাব তার রক্তিমাভ মুখের উপরে খেলে গেলো। তারপরই সে যেন একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলো। বিদায়ের সময় বক্‌বক্ করে পুলিশটী সাইকেলে উঠলো, এবং ভারিক্কি চালে দ্রুতগতিতে গলির ভিতর ঢুকে পড়ল। দুঃখের সহিত লোকটী তার টুপি মাথায় দিলো। এ নূতন জীবন তাকে আশ্রয়ের নিশ্চয়তা দেয়নি, বিক্ষিপ্ত অসন্তোষ এসে দ্বার প্রান্তে বার বার আঘাত দিচ্ছিলো।

ছোট ছেলে যেমন তার খেলার ঘড়ি বন্ধ হওয়ার প্রথম আশঙ্কা ও অনুভূতিকে আর বেশী দূরবিশ্লেষণ করে দেখে না, সেও অনেকটা তাই করলো, সে অনুভব করলো পূর্বের উচ্ছ্বাসপ্রাবল্য তার অজ্ঞাতসারে চলে গেছে।

ধূলিপূর্ণ রাস্তায় যেতে যেতে ভাবলো পুলিশটী তার দিকে এমনভাবে তাকিয়েছিলো কেন ?

গ্রামে পৌঁছে তার বেশ ভাল লাগলো। পৃথিবীর কোলে সূর্য্য তখন ঢলে পড়েছে। গলির পরিত্যক্ত স্নিগ্ধতায় ছায়া জমে উঠেছে, তখনও দিনের উত্তাপ কমেনি। দাঁড়কাকগুলি তার-স্বরে যেন কোন অদৃশ্য সত্তায় নিমজ্জিত হয়ে গির্জার চূড়ার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। স্তম্ভিত মৌনতা ছেড়ে কোন প্রতিধ্বনিও যেন যেতে চায় না।

কথা বলা, পা ফেলা, কূয়া হতে জল তোলার ক্ষীণ অস্ফুট শব্দ অলসমন্থর গতিতে ভেসে এসে বিলম্বে শ্রুতিগোচর হচ্ছিলো। লোকটী আপন মনে হাসলো। 'আমি এখানেই থেকে যাবো।' সে ক্ষুধা ও পিপাসায় অত্যন্ত কাতর। নিকটে একটা পান্থশালা দেখে সে দিকে চললো।

খোলা রাস্তা হতে আলু ছিটকে পড়ার শব্দের মত মদ্যবিক্রয়কোঠার হৈ চৈ পূর্ণ উত্তেজনা খোলা দ্বরজা দিয়ে বেরিয়ে আস্‌ছিল।

লোকটী মুহূর্ত্তের জন্য বাইরে দাঁড়ালো, সে লজ্জায় ম্রিয়মান, একটু পরেই অনিচ্ছা দূর করে ভিতরে প্রবেশ করলো।

তাকে দেখেই হঠাৎ কথাবার্তা থেমে গেলো। মদ্যবিক্রয়ের স্থানে উপবিষ্ট স্থূল লোকটী শুধু কথা বলছিলো কারণ ভিতরে নূতন লোক ঢুকেছে সে দেখেনি।

দৃঢ় সনির্বন্ধতার সহিত লোকটী বললো এটুকু ক্ষৌরি করতে তার কি অসুবিধা ছিলো। আমি তো আগাগোড়া একথার উপরই...

এ বলা শেষ হওয়ার পূর্বেই পাশে দাঁড়ান লোকটী তার হাতে চাপ দিলো। মোটা লোকটী আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য হয়ে আবার পরিত্রাণে পড়ে বিয়ার খেতে লাগলো।

আত্মবিস্মৃত লোকটী একটু লজ্জিত হোল এবং সাথেসাথেই তার অস্বস্তিবোধ জেগে উঠলো। লোকগুলি হঠাৎ চুপ করে গেলো। এ আকস্মিক নীরবতার অর্থ সে সম্পূর্ণ না বুঝিলেও তার একটা আশঙ্কা হচ্ছিল। সে অতলে আত্মহারা। যথাসম্ভব নির্লিপ্ততার সহিত সে মদবিক্রয়ের স্থানে গেলো। যাওয়ার সময় আড়চোখে দেখে নিলো তার পুলিশবন্ধু বোর্ডের নিকট কতগুলি লোক নিয়ে জটলা করছে।

একটু অস্বাভাবিক স্বরে বললো 'বিয়ার চাই'। চোখ না তুলেই বিক্রেতা জিজ্ঞাসা করলো— 'এক পাইন্ট না বেশী ?' কারণ সে পুলিশের দিকে তাকিয়ে ছিলো। বিয়ারের বোতল আনতে মদওয়ালা ভিতরে গেলো। আত্মবিস্মৃত লোকটী টুপি খুলে 'বার'এ হাত রেখে কাঁধ একটু সঙ্কুচিত করলো ও খুব মনোযোগের ভান করে হাতের নখগুলি দেখতে লাগলো।

সে তখন আত্মরক্ষায় ব্যস্ত।

বিনা দোষে শাস্তি পাওয়ার পূর্বে ছোট ছেলেপিলের মতো সে ধীরে ধীরে অতর্কিত আ[illegible]য় অভিভূত হয়ে পড়লো, সময় চলছে কিন্তু তাকিয়ে দেখার মত তার সাহস ছিলোনা। তা[illegible] হোল কে যেন তার চারিদিক ঘিরে ফেলেছে। কোঠাটী পূর্বের চেয়ে অন্ধকার হো[illegible] বোধহয় কে যেন দরজা টেনে দিয়েছে। মেঝের বোর্ডে শব্দ হোল।

মদওয়ালাকে পানপাত্র হাতে ইতস্ততঃ করে ঘরে ঢুকতে দেখলো। তার দৃষ্টি আগন্তুকের পিছনে কিসের দিকে নিবদ্ধ ছিলো।

তার উপর যেন কার দণ্ড উদ্যত। ধীরে ধীরে তার চোখ বুজে গেলো। মনে হোল কে যেন তার হাত ধরে ফেলেছে।

আঃ! আঃ! স্মৃতিবিহ্বল লোকটী চীৎকার করে উঠলো। চোখ খুলতেই পেছনের আয়নায় এক মুখ দেখলো।

ছোট পিঙ্গল চুলে ঢাকা চূণের মত সাদা 'সেই মুখ'।

Peter Fleming লিখিত 'The Face' গল্প হতে।

রুমানিয়ায় যুব আন্দোলন

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

জাতীয় জীবন গঠনের পক্ষে যুব আন্দোলন একান্ত আবশ্যক। গত মহাযুদ্ধের পর রুমানিয়ায় যুব আন্দোলন যে জাতীয় জীবন গঠনে কতখানি সাহায্য করিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। রুমানিয়ার যুব আন্দোলনকে বলা হয় "ষ্ট্র্যাজা ট্যারাই" অর্থাৎ "দেশের অভিভাবক"। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে রুমানিয়ার রাজা ক্যারল এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য তিনি যখন যুবরাজ ছিলেন, তখনই এইরূপ একটি আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে তিনি সচেষ্ট হন। পনর বৎসর বয়সে তিনি যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, আজ তাহা বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। দেশে যত সব যুব প্রতিষ্ঠান ছিল 'ষ্ট্র্যাজা ট্যারাই' সে গুলিকে সব এক সূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে।

এই আন্দোলনের ভিত্তি গণ-তান্ত্রিক। আন্দোলনের উদ্দেশ্য হইল রুমানিয়ার বালক-বালিকাদিগকে আন্তর্জ্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা। সেবার আদর্শটিকেও তাহাদের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হয়। এই সব আদর্শ থাকায় আন্দোলনের মধ্যে উৎকট জাতীয়তার ভাব প্রবেশ করে নাই। আন্দোলন বেশ শান্তিপূর্ণ। ইউরোপের অন্যান্য দেশের যুব আন্দোলনের সহিত রুমানিয়ার যুব আন্দোলনের এইখানেই পার্থক্য। অন্যান্য দেশের যুবকগণকে যেমন কেবল স্বদেশ প্রীতিই চরম বস্তু বলিয়া শিখান হয় এবং ছোট বেলা হইতেই যুবকগণকেকেমন একটা 'মারমুখো' করিয়া তোলা হয়—রুমানিয়ায় তেমন করা হয়না। জাতীয়তার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে আন্তর্জ্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধও শিক্ষা দেওয়া হয়।

জাতীয় পতাকা হস্তে 'ষ্ট্র্যাজা'র বালক

গ্রীষ্মাবকাশের সময় রুমানিয়ার নানাস্থানে ষ্ট্র্যাজা ট্যারাই' শিবির স্থাপিত হয়। এই সকল শিবির ফেলিবার জন্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্থানগুলি বাছিয়া লওয়া হয়। বালকগণ নিজেরাই শিবির স্থাপন করে। প্রতি শিবির সাত হইতে সতর বৎসরের বালকে ভর্ত্তি থাকে। শিবিরে সকলেরই কঠোর শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতে হয়, কিন্তু তাহাকে কেহ বন্ধন বলিয়া মনে করে না।

বালকদের মধ্যে থাকে সর্ব্বদাই একটা স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দের ভাব। কাজের আনন্দের মধ্যে তাহারা ডুবিয়া যায়। শৃঙ্খলা থাকিলেও শিবিরে বিধিনিষেধের বেড়াজাল নাই। বালকগণ সেখানে স্বাধীন জীবনের সত্ত্বা পুরামাত্রায়ই উপলব্ধি করিতে পারে। আন্দোলন প্রতিষ্ঠার সময় রাজা ক্যারল যে সকল নিয়মকানুন করিয়া দিয়াছিলেন, সেই একই নিয়মানুসারে সর্ব্বত্র শিবিরগুলি পরিচালিত হয়। কাজে যোগ দিবার পূর্ব্বে প্রত্যহ প্রাতঃকালে শিবিরগুলিতে একটা বিশেষ অনুষ্ঠান হয়। শিবিরের কেন্দ্রস্থলে নায়কের চারিপার্শ্বে আসিয়া বালকগণ সবেবত হইয়া দাঁড়ায় এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। তারপর ভগবানের নামে প্রার্থনা হয়। ইহারপর বালকগণ 'স্ট্রাজার সঙ্গীত' অর্থাৎ তাহাদের দলের নিজস্ব গান গায়। এই সঙ্গীতে তাহাদের দলের প্রধান নায়ক রাজা ক্যারল এবং জাতীয় পতাকার বন্দনা আছে। এই সঙ্গীতের ভাবার্থ তাহাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিতে হয়; তাহারা জানে উক্ত পতাকা তাহাদের জাতীয়তার প্রতীক। পতাকার পীতাংশ দেশের শস্য সম্পদের পরিচায়ক, নীলাংশ হইল রুমানিয়ার নীল নভোমণ্ডল—আর রক্তাংশ হইল শোণিতের প্রতীক—যে শোণিত তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ রুমানিয়ার স্বাধীনতার জন্য বিসর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

প্রাতঃকালীন এই অনুষ্ঠানের পর বালকগণ তাহাদের প্রাতরাশ সারিয়া যে যাহার কাজে যোগদান করে। প্রত্যেক শিবিরেই ব্যায়াম চর্চ্চা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকে। এতদ্ব্যতীত তাহাদিগকে অন্যান্য কায়িক পরিশ্রমও করিতে হয়। ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ, মাটি কাটা প্রভৃতি কাজগুলি তাহারা অতি উৎসাহের সহিত করিয়া থাকে। দিবাশেষে জাতীয় নৃত্য ও সঙ্গীতের মধ্যে তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্যতালিকা শেষ হয়। কাজ যাহাতে একঘেয়ে না হয় তজ্জন্য এক একদিন এক এক রকম কাজের ব্যবস্থা থাকে। কাজের একঘেয়েমি ভাঙ্গিবার জন্য দেশের ইতিহাস ও কৃষক জীবনের আচার পদ্ধতি সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। বক্তৃতা হইয়া গেলে বালকগণ সে সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিতে পারে। স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বালকগণ যে কাজ করিতে চাহে সাধারণতঃ তাহাদিগকে সেই কাজই করিতে দেওয়া হয়, পারতপক্ষে জোর করিয়াতাহাদের উপর কিছু চাপান হয় না।

'স্ট্রাজা'র বালকগণ জাতীয় সঙ্গীত গাহিতেছে

এই যুব আন্দোলনের একটি বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় হইল এই যে, দেহ গঠনের দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া সত্ত্বেও জ্ঞানবুদ্ধি বিকাশের দিকটা উপেক্ষিত হয় না। বালকদিগকে

৭

সভাসমিতি করিয়া নিজেদের মধ্যে আলোচনার সুযোগ দেওয়া হয়। তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে স্ব স্ব মত প্রকাশ করিতে পারে। অপর দিকে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়া তাহাদিগকে স্বদেশের শিল্পকলা ও সংস্কৃতির সহিত পরিচিত করা হয়। তাহাদের নৈতিক জীবন সুদৃঢ় করিয়া তুলিবার জন্যও নানাভাবে চেষ্টা হইয়া থকে।

কাজকর্ম্ম, খেলাধূলা ও নানাপ্রকার আনন্দের মধ্য দিয়া সারাদিন কাটিবার পর শিবিরে আবার আর একটি অনুষ্ঠান হয়। সকলে পুনরায় একত্রিত হইয়া জাতীয় পতাকা নামায়। তারপর ভগবানের নামে প্রার্থনা হয়। প্রার্থনান্তে সকলে রুমানিয়ার জাতীয় সঙ্গীত গায় এবং অবশেষে 'ষ্ট্র্যাজার' কায়দায় 'স্যানাতাতে' বলিয়া অভিবাদন করে। 'স্যানাতাতে' অর্থ হইল ভাল থাক। এই দলের একজনের সহিত আর একজনের সাক্ষাৎ হইলে তাহারা এই বলিয়া প্রীতিসম্ভাষণ জানায়।

এই যুব আন্দোলন সৃষ্টি করিয়া রাজা ক্যারল ইতিমধ্যেই দেশে এক নূতন আবহাওয়া আনিয়া দিয়াছেন। গত মহাযুদ্ধশেষে রুমানিয়ার আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ট্রানসিল্‌ভানিয়া, বাকোভিনা এবং বেসারাবিয়া—এই তিনটি নূতন প্রদেশ তাহার সহিত যুক্ত হয়। এই তিনটি প্রদেশে নানান জাতীয় লোকের বাস, তাহাদের সমস্যাও বহুবিধ। কি করিয়া ইহাদিগকে এক জাতীয় সূত্রে আবদ্ধ করা যায়, তাহা লইয়া রুমানিয়ার অধিপতি ও তথাকার সরকার মহা চিন্তায় পড়িলেন। রাজা ক্যারল বুঝিতে পারিলেন যে, জাতীয় ঐক্য স্থাপন করিতে হইলে এমন একটি ব্যাপক যুব আন্দোলন গড়িয়া তোলা দরকার—যাহাতে সকলেরই সাড়া মিলিবে। এই জাতীয় ঐক্যের উদ্দেশ্য লইয়াই রুমানিয়ার যুব আন্দোলন 'ষ্ট্র্যাজা ট্যারাই' এর সৃষ্টি। রাজা ক্যারলের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নাই। রুমানিয়ার জাতীয় জীবন গঠনে এই আন্দোলন অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে।

রুমানিয়ায় যুব আন্দোলন প্রতিষ্ঠাকালে রাজা ক্যারল একটি বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন : "আমরা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি যে, এই জাতিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে হইলে এমন একটা আন্দোলন প্রয়োজন যাহার শক্তি রাষ্ট্রের মূলদেশ পর্য্যন্ত যাইয়া উহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবে। সেই উদ্দেশ্যেই আমরা "ষ্ট্র্যাজা ট্যারাই" আন্দোলনের প্রতিষ্ঠা করিলাম।.............. রুমানিয়ার অধিবাসীরা বহুগুণের অধিকারী, তাহাদের মধ্যে অনেক কিছুর সম্ভাবনা রহিয়াছে, কিন্তু অনুশীলনের অভাবে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির মত তাহাদের সকল গুণ চাপা পড়িয়া আছে, একমাত্র দুর্ব্বার যুবশক্তিই সেগুলিকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারে, সেগুলিকে আবার স্বদেশের কল্যাণে নিয়োগ করিতে পারে। আমি তোমাদিগকে উপদেশ দিতে আসি নাই। আমি শুধু একথাই বলিতে আসিয়াছি যে, তোমাদের মধ্যে আমি আমার নিজেকেই প্রত্যক্ষ করিতেছি।"

রাজা ক্যারলের পৃষ্ঠপোষকতায় ও ঐকান্তিক চেষ্টায় অতি অল্পদিনের মধ্যে রুমানিয়ায় যুব আন্দোলন আশাতীতরূপে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। বর্ত্তমানে দশলক্ষেরও অধিক বালকবালিকা এই দলের সদস্য। দলের সদস্য হওয়া বাধ্যতামূলক নয়; তবে এই আন্দোলনের প্রতি বালক-বালিকারা যাহাতে অধিকতর আকৃষ্ট হয় তজ্জন্য সরকার সর্ব্বদাই নানাভাবে উৎসাহ দিয়া থাকেন।

রাজা ক্যারল একজন শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি। শিক্ষার যাহাতে সুব্যবস্থা হয় তৎপ্রতি তাঁহার সর্ব্বাদাই প্রখর দৃষ্টি রহিয়াছে। "ষ্ট্রাজা ট্যারাই" আন্দোলনের মধ্যে থাকিয়া বালকবালিকাদের প্রথম জীবনে যে কতগুলি শিক্ষালাভ হয় সেগুলিকে তিনি মহামূল্যবান মনে করেন। এই জন্য তিনি আপন পুত্র মাইকেলের জন্যও ঠিক ঐ ধরণের শিক্ষারই ব্যবস্থা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত যাহাতে গণতান্ত্রিক আদর্শ রক্ষা পায় তজ্জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তর হইতে বাছিয়া একদল বালককে তিনি যুবরাজের সঙ্গী করিয়া দিয়াছেন। তাহাদের সঙ্গে থাকিয়া যুবরাজ 'ষ্ট্রাজার' কায়দায় শিক্ষালাভ করিতেছেন। এইভাবে তিনি কৃষক, আইনজীবী, চিকিৎসক, সরকারী কর্ম্মচারী প্রভৃতি সমাজের বিভিন্ন ঘরের ছেলেদের সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিবার সুযোগ পাইতেছেন। সমাজের বিভিন্নস্তরেব লোকের সহিত এইরূপ মেলামেশার সৌভাগ্য রাজ-পরিবারের অতি কম ছেলের ভাগ্যেই ঘটে।

"ষ্ট্রাজা ট্যারাই" প্রতিষ্ঠানটিকে অতি সুচারু রূপে সংগঠিত করা হইয়াছে। এই আন্দোলনের উপযোগী করিয়া সমগ্র দেশকে কতকগুলি জেলায় বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রতি জেলার জন্য এক জন করিয়া নায়ক আছেন। কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ে এই সকল নায়ক নিযুক্ত করিয়া থাকে। ট্রেণিং প্রাপ্ত হইলেই যে কেহ এই নায়ক হইতে পারেন। জেলা-নায়কদের অধীনে যে দল থাকে তাহাকে বলা হয় 'লিজিয়ন'। 'লিজিয়ন' এর অধীনে থাকে কতকগুলি "কোহর্ট"। এক একটি বিশেষ স্থানের বালক অথবা বালিকা লইয়া এক একটি 'কোহর্ট' গঠিত হয়। কোহর্ট' এর অধীনে থাকে আবার কতকগুলি 'সেঞ্চুরী'। বালক বালিকারা যাহাতে কারবারে ও

'ষ্ট্রাজা'র বালকগণ শিবিরে বিউগল্ বাজাইতেছে

কারখানায় কাজ করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে পারে তদুদ্দেশ্যে 'ষ্ট্রাজা ট্যারাই' দলের একটি

বিশেষ বিভাগ খোলা হইয়াছে। স্কুলের পড়া যাহাদের শেষ হইয়াছে তাহারা ও এই বিভাগের মারফত কারবার ও কারখানায় কাজ শিখিবার সুযোগ পায়।

বয়স যাহাদের খুবই কম তাহাদের জন্য একটু স্বতন্ত্র রকমের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। শিশুদলগুলিকে বলা হয় 'নেষ্ট'। 'নেষ্ট' এর অন্তর্ভুক্ত বালকবালিকাদিগকে অতি সুনিপুণভাবে আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলা হয় সৌহার্দ্দ্য, অধ্যবসায়, ধৈর্য্য, দলের প্রতি আনুগত্য, নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণগুলি উহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হয়। 'ষ্ট্রাজা' দলের পূর্ণাঙ্গ সদস্য হইতে হইলে এই গুণগুলি থাকা একান্ত আবশ্যক।

আন্দোলনের নায়ক সৃষ্টির জন্য রাজা ক্যারল রুমানিয়ার তিনস্থানে তিনটী ট্রেণিং কেন্দ্র খুলিয়াছেন। দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে নরনারী আসিয়া উক্ত তিন কেন্দ্রে শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। ট্রেণিং পাইয়া যাহারা 'ষ্ট্রাজা' আন্দোলনের নায়কত্ব গ্রহণ করেন তাহাদিগকে কোনরূপ বেতন দেওয়া হয় না। সাধারণতঃ ছুটির সময়ই তাহাদিগকে কাজ করিতে হয়। তাহাতে জীবিকা অর্জ্জনে কাহারও অসুবিধা হয় না। বিশ দিনে ট্রেণিং পড়া শেষ হয়। ট্রেণিংএর সময় শারীরিকচর্চ্চা, সমাজ সেবা এবং উৎসবানুষ্ঠানের রীতিনীতি শিখিতে হয়। উৎসবানুষ্ঠানের রীতি-নীতি না শিখিয়া উপায় নাই, কারণ উহা হইল 'ষ্ট্রাজা' আন্দোলনের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। নারী-পুরুষের একসঙ্গে শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। এইকারণে পুরুষদের জন্য দুইটী এবং নারীদের জন্য একটি শিক্ষা কেন্দ্র রাখা হইয়াছে। এই তিন শিক্ষাকেন্দ্রেই রুমানিয়ার ইতিহাস, রুমানিয়ার নানাবিধ পল্লীগাথা এবং পল্লীশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। এই আন্দোলনের ফলে রুমানিয়ায় কুটীরশিল্পের বিশেষ আদর হইয়াছে ; কৃষকদের মধ্যে শিল্প প্রচেষ্টা বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রাচীন কুটিরশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে 'ষ্ট্রাজা' দলের উদ্যোগে দেশের নানাস্থানে কুটীরশিল্পের প্রদর্শনী হইয়া থাকে। এই আন্দোলনের ফলে জাতীয় নৃত্য এবং জাতীয় পরিচ্ছদের প্রতিও রুমানিয়াবাসীদের আগ্রহ বাড়িয়াছে।

যুব আন্দোলনের নীতি ও লক্ষ্য বর্ণনাকালে রাজা ক্যারল বলিয়াছিলেন যে, কৃষিজীবিদের সাহায্য করাই হইবে দলের প্রধান লক্ষ্য। রুমানিয়ায় কৃষিজীবির সংখ্যাই বেশী। দুই কোটী অধিবাসীর মধ্যে প্রায় এককোটি চল্লিশ লক্ষই হইল কৃষক। ইহাদের শিক্ষা অতি কম এবং ইহারা সেই সাবেক ধরণে জীবন যাপন করে। কাজেই 'ষ্ট্রাজা' দলের নায়কদিগকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যাহাতে তাহারা পল্লীর জীবনযাত্রা প্রণালীর উন্নতি বিধান করিতে পারে। প্রতিটী শিক্ষাকেন্দ্রের অধীনে দশটি করিয়া গ্রাম আছে। প্রত্যেক গ্রামে পল্লীবাসীদের স্বাস্থ্য, বাসস্থান এবং চাষবাসের উন্নতিবিধানের চেষ্টা চলিয়াছে। অধিনায়কদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী ষ্ট্রাজারগণ বাড়ী নির্ম্মান, খাল খনন, রাস্তা মেরামত এবং চাষের জন্য সেচকার্য্যাদি করিয়া থাকে।

এই সকল বিষয়ে অধিনায়কদিগকে শিক্ষা লইতে হয়, কাজেই বালকদিগকেও তাহারা হাতে কলমে কাজ দেখাইয়া দিতে পারে। এই আন্দোলন আরম্ভ হইবার পর রুমানিয়ায় যুবকগণ কর্ত্তৃক বহু নূতন গীর্জ্জা এবং সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারোপযোগী, বিস্তর বাড়ীঘর নির্ম্মিত হইয়াছে। যুবকগণ বহু খেলার মাঠ ও প্রস্তুত করিয়াছে।

এই ভাবে যুব আন্দোলনের ফলে রুমানিয়ায় পল্লীজীবন ও সহরজীবনের মধ্যে একটা অঙ্গাঙ্গী ভাব স্থাপিত হইয়াছে। একের অপরকে চিনিবার ও বুঝিবার সুযোগ হইয়াছে এবং গণতান্ত্রিকতার ভাব অনেকখানি প্রসার লাভ করিয়াছে। সহরবাসীরা বুঝিতে পারে পল্লী-জীবনের সমস্যা কি এবং পল্লীবাসীরা বুঝিতে পারে নূতন জীবনের উৎস কোথায়।

বয়স্কাউট আন্দোলনের সহিত 'ষ্ট্রাজা' আন্দোলনের অনেক জায়গায় মিল আছে সত্য, কিন্তু পার্থক্যও যথেষ্টই আছে। নীতির দিকদিয়া এই আন্দোলন সম্পূর্ণই স্বেচ্ছামূলক, কোন বাধ্য বাধকতা নাই। কিন্তু তাহার মধ্যেও একটু বৈশিষ্ট্য আছে। রাজা ক্যারলের মতে রুমানিয়ার সকল বালকবালিকাকেই "ষ্ট্রাজা ট্যারাই" এর দলভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়। একমাত্র কেহ যদি আপত্তি জানায় তবেই সে বাদ পড়ে। অবশ্য কেহ 'ষ্ট্রাজা ট্যারাই' এর অন্তর্ভুক্ত হইতে না চাহিলে তাহার প্রতি যে কোনরূপ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়, এমন নয়। রুমানিয়ার মত একটি অনগ্রসর দেশে এইরূপ একটু স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না করিলে আন্দোলন হয়ত গোড়ার দিকেই মরিয়া যাইত। জাতীয়তার যূপকাষ্ঠে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধকে বলি দেওয়া হয় নাই। রুমানিয়ার যুব আন্দোলনের ইহাই হইল বৈশিষ্ট্য।

'ষ্ট্রাজা ট্যারাই'এর যুবকগণ রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে যাইতেছে

'ষ্ট্রাজা' আন্দোলনের বালক বিভাগে সাত হইতে সতর বৎসর এবং বালিকাবিভাগে সাত হইতে একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সভ্য হওয়া চলে। সতর বৎসর উত্তীর্ণ হইলেই বালকদিগকে সামরিক বিভাগে প্রবেশের জন্য নূতন শিক্ষা লইতে হয় এবং একুশ বৎসরে তাহাদিগকে জাতীয় সামরিক বিভাগে যোগ দিতে হয়। জাতীয় সামরিক বিভাগে যাহাতে বেশীদিন না থাকিতে হয় তজ্জন্যই সতর বৎসর হইতে একুশ বৎসর পর্য্যন্ত একটু স্বতন্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কাজেই সতর বৎসর পরে হইলে কাহারও আর 'ষ্ট্রাজা' দলে থাকিবার উপায় নাই।

এই যুব আন্দোলনের ফলে রুমানিয়ায় এক নবজীবনের সূত্রপাত হইয়াছে। শতধা বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক অখণ্ড জাতিতে গড়িয়া তুলিতে হইলে, তাহাতে নবজীবন সঞ্চার করিতে হইলে, জাতীয় ভিত্তিতে এইরূপ একটি ব্যাপক যুব আন্দোলন আজ একান্ত আবশ্যক। জাতীয়তার, নামগন্ধহীন বিদেশীর সৃষ্ট বয়-স্কাউট আন্দোলন এদেশের প্রাণে কোনরূপ সাড়া জাগাইতে পারে নাই, কাজেই কার্য্যতঃ তাহার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। একমাত্র দেখা যায়, বাঙ্গালাদেশে গুরুসদয় দত্ত মহাশয় যে ব্রতচারী আন্দোলন প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার সহিত রুমানিয়ার 'স্ট্রাজা' আন্দোলনের অনেকখানি সাদৃশ্য আছে, কিন্তু জাতীয় মন্ত্রে প্রাণ প্রতিষ্ঠা না হইলে উহার সর্ব্বভারতীয় আন্দোলনে পরিণত হইবার সম্ভাবনা অতি কম।

ফলওয়ালা

রমেন বিশ্বাস

চারতলার একটা ঘরে থাক্‌ত সে। যৌবনের উৎস তা'র দেহের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তা'ও যেন জীবন-সংগ্রামের প্রবল ধাক্কায় মুস্‌ড়ে পড়তে চায়। বয়েস তা'র সাতাশ কি আটাশ।

ভোর হলে সে বেরিয়ে পড়ে মাথায় এক ডালা ফল নিয়ে। পরণে থাকে মলিন বেশ। আজও সে বেরিয়েছিল সকাল বেলায়। পূব আকাশের রঙিন সূর্য্য তা'র চিন্তাযুক্ত মুখের 'পরে যেন শান্তির প্রলেপ ঢেলে দিতে চায়। সে রাস্তা বেয়ে বেয়ে হাঁটতে থাকে ফেরি করে। সে যে ফলওয়ালা। 'ফল চাই' 'ফল চাই' এমনি করে তা'র কত দিন যে কেটেছে। জীবনে সুখ নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই, যেন কিসের বোঝা অহরহ তার ঘাড়ের 'পরে চেপে রয়েছে। আশা আকাঙ্খা যা ছিল তা'র সব তলিয়ে গেছে। এখন এক বৈচিত্র্যহীন জীবন। না আছে আনন্দ, না আছে দুঃখ। শুধু অকারণে ভেসে যাওয়াই যেন চরম লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তা'র।

একদিন ছিল যখন রূপসী ষোড়শী তন্বীর দর্শনে তা'র দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরায় এক মধুর প্রবাহ বয়ে যেত। দেহের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত অপরূপ রোমাঞ্চে তরঙ্গায়িত হ'ত। কত মেয়েকেই না সে পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে ফলের দাম কম নিয়ে। তখন তা'র দেহখানা ছিল কত টাট্‌কা আর ভবিষ্যতটা ছিল কিরকমই না রঙ্গিন! আর এখন তা'র হাসি পায় সে সব কথা ভেবে। কি বোকামিটাই না করেছে সে জীবনে।

সাথীহারা যদিও সে। তা'তে তা'র দুঃখইবা কিসের? দায়িত্ব নেই, বন্ধন নেই, আর অভাবটাই বা এমন তার কি? শুধুত একটি মাত্র মানুষ।

চল্‌তে চল্‌তে হয়ত এক রাস্তার মোড়ে গিয়ে সে বসে। সামনে থাকে তা'র ফলের ডালা। মাঝে মাঝে বিক্রি যে না হয় তা' নয়। তবে দর দস্তুরের লাগামটা আগে যেমন শক্ত ছিল এখন যেন ইচ্ছে করেই কতকটা সে ঢিলে করে দিয়েছে। এখন তার মন ছুটেছে অন্যদিকে। শরতের শাদা মেঘের মত ভাস্‌তে ভাস্‌তে কোন সুদূরে গিয়ে সে যেন মিলিয়ে যেতে চায়।

আবার ফেরে সন্ধ্যায় ক্লান্ত অবসন্ন দেহে। তারপরে তার ঘরের দরজা হয় বন্ধ। বাইরে থেকে শোনা যায় শুধু ষ্টোভ জ্বালানর শব্দ। দরজার ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসা এক ফালি আলো ও নজরে পড়ে।

পাশের ঘরে থাক্‌ত এক বুড়া আর তা'র বাড়ন্ত মেয়ে। মেয়েটির কিন্তু কৌতূহল জাগে। ফলওয়ালার চাল চলন যেন তা'র কাছে কেমন অভিনব বলে মনে হয়। যেন কেমন সন্দেহ হয়। হয়ত বা সে— — —। আহা, না জানি বা কোন অসহ্য দুঃখে আজ এমনতর নিকৃষ্ট কাজকেও সে তার জীবনের অবলম্বন করে নিতে বাধ্য হয়েছে।

মেয়েটির সহানুভূতি জাগে। অন্ধকারে দরজার সামনে সে দাঁড়িয়ে থাকে আর তা'র অনুভূতির ইন্দ্রিয় দিয়ে ভাব্‌তে চেষ্টা করে ঐ লোকটার সমস্তখানিকে।

আবার ভোর হয়। আবার সে ফলের ডালা মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। একটা উদাস সুর অন্তরের গভীরতম তন্ত্রীতে গিয়ে ঝঙ্কার দিতে থাকে।

অনন্ত বিশ্বে রয়েছে অখণ্ড, অনাদ্যন্ত প্রাণধারার নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। তারই এক অংশ নিয়ে হয়েছি 'আমি', আর আমার সসীম জগৎ। এই 'আমি' ও আমার জগৎকে সসীমে স্থায়ী করার জন্যই না আমাদের এত প্রয়াস? এত সংগ্রাম? সেই জন্যই না আমি রাস্তায় রাস্তায় ফল ফেরি করে ঘুরে বেড়াই, ফল কেনা বেচা? মুটে যে এত হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করছে এও ত সেই জন্যই। ঐ যে মুচী তারও প্রচেষ্টাত ঐ একই কারণে। আর একেই বলি আমরা প্রাণ ধারণ। সীমানার গণ্ডী ছাড়িয়ে যখন চলে যাই, তখন বলি মৃত্যু।

এক সময় ছিল যখন সে তার নিজেকে ভবিষ্যতের সুখ কল্পনায় রাখত ডুবিয়ে। গ্রামের ভিটায় উঠ্‌বে প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ। ফলে ফুলে থাকবে বাগান ভরা। প্রকাণ্ড দীঘি, তাতে থাকবে মাছ। গোয়ালে থাক্‌বে গাই। নিরানন্দের ছাঁপ কোথাও রবেনা। শুধু ফোয়ারা বইবে আনন্দের। এখন এসব কতো ফাঁকা, কতো ভূয়ো বলে মনে হয়। মায়ের আজীবন দুঃখ কষ্টের কথা মনে পড়্‌লেই তা'র চোখের কোণ দিয়ে গড়াত জল। এখন এদিকের কোন সাড়া নেই। একেবারে নিরুদ্বেগ নিশ্চল সুখ কি, দুঃখ কি, আশা আকাঙ্খাই বা কি?—সব মায়া আর কুহেলিকা। এরাই করেছে আমদানী অসীমের রাজ্য থেকে ধরে এসকল শৃঙ্খলিত বন্দী। এরাই যুক্ত করে দিয়েছে তা'দের এ জীবন সংগ্রামের একটানা গতিতে।

হায় রে হায়! মানুষ এত বুদ্ধিহীন? মুক্তির চাবি যার রয়েছে সাথে সে কেন ভেবে মরে? মরণে যদি মুক্তি, তা' নিয়ে কেন এতো শোক? মরণ এসে দেবে আমায় অভিন্নতা, নিয়ে যাবে দ্বন্দহীন অসীমের মাঝে, যেখানে প্রকৃতির প্রাণে প্রাণে, প্রাণীর প্রাণে প্রাণে হয়ে আছে ভোর, যেখানে প্রাধান্য যায় শুকিয়ে।

শেষ পর্য্যন্ত সহরের প্রান্ত ছাড়িয়ে গ্রামের ধারের এক প্রকাণ্ড নদীর পারে সে এসে থাম্‌ল। ধান ক্ষেতের ধান কাটা হয়ে গেছে, এখন শুধু শুষ্ক মাঠ রয়েছে পড়ে। তারই এক জায়গায় ফলের ডালা নামিয়ে সে বসে পড়্‌ল। রাত হয়ে গেছে অনেক। জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ ধারায় সকল দিক ছেয়ে গেছে। নদীর দুই দিকটা যেন কুয়াশার মাঝে লুপ্তি পেয়েছে। ওপারের ঘর বাড়ী গাছ পালা সব মৌন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওপারের দেশটা যেন মনে হয় স্বপ্নপুরীর, এপারের দেশ যেন যক্ষরাজের। ওপারের দেশে বুঝি আছে তৃপ্তি। এপারের দেশে আছে ক্ষুধার জ্বালা। ওপারের দেশ—ভাবুক, কবি। এপারের দেশ—নির্ম্মম, কঠোর। ওপারের দেশে আছে সহানুভূতি, এপারের দেশে মেলে আঘাত।

এমনি ভাবে চিন্তার অতুল রাজ্যে ধীরে ধীরে সে ডুবে যেত যেমন করে ডুবে যায় প্রকাণ্ড

জাহাজ কুলহীন সাগরের মাঝে। তারপরে থাকে শুধু নির্জ্জনতা, যার মাঝে সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব যায় লীন হয়ে। ঐ আকাশের চাঁদ আর থাকেনা। তারারা সব পলকে যেন কোথায় চলে যায়। ওপারের ঘর বাড়ী, গাছ পালা চোখের সামনে আর ভাসেনা। প্রকৃতির যা কিছু বাস্তবতা সব এসে মিশে যায় শূণ্যতার মাঝে, যেখানে না আছে স্থিতি, না আছে লয়; না আছে আদি, না আছে অন্ত।

হঠাৎ যখন ঘোর ভাঙে তখন জীবন্ত বিশ্বপ্রকৃতির রূপ দেখে তা'র চমক লাগে, লাগে বিস্ময়। আকুল নয়নে চতুর্দ্দিকে তাকায় কিন্তু অর্থ খুঁজে পায় না।

একটা ক্ষীণ সুর ভেসে আসে। বাঁশীর সুর। সুর স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়। দাঁড় টানার ছপাৎ ছপাৎ শব্দ। শব্দ আরও কাছে আসে, আরও কাছে। আবার দূরে চলে যায়, ক্ষীণ হয়, আর শোনা যায় না। বাঁশীর সুর তখনও শোনা যায়। শেষে তাও মিলিয়ে যায় নদীর অপর প্রান্তে কুয়াশার মাঝে।

* * * * * * * * * * * * *

গতরাত্রে ষ্টোভ জ্বালানর শব্দ হয়নি। মেয়েটির কিন্তু কৌতূহল বাড়ে আরও। তা'র ঘরের সামনে যেতেই দেখ্‌তে পেল ঘরের দরজায় মুখ বাড়িয়ে কি যেন সে দেখ্‌ছে। বড়ো বড়ো, গোল গোল তা'র চোখ,—অস্বাভাবিক তা'র চাহনি। মাথায় খাড়া খাড়া চুলগুলা যেন তা'কে আরও ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। তার সমস্ত অবয়বের ভেতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে একটি মাত্র শব্দহীন ভাষা যা বল্‌ছে—তোমরা কেউ এসোনা, এসোনা আমার কাছে।

মেয়েটি থম্‌কে দাঁড়াল। যেন ছুটো মর্ম্মর মূর্ত্তি মুখো মুখি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পরস্পরের দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি নিবদ্ধ। একজনার দৃষ্টি বেদনায় ম্লান, সহানুভূতিতে ভরা আর একজনের দৃষ্টি তীব্র, কঠোর।

একজন বল্‌ছে—বলো, তুমি কে, তোমার কি হয়েছে?

আর একজন বলে—আমি বন্দী, আমার পরাধীনতার কারণ একমাত্র তুমি।

তারপর আস্তে আস্তে সরে যায় ভেতরে তা'র গভীর দৃষ্টি নিয়ে। দরজা হয়ে যায় বন্ধ। মেয়েটি নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে থাকে দাঁড়িয়ে।

একদিন আবিষ্কার হ'ল, ফলওয়ালা আর সে বাড়ীতে নেই। আছে শুধু ফলের খোসা এদিকে সেদিকে ছড়ানো। দেয়ালের গায়ে একটা ফ্রেমহীন ছবি টাঙানো। তার নীচে ছাপার হরপে লেখা শপেনহায়ার।

আমাদের রাজনীতি

শচীন সেন

ভারতবর্ষে সমাজের ক্ষেত্র ছিল বিস্তৃত। তার গৃহে প্রাচীর গড়ে উঠলেও সমাজের পরিসর প্রসারিত থাকার দরুণ আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান ও প্রকাশশক্তি সমাজকে অবলম্বন করে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয়েছে। তাই রাজায়-রাজায় যুদ্ধ হ'লেও আমাদের স্বাধীনতার নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়নি—সমাজের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে আমরা কল্যাণের সঙ্গে, মঙ্গলের সঙ্গে বহুর মধ্য দিয়ে যোগস্থাপন করেছি। এই বিস্তৃতি ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে এল—আমাদের সংযমবোধ আচারের পথ অনুসরণ করে নিজেকে ক্ষুদ্রতার আবেষ্টনের ভিতর ফেলে দিল। আমরা লোককে বিশ্বাস না করে লোকাচারকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলাম, আমরা সমাজের মুক্ত আঙিনা ছেড়ে গৃহের প্রাচীরের ভিতর আশ্রয় নিলাম। নিজেদেরকে হারিয়ে স্থাণু হয়ে যখন বসেছিলাম তখনও সমাজের অনুষ্ঠানে মানুষের সঙ্গে একটা যোগাযোগ ছিল—আমাদের কল্যাণবুদ্ধি, মঙ্গলসৃষ্টি তখনও ব্যাহত হয় নি। তাই রাজার সিংহাসনের চেয়ে সমাজের আধিপত্যকে আমরা স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছিলাম। সেই সমাজ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে বৃহৎকে পাবার সুযোগ ছিল; বন্ধনকে গ্রহণ করে' মুক্তির স্বাদলাভ সম্ভব ছিল, বিরোধের মধ্য দিয়ে মঙ্গলের সঙ্গে যোগসাধন হ'ত।

সহসা পশ্চিমের ধ্যান ধারণা, বহির্মুখী কল্পনা, রূপপ্রধান সভ্যতা আমাদের চিন্তার জগতে, ভাবের জগতে, সামাজিক জীবনে এক নূতন আলোড়ন উপস্থিত করল। আমাদের নিশ্চল মন চঞ্চল হয়ে উঠল, আমাদের বেড়া-দেওয়া সমাজে নূতন আলো এসে আমাদের দিবাস্বপ্ন ভেঙে দিল। সে আজ প্রায় দুই শত বৎসরের কথা। ধীরে ধীরে আমাদের প্রাচীন সমাজ ভাঙতে আরম্ভ করল, গৃহেও ভাঙন ধরল। এর ভাল মন্দ বিচারের ভার এখানে নয়, কিন্তু নিশ্চল মনের উপর গতিশীল মনের আধিপত্য বিস্তার লাভ করলে ভাঙনের পালা সুরু হ'বেই। পশ্চিমের সমাজ ভেঙেছে, তাঁদের রাষ্ট্র আছে। রাষ্ট্র তাঁদের ঐক্যদান করেছে, মঙ্গল বিধান করেছে, দেশের কল্যাণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে—তাই সমাজবন্ধনের বিচ্ছিন্নতা তাঁদের শৃঙ্খলাহীন করেনি, কর্ম্ম-মহাসাগরে তাঁরা নোঙরচ্যুত হননি। আমাদের নোঙর ছিল সমাজবন্ধনের; গৃহের মায়ায় ছিল আমাদের শান্তি, সমাজের ছায়ায় ছিল আমাদের শ্রান্তি। তাই রাষ্ট্রের বিপ্লবের দিকে আমাদের দৃষ্টি ছিল না, সাম্রাজ্যবাদের কল্পনা, রাজায়-রাজায় কলহ আমাদের মনকে উত্তেজিত করত না, চিন্তজগতে নূতন সামগ্রী এনে দিত না। কিন্তু আজ যখন সমাজের প্রাঙ্গন থেকে বেরিয়ে এসে আমরা রাষ্ট্রের দিকে ধাবিত হ'লাম, আমরা বুঝতে পারলাম যে, রাষ্ট্রবিধান আমাদের হাতে নয়। সমাজকে আমরা নিজের হাতে গড়েছিলাম, সমাজের অনুশাসন নিজেদের চেষ্টায় ও বুদ্ধিতে রচিত

হয়েছিল—তাই সেখানে বন্ধনের মধ্যেও স্বাধীনতা ছিল, সংকীর্ণতার ভিতরও বদ্ধতার ব্যথা ও বেদনা ততটা উগ্র ছিল না। আজ রাষ্ট্রের বিধান পরহস্তগত, তাই আমাদের মঙ্গল চেষ্টা পদে পদে ব্যাহত হচ্ছে, পথে পথে বাধা পাচ্ছে। এই রাষ্ট্রাধিকার পাবার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি—তাতে সমাজের বন্ধন শিথিল হয়েছে; কিন্তু রাষ্ট্রবিধানের সাহায্যে আমরা আমাদের শৈথিল্য দূর করতে পারলাম না, আমাদের অনৈক্যের ভিতর ঐক্যের সুর গেঁথে দিতে পারলাম না, দেশের মঙ্গল চেষ্টাকে পরিপূর্ণ করে দিতে পারলাম না। পশ্চিম সমাজ হারিয়ে রাষ্ট্র পেয়েছে, আমরা সমাজ হারাতে বসেছি কিন্তু রাষ্ট্রের অধিকার বিদেশীর হাতে, রাষ্ট্রের মঙ্গলচেষ্টা বিদেশীর কল্যাণের সুরে ধ্বনিত। তাই আমাদের রাষ্ট্রের শাসনে সম্পত্তি গড়ে উঠছে, সম্পদ্ বাড়ছে না; অভাব সৃষ্টি হচ্ছে, ঐশ্বর্য্য বিকশিত হচ্ছে না।

আজ পিছনে যাবার উপায় নেই, তাই সম্মুখে যেতে হবে। সমাজের ভিতর দিয়ে কল্যাণ-চেষ্টা প্রবাহিত করবার সুযোগ আর ফিরে আসবে না, তাই রাষ্ট্রকে অবলম্বন করে আমাদের উর্দ্ধে উঠতে হ'বে। আমাদের ট্রাজেডি হ'ল এই যে, আমরা যখন পশ্চিম-চিন্তাধারার নূতন আলোকের সাহায্যে নূতন পথে যাত্রায় বাহির হ'লাম, রাষ্ট্রের চোখরাঙানিতেও আমাদের গতি বাধা পেল। এই বাধাকে অতিক্রম করতে গিয়ে আমরা ক্লান্ত হয়েছি, শ্রান্ত হয়েছি। তাই সর্ব্বদেশে যখন দেশের ও দশের কল্যাণচেষ্টা মূর্ত্ত হয়ে নূতন সমৃদ্ধি, নূতন সম্পদ্ সৃষ্ট হচ্ছে, আমরা তখন পথের ক্লান্তিতে ম্রিয়মান, পথের ভারে অবনত এবং পথিকের বেদনায় অসাড়। এই ট্রাজেডিই আমাদের সব চেয়ে পীড়াদায়ক।

আমরা গৃহে কোন হারানো বস্তুকে খুঁজে পাবার জন্য যখন প্রদীপ জ্বালি, তখন সে প্রদীপ সমস্ত ঘরকে আলো করে দেয়। আমরা যখন রাষ্ট্রাধিকার জয় করবার জন্য পথের ডাকে বাহির হ'লাম, আমরা আমাদের সম্পূর্ণ সত্তাকে দেখতে পেলাম। রাষ্ট্রকে পেতে গিয়ে আজ আমরা দেখেছি যে, আমাদের আর্থিক শোষণ কি রূপ ধারণ করেছে, আমাদের পারিবারিক ও গোষ্ঠী জীবন কিসের ধূলায় মলিন, আমাদের ধর্ম্মবুদ্ধি, কল্যাণবুদ্ধি কোন অনুর্ব্বর ক্ষেত্রের দিকে প্রসারিত, আমাদের ব্যক্তিগত জীবন, আমাদের বিচারধর্ম্ম, আমাদের প্রাণধর্ম্ম কোন সংকীর্ণ গণ্ডীর মায়ায় মুগ্ধ। এই রাষ্ট্রাধিকারের পথে বাধা পেয়ে, ব্যথা পেয়ে আমরা নিজেদেরকে চিনেছি, আমাদের পথের কাঁকড়ের সঙ্গে পরিচিতি লাভ ঘটেছে, আমাদের বাধাকে, সমস্যাকে সমগ্রভাবে দেখতে পেয়েছি। এ যেন আমাদের নূতন জন্মলাভ হয়েছে, আমরা নূতন দৃষ্টি পেয়েছি। আমরা বুঝেছি যে, নদী যতক্ষণ তার দুকূলের সীমানা মেনে চলবে, ততক্ষণ মহাসাগরে মিলতে পারবে না। কারণ মিলনে সে কূল হারায়, তখন অন্তহীন মহাসাগরের স্পর্শ পেয়ে সে ধন্য। আজ আমরা বুঝেছি যে, শোষণের শৃঙ্খল নানা স্বর্ণে গঠিত, বন্ধনের রূপ নানা বর্ণে শোভিত। এই সর্ব্বতোমুখী সমস্যা-নদীর তীরে আজ আমরা অবস্থিত—এই খেয়া পার না হ'তে পারলে অন্য পারের সম্পদ্ ও ঐশ্বর্য্য, কল্যাণবুদ্ধি ও মঙ্গলচেষ্টা আমাদের নাগালের বাইরে থাকবে।

তাই আমাদের দেশে দিকে দিকে এতো অভিযান—সমস্যার তরী নানা দিকে প্রবাহিত, নানা হাটে এর গন্তব্য স্থান। মানুষ যখন শুধু নিজেকে দেখে, সে তখন অত্যন্ত সংকীর্ণ, সে শুধু গৃহী। সমাজের প্রাঙ্গণে আমরা দশজনের সঙ্গে মিশেছি, দশজনের কল্যাণ কামনা করেছি এবং মঙ্গল সাধন করেছি। আজ রাষ্ট্রের মুক্ত আঙিনায় আমাদের সমস্ত দেশবাসীর সঙ্গে পরিচয় ঘটবে—তাই সকলের মঙ্গল নিজের চেষ্টার ভিতর প্রকাশ করতে না পারলে রাষ্ট্রমন্দিরে তিনি সেবক হ'বার অযোগ্য। এই যে "আমি"র ভিতর বহুর প্রতিষ্ঠা, আজ রাষ্ট্রযজ্ঞে ইহাই প্রধান মন্ত্র। তাই বহুর আমন্ত্রণে আমরা বেরিয়েছি। যাঁরা এই যজ্ঞে যোগদান করতে চান, তাঁদের ভিতর এই বহু-বোধ না থাকলে, যজ্ঞের শুধু অনুষ্ঠানই চলবে, প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'বে না। বহুর আমন্ত্রণে রাষ্ট্রযজ্ঞ আহূত হয়, বহুর মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রযজ্ঞ সম্পন্ন হয়। এই বহুকে অতিক্রম করে যাঁরা নিজেদের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তাঁরা রাষ্ট্রধর্ম্মের সম্যক অর্থ বোঝেন নি। গৃহীর বোধ নিয়ে রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রবেশ করলে আমাদের অমঙ্গল ঘটবে। গৃহে আমরা কর্ত্তা, রাষ্ট্রে আমরা সেবক; গৃহে আমাদের কর্ম্ম, রাষ্ট্রে আমাদের সেবা, তাই গৃহকর্ম্মে প্রাধান্য চলে কিন্তু জনসেবায় আধিপত্য অনুকূল নয়।

একটি কথা আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, সমাজ যখন আমরা ছেড়েছি, অথবা সমাজ-সৌধ যখন ভেঙেছে, এবং রাষ্ট্রের দিকে যখন আমরা যাত্রা করেছি, অথবা রাষ্ট্রের প্রাধান্য যখন আজকের জগতে স্বীকৃত, তখন আমাদের মঙ্গলচেষ্টা রাষ্ট্রকে অস্বীকার করে, অথবা রাষ্ট্রকে অতিক্রম করে সাধন করা সম্ভব নয়। তাই রাষ্ট্রসাধনা আজকের দিনে এতো প্রবল। যখন সমাজের প্রাঙ্গণে আমরা মিশেছি, তখন কল্যাণবুদ্ধি ব্যক্তিগত মঙ্গল চেষ্টায় বিকশিত হ'ত। সমাজ ব্যক্তিকে মানে, ব্যক্তির শাসন চায় এবং ব্যক্তির অনুশাসনে পুষ্টি লাভ করতে চায়। কিন্তু রাষ্ট্র চায় ব্যক্তির সমাধি—তাই আজ রাষ্ট্র সমস্ত প্রকার মঙ্গলকার্য্য সাধনে ব্যগ্র এবং তারই বিধানে সমস্ত চেষ্টা অনুপ্রাণিত ও বিকশিত হ'বে। এই সাধনা ভারতীয় সাধনার অনুকূল কিংবা প্রতিকূল, সে আলোচনা আজ নিরর্থক। যাকে গ্রহণ করতে হ'বে, তাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করলে আমাদের বর্জ্জন শুধু দুর্গতিই সৃষ্টি করবে। রাষ্ট্রের এই চরম ও পরম শক্তিকে স্বীকার করতে হ'বে এবং সেই শক্তি স্বীকার করলেই দেখব যে, যাঁরা রাষ্ট্রের বাইরে থেকে দেশের বহুর সঙ্গে, দেশের প্রাণের সঙ্গে মঙ্গলকার্য্যের ভিতর দিয়ে যোগ সাধন করতে চান, তাঁরা যুগধর্ম্ম, যুগ-সাধনাকে অস্বীকার করছেন। আজ ব্যক্তির প্রয়োজন চুকে গেছে বলেই সংঘের প্রয়োজন, সমাজের বন্ধন শিথিল বলেই রাষ্ট্রের ঐক্য-বাঁধন ও অনুশাসন, বহুর আহ্বান এসেছে বলেই ব্যক্তি-ধর্ম্ম এতো অবহেলিত, জনগণের মুক্তধারা চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত বলেই রাষ্ট্র-তরণীতে পাল তুলে আমাদের যাত্রা। তাই আজ রাষ্ট্রাধিকারের এতো প্রয়োজন এবং সেই অধিকারে আমাদের অনধিকার থাকার দরুণ আমাদের ব্যথা এতো প্রচণ্ড, বেদনা এতো বিস্তৃত, সমস্যা এতো গভীর এবং আমাদের মঙ্গলচেষ্টা এতো প্রতিহত। আজ রাষ্ট্রের বিধানকে অধিকার না করে যাঁরা

ভাবেন যে, দেশের ও দশের সমস্যা সমাধান করা সম্ভব, তাঁরা সমস্যার বিস্তৃতি ও জটিলতা সম্বন্ধে সচেতন নন, বলতে হ'বে।

তাই সমস্যা-সমাধানের উপায় হ'ল রাষ্ট্রের সাহায্যে কল্যাণবুদ্ধি ও মঙ্গলচেষ্টাকে প্রসারিত করা, ব্যাপ্ত করা এবং সফল করা। এবং রাষ্ট্রাধিকারের উপায় হ'লো বিরোধের সাহায্যে সেই মঙ্গলচেষ্টা-বিধায়ক যন্ত্রকে আয়ত্ত করা। তাই বিরোধের মধ্যে সমস্যা-সমাধান নেই কিন্তু সমস্যা-সমাধানের বীজ আছে। বৃষ্টি যখন আসে, নদীর জল যখন কূল ভাসিয়ে শস্যক্ষেত্রে এসে পড়ে, সেই জল জমির উর্ব্বরতা আনে, কিন্তু শস্য ফলাতে হ'লে আমাদের সঙ্গে জমির যোগসাধন প্রয়োজন। সৃষ্টিবেদনা নিয়ে এলেও মিলন না ঘটলে কোন সৃষ্টি সম্ভব নয়। তাই বিরোধের প্রয়োজন, সংঘাতের প্রয়োজন সৃষ্টিকে সম্ভব করার জন্য, কিন্তু সৃজন কাজ যখন চলবে, অর্থাৎ সমস্যা-সমাধানের কাজ যখন চলবে, তখন বিরোধ নয়, মিলন; তখন আঘাত নয়, মঙ্গলবোধন; তখন নদীর কূল-ভাঙার পালা নয়, জমির সঙ্গে যোগসাধন। তাই আমরা বলি যে, বিরোধের ভিতর মিলন আছে; সংঘাতের সমগ্রতা উপলব্ধি করলে সৃজনকে, সমাধানকে আর অস্বীকার করা যায় না। এ যেন অমাবস্যা ও পূর্ণিমা—এই দু'পক্ষের মিলন না ঘটলে মাসের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। রজনী অবসান না হ'লে প্রভাতের ফুল বিকশিত হয় না, কিন্তু তা' বলে ফুল ফোটাবার পক্ষে রজনীর দুর্য্যোগই সবটা নয়—প্রভাতের আলোরও প্রয়োজন। আমাদের রাষ্ট্রাধিকারের জয়যাত্রার পথে যদি এই খণ্ডতাবোধ আমাদের সমগ্রতার মূর্ত্তিকে উপলব্ধি করতে বাধা দেয়, তাহ'লে আমাদের দিক্ ভুল হ'বার সম্ভাবনা বেশী। আমাদের রাষ্ট্রাধিকারের জয়যাত্রা সমগ্রতাকে লাভ করবার জন্য, দেশের বহুর সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন করবার জন্য। আজ সমস্যা ও সমাধান কোনটাকেই খণ্ডভাবে দেখলে চলবে না। তাই রাষ্ট্রাধিকারের যাত্রায় আত্মাহুতি এবং রাষ্ট্রবিধানেও আত্মাহুতি—এই যাত্রার শেষ নেই। বিরোধের শেষ থাকলেও মিলনের শেষ নেই। বিরোধে মানুষ স্বতন্ত্র কিন্তু মিলনে সে পূর্ণ। কিন্তু বিরোধের ভিতরও নিজের স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন না দিতে পারলে মিলনের পরিপূর্ণতা লাভ করা সুকঠিন। তাই, আত্মাহুতির এই যাত্রা গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত। এই আহুতির মূলমন্ত্র হ'ল নিজের ভিতর বহুর বোধ—সেই বোধের জন্য আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন নানা দিকে প্রসারিত, এবং বিরোধের ভিতরে সমাপ্তির অন্বেষণে ব্যগ্র নয়। এই বহু-বোধ যেদিন আমাদের আন্দোলনকে পোষণ না করবে, সেইদিনই আন্দোলনের ধারা মরুপথের অনুর্ব্বরতার দিকে যাবে। এই বোধই আমাদের আন্দোলনের সম্পদ্। আমাদের কলহে, আমাদের ঈর্ষায়, আমাদের সংকীর্ণতায় কখনো যেন সেই বোধের অভাব না ঘটে।

সুনির্ভর

অরুণা সিংহ

মম জীবনের করুণ-আশায় রিক্ত সমাধি পরে
জানি জানি প্রিয় তোমার আশার প্রসাদ কণিকা বারে ;
ভগ্ন ব্যর্থ প্রাণে,
সে সুর বহিয়া আনে—
ডুবালে গভীরে নিবিড় তিমিরে আমারে আপন করে— ;
তুলিবে নিজেই-জানি' অপেখিব নিয়ত সুনির্ভরে।

জানি সব ক্ষয়ে সঞ্চয় হয়ে তুমি শুধু রহিয়াছো—
আমার সকল আঘাত বেদনা নিজে বুকে বহিয়াছো।
অশ্রুর জলে ভাসি'
ফুটালে মধুর হাসি
পাষাণ গলায়ে তোমার বাঁশরী মধুসুরে ভরিয়াছো।
নির্ম্মম তব মধুর করুণা তাই মোরে দহিয়াছো।

রহিয়া রহিয়া বেদনাবীণায় তোমারি রাগিনী সাধি'
উতলা পরাণ নানাদিকে ধায় জোর ক'রে তায় বাঁধি !
পথ চলা করি সার
নাহি সঞ্চয় আর
জটিল জীবন গ্রন্থিমোচন কিছুতে মেলেনা খুঁজি।
দান করিবারে গিয়ে দেখি হায় নাহিযে কোনই পুঁজি।

তবু জানি প্রভু এ পথের শেষে সেই তুমি রহিয়াছো
সকল ঝড়ের বাতাস বাঁচায়ে দীপশিখা ধরিয়াছো।
জীবনের সুরগুলি
ত্যাজিও যাইনি ভুলি'
আমার ব্যথার এ ব্যর্থতার রাখিয়াছো পরাজয়—
মানুষের বেশে মানুষই করেছো তার চেয়ে ছোট নয় !

বায়ুমণ্ডল (Atmosphere)

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

৫০।৫৫ মাইল থেকে ২০০।২১০ মাইল উঁচুতে বায়ুমণ্ডলের অবস্থা জানার জন্যে কয়েকটি উপায় আছে। মেরুপ্রদেশের উচ্চাকাশে সময় সময় এক অভিনব আলোকমালা দেখা যায়, এর ইংরেজি নাম Aurora Borealis, বাংলায় বলা যেতে পারে মেরুজ্যোতিঃ। বায়ুমণ্ডলের উঁচুস্তরে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণ হয়, এর কারণ এখনো নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি। সূর্য্যের অভ্যন্তরে প্রচণ্ডতাপে পরমাণুর দল ভেঙে বিদ্যুৎকণায় পরিণত হয়; ভিতরের অসহ্য চাপের ঠেলায় মাঝে মাঝে এসব ভাঙা পরমাণুর দল সূর্য্যপৃষ্ঠ ভেদ করে উৎক্ষিপ্ত হয় প্রচণ্ডবেগে বহু উর্দ্ধে। সূর্য্য থেকে প্রক্ষিপ্ত এই বিদ্যুতের দল পৃথিবীর নিকটে এসে তার চৌম্বিক ক্ষেত্রের প্রভাবে মেরুপ্রদেশের দিকে ধাবিত হয়, তারপর উচ্চাকাশের বায়ুরাশিতে প্রবেশ করে এক বিদ্যুৎস্ফুরণের সৃষ্টি করে। একটা কথা একটু বলে রাখা দরকার—ধাবমান বৈদ্যুৎকণা কোন চুম্বকের বলক্ষেত্রে প্রবেশ করলে তার চলার পথ পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়, পজিটিভ্ ও নিগেটিভ্ বৈদ্যুতের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত। পৃথিবী একটি বিরাট চুম্বক, তার প্রমাণ পাই একটি কম্পাসের কাঁটার আচরণ দেখে; কম্পাসের ক্ষুদ্র চুম্বক যেদিকেই রাখা হোকনা ঘুরে ফিরে উত্তর দক্ষিণ দিকেই স্থির হয়ে দাঁড়ায়। বুঝতে পারি একটা অদৃশ্য আকর্ষণ এর স্থিতি নিয়ন্ত্রিত করছে। ধাবমান বৈদ্যুতের দল লক্ষ লক্ষ মাইল সরল পথে চলে এসে পৃথিবীর চৌম্বিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তাড়িত হয় মেরুপ্রদেশে। মেরুদেশের দীর্ঘ ছয়মাস ব্যাপী রাত্রির অন্ধকার এই মেরুজ্যোতিঃর আলোকে কিছু পরিমাণে দূর হয়।

চোখে না দেখলে, শুধু বিবরণ পড়ে, এই জ্যোতিঃর অভিনবত্ব ধারণা করাই যায় না। এর আবির্ভাব, তরপর সমস্ত আকাশময় বিচিত্র রঙের খেলা, প্রত্যেকটি দৃশ্যই দর্শকের মনে গভীর বিস্ময়ের সঞ্চার করে। প্রথমে হরিতাভ পীত রঙের একটি বৃত্তাকার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃর আবির্ভাব হয়, প্রায় ঘণ্টাখানেক এই আলো সম্পূর্ণ নিশ্চল হয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে এর নিম্নদেশ উজ্জ্বলতর হয়ে লাল, নীল, সবুজ ও বেগনী আলোর বিচিত্র ছটা উর্দ্ধাকাশে পরিব্যাপ্ত হয়। কখনো বা এই উজ্জ্বল আলোর প্রবাহ কুণ্ডলীকৃত হয়ে একটা বিরাট সার্চ্চলাইটের মতো সমস্ত আকাশ আলোর প্লাবনে উদ্ভাসিত করে তোলে, আবার কখনো বা অতি সূক্ষ্ম ঝুলানো এক অভিনব আলোর পর্দ্দার রূপ ধরে দুলতে থাকে, আর তা না হ'লে একটা অদ্ভুত ভয়াবহ নৃত্যের ছন্দে সমস্ত আকাশ পথ মথিত করে আবর্ত্তিত হতে থাকে। মনে হয় যেন এই প্রলয় নৃত্যে আকাশ ভেঙে নীচে নেমে আসবে। এই বিচিত্র রঙের আলোর খেলা যখন চরম সীমায় পৌঁছে তখন হঠাৎ এর পরিসমাপ্তি

হয় ; এক বিচ্ছুরিত মৃদু আলোক ছাড়া আর কিছুই তখন দেখা যায় না ! এই আলো দেখলেই মনে হয় যেন আকাশের বায়ুরাশি এক প্রচণ্ড বিদ্যুৎশক্তির তাড়নে বিপর্য্যস্ত হচ্ছে। ঠিক সঙ্গে সঙ্গেই আবার এই স্তরে আগুন জ্বলে উঠে তার শিখা উচ্চাকাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে দুলতে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে এই আগুন নিভে গিয়ে মুহূর্ত্তপূর্ব্বের আলোকিত আকাশে অন্ধকারের একটা গাঢ় পর্দ্দা ফেলে দেয়। ১১ বৎসর পর পর যখন সূর্য্যের গায়ে কালো দাগ বেড়ে ওঠে, পৃথিবীর চৌম্বিক ক্ষেত্রে ঘন ঘন চৌম্বিক-ঝড় বয়ে যায়, এই মেরুজ্যোতিঃ তখন পরিপূর্ণ সমারোহে মেরুপ্রদেশের উচ্চাকাশে আবির্ভূত হয়।

এই জ্যোতিঃ ছাড়া বায়ুমণ্ডলের উঁচুস্তরে আরো একপ্রকার আলোকের সন্ধান পাওয়া গেছে ; এই আলোক শুধু মেরুপ্রদেশ নয় পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আকাশ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অমাবস্যার গভীর অন্ধকারেও দূরে গাছপালা বাড়ীঘর অস্পষ্টভাবে দেখা যায় ; আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে নক্ষত্রের আলোর সাহায্যে এই দেখা সম্ভব হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম হিসেব কষলে দেখা যায় যে প্রায় অর্দ্ধেক আলো দেয় নক্ষত্রগুলি আর বাকী অর্দ্ধেক আসে আকাশ থেকে। হরিতাভ এক মৃদু আলোকে রাত্রির আকাশ উদ্ভাসিত। নৈশাকাশের এই আলোকের প্রকৃতি ও উৎপত্তি সম্বন্ধে গত ১০।১৫ বছর ধরে অনেক পরীক্ষা চলছে। ৬০ মাইল উর্দ্ধে হাওয়ার অণুপরমাণু দিনের বেলায় সূর্য্যের আলো শুষে নিয়ে তেজ সঞ্চিত করে রাখে, রাত্রিতে ঐ তেজোপূর্ণ অণুপরমাণু থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হয়। মেরুজ্যোতিঃ ও নৈশাকাশের আলোকের বর্ণালী (Spectrum) পরীক্ষা করে বায়ুমণ্ডলের উঁচুস্তরে হাওয়ার অবস্থা ও উপাদান সম্বন্ধে অনেক আশ্চর্য্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখানেও অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস আছে, কিন্তু ক্ষুব্ধ স্তরের মতো অক্সিজেন এখানে আণবিক অবস্থায় না থেকে পরমাণুর অবস্থায় আছে।
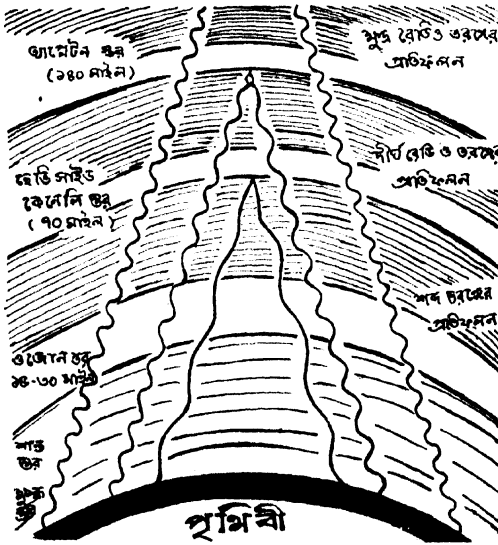
৬০।৭০ মাইলের বেশি উঁচুতে বায়ুমণ্ডলের অবস্থা জানতে হলে বৈদ্যুতিক ঢেউয়ের সাহায্য নিতে হবে। তেজের পার্থক্য ছাড়া আলোর ঢেউ ও বৈদ্যুতিক ঢেউয়ের প্রকৃতিগত কোনো বৈষম্য নেই, আলোর ঢেউয়ের তেজ বৈদ্যুতিক ঢেউয়ের চেয়ে কোটি কোটি গুণ বেশি। মূলে বিশেষ

কোনো তফাৎ না থাকায় এই দুই জাতের তরঙ্গের ভিতর অনেক গুণের মিল দেখা যায়। যেমন, এদের চলার বেগ একেবারে সমান, সোজা লাইন ধরে এরা চলে, মাটির মতো কঠিন জিনিষের ভিতর দিয়ে এরা চলতে পারেনা। এই বিদ্যুতের ঢেউ যদি সোজা লাইনে চলে তাহলে পৃথিবীকে ঘুরে আবার সেই জায়গায় ফিরে আসতে পারেনা, কারণ পৃথিবী গোলাকার। কিন্তু বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা থেকে জানা গেছে যে কোথাও বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি হলে তা পৃথিবী ঘুরে আবার সেই জায়গাই ফিরে আসে। বেতার যন্ত্র নিয়ে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা জানেন যে প্রেরক-যন্ত্র (Transmitter) থেকে গ্রাহক-যন্ত্র (Receiver) দূরে থাকলেই বরং কথা পরিস্কার শোনা যায়। এই ঢেউ সোজা লাইনে চলেও যে কী করে পৃথিবীর মতো গোল জিনিষকে প্রদক্ষিণ করে আসে তা প্রথমে খুবই আশ্চর্য্য বলে মনে হতো। আস্তে আস্তে পণ্ডিতদের এই ধারণা হলো যে বৈদ্যুতিক ঢেউ পৃথিবী থেকে কিছুদূর উপরে উঠে বায়ুমণ্ডল থেকে কোনো উপায়ে প্রতিফলিত হয়ে নীচে ফিরে আসে; এভাবে প্রতিহত হলে এই ঢেউ এমন জায়গায় এসে পৌঁছুতে পারে, সোজা লাইনে চললে যেখানে এর যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

সাধারণ অবস্থায় হাওয়া বিদ্যুৎপরিবাহী নয়, তাই বিদ্যুতের ঢেউ প্রতিফলিত করতে পারে না, কিন্তু হাওয়ার পরমাণু থেকে যদি ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন করা যায় তাহলে ঐ বৈদ্যুতাশ্রিত হাওয়া বিদ্যুতের ঢেউয়ের বেগ বর্দ্ধিত করে তার গতিরেখার দিক পরিবর্ত্তিত করতে পারে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে Heaviside ও Kennelly অনুমান করলেন যে বৈদুতাশ্রিত হাওয়ার কোনো স্তর বায়ুমণ্ডলে কোথাও আছে যার ভিতর প্রবেশ করতে গিয়ে বিদ্যুতের ঢেউ প্রতিফলিত হয়ে নিচে ফিরে আসে। পণ্ডিতদের পরীক্ষায় এই স্তরের অস্তিত্ব ও স্থিতি আজ একেবারে স্থির হয়ে গেছে, এর নাম হয়েছে Heaviside-Kennelly স্তর বা E স্তর। ৬০।৭০ মাইল উঁচুতে এই E স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে, সময় সময় অবশ্য এর উচ্চতার পরিবর্ত্তন হতে দেখা যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাক্তার শিশিরকুমার মিত্র এ বিষয়ে অনেক পরীক্ষা করে এই স্তরের উপরে ও নীচে আরো কয়েকটি স্তরের সন্ধান পেয়েছেন।

বায়ুমণ্ডলের অনেক উপরেও এরকম আরো একটি স্তর আবিষ্কার করা হয়েছে, তার নাম হয়েছে Appleton স্তর বা F স্তর। নিম্নতম স্তরের উচ্চতা ২৫।৩০ মাইলের বেশি নয়, এর নাম হয়েছে D স্তর। মাটী থেকে এত উপরে হাওয়ার মধ্যে কী করে বিদ্যুৎকণা সৃষ্টি হয় তা বুঝতে হলে বেগনীপারের রশ্মির (ultra-violet rays) একটি বিচিত্রগুণের সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। কোনো পদার্থের পরমাণু থেকে ইলেকট্রন মুক্ত করার ক্ষমতা এই বেগনীপারের আলোর আছে। আগেই বলা হয়েছে সূর্য্য থেকে অনেক বেগনীপারের আলো আসে পৃথিবীর দিকে, তার বেশির ভাগ শুষে নেয় ওজোন স্তর। অসীম তেজোপূর্ণ এই আলো ওজোনস্তরে পৌঁছবার আগেই হাওয়া থেকে অসংখ্য বৈদ্যুৎকণা মুক্ত করে দিয়ে আসে। বিদ্যুতের ঢেউ এই ইলেকট্রনমুক্ত স্তরে প্রবেশ করতে গিয়ে, বিদ্যুৎকণার তাড়নে সবেগে প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে পৃথিবীর দিকে।

বৈদ্যুতাশ্রিত এসব স্তরের উচ্চতা সব সময় সমান থাকে না ; আকাশে প্রতিদিন সূর্য্যের স্থান পরিবর্ত্তন ও ঋতু পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদের উচ্চতারও ভেদ দেখা যায়। D স্তরের উচ্চতা সব চেয়ে কম, ২৫।৩০ মাইলের বেশি নয়। খুব দীর্ঘ বিদ্যুতের ঢেউ এই স্তর থেকে প্রতিফলিত হয় এবং তাও আবার সূর্য্যোদয়ের ঠিক পরেই। বেলা যত বাড়তে থাকে এ স্তরের প্রতিফলন ক্ষমতাও তত কমতে থাকে ; E ও F স্তর থেকে যে-সব ঢেউ প্রতিফলিত হয় এই স্তর তাদের অনেকটা শোষণ করে নেয়। E স্তরের উচ্চতা দিনের বেলা ও গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে কম থাকে, কারণ তখন সূর্য্যরশ্মির প্রাখর্য্য এতো বেশি যে হাওয়ার পরমাণু ভেঙে বৈদ্যুৎকণা সৃষ্টি হয় অনেক নীচুস্তর পর্য্যন্ত। রাত্রিবেলা এবং শীতের সময় সূর্য্যরশ্মির প্রখরতা কম থাকায় বেগনীপারের আলো হাওয়ার নীচুস্তরে প্রবেশ করতে পারেনা, তাই এ সময়ে এই স্তরের উচ্চতা হয় সব চেয়ে বেশি। সাধারণতঃ E স্তর ৬০।৬৫ মাইল উঁচু হয়, কিন্তু কখনো এর উচ্চতা হয় ৪৫ মাইল, আবার কখনো বা ৯০ মাইল পর্যন্ত হতেও দেখা যায়। সচরাচর এই স্তর ৯০০ ফুট থেকে ১২০০ ফুট দীর্ঘ বিদ্যুতের ঢেউ প্রতিফলিত করে, এর চেয়ে ছোটো ঢেউ এই স্তর অতিক্রম করে উচ্চতর F স্তর থেকে প্রতিফলিত হয়।

F স্তরের উচ্চতারই সব চেয়ে বেশি পরিবর্ত্তন দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়াতে কখনো এর উচ্চতা মাত্র ৯৩ মাইল, আবার কখনো হয় ২৪০ মাইল। মোটের উপর এর উচ্চতা থাকে প্রায় ১৫০ মাইল। প্রায় ৩০০ ফুট দীর্ঘ বিদ্যুতের ঢেউ এই স্তর থেকে সাধারণতঃ প্রতিফলিত হয়, ক্ষুদ্রতর ঢেউ বৈদ্যুতাশ্রিত এই তিনটি স্তরকে অতিক্রম করে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ে। মহাকাশে পরিব্যাপ্ত এই ক্ষুদ্রতম বিদ্যুতের ঢেউ সময় সময় কোটি কোটি মাইল ঊর্দ্ধে উঠে আবার ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসে ; কী করে বৈদ্যুতাশ্রিত স্তরহীন মহাশূন্য থেকে এরা প্রতিহত হয় তার কারণ আজও অজানাই রয়ে গেছে।

পৃথিবী থেকে যতই উঁচুতে ওঠা যায় হাওয়ার পরিমাণ ততই কম হতে থাকে। ৬ মাইল উঁচুতে বায়ুর ঘনত্ব ভূতলের বায়ুর প্রায় এক তৃতীয়াংশ, ৩০ মাইল উঁচুতে দুই সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র। এখন প্রশ্ন ওঠে বায়ুমণ্ডলের শেষ কোথায় ? উপরে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর ঘনত্ব এতো কমে আসে যখন তার অণুপরমাণুর পরস্পরের মধ্যে সংঘাত ঘটা খুবই বিরল হয়ে ওঠে। এই বায়ুরাশি থেকে অনুপরমাণুর দল আপন গতিবেগে, পরস্পর সংঘাত এড়িয়ে শূন্যে চলে যেতে পারে ; কিন্তু বহু ঊর্দ্ধে উঠেও পৃথিবীর আকর্ষণের বলে আবার নীচে ফিরে আসে। বায়ুমণ্ডল থেকে মুক্ত হাওয়ার এই অণুপরমাণুর দল সময় সময় দশ হাজার মাইল পর্য্যন্ত উপরে ওঠে। এই ধাবমান অণুপরমাণুর সমষ্টিকে বায়ুমণ্ডলের ছটা বা 'spray' বলা যেতে পারে ; এদের সংঘাত ক্রমশঃ বিরল হয়ে আসে, অবশেষে এই ছটা মহাশূন্যের সঙ্গে মিশে যায়।

"অভাগা যেদিকে চায়......"

হিমাংশু রায়

হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

একদল প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেমেয়ে এতক্ষণ ইহারই অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল। কেনা-বেচা সাঙ্গ করিয়া সবাই যখন বিশ্রামসুখ উপভোগ করিবার জন্য বাড়ীর পথ ধরে তখন তাহাদের সত্যিকার কাজ সুরু হয়।

তাহারা অজানা লোকের হারাণো পয়সা খুঁজিয়া বেড়ায়।

দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের দল। ক্লিষ্ট মুখ; বুভুক্ষু দৃষ্টি। পরিধানে শত ছিন্ন মলিন বসন। আয়তনে ইহা এত সংক্ষিপ্ত যে লজ্জা নিবারণ করা কষ্টসাধ্য। ছেলেদের ইহাতেই কোন মতে পোষাইয়া যায়। একান্তই খাটো হইলে কৌপিনের মত করিয়া পরে। মেয়েদের বিপদ। হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত কাপড় পরিয়াও তাহারা বুক-পিঠ ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। তাই তাহাদের ক্রমাগত এদিক ওদিক কাপড় টানিয়া দিবার বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয়। আর সব সময় থাকিতে হয় সন্ত্রস্ত।

খুঁজিবার পদ্ধতি অভিনব। অপরিস্ফুট জ্যোৎস্নালোক পয়সা সন্ধানের পক্ষে যথেষ্ট নয়। আলোর প্রয়োজন। কিন্তু ইহার জন্য তাহাদের ভাবিতে হয় না। পাটশলা তাহারা আগেই সংগ্রহ করিয়া রাখে। যথাসময় ইহাতে আগুন ধরাইয়া লয়। তারপর সুরু হয় সাধনা। পলকহীন দৃষ্টি মাটির উপর নিবদ্ধ রাখিয়া, সামনের দিকে ঈষৎ নুইয়া এক পা এক পা করিয়া তাহারা আগাইতে থাকে। অবসন্ন পা দুইটি হয়ত মাঝে মাঝে কাঁপিয়া উঠে। সে দিকে মন দিবার অবসর তাহাদের নাই। সারা হাটটা অন্তত একবার চষিয়া ফেলিতে হইবে।

দুলালী সে দলের একজন!

চলিতে চলিতে সে হঠাৎ এক স্থানে আসিয়া একটু থামিতেই তাহার ছোট ভাই ভোলা কহিল, পেলি দিদি?

নিতান্তই ছোট সে। দিদির আঁচল ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিল।

দুলালী কথা না কহিয়া পুনরায় চলিতে সুরু করিল।

হাতের আলো নিবন্তপ্রায়। আর পাটশলা যোগাড় করা সম্ভব নয়। নিরাশায় দুই জনেরই চোখ মুখ করুণ হইয়া উঠিয়াছে।

শেষ চেষ্টা। সতর্ক দৃষ্টি মেলিয়া উভয়ে আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিয়ৎদূর যাইতেই সহসা দুলালীর পায়ে যেন কি একটা ঠেকিল। সে সাগ্রহে প্রায় মাটির সঙ্গে নুইয়া পড়িয়া জিনিষটাকে পরীক্ষা করিতে লাগিল।

একটা পয়সা যেন !

তাহার মুখ চোখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে কতকটা চীৎকার করিয়াই বলিয়া উঠিল, পেয়েছি ভোলা !

ভোলা হাল ছাড়িয়া দিয়াছিল। দিদির আচমকা ডাকে সে সচকিত হইয়া কহিল, সত্যি ?

সত্যিরে ! বলিয়া সে পয়সাটি তুলিয়া লইয়া তাহাকে দেখাইবার চেষ্টা করিতেই আলো নিবিয়া গেল।

দুইজনে কিছুক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সর্ব্বাঙ্গে তাহারা অনির্ব্বচনীয় পুলক অনুভব করিতেছিল বুঝি।

দুলালী ভোলার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, চল বাড়ী যাই।

কালো মেঘের আড়ালে চাঁদ মুখ লুকাইয়াছে।

অন্ধকারে পথ চিনিয়া দুইজনে পাশাপাশি চলিতে লাগিল। কিছুটা সময় নিঃশব্দে অতিবাহিত হইবার পর ভোলা কহিল, পয়সাটা দেনা দিদি দেখি।

না। হারিয়ে যাবে ; যে অন্ধকার। বলিয়া দুলালী হাতের মুঠিতে আবদ্ধ পয়সাটিকে একবার ভাল করিয়া অনুভব করিয়া লইল।

ভোলা নিরস্ত হইল না। ইহার স্পর্শসুখ উপভোগ করিবার জন্য তাহার মনপ্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। সে পুনশ্চ মিনতিভরে কহিল, দেনা দিদি। হারাবে না, হারালে আমায় মারিস।

দুলালী হাসিল। কহিল, মারলেই কি আর হারাণো পয়সা পাওয়া যাবে ?

ভোলা একটু অপ্রস্তুত ও ব্যথিত হইয়া চুপ করিল। তাহার এই আকস্মিক মৌনতা দুলালীর বুকে আঘাত দিল। সে স্পষ্ট বুঝিল, ছোট ভাইটির মুখ অভিমানে ও দুঃখে এতটুকু হইয়া গিয়াছে। হয়ত চোখ দুইটি বাষ্পার্দ্র হইয়া উঠিয়াছে।

আদরের ভাইটি তাহার।

এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ থাকিয়া সে স্নেহ-সুগভীর কণ্ঠে কহিল, রাগ করলি ভোলা ?...নে হাত পাত। বলিয়া সে তাহার হাতটি ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিতেই ভোলা তাহা ছাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল।

আহতকণ্ঠে দুলালী কহিল, তোর একটুতেই রাগ ! এই নে, লক্ষ্মী ভাইতো।

ভোলার অভিমান জল হইয়া গেল। হাত বাড়াইয়া সে পয়সাটি লইল। তাহার আর আনন্দের অবধি নাই। পয়সাটির উপর সে পুনঃ পুনঃ আঙ্গুল বুলাইতে লাগিল। কখন বা চোখের সুমুখে তুলিয়া ধরিয়া উহা দেখিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর সে পয়সাটি দুলালীকে ফিরাইয়া দিয়া কহিল, আজ কিন্তু দিদি পেটপুরে মুড়কি খাব। ইস্ কি ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে। সারাদিন খালি জল খেয়ে কাটিয়েছি।

দুলালীও অভুক্ত। ক্ষীণ হাসি হাসিয়া সে কহিল, আচ্ছা দেখব'খন কত খেতে পারিস।

কথাটা বলিবার সময় সে এক পয়সার মূল্যটা ভুলিয়া যায়।

এমনি আলাপ-আলোচনা করিতে করিতে তাহারা দ্রুত অগ্রসর হইতে থাকে।

পরাণ চুপ করিয়া বসিয়া তাহার দুরদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছিল।

জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি। অথচ বৃষ্টির নাম নাই। আকাশ পরিষ্কার—কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ। অনাবৃষ্টিতে সমস্ত ফসল নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিলেই চলে। সামান্য যাহাও আছে তাহাও প্রখর রৌদ্র তাপে ঝলসিয়া যাইতেছে।

পরাণ দিন মজুরি করে। পরের ক্ষেতে কাজকর্ম্ম করিয়া দিনান্তে চার-ছয় পয়সা পায়। ইহাতেই কায়ক্লেশে সংসার চলে। কামলার কাজও সে জানে। অবসর সময় কামলা খাটিয়াও কিছু উপার্জ্জন করে। কিন্তু এবার তাহার দুঃখকষ্ট চরমে উঠিয়াছে। অজন্মা; চাষ আবাদ নাই। সে সম্পূর্ণ বেকার। ক্ষেতের মালিকদের কাছে কাজের জন্য গেলে তাহারা শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলে, তোমরা এই প্রার্থনা কর যাতে তোমাদের আবার ডাকতে পারি।

কামলার কাজও জোটে না। সকলেরি অভাব। কামলা খাটাইবে কে? নিজের জন্য পরাণের বিশেষ ভাবনা হয় না। দিন কয়েক সে অনায়াসে না খাইয়া কাটাইতে পারে; এবং কাটাইতেছেও। ছেলেমেয়েদের জন্য তাহার যত ভাবনা। দুই মুঠি অন্নের জন্য তাহারা পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ায়। দিন শেষে যাহা লইয়া আসে তাহাতে একজনের ক্ষুধাও মিটে না। অনাহারে মৃতপ্রায় সবাই। বছর ছয়েকের ছেলে মণ্টু তাহার পাশে বসিয়া ক্ষুধার জ্বালায় চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। কান্না ছাড়িয়া সে এখন ঝিমাইতেছে।

সর্ব্বকনিষ্ঠ ছেলেটির জ্বর। মোহাচ্ছন্নের মত সে পড়িয়াছিল। কিছুক্ষণ হয় জাগিয়া উঠিয়া চিঁ চিঁ করিয়া কাঁদিতেছে।

পরাণের এ সমস্ত গা সওয়া হইয়া গিয়াছে। সে নীরবে যেমন বসিয়াছিল তেমনি বসিয়া রহিল।

এমন সময় দুলালী ও ভোলা বাড়ী আসিয়া পঁহুছিল। ঘরের চৌকাঠে এক পা দিয়াই ভোলা যেন দিগ্বিজয় করিয়া আসিয়াছে এমনি উল্লাসভরা কণ্ঠে কহিল, ও মা, ও বাবা শীগগির দেখ এসে কি এনেছি!

কিন্তু কেহই আসিল না। সবাই জানে সে আর কি আনিবে। বড় জোর কিছু কলমি শাক না হয়ত খান কয়েক ডাঁটা।

ভোলা তাহার উল্লাসের যথোচিত প্রতিধ্বনি না পাইয়া ক্ষুণ্ণ এবং ক্ষুব্ধ হইল। সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া আপন মনে কহিতে লাগিল, বেশ না এলে কেউ, কাউকে দেখাব না আমি। দুলালীর দিকে চাহিয়া কাতরভাবে কহিল, তুই বলিস না রে দিদি, বুঝলি?

দুলালী ঈষৎ হাসিয়া ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল সে বুঝিয়াছে।

ভোলা আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া দুমদুম শব্দ করিতে করিতে পাশের নির্জ্জন ঘরটিতে গিয়া প্রবেশ করিল।

পথ চলিতে চলিতে অনেক কিছু সে ভাবিয়া রাখিয়াছিল।

সবাই আসিয়া উৎসুকচিত্তে তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইবে। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর সে পয়সাটি সকলের চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়া তাহাদের চমক লাগাইয়া দিবে। তাহারা হয়ত কতক্ষণ সংশয় দোলায়িত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিবে। ইহা যে সত্যি একটা পয়সা সে সম্বন্ধে তাহারা যেন নিঃসন্দেহ হইতে পারিতেছে না। পরে যখন সন্দেহের অবসান হইবে তখন প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া সবাই তাহাকে বিব্রত করিয়া তুলিবে। 'কোথায় পেলি' 'কি করে পেলি' এমনি শত সহস্র প্রশ্ন।

দুলালী কিছু বলিতে পারিবে না। ভোলার সঙ্গে এই সত্বে সে চুক্তিবদ্ধ। ভারিক্কি চালে ধীরে ধীরে সেই সব ব্যক্ত করিবে।

কিন্তু সব পণ্ড হইয়া গেল।

কয়েক মিনিট কাটিল। শেষটা ভোলাকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। মাকে গিয়া কহিল,' দেখবে মা কি এনেছি ?

অরুচির একটুও কৌতূহল ছিল না। বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কহিল, যা .গাল করিস নে !

ভোলা আর পারিল না। তাহার দুই চোখ ছলছল করিয়া উঠিল। টুঁ শব্দটি না করিয়া সে পরাণের কাছে ছুটিয়া গিয়া তাহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কাঁদো কাঁদো ভাবে কহিল, মাকে আমি কিছুতেই দেখাব না। তুমিও দেখাতে পারবে না—কিছুতেই পারবে না।

পরাণ তাহার এই অভিমানী ছেলেটির পিঠে সস্নেহে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, কি এনেছিস বাবা ? পরাণের স্নেহমাখা কথা শুনিয়া আনন্দে ভোলার অন্তর পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি পয়সাটি বাবার হাতে দিয়া কহিল, এই দেখ !

ভূমিকা করা আর হইল না।

পয়সাটি দিদি পাইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাতে যে তাহারও অনেকখানি সাহায্যের প্রয়োজন হইয়াছিল সে রকম একটা আভাষ দিবার ইচ্ছা থাকিলেও কার্য্যক্ষেত্রে তাহা হইয়া উঠিল না।

পয়সা দেখিয়া পরাণের চোখমুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। পরমুহূর্ত্তেই তাহার চোখমুখে চিন্তার ছায়াপাত হইল। পাঁচ ছয়টি লোকের পক্ষে একটা পয়সার কিইবা মূল্য ! যেন মরুভূমিতে এক বিন্দু জল।

পয়সাটি হাতে লইয়া সে নতমুখে বসিয়া রহিল। ভোলা সহসা তাহার এই ভাবান্তরের কারণ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিল না। খানিকক্ষণ বোকার মত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল, বাবা আজ সবাই পেট ভরে মুড়কি খাব ? বসে রইলে যে, যাও না শীগ্‌গির ক্ষিধের জ্বালায় যে নাড়ি-ভুঁড়ি শুদ্ধ হজম হবার যোগাড় !

মুড়কির চিন্তা ভোলাকে পাইয়া বসিয়াছে।

পরাণের অনুভূতি ফিরিয়া আসিল। সে নিমেষের জন্য ছেলের শুষ্ক ম্লান মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল, যাই বাবা।

ইতিমধ্যে কখন যে মন্টু আসিয়া পরাণের কোল ঘেষিয়া বসিয়াছে তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই। পরাণ উঠিবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া সে তাহার কাপড়ের এক প্রান্ত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, না বাবা মুড়কি না। ঐ যে মিষ্টি মিষ্টি গোল গোল, ও গুলি আনবে কিন্তু?

ভোলা তাহাকে মস্ত এক ধমক দিয়া কহিল, বললেই হল আর কি! এক পয়সায় তোকে অনেকগুলি রসগোল্লা খাইয়ে দেবে'খন!

মন্টুর রসগোল্লা প্রীতির এক ইতিহাস আছে।

মাস কয়েক আগের কথা। জমিদারের মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে বিরাট দরিদ্র ভোজনের আয়োজন হইয়াছিল। সেখানে মন্টু প্রথম এই সুস্বাদু জিনিষটির আস্বাদ পায়। কিন্তু দুর্ভাগা-বশতঃ তখন সে একটার বেশী দুইটা খাইতে পারে নাই। অনেক কিছু খাইয়া আগেই তাহার পেট ভরিয়া গিয়াছিল। বাড়ী ফিরিবার পথে সে পরাণকে বারংবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, আচ্ছা বাবা ভাত আগে না দিয়ে ঐ মিষ্টি মিষ্টি গোল গোল গুলি আগে দেয় না কেন? (বলা বাহুল্য, বলিয়া দেওয়া সত্ত্বেও রসগোল্লা শব্দটি তাহার মনে থাকে না)।

পরাণ কি যেন একটা উত্তর দিয়াছিল; কিন্তু ইহা তাহার মনঃপূত হয় নাই।

সেই পাইয়াও না খাইতে পারার দুঃখ আজও সে ভুলিতে পারে নাই। আর উহার অপূর্ব্ব স্বাদ এখনও তাহার মুখে লাগিয়া আছে। সুযোগ পাইলেই সে 'মিষ্টি মিষ্টি গোল গোল' খাইবার বায়না ধরে। পরাণের ইহা মনে আছে। তাহাকে নিরাশ করিতে তাহার মন সরিল না। কহিল, তাও আনব।

ভোলা বাধা দিল।

না বাবা তা হবে না, খালি মুড়কিই আনবে। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস রসগোল্লা আনিতে গেলে মুড়কির পরিমাণ কমিয়া যাইবে।

উভয়ের মন রক্ষা করা পরাণের পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে দুই ভাইয়ের মধ্যে বাদবিতণ্ডা এবং পরিশেষে কান্নাকাটি সুরু হইল। গোলমালে আকৃষ্ট হইয়া দুলালী ও অরুচি আসিয়া জুটিল। সমস্ত শুনিয়া অরুচির চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। মন্টুকে কোলে তুলিয়া লইয়া এবং ভোলাকে পরম স্নেহে কাছে টানিয়া আনিয়া কহিল, ছিঃ বাবা, ছোট ভাইয়ের সঙ্গে অমন করতে নেই। মুড়কি ও রসগোল্লা দুই-ই আনবে। এক পয়সায় অনেক মুড়কি ও রসগোল্লা পাওয়া যাবে।

সান্ত্বনা দিবার জন্য সে মিথ্যার আশ্রয় লইল।

কি জানি কেন মণ্টু ও ভোলা কেউ আর কোন উচ্চবাচ্য করিল না। অরুচি স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, যাও নিয়ে এস গিয়ে।.. বেশী করে এনো কিন্তু ?

পরাণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখিতেছিল। নিজের অজ্ঞাতেই তাহার চোখের পাতাগুলি সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীর কথায় সে যন্ত্রচালিতের মত সাড়া দিয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

পথে নামিয়াও পরাণ নিস্তার পাইল না। দুশ্চিন্তাভারে সে ভাঙ্গিয়া পড়িল। অবোধ শিশু দুইটি শান্ত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহার মনে হইতে লাগিল তাহাদের প্রবঞ্চনা যদি তাহারা ধরিতে পারিত তাহা হইলেই ভাল হইত। আগ্রহ ব্যাকুলচিত্তে তাহারা তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহাদের শিশু মন এতক্ষণে কত রঙ্গিন কল্পনাই না করিতেছে!...তারপর যখন সে শুধু একমুঠি মুড়কি লইয়া ফিরিয়া যাইবে তখন ? মণ্টু নিশ্চয় কাঁদিয়া-কাটিয়া অনর্থ ঘটাইবে।

হাঁটিতে হাঁটিতে সে একটা মুদী দোকানের সামনে আসিয়া পড়িল। ছোট দোকান। সে চকিতে একবার সমস্ত জিনিষগুলির উপর চোখ বুলাইয়া লইল। কিন্তু মুড়কি দেখিতে না পাইয়া প্রশ্ন করিল, মুড়কি আছে ?

না।...চিড়া আছে, নেবে ? দোকানী সপ্রশ্ন জবাব দিল।

প্রস্তাবটা পরাণের মন্দ লাগিল না। এক পয়সার চিড়া ভিজাইয়া রাখিলে অনেকগুলি হইবে। হয়ত কিছু কিছু সবার ভাগ্যেই জুটিবে। ইহা তাহার একবারও মনে হয় নাই! কিন্তু অচিরেই তাহার মত বদল হইল। মণ্টু নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাহাকে না হয় কোনমতে ভুলাইয়া রাখা যাইবে। ভোলাকে তো আর তাহা পারা যাইবে না ?

না থাক। বলিয়া সে অগ্রসর হইল।

একটু আগাইতেই আর একটি দোকান পাওয়া গেল। মুড়কি ছিল। পরাণ চাহিবার মাত্রই সে জিজ্ঞাসা করিল, ক' পয়সার ?

এক পয়সার দাও দেখি।

একটা ঠোঙায় করিয়া দোকানী তাহাকে খানিকটা মুড়কি আনিয়া দিল।

ঠোঙাটি হাতে লইয়া পরাণ মুহূর্ত্তকাল ইহার দিকে অনিমেষে তাকাইয়া রহিল। আনন্দে সে আত্মহারা হয় বুঝি। ভোলার বেদনাকাতর মুখে সে যেন তৃপ্তির হাসি স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে।

ডান হাতের মুঠিতে সযত্নে রক্ষিত পয়সাটি সে ধীরে ধীরে দোকানীর দিকে আগাইয়া দিয়া চলিবার উদ্যোগ করিতেই দোকানী বাধা দিয়া কহিল, ওহে পয়সাটা বদলে দাও, ফুটো।

ফুটো! চমকিয়া পরাণ প্রতিধ্বনি করিল।

তাহার সন্দেহ দূর করবার জন্য দোকানী পয়সাটা তাহার হাতে দিল। পরাণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পয়সাটাকে বারকয়েক উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল।

ঠিকই।

তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঠ হইয়া গিয়াছে ; নড়িবার শক্তি নাই।

ইন্দো জার্মেন বাণিজ্য

সত্যব্রত সেন

ডাঃ সাখ্‌টের বেড়াতে আসা উপলক্ষ করে জার্মেণ-ভারতীয় বাণিজ্য সম্বন্ধে হালে অনেক আলোচনা চলেছিল। ডাঃ নাকি ভারতে জার্মেণ রপ্তানির কি সুরাহা করা যায় তাই দেখতে এসেছিলেন। ভারতবর্ষ বাপু বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত, বৃটিশ বাণিজ্য এখানে অক্ষুণ্ণ থাকুক। বাইরের কেউ এসে আস্তে আস্তে জায়গা করে নেবে, এ কারই বা ভাল লাগে? কিন্তু এই পরিষ্কার কথাটা সোজা করে বলতে এমন সঙ্কোচ লাগে! বিপদও অল্পসল্প আছে। বৃটিশ-বণিক-স্বার্থ তাই অনেক ঘুরিয়ে ভারতীয় বণিকদের বলছে, 'দেখ জার্ম্মেণীর সঙ্গে ব্যাবসা-ট্যাবসা না করাই ভাল। তোমাদের মঙ্গল হবে। দেশের মঙ্গল হবে।'

এদেশের বৃটিশ বণিকদের একখানা মুখপত্র থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যাক। জার্ম্মেণীর সঙ্গে ব্যাবসা করার কি সব অসুবিধা তা' ভারতীয় বণিকদের উদ্দেশ করে, এই পত্রিকা বলছে—

"We do not, however, seek to dissuade them from that trade if they are embarking on it with a full appreciation of its implications, both economic and political.

In the economic sphere they are in danger of antagonising other import markets and perhaps closing to their products larger and more profitable markets than Germany can ever hope to offer. In the political sphere—as recent activities in Central and South-Eastern Europe go to show—they are furnishing Germany with the wherewithal to maintain and expand her aggresive tactics to the danger of the peace of the world."
[Capital—June 1. 1939.]

এ হেন দুষ্‌মন জার্ম্মেণীর সঙ্গে ব্যাবসা বাড়াবার প্রচেষ্টা হোক্ না স্পেনে non-intervention এর নামে প্রহসন, হোক্ না মিউনিখ্‌-চুক্তি, তাই বলে ভারতবর্ষ জার্ম্মেণীর সঙ্গে ব্যাবসা চালিয়ে তাকে শক্তিমান করে' শান্তিভঙ্গের আয়োজন করবে? ঘোর কলি!

কেনাবেচা আমি যার সঙ্গে ইচ্ছে করব। লাভ লোকসান জ্ঞান আমার আছে। তুমি বলতে কে? বিদেশে যদি আমার বিক্রী বাড়ে, দরকারী জিনিষ যদি আমি সেখানে কিনতে পারি ত কেন কিনব না? হকগে জার্ম্মেণী। কি সুবিধা আছে, কি বিপদ আছে আমরাই দেখব। তুমি হিতোপদেশ দিও না, পিঠ চাপড়িও না।

দেশের শিল্প বাণিজ্যের প্রসার যে কোন সামাজিক কাঠামোতেই হোক, বাইরের কোন

শক্তির একের পরিবর্ত্তে অন্যের কোনো হাত থাকুক তা স্বভাবতঃই আমরা চাই না। এ নিয়ে তর্ক তোলাও অবান্তর। কিন্তু বিদেশের সঙ্গে ব্যবসা আমাদের করতেই হবে। বাণিজ্যের কথা যখন উঠলই তখন ভারতের সঙ্গে জার্ম্মেণীর কেনাবেচার রকমটা আর একটু ভাল করে' দেখা যাক্।

আমদানী (× ১ লক্ষ টাকা)

কোন দেশ হইতে	যুদ্ধের পূর্বে গড়পড়তা	যুদ্ধের সময়	যুদ্ধের পর	'৩৫-৩৬	'৩৬-৭	'৩৭-৮	'৩৮-৯
সমস্ত দেশ হইতে	১৪৫,৮৫	১৪৭,৮০	২৫৪,০৫	১৪৯,৭৭	১৪১,৭০	১৭৩,৭৯	১৫২,৩৪
জার্মেণী	৯,৩৫	১,০৪	৭,১৬	১১,৮৫	১১,৫৬	১৫,৩১	১২,৯৪
জার্মেণীর ভাগ (শতকরা)	৬'৪	০'৭	২'৮	৭'৯	৮'২	৮'৮	৮'৫

রপ্তানী

সমস্ত দেশে	২২৪,১২	২২৪,১১	৩০১,৯৮	১৫৪,২৫	১৯২,২৯	১৮৯,২১	১৬২,৭৭
জার্মেণী	২২,৩৬	২,০৪	১৪,৮৬	৮,৩৫	৯,০০	১০,৫৩	৭,৫৮
জার্মেণীর ভাগ (শতকরা)	৯'৮	০'৯	৪'৯	৫'৭	৪'৭	৫'৬	৪'৬

গত কয়েক বছরে জার্ম্মেণীর অংশ বাড়লেও, ভারতীয় বাজারে এখনও ওরা বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেনি। গত বছর ওদের অংশ আবার কমে গেছে। এদিকে একটু বিশেষ নজর দেওয়া তাই ওদের পক্ষে একটুও অস্বাভাবিক নয়। জার্ম্মেণী থেকে আমরা আমদানী করি প্রধানতঃ (যার মূল্য এক কোটী টাকা বা তার কাছাকাছি যায়)—

আলিজারিন ও অন্যান্য আলকাতরা হইতে উৎপন্ন রং, লৌহ ও ইস্পাত, কাঁসা, তামা, হার্ডওয়ার, যন্ত্রপাতি, মিলের উপকরণ, পশমজাত দ্রব্য ইত্যাদি এ সবের আমদানী (মূল্য ধরে) ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে।

আমরা কাঁচা মাল হিসাবে জার্ম্মেণীতে রপ্তানী করি প্রধানতঃ পাট্, গম, তূলা, বীজ ও চামড়া (৫০ লক্ষ টাকা)।

জার্ম্মেণী থেকে আমরা আমদানী করি বেশীর ভাগই রং, কলকব্জা ইত্যাদি যা আমাদের দরকার হয় অন্য জিনিষ তৈরী করতে (Producer goods)। আর আমরা রপ্তানী করি কাঁচামাল।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব অর্থসচিব সার জর্জ সুস্টার ২১শে মে তারিখের Economistএ জার্ম্মেণীর বৈদেশীক বাণিজ্য সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখেছেন। একটা জিনিষ এই প্রবন্ধে বেশ পরিষ্কার করে দেখান হয়েছে যে জার্ম্মেণীর ব্যবসা বাণিজ্য প্রধানতঃ চলে বৃটিশ সাম্রাজ্য ও জার্ম্মেণীর চারিদিকের দেশগুলি—যারা জার্ম্মেণীর শক্তিতে সন্ত্রস্ত—তাদের সঙ্গে। যাকে এত ভয় ব্যাবসা চলেছে তার সঙ্গে নেহাৎ প্রয়োজনের খাতিরে। বর্ত্তমান জগতের contradiction এখানে চমৎকার ফুটে উঠেছে। রাজনৈতিক মতামত বাণিজ্যের গতিকে ব্যাহত বা দ্রুত করতে পারে, কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ

করতে পারে না। পৃথিবীর অর্থ নৈতিক অবস্থা এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যে কোন দেশ যত গোঁড়া স্বদেশীই হোক না অর্থনৈতিক প্রয়োজনের খাতিরে তাকে অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হবেই। দেশের ভিতরেই সব হবে, বাইরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখব না এই গোঁড়ামি নিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হওয়া যায় কিন্তু কিছুদূর পর্য্যন্তই। এরপর এগুতে হলে দেশের জনসাধারণের ঘোর অনিষ্ট করতে হয়।

ভারতবর্ষও অন্য কোন দেশের সঙ্গে কোন রকম বাণিজ্যের সম্পর্ক রাখবে না এ রকম আজগুবি ইচ্ছা আশা করি অনেকের নাই। সম্ভবও নয়। আন্তর্জাতিক ব্যাবসা বাণিজ্যের মূল কথা হ'ল পারস্পরিক সহযোগিতা। আমরা তাই দেখতে চাই যেন এই সহযোগিতার সুবিধাটা আমরা পুরোপুরি পাই।

আমাদের দেশ যান্ত্রিক উৎপাদন কৌশল ক্রমশঃই গ্রহণ করছে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিজেরা যন্ত্র তৈরী করতে না পারি ততদিন এসব বিদেশ থেকে আমদানী করতেই হবে, এবং আপাততঃ কাঁচামাল রপ্তানি করেই এই আমদানীর বন্দোবস্ত করতে হচ্ছে। তাই মাল বেচাকেনার দিক দিয়ে দেখতে গেলে অন্য দেশের তুলনায় জার্ম্মেণীর সঙ্গে কারবার করা কিছু অবাঞ্ছনীয় নয়।

কয়েক বছর ধরে ওদেশ থেকে আমদানীর ও এখান থেকে রপ্তানির মূল্যের ব্যবধান ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। জার্ম্মেণীর আমদানী কমান ও রপ্তানি বাড়াবার প্রচেষ্টা এখানেও প্রতিফলিত হয়েছে। ওদেশ আমাদের কাছে যতখানি রপ্তানি করবে তার চেয়ে নিজে কেন কম নেবে এ আপত্তি উঠতে পারে। সব দেশের সঙ্গে যদি সোজাসুজি চুক্তি করে ব্যাবসা চলে (Bilateral trade agreement) তবে এ আপত্তির দাম আছে ; আলাদা প্রত্যেক দেশের সঙ্গে আমদানী রপ্তানি সমান রাখতে হবে। আমাদের দেশের সঙ্গে এরকম বাণিজ্য চুক্তি বেশীর ভাগ দেশেরই নাই (একদম আছে কিনা ঠিক জানি না)। তাই favourable balance of tradeএর সুবিধা যদি থাকে তবে তা সব দেশ মিলিয়ে এই মিলিত কেনা বেচার ওপর। একটা মাত্র দেশের সঙ্গে কি সম্পর্ক সেটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়। জার্ম্মেণীর সঙ্গে ব্যাবসা বাড়াবার আপত্তি এদিক দিয়েও উঠতে পারে না।

ওদেশের সঙ্গে ব্যাবসা করলে অন্য সব দেশ চটে গিয়ে আমাদের কাছ থেকে আর কিনবে না—এ আপত্তির যুক্তিযুক্ততা বড় কম। সব বড় বড় দেশগুলি এখনও জার্ম্মেণীর সঙ্গে ব্যাবসা চালায় এবং যতদিন লাভবান হবে ততদিন চালাবেও। আমাদের উপর দোষ দেওয়ার অধিকার তাদের অন্ততঃ নেই।

ব্যাবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা জিনিষ আছে যাকে বলে বিশ্বাস (Goodwill)। একই রকমের জিনিষ, একই দাম তবুও একটাকে ছেড়ে লোকে বারবার আর একটাকে কেনে কেন ? আপনার টুথ্‌পেষ্টের কথাই ধরুন না। দোকানে গিয়ে বিশেষ একটা মার্কা (brand) চান

কেন? Quality থেকেও অনেক সময় আসল কারণ হচ্ছে আপনি ওটাতে অভ্যস্ত বলে। নতুন বিজ্ঞাপন দেখে মত বদলাতে পারেন। অন্য কিছু কিনতে পারেন। সেখানেও আপনার impressionএর প্রাধান্য থেকে গেল। Goodwill অবশ্য অনেক কারণেই হতে পারে।

ডাঃ সাখ্‌ট যদি বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে এসে থাকেন তবে বিশেষ করে এই goodwill বাড়াতেই এসেছিলেন। এখানে অর্থনৈতিক যুক্তি ছেড়ে অন্য সব কথা ওঠে। রাজনীতির কথাও এখানে আসে। বাইরের থেকে যদি জিনিষ কিনতেই হয়, পাওয়া গেলে জার্ম্মেণী থেকে সে জিনিষ কিনতেও পারি। কিন্তু জার্ম্মেণী কি সত্যিই আশা করে যে একই রকমের জিনিষ একই দরে দিলে আমরা তার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাব? রাজনৈতিক দিক থেকে দেখলে সে আশার কোন কারণই নেই। টাকাওয়ালা সব ব্যাবসাদারদেব কথা জানি না, কিন্তু দেশের সাধারণ মত নাৎসী জার্ম্মেণীর কার্য্যকলাপ প্রীতির চক্ষে দেখে না। রাজনৈতিক মতামত যাদের আছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তারা ঘৃণা করে বলে অ-বৃটিশ কিছু হলেই তাতে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে না। যে সব সঙ্ঘ জনমতের প্রতিনিধি বলে গর্ব্ব করে তাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে জার্ম্মেণীর প্রতি ভারতের যদি কিছু থাকে তবে তা Political goodwill নয় ঠিক তার উল্টোটা।

জার্ম্মেণীর সঙ্গে বাণিজ্য না বাড়িয়ে বা কমিয়ে সত্যি সত্যি কি আমরা তার অন্য দেশ আক্রমণের শক্তি বা ইচ্ছাকে প্রতিরোধ করতে পারি? তর্ক হয়ত করা চলে যে সমস্ত দেশ যদি জার্ম্মেণীকে বয়কট করে তবে ও নিরুপায় হয়ে পড়বে; বা যে সমস্ত দেশের সঙ্গে জার্ম্মেণীর বিশেষ করে বাণিজ্য সম্পর্ক আছে তারা যদি ভয় দেখায় তবে ও ভদ্র হয়ে যাবে। কিন্তু এই 'যদি' বাস্তবে পরিণত হবে বলে বিশ্বাস করি না। আবিসিনিয়া আক্রমণের সময়ের ইতালীর ওপর economic sanctionsএর মত হাস্যকর একটা কিছু হতে পারে এই পর্য্যন্ত। জার্ম্মেণীর গতি-রোধ করতে হলে রাজনৈতিক উপায়ই একমাত্র উপযুক্ত। তোমরা প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে ওকে সায় দেবে আর আমাদের world peace আর democracy সম্বন্ধে উপদেশ দেবে এ আমরা পছন্দ করি না। জার্ম্মেণী যদি ভাল জিনিষ বা সস্তায় জিনিষ দিতে পারে ব্যাবসার কথা ভেবে না কেনার কোনো কারণ দেখি না। তা যদি না হয় পক্ষপাতিত্ব কেন দেখাব? আর যদি দেয় তবে তাও বা কিনব কেন? 'Empire products'এর জন্যও আমাদের এমন কি good-will আছে?

তোমার ইচ্ছা

অমলেন্দু দাশ গুপ্ত

আমাদের এ-দেশের বাজারে জাপান-দেশের একরকম পুতুল কিনিতে পাওয়া যায়, যা ঠেলিয়া দিলেও কয়েকবার টাল সামলাইয়া সোজা বসিয়া থাকে, কাৎ করিয়া শোয়াইয়া ছাড়িয়া দিলেই আবার খাড়া হইয়া উঠিয়া বসে। পুতুলের নিম্নপ্রদেশে একখণ্ড সীসা এমনভাবে জুড়িয়া দেওয়া হয়, যাতে এমন হইতে পারে।

আমাদের নিতাই শীল ঐ রকম জাপানি-পুতুল। তাকে কাৎ হইতে, অপদস্থ হইতে কেহ কখনও দেখে নাই। দুর্ঘটনা বা দুরবস্থার ধাক্কা যতবারই তাকে কাৎ করিয়া ভূমিশায়ী করিয়া রাখিতে চাহিয়াছে, ততবারই সে ঠিক উঠিয়া বসিয়াছে। নিতাই শীলের মনেও জাপানি-পুতুলের মতই অমনই একটি সীসা কোথাও নিশ্চয় ছিল যার ফলে সর্ব্বদাই তার মনের সাম্য বজায় থাকিত। কাজেই নিতাইয়ের মনের মেজাজটি কখনও বিগড়াইতে দেখা যায় নাই।

বর্ষাকাল। ভোর হইতেই টিপ-টিপ করিয়া বৃষ্টি সুরু হইয়াছে। পথ-ঘাট কাদায় ভরিয়া গেছে, চলিতে গেলে হাঁটু পর্য্যন্ত কাদার ফুল-ষ্টকিং পরিতে হয়। আর কয়টা দিন গেলেই গ্রামের এ-বাড়ী হইতে ও-বাড়ী যাইতে নৌকা ভাসাইতে হইবে। কাপড়ের খুঁটটা গায়ে জড়াইয়া নিতাই ঘরের দাওয়ায় বসিয়া তামাক সেবন করিতেছিল। আর, বাহিরে তাকাইয়া যাবতীয় ভাবনা, যাহা স্বেচ্ছায় মাথায় আসিতেছিল, ভাবিয়া যাইতেছিল। আপাততঃ তার ভাবনার বিষয় ছিল বর্ষা-কালের অসুবিধা সম্বন্ধে। এমন একটা বিশ্রী কালই আর হয়না। বেশী কথার দরকার কি, হাতের ধারেই প্রমাণ মজুত আছে। কালরাত্রেই গাঁজা ফুরাইয়া গিয়াছে, আজ ভোরে তাহা হাট হইতে আনিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এই দিনে হাঁটিয়া যাইতে কেহ পারে কি? না, তাতে কোন সুখ আছে। অবশ্য গাঁজার জন্য দরকার হইলে হাট পর্য্যন্ত সে বুকে হাঁটিয়াই যাইতে পারে, কারণ কষ্ট না করিয়াই কেহ কখনও কেষ্ট পাইয়াছে বলিয়া সে জানে না। তা' ছাড়া, কেষ্টর জন্য কষ্ট পাইতেও সুখ আছে। কিন্তু তাতে বর্ষাকালটার সুবিধা কি প্রমাণ হয়? গাঁজার মহিমাই এতে জানা যায় যে, বর্ষাকালের জলকাদার পথও গাঁজাকে ঠেকাইতে পারেনা।—হাটটা যদি এই হাতের কাছে হইত,—

তাহা হইলে কি হইত তাহা আর জানা গেলনা। নিতাইয়ের স্ত্রী আসিয়া দেখা দিল, কোন রকম ভূমিকা না করিয়াই জিজ্ঞাসা করিল—বলি ইচ্ছেটা কি শুনি?

—শোন, তোমারই ইচ্ছা।

—বসে থাকলেই চলবে, না হাটে যেতে হবে ?

আকাশে মেঘ ছিল, কিন্তু তার গর্জ্জন ও বিদ্যুৎ চমক নিম্নে নিতাইয়ের স্ত্রীর কাছে গচ্ছিত রহিয়াছে দেখা গেল। নিতাই নির্ব্বিকার কণ্ঠে জবাব দিল,—না, যেতে হবেনা।—যেতে হবেনা ? আচ্ছা, কি গেলো দেখব। বলিয়া—নিতাইয়ের স্ত্রী যেমন আসিয়াছিল তেমনই অদৃশ্য হইল। তার চলনে ও বলনে বিদ্যুতের গতি ও জ্বালা দুইই বেশ প্রকট রহিয়াছে।

নিতাই পিছন হইতে ডাকিয়া কহিল,—ওগো শুনছ, শরীরটা ভালো নেই, জ্বরজ্বর ঠেকছে। এ বেলা কিছু খাবনা। নিতাইয়ের স্ত্রী শুনিল, কিন্তু মিথ্যা কথায় বিশ্বাস করিল না, তাই মিথ্যা কথার উত্তর কিছু দিবার দরকারও বোধ করিলনা। তামাক পুড়িয়া বহুক্ষণ আগেই শেষ হইয়া গিয়াছিল, তবু অভ্যাসবশতই নিতাই বহুক্ষণই সে দগ্ধ তামাক টানিয়া যাইতেছিল। রাগ করিয়া কল্কিটাকে এমন ভাবে নামাইয়া রাখিল যেন সে হুঁকার মুণ্ড ছিঁড়িয়া আনিল। কল্কিটাকে আগুনের পাতিলের পাশে নামাইয়া রাখিয়া হুঁকাটা বেড়ার সাথে গুঁজিয়া রাখিয়া দিল।

বসে থাকলে চলবেনা—হাটে যেতে হবে

পাশের বাড়ীর গরুটা ছাড়া পাইয়া উঠানে শশার মাচার কাছে আসিয়া পড়িয়াছে, নিতাই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—যাও, কচি শশা কটা খেয়ে নেও। ভদ্রলোকের বাড়ীর গরু তুমি, গাছের প্রথম ফলে তোমারই অধিকার। তাড়াতাড়ি কর, তিনি এসে পড়লে অদৃষ্টে তোমার দুঃখ আছে। তিনি মানে নিতাইয়ের স্ত্রী কাত্যায়নী ওরফে কাতু।

গরুটাকে তাড়াইয়া বাড়ীর সীমানা পার করিয়া দিয়া নিতাই নিজের বাড়ীর ভিতরে রান্না-ঘরের দুয়ারে গিয়া দাঁড়াইল। কাতু কোলের ছেলেটাকে একটা স্তন ছাড়িয়া দিয়া উনানের সম্মুখে বসিয়া রন্ধনেই ব্যস্ত ছিল। পদশব্দে ঘাড় ফিরাইলনা বা ছেলেটার দখল হইতে স্তন মুক্ত করিয়া লইয়া বুক ঢাকিলনা। কাতু ঘোমটা দেয়না, তাই মাথায় কাপড় টানিয়া দিবার কথাই উঠে না। একবোঝা চুল মাথায় কোনমতে জড় করিয়া রাখিয়াছে। এখানে উল্লেখ থাকে যে, কাতু সত্যই সুন্দরী এবং রূপসী। গ্রামের ভদ্র-অভদ্র অনেকেই সময়ে অসময়ে কেন যে নিতাইয়ের বাড়ীতে আসে বা সম্মুখ দিয়া যাতায়াত করে, তার কারণ অনুসন্ধান করার নিতাইয়ের আর দরকার হয় নাই। কাতু যে বিদ্যুতের গর্জ্জনে ও জ্বালায় ভরা এ সত্য অনেকেই জানিত। তবু রূপপিপাসী-দের যাতায়াতের জোয়ার ভাঁটা বাড়ীর সমুখ দিয়া তেমনি চলিতে থাকিত। কিন্তু কাতুর তটে তরঙ্গ পৌছাইতে পারিতেছিল না। নিতাই দাওয়ায় বসিয়া দেখিত, মনে মনে হাসিত, মনে মনে

গান গাইত,—মা, আমায় ঘুরাবি কত ? চোখ ঢাকা বলদের মত সমুখের পথে যিনি চলেন মুখে তাকে ডাকিয়া বলে,—দা'ঠাকুর, তামাক খেয়ে যান।

—না, নিতাই সময় নেই। বলিয়া দা'ঠাকুর দাওয়ায় উঠিয়া বসেন এবং কেন সময় নাই তার বিশ্বাসযোগ্য কারণ ও যুক্তি দাখিল করেন।

নিতাই রান্নাঘরের দোরগোড়া হইতে ডাকিয়া কহিল—দাও, কি কি আনতে হবে।

কাতু যে ভাবে ছিল সেই ভাবেই থাকিল, কিন্তু উত্তর করিল,—বেশী কিছু না, ভরিটাক গাঁজা আনলেই চলবে।

মনে মনে কাতুর বুদ্ধির মুণ্ডপাত করিয়া ও মনে মনেই মন্তব্য পেশ করিয়া যায়, মেয়ে মানুষ নয় আস্ত একটা শয়তান, মুখে নিতাই হাসিয়া ফেলিল—এ্যাঁ, ধরে ফেলেছ দেখ্ছি। বেশ, তোমার কথাই রইল, গাঁজা আনতেই যাচ্ছি। এখন বল, কি আনতে হবে।

মাথায় ছাতা, কাঁধে গামছা, হাতে ঝুলানো দড়ি বাঁধা বোতল ও একটি মাটির ভাঁড় লইয়া নিতাই শীল হাটের পথে বাহির হইল। জলকাদায় পথ খারাপ হইয়া আছে, আকাশ হইতে টিপ্‌টিপ্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া আসিতেছে, তাকাইয়া দেখিয়া একটা কটু সম্বোধনে নিতাই আকাশের সহিত সম্বন্ধ পাতাইয়া কহিল,—শালা, ঢালবি তো জোরে ঢাল, কি ফ্যাঁচ্‌ফ্যাঁচ্ নাকে কাঁদুনী।

কাতু দাওয়া হইতে শাসাইয়া দিল,—ছাতাটা পার যদি আবার ফেলে এস। ছাতাটা নিতাইয়ের নিজের নয়, তার শ্যালকের অর্থাৎ কাতুর দাদা গোপীনাথের। এটা সে ভুলে সেদিন ফেলিয়া গিয়াছে।

নিতাই কহিল,—আচ্ছা।

পথ চলিয়া খালের কাছে নিতাই আসিয়া গিয়াছে। খালে ইতি মধ্যেই বেশ জল হইয়াছে। নদীতে জল বাড়িলে তার ছিঁটে ফোঁটা এদের ভাগ্যেও জোটে এবং তাতেই এদের পূর্ণোদর স্ফীতি হইয়া যায়। ছোট খাল, কতইবা আর জলের চাহিদা।

লোকজনেরা জাল ফেলিয়া খালের জল হইতে মাছ ছাঁকিয়া তুলিতে চাহিতেছে, কিছু কিছু যে না পাইতেছে তা নয়। দিগম্বর ও দিগম্বরী ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে। খালের এপার ওপার হইবার জন্য বাঁশের পুল হইয়াছে। নিতাই পুলের গোড়ায় আসিয়া উঠিতে গিয়া বাধা পাইল। মৎস্যশিকারীদের একজন ডাকিয়া কহিল,—শীলেরপো' নীচ দিয়েই যাও, পুলটা ভালো নয়। শীলের তনয় পরামর্শ গ্রাহ্য করিল না; ব্যাটাদের মতলব তাকে জলে সাঁতার কাটায়। পুল থাকিতে জল ভাঙ্গিয়া যাইবে, নিতাইকে বাহির হইতে কি সত্যই এত বোকা দেখায়! ছাতা মাথায় গামছা কাঁধে বোতল ভাঁড় হস্তে লইয়া নিতাই পা চালাইয়া বাঁশের পুলের উপর চড়িয়া বসিল। গুটি গুটি পা ফেলিয়া নিতাই পুলের মধ্যভাগে আসিয়া পৌঁছিল। সেখান হইতে মাথা সোজা করিয়া নিতাই চারিদিক তাকাইয়া দেখিল, উদ্দেশ্য উঁচুতে উঠিলে

নীচুকে ও তার অধিবাসীদের কেমন দেখায় আর একবার জানিয়া লওয়া। তেঁতুলগাছে একবার শকুনের বাসা ভাঙ্গিতে নিতাই উঠিয়াছিল। গাছের মাথাটার দিকে নীচু হইতে চাহিয়া দেখিতেই মাথা ঝিম ঝিম করে, সেই গাছের সবচেয়ে উঁচুতে উঠিয়া উর্দ্ধে-উঠার কি আস্বাদ নিতাই জানিতে পারিয়াছিল। শক্তমুঠায় ডাল ধরিয়া থাকিতে হইয়াছিল, নীচের মাটি কেবল টানিতেই ছিল, মাটির মানুষ শূন্যে উঠিবে এ যেন সহিতেই পারিতেছিল না। পুলের মধ্যভাগে আসিয়া নিতাই কেন যে ভাবিল, এখন পড়িয়া গেলে কেমন মজা হয়। অন্তর্য্যামী যিনি তিনি নিতাইয়ের অভিলাষ টের পাইলেন কিনা জানিনা, তবে একথা ঠিক যে জলকাদায় পুলের বাঁশ অতিশয় পিছল হইয়াছিল আর ঐ মধ্যভাগেই পুলের দুর্ব্বল মানে ভাঙ্গন স্থান ছিল যা নিতাইয়ের নজরে পড়ে নাই। খালপারের সকলে সবিস্ময়ে ও দিগম্বর-দিগম্বরী শিশু সম্প্রদায় সানন্দে দেখিতে পাইল যে, নিতাই শীল ছাতা মাথায় এবং হাতে বোতল ও ভাঁড় ঝুলাইয়া লইয়া পুল হইতে নীচে জলের দিকে বিদ্যুৎগতি নামিয়া যাইতেছে। ছেলে মেয়েগুলি চেঁচাইয়া উঠিল। এমন মনোরম ও উপাদেয় দৃশ্য তারা শীঘ্র উপভোগ করিতে পায় নাই বুঝা গেল। কিন্তু মাথাটা নীচু করিয়া ও ঠ্যাং উপরের দিকে রাখিয়া নিতাই নামিতেছে কেন—ঝাঁপাইয়া পড়াতো এরূপ কায়দায় তাহারা কখনও করে নাই। ছাতাটা পুলের পাশে লাগিয়া উল্টাইয়া গিয়াছিল—কিন্তু নিতাইয়ের হাতের মুঠা হইতে তাহা ছুটি পায় নাই তখনও। কাতু বারণ করিয়াছে যে, ছাতি হারাণো চলিবেনা। সশব্দে নিতাই জলে পড়িল এবং তলাইয়া সেই জলেই অদৃশ্য হইল। ঘটনাটি ঘটিতে কয়েক পলক মাত্র লাগিয়াছিল কিন্তু খালপারের সবাই চোখের পলক মাত্র না ফেলিয়া চোখ পূরা মেলিয়া নিতাইয়ের পতন দেখিয়া লইয়াছিল।

মাথাটা নীচু করিয়া ও ঠ্যাং উপরের দিকে রাখিয়া নিতাই নামিতেছে কেন?

ক্ষণপরেই নিতাইয়ের মাথা জলের উপর জাগিয়া উঠিল। কিনারার কাছে আসিয়া পায়ে জমি পাইয়া নিতাই খাড়া হইয়া দাঁড়াইল।

বুড়া গোছের একজন জিজ্ঞাসা করিল—লাগেনি তো? নিতাইকে যে সাবধান করিয়া দিয়া নীচ দিয়াই যাইতে পরামর্শ দিয়াছিল, সে নিতাইয়ের পতন হইতে জলে ডুবিয়া ওপরে ভাসিয়া-উঠা পর্য্যন্ত কোনমতে ধৈর্য্য টিকাইয়া রাখিয়াছিল, আর রাখিতে পারিলনা। লাগিয়াছে কি লাগে নাই পরে জানিলেই চলিবে। আগে বক্তব্যটা

জানাইয়া দেওয়া চাই যে, তাই কহিল, —কেমন হোলত ? এত করে বারণ করলাম যে, নীচ দিয়ে যাও, কথা কানেই গেলনা। এখন ঠেলা বোঝ শীলের পো।

এতক্ষণে নিতাই ভাঙ্গা হাঁড়ির কাণা ও বোতলের অর্দ্ধেকটা দড়িতে ঝুলাইয়া জল হইতে মাটিতে উঠিয়াছে, বক্তাকে ডাকিয়া কহিল—ওহে, তোমার কথাই রাখলাম, নীচ দিয়েই এলাম।

কিন্তু ছাতা নেই—মুঠা আলগা হয়ে কোন ফাঁকে তা' খসিয়া ভাসিয়া গেছে, নিতাই জানিতে পারে নাই। কয়েকজনে খোঁজ করিল, কিন্তু ছাতা ফিরিল না। গোপীনাথের ছাতা, তাই কি নিতাই কহিল,—শালার ছাতা, সোঁতে কোথায় গিয়ে ঠেকেছ, এখন মর খুঁজে। কিন্তু নিতাই খুঁজিয়া মরিল না।

খালপারের লোকগুলি নিতাইয়ের উত্তর ও কথাবার্ত্তায় হাসিতে লাগিল। নিতাই আবার পথ ধরিল, হাটের দিকে নয়, বাড়ীর দিকে।

রান্নাঘরের দুয়ারে ভাঙ্গা হাড়ি ও ভাঙ্গা বোতল দড়িতে ঝুলাইয়া লইয়া আসিয়া নিতাই দাঁড়াইল এবং ডাক দিল—ওগো, শুনছ।

ওগো, শুন্‌ছো ?

ওগো শুনিবার জন্য চমকাইয়া ঘাড় ফিরাইয়া আরও চমকাইয়া হাঁ করিয়া রহিল।

নিতাই হাড়ির কাণা ও অর্দ্ধেক বোতল দুয়ারে নামাইয়া রাখিয়া কহিল,--তোমার কথাই রইল, ছাতাটা দিয়ে এসেছি।

—দিয়ে এসেছ ?

হাঁ, গঙ্গার জলে। কাত্যায়নীর বাকস্ফূর্ত্তি পাইতেছিল না। নিতাই এই ফাঁকে ব্যাপারটা সবিস্তারে বলিয়া গেল। বলিয়া চলিয়া যায় দেখিয়া কাতু পিছন হইতে গর্জ্জন করিয়া কহিল,—এ দুটোকে আবার রেখে গেলে কেন ? ফেলে দিয়ে এস।

নিতাই ফিরিল না, শুধু একটু থামিল মাত্র। কহিল,—ওদুটার কথা তো তুমি তখন কিছু বলনি। নেও তুলে রাখ।

কাতু কহিল—ঢং আর কি। নেও, ফেলে দিয়ে এস। হাত পা ভাঙ্গেনি তো।

নিতাই হাত টান করিয়া ও সোজা হইয়া হাটিয়া দেখাইল যে, সবই ঠিক আছে, বেকল বা জখম হয় নাই। কিন্তু হাড়ির কাণা, বোতলের অর্দ্ধেক রান্নাঘরের দাওয়াই রহিল, কাতুর হুকুম নিতাইকে ফিরাইতে পারিলনা।

নিতাই বলিতে বলিতে গেল, যেন জপ করিতেছে—গুরু, তোমারই ইচ্ছা।

প্রকৃতি

কানাই সামন্ত

কী সুন্দর! কয়েকদিন বাদলার পরে আজ সকালে রোদ হয়েছে। রোদে ভ'রে গেছে আকাশ, ভ'রে গেছে উঠোন। উঠোনে জরাজীর্ণ চৌকীর ছায়ায় ঘুমুচ্ছে বেড়ালটা। বাঁশ বাখারীর বেড়া ঢেকে হাসচে অপরাজিতার ফুল আর উচ্ছের পরিপক্ক হলদে ফলগুলি। তারের উপর মেলে দেওয়া আছে ভিজে কাপড়। করবীর ডাল একবারে নীল আকাশের গায়ে তুলে ধরেচে কয়েকটি রাঙা রঙের পুষ্পস্তবক।

এইমাত্র। কিন্তু, কী সুন্দর! কী আশ্চর্য! দিব্য চক্ষের তুর্লভ দর্শন সম্বন্ধে সঞ্জয় যা বলেছিলেন, সামান্য এই চোখের সুলভ এই দেখার সম্বন্ধেও তাই বলতে হয়! হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।

চিরবিচিত্রা ও অচিন্তানীয়া এই প্রকৃতি। যুগে যুগে মানবের আনন্দ ও জিজ্ঞাসা আকর্ষণ ক'রেও কখনো হয়তো কোনো উপলব্ধির ভিতরে, কিন্তু সতত সকল ব্যাখ্যার বাইরে র'য়ে গেছে। ব্যাখ্যার বাইরেই র'য়ে গেছে, তাই নিঃশেষ তত্ত্বনির্ণয় তো অসম্ভব; অপূর্ণ উপলব্ধির সম্পূর্ণ ভাষাই বা কোথায় পাওয়া যায়?

নিখিল জীবনের উৎস প্রকৃতি। কিন্তু, নিখিল জীবকে জন্ম দিয়ে জীবজননী স'রে দাঁড়ায়নি পশ্চাতে, অথবা অনাদি অনন্ত নাট্যের মূক মঞ্চরূপে প'ড়ে রয়নি পদতলে। চঞ্চল জীবনের চঞ্চল ভূমিকারূপিণী সমান্তরাল রেখায় সঙ্গে সঙ্গে চলে, অথচ কখনো কোনো স্পর্শে প্রভাবিত করে না এ জীবন, এমন কথাই বা কী ক'রে বলব? বস্তুতঃ দেখি, তরুলতা পশুপক্ষী শুধু নয়, মানুষও প্রকৃতির শিশু। এমন কি গর্ভস্থ শিশুর মতই; এখনো নাড়ীতে নাড়ীতে যোগ রয়েচে, একের ক্ষুৎপিপাসা রসরক্ত তুষ্টিক্ষোভ অন্যে সঞ্চারিত হচ্চে সততই এবং নিত্যযুক্ত এই সম্বন্ধে জীব ও জননীর ভেদ বা বিরোধ একান্তই মনঃকল্পিত ব'লে জানচি।

এরূপ কল্পনা করা যেতে পারে, প্রকৃতির মধ্যে মানুষ শত তার বীণাযন্ত্রবিশেষ। প্রকৃতির অলক্ষ্য করস্পর্শে দিনে রাতে বাজচে আলো-ছায়াভেদে, ঋতুতে ঋতুতে বাজচে আবহাওয়া ভেদে। শতবিধ আঘাতে শতবিধ সুর উঠচে তারে তারে, অলক্ষ্যে মিলে মিশে যাচ্চে জীবনে: কেবল মানুষকে নিয়ে ছিল যে মানুষের সংসার, যে প্রেমঘৃণা, বিশ্বাসসংশয়, সুখতুঃখ, সেখানে ঐ সুরের মোহিনী মায়া কাজ করচে; সেখানেও থাকচে না মানুষের উগ্র স্বাতন্ত্র্য। মানুষের জীবন অন্তরে বাহিরে প্রেরিত হয়ে মিলবে নিখিল জীবনের ছন্দে—অনন্ত শূন্যের সূর্য্য-চন্দ্র-তারার উদয়াস্তের দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত।

এ কথা কি এত সহজেই মেনে নেবার? বিশ্বছন্দ কথাটি অবশ্য কবিতায় শুনতে ভালো।

কিন্তু, কবিতায় আরো তো অনেক অসম্ভব অমূলক কথা শোনায় ভালো। রহস্যময় ভবিতব্যের লুক্কায়িত লিপি পাঠ করবে ব'লে গ্রহ নক্ষত্রের উদয়াস্তের সঙ্গে মানব জীবনের যোগ খুঁজেছিল বটে মূঢ় কল্পনা। কিন্তু, সেও হ'ল সুদূর অন্ধকার যুগের কথা। আজ সে চেষ্টার পরিণতি দেখি পরীক্ষা ও প্রমাণমূলক উন্নত জ্যোতির্বিজ্ঞান।

অবশ্য, এ কথা স্বীকার করতে হবে এ প্রবন্ধ গদ্য কবিতা নয়; আর এর উদ্দেশ্যও নয় সামুদ্রিক বিদ্যার মূল্য নির্ণয় করা। তবু, স্বতঃপ্রমাণিত ব'লে ধরে নিতে হচ্ছে যে প্রকৃতি ও মানুষের সম্বন্ধে চরম সত্য হ'ল বিরোধহীন বাধাহীন ঐক্য, আর সেই ঐক্যকেই সজ্ঞানে সমৃদ্ধভাবে অনুভব করবে ব'লে ক্রমপ্রবৃদ্ধ স্বাতন্ত্র্যাভিমানে মানুষ করেচে বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহে ভিতর থেকে বাইরে থেকে প্রকৃতিই দিয়েচে প্রেরণা; এবং বুদ্ধিবিকাশকারী বুদ্ধিবিভ্রান্তকারী এই বিদ্রোহের ইতিহাসই হ'ল মানব সভ্যতার ইতিহাস।

তাই, মানুষ নগ্ন দেহ আবৃত করেচে পরিচ্ছদে। অনায়াসলভ্য গুহাগহ্বর বৃক্ষতল পরিত্যাগ ক'রে গ'ড়ে তুলেচে লোকালয়। উদ্ভাবন করেচে যন্ত্র, যান, আয়ুধ। আয়ত্ত করেচে অগ্নি, বায়ু, বাষ্প, বিদ্যুৎ। কল্পনা করেচে ভাষা, শিল্প, নীতি, ধর্ম, স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর। সুতরাং আপাতঃদৃষ্টিতে মানুষ হ'য়ে পড়েচে কৃত্রিম ও অস্বাভাবিক। বিশাল স্বভাব থেকে বিচ্ছিন্ন। শঙ্খ যেমন আপনার দেহ ঘিরে কঠিন আবরণ সৃষ্টি ক'রে সারা জীবন তাই ব'য়ে বেড়ায়; তাতে হয়তো তার বিপদবারণ হয়, কিন্তু জীবন থেকে বাদ পড়ে শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের অনেক ঐশ্বর্য, তেমনি অনেক মানুষ আয়ুর অধিকাংশই স্থূল সভ্যতার আবরণে আবৃত হ'য়ে জীবন যাপন করে ও বঞ্চিত হয় সত্য। আবরণের অন্তরে মানুষ তবুও মানুষই থাকে; মানুষের মন থাকে মানুষেরই মন; সাধনায় সংঘাতে বা সহসাই যখন ঐ আবরণ ঘুচে যায়, আপনাকে এক ব'লে অনুভব করে সে অসীম বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে। আর, সভ্যতার ভিতরে লালিত হয়ে সকল মানুষই যে সর্ব্বপ্রকারে ঐ আবরণে আবৃত হ'য়ে জীবন কাটায়, তাও সত্য নয়। অন্য প্রকার মানুষও আছে। আছে কবি, বাউল, প্রেমিক, সাধু। তাদের দেখেই বুঝি মানব জীবন যত সমৃদ্ধ হয় সত্যকার কল্পনায় উদ্যমে জ্ঞানে, তত সমৃদ্ধ হয় প্রকৃতি ও মানুষের সম্বন্ধ। বিরল হ'লেও এরূপ মানুষের জীবন দিয়েই প্রমাণিত হয়, সভ্যতা মানেই অস্বাভাবিকতা নয়।

কিন্তু, স্বভাবকে বিশেষ করে চায় মানুষের হৃদয়। সুতরাং মানুষের হৃদয়ের সৃষ্টিতেই স্বভাবের বিশেষ প্রকাশ দেখি। প্রেমে, উপাসনায় ও শিল্পে। প্রকৃতি এখানে আপন মুখাবগুণ্ঠন খুলে ফেলে দিয়ে দেখা দিয়েচে আপন প্রিয়কে। আনন্দে হাসিতে আলোয় উদ্ভাসিত হয়েচে শাশ্বত সম্বন্ধ। ফলতঃ যেখানেই প্রেম, যেখানেই ভক্তি, যেখানেই রসরূপ (সঙ্গীত, কবিতা, চিত্র, মূর্তি, অভিনয়, সব শিল্পকেই এই অতি ক্ষুদ্র অভিধানে নির্দেশ করা চলে), সেখানেই যে কোনো নামে বা যে কোনো রূপে হোক্—প্রকৃতি।

সাধারণ দৈনন্দিন জীবনেও প্রকৃতির সর্ব্বব্যাপী প্রভাব এড়ানো কঠিন। যখন কালবৈশাখীতে

কুটীরের চাল উড়ে যায়, বা ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হয় গৃহ, বা তুফানের ঘূর্ণাবর্তে প'ড়ে ডুবে যায় নৌকা, তখনকার কথা বলিনেঃ তখন তা ঝঞ্ঝা ভূকিকম্প বা তুফানের উৎপাত ব'লে মনে হয়, মন যায় না কোনো অতর্কনীয়া সত্তা বা শক্তির সন্ধানে, আতঙ্কে হৃদয় অন্ধ হ'য়ে থাকে চক্ষু বুজে। তবে যার নেই ভয়, যে মনে করে না ওকে পীড়ন, তুফানে ঝঞ্ঝায় সে সমভাবেই দেখে আনন্দময়ী নৃত্যময়ী প্রকৃতির লীলা এবং নিজের উচ্ছলিত আনন্দে একীভূত হয় ঐ লীলার সঙ্গে। প্রকৃতির দক্ষিণামূর্তিই আমাদের প্রিয়; আমরা দেখেচি মায়ের মধুর বা উদাস বা বিষণ্ণ হাসি প্রভাতে সন্ধ্যায়ঃ কখনো একটু যদি ভ্রুকুটি কুটিল হয়েচে ললাট কখনো হয়তো তাও ভালো লেগেচে; তবু কিন্তু কাপালিকের মত উল্লাসে নৃত্য করতে পারিনে শ্মশানে মৃত্যুরূপা কালীর অট্টহাস্যোন্মুখর উন্মত্ত-নৃত্যের তালে তালে।

তা না হয় নাই পারলাম। তবুও হৃদয় তুলিয়ে দিয়েচে আর দেহের রোমে রোমে প্রবেশ করেচে প্রকৃতির আরো তো কত রূপ, আরো তো কত ভাব। কতবার অভয় দিয়েচে, সান্ত্বনা দিয়েচে, সুখ দিয়েচে, মানব জিজ্ঞাসাকে দিক দেখিয়েচে বা জিজ্ঞাসার উত্তরও দিয়েচে এই প্রকৃতি। কখনো অনুকূল স্পর্শে অনুকূল ভাব জাগিয়েচে; আবার কখনো প্রবল প্রতিকূলতাকেও পরাভূত ক'রে আপন একচ্ছত্র প্রভাব বিস্তার করেচে শরীরে মনে। তাই মানুষকে মনে হয় প্রকৃতির বীণাযন্ত্র; যদি একেবারে মরচে-পড়া না হয় বা ছিঁড়ে না যায় তার, তবে যখন যে সুরে বাজায় প্রকৃতি সেই সুরেই বাজে।

আকস্মিক প্রবল শোকে হয়তো দ্বিপ্রহরের মুখর উজ্জ্বল জগতে নামে স্তব্ধতা, অন্ধকার; শূন্য মনে হয় সব। কিন্তু শোকের সে প্রবলতা দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতিরই অলক্ষিত করস্পর্শে তো শান্ত হয়; সুহৃদসজ্জনের মৌখিক সান্ত্বনায় বা বৈরাগ্য শতকের শ্লোক পাঠে নয়। একদিন আবার সে সহজে খুসী হয়; খুসী হয় তার দেহ মন প্রভাতের সানন্দ আলোকে জেগে উঠে।

অবশ্য, গ্রাসাচ্ছাদনের যার ভাবনা নেই, মায়ের আছে স্নেহ, প্রিয়ার আছে প্রীতি, চর্চা আছে কবিতাকলার, অপেক্ষাকৃত সহজে মেলে তার প্রভাতের খুসী। অপেক্ষাকৃত সহজে মগ্ন হয় সে সন্ধ্যার উদাস বৈরাগ্যে বা রাত্রির অতলস্পর্শ ধ্যানে, বৈরাগ্য বা সমাধি যার আজন্ম স্বভাবসিদ্ধ বা আবাল্য সাধনার বিষয়। কিন্তু, তা নইলেও পলায়ন বা চিত্তবৃত্তিনিরোধ ভিন্ন প্রকৃতির বিশাল প্রভাবকে একেবারে অতিক্রম করার উপায় নেই কারো। আমরা যারা নিতান্তই সাধারণ, অথচ পলায়নের পক্ষপাতী নই এবং চিত্তবৃত্তিনিরোধেও অক্ষম, সে সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিতে পারি।

গভীর উপলব্ধি থেকে সাক্ষ্য দিতে পারি, সূর্যের অক্ষয় উৎসমুখে প্রকৃতি অজস্রভাবে ঢেলে দিয়েচে যে উত্তাপ যে আলো, তা ছাড়া জাগত না কখনো জীবন ও চেতনা। মানুষের জীবন ও চেতনা ঐ উত্তাপ ও আলোর টানা-পোড়েনেই বোনা, অথবা যেন ওদেরও রূপান্তর। প্রাচীনেরা বুঝেছিলেন বলেই সূর্যের বন্দনা উপাসনা করেছিলেন ত্রিসন্ধ্যা, অথবা বলেছিলেন পরাৎপর

পুরুষের অধিষ্ঠান ঐ সূর্যে। আধুনিক বিজ্ঞানের বক্তব্য বৈজ্ঞানিকে বলতে পারেন। জানি, মূক বৃক্ষলতার সর্বাঙ্গে সর্বদা মুদ্রিত রয়েচে এ সত্য, বিকশিত হয়েচে তাদের পুষ্পপল্লবে, অবশেষে পরিণত হয়ে পরিপক্ক ফলভারে ঋণ শোধ করচে মাটির।

আমাদের এই ক্ষুদ্র গ্রহে সূর্যের হাত দিয়ে পেয়েচি প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ দান; তাই, পূর্বেই বলেচি, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সহজেই উৎফুল্ল হয়েচে দেহ মন। সে উৎফুল্লতা হয়তো ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র জীবনের হিসাবে অনেকটা অহেতুক। হয়তো শোক, হয়তো জরা, হয়তো ব্যর্থ জীবনের বেদনা জীবনের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে পূর্বেই, এবং তা নিয়ে পূর্ব দিন সন্ধ্যায় বোবা হয়ে ব'সে থেকেচি একা ও পূর্ব রাত্রের অশ্রু কলঙ্ক হয়তো এখনো দেখা যায় চোখের কোলে। তা যাক্। অবোধভাবে তবুও খুসী হতে হয়; মন বাধা দিলেও দেহ খুসী হয় নূতন এই প্রভাতে, ভুলতে হয় বাস্তবিক বিষাদ ব্যথা, অথবা চেষ্টা ক'রে মনে আনলেও অর্থ কিছু তার বোঝা যায় না।

দিবা দ্বিপ্রহরে কর্মময় উদ্যমময় বিশাল জগৎ গ্রাস ক'রে নেয় ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, আমল দেয় না তার স্বাভাবিক আলস্য বা আশাহীনতাকে।

তারপরে আসে ছায়া দীর্ঘ ক'রে বিকেল বেলা। গল্পগুজবে বা দিনের দুর্ভাবনার জের টেনে যদি না [illegible] করা যায়, দীর্ঘ হয়ে ছায়া পড়ে অন্তরে; ক্রমে বাহিরে অন্তরে বর্ণান্তর হয় আলোকের এবং অস্ত সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে যেন অস্তমিত হয় জীবনের কত কিছু নিঃসঙ্গ মানুষের নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস মিশে যায় বাতাসে। গাছের পাতা নড়ে না; পাখী ঘুমিয়ে পড়ে; নির্বৃত মানুষ চায় ঊর্ধ পানে।

আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য একে একে তারাগুলির প্রকাশ অন্ধকার রাত্রিতে। মনে হয়েছিল সূর্যের সঙ্গে পশ্চিম সাগরে ডুবে গেছে সব; তা তো নয়। একটি সূর্য নয় অসীম প্রকৃতিতে; অগণ্য নক্ষত্রে নক্ষত্রে সূচিত হয় তারই অগম অসীমতা। কারণ, সূর্যে জগৎ আলোকিত হয়েছিল—যে প্রকৃতি, ঐ আলোতেই ছিল সে সীমাবদ্ধ। ঐ আলোকাবরণ উঠে যেতেই দেখা গেল আবার অনন্ততর দূরের আভাস, অসীমতর প্রকৃতি। মগ্ন হ'য়ে গেল মন সুধাসমুদ্রে ঘটের মত। কিন্তু, যেক্ষেত্রে এই পরম উপলব্ধির যোগ্য হয়নি দেহ মন, সুপ্তি এল, ক্ষণিক মৃত্যু এল অমৃতের তটে। মহাকবি ব্যাস বলেছেন অন্য ভাষায়; সর্বভূতের যা দিবা মুনির পক্ষে তাই রাত; সর্বভূতের রাত্রিই মুনির দিবা।

সূর্য। তারা। আরো আছে চাঁদ। তিথিতে তিথিতে ক্ষয়বৃদ্ধিশীল চাঁদের চন্দ্রিকা। কবি, প্রেমিক, এমন-কি অকবি-অপ্রেমিকের চিত্তেও জাগায় সে জাগর স্বপ্ন। জ্যোৎস্না যেমন সূর্যের প্রতিফলিত জ্যোতি, স্বপ্নেও তেমনি জাগ্রত চেতনার দূরান্তরীণ মায়া। জ্যোৎস্না মায়াবিনীকে পরাভব করা কঠিন। আচার্য শঙ্করের অমন যে মোহমুদ্গর, হয়তো শূন্যে প্রতিহত হ'য়ে সেও নিষ্ফল হ'য়ে যায়।

এই পর্যন্তই। রচনা বৃথা দীর্ঘ না ক'রে স্বীকার করা যাক্ বিচিত্র মানবচিত্তে ঋতুর বিচিত্র প্রভাব। আশ্চর্য এই প্রকৃতি। মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধও অতি আশ্চর্য।

এ সম্বন্ধে যা কিছু বলবার চেষ্টা করা গেল, তা বোবার ভাষার মতই ইঙ্গিতময় ও অসম্পূর্ণ। যা বলবার কল্পনাও করতে পারতাম না, তা বলেছেন পূর্বগামী কবিরা কখনো একটিমাত্র কবিতায়, কখনো একমাত্র শ্লোকে। স্বভাবতঃই মনে পড়ে 'পরিশেষ' কাব্যে 'সাথী' কবিতাটি। চিরদিন প্রকৃতি কবির সাথী; যৌবনে রঙীন প্রেমবেদনার সাথী, পরিণত বয়সে সাথী স্তব্ধ ধ্যানের; একই সেই প্রকৃতি, একই সেই অশ্বত্থ নারিকেল, অতি পরিচিত গাছপালা প্রকৃতির এই আরেক দিক। প্রকৃতিতে সর্বদাই আছে সব রূপ, সব ভাব। মানব চিত্তের উত্তরোত্তর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর তারই প্রকাশ।

কারণ, আষাঢ়ের এমনই এক বেলায় (এমন বাষ্পগম্ভীর অথচ রৌদ্রকরুণ অপরাহ্নে) দেখেছি নিরঞ্জনাতীরে নব মেঘের ছায়া সম্পাতে নীল গিরিশ্রেণী, আর আমার মনে হয়েচে: সিদ্ধার্থ যখন প্রথম এসেছিলেন এ পথে, উত্তরহীন নীলাম্বরে এই নীল গিরিগুলি অঙ্কিত করেছিল নীরব প্রশ্নমালা; সিদ্ধার্থ বসেছিলেন যখন অটল ধ্যানের আসনে, ধ্যানস্তব্ধ ছিল এরা; যেদিন সিদ্ধ হলেন তিনি সুজাতার প্রীতিপূত পায়সান্ন গ্রহণ ক'রে, নির্মেঘ প্রভাতে সিদ্ধির হাসি হেসেছিল এই গিরিগুলিই অঙ্গে অঙ্গে বনোপবনের উৎফুল্ল শোভায় আর আপাদশীর্ষ আলোকের স্নানে, নিঃশব্দে বলেছিল, দেখেছি, পেয়েছি; তারপর সংসার থেকে অন্তর্ধান করেছেন সেই মহাপুরুষ;— প্রকৃতির গভীরে লীন হয়েচে সেই অপূর্ব উদ্ভাস। সার্ধ দুই সহস্র বৎসর পরে আজ সবিস্ময়ে চেয়ে দেখচি, এ কি শুধু মূঢ় পাহাড় আর মূক প্রকৃতি! দৃষ্টির অসম্পূর্ণতা আমার।

* * * * * *

প্রকৃতি তবে কী?—সমস্ত নিয়েই প্রকৃতি। জড় নিয়ে, চেতন নিয়ে। উদ্ভিদ, পশু, পক্ষী, মানুষ নিয়ে। মানুষের ভিতর হৃদয় নিয়ে, বুদ্ধি নিয়ে, আত্মা নিয়ে। যাত্রিজনের চলার পথে যেমন নিয়ত উন্মোচিত হয় নব নব দিগ্বলয়, চেতনার চিরাভিযানে তেমনি প্রকাশ পায় চির নবায়মানা প্রকৃতি: যে দেখে আর যা দেখে সব নিয়েই প্রকৃতি। বাহ্য দেশে কালে এবং চেতনার অনন্ত স্তরে অপ্রকাশের সমগ্র প্রকাশই প্রকৃতি।

ভারতীয় রাজনীতির রামায়ন

খাওজা আহাম্মদ আব্বাস্

বোম্বে মিউনিসিপ্যাল মিউজিয়ামে দুটী মাইন দর্শকের জন্য রাখা হোয়েছে। বিগত ইউরোপীয় যুদ্ধে জার্মান রণপোত "এমডেন" ভারত মহাসাগরে—এই মাইন দুটী স্থাপন ক'রেছিল। সে আজ বিশ বছরের কথা। ইতিহাসের অমোঘ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে আজও জার্মান 'ফুয়েরের' ভারতীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার দুরভিসন্ধি ত্যাগ করেননি। কিন্তু এবার মাইন বা টরপেডোর সাহায্যে নয়—প্রচার ও ষড়যন্ত্র হোল এবারকার নূতন অস্ত্র। সুরুতে সামান্য হোলেও নাৎসী গবর্ণমেন্টের ন্যায় রাশিয়া-বিরোধী দুই শক্তি—ইটালি এবং জাপান—ভারতে অনুরূপ প্রচার কার্য্যে মন দিয়েছে।

ম্যাপ দেখলেই বোঝা যাবে সমর-নায়কদের ভারত সম্পর্কে এত আগ্রহ কেন। পাশ্চাত্যে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অটল ভিত্তি-ভূমি হল ভারতবর্ষ। সাম্রাজ্যবাদী এই তিন শক্তিরই এ সমান লোভনীয়। ভারতের বিপুল জনশক্তি—এবং রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিকও ভৌগলিক সংস্থিতির একটা বিশেষত্ব আছে। উত্তর-পশ্চিমে আফ্‌গানিস্থান ও ইরান এবং উত্তর-পূর্ব-পশ্চিমে চীন তাছাড়া ভারতবর্ষও সোভিয়েট রাশিয়ার সান্নিধ্য—এ যোগাযোগের উপর ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলির প্রতীচো পররাষ্ট্রনীতি অনেকটা নির্ভর করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের সহিত ভারতের মৈত্রীবন্ধন এবং সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন ভারত, এই ত্রিশক্তিরই উচ্চাশার পথে সমান কণ্টকস্বরূপ। অপরপক্ষে যদি ভারতবর্ষকে ফ্যাসিষ্ট আদর্শ অথবা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রভাবে অনুপ্রাণিত করা যায়—তবে পূর্ব মহাদেশে ফাসিজিমের একটি প্রধান আশ্রয়-দূর্গ হবে।

বর্তমান ভারতের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের দরুণই এ ধরণের প্রচার সম্ভব হোচ্ছে—স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলে যে দেশাত্মবোধ জেগেছে—ফ্যাসিষ্ট স্বার্থসিদ্ধির জন্য তা কাজে লাগানো সম্ভব—এ বিশ্বাস রয়েছে এর মূলে। একটু ইতিহাস আলোচনা করলেই এ বিশ্বাসের কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। বিগত মহাযুদ্ধের সময়—প্রুশিয়ার রাষ্ট্রধূরন্ধরগণ ইয়োরোপপ্রবাসী ভারতের ক'জন বিপ্লবীর সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ স্থাপন করে। সেদিনের বার্লিন-বোগদাদ সাম্রাজ্যের স্বপ্নজাল—দিল্লীকেও স্পর্শ করেছিল। এ উদ্দেশ্যে জার্মান সরকার প্রবাসী বিপ্লবীদের কিঞ্চিৎ সাহায্যও করেছিল—এবং সে সাহায্যকে মূলধন করে স্বাধীনতা অর্জ্জনের পরিকল্পনাও করেছিল বিপ্লবীরা। কিন্তু এ সকল চেষ্টার অর্থহীনতা উভয় পক্ষই বুঝ্‌তে পেরেছিল; উভয়ের শত্রু গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে একে অন্যকে ব্যবহার করার মনোবৃত্তিই এর মধ্যে ছিল প্রধান। এ সম্পর্কে আপন আত্মচরিত 'Mein kamf' (My struggle) পুস্তকে এডল্‌ফ হিট্‌লার ঘৃণার সহিত বলেছেন—এশিয়ার এসব বিপ্লবী ভণ্ড হোলেও ভারতের স্বাধীনতাকামী হোতে পারে। তারা যুদ্ধের সময় সারা

ইউরোপে ঘুরে বেড়াতো এবং যে প্রকারেই হোক এ দেশের একান্ত যুক্তিবাদী লোকদের মনেও এ দৃঢ় ধারণা দিতে পেরেছিল—যে অচিরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হবে। তারা বুঝতে পারেননি যে তাদের ইচ্ছাই এই চিন্তার মূল কারণ। এ সব যে নিছক পাগলামি তাও তাদের সহজে মনে আসেনি।

অদৃষ্টের এমনই পরিহাস—যে এর ভিতর ক'জন এশিয়ার 'ভণ্ড তাপস'ই ('Mountebanks of Asia) ভারতে নাৎসীবাদের প্রধান প্রচারক। এদের ভিতর এখনও যারা ইউরোপে নির্বাসিত আছে তাদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বভাবগত বিদ্বেষ আছে। নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট গবর্ণমেণ্ট এ বিদ্বেষ আপনাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রয়োগ করছে।

গত বিশ বছরে ভারতীয় রাজনীতির ধাবমান পরিবর্তন হতে বিচ্ছিন্ন থাকায় তারা এখনও পুরাতন মনোবৃত্তি ত্যাগ করতে পারে নাই। ইদানীং ইউরোপে নির্বাসিত ক'জন বিপ্লবীর সাথে আমার দেখা হয়। তারা সকলেই ফ্যাসিষ্ট আদর্শবাদে ঘোর বিশ্বাসী। তারা উচ্ছ্বসিত ভাষায় হিট্‌লার ও মুসোলিনীর প্রশংসা করে। তাদের মতে ভারতবাসীর পক্ষে জার্মেণী, ইটালী ও জাপানের বিরুদ্ধাচরণ অন্যায় এবং ভারতে সাম্যবাদ আন্দোলনের মূলে আছে ইহুদী প্ররোচনা। ভারতের স্বাধীনতা লাভ শুধু একতান্ত্রিকতার আদর্শেই সম্ভব, কাজেই নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট শক্তিগুলি ভারতের মিত্র। এরা হিটলারের কথা ভুলে যায়—"জাতীয় চরিত্রের অবনতিতে বা পরাক্রান্ত শত্রুর আক্রমণে ইংলণ্ড একদিন ভারত হতে বিতাড়িত হবে; কিন্তু ঐ সকল ভারতীয় বিদ্রোহীর কোন আশা নেই। জার্মান স্বার্থানুযায়ী বিচার করলে আমি ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের অধীনে রাখাই প্রয়োজন মনে করি। আমি বর্ণ বৈষম্যতায় বিশ্বাসী। কাজেই জার্মেন জাতির সাথে কোন 'পদানত' জাতির সম্বন্ধ অগৌরবের।"

আর্য (Nordic) জাতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে হিটলার আজও বিশ্বাসী। যেমন পেলেষ্টাইনে অনার্য আরবকে ইহুদীদের বিরুদ্ধে উস্‌কান তার স্বার্থ বর্ণ বিদ্বেষসত্বেও; তেমন ভারতের জাতীয়তা-বাদীদের প্ররোচিত করা তার দরকার। নির্বাসিত ভারতীয়দের মধ্যে অনেকে অত্যন্ত আর্থিক দুরবস্থায় জীবন কাটাচ্ছে, তাঁরা নাৎসী গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা মোটেই নীতি-বিরুদ্ধ মনে করে না। ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ সকল ছদ্ম বিপ্লবীদের কোন প্রভাব নেই।

সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের মনোভাব একতান্ত্রিকবাদ হতে বহু পরিবর্তিত হয়েছে। ৮।১০ বছর আগে ভারতের শিক্ষিত যুবকগণও অনেক সময়ে ইতালী, ফরাসী ও আইরিশ বিপ্লবীদের মত হিটলার ও মুসোলিনীকে সম্মান করত। রাষ্ট্রক্ষেত্রে অনেকের নিকট হিটলার-মুসোলিনি প্রাণশক্তির প্রতীক্ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসের নিশানা দেয়।

ভার্সাইয়ের সন্ধিপত্র হিটলার ছিঁড়ে ফেল্‌লে আমরা উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম। কারণ শান্তি প্রচেষ্টা একান্তই ভুয়া ছিল। জার্মেন প্রত্যাগত অনেক ভারতীয় শিক্ষার্থী জাতীয়তাবাদী সমাজতন্ত্রের (National Socialism) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। নাৎসীদের ভুল করলে যে সকল

চিন্তাশীল মনীষী অকাট্য যুক্তিতে দেখিয়েছেন যে হিটলার অভ্যুত্থানের মূলে ভার্সায়ের সন্ধি তাও ভাল করে বুঝা যাবে না। জাপানের নিকট রাশিয়া পরাজিত হলে বহু ভারতীয় জাপানকে সহানুভূতি ও সম্মানের চোখে দেখত। কারণ সেটা প্রতীচ্যের উপর প্রাচ্যের বিজয়ের প্রতীক। জাপানের বাণিজ্য ও জঙ্গি শক্তির বৃদ্ধিকে অনেকে প্রাচ্যে ইউরোপীয় সাম্রাজ্য বিস্তার প্রতিহত করার একমাত্র উপায় মনে করত।

ইতালী ও জার্মেনীতে ডিক্‌টেটরশিপ অধিষ্ঠিত হলে ভারতীয়গণ একতান্ত্রিকতার নগ্নরূপ বুঝ্‌তে পারল। ইতালীতে সাম্যবাদীদের উপর অত্যাচার, জার্মেনীতে ইহুদী দলন ও মুসোলিনির কাল-কোর্তাদল দ্বারা ইথিওপিয়া অধিকার প্রভৃতি সব মিলে ভারতীয়দের সহানুভূতি সম্পুর্ণরূপে নষ্ট হয়েছে। নাৎসী ফ্যাসিষ্ট রণদানবের উদগ্র মূর্তি ও নগ্ন বর্বরতা প্রকাশ পেয়ে গেছে। ভারতের জাতীয় মহাসভা ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসী অত্যাচারের বীভৎস কাহিনী তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ করেছে।

পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল ভারতীয়গণ সাধারণতঃ জাতিধর্মনির্বিশেষে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, এ অত্যাচার ইতালিয়ান সোসিয়েলিষ্ট, জার্মেন ইহুদী, ইউরোপিয়ান, চাইনিজ বা স্পেনীয় বা যার উপরই হউক। আজকাল একতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ভারতীয় জনমত যে একটা বিশেষ স্বরূপ নিচ্ছে তা শুধু একটা উচ্ছাসপ্রবল প্রতিক্রিয়া নয়। ইহার মর্মমূল আরো গভীর, আরো ব্যাপক। ইহা আন্তর্জাতিক সংযোগে সম্ভব হয়েছে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে দেখা ও সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিজম ও ধনতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে জগতের বৃহত্তর আন্দোলনের সাথে যুক্ত করার কৃতিত্ব অনেকখানি পণ্ডিত জওহরলালের প্রাপ্য। রাষ্ট্রপতি হিসাবে তিনি গত কাউন্সিল নির্বাচনের সময় অসংখ্য সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন ফ্যাসিজম কিরূপ বিপদ্‌জনক ও জাতীয় আন্দোলনের পরিপন্থী। অনেক সময় তিনি দেশব্যাপী শোভাযাত্রা করে স্পেন ও চীনের জাতীয়সংগ্রামে সহানুভূতি জানিয়েছেন। অর্থ সংগ্রহ ও যুদ্ধে আহতদের সেবার জন্য লোক পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক সঙ্কটাপন্ন মুহূর্ত্তেই তার নিজের বক্তব্য ও প্রবন্ধ প্রকাশ করে ঘটনাবলীর সম্যক ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং কোন সময় তিনি ভুলে যাননি যে ভারতে জাতীয় আন্দোলন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সাথে বিশেষভাবে যুক্ত। তিনি কংগ্রেসে বিদেশপ্রচার বিভাগ প্রবর্তন করেছেন। এ বিভাগ পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিষ্ট বিরোধী প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে সংযোগ রক্ষা করে এবং ভারতের সাংবাদিক মহলগুলিকে আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞাত রাখে। স্পেনীয় বিপ্লবীদের প্রতি ভারতীয় সহানুভূতি ও একাত্মবোধ প্রকাশ করতে তিনি নিজে স্পেনে গিয়েছেন। কোন কোন কংগ্রেস নেতা এক সময় ফ্যাসিষ্ট প্রভাবে মুগ্ধ হয়েছিলেন, তারাও আজ জওহরলালের সহিত একাতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। কাজেই নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট প্রচারের বিষময় ফল জনমত স্পর্শ করতে পারেনি। কিন্তু এতে মনে করা উচিত নয় যে ভারতে ফ্যাসিজমের কোন সম্ভাবনা নেই। জাতীয়তাবাদীরা একে বিনষ্ট করার চেষ্টা করেছে সত্য, কিন্তু অন্ধ সাম্প্রদায়িকতা ফ্যাসিষ্ট আদর্শে সহানুভূতি সম্পন্ন।

প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্ধ হিন্দু ও মুসলমানগণ একতান্ত্রিকতার আদর্শে বিশ্বাসী। ডিকটেটরদের রহস্যাচ্ছন্ন উক্তিগুলি তাদের আকৃষ্ট করে। নাৎসীদের আর্যজাতির গৌরবাখ্যান গোঁড়া হিন্দুর জাতি ও বর্ণাশ্রম ধর্মের সমর্থক। নাৎসী প্রতীক হিসাবে স্বস্তিকা হিটলারী ও হিন্দু আদর্শের সাজাত্য ও সাদৃশ্য ঘোষণা করছে। জাপানের অধিবাসী বেশীর ভাগই বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্মের আদি জন্মস্থান ভারতবর্ষ হওয়ায় জাপান সুদূর প্রাচ্যে (Far East) ক্ষমতা বিস্তার করেছে দেখে অনেকে আনন্দিত। হিন্দু সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি অনেক সময় জার্মেন, জাপানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। হিন্দুমহাসভার সভাপতি বিনায়ক সভরকার এক সময় বিপ্লবাত্মক কাজের জন্য যাবদ্‌জীবন দ্বীপান্তরিত হয়েছিলেন। মুক্তিলাভের পর তিনি ঘোর সাম্প্রদায়িকতার পরিচয় দিচ্ছেন তিনি, কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক সংযোগ ও সহানুভূতি পছন্দ করেন না।

'নাৎসী মতবাদ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই আছে। বাস্তবিক পক্ষে জাতীয় কংগ্রেস ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধমত পোষণ করে বলে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এটা হয়েছে। পালেষ্টাইন সমস্যা নিয়ে নাৎসী গভর্ণমেণ্ট অন্যান্য মুসলিম দেশের ন্যায় ভারতবর্ষেও দারুণ চাল চেলেছে।

মুসলমানগণ আরববাসীদের উপর স্বাভাবিক সহানুভূতিসম্পন্ন। এ মনোভাব ইহুদী বিরোধী করতে নাৎসীরা অনেকটা কৃতকার্য হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে মুসলিম লিগের অধিবেশনে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্মানবিৎ একজন অধ্যাপক ইহুদীদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেছেন। ইনি একজন গত যুগের বিপ্লবী, প্রায় কুড়ি বৎসর জার্মেনীতে ছিলেন এবং কিছুদিন হয় তাঁর জার্মেন স্ত্রী নিয়ে এদেশে এসেছেন। যত্ন সহকারে এরূপ ইহুদী বিদ্বেষ জাগাবার উদ্দেশ্য হল, হিটলার ও নাৎসী গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় মুসলিমের মিত্র' তা প্রচার করা।

মুসোলিনী আফ্রিকায় একজন ইসলামের 'রক্ষাকর্ত্তা', এবং জাপানেরও চীনদেশে অনুরূপ মহান উদ্দেশ্য আছে ইহাই বেশ জোর দিয়াই আন্তর্জাতিক ফ্যাসিজম সমর্থনের জন্য প্রচার করা হয়। তবে মুসোলিনী কর্তৃক ত্রিপলী ও লাইবিয়াতে মুসলীম উৎপীড়নে সে ভাব অনেকটা কমে গেছে। সাম্প্রদায়িক মতাবলম্বী ও তাদের প্রতিষ্ঠানগুলি সহজেই ফ্যাসিষ্ট আদর্শে আকৃষ্ট হয়। যদিও জাতীয় মহাসভা মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অহিংসনীতি গ্রহণ করেছে, কংগ্রেসের ভিতর বহু সভ্য আছে যারা অহিংস প্রতিরোধে বিশ্বাসী নয়। কাজেই ইহা অস্বাভাবিক নয় যে তারা শক্তি-প্রবল ফ্যাসিষ্ট নীতিতে আস্থাবান হবে এবং জার্মেনী, ইতালী ও জাপানে এ আদর্শের সাফল্য দেখবেন। বাঙ্গলাদেশে সিন্ ফিন্‌দের অনুরূপ সন্ত্রাসবাদ অনেকদিন চলেছে, এজন্য একতান্ত্রিকতা বেশ প্রসার পাচ্ছিল। পরাধীনতার জ্বালায় দগ্ধ বাঙ্গলার ভাবপ্রবণ দেশপ্রেমিকের কাছে হিটলারের রহস্যময় শাক্তধর্মের আকর্ষণ ছিল।

সাম্যবাদভীতি নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট প্রচারকদের আর একটি সুযোগ দিয়েছে।

রাজনীতি দ্রুত বামপন্থীভাবাপন্ন হওয়ায় এবং কংগ্রেস সাম্যবাদের আদর্শে অর্থ নৈতিক সমস্যার উপর ভিত্তি নেওয়ার একদল স্থিত-স্বার্থ স্বভাবতই চিন্তাকুল হয়ে পড়েছে,—কংগ্রেস বৃটিশের

হাত হতে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিলে তাদের কি উপায় হবে। ধনি ও জমিদার সম্প্রদায়ের সম্পত্তিনাশের আশঙ্কা দেখিয়ে ফ্যাসিষ্ট গুপ্তচর সাম্যবাদ ভীতি প্রচার করছে। এরূপ কৌশলজাল অন্যান্য দেশেও বিস্তার করা হয়েছে। সব ধনিক ও অভিজাত মহলে ফ্যাশিজম্ অনেকটা সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ করেছে। গোঁড়া ও ধর্মান্ধদের লোহিতাঙ্ক' সুযোগও খুব নেওয়া হয়েছে। নাস্তিক সোভিয়েট রাশিয়ার আতঙ্ক তাদের খুব বিচলিত করেছে। কাজেই ভারতের এমন দুর্গতি যাতে না হয় সেজন্য তারা যা কিছু শুনতে রাজী। এ পরিস্থিতিতে সাম্যবাদ বিরোধী তিন শক্তির ভারতে প্রচার কার্য আলোচনা করা দরকার। এর মধ্যে জাপানের ভৌগলিক সান্নিধ্যে থাকলেও ভারতে নাৎসী গভর্ণমেণ্টের প্রচার বেশী কার্যকরী। ইউরোপীয়ান যুদ্ধের সময় পত্রিকা অফিসগুলিতে ইতালীর প্রচারসাহিত্যের ছড়াছড়ি ছিল এবং ছোট খাটো পত্রিকাগুলি অর্থ সাহায্যও যে কিঞ্চিৎ না পেয়েছে তা নয়। কিন্তু তারপর এরা থেমে গেছে, শুধু বৃত্তি বা অর্থ দান করে কয়েকজন ছাত্রকে সাংস্কৃতিক সংযোগএর জন্য ইতালীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে আকৃষ্ট করা ভিন্ন আর কিছু করে নাই। ক'জন বিশিষ্ট ভ্রমণকারীদের ইতালীতে অনাবশ্যক আড়ম্বরের সহিত অভিনন্দিত করা হয়েছে। তারা দেশে ফিরে উচ্চকণ্ঠে ইতালীর ও ফ্যাসিজ্‌মের প্রশংসা করেছে। প্রাদেশিক ভাষায় পরিচালিত অনেক মাসিক পত্রিকায় নির্বাসিত ভারতীয়গণ ফ্যাসিজ্‌ম্ সমর্থক প্রবন্ধ লিখে থাকে। জাপান প্রবাসী নির্বাসিত কয়েকজন ভারতীয় জাপান গভর্ণমেণ্টের টাকায় কাজ করছে। এর ভিতর একজন সাম্প্রদায়িক হিন্দুমহাসভার সাথে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রক্ষা করে আসছে। আবার কেউ বা জাপান গবর্ণমেণ্ট দ্বারা প্ররোচিত হয়ে চীনযুদ্ধে জাপানের 'সভ্যতা প্রচার' সমর্থক পুস্তিকা লিখে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জাপানী অধ্যাপক মারফতেও প্রচার-সাহিত্য এ দেশে আসছে। প্রতি সপ্তাহে তিনি 'সুদূর প্রাচ্য' সম্বন্ধে নানা খবর ও নোট পাঠান। সংস্কৃতির বাহক' ও প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদগণ মাঝে মাঝে ভারতে অবতীর্ণ হন। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের তরফ হতে কয়েকটি সভাসমিতি ছাড়া দেশের অন্য কোথাও তারা পাত পায় না। নোগুচির মত ভারতের উপর সহানুভূতিসম্পন্ন একজন মহাকবি ও পণ্ডিত লোক তাঁর অধুনা প্রকাশিত কতগুলি বক্তব্যের জন্য ভারতবর্ষে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়েছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের সাথে তার চিঠির আদান প্রদানে প্রমাণিত হয়েছে যে ভারত ও জাপানের সাথে সাংস্কৃতিক যোগ যতই থাক না কেন চীনে জাপানী বর্বরতা কখনও ভারতবাসী বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করবে না।

সোভিয়েট বিরোধী তিন শক্তির ভিতর প্রচার কার্যে জার্মেনি অত্যন্ত সক্রিয়। এদের গুপ্তচরগণ হিটলারের 'Mein Kampf' বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় অনুবাদ করে ছাপাবার প্রচেষ্টায় মন দিয়েছে। ধীর ও অতর্কিতভাবে তারা ভারতীয় সংবাদ পত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। এখানে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের ন্যায় অর্থসঙ্কটে পতিত কতকগুলি সংবাদপত্রের সুবিধা নিয়েছে। নাৎসীমতবাদ সমর্থক বিষয়বস্তু বিনামূল্যে প্রচারার্থে দেওয়া হয়। একাজের জন্য ভারতে ও জার্মানীতে এজেন্সী আছে। ইন্দো-জার্মান 'নিউজ্ এক্‌চেঞ্জ' ও 'ইণ্টারন্যাশনেল

রেলওয়ে ইনফরমেশন বুরো' ইত্যাদি তার দৃষ্টান্ত। প্রতি সপ্তাহে বিশেষভাবে তৈরী পত্র, প্রবন্ধ, ভ্রমণ বৃত্তান্ত, খেলাধূলা, বৈজ্ঞানিক অথবা সাধারণের চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ, ছবি, এমনকি অনেক তুচ্ছ খবর পাঠান হয়।

ভারতীয় পত্রিকায় অতি অল্পসংখ্যক সম্পাদকই আছেন যাঁরা প্রচারবস্তুকে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে বেছে নিতে পারেন। অতিরিক্ত কর্মক্লান্ত সহ-সম্পাদকগণ তৈরী জিনিষ অজ্ঞাতসারে ছাপাতে দেয়। তা ছাড়া দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত অনেক সংবাদপত্রের তেমন আর্থিক স্বচ্ছলতা নেই। ছাত্র অথবা নির্বাসিত ভারতীয় কর্তৃক দেশীয় ভাষায় লিখিত প্রবন্ধ পেলে এ জাতীয় পত্রিকা অতি সহজে গ্রহণ করে। এ সব রিপোর্ট এরূপ কৌশলে লেখা হয় যে আপাতদৃষ্টিতে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া বিষয়ক প্রবন্ধ হলেও মাঝে মাঝে এতে নাৎসী আদর্শের কথা প্রক্ষিপ্ত থাকে। প্রাণী ও উদ্ভিদ বিষয়ক একটি প্রবন্ধে কৌশলে অষ্ট্রিয়া ও সুদেতানলেণ্ড অধিকার সমর্থন করা হোয়েছে, জার্মেন ও এ সব দেশের প্রাণী ও উদ্ভিদের ভিতর একটা স্বাজাত্য দেখিয়ে। বার্লিনে মুশলিম কর্তৃক ঈদ্ পর্বানুষ্ঠানে কোন রিপোর্ট লিখছে: 'বার্লিনে অবস্থিত প্রাচ্যবাসীদের মধ্যে সংগঠন শক্তি বিশেষ লক্ষিত হয়'।......বোধ হয় জগতের শ্রেষ্ঠ জার্মাননিয়মানুবর্তিতা ও সংহতির আদর্শ এ সকল প্রতিষ্ঠানকে প্রভাবান্বিত করেছে। এ রিপোর্টে অন্যত্র ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে, বৃটিশ ভারতবর্ষে কিরূপ লুটতরাজ ও অর্থ শোষণ করছে এবং প্যালেষ্টাইনে কেমন নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে।

জার্মেন ভাষায় পুষ্ট অনেক কাগজ প্রত্যক্ষভাবে প্রচার কার্য চালায়। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপকের জার্মেন স্ত্রী 'স্পিরিট অব্ দি টাইম্' নামে একটি কাগজ চালান। এর বিজ্ঞাপন শুধু ক্রুপ্স্, সিমেন্স্ ও এ, ই, জি কোম্পানীর। সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রমাণের চেষ্টা হয় যে নাৎসী ও মুসলিম আদর্শ পরস্পরের সদৃশ। ইদানীং কোন সংখ্যায় লিখেছে যে 'মুসলিম ষ্টেট্স্ প্রকৃতপক্ষে জার্মেন ষ্টেটস্এর আদর্শানুরূপ, যেখানে প্রত্যেকে নিজ নিজ কর্তব্য করছে।' নেতৃত্বের আদর্শ ইসলাম ধর্মের মূল নীতি এবং মুসলমানদের 'এক নেতা, এক ফুয়েরের'এর অধীনে আসা উচিত। আরো আশ্চর্য যে এ কাগজই আবার ফ্যাসিষ্ট ইতালী ও জাপানের পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়া, ইহুদী ও সাম্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালায়।

ভারতে জার্মেন সমাজ নাৎসী আদর্শে সংগঠিত। তাদের একজন নেতা, ভিন্ন ভিন্ন নগরে ক্লাব হাউজ ও 'ভারতে জার্মেন' নামে একটি কাগজ আছে। অধুনা প্রকাশিত কোন সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ আছে 'উপনিবেশ বিস্তার (বৃটিশ) হিংসা প্রসূত' (Hate makes British) Colonial Policy)। এতে কলকাতার স্থানীয় দলের কার্যকলাপ সম্বন্ধেও বিবরণ আছে। এ জার্মেনেতর জাতির জন্য একটি চারুশিল্পের প্রদর্শনী খোলে এবং ইহা সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে বলে প্রকাশ করেছে। ভারতবাসীগণ অনেক সময় জার্মেন ক্লাবে নাৎসীবাদ ও অন্যান্য বিষয়ে বক্তৃতা শুনতে আমন্ত্রিত হয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় জার্মেন বিতাড়িত ভারতে আশ্রয়প্রাপ্ত ইহুদী ও সাম্যবাদীগণ অভিযোগ জানিয়ে আস্‌ছে 'গেষ্টেপোর' গুপ্তচর তাদের পিছনে

লেগে আছে। এ সকল সক্রিয় গুপ্তচর অনেকের সাথে আমার বোম্বেতে দেখা হয়েছে। জার্মেন দোকানে কর্মচারীদের অনেক সময় নাৎসী প্রচার কার্যে নিয়োজিত হতে বাধ্য করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে বীমা কোম্পানীর জনৈক কর্মচারী দিল্লীস্থিত ব্যবসাকেন্দ্র হতে 'ইন্দো জার্মেন নিউস্ এক্‌চেঞ্জ'এর কার্য নির্বাহ করে।

এ সকল প্রচারের ব্যর্থতা সহজেই বুঝা যায় কেননা, যে কোন নাম করা প্রতিষ্ঠানই ফ্যাসিষ্ট আদর্শ বা কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করেনি। সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানগুলি অবশ্য একতান্ত্রিক মনোবৃত্তি ভাব ও ভাষায় প্রকাশ করে, কিন্তু ফ্যাসিষ্ট বিরোধী জাতীয় মহাপ্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের তুলনায় এদের প্রভাব অতি সামান্য। তুচ্ছ ছোট খাটো সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে লিপ্ত থাকায় ফ্যাসিষ্ট আদর্শ ও তার অর্থ বুঝবার উৎসাহ অনেকের নেই। ফ্যাসিষ্ট লাইনে চালিত মাঝে মাঝে দু' একটি প্রতিষ্ঠান বাস্তবিকই বিপদজনক। সাম্প্রদায়িক হিন্দু পরিচালিত কুঁচকাওয়াজ ও দেহচর্চার কেন্দ্রগুলি জার্মেন 'ঝটিকাবাহিনী' 'Storm Troops'এর আদর্শে গঠিত হয়েছে। বাঙ্গলা দেশে একজন ভারতীয় সিভিলিয়ানের উদ্যোগে বাঙ্গলার যুবকদের মধ্যে সন্ত্রাস ও সাম্যবাদ প্রতিরোধ কল্পে 'ব্রতচারী' আন্দোলন সুরু হয়েছে। মুসলিমদের মধ্যে ও উত্তর ভারতে 'খাক্‌সার' দল এরূপ উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে। সমাজসেবা এ দলের প্রকাশ্য আদর্শ কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা সামরিক আদব-কায়দা চালান হয়। সৈনিকের ন্যায় পোষাক পরিহিত আদবকায়দায় 'খাক্‌সার' কোদাল হাতে হিটলারের 'শ্রমিকবাহিনীর' অনুকরণে কুঁচকাওয়াজ করে। নেতার প্রতি অকুণ্ঠবশ্যতা দাবী করা হয়। খুব অল্প দিন হয় দিল্লীতে 'রেবেতা' দল গঠিত হয়েছে। সভ্যগণ সকলেই মুসলিম। এদের মধ্যে অনেকে আবার আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। তারা ভ্রাতৃবন্ধনের শপথ গ্রহণ ও নেতার অন্ধ আনুগত্য স্বীকার করে।

এ সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতি বৃটিশ সরকারের মনোভাব কি? এ কথার জবাব অবশ্য খুব সহজেই পাওয়া যায়। অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানগুলি সরকারী কৃপাপুষ্ট। এ একটু অদ্ভুত মনে হয় যে সকল ফাসিষ্ট প্রচার বৃটিশ বিদ্বেষে ভরপুর অথচ তার কোন প্রতিরোধের চেষ্টা নাই। চেম্বার-লেন গবর্ণমেণ্ট ইউরোপে যেমন নাৎসী হুমকির কোন প্রতিবাদ করে না।

ভারতের বৈদেশিক নীতি লণ্ডনের হোয়াইট হল হতে নির্ধারিত হয়। আজ কিছুদিন যাবৎ, সাম্রাজ্যের চেয়ে ডিক্‌টেটরী বৃত্তি রক্ষার জন্য অধিক উদ্‌গ্রীব, বৃটিশের সোভিয়েট বিরোধী মনোভাব দ্বারাই বৈদেশিক ও ভারতের রাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়। সাম্যবাদের বিরুদ্ধে যে কোন প্রতিষ্ঠানই ভারত সরকারের সমর্থন পায়।

বৃটিশ আমলাতন্ত্রের যে অভিসন্ধিই থাক না কেন রাজনৈতিক ভারতের প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস, ফ্যাসিষ্ট বিরোধী নিঃসন্দেহ। গত ত্রিপুরী অধিবেশনে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিষ্ট বিরোধী প্রস্তাব পুনরায় অবিসংবাদীভাবে পাশ করিয়েছে।

ইংরেজী হইতে অনুদিত—কল্পনা মিত্র।

ইউরোপে ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য আজ কয়েকমাস যাবং গ্রেট্‌ব্রিটেন্, ফ্রান্স ও সোভিয়েট্ রাশিয়ার মধ্যে একটি ত্রিশক্তি চুক্তির ভিত্তির উপর শান্তি-মোহড়া গঠনের যে আলোচনা চলছে তা ক্রমেই তর্কযুদ্ধে পরিণত হ'চ্ছে। বস্তুতঃ সেই জাতীয় আলোচনার কোন মীমাংসাই হওয়া সম্ভব নয় যার কোন লক্ষ্য নেই। যে সব আলোচনা পরস্পরের দাবী ন্যায়সঙ্গত কিনা তাকে কেন্দ্র করে শুধু অর্থহীন বাক্যবিনিময়ে পর্য্যবসিত হয় এবং এই উদ্দেশ্যহীন আলোচনার লোকচক্ষুর সামনে যৌক্তিক ব্যাখ্যানের জন্য প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত বাক্‌ছলের। আধুনিক রাজনীতিতে বাক্‌ছল একটা বড় আর্ট হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এবং ইউরোপে এই শ্রেণীর একজন অন্যতম আর্টিষ্ট হ'লেন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেন। স্পষ্টভাষণ চেম্বারলেনের স্বভাববিরুদ্ধ এবং সেইজন্যই ইঙ্গ-সোভিয়েট্ আলোচনার মধ্যে আজও কোন সঙ্গত মীমাংসার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সোভিয়েট্ রাশিয়ার যা দাবী তা অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় মোলোটভ্ জানিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু বৃটেনের কাছে সে-দাবীর অর্থ আজও পরিষ্কার হয়নি এবং তার একঘেয়ে পাল্টাদাবীও নেহাৎ ছিচ্‌কাঁদুনে মেয়ের নাকীকান্নার সামিল হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। রাজনীতিতে যাঁরা পশুবলের পক্ষপাতী, নাকীকান্না কোনদিনই তাঁদের মনে করুণরসের সৃষ্টি করে না, বরং তার সুদীর্ঘ অবসরের মাঝখানে তাঁদের হীন উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ আরও সুগম হ'তে থাকে। ডানজিগ্ সহরের পথে পথে তাই হাইম্‌ওয়েরের (Home Army) রণযাত্রা আরম্ভ হ'য়েছে, সৈন্যদের কুচ্‌কাওয়াজও শোনা যাচ্ছে কারণ জার্ম্মাণ ফুরহার বেশ বুঝতে পেরেছেন যে বৃটিশ মন্ত্রীদের কাছে ডান্‌জিগ্ এমন কিছু একটা বৃহৎ সমস্যা নয়, যার জন্য মহাযুদ্ধ বাধতে পারে। মিঃ উইলিয়াম ষ্ট্র্যাঙ্ এইবার রান্সিম্যানের দৌত্যকর্ম্মের গৌরব ফিরে পাবেন। যতদূর সম্ভব চেকোশ্লোভাকিয়ার মতই ডান্‌জিগ্ সমস্যার সমাধান হবে। ইতিমধ্যে আস্ফালন, তর্জ্জন-গর্জ্জন, শান্তি অভিনয় প্রভৃতি অনেক

কিছু বাহ্যাড়ম্বর হবে, কিন্তু তারপর আবার সেই চুপচাপ্, চেম্বারলেন-হ্যালিফাক্স গোষ্ঠির 'Hush, Hush, Policy'র সেই অস্বস্তিকর বিরতি।

আসল সমস্যা হচ্ছে বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলিকে কেন্দ্র করে'। ইউরোপীয় রাজনীতিতে জার্ম্মাণির 'forward' নীতির সঙ্গে এই বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয়নি এবং রাষ্ট্রীয় সমালোচকরা এই বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলির (লিথুয়ানিয়া, ল্যাট্‌ভিয়া ও এষ্টোনিয়া) ভৌগলিক গুরুত্বকে' উপেক্ষা করে' গেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জার্ম্মাণি যদি বল্‌টিকের দিকে আরও অগ্রসর হয় তা হ'লে সোভিয়েট্ রাশিয়ার পক্ষে নির্লিপ্তভাবে নিরপেক্ষ থাকা আদৌ সম্ভব হবে না; এবং তাকে বাধ্য হ'য়ে বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষা করার জন্য জার্ম্মাণির বিরুদ্ধে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে। তার কারণ কি? কারণ হ'চ্ছে এই যে জার্ম্মাণির যা কিছু দুর্ব্বলতা এই বল্‌টিক। স্কানডিনেভিয়ান শক্তিগুলির সঙ্গে, বিশেষ করে' সুইডেনের সঙ্গে বাণিজ্য যোগাযোগ না রাখতে পারলে জার্ম্মাণির পক্ষে যুদ্ধচালনা করা দুরূহ ব্যাপার। গত মহাযুদ্ধের সময় জার্ম্মাণির পক্ষে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালান সম্ভব হয়েছিল সুইডেন থেকে magnetic iron ore ও অস্ত্রশস্ত্র আমদানীর জন্য। গ্রেট্ বৃটেন্ এই আমদানি বন্ধ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু তৎকালীন রুষ নৌ-বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার জন্য সে-চেষ্টা সার্থক হয়নি। বর্ত্তমানে সমস্ত সমরপারদর্শীরা রাশিয়ার শক্তিশালী নৌবাহিনীর উপর যথেষ্ট আস্থা রাখেন। সুদূর প্রাচ্যের ঘাঁটি ও 'ব্ল্যাক সি' বাদ দিয়েও শুধু ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগরে রাশিয়ার ২৩ হাজার টনের দু'টি রণপোত, পাঁচ ছটি ক্রুইজার, ১৫টি ডেষ্ট্রয়ার এবং ৬০টি সাবমেরিণ আছে। সুদক্ষ রণনায়কের নেতৃত্বে এই শক্তির সাহায্যেই জার্ম্মান ফ্লিট্‌কে পর্য্যুদস্ত করা যায়, কারণ জার্ম্মানিকে 'নর্থ সি-'র জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। সুতরাং সুইডেনও জার্ম্মানির মধ্যে অস্ত্রচলাচল রাশিয়া খুব সহজেই এবার বন্ধ করতে পারবে। এইটাই হ'চ্ছে জার্ম্মান্ নৌকর্ত্তাদের বিশেষ চিন্তার বিষয়। সেইজন্য জার্ম্মানির কৌশল হ'চ্ছে রাশিয়ার নৌবাহিনীকে ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগরে এমনভাবে ঘেরাও করে' রাখা যাতে না একটিও সাব্‌মেরিণ সাগরে এসে পড়তে পারে। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জার্ম্মানির এমন কতকগুলি ঘাঁটির প্রয়োজন যেখান থেকে ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগরকে রীতিমত নজরে রাখা যায়। এইসব ঘাঁটির একটিও এখন জার্ম্মানির আয়ত্তে নেই। ডান্‌জিগ্ ও মেমেল্ বহুদূর হ'য়ে যায়। ল্যাটাভিয়ার রিগা এবং এষ্টোনিয়ার ট্যালিন্ ও দাগো দ্বীপগুলি এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বিশেষ উপযোগী। অতএব জার্ম্মানির 'No Kennt Kein Gebot' (Necessity knows no Law) নীতি অনুযায়ী ডান্‌জিগ্ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের পর হিট্‌লার যে বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলির দিকে অগ্রসর হবেন তা বেশ স্পষ্টই বোঝা যায়। অথচ এই বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলির উপর রাশিয়ার সম্পূর্ণ নিরাপত্তা নির্ভর করছে। এবং সোভিয়েট্ রাশিয়ার তরফ থেকে কোনপ্রকার শান্তিচুক্তিতে যোগদান করা সম্ভব নয়, যদি এই বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলি রক্ষা করার কোন পরিষ্কার প্রতিশ্রুতি তার মধ্যে না থাকে। সেইজন্যই মোলোটভ্ গ্রেট বৃটেনকে বারবার জানিয়েছেন যে রুমানিয়া ও পোল্যাণ্ডকে প্রতিশ্রুতি দিতে রাশিয়া প্রস্তুত আছে যদি গ্রেট্

বৃটেন্ বল্‌টিক রাষ্ট্রগুলিকে অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দেয়। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্রসচিব এই দাবী পরিপূর্ণভাবে স্বীকার করছেন না, নানারকম ওজর আপত্তি করে' দিন কাটাচ্ছেন, কারণ তাঁরা চান ঝক্কি যা কিছু সব রাশিয়ার ঘাড়ে পড়ুক আর কাগজে-কলমে তাঁদের গণতন্ত্রী মর্য্যাদা বজায় থাক্। প্রকৃতপক্ষে গ্রেট্ বৃটেন্, ফ্রান্স ও সোভিয়েট্ রাশিয়ার মধ্যে ত্রিশক্তি চুক্তি আজও সম্ভব হয়নি এই কারণে এবং যতদূর মনে হয় কোন যুক্তিযুক্ত মীমাংসা হওয়া অল্পসময়ের মধ্যে সম্ভব হবে না। মাঝখানে শোনা গেছে যে বৃটেন বল্‌টিক্ রাষ্ট্রগুলিকে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিতে প্রস্তুত আছে, যদি রাশিয়া, হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডকে প্রতিশ্রুতি দেয়। সোভিয়েট্ রাশিয়ার উপর এইরকম অন্যায় সর্ত্ত পেশ করা গ্রেট্ বৃটেনের মজ্জাগত কূটনীতিক চালের একটা দৃষ্টান্ত। সোভিয়েট্ রাশিয়ার তরফ থেকে হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ডকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না, কারণ এই দুইটি রাষ্ট্র সোভিয়েট রাশিয়ার রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনপদ্ধতিকে কোনদিনই স্বীকার করেনি। আসলে গ্রেট্ বৃটেনের এই দাবী করার কারণ হচ্ছে এই যে ত্রিশক্তি চুক্তি অর্থাৎ শান্তিমোহড়া গঠনের ব্যর্থতার সমস্ত দোষ সোভিয়েট্ রাশিয়ার স্কন্ধে চাপান এবং শিশুর মত রাশিয়ার কাছ থেকে আকাশের চাঁদ চেয়ে গ্রেট্ বৃটেন্ জনগণের কাছে প্রতিপন্ন করতে চায় যে ইঙ্গফরাসী সোভিয়েট চুক্তির জন্য বৃটেনের আন্তরিকতার কোন অভাব নেই। সেইজন্য ঘনঘন মন্ত্রীপরিষদের বৈঠক হ'চ্ছে মন্ত্রীতে মন্ত্রীতে পরামর্শ হচ্ছে এবং উপদেশের পর উপদেশ, প্রস্তাবের পর প্রস্তাব চলেছে মস্কোর বৃটিশ রাষ্ট্রদূত মিঃ উইলিয়াম্ সিড্‌স্‌এর কাছে। গ্রেট্ বৃটেনের এই একাগ্রতা, ও বৈমাত্রেয় দরদের প্রকৃত সমঝদার হ'চ্ছেন হিট্‌লার ও মুসোলিনী এবং সেইজন্য হিট্‌লার কোনদিকে বিশেষ ভ্রূক্ষেপ না করে' শুধু মাঝে মাঝে 'encirclement'-এর কলরব তুলে' নিজের কাজ গুছিয়ে নেবার চেষ্টাতে আছেন। আর এদিকে দিনগুলো বৃটিশের রাশি রাশি কথার উপলখণ্ডের উপর দিয়ে একটার পর একটা গড়িয়ে যাচ্ছে।

এতবড় সুযোগ ফ্যাশিষ্ট অক্ষের তৃতীয় অংশীদার জাপানের কাছে খুবই লোভনীয়। ইতিপূর্ব্বে এই সুযোগ আর একবার এসেছিল মিউনিক চুক্তির সময়, জাপান তখন সৈন্য-চালান করেছিল হংকং-এর কাছে। এবার জাপান তিয়েনৎসিনের বৃটিশ এলাকা আক্রমণ করেছে। চীনের সঙ্গে গ্রেট্ বৃটেন্, ফ্রান্সও আমেরিকার যে যোগসূত্র রয়েছে তাকে ছিন্ন করার জন্য সমস্ত বিদেশীর এলাকার উপর জাপান আক্রমণের এই সঙ্কল্প করেছে। তিয়েনৎসিন্, সোয়াটো, ফু-চো, ওয়েন্‌চো— প্রভৃতি প্রত্যেকটি সহরের ওপর আক্রমণ করে' জাপান চীনকে সহায়হীন অবস্থায় এনে তার উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করতে চায়। লণ্ডন ও টোকিওর সঙ্গে ইতিমধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। টোকি-ওর পরিষ্কার সর্ত্ত হ'চ্ছে এই যে গ্রেট্ বৃটেন্, ফ্রান্স ও আমেরিকা জাপানের উত্তর চীন জয় স্বীকার করে' নেবে এবং তার সঙ্গে চীনে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপনে সহযোগিতা করবে। এর পরিবর্ত্তে জাপান ইয়াংসি ভ্যালিতে বৃটেন্ ও আমেরিকার বাণিজ্যের সুযোগ দেবে। এই-সর্ত্তে বৃটেনের বিশেষ গররাজির লক্ষণ দেখা যাচ্ছেনা শুধু এছাড়াও মাঞ্চুকুও ও উত্তর চীনে বাণিজ্যের স্বাধীনতা বৃটেন

দাবী করেছে। জাপানের নির্ম্মম অত্যাচার এবং বৃটিশ বাসিন্দাদের উপর জঘন্য অপমান নির্লিপ্ত-ভাবে গলাধঃকরণ করে যাওয়া থেকে মনে হয় যে চেম্বারলেন সাহেব জাপানের এই দাবীতে বিশেষ আপত্তি করবেন না, তা ছাড়া তিয়েনৎসিনের ব্যাপারকে মিঃ চেম্বারলেন 'local issue' বলে শুধু গ্রেট্ বৃটেন্ ও জাপানের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চান। সমস্ত বিদেশী অধিকারের উপর আক্রমণ বা নবশক্তি চুক্তিভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে' আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা করে' জাপানের উপর চাপ দেওয়া বা কৈফিয়ৎ দাবী করার ইচ্ছা বৃটেনের নেই। সুতরাং বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে বৃটেনের চেম্বারলেন-হ্যালিফাক্স গোষ্ঠী যথারীতি মিউনিক্ চুক্তির মত সুদূর প্রাচ্যে চীন বলিদানের জন্য আর একটি চুক্তির গোপন ষড়যন্ত্র করেছেন।

এর সঙ্গে বৃটেনে আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তনের যেসব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে তাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কথা হচ্ছে যে বৃটিশ বৈদেশিক অফিসের একটি প্রচার বিভাগ খোলা হবে এবং এই বিভাগের সম্পূর্ণ ভার থাকবে লর্ড পার্থের উপর। লর্ড পার্থকে আমরা যতদূর জানি তাতে তিনি যে এই বিভাগ পরিচালনায় ফ্যাশিষ্ট প্রচার মন্ত্রী গোয়েবেল্স্ অপেক্ষা কম সুনাম অর্জ্জন করবেন তা মনে হয়না। ফ্যাশিষ্ট দরদী বলে' লর্ড পার্থের বেশ খ্যাতি আছে এবং তাঁর সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বে এই প্রচার বিভাগ স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বৃটেনে ফ্যাশিষ্ট্‌তন্ত্র পুরোপুরি কায়েম করা। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী লেবর অপোজিশন্‌কে সান্ত্বনা দিয়েছেন এই বলে' যে নূতন প্রচার বিভাগের উদ্দেশ্য হবে বাইরে বৃটিশ রাষ্ট্রনীতির "objective presentation" এবং শান্তির সময় প্রেসের উপর মোটেই হস্তক্ষেপ করা হবে না। এ হচ্ছে চেম্বারলেনের আশ্বাসবাণী। আমাদের কাছে এর অর্থ হচ্ছে এই যে জার্ম্মানি ও ইটালির প্রচার বিভাগের মত একটি প্রচারবিভাগ স্থাপন করে' প্রেসের মারফতে ন্যাশানাল গবর্ণমেণ্টের কূটনীতির ব্যাখ্যা করা, জনসাধারণকে গভর্ণমেণ্টের উপর আস্থা রাখার জন্য এবং গভর্ণমেণ্টের সামরিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করার জন্য যুক্তিযুক্ত কারণ দেখিয়ে অনুরোধ করা। প্রচারবিভাগের সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেট বৃটেনের সর্ব্বশেষ গণতান্ত্রিক চেতনাটুকুও অপসারিত হবে।

গ্রেট্ বৃটেনের ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্টের এই ফ্যাশিষ্ট রূপান্তরের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী বৃটিশ লেবর-পার্টি। আলেয়ার মত ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্টের পিছু পিছু চলেছে লেবরপার্টি, গভর্ণমেণ্টের আশ্বাসের উপর লেবরপার্টির বিশ্বাস আছে, তাই আজও তার যাবতীয় প্রতিবাদ শুধু মৌখিক এবং কমন্সসভার হলঘরে। অপোজিশন্ পার্টির প্রতিবাদ যদি শুধু পার্লামেণ্টারী কায়দায় বাক্যযুদ্ধতেই শেষ হয় তা হলে তার কিছুই ফল হয় না, বরং যাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ তাদেরই সুবিধা হবার সম্ভাবনা বেশী। গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের অধিকার আছে পার্লামেণ্টের হলঘর ছেড়ে বাইরে দেশব্যাপী জনগণের মাঝখানে আন্দোলন করার এবং লেবরপার্টির সেই গণতান্ত্রিক মর্য্যাদাই অক্ষুণ্ণ

রাখা উচিত ! অপোজিশন্ নেতা আট্‌লির কথায় কোন কাজ হবে না। শুধু কথাতে কোনদিনই কোন কাজ হয়না। কাজ ঘরের চাইতে বাইরেই বেশী। লেবরপার্টির উচিত কালবিলম্ব না করে' এই গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের জন্য প্রস্তুত হওয়া। এই গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য হবে পারিপার্শ্বিক অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে' লেবরপার্টির নিজের উপর সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে আন্দোলন চালান। সেইজন্য কমন্সসভায় পরিষ্কার ভাষায় অপোজিশন নেতাকে জানিয়ে দিতে হবে যে লেবরপার্টি গভর্ণমেণ্টের আর কোন কথাতেই বিশ্বাস করতে সম্মত নয়। দেশব্যাপী জনসাধারণের সাহায্য নিয়ে তারা গভর্ণমেণ্টের প্রত্যেকটি কর্ম্মব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন করবে, বাধ্যতামূলক সামরিক আইনকে তীব্র প্রতিরোধ করবে, ফ্যাশিষ্ট রীতিতে সমস্ত রকম প্রচার এখনি বন্ধ করবে। অপোজিশনের দাবী হবে তিনটি—১। গভর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র নীতির আমূল পরিবর্ত্তন অর্থাৎ বর্ত্তমান ফ্যাশিষ্টপন্থী ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্টের পদত্যাগ; ২। বিনা বাক্যবিনিময়ে অনতিবিলম্বে সোভিয়েট রাশিয়ার সমস্ত ন্যায্য দাবীকে পরিপূর্ণ স্বীকার করে' নিয়ে তার সঙ্গে ফ্যাশিষ্ট বিরোধী চুক্তি করে' শান্তিমোহড়া গঠন করতে হবে; ৩। চীনকে রীতিমত সাহায্য করতে হবে এবং জাপানের ঔদ্ধত্যকে আদৌ প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না—চীনের উপর জাপানের পৈশাচিক আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য চীনকে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতে হবে, চেকোশ্লোভাকিয়া বা স্পেনের ইতিবৃত্তের পুনরাবৃত্তি সুদূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থরক্ষার জন্য চলবে না,—ভারতবর্ষের মত অধীন রাষ্ট্রগুলির গণতান্ত্রিক দাবী স্বীকার করতে হবে। মোটা-মুটিএই তিনটি দাবীর উপর বর্ত্তমানে লেবরপার্টির আন্দোলন চালাতে হবে। এই আন্দোলনের ক্ষেত্র হবে বাইরে জনসাধারণের মাঝখানে, পার্লামেণ্টের হলঘরে নয় এবং আন্দোলনের অস্ত্র যে সমস্ত শ্রমিক সঙ্ঘ ও গণপ্রতিষ্ঠানগুলির সহযোগিতায়, কম্যুনিষ্ট ও সোশ্যালিষ্টদের সঙ্গে মিলিত হয়ে দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট করে, কমন্সসভায় চেম্বারলেনের উপর বাক্যবাণ নিক্ষেপ করে নয়। সুতরাং লেবরপার্টির সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য হবে কম্যুনিষ্ট ও সোশ্যালিষ্টদের উপর বৈরীভাব বর্জ্জন করা, সমস্ত প্রগতিপন্থী গণপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করা এবং বর্ত্তমান ন্যাশানাল গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ফ্রণ্ট্ গঠন করে' শুধু গ্রেট্‌বৃটেনকে নয়, পৃথিবীর বৃহত্তম মানবগোষ্ঠীকে ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা করে।

এই পথে আন্দোলন চালিত হ'লে সুদূর প্রাচ্যে চীনের জয় অবশ্যম্ভাবী। এই জুলাই মাসে চীন-জাপান যুদ্ধ তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করল। মার্শাল চিয়াং কাই সেক্ ঘোষণা করেছেন যে চীন-জাপান যুদ্ধের অনিবার্য্য পরিণতি চীনের জয়ে। জাপানের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং এই যুদ্ধ আর কিছুকাল স্থায়ী হলে জাপানে যে প্রচণ্ড আর্থিক সঙ্কট দেখা দেবে তাতে জাপানে গৃহবিপ্লব অবশ্যম্ভাবী। যদিও ওয়াং চিং উই প্রমুখ কয়েকজন পলাতক বিশ্বাসঘাতক নেতা গোপনে জাপানের সঙ্গে রফার চেষ্টা করছেন এবং জাপানী সমর কর্ত্তাদের চীনে যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্ত্তনের পরি-

কল্পনায় মন্ত্রণা দিয়ে সহায়তা করছেন, তা হলেও তাঁদের দুরভিসন্ধি চীনের জাগ্রত জনগণের কাছ থেকে কোনদিনই সহানুভূতি বা সমর্থন পাবে না। বর্ত্তমান যুদ্ধে চীনের যে ৯৪১টি জেলা আক্রান্ত হয়েছে তার মধ্যে ৫৮৩টি পরিপূর্ণ চীনের শাসনাধীনে রয়েছে, মাত্র ছটি সহর জাপানীরা দাবী করতে পারে, সাংহাই, ক্যাণ্টন, নান্‌কিং, হ্যাঙ্কাও, পিপিং ও তিয়েনৎসিন্। সম্প্রতি শোনা গেছে যে চীন হুনান্-হুপে সীমান্তে ঘোরতর সংগ্রাম করছে এবং অনেকগুলি অঞ্চল চীন পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্বস্তসূত্রে আর ও জানতে পারা গেছে যে মাঞ্চুরিয়ায় চীনের অষ্টম রুট্ আর্ম্মি প্রবেশ করেছে। আট বছর পর এই প্রথম মাঞ্চুকুওতে চীনা সৈন্যের প্রবেশ এবং এর পরিনাম গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং এই অবস্থায় যদি গ্রেট্ বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকা চীনকে প্রয়োজনমত অর্থ দিয়ে সাহায্য করে, তা হ'লে জাপানের পরাজয় সম্বন্ধে নিঃসন্দেহে ভবিষদ্বানী করা যেতে পারে।

চীনে ইউনাইটেড ফ্রন্টের প্রশংসনীয় সাফল্য এবং ইউরোপে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী শান্তি-মোহড়ার আবশ্যকতা থেকে বোঝা যায় ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী বিরোধী মোহড়া গঠনের জরুরীত্ব কত বেশী। সেইদিক দিয়ে বামপন্থী সমন্বয় কমিটি (Left Consolidation committee) আমাদের আশান্বিত করেছে। এই বামপন্থী সমন্বয় কমিটি অর্থাৎ বামপন্থীদের এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান একদিনে হঠাৎ গঠিত হয় নি। এর পিছনের যে ইতিহাস এবং সামনের যে কর্ত্তব্য তারই ঘাত প্রতিঘাতে এর জন্ম। প্রগতিপন্থী শক্তিগুলি ঐতিহাসিক নিয়মে বিসর্পিল বক্রগতিতে, পতন অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে এবং এগিয়ে চলার পথে আবর্জ্জনা ও শৈবালদামকে ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়। ভারতবর্ষের সোশ্যালিষ্ট পার্টির মধ্যে এতদিন যাবৎ যে শ্যাওলাদাম জড় হয়ে তার গতিকে বাধা দিচ্ছিল তা প্রায় অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে গেছে মাসানি-পট্টবর্দ্ধন লোহিয়া মেহেটার পদত্যাগে। বস্তুতঃ পদত্যাগ এঁরা স্বেচ্ছায় করেন নি, করতে বাধ্য হয়েছেন। শুক্‌নো ফাঁপা ডাল ঝড়ের বেগে আপনা হতে খসে পড়ে, মুট্‌কে ভাঙতে হয় না। এরাও প্রগতিপন্থী শক্তির অনিরুদ্ধ চাপে স্বাভাবিকভাবে খসে গেছেন এবং তাতে দেশের সাম্রাজ্যবিরোধী সংগ্রামের পথ আরও মসৃণ হয়েছে। এই সব reformist ও revisionistরা একই পার্টির মধ্যে প্রাচীন গান্ধীনীতির পাশে নুতন সংস্কৃত সমাজতান্ত্রিক নীতিকে জুড়তে চান, এতে পার্টির ভাঙন ও বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। কারণ লেনিন্ বলেন এই পথেই "খানা" (Marsh) রয়েছে। লেনিনের কথার পুনরুক্তি করে' আমরাও মাসানি-লোহিয়া পট্টবর্দ্ধন-মেহেটা প্রমুখ সোশ্যালিষ্টদের বলতে চাই:

"Oh yes, gentlemen! You are free......to go yourselves wherever you will, even in to the marsh. In fact, we think that the marsh is your proper place, and we are prepared to render you every assistance to get

there, Only let go of our hands, don't clutch at us and don't besmirch the grand word 'freedom' for we too are 'free' to go where we please, free not only to fight against the marsh, but also against those who are turning towards the marsh."

আমরা চারিদিকে শত্রু পরিবেষ্টিত। ভিতরে দেখা যাচ্ছে কংগ্রেসের দক্ষিণ পন্থী নেতৃবৃন্দ জাতীয় সংগ্রাম নিয়মতান্ত্রিকতার পথে পার্লামেণ্টারী কৌশলে চালাতে চান। বোম্বাই কংগ্রেসে যে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য বিরোধী গণ-আন্দোলনকে দমন করা। কোন গণপ্রতিষ্ঠানের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের কোন স্বাধীনতা থাকবে না, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অনুমতি নিতে হবে। এই প্রস্তাব পাশের লক্ষ্য হচ্ছে যে বৈপ্লবিকগণ আন্দোলন বন্ধ হোক্। তারপর মন্ত্রীপরিষদের উপর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কোন ক্ষমতা থাকবে না, পার্লামেণ্টারী সব-কমিটি তার পরিচালনা করবে। অর্থাৎ মন্ত্রীরা আর জনসাধারণের মন্ত্রী রইলেন না, গান্ধী-প্যাটেল-গোষ্ঠীর ক্রীড়নক হলেন। এতে রাজাগোপালাচারী শ্রীকৃষ্ণ সিং প্রভৃতির দৌরাত্ম ও প্রতাপ যে কত বেড়ে যাবে তা অনুমান করাও কঠিন। এখনই জনসাধারণের প্রতি তাঁদের যা দরদ তাতে 'Super-Hitler' (প্যাটেলের নিজস্ব উক্তি) বল্লভাইয়ের নির্দ্দেশে তাঁরা ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে যে এক একজন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোয়েবেল্‌স্, গোয়েরিং, সিয়ানে হবেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আগাগোড়া এই হীন দুরভিসন্ধি ও জঘন্য ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যদি সকলের পূর্ণসম্মতি ভিন্ন 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীত বন্ধ করা, জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করা এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন সংগ্রাম না করে' তাদের হৃদয় শুচিতার জন্য প্রার্থনা করা প্রভৃতি গান্ধীজীর আশঙ্কাজনক প্রলাপোক্তি যোগ দেওয়া যায় তা হ'লে অতিবড় মূঢ়েরও আর বুঝতে বাকি থাকে না যে ভারতবর্ষে যুক্তরাষ্ট্রের সেই মোলায়েম দিনগুলি আসন্নপ্রায়।

এ ক্ষেত্রে এবং এ অবস্থায় আমাদের কর্ত্তব্য কি? কংগ্রেসের দক্ষিণমার্গের নেতৃবৃন্দের এই প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী গণআন্দোলন করা। কিন্তু এই সঙ্গে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্চে দেশের জনসাধারণকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যে আমাদের এই সংগ্রাম কংগ্রেসের দক্ষিণমার্গীয় নেতৃবর্গের বিরুদ্ধে নয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। শুধু এই দক্ষিণপন্থীরা কংগ্রেসের মধ্যে 'discipline-এর নামে যে 'conciliation' 'Purification'এর, এর নামে যে 'parliamentarianism'এর মতলব করছেন তাতে আমরা প্রতিবাদ করছি। আমাদের আন্দোলন মুখ্যতঃ সাম্রাজ্যবিরোধী আন্দোলন এবং যাতে ভারতের শ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠান নিয়মতান্ত্রিকতার পথ অনুসরণ করে' এই আন্দোলনের বৈপ্লবিক গতিকে প্রতিরোধ না করতে পারে তার জন্যই আমাদের এই দেশব্যাপী প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদে আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার

আছে এবং এতে কংগ্রেসের শৃঙ্খলাহানি হবে না, কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ জড়তা ও স্থবিরতা দূর হ'য়ে যাবে, কংগ্রেস শক্তিশালী সাম্রাজ্যবিরোধী বৈপ্লবিক গণপ্রতিষ্ঠান হবে। এই উদ্দেশ্যে কম্যুনিষ্ট্, সোশ্যালিষ্ট্, কিষাণ সভা ফরোয়ার্ড ব্লক্* প্রভৃতি প্রগতিপন্থী প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত বামপন্থী সমন্বয় কমিটি বৈপ্লবিক আন্দোলন অপ্রতিহতভাবে চালাবার জন্য যে সিদ্ধান্ত করেছে ভারতবর্ষের জনগণ তাকে পূর্ণ সমর্থন করচে এবং জনগণের অক্লান্ত চেষ্টায়, আন্তরিকতায় ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে সেই উদ্দেশ্য জয়যুক্ত হবে।

১০ই জুলাই, ১৯৩৯, কলিকাতা

*গত সংখ্যার 'বিশ্বাবর্ত্তে'র মধ্যে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' সম্বন্ধে যে মতামত ব্যক্ত হয়েছে তার জন্য আমি দায়ী নই। সমস্ত বক্তব্যটি ছাপা না হওয়ার দরুণ মতটা পরিষ্কার হ'তে পারেনি Printer's devil অনেক সময় এরূপ প্রমাদ ঘটায়। ফরওয়ার্ড ব্লক জাতীয় কংগ্রেসে Opposition partyর কাজ করতে বর্ত্তমানে পারে না। তার কারণ ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা। এখন ফরোয়ার্ড ব্লক যে রূপ নিয়েছে তাতে তাকে একটি পৃথক প্রগতিপন্থী পার্টি বলা চলে! এ পার্টির সার্থকতা থাকলেও আবশ্যকতা কিছু ছিল কিনা বলা যায়না। তবে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন কতকটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে অবশ্যম্ভাবী হয়েছে এবং বামপন্থী সমন্বয় কমিটি দ্রুত-গঠনের সহায়তা করে' বামপন্থী শক্তিগুলিকে সুসংহত করার পথ অনেক পরিষ্কার করে দিয়েছে বলে "ফরোয়ার্ড ব্লক্' সকলের সমর্থন পাবে! ফরোয়ার্ড ব্লকের ভবিষ্যৎ সাফল্য নির্ভর করে তার নীতি ও কর্ম্মপদ্ধতির উপর, যা আজও সম্পূর্ণ পরিষ্কার হয়নি। —লেখক

ডাহিনা তরফ

গ্রন্থ-পরিচয়

কবিতা—

বিশেষ বর্ষা সংখ্যা (আষাঢ়, ১৩৪৬) দাম ৵৹

সাময়িক সাহিত্যের দরবারে "কবিতার" একটা বিশেষ স্থান আছে। বাংলা দেশে যাঁহারা সাহিত্য লইয়া কারবার করেন তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন যে "কবিতা"র পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় সংস্কার-মুক্ত সাহসিকতা এবং বহু বিচিত্র পরীক্ষণশীলতার অনবদ্য ছাপ সততই থাকে। কি ছন্দে, কি ভাষায়, কি ভাব সমৃদ্ধিতে, কি প্রকাশ ভঙ্গীতে—সকল ক্ষেত্রেই "কবিতা"র এই স্বকীয়তা বাংলা সাহিত্যে একটা বিশিষ্ট সাধনার পথকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

আলোচ্য 'বিশেষ বর্ষা সংখ্যা'খানাও এই অনুপম বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। কবিতা এবং প্রবন্ধে, মন্তব্যে এবং সমালোচনায় এই সংখ্যা লোভনীয় হইয়াছে, ইহাতে অত্যুক্তি নাই। অনেকগুলি কবিতাই যেমন রসাত্মক প্রভাবে হৃদয় বিনোদন করে, একাধিক প্রবন্ধও তেমনি সুতীক্ষ্ণ প্রশ্নের আঘাতে বুদ্ধিকে সচেতন করিয়া তোলে। এই সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর কবিতা দুটীই তাঁহার প্রতিভার ছাপকে বহন করিতেছে। "সূর্য্যাস্তের জ্বলন্ত জঙ্গলে দুরন্ত সোণালি বাঘ"এর চিত্র যে বর্ণ সমৃদ্ধিকে দুই চোখের সমুখে ফুটাইয়া তোলে, তাহার তুলনা নাই। "আষাঢ়ের একটী দিন" শীর্ষক কবিতাটীর ছত্রে ছত্রে কল্পনার অজস্র প্রাচুর্য্য ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে; কবিতাটী চক্ষু এবং কান, উভয় ইন্দ্রিয়ের মোহ ঘটায়; চিত্রাঙ্কনে এবং ধ্বনি-সঙ্কেতে ইহা ঐশ্বর্য্যশালী। "ইলিশ" কবিতাটীতে "জলের উজ্জ্বল শস্য, রাশি রাশি ইলিশের শব" যে ছবি ফোটাইয়া তোলে তাহা একান্ত করুণ। বিষ্ণু দে, কামাক্ষী প্রসাদ, জীবনানন্দ, জ্যোতিরিন্দ্র, সুরেশ সরকার, অচিন্ত্যকুমার, ফররুক আহমদ ইত্যাদি আরো ক'জনের কয়টী ভালো কবিতা এই সংখ্যায় স্থান পাইয়াছে।

"কবিতা"র কাব্য-কৃষ্টি সম্বন্ধে দুই একটা কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। "কবিতা" যখন প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তখন সাহিত্যক্ষেত্রে দীর্ঘ আলোচনা এবং বিতর্কের অবতারণা হইয়াছিল, এ কথা আমাদের স্মরণ আছে। কিন্তু সংশয় থাকিয়াই গিয়াছে, এ কথাও অস্বীকার করার উপায় নাই। "কবিতা"-গোষ্ঠী বলিতে কোনো স্বতন্ত্র গোষ্ঠী আছে কিনা জানি না। গোষ্ঠী বলিতে সম-আদর্শ নিয়ন্ত্রিত, সঙ্ঘবদ্ধ সমবায়কেই বুঝি। "কবিতা"র কাব্যাদর্শ এবং রচনা-রীতি

(technique) বলিতে কোনো পৃথক্ এবং বিশিষ্ট আদর্শ ও রীতিকে বোঝায় কিনা জানিনা। তবে ভাবে, ভাষায়, উপমায়, ছন্দে—এক ধরণের বহু কবিতা ইহাতে বাহির হয়, সে সম্বন্ধে প্রশ্নের অবকাশ থাকে। এই সব কবিতা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক বিচার করিতে হইলে সুস্পষ্ট সংজ্ঞা এবং অর্থনির্দ্দেশের প্রয়োজন আছে। প্রথমতঃ এই সব কবিতা "বাস্তব" বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে; কাব্যে 'বাস্তবতা' বস্তুটী কি, তাহার ব্যাখ্যানের প্রয়োজন রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ ইহারা "আধুনিক"। আধুনিকতা নিতান্তই কাল-বাচক এবং "আগে-পরে" এই ক্রমসূচক। যাহাই পরে আগত হয় তাহাই পূর্ব্বগত হইতে মূল্যবান্ হইবে, এ কথা অযৌক্তিক। কাব্যের ক্রমবিবর্ত্তনের পথে পরের অবস্থা সততই পূর্ব্বতন অবস্থা হইতে উৎকৃষ্ট, কাব্য-ইতিহাসের এই ধরণের প্রগতির ধারণাই কি "কবিতা"-গোষ্ঠী পোষণ করেন? তৃতীয়তঃ কাব্য-গুণ আসলে জিনিষটী কি? রসাত্মক বাক্যের রস বস্তুটীই বা কি? এ কি কেবল ভাল-লাগা, মন্দ-লাগাতেই পর্য্যবসিত? না, ভাল-লাগা মন্দ লাগার উত্তর লোকে এই কাব্য রসের কোন নিঃসংশয় অস্তিত্ব রহিয়াছে? চতুর্থতঃ ছন্দের স্থান এবং মূল্য কাব্যলোকে কি বা কতটুকু? গদ্যকাব্য এবং কবিতার মধ্যে পার্থক্য কিছু আছে কিনা, ইহাদের দুইয়ের এলাকার মধ্যে সীমারেখা কোথায়! বাংলা সাহিত্যে কথা কাটাকাটি হইয়াছে অনেক, কিন্তু, বিচারমূলক আলোচনার অন্তে এ সব প্রশ্ন সম্বন্ধে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গিয়াছে কি না জানা নাই। "কবিতা"র সাহিত্যিক-গোষ্ঠী এ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করিলে জিজ্ঞাসুদের উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

এই তো গেল কাব্যরীতি সম্বন্ধে। তারপরে প্রশ্ন হইল কাব্যাদর্শ সম্বন্ধে। আলোচ্য সংখ্যায় তিনটী প্রবন্ধ আছে, প্রত্যেকটীরই বিষয় বিতর্কবহুল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর সুলিখিত প্রবন্ধ "প্রেমের কবিতা" বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। বিচার প্রবণতা এবং জোরাল প্রকাশ-ভঙ্গীর দরুণ প্রবন্ধটী বিশিষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বুদ্ধদেববাবু সমাজতত্ত্বের কথা উঠাইয়াছেন। সাহিত্য বিচারে সমাজতত্ত্বের যে বক্তব্য তাহার মূল্য খুব বেশী। কারণ সাহিত্য জীবনেরই প্রকাশ এবং সমগ্র জীবনের বিকাশ ও বিপ্লবের সাথে সাথে সাহিত্যেরও বিকাশ বা বিপ্লব ঘটে। তাই প্রেমের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া বুদ্ধদেব প্রেম ও বিবাহের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের সন্ধান করিয়াছেন। তাঁহার মতে প্রেম সম্বন্ধে ধারণা বাংলা দেশে অতি অবাস্তব এবং অপরিণত। সেই কারণে সত্যিকার প্রেমের কবিতাও বাংলায় বিরল। এখন প্রশ্ন এই যে সত্যিকার প্রেম পৃথিবীর কোন্ দেশে আছে এই যুগে? এবং সত্যিকার প্রেমের কবিতাই বা কোথায় আছে? শ্রেণী ও সম্পত্তি লুপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সত্যিকার প্রেম জগতে আবির্ভূত হইবে না। সুতরাং "প্রেমের গীতি কবিতা"ও মুঞ্জরিত হইতে পারিবে না। তাহা হইলে একমাত্র রাশিয়া দেশেই বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বপ্রথম প্রেমের কবিতার জন্ম হইয়াছে, কারণ রাশিয়াতেই সর্ব্বপ্রথম সম্পত্তিপ্রথা বিলোপ পাইয়াছে। যাহা হৌক এ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিবে সন্দেহ নাই: প্রেম সম্বন্ধেও মানুষের

মতান্তর কোন দিন হ্রাস পাইবে বলিয়া মনে হয় না, কারণ হ্যাভ্‌লক ইলিস বলিয়াছেন, প্রেম জীবনেরই মত অনির্দ্দেশ্য এবং অনিরূপ্য ! কিন্তু একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধটী ভাষায়, ভঙ্গীতে অনবদ্য হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রবন্ধে এবং পুস্তক সমালোচনায়ও কবিতার হৃদয়গ্রাহিতা পূর্ব্ববৎ বজায় রহিয়াছে।

অনিল চন্দ্র রায়

প্রথম প্রশ্ন—

শ্রীরাইমোহন সাহা। মূল্য ৩৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স প্রকাশিত।

প্রগতিশীল বাঙালী জাতির চিন্তা ও কর্মের ধারা যে পথকে আশ্রয় করে চলেছে, জাতীয় জীবনে আজ যে সমস্ত সমস্যা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে, জাতির সমাজ-জীবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে ধরা পড়েছে তার স্পন্দন। রবীন্দ্রনাথ হতে সুরু করে আধুনিকতম সাহিত্যিকের লেখনীতে সে প্রাণ চাঞ্চল্যের সাড়া পাই। রাষ্ট্রক্ষেত্রের মতো সাহিত্যেও বেজেছে গণতান্ত্রিকতার সুর। শূদ্র আজ আর অপাংক্তেয় নয়, সাহিত্যের ভোজ সভায় তারও আসন পাতা হয়েছে। মানুষে মানুষের অবাধ মিলনক্ষেত্রে আমাদের সমাজের কড়া নিষেধের গণ্ডী যে নিবিড় আড়ষ্টতায় পরিণত হয়েছে, মানুষের অন্তরাত্মা যে সব কালে ও সর্বদেশে চরম মূল্য প্রাপ্তির দাবী করে এইটে হচ্ছে গ্রন্থকারের অন্তর্নিহিত চরম লক্ষ্য। শুধু মাত্র ক্ষুদ্র সমষ্টি নয়, মানুষের ব্যক্তিগত জীবন নয়, সমগ্র মানব জাতি, বৃহত্তর সমাজ একদিন এই চরম সত্য উপলব্ধি করবে মানবতার মূল্য দিতে, তবে মিলবে শান্তি ও স্বাধীনতা রাষ্ট্র ও সমাজ জীবনে। গ্রন্থকার ফেরীওয়ালা পমু অথবা ক্ষুদ্র অনুপম রায়, বিপ্লবী লেখকের জীবনাদর্শে এ সত্য প্রচার করেছেন। পমু ফেরীওয়ালা। সে তৈজসাদি ক্রয় বিক্রয়ের বিনিময়ে মানুষের হৃদয় নিয়েও কারবার করে, অর্থের সঙ্গে অন্তরের কোমল অনুভূতির আদান প্রদান। এমনি করে তার পরাণ মণ্ডল, নইমদ্দি মাতব্বর জজবাবু সকলেই তাঁকে স্নেহ করেন, আত্মীয়গণ্য করে। বেথুন কলেজের উপাধিধারী মায়া, দেশ-সেবিকা কমলা দেশাই, সকলেই তার গুণমুগ্ধা, কিন্তু জজবাবুর মেয়ে বীণার দাবী আরোও গভীরতর। কিন্তু চণ্ডাল বংশোদ্ভব পমু বীণার দাবী পূরণ করতে অক্ষম। বীণার কম্পিত প্রশ্ন "এমনি অন্ধকারেই কি চিরকাল থাকবো" সহ অন্ধকার নদীগর্ভে চিরতরে মিলিয়ে গেল। এমনি আর একটী চিত্র ফুটে উঠেছে ব্রাহ্মণ কন্যা মায়া ও শূদ্র পরেশের জীবন আলেখ্য। সেখানে সেই ব্যর্থতা।

পৃথিবীর ইতিহাসে বহিঃ ও অন্তর্বিপ্লবের আভাস বারে বারে প্রকাশ পেয়েছে সাহিত্যকে মুখপত্র করে, নানা জিজ্ঞাসা, দ্বন্দ্ব, সমস্যা পথের প্রশ্ন সেখানে এসে ভিড় করেছে, মানুষের জীবন দিয়ে সে সবের সমাধানের প্রচেষ্টা চলেছে ; জীবন ইতিহাসে দেখি উদ্যম, সাহিত্য আনে ইঙ্গিত।

মীমাংসা নিরসনের দায় সাহিত্যিকের নেই, তিনি শুধু সমাজের স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত অসংখ্য জটিলতার দিকে সঙ্কেতসূচক অঙ্গুলি নির্দ্দেশে ক্ষান্ত রহেন। সুতরাং প্রথম প্রশ্নে যদি তাই পাওয়া যায় তো বিস্মিত হই না। সাহিত্যিক সংস্কারক নন, কিন্তু জীবনের অগ্নিগর্ভ অনুভূতি ও সংবেদনার পরিণতি স্বেচ্ছাকৃত মৃত্যুবরণে,' আত্ম-হত্যায় রেহাই পাওয়া ? প্রশ্ন প্রথম সুতরাং উত্তরও প্রথম শ্রেণীর হওয়া চাই, নইলে যদি সেই গতানুগতিক সাবেকী ঘটনার পুনরাভিনয় হয় তাহোলে বিপ্লবী সাহিত্যিকের বৈপ্লবিক বৈদ্যুতির অভাববোধ জাগে। এখানে 'গোরা' ও 'দত্তা' এই দুখানির উল্লেখ বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বিশেষত গোরাতেও প্রথম প্রশ্নের মত নানা সমস্যা সমন্বিত। সুতরাং গ্রন্থকার যে প্রশ্ন তুলেছেন তা প্রথম প্রশ্ন নয় চিরন্তন প্রশ্ন। কিন্তু এ কথা সত্য লেখকের একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে দেখার, জীবন সমস্যা পর্য্যালোচনার, বেদনা রূপায়িত করার। ভাষার সুষ্ঠুতা ও বর্ণনার ভঙ্গীটী ভালো। আমাদের আধুনিক জীবনের গতি ছন্দটী তার লেখনীতে ধরা পড়েছে—নগণ্য ফেরীওয়ালাকে উচ্চাদর্শে তুলে ধরে আধুনিক প্রোলেটারিয়েট সাহিত্যের আভাস দিয়েছেন।

বাণাপাণি রায়
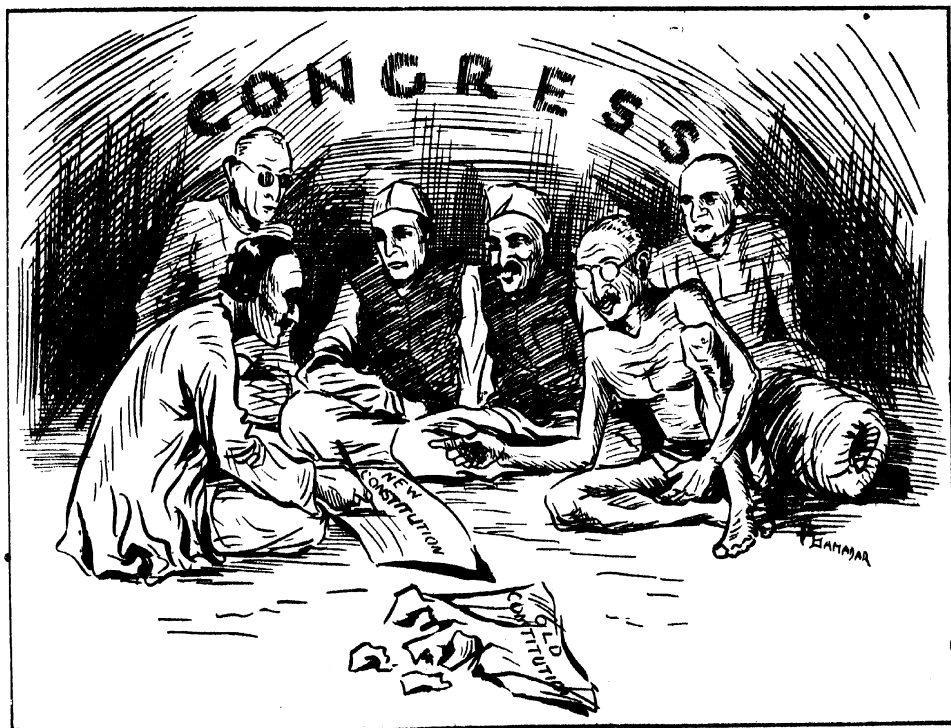
ব্রহ্ম-লিপি

সম্পাদকীয়

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন

গত ১৪শে জুন নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বম্বে অধিবেশন জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সঙ্কটসঙ্কুল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও জাতীয় সমস্যার মধ্যে বম্বে অধিবেশন সুরু হয়। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ অভিভাষণের ভূমিকায় তা বলেন। (The international situation was continually on the verge of crisis & many of our national problems have also reached a critical stage).

ত্রিপুরীতে কংগ্রেস গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য যে সাবকমিটি নিয়োজিত হয়েছিল, সে কমিটির রিপোর্ট আলোচনা করার জন্যই মুখ্যত বম্বে অধিবেশন হয়। তা ছাড়া আসন্ন সমরে ভারতবর্ষ যুদ্ধবিরোধী আন্দোলন কিভাবে কার্যকরী করবে, গান্ধিজীর 'নূতন পদ্ধতি, ('new technique')র ফলে রাজকোটে সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার, প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত কংগ্রেসের সম্বন্ধ, ভারতীয় প্রবাসী ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে যে সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, এ অধিবেশনে তা আলোচিত হয়।

আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হয়ে কংগ্রেস হঠাৎ কেন গঠনতন্ত্রের পরিবর্তনে এত বদ্ধ পরিকর এ প্রশ্ন সবার জেগেছে। 'দেশ এখনও প্রস্তুত হয় নি' এ অজুহাতে নেতৃস্থানীয় অনেকে সংগ্রামশীলতার চেয়ে নিয়মানুগামীতার নিরাপত্তা পছন্দ করেন। বামপন্থীদের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি কংগ্রেসকে সংগ্রামের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পুরাতন কংগ্রেস-নায়কগণ (old-guards) সংগ্রাম বিমুখ। কাজেই কংগ্রেসে নিরুপদ্রব অস্তিত্ব ও আধিপত্য বজায় রাখতে হলে বামপন্থী বিতাড়ন (purge) দক্ষিণ পন্থীদের একান্ত দরকার। শুদ্ধির (to purify) নামে গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের যে অভিনয় হয়েছে তার প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য হল বামপন্থীদের কংগ্রেস হতে বহিষ্কার করা। এর বিপদ-সঙ্কেত (S.O.S.) ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের প্রথম দিনে হরিজন প্রকাশিত মহাত্মাজীর প্রবন্ধে 'এর অন্তর্নিহিত অর্থ' (Its Implications)। উক্ত প্রবন্ধে তিনি বলছেন 'আমি কয়েক বছর যাবতই বলে আস্‌ছি সত্যাগ্রহের সময় উপস্থিত হয় নেই। কংগ্রেস দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ চালাতে অক্ষম। এর ভিতর দুর্নীতি আশ্রয়লাভ করেছে। কংগ্রেস সেবীদের মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব দেখা যাচ্ছে। কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী দল প্রবেশ লাভ করেছে,

সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলে এরা কংগ্রেসের কর্মনীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করবে। এখন পর্যন্ত সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি দেখে আমি বিন্দুমাত্র স্বস্তি বোধ করছিনা। (I have been for some years saying that there is no warrant for resumption of Satyagraha. The reasons are plain. The Congress has ceased to be an effective vehicle for lauuchlng nation-wide satygraha. It has become unweildy, it has corruption in it. There is indiscipline among Congressmen & rival groups have come into being which would radically change the Congress programme, if they could secure the majority. That they have so long failed hither to secure it, is no comfort to me.

একথা গুলির 'অন্তর্নিহিত অর্থ' (Implications) মনে থাকলে ওয়াকিং কমিটির অধিবেশন ও পরবর্তী অনুষ্ঠান বুঝতে কারো অসুবিধা হবে না।

অধিবেশনের অন্যান্য প্রস্তাব ও নির্ধারণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল—

গঠনতন্ত্র সংশোধন, দুর্নীতি দমন, প্রাদেশিক কংগ্রেস ও মন্ত্রীসভার সম্পর্ক, সত্যাগ্রহে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি ও শাস্তি মূলক ব্যবস্থা।

গঠনতন্ত্র সংশোধন ও দুর্নীতি দমনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ তার অভিভাষণে বলেন 'বর্তমানে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে, কংগ্রেসের শক্তি বৃদ্ধির সাথে সাথে অনেক দুর্নীতি মূলক কার্যের অনুষ্ঠান ও ভূয়া সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। কংগ্রেসের মধ্যে অনেক গোলযোগকারী ও কংগ্রেস বিরোধী দল প্রবেশ লাভ করেছে। কংগ্রেসের সর্বপ্রথম সমস্যা হচ্ছে যে এ প্রতিষ্ঠানের পূর্বোক্ত দোষগুলি নিরাকরণ'। একথাগুলি মহাত্মার 'Its Implications' এরই প্রতিধ্বনি।

১। সংশোধন প্রস্তাবের মৌলিক দিক হল ভোটাধিকার লাভ করবার পূর্বে প্রাথমিক কংগ্রেস সদস্যকে অন্ততঃ এক বছর কাল সদস্য তালিকাভুক্ত থাকতে হবে। প্রতিনিধি নির্বাচনে অথবা জেলা রাষ্ট্রীয় সমিতিতে প্রবেশ লাভ করার অধিকার থাকবে শুধু তাদের যারা একাদিক্রমে তিন বছর সভ্য শ্রেণীভুক্ত আছেন।

এ সংশোধনের প্রধান উদ্দেশ্য হল সভ্যশ্রেণীভুক্ত হতে বাধা সৃষ্টি করে উদবুদ্ধ সংগ্রামশীল গণশক্তিকে কংগ্রেসের বাইরে রাখা ও দক্ষিণ পন্থীদের নিরঙ্কুশ নিয়মতান্ত্রিকতার পথে চলা। জওহরলালও স্বীকার করেছেন যে সদস্য বা কর্মকর্তা নির্বাচনে এ ব্যবস্থা অতিরিক্ত বাধা নিষেধ আরোপ করবে।

২। প্রাদেশিক কংগ্রেস ও মন্ত্রী সভা—

এ প্রসঙ্গে মহাত্মাজী 'Implications' এ লিখেছেন (কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর আমরা ন্যায়ানুবর্তিতা পালন করতে পারি নেই। গভর্ণরগণ মন্ত্রীদের কাজে সামান্যই

হস্তক্ষেপ করেছেন। কংগ্রেসসেবী ও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানগুলি নানা প্রকারে গোলমাল বাঁধিয়েছে।......কংগ্রেস কর্মীদের দাবী মেটাতে ও তাদের বিরোধিতার সাথে সংগ্রাম করতে মন্ত্রীমণ্ডলীর অধিকাংশ শক্তি ব্যয়িত হয়েছে' (We have not done any thing like justice to the task undertaken by the Congress in connection with it. It must be confessed that the Governors have on the whole played the game ; there has been very little interference on their part with the ministerial actions. But the interference, sometimes irritating, has come from Congressmen & Congress organisations......Most of the ministerial energy has been devoted to dealing with the demands & opposition of Congressmen.) কাজেই কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলীকে নিরুপদ্রব নিয়মতান্ত্রিকতার পথে চলতে দিলে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির শাসন হতে মুক্তি দেওয়া দরকার। এ মর্মে প্রস্তাব ছিল যে শাসন কার্য সম্পর্কে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি মন্ত্রিবর্গের কার্যে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। কোন নীতি সম্পর্কে মন্ত্রীমণ্ডলী ও প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির মতভেদ হলে তা পার্লামেণ্টারী সাব কমিটির নিকট দেওয়া হবে। প্রকাশ্যে এ সব বিষয় আলোচনা হবে না। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী কমিটির সভাপতি ও গান্ধিজীর দক্ষিণ হস্ত স্বয়ং প্যাটেল মহাশয় এ প্রস্তাব আনেন। 'Thy will be done' এ মহৎ প্রেরণা হতেই যে ভক্ত প্রবর প্রস্তাব এনেছেন নিঃসন্দেহ। মন্ত্রীদের দৈনন্দিন কাজে হস্তক্ষেপ সমর্থন কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এ যাবৎ করে নাই করবেও না। কিন্তু নীতির বিচ্যুত যেখানে ঘটবে, নির্বাচন ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি যেখানে পালিত হবে না, সেখানেও কি সমালোচনার কণ্ঠরোধ করে কংগ্রেসের শক্তিবৃদ্ধি হবে? শাসনভার গ্রহণ করার পর প্রায় সমস্ত কংগ্রেস শাসনেই এরকম ত্রুটী-বিচ্যুতি ঘটেছে। গান্ধীজী থেকে আরম্ভ করে অনেক কংগ্রেসীই তার সমালোচনা করে ন্যায় ও নীতির আসনে মন্ত্রীদের অবিচলিত রাখতে চেষ্টা করেছেন। নেতৃত্ব আজ কিসের স্বপ্ন দেখে নুতন রাস্তা বেছে নিলেন?

৩। সত্যাগ্রহ নিষেধ আইনও ঠিক একই কারণে প্রবর্তিত হয়েছে। পর পর বিভিন্ন কংগ্রেসী প্রদেশে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছে। ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও আর্থিক উন্নতির অঙ্গীকার পালনে অক্ষম মন্ত্রীমণ্ডলী ক্রমেই অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছেন, গতানুগতিকতার আশ্রয় নিয়েছেন নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হোয়ে—"Power without struggle," (সংগ্রাম ছাড়াই ক্ষমতা হাতে আসবে।) কাজেই কংগ্রেসীদের সত্যাগ্রহের স্বাধীনতা আর তাঁদের মনঃপুত নয়। সত্যাগ্রহের ইচ্ছা জানিয়ে প্রাদেশিক সমিতির অনুমতি প্রার্থনা করতে হবে, জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে সত্যাগ্রহের অনুকূল সময় উত্তীর্ণ হবে, ব্যক্তি স্বাধীনতা হবে শাসনতন্ত্রের কবলিত, ব্যাপারটা হোয়ে দাঁড়াবে—'while Rome burns Nero fiddles.' কংগ্রেসী প্রদেশের কিষাণ ও শ্রমিক আন্দোলনই যে কংগ্রেস নেতৃত্বের আশঙ্কার কারণ এ কথা কারও অজ্ঞাত নেই।

কংগ্রেসী ব্যবস্থার এই নূতন অধ্যায় অকংগ্রেসী প্রদেশগুলির উল্লাসের কারণ হবে, তর্জনী হেলিয়ে তারাও বলবে "I told you so." ('আমরা তো আগেই বলেছিলাম এ রকমটা করা দরকার'।) কংগ্রেসী প্রদেশের চাপে পড়ে ব্যক্তি স্বাধীনতা যেটুকু প্রত্যার্পিত হচ্ছিল এবার সাহসে ভর করে তারা সবটাই ফিরিয়ে নিতে কুণ্ঠা বোধ করবে না। কারণ, কংগ্রেসী প্রদেশেই নজীর তৈরী হোতে আরম্ভ করেছে।

পট্টভি সিতারামিয়া ও দেশীয় রাজ্যে গণআন্দোলন

রাজকোটে মহাত্মাজী 'নূতন আলোর' সন্ধান পেয়েছেন। পথ ও পাথেয় দু'য়ের মধ্যে অভিনবত্ব না থাকলে পাওয়ার মূল্য অনেক কমে যায়। কাজেই 'নূতন আলো' প্রাপ্তির পরই আমরা শুনছি পথ ও পাথেয়র নূতন ব্যাখ্যা। পট্টভি সিতারামিয়া মহাত্মাজীর ভক্তবৃন্দের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় না হলেও বরেণ্য, এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ। কাজেই মহাত্মাজীর 'নব নব আলো' দর্শনের অভিনব ব্যাখ্যা পট্টভির ন্যায় একজন বিশিষ্ট ভক্তের দেওয়া খুব স্বাভাবিক। তিনি যদি এ ব্যাখ্যায় শুধু বিশ্বাস ও ভক্তির সাহায্য নিতেন তবে আমাদের 'বিশ্বাসে মিলিবে কৃষ্ণ, তর্কে বহু দূর' ভিন্ন কিছু বলার থাকে না, কিন্তু তিনি যখন ভক্তিমার্গ ছেড়ে দিয়ে 'আপ্তবাণীকে' যুক্তি ও তর্কের আচ্ছাদনে উদ্ভাসিত করতে চান ('to clothe... with necessary reason and logic') তখন আমাদের দেখতে হয় সত্য সত্যই তার কথায় কতখানি যুক্তি আছে।

আলো দর্শনের ফলে মহাত্মাজী দেশীয় রাজ্যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন বন্ধ করে দিয়েছেন। এরূপ আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত সিদ্ধান্তে দেশব্যাপী এমন কি মহাত্মাজীর অনুচরবৃন্দের ভিতর বিক্ষোভ, অবিশ্বাস, নিরাশা ও বিরক্তি দেখা দিয়াছে ('decision, startling and unexpected, has evoked the wildest feelings of irritation, despair, distrust and even disgust in some of his followers')। কাজেই এটা দূর করার গুরুদায়িত্ব পট্টভি মহাশয় নিয়েছেন। এ মহৎ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য তাঁর সাধারণের নিকট ন্যূনতম দাবী হল 'মহাত্মাজী ও তাঁর দৈব সিদ্ধান্তগুলি বুঝতে হলে মহাত্মাজী সম্বন্ধে কতগুলি তথ্য ও তিনি সত্যাগ্রহ সমস্যাটি কি মনোবৃত্তি নিয়ে সমাধানের চেষ্টা করছেন তা সর্বাগ্রে দেখা উচিত'। (If we want to understand him and appraise his decision correctly we must also share the knowledge of these facts and further we must put ourselves in his mood of approach in regard to the solution of the problems of Satyagraha) সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে পট্টভি মহাশয় কি নূতন তত্ত্ব বা তথ্য দিয়েছন দেখা যাক।

সুরুতেই বল্‌ছেন 'সবাই জানে সত্যাগ্রহ একটি নব বিজ্ঞান ও নব কলা-কৌশল।' (Satyagraha, as we all know, is a new Science and Art.)

যুক্তিনির্ভর বস্তুনিষ্ঠতা বিজ্ঞানের প্রধান ধর্ম এবং বুদ্ধি তার শ্রেষ্ঠ সম্বল। কিন্তু মহাত্মাজী

বিচার বুদ্ধির চেয়ে 'ঐশবাণী' (Inner calls), সহজ প্রবৃত্তির উপর বেশী নির্ভরশীল ('Gandhiji senses things and decides by instinct.')

গান্ধিজীর সত্যাগ্রহ ও অন্যান্য কর্মপদ্ধতি বিচার বুদ্ধির চেয়ে সহজ প্রবৃত্তি দ্বারা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। পট্টভি মহাশয় তার কংগ্রেসের ইতিহাসে অনেক পূর্বে সে কথা উল্লেখ করে গেছেন ('Gandhi's plans (Satyagraha) have all along been revealed to him by his own instinct, not evolved by the cold, calculating logic of mind. His inner voice is his mentor and monitor, his friend, philosopher and guide'—History of the Congress pp. 630.)

যে সত্যাগ্রহ বিচার বুদ্ধি বা বিশ্লেষণ সাপেক্ষ নয় তাকে নব বিজ্ঞানের আখ্যায় কিভাবে ভূষিত করা যায় শ্রীযুত পট্টভি জানলেও সবাই তা জানে না। কাজেই 'as all know' কথাটা তার নিছক কল্পনাপ্রসূত এবং ভ্রান্ত। সত্যাগ্রহকে নব বিজ্ঞানের পর্যায় ফেলে পট্টভি মহাশয় তাঁর মহা প্রশাস্তির যে ভূমিকা করেছেন তা প্রথমেই অগ্রাহ্য ও বর্জনীয়।

দেশীয় রাজ্যে সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করার ঐতিহাসিক নজির দিতে গিয়ে পট্টভি মহাশয় বলেছেন গান্ধী নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এরূপ সিদ্ধান্ত পূর্বে আরো দু'বার হয়েছে, কাজেই ইহা অপ্রত্যাশিত বা আকস্মিক নয়।

১৯২২ সালে চৌরীচৌরা হত্যাকাণ্ডের পর আইন অমান্য আন্দোলন মহাত্মাজীর আদেশে বন্ধ হল। ১৯৩৪ সালেও ঠিক তাই করেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে যে দেশের এবং জাতীয় সংগ্রামের যে অবস্থায় তখন অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করা হ'য়েছিল, এখন অনুরূপ অবস্থা কিনা যেজন্য সত্যাগ্রহ সেনাপতি ও তাঁর অনুচরবর্গ রণবিমুখ?

১৯২২ ও ১৯৩৪ সালে দেশে নানারূপ উত্তেজনা, হিংসামূলক বা হিংসা উদ্দীপক দু'চারটী ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে দেশের অবস্থা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। মহাত্মাজী আকাশে বাতাসে হিংসার গন্ধ পেলেও (I smell violence in the air), বাস্তবিক পক্ষে দেশে হিংসার কোন অস্তিত্ব নেই। বাস্তবকে উপেক্ষা করে অহৈতুক আশঙ্কাকে বড় করে তোলার বিভীষিকা নেতাদের সাম্‌নে ভেসে উঠছে। দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন থাকলে সে বিভীষিকার তাড়নায় নিজেদের চিত্ত দৈন্য বা সংগ্রাম বিমুখতা অনেকখানি দেশবাসীর নিকট প্রকাশ পেয়ে যাবে। কাজেই 'ঐশবাণী'র নানা টীকা ভাষ্য করে দেশবাসীকে বুঝাতে হল, আন্দোলন কেন বন্ধ করা হয়েছে ;

'সত্যাগ্রহ সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছে, চিরকালের জন্য বন্ধ হয় নেই।' ('though Satyagraha is to be wound up it is not going to be stopped for ever. It is only suspended.')

এ সাময়িক রণ বিরতির কারণ হল উপযুক্ত আয়োজনের অভাব (Suspended because the necessary preparation for Satyagraha is wanting.)

বামপন্থী সমন্বয় (Left Consolidation)

স্বীয় কক্ষপথে পরিক্রমণ করে বামপন্থীরা এতদিন সাম্রাজ্যবাদ লোপ করবার ফিকির আঁটছিল। দক্ষিণপন্থী অসহিষ্ণুতা, বামপন্থী সাফল্যে ক্রমেই বৃদ্ধি হোয়ে কংগ্রেসের রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা বিভেদের অস্পষ্ট ছায়াপাত করে আসছে, গত দুই বৎসর যাবৎ। ত্রিপুরীর অধ্যায়ে বিভেদ স্পষ্ট হোয়ে উঠলেও বিভেদের মূল ছিল আড়ালে। বামপন্থী সংহতি অথবা সমন্বয়ের অভাবে বামপন্থী ঐক্যবদ্ধতার (United Front) ঐকান্তিকতা ত্রিপুরীতে দক্ষিণপন্থী গোঁড়ামির নিকট আত্মনিবেদন করেও পরিতৃপ্ত হয় নাই। ত্রিপুরীর পরাজয় বামপন্থীদের আত্ম-সম্বিৎ ফিরিয়ে আনবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। ঐক্যবিমুখ দক্ষিণীদের নিকট জাতীয় সংহতির (United Front) আবেদন আর একবার ব্যর্থ হয় ক'লকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নিখিলভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে, কারণ, দক্ষিণপন্থী স্বৈরসংহতির বামপন্থী দুর্বলতার কথা অজানা ছিল না।

পরাজয়ের গ্লানি বহন করেও বাম-সমন্বয় ঘটে উঠছিল না। সুভাষচন্দ্রের ফরোয়ার্ড ব্লক এই প্রচেষ্টাকে দ্রুত করে তোলে এবং শেষ পর্য্যন্ত বোম্বাই নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনের প্রাক্কালে এই সমন্বয় ঘটে। এই সমন্বয় হোয়েছে সোস্যালিষ্ট, কমুনিষ্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক, রায়-পন্থী ও অন্যান্য বিচ্ছিন্ন বামদলের প্রতিনিধি নিয়ে। বামসংহতির কেন্দ্র হোয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে বামপুষ্টি সাধন করে দক্ষিণী নিয়মতান্ত্রিক সংগ্রামবিমুখতাকে খর্ব করা হবে বাম-সমন্বয় কমিটির সর্ব্বপ্রথম এর সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। বাম-সমন্বয় থেকে বামসংহতি বেশীদূরের পথ নয়। সত্যিকারের বাম সংহতির যেদিন সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে সেদিন পুরোপুরি জাতীয় সংহতি সম্ভব হবে। কারণ, দক্ষিণীরা তখনই রাজী হবে ঐক্যসাধনে (United Front), অথবা নেতৃত্বের পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে। সেই ঐক্য হবে সংগ্রামের ভিত্তিতে, জাতির অগণিত জনগণের সম্বুদ্ধ চেতনার নিঃসংশয় আশ্রয়ে।

সমন্বয়ের ঐতিহাসিক পরম্পরা আলোচনা করলে সে ভরসা পাওয়া যায় না। এ উক্তি আমাদের সন্দেহাতুর মনের বহিঃপ্রকাশ নয়। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধন প্রস্তাবে বামবিতাড়নের ব্যবস্থাই আসন্ন আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে বামশক্তিগুলিকে সমন্বয় সাধনে বাধ্য করে। স্বেচ্ছায় সমন্বয় অর্থাৎ বামকর্ম্মপন্থার দ্রুত প্রসারের একনিষ্ঠ উদ্দেশ্যে সমন্বয় ও পারিপার্শ্বিকের চাপে পড়ে বিভিন্নমুখী শক্তির সমন্বয়ে প্রভেদ অনেক। বামপন্থী সমন্বয় যদি সংহতিতে পরিণত হবার উৎসাহ হোতে বঞ্চিত হয় তবে এই কারণেই হবে। বোম্বাই সমন্বয়ের দুর্ব্বলতা এইখানেই। আমরা আশা করি ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে বামপন্থীদের গুরুদায়িত্ববোধ সংহতির অন্তরায় দূর কোরে প্রকৃত সংহতি সাধন করবে।

৯ই জুলাইয়ের প্রতিবাদ—

সত্যাগ্রহ ও কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কার্যের সমালোচনায় বিধিনিষেধ আরোপ করে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিতে গৃহীত প্রস্তাবের প্রতিবাদ বামসমন্বয় কমিটির উদ্যোগে গত ৯ই জুলাই সারা দেশে

করা হোয়েছে। বামসমন্বয়ের এই প্রচেষ্টায় কংগ্রেসের শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ভঙ্গ করা হোয়েছে —জওহরলাল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও কৃপালনী এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। উভয় পক্ষের বাদানুবাদে যে ঝড় উঠেছে তা'তে প্রতিপক্ষ বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের সীমারেখা টানতে ভুলে গিয়ে অনর্থের সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে জওহরলালের দায়িত্ব সব চাইতে বেশী। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত যদি মূলনীতিকে ব্যাহত করতে চায়, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রতিবাদ ও আন্দোলন করবার প্রাথমিক অধিকারকে 'উপেক্ষা' ও 'বিদ্রোহে'র আখ্যা দিলে হিতের চাইতে অহিতই করা হয়। জওহরলাল এ দায় এড়াতে পারেন নাই। কিন্তু, আন্দোলন থাকবে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ, বাইরের জনসাধারণের কাছে অন্তর্বিরোধ তুলে ধরা অসমীচীন ও অকল্যাণকর। গত ৯ই জুলাইয়ের প্রতিবাদে বামশক্তি এ বিষয়ে আশানুরূপ সচেতন ছিল না।

এই প্রস্তাব দুইটির অন্তর্নিহিত অর্থ আমরা অন্যত্র আলোচনা করেছি। নিয়মতান্ত্রিকতাকে মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় বলে যাঁরা বেছে নিতে চান গণ-সংগ্রাম তাঁদের অবাঞ্ছনীয় হবেই, সেই একই কারণে আলোচ্য বিধিনিষেধও তাদের অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। বোম্বাইয়ে বল্লভভাইয়ের একটি উক্তি এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যায়—"আমরাও বিপ্লবের পক্ষপাতী কিন্তু ইহার জন্য জনসাধারণকে মন্ত্রীসভাসমূহকে শক্তিশালী করিতে হইবে।" ["Power has the habit of corrupting even the noblest of those who exercise it. ......Power has always to be organised for action in accordance with rules, and that the obedience of the community has been proffered to the government only when it abides by those rules . Power, that is to say, when vested in a number of persons, is not only limited as to method, but also as to the objects to which it can be directed." (Laski)] কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষমতা ব্যবহৃত হবে সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্যে। সেখানে তাদের কার্যকলাপ বিপরীত ব্যবস্থারই আভাস দিচ্ছে। এ অবস্থায় ৯ই জুলাই বামসমন্বয় জাতীয় সংহতির কাছে তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করেছে মাত্র।

এই উপলক্ষে 'alternative leadership' (নেতৃত্বান্তর) এর উদ্গাতা রায়ের ব্যবহার বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। নেতৃত্বের পরিবর্তনেই যাঁর মনোযোগ নিয়োজিত নেতৃত্বের সংগ্রামবিমুখতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে তিনি অসম্মত। এই স্ববিরোধী ব্যবহারের কারণ দেখিয়ে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে অবস্থার উন্নতি হয় নাই। রায় বামধর্মের নূতন ভাষ্য দিয়েছেন !

আলোচ্য প্রস্তাব দু'টির অসারতা ইতিমধ্যেই প্রতিপন্ন হোয়ে গেছে। রোটাকে সমাজতন্ত্রী কনফারেন্সের পথে পাঞ্জাবে পৌঁছবামাত্র আচার্য নরেন্দ্র দেবের উপর পাঞ্জাব গভর্ণ-

মেণ্ট নিষেধাজ্ঞা জারী করে। নরেন্দ্র দেব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতির নিকট তার করে অনুমতি পাওয়ার পূর্বেই আইন অমান্য করেন।

সম্প্রতি জওহরলাল 'ন্যাশনাল হেরাল্ডে' যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী গভর্ণমেণ্টের তীব্র সমালোচনা করেছেন 'গাইন সার্কুলার' উদ্দেশ্য করে। নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির প্রস্তাবানুযায়ী জওহরলাল ও নরেন্দ্র দেব উভয়েই 'বিদ্রোহী'। সুতরাং, বামসমন্বয়ের প্রতিবাদ যে সময়োচিত হয়েছে তা বলা নিষ্প্রয়োজন।

ফেডারেশন ও রাজন্যবর্গ—

হায়দারী কমিটির রিপোর্ট আলোচনা করে কিছুদিন পূর্বে বোম্বাই সম্মেলনে রাজন্যবর্গ ফেডারেশনে যোগ দিতে অসম্মতি প্রকাশ করেছিলেন; কারণ, পরিবর্তিত (Instrument of Accession এ) ব্যবস্থায়ও তাদের অধিকার যথাযথ রক্ষিত হয় নাই বলে তাঁরা মনে করেন। ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী অধিকাংশ রাজন্যবর্গের সম্মতি ব্যতীত ফেডারেশন চালু হোতে পারে না (The states, the rulers whereof will be entitled to choose not less than 52 members of the Council of state and the aggregate population whereof amounts to one half of the total population of the states shall have acceded to the Federation)। দেশীয় রাজ্যে নিজ নিজ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রেখে ফেডারেশনে অপ্রতিহত ক্ষমতা প্রয়োগ করার স্বাধীনতা না থাকলে সামন্ত নৃপতিরা ফেডারেশনে যোগ দিতে নারাজ। সামন্ত নৃপতিদের মনোভাবে White Hall এর টনক নড়েছে। যবনিকার আড়ালে যে লেন-দেনের মহড়া চলেছিল সাম্রাজ্যবাদের তাগিদে এবার সবই উল্টে যাবে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের দৌলতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট বেশীদিন বর্তমান অবস্থায় চলতে পারে না, তার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী—সে সামন্ত-ভারত রাজী থাকুক আর নাই থাকুক। এদিকে প্রত্যাসন্ন যুদ্ধে ভারতবর্ষের রণ-ভাণ্ডার সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনের অপেক্ষায় আছে। সুতরাং, সার্বভৌমশক্তি আত্মরক্ষার মূলসূত্র অনুযায়ী সামন্তভারতের আপত্তি উপেক্ষা করেই চলবে।

ইতিমধ্যেই লোকচক্ষুর অন্তরালে আলাপ আলোচনা ফলপ্রসূ হতে আরম্ভ করেছে। বরোদা, মহীশূর, কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর প্রভৃতি রাজ্যগুলি সার্ব্বভৌমশক্তির যাদুস্পর্শে ফেডারেশনে যোগ দিতে সম্মতি দিয়েছে। অনতিকালে অন্যান্য অনগ্রসর ও প্রাগ্রসর রাজ্যগুলিও রাজী হবে আশা করা যায়। সাম্রাজ্যবাদ ও দেশীয় রাজ্যের শিথিলগ্রন্থি পুনরায় দৃঢ় হতে চলেছে। সামন্ত-ভারত সম্পর্কে কংগ্রেসের নূতন পদ্ধতি (new technique) এই বন্ধনকে আরও দৃঢ়তর কোরে তুলবে। দেশীয় রাজ্যে স্বায়ত্ব শাসনের জন্য গণআন্দোলন ফেডারেশন প্রতিরোধ করতে পারে, কিন্তু সে সম্ভাবনা কৈ? বোম্বাই সম্মেলনের পরে রাজেন্দ্রপ্রসাদজী ফেডারেশন সম্পর্কে মূল আপত্তির কারণ দেখাতে দিয়ে স্বায়ত্ব শাসনের সঙ্গে স্বৈর-শাসনের অদ্ভূত মিলনের কথা উল্লেখ করেছেন, ফেডারেশনের স্বৈর ব্যবস্থার কথা তাঁর মনে পড়ে নাই।

রাজনৈতিক বন্দীদের অনশন

সুদীর্ঘকাল মুক্তির জন্য প্রতীক্ষা করে অবশেষে রাজনৈতিকবন্দীগণ প্রয়োপবশেন সুরু করেছেন। মহাত্মা গান্ধীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে তাদের যে ভাগ্য পরিবর্তিত হবে এ আশা দেশবাসী করেছিলো। কিন্তু ফল কিছুই হয়নি, রাজনৈতিকবন্দীদের অবস্থা অনির্দিষ্টকালের জন্য আজও অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এ সম্বন্ধে এখনো কর্তব্য নির্দ্ধারণ করতে পারেন নাই, মহাত্মা গান্ধী তাদের অনশন সমর্থন না করলেও তাদের জন্য যথাসাধ্য করবেন তার প্রতিশ্রুতি দিতেছেন।

রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রবল দাবী দেশের সর্বত্র উঠেছে। এ প্রবল জনমতের বিরুদ্ধে বাঙ্গলা সরকার আর কতদিন নির্বিকার থাকবেন ?

ইয়োরোপের হালচাল

আসন্ন কুরুক্ষেত্রের উদ্যোগপর্ব পূরোদমেই চলেছে। শুধু উদ্যোগ নয়, আস্ফালন-পর্বও বলা চলে। ইয়োরোপের ষ্টেজ জুড়ে আজ এই তুপালাই চলেচে। তাপমান যন্ত্রে বড় জোর তু'এক ডিগ্রীর কম্‌তি বাড়তি হচ্ছে। অমন যে air conditioned (তাপ-সাম্যের ব্যবস্থা করা) ঠাঁই ডাউনিং ষ্ট্রীট' সেখানেও আবহাওয়া ঠাণ্ডা নয়। হ্যালিফ্যাক্স-এর বক্তৃতায় বরফের ছোঁয়াচ নেই। ক্যাবিনেটে কিছু রদ-বদল হওয়াও হয়তো অসম্ভব নয়। দেশের লোকগুলোও জ্বালাতন আরম্ভ করেছে,—চার্‌চিল, ইডেন, ডাফ্‌ কূপারের সঙ্গে হাত না মিলোলে চেম্বারলেনের পক্ষে সোরগোল থামানো সম্ভব হবে কিনা সন্দেহ। চেম্বারলেন মানুষটি ভাল 'has some notable qualities that have won him widespread respect' কিন্তু 'his inexperience of foreign affairs is such that he falls an easy victim to illusions that would never have deceived any less simple mind.'

ঘোর কলিতে এ হেন ভালোমানুষী অচল। আপত্তি থাক্‌লেও তাঁর রাজনৈতিক শত্রুদের আমন্ত্রণ জানাতেই হবে তা ঠিক।

কায়েমি শান্তি না হোক্, অন্ততঃ কিছুকালের জন্যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাওয়া যেতো যদি ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তির কিছু হদিস্ মিলতো। ডেমোক্রেসীর গ্রহবৈগুণ্যে চুক্তির আলোচনা প্রায় একশোদিনেও শেষ হোলো না। পরোক্ষ আক্রমণ কাকে বলে, যুদ্ধের সময় কোন্ কোন্ দেশকে অভয় দিতে হবে, রাজনৈতিক চুক্তিকে সাম্‌নে রেখে একটা সামরিক চুক্তিও খাড়া করা দরকার কিনা এ সব সমস্যার সমাধান যে কবে হবে তা ভবিতব্যই জানে। মোলোটভের বৃহদায়তন মস্তকে কূট রাষ্ট্রনীতির স্থানাভাব নেই, স্তোকবাক্য বা কৃত্রিম 'আন্তরিকতা'য় তাঁকে ভোলানো কঠিন। তু'পক্ষই যে বিষম সন্দেহের বোঝা বয়ে বেড়াচ্চে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া কারও সহজে সম্ভব নয়। সোভিয়েট হয়তো ভাব্‌ছে হিট্‌লারকে পূবের দিকে মুখ ফিরিয়ে দিয়ে

পশ্চিমে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলাই ডেমক্রেসীগুলোর পররাষ্ট্রনীতির মূল কথা। এদিকে বৃটিশের দুর্ভাবনা হয়তো এই কথা ভেবে যে,—হাঙ্গামার ক্ষেত্রটাকে যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে নিজের পায়ে যতটা সম্ভব কম আঁচড় লাগিয়ে সোভিয়েট চায়.ধনতন্ত্রের ঘরোয়া লড়াই যাতে বিশ্ব-বিপ্লবের পরিকল্পনা আকাশ থেকে নেমে এসে সহসা হাতের মুঠোর মধ্যে বাস্তব রূপ নেয়। এই সন্দেহের প্রতিযোগিতা কোথায় গিয়ে থাম্‌বে বলা সহজ নয়। তবে আপৎকাল উপস্থিত হলে পণ্ডিতজন 'অর্দ্ধং ত্যজতি'। স্বস্তিকের দম্ভে অস্বস্তি আজ এমন চরমে এসে উপস্থিত হয়েছে যাতে আদর্শের রেষারেষি সম্বন্ধে অতঃপর বেশীদিন অ-পণ্ডিত হয়ে থাকা চলবেনা।

আপাতদৃষ্টিতে ডানৎজিক্ সমস্যাটার জোয়ার কেটে গিয়ে এখন ভাঁটার সময় পড়েছে। হিট্‌লার মুহূর্তে মুহূর্তে অগ্নি-উদ্গীরণ না করে' উদ্যান-বাটিকায় বিশ্রাম নিচ্ছেন, জার্মাণ খবরের কাগজগুলো অর্থাৎ গোয়েবেলস এর প্রোপাগাণ্ডা যন্ত্র ততটা মুখর নয়। ডানৎজিকে অস্ত্রচালাচালিও একটু মন্দা পড়েছে। ব্যাপার কি ? 'ফুয়েরার কি হাল ছেড়ে দিলেন ?' কিন্তু ভাঁটাই শেষ নয়, পুনশ্চ আছে জোয়ার-এ নৈসর্গিক নিয়ম রাজনীতির ক্ষেত্রেও অপ্রযোজ্য নয়। জার্মানীর ভাগ্যবিধাতা হয়ত এইটুকু বোঝবার চেষ্টা করছেন যে ডানৎজিগ্‌ এর ব্যাপারে মিউনিখের পুনরাবৃত্তি হওয়া সম্ভব নয়। ত্রি-শক্তি চুক্তির সম্ভাবনা, বৃটিশ মন্ত্রীমণ্ডলীর সুষুপ্তির থেকে সুপ্তি অবস্থায় পৌঁছানো, পোলাণ্ডের চোখরাঙানী, বেক্-আয়রনসাইড মোলাকাৎ যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিক থেকে একেবারে অবাস্তব—এ কথা ভাববার মত মূঢ়তা হিট্‌লারের নেই। নেহাৎ ভালোমানুষ সেজে তিনি বলেছেন, 'বাইরের উস্কানি বন্ধ হলে ডানৎজিক্ প্রশ্নের মীমাংসা সরল হয়ে যায় ; একটা আপোষ সম্বন্ধে আমি খুবই আস্থাবান।' কিন্তু এই ভালোমানুষী পালা শেষ হতে না হতেই ডানৎজিকের নাৎসী নেতা ফষ্টার এবং প্রোপাগাণ্ডানায়ক ওজাস্‌কে নিজমূর্তি ধরেছেন। ডান্‌ৎজিকের পোল শাসনকর্তা মঃ চোডাকীকে প্রকাশ্য সভায় অপভাষণ করা হচ্ছে। হিটলারকে, রাষ্ট্রের ভাবী সভাপতি বলে প্রচার করা চলছে, শেখানো 'জনমত' রাইখ্‌-বন্দনায় মত্ত, 'হাইম্‌হ্বার (নাৎসী পল্টন) এর কুচকাওয়াজের কামাই নেই। Volkstum—জার্মাণ জাতির সংহতির চাহিদা যে অনিবার্য সে কথা না বুঝলে কারও রেহাই নেই। তিরোলে 'Volkstum' কে জাহান্নামে যেতে দেওয়া হল কেন সে কথার জবাব দিতে বোধ করি 'ফুয়েরার বাধ্য নন! যাই হোক্, যারা 'মাইন্‌ কাম্‌ফ্‌' এবং তার অটল প্রতিজ্ঞ লেখককে চিনেছে তারা জানে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্মানীর ভবিষ্যত সম্পর্ক কি হবে। তারা জানে,—চুক্তি, আপোষ ইত্যাদি শব্দগুলোর হিট্‌লারী অর্থ কি। ১৯৩৪এ পিল্‌সুড্‌স্কীর সঙ্গে সই করা ১০ বছরের অনাক্রমণ চুক্তি চেক্ 'coup'এর পরেই যখন রসাতলে গেল, বাস্তব রাজনীতিবিদ্‌রা মোটেই অবাক্ হননি। ডানৎজিকের অবস্থান্তর পোলাণ্ডের পক্ষে অসহ্য ; কি কারণে সে অসহ্য তা মানচিত্র খুললেই বোঝা যায়। ডান্‌ৎজিকের যে কোন সরল সমাধান সম্ভব, এমন কথা আজ কেউ স্বপ্নের ঘোরেও দেখেন কিনা সন্দেহ। "স্বাধীন নগর"টিকে কেন্দ্র করে যে মেঘ ঘনিয়ে এসেছে তার মাঝ দিয়ে কিছুমাত্র আলো ইয়োরামেকার কোন রাজনীতি-

ধুরন্ধরই খুঁজে পাচ্ছেন না। ওয়েল্‌স সাহেব তাঁর The shape of "Things to come" বইয়ে একদা এই সহরকেই ইয়োরোপের ভাবী বিস্ফোরণ-কেন্দ্র বলে সাব্যস্ত করেছিলেন। এই খ্যাতি থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারে আপাততঃ এমন কিছুই চোখে পড়ছেনা।

চীন-জাপান

পূর্ব আকাশে যে মেঘ তত কালো হয়নি তার কারণ ইংরেজের অপূর্ব পরিপাক-শক্তি, ওরফে অক্ষমতা। টিয়েন্‌ট্‌শিনের লাঞ্ছনা নির্বিকারে সহ্য করতে হবে, ইংরেজের ভাগ্যলক্ষ্মী একদা এমন কথা ভাবতেও হয়তো শিউরে উঠ্‌তো! জাপান তারস্বরে ঘোষণা করছে, এটা একটা সাধারণ রাষ্ট্রনীতির আংশিক ব্যবহার মাত্র, এটা শুধু একটা স্থানীয় ব্যাপার নয়। তবু ইংরেজের কর্তৃপক্ষ মনকে প্রবোধ দিচ্ছেন এবং জাতিকে বোঝাবার ব্যর্থ প্রয়াস করছেন যে ঘটনাগুলো নেহাৎই স্থানীয় ও সাময়িক এবং অনতিদীর্ঘ আলোচনা সাপেক্ষ। 'সৌজন্যের দানে ও গ্রহণে' এগুলোর পরিসমাপ্তি হবে। বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি এই লুকোচুরি এই 'Sinister elasticity'কে আঁকড়ে ধরে কি লাভ করবে তা সেই জানে। ইঙ্গ-জাপান চুক্তির ভবিষ্যৎ যে ইংরেজের পক্ষে উজ্জ্বল নয় সে কথা স্বভাবতই মনে হয়। এশিয়া থেকে ইয়োরোপকে তাড়ানো, চাং-কাই-শেককে টুঁটি টিপে মারা, এক বিশিষ্ট আদর্শবাদকে এসিয়া ভূখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যগুলো যেখানে প্রেরণা জোগাচ্ছে সেখানে বৈঠকখানার আলাপে সুফল ফলবার আশা কোথায়? তার পরে রয়েছে গুরুতর অর্থনৈতিক সমস্যার জের। অপ্রত্যাশিতভাবে চীনা যুদ্ধটা দীর্ঘকালস্থায়ী হয়ে চলেছে, এদিকে ধনভাণ্ডার শীর্ণতর হচ্ছে। ধাপ্পাবাজী করে নকল মুদ্রা-বিনিময়ের ব্যবস্থা না করলে যুদ্ধ চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে। 'কন্‌সেশন' এলাকাগুলোর সঙ্গে বাইরের লোকের লেন-দেন থাকলে এই ধাপ্পা অচল। অতএব, অজুহাত যাই হোক না কেন, উদ্দেশ্যটা ভুললে চল্‌বেনা। অথচ 'কিমাশ্চর্য-মতঃপরং' বৃটিশ দপ্তরখানায় এ ভুল গা-সওয়া হয়ে গেছে। জাপান স্পষ্ট কথাতেই তার মনোভাব জানিয়ে দিয়েছে, একবার নয় বহুবার—তবুও অপরে যেখানে অন্ধকার দেখে বৃটিশ পররাষ্ট্রের দিব্য দৃষ্টি সেখানে উল্লাসে বলে ওঠে, 'Hail! Holy Light! দৃষ্টির এই নভোসঞ্চারী বৃত্তি রূঢ় প্রয়োজনের প্রেক্ষাপটে আত্মপ্রবঞ্চনার অভিনয় ছাড়া হয়ত আর কিছুই নয়;—তাও অভিনয়ের পঞ্চমাঙ্কের শেষ গর্ভাঙ্কে।
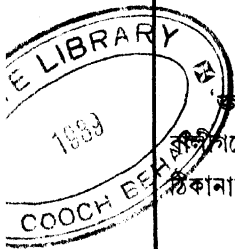
স্থান পরিবর্তন

'জয়শ্রী কার্যালয়' ১৯০।১ রাসবিহারী এভিনিউ, পোঃ আঃ বালীগঞ্জে উঠিয়া আসিয়াছে। পত্রিকা প্রবন্ধ ও পত্রাদি উপরোক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

পরিচালিকা—
জয়শ্রী

অষ্টম বর্ষ | ভাদ্র ১৩৪৬ | তৃতীয় সংখ্যা

বৈজ্ঞানিকের জগৎ

(দেশ ও কাল)

অনিলচন্দ্র রায়

বাহিরের দিকে তাকাইলে সংশয় ছাইয়া আসে। বস্তু নাই, দ্রব্য মিলাইয়া গিয়াছে—এ সব কেমনতর কথা! চারিদিকে দ্রব্যজাত ঠাসাঠাসি করিয়া ঘিরিয়া আছে; নীরেট বস্তুপুঞ্জের দুর্গের মধ্যে বসিয়া, হাঁটিয়া-চলিয়া নিরাপদে দিন কাটাইতেছি; ইহার মধ্যে নব-বিজ্ঞানের এই সব দুর্ব্বোধ্য কথা প্রলাপের মত শোনায় বই কি? গভীর সংশয়ও জাগায়, কিন্তু আমাদের মত "ইতরে জনাঃ" যাহাই বলুক, বৈজ্ঞানিক মহারথীরা এ সম্বন্ধে নিঃসংশয়। তবে তাহারাও এক সময়ে সংশয়ের দংশনকে এড়াইতে পারেন নাই। আজ তাঁহারা সংশয়ের পরপারে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছেন। এখানে "ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ," কারণ বিজ্ঞানের এই নবলোকে সব তত্ত্ব ও তথ্যই আজ মাপজোঁকের চাপরাশ আঁটিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বহুদিন আগে ভিক্টর কাজিন (Victor Cousin) বলিয়াছিলেন যে সংশয় হইতে সুফল হয় ("Salutary exercise of the spirit"); বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে বলিতে হইবে। বহুতর সংশয়ের মধ্য দিয়া বিজ্ঞান ধীরে ধীরে সংশয়াতীতের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। অন্ততঃ বৈজ্ঞানিক তাহা দাবী করেন। বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে, জড়ধাতু সম্বন্ধে, আলোক সম্বন্ধে বিজ্ঞান যে সব অপরিচিত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছে, তাহাতে বৈজ্ঞানিকরাই চক্ষু রগড়াইয়া সংশয় প্রকাশ করিয়াছিলেন। আজ ধীরে ধীরে সব সহিয়া গিয়াছে। তরঙ্গ-বিজ্ঞান বা পরমাণু-তত্ত্ব আমাদের দৈনন্দিন পৃথিবীকে

আঘাত করিয়াছে, একথা আলোচিত হইয়াছে। আপেক্ষিকতাবাদও (Relativity) অন্য দিক হইতে আমাদের পরিচিত পৃথিবীকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছে। যান্ত্রিক যুগে যে সহজ বাস্তববাদ বৈজ্ঞানিক মহলে রাজত্ব করিয়া আসিয়াছে, আপেক্ষিকতাবাদ তাহার ভিত্তি টলাইয়া দিয়াছে।

আমাদের বহির্জ্জগৎ বিধৃত হইয়া রহিয়াছে দেশে ও কালে। বাহিরের জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা তাহা দাঁড়াইয়া আছে আমাদের দেশ-কালের ধারণার উপরে। পৃথিবীর কোন বস্তুকে টিকিয়া থাকিতে হইলে কিছু স্থান ও কিছু কালকে ব্যাপিয়া থাকিতে হইবে। কোন ঘটনা ঘটিলেই অনন্ত কালের কিছুটা অংশকে জুড়িয়া সে ঘটিবে। ডাইনে-বাঁয়ে, উর্দ্ধে-নিম্নে যে অসীম দিগ্‌বিস্তৃতি তাহার কিঞ্চিৎ দেশকে সে ব্যাপ্ত করিয়া ঘটিবে। দেশ ও কালের বাহিরে পা বাড়াইতে পারে এমন কিছু নাই। ইহারা উভয়েই অনাদি এবং অনন্ত। ইহারা স্বতন্ত্র এবং একান্ত নিরপেক্ষ (Absolute). ইহাদের অস্তিত্ব অন্য কিছুর তোয়াক্কা রাখে না। বরং বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড একান্তভাবে ইহাদের উপরেই নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া আছে। লোহার ফ্রেমের মত দেশ-কালের কঠিন আবেষ্টনী বহির্জ্জগৎকে আঁটিয়া ধরিয়াছে। কোনক্রমেই ফস্‌কাইয়া বাহিরে সরিবার উপায় নাই। দেশকালের এই অচল ও অনড় পরিকল্পনা ছিলো যান্ত্রিক যুগের বিশেষত্ব। আইনষ্টাইন আসিয়া এই পরিকল্পনাকে ভাঙ্গিয়া দিলেন। দেশ-কাল সম্বন্ধে নূতন আলোক-সম্পাত করিল আপেক্ষিকতাবাদ। সেই আলোকে স্নাত হইয়া আমাদের পুরাতন পৃথিবী নতুন রূপে আবির্ভূত হইল আমাদের বিমুগ্ধ চোখের সম্মুখে। যান্ত্রিক যুগের বাস্তববাদকে আপেক্ষিকতা-বাদ আসিয়া কঠিন আঘাত করিল।

শিশুর চোখের উপর দিয়া ঘটনাগুলি ভাসিয়া চলিয়া যায়। ছায়াচিত্রের ছবির মত, একটার পর একটা। তাহার ইন্দ্রিয়ের উপর এই ক্রমিক অপসৃতির ছাপ ফেলে বহির্জ্জগৎ। এই ছাপগুলি সব আগে-পরে সাজান। এই "আগে-পরে"র জ্ঞানই "কাল" (Time). আমাদের সাধারণ অনুভূতিতে কাল প্রতিভাত হয় যেন একটা বিপুল নদীস্রোত। অনন্ত ভবিষ্যতের দ্বারপথ দিয়া বাহির হইয়া আসিয়া এই অশ্রান্ত কলনাদিনী বিদ্যুৎবেগে আমাদের পাশ দিয়া বহিয়া চলিয়াছে; আমাদের ছাড়াইয়া চলিয়াছে পিছন দিকে, অতীতের অন্ধকার তমসা-লোকে, ঘটনাগুলি এবং বস্তুগুলি তাহার কুটীল স্রোতে বহিয়া চলিয়াছে এবং সেখানে যাইয়া অজ্ঞাত গুহা মুখে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। কালের এই গতি আমাদের সকলেরই চেতনার উপর তাহার প্রভাব ফেলিতেছে। আমাদের সকলেরই চিত্তে এই চেতনা জন্মে যে কাল যেন আমাদের বাহিরের কোন বস্তু; যেন আমাদের চেতনার বাহিরে ইহার একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে, যেন কাল একটা গতিমান্, বিশিষ্ট বস্তু। বায়োস্কোপের দ্রুত আবর্ত্তিত ফিতার উপরে ছবিগুলি পর পর সরিয়া যাইতে থাকে। কালের গতিশীল পটের উপর দিয়া ঘটনাগুলিও তেমনি সরিয়া যায়; কাল যেন বায়োস্কোপের চলন্ত ফিতা। আমরা তাই মনে করি; কাল একটা বাহিরের বিশিষ্ট সত্তা (objective), আমাদের চেতনার অন্তর্গত একটা অনুভূতি মাত্র নয়। বৈজ্ঞানিক এই

কালস্রোতের গতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া পরিমাপ করেন নানা উপায়ে ; সূর্য্যের গতি কিংবা ঘড়ির কাঁটার সাহায্যে।

দিক্ বা দেশ (space) সম্বন্ধেও সেই একই কথা। শিশুর দূরত্বের জ্ঞান এবং দিকের অনুভূতি জাত হয় ধীরে ধীরে ; বাহিরের জগতের স্পর্শ তাহার ইন্দ্রিয়ে লাগে, ইন্দ্রিয় তাহাকে দূরত্ব ও দিকের জ্ঞান আনিয়া দেয়। স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা ধরিতে-ছুঁইতে অভ্যস্ত হইলে বস্তুগুলির সংস্থান (location) সম্বন্ধে তাহার মনে একটা আঁচ হয়। চোখের দৃষ্টিও তাহাকে আঁচ করিতে সাহায্য করে। বস্তুগুলি হইতে তাহার চোখে আলোকসম্পাত হয়। একদিক্ হইতে যতো আলোক-কণিকা আসিয়া চক্ষুতে পড়ে, সবগুলিই চোখের রেটিনার (Retina) একটা বিন্দুতে আসিয়াই পড়ে। এই আলোকসম্পাতের জটিল প্রক্রিয়ার ফলেই আমাদের ত্রৈবৃত্তিক (three-dimensional space) দেশ-ব্যাপ্তির জ্ঞান জন্মায়। প্রত্যেকটী বস্তুরই তিন তিনটী দিক্ বা বৃত্তি আছে আমাদের দৃষ্টিতে। এইভাবে তাহার দিক (direction) এবং দূরত্বের (distance) জ্ঞান হয়। বস্তুগুলি সব সাজান আছে একটার পর একটা। চক্ষু মেলিয়া সম্মুখে চাহিলে অফুরন্ত দিগন্তবিস্তার দুই চোখে ধরা দেয়। এই অপার বিস্তৃতির মধ্যে বস্তুগুলি সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে, স্তরের পর স্তর। এই সীমাহীন বিস্তারের বুকের উপরেই বস্তুগুলি নুড়িয়া-চড়িয়া, গড়াইয়া বেড়াইতেছে ; ঘটনাগুলি বিবিধ গতিতে ঘটিয়া যাইতেছে। বায়োস্কোপের পটের ওপর যেমন ঘটনাগুলি দ্রুত ঘটিয়া যায় তেমনি অখণ্ড দেশ-বিস্তৃতির উপরে চলিয়াছে গ্রহ-উপগ্রহের আবর্ত্তন এবং উৎক্রমণ, ঋতুতে ঋতুতে প্রকৃতির সজ্জা পরিবর্ত্তন। সমস্ত ঘটনার গতির এবং সমস্ত বস্তুর স্থিতির অদ্বিতীয় পৃষ্ঠপট হইল এই দিক্ বিস্তৃতি (space). ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে, ঊর্দ্ধে-নিম্নে, কাছে-দূরে বস্তুর অবস্থিতি এবং গতি, এই দুইয়ের দ্বৈত-লীলা চলিয়াছে। এই সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে'র জ্ঞানই দেশ সম্বন্ধীয় জ্ঞান। দিক্ বা দেশের কোন গতি নাই ; অনন্ত কাল ধরিয়া সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বুকে ধরিয়া স্থির—নির্ব্বাক্ হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের যত আকস্মিক বিপ্লব, যত ক্রমিক বিবর্ত্তন তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার না আছে চাঞ্চল্য, না আছে বিক্ষোভ। তাহার চক্ষু পাথরের মত কঠিন ও স্থির হইয়া রহিয়াছে, অনাদি কাল হইতে তাহাতে পলক নাই। শৈশব হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত আমাদের সকল জ্ঞানকে এই বিচিত্র সত্তা ঘিরিয়া রহিয়াছে। আমাদের চেতনার উপরে ইহার অমোঘ ছায়া পড়িয়াছে, বাহির হইতে। তাই আমরা এই নিখিল দিক্‌কেও (Universal space) বাহিরের একটা নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র সত্তা (objective) বলিয়া মনে করি।

আমাদের সহজ অনুভূতিতে চিরদিন তাই দেশ ও কাল পৃথক ও বিশিষ্ট সত্তা বলিয়া ধরা দিয়াছে। যান্ত্রিক যুগে তাই এই দেশ ও কাল বাহিরের বস্তু এবং সর্ব্বকালের ও সর্ব্বলোকের এক এবং অদ্বিতীয় সত্তা বলিয়া কল্পিত হইয়াছিল। তাই কালকে বৈজ্ঞানিক মনে করিত, প্রকৃতির অদ্বিতীয় ও নিজস্ব কাল (Nature's own time)। বিশ্বের কোথাও আলাদা আলাদা কাল

নাই। সর্ব্বত্র ব্রহ্মাণ্ড ভরিয়া একই অখণ্ড কাল অব্যাহত হইয়া রহিয়াছে। তেমনি দেশও একই অখণ্ড দেশ (space); নিখিল বিশ্বে, গোচর-অগোচর সর্ব্বত্র অপরাজেয় মহিমায় বিদ্যমান রহিয়াছে। প্লেটোর সময় হইতেই এই ধারণা চলিয়া আসিয়াছে।* আমাদের ন্যায়শাস্ত্রেও দিক্ এবং কালকে বাস্তব বস্তু বলিয়া ধরা হইয়াছে। এরা উভয়েই "দ্রব্য" (substance)। ন্যায় বাস্তববাদের চূড়ান্ত মতবাদ। নৈয়ায়িকের মতে অতীত-বর্ত্তমান-ভবিষ্যৎ বলিতে আমরা যাহাকে বুঝি তাহাই "কাল" এবং পূব, পশ্চিমাদি বলিতে যাহা বোঝা যায় তাহাই "দিক" (space). এই দিক্ এবং কাল উভয়ই অদ্বিতীয়, সর্ব্বব্যাপী এবং নিত্য। "অতীতাদি-ব্যবহার হেতুঃ কালঃ। স চ একো বিভুঃ নিত্যশ্চ। প্রাচ্যাদি-ব্যবহারহেতুঃ দিক্। সা চ একা বিভ্বী নিত্যা চ" (তর্ক সংগ্রহ)। ন্যায়মতে বিশ্বের সমস্ত বস্তুর 'অধিকরণ' (containing substratum) হইল এই মহাকাল এবং অখণ্ড দিক্। কোন্ বস্তুই এই দুইয়ের অতীত নয়। "জন্যমাত্রং কালোপাধি, মূর্ত্তমাত্রং দিগুপাধি।" বৌদ্ধবাদী এবং অদ্বৈতীরা দেশ-কালকে বাস্তব বলিয়া স্বীকার করে না। কিন্তু ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য, বৈয়াকরণিক, ইত্যাদি বাস্তববাদী দর্শন সকলেই দেশ-কালকে বাস্তব (objective) বলিয়া কল্পনা করিয়াছে।

দেকার্ত্তে (Descartes) আসিয়া দেশ (space) সম্বন্ধে নূতন পরিকল্পনা দান করিলেন। তাঁহার মতে দেশ (space) কেবলমাত্র শূন্যতা নয়; ইহাকে ব্যাপ্ত করিয়া, পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে এক রকমের সমব্যাপী, একাকার দ্রব্য। এই সর্ব্বব্যাপী সত্তার নাম 'ইথার। আলোক সম্বন্ধে দেকার্ত্তে তরঙ্গ-বাদকে (Wave theory) গ্রহণ করিলেন; এই সর্ব্বব্যাপী ইথার-তরঙ্গের ধাক্কা লাগিয়া আমাদের চোখে আলোক সম্পাত হয়। পরবর্ত্তী বৈজ্ঞানিকরাও আলোক সম্বন্ধে এই মতবাদকেই গ্রহণ করিলেন। এখন বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দেশ-কালের পরিকল্পনা লইয়া অনেকগুলি মুস্কিল বাঁধিয়া গেল। এই মুস্কিলের আসান না হইলে আমাদের জগৎ সম্বন্ধে সঠিক ধারনা গড়িয়া তোলা হয় না; কারণ দেশ-কালের সঙ্গেই জড়াইয়া রহিয়াছে আমাদের বিশ্ব-পরিকল্পনা।

কোন বস্তু বা ঘটনার দেশে-অবস্থিতি (location in space) বর্ণনা করিতে হইলে আমরা কোন স্থির ও স্থিতিশীল সত্তার (fixed landmark) সহিত সেই বস্তু বা ঘটনার দূরত্ব নির্ণয় করিয়া তাহার অবস্থিতি নির্দ্দেশ করি। আমাদের পৃথিবী, সূর্য্য চন্দ্র ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুই দ্রুতগতিতে আকাশে ছুটিতেছে। এ অবস্থায় অনন্ত শূন্যের মধ্যে কোন একটী বস্তুর স্থান নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। পার আছে বলিয়াই জাহাজের অবস্থিতি নির্ণয় হয়। পার-ও যদি জাহাজের মতই ছুটিতে থাকিত তবে জাহাজের স্থাননির্ণয় অসম্ভব হইত। এই সমস্যার সমাধান হয় যদি জানিতে পারা যায় যে সমস্ত দিগ্-দেশ-ব্যাপী একটী সুস্থির ও স্থিতিশীল ইথার ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র অচল হইয়া আছে। দেকার্ত্তের ইথারএই সুবিধাটুকু করিয়া দিল। নিউটন নিজেও এ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আমাদের পৃথিবীতে বাস করিয়া কোথাও "পরিপূর্ণ, একান্ত স্থিতি"র

* "Space never perishes but provides an emplacement for all that is born." (Jimaeus)

(absolute rest) সন্ধান মিলিবে না। কারণ আমাদের গোচর ব্রহ্মাণ্ডের সকল গ্রহ-উপগ্রহ-তারকাই নিত্য ধাবমান। * ইথারকে স্বীকার করিলে এ সমস্যার সমাধান হয়। ইথার-কণিকাগুলি স্থির ও অচল ; ইহাদের তুলনায় অন্যান্য সচল বস্তুগুলির অবস্থান-পরিবর্ত্তন পরিমাপ করা সম্ভব হয়। কিন্তু নিয়তির এমনই বিধান যে বিজ্ঞানের নানা পরীক্ষণ অচিরে এই ইথারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত করিল। আবার সেই সমস্যাই প্রখর হইয়া উঠিল। মাইকেল্‌সন্-মর্লীর আলোকের গতি সম্বন্ধে পরীক্ষায় ধরা পড়িল যে ইথারের কোন প্রভাবই পৃথিবীর উপরে বা আলোকের গতির উপরে দেখা যায় না। ইহাতে দাঁড়াইল এই যে প্রত্যেকটী গ্রহের অবস্থান ও গতি পরস্পরের আপেক্ষিক মাত্র। কাহারও দেশে-অবস্থিতি একান্তভাবে (absolutely) জানিবার উপায় নাই। যে যে-স্থানে ঘুরিতেছে, তাহার অবস্থিতি কেবল আশে-পাশের অন্যান্য ভ্রাম্যমান বস্তুর তুলনায় জ্ঞাত হওয়া যাইবে। অখণ্ড ব্যাপ্তির তুলনায় তাহার একান্ত অবস্থান অজ্ঞেয়। কাজেই প্রত্যেকের যে দেশ (space) তাহা হইল খণ্ড দেশ, একান্ত ব্যক্তিগত দেশ (Individual space), অখণ্ড দেশ (Universal space) ইহাদের সবাইকে ছাড়াইয়া, সকলের অতীতে বিদ্যমান রহিয়াছে।

কালে-অবস্থিতি (location in time) সম্বন্ধেও সেই একই সমস্যা। কোনো ঘটনা ঘটিলেই তাহা অনন্ত কালের কোনো না কোনো একটা বিশেষ কাল-বিন্দুতে ঘটিবে। এই বিশেষ কালবিন্দুটীকে বর্ণনা বা নির্দ্দেশ করিতে হইলে আমাদের কোনো একটা স্থিতিশীল, অনড় পরিমাণের (fixed landmark) সহিত তাহার দূরত্বকে জানিতে হইবে। অখণ্ড কালপ্রবাহের কোন্ স্থানটীতে ফরাশী বিপ্লব ঘটিয়াছে তাহা বুঝাইতে খৃষ্টের জন্মদিন হইতে তাহার দূরত্ব ধরিতে হইবে। আমাদের কালগণনার একমাত্র উপায় কোনো একটি স্থায়ী মান হইতে গণনা করা। তেমনি কোন একটী সুদূর তারকায় যদি একটা আকস্মিক বিস্ফোরণ ১৯৩৯ সনের ১২ই আগষ্ট তারিখে পৃথিবী হইতে দেখা যায় তবে সেই বিস্ফোরণটী ঠিক কোন তারিখে ঘটিয়াছে তাহা জানিতে হইলে হিসাব করিতে হইবে। তারকাটী হয়ত ১০০ আলোক-বর্ষ (light-year) দূর অর্থাৎ আলোকের ওখান হইতে পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিতে ১০০ বৎসর লাগে। তাহা হইলে বিস্ফোরণটী ঘটিয়াছে ১৮৩৮ সনের ১২ই আগষ্ট। ঘটনাটী কখন ঘটিল তাহা আমরা জানিব তখনই যখন আমাদের চোখে ঘটনা হইতে বিকীর্ণ আলোকরশ্মি আসিয়া পৌছিবে। আমরা পৃথিবীতে আছি ; পৃথিবী দ্রুতগতিতে ছুটিতেছে ইথারের মধ্য দিয়া, এবং আলোকরশ্মি ও ইথারের মধ্য দিয়া আসিতেছে ছুটিয়া সেকেণ্ডে ১৮৬ হাজার মাইল বেগে। এ অবস্থায় আলোকরশ্মিটী পৃথিবীতে আসিয়া পৌছিবে কখন, তাহা নির্ভর করিতেছে পৃথিবী হইতে তারকাটীর দূরত্ব এবং তারকা, পৃথিবী ও আলোকের গতিবেগ ইত্যাদির

* "It follows that absolute rest cannot be determined from the position of bodies in our regions." (Newton)

উপর। ব্রহ্মাণ্ডের সব গ্রহতারকাই নভোমণ্ডলে দ্রুত ছুটিতেছে; কাজেই ঘটনাটি পৃথিবীতে যখন দেখা যাইবে, অন্যান্য গ্রহ-তারকায় তখন দেখা যাইবে না; এক একটী গ্রহে-উপগ্রহে আলোকরশ্মি এক এক সময়ে পৌছিবে এবং কাজেই বিভিন্ন গ্রহের অধিবাসীদের কাছে বিস্ফোরণের সময় বিভিন্ন হইবে। কাজেই যখন আমরা পৃথিবীবাসিরা বলি অমুক ঘটনা অমুক সময়ে ঘটিল, তখন আমরা পৃথিবীর "স্থানীয় কাল" (local time) এর হিসাবেই একথা বলি। এই রকম প্রত্যেক গ্রহ বা তারকার অধিবাসীরা-ও তাহাদের "স্থানীয় কালের" হিসাবেই সময় নির্ণয় করিবে। যখন বলি সিরিয়াস নামক তারকা হইতে আলোকরশ্মি আমাদের কাছে পৌছিতে ৮'৬৫ বৎসর লাগে, তখন আমরা পৃথিবীর গণনায় ৮'৬৫ বৎসরই বলিয়া থাকি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মাণ্ডে অগণিত "স্থানীয় কাল" (local time) রহিয়াছে; কিন্তু ইহারা কখনই আসল অখণ্ড কাল ('true time' of nature) নয়।

এদিকে আলোকের গতি-ভঙ্গীর (mode of travel) সমস্যাও দেশ-কালের সমস্যাকে জটিল করিয়া তুলিল। ম্যাক্সওয়েল, ফ্যারাডে হইতে মাইকেল্‌সন-মর্লি এবং লোরেঞ্জ্ পর্য্যন্ত সবাই ইথারের তরঙ্গের মারফৎ আলোক দেশ-বিস্তৃতিকে উৎক্রমন করিয়া চলে এইরূপ ধরিয়া লইয়াছিলেন। আলোক এবং বিদ্যুৎ লইয়া বহু পরীক্ষণ মাইকেল্‌সন-মর্লির সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করিল। ইথারের অস্তিত্বে সন্দেহ আসিল। তবে আলোক দিক্ উৎক্রমণ করে কোন্ রীতিতে? ঢেউয়ের মত সে তরঙ্গিত হইয়া চলে, না, বন্দুকের গুলির মতন সে সূর্য্য হইতে বর্ষিত হয় অজস্র কণিকারাশির ঝাঁকে ঝাঁকে? দেখা গিয়াছে এই দুই রীতির কোন রীতিতেই আলোক দিগ্‌দিগন্ত বাহিয়া চলে না। তবে কী রীতিতে সে চলে দিগন্তব্যাপ্তির মধ্য দিয়া (through space)? আইনষ্টাইন্ এই সমস্যার সমাধান করিয়াছেন—আলোকের রীতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া নয়, দিক (space) সম্বন্ধে একটা নতুন পরিকল্পনা ঘোষণা করিয়া। আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ দেশ সম্বন্ধে—এবং তথা কাল সম্বন্ধে, একটা নূতন ধারণা বিজ্ঞানে আমদানী করিয়াছে। এই নূতন ধারণা দেশকাল সম্বন্ধে এবং তথা বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে আমাদের সকল কল্পনায় গভীর বিপ্লব ঘটাইয়া দিয়াছে।

আইনষ্টাইন্ বলিলেন, ব্রহ্মাণ্ডে কেবল "স্থানীয় কাল" (local time) বা বিশিষ্ট, খণ্ড কালই আছে, "নিত্যকাল বা সত্যিকার কাল" বলিয়া প্রকৃতিতে কোথাও কিছুর অস্তিত্ব নাই। কারণ নিত্যকালের কোন প্রমাণ কোথাও নাই। নিত্যকাল (true time) বলিলে বোঝা যায় যে গতিশীল গ্রহ-তারকার ওপারে কোথাও কোন স্থাবর সত্তা (body at rest) রহিয়াছে যাহা চিরকাল স্থির হইয়া আছে। কিন্তু এমন কোন স্থাবর সত্তার প্রমাণ নাই। ব্রহ্মাণ্ডে যত গ্রহ-উপগ্রহ-তারকা রহিয়াছে, ততগুলি "স্থানীয়" বা খণ্ড কাল রহিয়াছে। এই খণ্ডকাল নিতান্তই "প্রাইভেট্" এবং নিখিল প্রকৃতির বেলায় এই সব "প্রাইভেট্" কাল প্রযোজ্য হইতে পারে না। ইহা হইতে এই বোঝা গেল যে কোন ঘটনার অবস্থিতি নিত্যকালের মধ্যে কোথায়—অর্থাৎ তাহার

সত্যিকার বাস্তব অবস্থিতি (objective) নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। তেমনি নিত্য ও অখণ্ড দিগ্‌বিস্তারের কোন স্থানে কোনো বস্তুর সত্যিকার (objective) অবস্থিতি তাহা নির্দ্দেশ করার চেষ্টাও বাতুলতা মাত্র। * আমরা দেশ ও কালকে বাস্তব এবং বহিপ্রর্দেশে বিদ্যমান বলিয়া (real & objective in the region 'out there') মনে করিতে অভ্যস্ত ছিলাম। নিউটনও একরকমে নিত্য এবং একান্ত (absolute) কালকে কল্পনা করিয়াছিলেন। + কিন্তু আপেক্ষিকতাবাদের কল্যাণে আজ আমরা দেখিতেছি যে দেশ (space) আমাদেরই বস্তু-জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু নয় এবং কাল-ও আমাদেরই ঘটনার অভিজ্ঞতা ব্যতীত কিছু নয়। দেশ ও কাল আমাদের মানস-সৃজন এবং বস্তু ও ঘটনার বিবিধ সজ্জাকে (arrangement) বুঝিবার সহায়ক প্রত্যয় বই কিছু নয়। × প্রকৃতিতে বাস্তবিক পৃথক দেশ ও পৃথক কাল বলিয়া কিছু নাই। যাহা আছে তাহা হইল দেশ-অনুস্যূত কাল এবং কাল-অনুস্যূত দেশ। এক কথায় "দেশ-কাল"। সর্ব্বত্র, সর্ব্বকালে দেশে-কালে জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে ; আমাদের মানুষী চশমার ভিতর দিয়া আমাদের দৃষ্টি পৃথক করিয়া তাহাদের দেখে। আমাদের সাধারণ দিক্ পদার্থের (space) আছে তিনটী বৃত্তি (dimension); ইহার সঙ্গে যোগ করিয়া দিতে হইবে আর একটী বৃত্তি (dimension) কাল। ফলে আমরা পাই, চতুর্ব্বৃত্তিক (four-dimensional) দিগ্‌-পদার্থ। ব্যক্তিগত দিক্ এবং ব্যক্তিগত কালকে কোন ব্যক্তি যদি পরস্পরের দ্বারা অনুবিদ্ধ করিয়া দেয়, তবে তখন তাহা আর ব্যক্তিগত থাকেনা ; হইয়া দাঁড়ায় নৈর্ব্যক্তিক একটী নিরপেক্ষ পদার্থ। যেমন দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আমি যদি কোন হেলান বৃক্ষশাখায় থাকিয়া আমার সমান্তরাল horizontal এবং লম্বিক vertical দিক্‌কে বিভক্ত করিয়া দেখি, তবে এই বিভাগটী আমার পক্ষে এবং ঐ বিশেষ অবস্থানের পক্ষে ব্যক্তিগত বা "স্থানীয়" (local) বলা যাইতে পারে। কারণ আমার তদানীন্তন অবস্থার পক্ষে যাহা আমার সমান্তরাল বা লম্বিকা (horizontal or vertical) তাহা ভিন্ন পারিপার্শ্বিকে অবস্থিত অন্য লোকের পক্ষে সমান্তরাল বা লম্বিক নয়। কিন্তু আমার ঐ পৃথক ও বিশিষ্ট সমান্তরাল ও লম্বিক-কে (horizontal এবং verticalকে) সমবেত ও সংযুক্ত করিলে যে একটী দেশ-খণ্ড (piece of space) পাওয়া যায় তাহা অন্যান্যদের ঐ প্রকার সকল দেশ-খণ্ডেরই মতন একরকম। তেমনি এই চতুর্ব্বৃত্তিক (Four-dimensional) দেশকে (space) বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন অবস্থান হইতে দেখিলেও

* "This implies that it is just as impossible to locate an event in time in an objective way, as to locate an object in space in an objective way.......there is no fixed background of points in space against which motion can be measured in absolute terms, and consequently no absolute flow of time against which intervals of time can be measured." (New Background of science : pp, 95)

+ "Absolute,true & mathematical time, of itself, and by its own nature, flows uniformly on, without regard to anything external. It is also called duration." (Newton)

× "Space begins to appear merely as a fiction created by our own minds, an illegitimate extension to nature of a subjective concept......while time appears as a second fiction......" (New Background of Science : pp. 96).

প্রাকৃতিক নিয়মগুলি (Laws of Nature) তাহাদের কাছে একই রকম প্রতিভাত হইবে। এই দেশ-কাল-প্রসৃতির (space-time continuum) উপরে কোন এক বিন্দুতে ঘটনা ঘটে। এই বিন্দুতেই অনুস্যূত হইয়া আছে দেশ ও কাল এক সঙ্গে অনুবিদ্ধ হইয়া। ফলে বস্তুতঃ পক্ষে প্রকৃতিতে দেশে এবং কালে বিদ্যমান কোন "বস্তু" আছে বলিয়া স্বীকার করা চলে না। সে ধরণের 'বস্তু' আর নাই। যাহা আছে তাহা হইল এই প্রসৃতির (continuum) মধ্যে "ঘটনা" (event) মাত্র। বস্তুর একটা একটানা প্রসারিত সত্তা। কালকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে বলিয়া আমরা মনে করিতাম। এখন সেই "বস্তু" পরিণত হইয়াছে একটা একটানা ঘটনা-পর্য্যায়ে ("continuous succession of events.") আমরা দেখিয়াছি যে নিখিল কাল (cosmic time) বলিয়া কিছু নাই। "আগে-পরে", "সাম্প্রতিক" ইত্যাদি ধারণা আজ ঘোলাইয়া অর্থহীন হইয়া পড়িয়াছে ("neither definitely before, nor definitely after nor definitely simultaneous......" Russell) পূর্ব্বে আমরা মনে করিতাম যে ব্রহ্মাণ্ড এক কালে এক অবস্থায় আছে এবং অন্য কালে অন্য অবস্থায় আছে। ইহা ভুল। যেহেতু কোন বিশ্বব্যাপী নিখিল কাল (cosmic time) নাই, কোন একটী কালে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবস্থার কথা উল্লেখ করা অর্থহীন।

দেকার্ত্তের (Descartes) যুগে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছিল বস্তুময় এবং বস্তুগুলি অনন্ত দেশ-বিস্তারের বুকে ঘুরিয়া বেড়াইত। "বস্তু" বলিতে দেকার্ত্তে বুঝিতেন "যাহার দেশে ব্যাপ্তি আছে (extension in space). বস্তু এবং তাহাদের গতি—এই দিয়াই দেকার্ত্তীয় (Cartesian) বিশ্ব গঠিত। কিন্তু আজ আপেক্ষিকতার যুগে এই ধরণের বস্তুময় বিশ্বের পরিকল্পনা অচল হইয়া গিয়াছে। বস্তু আজ হইয়াছে "ঘটনাপুঞ্জ" (strings of events). রাসেল বলেন যে, বস্তুর স্বগত ঐক্য তাহা হইল ইতিহাসের ঐক্য। এ ঐক্য হইল যেন একটা রাগিণীর একখণ্ড সুরের যে ঐক্য তাহারই মতন। কিছুকাল ব্যাপিয়া একটা রাগিণী বর্ত্তমান থাকে। এই সমস্ত কালটুকু ব্যাপিয়া যে স্বর-বৈচিত্র্য জমাট বাঁধিয়া উঠিয়াছে তাহাকেই বলি রাগিণী। কিন্তু কোন একটা মাত্র মুহূর্ত্তে যে স্বরটুকু ঝঙ্কৃত হইল তাহাকে "রাগিণী" আখ্যা দেওয়া যায় না। পর পর মুহূর্ত্তে যে স্বরগুলি ধ্বনিত হইল তাহাদের বিশিষ্ট সংঘাতকেই বলি "রাগিণী"। * কিন্তু রাগিণীকে আমরা একটী "বস্তু" বলি না। রাগিণী হইল কতকগুলি পর্য্যায়-সজ্জিত স্বর, ঐ স্বরগুলি এমনভাবে সম্পর্কিত হইয়াছে যে একটা ঐক্য তাহাদের মধ্যে সঞ্জাত হইয়াছে। কাজেই "বস্তু"ময় বিশ্ব আজ ঘটনাময় হইয়াছে এবং "বস্তু"-ও আর বস্তু নাই।

বহির্জ্জগৎ বলিতে আমরা এত দিন যাহা বুঝিতাম আজ তাহা বুঝি না। সে দেশ-ও নাই, সে কাল-ও নাই। আছে এক নিরাকার, নির্ব্বিশেষ "দেশ-কাল", যাহাকে কল্পনায় আনা দুঃসাধ্য।

* The unity of a body is unity of history—it is like the unity of a tune......what exists at any one moment is only what we call an "event" (Outline of philosophy pp. 116).

সে বস্তু-ও নাই, দেশে ও কালে প্রসারিত বস্তুর সে গতি-ও নাই। আমাদের সমস্ত বিশ্বজগৎ আজ রূপান্তর ধরিয়া সম্মুখে আসিয়াছে। পূর্ব্বতন বাস্তববাদের যে সহজ বাস্তবতা তাহা আর নাই। যান্ত্রিক যুগের সে বিশ্ব-পরিকল্পনা আজ বাতিল হইয়াছে। রাসেলের মতে, আপেক্ষিকতাবাদের দার্শনিক প্রতিক্রিয়া অতি গভীরভাবে দেখা দিয়াছে। বহির্জগতের সংগঠন সম্বন্ধে আমাদের ধারণায় ইহা আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়াছে। † আপেক্ষিকতাবাদ যে বিশ্ব-পরিকল্পনা দান করিয়াছে তাহা ধারণায় আনা দুষ্কর। এমন কি বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও ইহার সত্যতা সম্বন্ধে আজও সংশয় থাকিয়া গিয়াছে। ইহার কল্পিত দেশ এক অজ্ঞেয়, অবাচ্য পদার্থ। বৈজ্ঞানিক শাহ মহম্মদ স্থলেমান এই কাল-অনুবিদ্ধ দেশকে নাম দিয়াছেন "a new hyper-space" এবং ইহার সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বর্ত্তমান বিজ্ঞানের এই জটিল ও দুর্ব্বোধ্য সিদ্ধান্ত-গুলি নিশ্চয়ই কৃত্রিম এবং ভিত্তিহীন। * কিন্তু আইনষ্টাইনের মতগুলি দাঁড়াইয়া আছে ইন্দ্রিয়ানু-ভূতির শক্ত ভূমির উপরে। তাঁহার প্রত্যেকটী সিদ্ধান্ত বাস্তব-অভিজ্ঞতার (experience) দ্বারা পরীক্ষিত এবং পরীক্ষাযোগ্য। কাজেই প্ল্যাঙ্ক্ (Planck) বলেন যে যেহেতু বাস্তব-অভিজ্ঞতা দ্বারা আপেক্ষিকতাবাদ খণ্ডিত হয় নাই, ইহাকে মানিয়া নিতেই হইবে; ইহা যতই দুর্ব্বোধ্য এবং কষ্ট-কল্প্য হৌক্ না কেন।

যান্ত্রিক যুগে যে কটী পদার্থের (category) উপরে ভিত্তি করিয়া বৈজ্ঞানিক সে যুগে বিশ্ব-চিত্রকে গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকটী সম্বন্ধেই নববিজ্ঞান আজ মত পরিবর্ত্তন করিয়াছে। দ্রব্য, গুণ, দেশ, কাল ইত্যাদির ধারণায় বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছে। নূতন চোখে ইহাদের দেখিতে হইবে এবং নবতর দৃষ্টিতে ইহাদের স্বরূপ নির্ণয় করিতে হইবে। এই নূতন দৃষ্টির সম্মুখে বিশ্বজগৎ আজ নতুন রূপ লইয়া উদ্ঘাটিত হইয়াছে। "দেশ-কাল" নামক দিক্-হীন ও কালাতীত পৃষ্ঠপট বিজ্ঞানের দৃষ্টির সম্মুখে আজ বিসর্পিত হইয়া রহিয়াছে। এই পৃষ্ঠপটে বর্ণ নাই, রূপ নাই, গতি নাই, বিকৃতি নাই। আমাদের সকলের চোখে অহরহ বিশ্বের যে পট পরিবর্ত্তন ধরা পড়িতেছে তাহা এই রাজ্যে নাই। কালগত বিকৃতি এবং দেশগত ঘটনার অপসরণ এই অখণ্ড নির্ব্বিশেষ লোকে অনুপস্থিত। এই কারণে কেহ কেহ বলেন যে বর্ত্তমান-অতীত ভবিষ্যতের সীমারেখা লুপ্ত হওয়ায় ক্রমবিকাশতত্ত্বের (Evolution) কোন মানেই থাকেনা। একথার সত্যতা যতটুকুই থাকুক, দার্শনিকেরা কিন্তু বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই এই নামরূপের জগৎকে অবাস্তব বলিয়া আখ্যাত করিয়া আসিয়াছেন। সকল বিবর্ত্তনের পিছনে যে পটভূমিকা তাহাকে তাঁহারা বলিয়াছেন

†"For philosophy, far the most important thing about the theory of relativity is the abolition of the one cosmic time & the one persistent space, & the substitution of space-time in place of both. This is a change of quite enormous importance, because it alters fundamentally our notion of the structure of the physical world......"(Outline of Philosophy : pp. 114).

* "One cannot help that these unconvincing conclusions are...really nothing more than artificial mathematical devices for expressing something very imperfectly understood."—Sir S. M. Sulaiman in "Indian World."

'কালাতীত'। + বিখ্যাত ব্র্যাড্‌লীও (Bradley) বলিয়াছেন যে, সকল পরিবর্ত্তনের পশ্চাতে একটী চির-শাশ্বত থাকা চাই এবং কাল পদার্থের সত্যিকার কোন বাস্তবতা নাই। বৈজ্ঞানিক জিন্‌স্‌'এর মতে দার্শনিকদের এই সিদ্ধান্তের সহিত নববিজ্ঞানের দেশ-কাল-সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তের সাদৃশ্য আছে। × দেশাতীত এবং কালাতীত যে "দেশ কাল" আপেক্ষিকতাবাদ কল্পনা করিতেছে, তাহার সঙ্গে ব্র্যাড্‌লীর পরিকল্পিত শাশ্বত পৃষ্ঠভূমিকার মিল প্রত্যক্ষ। আজিকার বিশ্ব-পরিকল্পনা আমাদের সহজ বুদ্ধির কাছে অস্বাভাবিক মনে হয়। যান্ত্রিক যুগে বিজ্ঞান যে সব ধারণা আমাদের মনে একদিন রোপণ করিয়া দিয়াছিল, আজ সে সব ধারণা বদ্ধমূল সংস্কারে পরিণত হইয়াছে। আমাদের চেতনার স্তরে স্তরে তাদের শিকড় শক্তভাবে আঁটিয়া ধরিয়াছে। আজিকার বিজ্ঞানকে স্বীকার করিতে হইলে সেই দুশ্ছেদ্য সংস্কারকে উৎপাটন করিয়া নির্মুক্ত মানসিক পরিমণ্ডল সৃজন করিতে হইবে। সেই স্বচ্ছ পরিমণ্ডলের উপরে বিজ্ঞানের নব্যালোকপাতে ফলাইয়া উঠিবে নতুন বিশ্ব-ছবি। জড়বাদ কিংবা বাস্তববাদ যে চিত্র এতদিন ধরিয়া আঁকিয়াছে, এই ছবির সঙ্গে তাহার কোনো সাদৃশ্যই নাই।

+ "From the time of Plato onwarlds, philosophic thought has repeatedly returned to the idea that temporal changes & the flux of events belong to the world of appearances onlv & do not form part of reality." (New Background of Science. pp. 110).

× "We may notice how the absorption of space & time into a higher unity, the space-time Continuum, which transcends both & is changeless, satisfies the requirements of the philosophies......" (Jeans : Ibid : pp. 111).

ইতিহাস

সুধীরকুমার গুপ্ত

ভঙ্গুর স্বপ্নের মাঝে আরম্ভের নবতর সুর
ধ্বনিয়াছে যুগে যুগে, প্রত্যহেরে করেছে মধুর
শতেক বঞ্চনা মাঝে স্ফুটমান আপন সাধনা ;
বিগত শতাব্দীতলে বিড়ম্বিত যত উদ্দীপনা
আবার উঠেছে জাগি, লয়ে তার হাসি, অশ্রু, গান—
মাগিয়াছে সভাতলে আপনার অকুণ্ঠিত স্থান ;
লভেছে আশ্রয় তার, হয়তো সন্দেহ নাই তায়,
তবু কি শান্ত সে হোলো আপনার চরিতার্থতায় !
বসেছে ক্ষণেক শুধু, স্থায়ী তার হয় নি আসন—
পশ্চাতে গিয়াছে ফেলি সকল কীর্ত্তির প্রহসন।

চঞ্চল বিশ্বের এই চিরন্তন নব অভিসার
চলেছে যাহার পানে, ঠিকানা রয়েছে কিনা তার
সে কথা অজ্ঞাত রয় ; চারিদিকে শত কলরব,—
জানি না কোথায় চলে নিরন্তর গোপন উৎসব।
স্বপ্নের তন্তুতে কত বিজড়িত আকাঙ্ক্ষার মোহ
মুখর করিয়া তোলে নিত্যকার শত সমারোহ।
যে প্রচেষ্টা ব্যক্ত হোলো কোনো এক সাফল্যেরে মাগি'
বর্জ্জিত হয়েছে তাহা অপরের প্রতিষ্ঠার লাগি ;
বিস্ময়ের নাই তাই আজিকার নবীন আশ্বাস
যখন রচিছে পুন আগামী কালের ইতিহাস।

আমার সুদূর প্রাচ্যের শিল্পী বন্ধু

(ইয়ুংহিল্ ক্যাঙ্)

ডাঃ সত্যানন্দ রায়

সে আজ অনেক দিনের কথা, প্রায় কুড়ি বৎসরের উপর শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাণ্ডেল হলে, নৃতত্ত্বের অধ্যাপক ফ্রেডারিক ষ্টার্ক বক্তৃতা করিতেছিলেন। তাঁহার বিষয় ছিল সুদূর প্রাচ্যের সভ্যতা বিশেষ করিয়া জাপান ও কোরিয়ার। আমরা প্রাচ্যবাসী কিন্তু সেই দিন প্রথম শুনিলাম ভারতবর্ষ হইতে বুদ্ধদেবের বাণী জাপানে প্রবেশ করিয়াছিল কোরিয়ার মধ্য দিয়া। আমরা স্বদেশে বিদেশে তখন পর্য্যন্ত যেটুকু ইতিহাস পড়িয়াছিলাম তাহার মধ্যে এই সন্ধান পাই নাই। তাহার কারণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও যুগের সম্বন্ধে আলোচনা তখন আমাদের দেশে নৃতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব বা তুলনামূলক ধর্ম্মের ইতিহাসের দিক হইতে কিছুই হইয়া উঠে নাই। এসিয়ার উত্তর পশ্চিম কোণে একটী ছোট দেশ ভারতবর্ষকে জাপানের সহিত এক সূত্রে বাঁধিতে পারে তাহার ধারণা আমাদের ছিল না।

পরাধীন ভারত ও পরাধীন কোরিয়া এই দুই দেশের সহিত স্বাধীন চীন ও স্বাধীন জাপানের যে কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে সে ভাবনা এদেশে কাহারও তখন হয় নাই। মহাযুদ্ধের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে Travelling Fellowship লইয়া যখন G. Lowes Dickinson প্রাচ্য ভূখণ্ড ভ্রমণ করিয়া তাঁহার ভ্রমণলব্ধ জ্ঞানের ভূমিকা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করিলেন "An Essay on the Civilization of India, China and Japan" তখন স্পষ্ট বলিলেন "চীন ও জাপানকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি কুক্ষিগত করিতে পারিবে কিন্তু ভারতবর্ষকে কিছুতেই পারিবে না।"* প্রায় ইহার পনর বৎসর পূর্ব্বে জাপানী শিল্পী ওকাকুরা তাঁহার Ideals of the East পুস্তকে লিখিয়াছিলেন, "অখণ্ড এসিয়া-হিমালয় তাহাকে দুই ভাগে ভাগ করিয়াছে কিন্তু ভারত চিরদিন চিন্তাধারা ও সংস্কৃতির জন্মভূমি বলিয়া আমাদের সকলেরই প্রিয় থাকিবে।" প্রাচ্যের আদর্শবাদীর এই বাণী কতদূর সত্য তাহা জানি না কিন্তু প্রতীচ্যের Bertrand Russell ও Mc Taggertএর বিশেষ বন্ধু Lowes Dickinsonএর কথা যে অধিক সত্য তাহা আজ অনেকেই বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন। ভারত পশ্চিমকে কুক্ষিগত করিতে পারে নাই, পশ্চিমও ভারতকে কুক্ষিগত করিতে পারে নাই। ভারত পরাধীন বটে কিন্তু আজ কোরিয়াও পরাধীন, কোরিয়াও পাশ্চাত্যের কুক্ষিগত হয় নাই যদিও আজ সে প্রাচ্যের আর এক স্বধর্ম্মী জাতির অধীন।

* ইঁহার রচিত Letter from Chinaman ও A Modern Symposium আধুনিক যুগে সকলের কাছে সুপাঠ্য হইবে।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে বিশেষতঃ আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে প্রায়ই কয়েকটী প্রাচ্য ভূখণ্ডের ছাত্রকে দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষ করিয়া চীন দেশের। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর সন্ধিস্থল অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে প্রাচ্য ভূখণ্ডে যে সমরানল জ্বলিয়া উঠে তাহার মধ্যে বক্সার বিদ্রোহে পাশ্চাত্য সর্ব্বজাতি চীনদেশকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়া যখন ক্ষতিপূরণস্বরূপ সমস্ত টাকা বুঝাইয়া লন তখন পাশ্চাত্য জাতিদের মধ্যে কেবল মাত্র আমেরিকার যুক্তরাজ্যই চীনদেশের তরুণ তরুণীদের বিদ্যা শিক্ষার জন্য ঐ টাকা খরচ করিতে প্রতিশ্রুত হ'ন। ইহার ফলে চীন দেশ ও আমেরিকার যুক্তরাজ্য অচ্ছেদ্য বন্ধুতা সূত্রে আবদ্ধ। সেইজন্যই প্রাচ্য ভূখণ্ডের মধ্যে চীনদেশের ছাত্র ছাত্রী অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

আমেরিকার পথে ঘাটে, বিশ্ববিদ্যালয়ে কত প্রশ্ন শুনিয়াছি—"তুমি কি চীনদেশীয়? তুমি কি জাপানী? তুমি কি ফিলিপিনো? তুমি কি কোরিয়ান? তুমি কি মেক্সিকান? তুমি কি হাওয়াইয়ান? এমন কি তুমি কি পর্ত্তুগীজ? হায় দুরদৃষ্ট! কদিচ কখনো "তুমি কি হিন্দু? Are you a Hindu or an East Indian? এই প্রশ্ন খুব অল্প লোকেই করিয়াছে।

প্রতীচ্যের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা ও প্রাচ্যের সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশবাসিগণের অজ্ঞতা তুলনা করা কঠিন ও সেখানে অনেক মিলনের ভূমি আছে যেখানে বাস্তবিকই পরিচয় হয়, মিলন হয়। প্রাচ্য ভূখণ্ডে তাহার একান্ত অভাব।

চীন দেশীয় ও জাপানী বন্ধুরা তাঁহাদের দেশবাসীর স্বভাব ও স্বরূপকে অনেকটা প্রকাশ করিতেন। জাপানীরা অতি অল্পভাষী। আমার এক চীন দেশীয় বন্ধু পিকিং (পাইপিং) জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক লু একবার Christmasএর কার্ড পাঠাইলেন "I do not know why the birth of a Jew brings us together." আমি তাহার উত্তর দিতে পারি নাই কিন্তু একথা সত্য সেই কুড়ি বৎসর পূর্ব্বেও প্রাচ্য ভূখণ্ডের এই তিন জাতির ছাত্রদের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্দ ছিল।

প্রায় ইহার পাঁচ বৎসর পরে একদিন হঠাৎ টেলিফোন আসিল। বষ্টন সহরে আমি তখন রহিয়াছি। No More War Committee'র সম্পাদিকা ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। অল্পক্ষণ পরে তাঁহার কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইলেই তিনি বলিলেন "আগামী রবিবার Boston Commonএ (বিলাতে লণ্ডনের Hyde Parkএর ন্যায় পৃথিবীর যতরকম মতামত প্রচার ও বক্তৃতা করিবার উন্মুক্ত প্রান্তর) আমরা একটা সভা করিব, হয়তো নিউইয়র্ক হইতে John Haynes Holmes আসিবেন, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের বক্তৃতা করিতে হইবে, আপনাকে ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে কিছু বলিতে হইবে।" কথা প্রসঙ্গে League of Nations, No More War Movement সম্বন্ধে কোন কোন অপ্রিয় সত্য বলা সত্ত্বেও যখন তিনি বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন তখন স্বীকার করিলাম।

পরে রবিবারে যখন Boston Commonএর Band Standএর কাছে আসিলাম তখন দেখিলাম কয়েকজন বক্তা আসিয়াছেন, যতদূর স্মৃতি পথে পড়ে যুক্তরাজ্যের সভাপতি পদের জন্য প্রার্থী সমাজতন্ত্রী নেতা নর্ম্মান টমাস তাহার মধ্যে ছিলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে একজনকে দেখিলাম যিনি অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকাইয়া শেষে আমারই পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। পাঁচ মিনিট কথাবার্ত্তার পর জানিলাম তাঁর নাম Younghill Kang. তিনি একজন কোরিয়ান ছাত্র। * অতি অল্প কথায় যখন তিনি জাপানের কথা বলিতে লাগিলেন, ক্ষুদ্র কোরিয়াকে নিষ্পেষিত করিবার জন্য জাপানের কত আগ্রহ ও যত্ন; তখন সেই কোরিয়ার বিদ্রোহী সন্তানের মর্ম্মস্পর্শী বাণী সেই সভায় যাঁহারা জাপানের সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী তাঁহাদের মনে এক নূতন ভাবধারার স্রোত প্রবর্ত্তন করিয়া দিল। জাপানের প্রতি কি তীব্র বিরুদ্ধ ভাব! অথচ সেই তীব্র বিরোধিতার ভিতর কোথাও বিন্দুমাত্র হিংসা দ্বেষ বা মিথ্যার বাগজাল নাই। সেই সভায় জাপানী বক্তাও বক্তৃতা করিলেন। অবশ্য কোরিয়া সম্বন্ধে তিনি নীরব রহিলেন। সভার শেষে ইয়ংহিল ক্যাঙ্ আমাকে ভারতবর্ষের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন ও বলিলেন পরে দেখা হইবে। তিনি বষ্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আমি তখন বর্ত্তমানে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সহযোগিতা সূত্রে আবদ্ধ বৃহত্তর বষ্টনস্থিত Tufts Collegeএর Post Graduate বিভাগের ছাত্র।

এই ঘটনার পর ইয়ংহিল ক্যাঙের সঙ্গে পথে বিভিন্ন লাইব্রেরীতে, subwayর গাড়িতে, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশে, রেষ্টরাতে, থিয়েটারে দেখা হইয়াছে ও কথাবার্ত্তা হইয়াছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার ইচ্ছা দেখিয়া শেষে একদিন গ্রীষ্মাবকাশের সময়ে বষ্টন সহরের ব্রাহ্মণ পল্লীতে (Boston Brahmin নামে আমেরিকার আভিজাত্য বংশীয় যাঁহারা বিশুদ্ধ ইংরাজদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন) কোন এক অধ্যাপকের বাড়িতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দেশ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সুযোগ হইল। ক্যাঙ্ আমার লিখিত বই When I Was a Boy in India পড়িয়া খুব খুসী হইয়াছেন বলিলেন ও তাঁহার নিজের একখানি বই লিখিবার ইচ্ছা হইয়াছে জানাইলেন। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম তিনি কবি ও শিল্পী। কোরিয়া হইতে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসিত এই যুবকটী একদিন এক সুলেখক হইবেন এ ধারণা আমার হইয়াছিল। তুলনামূলক বিশ্বসাহিত্য অনুশীলন করিবার জন্য তখন হইতে তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ।

এদেশে ফিরিয়া আসিবার কিছুদিন পরে আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু Dr. John Herman Randall, Sr., সম্পাদিত Younghill Kangএর নাম দেখিতে পাইলাম। সেই সময় তাঁহার রচিত "The Grass Roof" নিউ ইয়র্ক হইতে প্রকাশিত Asia পত্রিকায় প্রকাশিত হইল, এই পুস্তকে ক্যাঙ্ তাঁহার প্রিয় কোরিয়ার জীবনের বর্ণনা করিয়াছেন। এই পুস্তকের সমালোচনা করিতে যাইয়া Observer লিখিলেন "The book has entertainment for the general

* চুংপা হান। (কোরিয়ান নাম)

reader, material for the politician and historian, tears for the lover of humanity, romance for the jaded and humor for all." সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক রেবেকা ওয়েষ্ট (Rebecca West) লেখেন "A remarkable book, as astonishing as 'Kim.' I like it so much that I am shy of recommending it...what a man, what a writer." আমাদের নিজের মনে এর টোয়োহিকো কাগাওয়ার আত্মজীবনীর পর ইংরাজী ভাষায় লিখিত আর কোন সুদূর প্রাচ্য ভূখণ্ডবাসী এমন সুন্দর আত্মজীবনী গল্পের আকারে লেখেন নাই।

প্রায় ১৫ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের বন্ধু ধনগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় Caste and Outcaste পুস্তকে পাশ্চাত্য জগতে পদার্পণের পর হইতে তাঁহার জীবনে যে অভিজ্ঞতা হয় সেই বিষয় অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছিলেন। আমেরিকার সাহিত্য জগতে ইহার বিশেষ আদর হয় ও পরে তিনি তাঁহার পরবর্ত্তী পুস্তক My Brother's Faceএ ভারতবর্ষে তাঁহার আত্মজীবনের কথা যে বর্ণনা করেন তাহা আমেরিকার বিশেষরূপে আদৃত হয়। ক্যাঙের রচিত শেষ পুস্তক East goes West তাঁহার পাশ্চাত্য জগতের অভিজ্ঞতালব্ধ এক অতি চিত্তাকর্ষক কাহিনী। এক প্রাচ্যের সন্তান পাশ্চাত্য দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতি কর্ত্তৃক প্রভাবান্বিত হইলেও কিরূপে মাঝে মাঝে তাঁহার প্রাণ প্রাচ্যের জন্য কাঁদিয়া উঠে তাহার সুন্দর নিদর্শন। ইংরাজি ভাষায় যাঁহাদের দখল তাঁহাদের এ বই অবশ্য পাঠ্য। যদিও ইহার মধ্যে অনেক আমেরিকান slang ও চলতি কথা আছে যাহা সহজে বোধগম্য না হইতে পারে, তাহা হইলেও যাঁহারা আমাদের জীবনের ধারাকে পরিবর্ত্তনশীল স্রোতের মধ্যে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা যেন এই পুস্তকখানি পড়েন ইহাই আমার অনুরোধ।

নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্যের (বা বিশ্বসাহিত্যের) সহকারী অধ্যাপক ক্যাঙ্ তাঁহার East Goes West এর নবম পৃষ্ঠায় যে কয়টী সুন্দর কথা লিখিয়াছেন তাহা পাঠক পাঠিকাদের উপহার দিয়া বারান্তরে কাগাওয়া, ধনগোপাল ও ক্যাঙের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিব ঃ—

"The military position of Japan—intrenched in Korea in our own life time—forced me into dilemma : Scylla and Charybdis. I was caught between—on the one hand, the heart-broken death of the old traditions irrevocably smashed not by me but by Japan (and yet I seemed to the elders to be conspiring with Japanese)—and on the other hand the zealous, summary glibness of Japan, fast Westernizing, using Western incantations to realize the ancient fury of spirit, which Korea had always felt encroaching, but had snubbed in a blind disdain. Korea, a small provincial, old fashioned Confucian nation, hopelessly trapped by a larger expanding one,

was called to get off the earth.—Death summoned.—I could have renounced the scholar's dream for ever (plainly scholarship had dreamed us away into ruin) and written my vengeance against Japan in martyr's blood, a blood which like that of the Tasmanians is strangely silent though to a man they wrote. Or I could not take away my slip cut from the roots, and try to engraft my scholar's inherited kingdom upon the world's thought. But what I could not bear was the thought of futility, the futility of the martyr, or the death-stifled scholar back home. It was so that the individualist was born, the individualist, demanding life and more life, fulfilment, some answer to his thronging questions, some recognition of his death-wasted life some anchor in thin air to bring him to earth though he seems cut off rom the very roots of being.

"And this it was—the naked individualslip—I had brought to New York."

সাগর-স্বপন

(নাটিকা)

—পূর্ব্বানুবৃত্তি—

ভুপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়

উত্তীয়
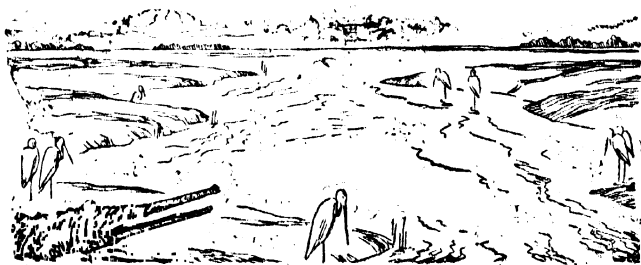
[স্নিগ্ধ হাস্যে] কী কোরবে, বালা ?...যে-বন্ধন আজ তোমার-আমার মিলন ঘটিয়েচে, তাকে উপেক্ষা করার সামর্থ্যিতো কারোই নেই !

মঞ্জুলা

[স্বগত] উঁহু, ভয় কোরলে চলবে না।

[উত্তীয়র পাশ কাটাইয়া সে একটু দূরে সরিয়া গেল, এবং মুহূর্ত্ত থামিয়া উত্তীয়র মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া তাকাইল]

[স্বগত] না, সঙ্কল্প আমার ব্যর্থ কোরবো না।

[হঠাৎ দৌড়াইয়া পার্শ্বস্থিত মঞ্চের উপর সে উঠিল]

[স্বগত] এখন, এখন মহিয়সী সম্রাজ্ঞী, নিঃশঙ্ক হও।

[ছাদের একেবারে শেষ-প্রান্তে আসিয়া উত্তীয়কে লক্ষ্য করিয়া উত্তেজিত-কণ্ঠে]

মূঢ় তরুণ ! আমার উদ্দেশ্য কিছু বুঝতে পেরেচ ?—এক পা বাড়িয়েচ-কি এ-উন্মত্ত-সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়েচি —

উত্তীয়

[যুক্ত হস্তে] ভুল বুঝোনা, নারী।— আমি শান্ত, অচঞ্চল। কাউকে পরশ কোরবার জন্যে ব্যস্ত হইনি।...আদি-অন্তকাল থেকে যে-বন্ধনের রেখা তোমায়-আমায় অতি সংগোপনে ঘিরে রয়েচে তাকে শ্রদ্ধা না-কোরলে চলবে কেন ?...যা খুশী তা-ই করো — কিন্তু জেনো, একে অস্বীকার করার পথ তোমার নেই। এ শাশ্বত, চিরন্তন।...

প্রথম নাবিক

[মঞ্জুলার প্রতি] তোমার আত্মহত্যা কোরতে হবে না। আমাদের ক্ষমা কর। পথ দেখিয়ে গৃহে নিয়ে চল। [উত্তীয়কে দেখাইয়া] ওকে এক্ষুনি আমরা হত্যা কোরবো।

মঞ্জুলা

তা-ই হবে।

প্রথম নাবিক

ওর পক্ষে কেউ দাঁড়াবে না।

দেবদত্ত

[সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া] আমি দাঁড়াব।

[বলিয়া-ই উন্মুক্ত অসি-হস্তে উত্তীয়র পাশে যাইয়া দাঁড়াইল। উত্তীয় শান্ত-ভাবে তাহার বীণায় ঝঙ্কার তুলিল]

প্রথম নাবিক

বটে ? [বলিয়া-ই সে কতিপয় নাবিক-সহ দেবদত্তকে আক্রমণ করিয়া মেজের উপর ফেলিয়া দিল, এবং উত্তীয়কে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। কিন্তু নিবিড়-অন্ধকার যেন ক্রমেই চারিদিক জুড়িয়া নাবিয়া আসিতে লাগিল, ভয়ে আক্রমণকারীরা ইতস্তত করিতে লাগিল]

দ্বিতীয় নাবিক

দেখেচ, কোত্থেকে পুঞ্জীভূত আঁধার টেনে এনে চাঁদটাকে কেমন ঢেকে দিচ্চে ?

মঞ্জুলা

[উত্তেজিত-কণ্ঠে] হানো আঘাত। যে প্রথম হান্‌বে, তাকে দেবো আমি প্রভূত সম্পদ...

প্রথম নাবিক

আমি, আমি-ই হান্‌বো।

[উত্তোলিত-অসি-হস্তে উত্তীয়র সুমুখে সে উপস্থিত হইল]

[হঠাৎ সশঙ্কিতে পশ্চাতে হটিয়া] নাঃ, চাঁদের মৌলী আকাশ থেকে টেনে এনে যেন ঢালের মতো কোরে ধরেচে।...

দ্বিতীয় নাবিক

[ভয়-ব্যাকুলিত কণ্ঠে] দেখেচ, আগুনের হল্‌কা — আকাশ ফেটে কী ভীষণ হয়ে ঝরে পড়চে আমাদেরকে দগ্ধে মারবার জন্যে।...

মঞ্জুলা

[অধিকতর উত্তেজিত-কণ্ঠে] অপরিমিত মণিমাণিক্য দেব। রাজার ঐশ্বর্য্য দেব। — কে আচ, সবার প্রথম হান ওকে মরণ-আঘাত...

প্রথম নাবিক

ধরুক-না চাঁদের মৌলী আমাদের মাঝখানে, আমি ওকে মারব-ই।

দ্বিতীয় নাবিক

নাঃ, আমি-ই মারব। একবার কৃপাণ সেঁধিয়ে দিলে-ই উবে যাবে যতো ওর ভেল্‌কি আর যাদু।...

অন্যান্য নাবিকেরা

আমি মারবো! আমি মারবো! আমি মারবো!

[উত্তীয় তাহার বীণায় গভীর গুঞ্জন তুলিল]

প্রথম নাবিক

[হঠাৎ আচ্ছন্নতায় আবিষ্ট হইয়া] উত্তীয়, তুমি না বোলেছিলে ও-বজরায় কার সমাধির পাশে আমাদের পাহারায় থাকতে হবে সারারাত? — হাঁ, তার মরণ কিসে হলো তা' তুমি জাননা। তবে মৃত্যু যে অকস্মাৎ ঘটেছিল, তা' বলেচ।

দ্বিতীয় নাবিক

ঠিক মনে করেচ। আমি তো ভুলেই গেছ্‌লুম ও-কথা —

মঞ্জুলা

তোমরা কি খ্যাপে গেলে? ওর বীণার ঝঙ্কারে ইন্দ্রজাল সৃষ্টি হয়েচে। তার-ই মায়ায়-যে তোমরা আচ্ছন্ন হয়ে উঠ্‌চ!

দ্বিতীয় নাবিক

কী কোরে রাত্রি-ভর শবের পাশে জেগে থাকবো? — কোথায় সুরা? কোথায় কারণ?

প্রথম নাবিক

আমি দেখেচি, ও-বজরায় ভাঁড়ে-ভাঁড়ে সুরা রয়েচে।

তৃতীয় নাবিক

আচ্ছা, ও-মৃতের নাম তো মনে আসচে না! ওর পাশে বসে প্রার্থনা জানাই কী কোরে?

প্রথম নাবিক

চলনা, ওখানে গেলে-ই ওর নাম মনে পড়বে। আমি জানি, ওটা হাজার বছরের মড়া। অমনি পড়ে রয়েচে। আজ ওর জন্যে আমরা পূজো দেব, প্রার্থনা কোরবো।

দ্বিতীয় নাবিক

[গুন্‌গুন্ করিয়া গানের সুরে]

ওগো মরণ!

হে মরণ!

তোমার শান্ত চরণ-ছায়ে

হোক

দুঃখ বিস্মরণ।

সমস্ত নাবিকগণ

ওগো মরণ!

হোক্

দুঃখ বিস্মরণ।

[সমস্বরে গুন্‌গুন্ করিতে করিতে সকলে অপর বজরায় চলিয়া গেল]

মঞ্জুলা

[ব্যাকুল হইয়া] ভগবান, এবার আমায় রক্ষা কর।

[দেবদত্ত সংবিৎ ফিরিয়া পাইয়া উঠিয়া বসিল, এবং স্বপ্নোত্থিতের মতো তন্দ্রাজড়িত ভাবে নিজের অসি খুঁজিতে লাগিল]

দেবদত্ত

কোথায় আমার অসি? ঐ-ত, হাঁ ঐ-যে!

[ভূলুণ্ঠিত অসিখানার দিকে টলিয়া টলিয়া সে অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু সহসা মঞ্জুলা ছুটিয়া আসিয়া আপন হস্তে সে-অসি তুলিয়া লইল]

দেবদত্ত

[নিদ্রাজড়িত-কণ্ঠে] রাণী, অসি আমায় ফিরিয়ে দাও —

মঞ্জুলা

না, ওতে আমার প্রয়োজন আছে।

দেবদত্ত

কী প্রয়োজন তোমার?...যাক্, রাখ তুমি আমার অসি। উত্তীয়র মৃত্যুর সাথে আমার সকল প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে গেছে —

জনৈক নাবিক

[অপর বজরা হইতে চীৎকার করিয়া]

এদিকে এসো, দেবদত্ত। বল, এ কার শব-সমাধি! কার আত্মার জন্যে আমরা মঙ্গল কামনা কোরচি?...

দেবদত্ত

[কিছুটা স্বগত এবং কিছুটা মঞ্জুলাকে লক্ষ্য করিয়া]

মৃত সে সম্রাটের কী নাম ছিল ?...পুলস্ত্যপ্রিয় ? হাঁ, ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট পুলস্ত্য-প্রিয়।...না না — পুলস্ত্যপ্রিয় নয়। এখন মনে হচ্চে। — এ সম্রাটের নাম সুগতঋদ্ধি। এর বাহু দু'খানা ছিল সোনার। কোন এক মায়াবীর অমোঘ যাদু-বলে রাজ্ঞীকে এ হারায়। প্রিয়তমার বিরহে ভগ্ন-হৃদয়ে হয় এর মৃত্যু।...কিন্তু মৃত্যুর কারণ তো শুধু এ-ই নয় —

[কথা শেষ না-করিয়াই সে নিষ্ক্রান্ত হইল]

[দেবদত্ত যখন কথা কহিতেছিল তখন অপর বজরা হইতে নাবিকদের চীৎকারধ্বনি আসিতেছিল। দেবদত্ত চলিয়া যাইতেই মঞ্জুলা অসি হস্তে উত্তীয়র সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল]

মঞ্জুলা

[দৃঢ়কণ্ঠে] তোমার সমস্ত ভেল্‌কি এ-অসির আঘাতে চূর্ণ কোরে দেব।...

[কিন্তু হঠাৎ তাহার কণ্ঠও যেন তন্দ্রাজড়িত হইয়া আসিল, অসি নামাইয়া ফেলিল, এবং আস্তে আস্তে হাত হইতে উহা ফেলিয়া দিল। নিজের কেশদাম এলাইয়া দিল। মাথার মুকুট খুলিয়া মেঝের উপর রাখিয়া দিল]

[তদ্‌গত-ভাবে] শবাধারের পাশে এ-অসি শায়িত থাকবে। তাঁর সমগ্র যুদ্ধ-জয়ের সঙ্গী ছিল এ।...কী অপূর্ব্ব-গর্ব্বীই না ছিলে তুমি হাজার বছর আগেকার মহাবীর ! -- আমি তোমায় সহস্র নতি জানাচ্চি।...

[উত্তীয় তাহার বীণার তন্ত্রীতে অন্য সুর তুলিল]

[কিছুক্ষণ মৌন-তন্ময়তার পর] না না, আমি তাঁকে ভাল কোরে-ই জানি। পরিপূর্ণ কোরে চিনি।...তাঁকেই তো এরা আমার সুমুখে হত্যা কোরেচে।...হাঁ, সোনার বাহু ছিল যে-সুগতঋদ্ধির তাঁকেই তো আমি প্রিয়তম বোলে জেনেছিলুম। [সংশয় মিশ্রিত কণ্ঠে] না না, কে বলচে সে আমার দয়িত ?...[গম্ভীর অন্যমনস্কতায়] হুঁ, বুঝেচি, বীণার তন্ত্রীতে যে-গুঞ্জন উঠেচে তারই পরশ, বাণী তুলেচে আমার অন্তর-বীণায়। সে বাণী বোলচে — এই তোমার পরম সত্য, সুগতঋদ্ধির বিরহীচিত্তকে যুগযুগ ধরে ভালোবেসে এসেচে তোমার চিত্ত-তলের বিরহিণী। এ-ভালোবাসা চির-জন্মের। এর রূপ অপৌরুষেয়।...[উৎকণ্ঠিত হইয়া] আচ্ছা, ওরা ও-বজরায় ছুটে গেল কেন ?... তাঁর স্বর্ণ-বিভায়তো মালিন্য ঘটাবে না ?...

উত্তীয়

নারী, আমায় চিনতে পারচ ? যার জন্যে তোমার চোকে কান্না এসেচে, সে যে আমি।

মঞ্জুলা

না না, তাঁর যে মৃত্যু হয়েচে।...ওহো, চিরযুগের বিরহী আমার সুগতঋদ্ধি! তোমার বিরহিণীর বুকের রোদন কি শুনবে না ?

উত্তীয়

[মধুর হাস্যে] সবাই জানে, সুগতঋদ্ধির মরণ হয়েচে। কিন্তু, তা' হয়নি। বিভ্রান্ত মানুষ তার সোনার বাহু দু'খানা সমাধিস্থ কোরেছিল। কিন্তু, তার পরিপূর্ণ অস্তিত্ব, আমার মধ্যেই যে বেঁচে আচে।...চাঁদের রূপালী-তন্ত্রীর মৃদু-ঝঙ্কার শোনো — বিস্মৃতি থেকে জেগে উঠে তুমি আমায় চিনতে পারবে, আমার কণ্ঠে তোমার পরিচিত ধ্বনি জানতে পারবে।...নারী, হাজার বছর ধরে তুমি কি শুনে আসচো-না আমার বীণার সঙ্গীত ?

[হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া পাখীদের অস্পষ্ট-কণ্ঠের উদ্দেশে কান পাতিয়া রহিল। হাত হইতে বীণা স্খলিত হইয়া পড়িল]

পাখীরা হোথায় কী কোরচে ? অমন কোরে ডানার ঝাপ্‌টা দিচ্চে কেন ? [পাখীদের প্রতি] মাস্তুলের উপর ঘুরেঘুরে কী কইচ তোমরা ?...বীণার ইঙ্গিতে নারী-বক্ষে প্রেমের বন্দনা জাগিয়েচি — তাই কি হাসচো ? বিদ্রূপ কোরচো ?...যদি তা-ই হয়, তবে শোনো আমার কথা — চিরন্তনের বাণী কল্পলোক থেকে নেবে এসে আমায় যে-কাজে উদ্বুদ্ধ কোরেচে তার মাঝে সত্য চির-জাগ্রত। সে-বাণীকে লঙ্ঘন করার সাধ্য আমার কোথায় ? তোমরা ক্ষুব্ধ হলে কী কোরবো ?

মঞ্জুলা

[মধুরকণ্ঠে মৃদু হাসিয়া]...কী আশ্চর্য্য, আজ জ্যোৎস্নার অবারিত-অঙ্গনে আমি আমার হাজার-বছরের-হারানো বিরহী-প্রিয়তমকে খুঁজে পেলুম।

উত্তীয়

[স্বগত] মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে এ-নারীকে মোহাচ্ছন্ন কোরেচি কি ?...না না, তা' হতে পারে না। আমার উপলব্ধি মিথ্যে হতে পারে না।

[পাখীদের প্রতি] তোমাদের গুঞ্জন-ধ্বনি আমাকে লক্ষ্য কোরে নয়। তোমরা তো চিরঞ্জীবীদের সন্ধান জান, তাদের ভাষাতো তোমরা পড়তে পার।...না না, তোমাদের ডানার ধ্বনিতো বিশ্বের হর্ষ-সঙ্গীত। তোমাদের গুঞ্জনতো বিবাহ-বাসরের মঙ্গল-গীতি।...আর, যদি ক্ষুব্ধ হয়েই থাক, তবে আমি বোলবো — যে প্রেমকে তোমরা জেনেচ তা' আমার ভালোবাসা থেকে

ভিন্নতর নয়। তোমরা বলবে, আমাকে যা' বিভোর কোরেচে তা' প্রেম নয়। তা' হচ্চে সংরাগ-বহ্নি, সৌজন্য, কৃপা। তার মধ্যে আচে মোহ, আচে ক্ষণিক-মত্ততা, আচে ভঙ্গুর উচ্ছ্বাস।... [অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া গভীর সংশয়ে] নাঃ, কেমন যেন বোধ হচ্চে! সত্যি কি ভুল কোরলুম ?....

মঞ্জুলা

অমন কোরে মুখ ফিরিয়ে নিচ্চ কেন? যুগযুগ ধরে ও-মুখের পানে তাকিয়েই-তো আমি বাঁচবো, বন্ধু!

উত্তীয়

কী বুঝবে আমার বেদনা ?

মঞ্জুলা

কেন, প্রিয়! তোমায় কি হাজার বছর ধরে ভালোবেসে আসিনি ?

উত্তীয়

নারী, আমি কোনোদিন-ই তোমার স্বগতঋদ্ধি নই।

মঞ্জুলা

কিছু-ই বুঝলুম না। তোমার মুখখানা-যে আমি একান্ত কোরে চিনি —

উত্তীয়

না, তোমায় বঞ্চনা কোরেচি।

মঞ্জুলা

তুমি কি হাজার বছর পূর্ব্বে জন্মাওনি? তোমার জন্ম কি সেথায় হয়েছিল না, যেখানে সাগর-উর্ম্মির মানস-শিশুরা হাওয়ায় দুলে উঠে জ্যোৎস্নার প্লাবনে নেচে বেড়াচ্চে? — আমরা কি ফিরে সেথায় যাব-না, বন্ধু ?

উত্তীয়

তোমায় বঞ্চনা কোরেচি, নারী। তোমায় শুধু-ই মিথ্যে বলেচি।

মঞ্জুলা

কী কোরে মিথ্যে বোলবে? তোমার আঁখির গভীরে যে-প্রেমের গান উঠেচে তা-তো বঞ্চনা জানে না? [একটু সন্দিগ্ধ-কণ্ঠে] তবে কি আর কোনো নারীর ছায়া পড়চে তোমার চিত্তে ?

উত্তীয়

না না, ও-কথা বোলো-না —

মঞ্জুলা

[গভীর আবেশে] যদি আর কাউকে ভালোবেসেই থাকো, তাতেই বা আমার কী ক্ষতি? তোমার অনন্ত প্রেম-সায়রে আমি তো আকণ্ঠ নিমজ্জিত কোরে আছি! আর কেউ এসে, এর গভীর থেকে তার ঘট যদি ভরেই নিলে, তাতে নালিশ্ কোরবো কেন?

উত্তীয়

ভুল বুঝলে কেন, মঞ্জুলা? যা' মনে কোরচ তা' নয়। তোমার উপর কতো নির্দ্দয় অন্যায়ই না কোরেচি। কেমন কোরে তার প্রতিবিধান কোরবো?...বলচি সব কথা —

মঞ্জুলা

[মধু-দৃষ্টি ছড়াইয়া] ও সব শুনবার সময় কৈ?...আমার সমগ্র দেহ জুড়ে ঘুম ঘনিয়ে আসচে। তুমি আমার কল্পনায় ধরিয়েচ আগুন। আমার চেতনায় লাগিয়েচ সুন্দরের ছোঁয়া।... যদি সত্যি কোথাও সত্যের অপলাপ কোরে থাক, যদি সত্যি আমার স্বামীকে আমারই সুমুখে হত্যা কোরে এখন আমার চিত্তকে মায়াবলে জয় কোরে থাক — তবুও আমি নালিশ জানাব না, বন্ধু।...আমার অন্তর-যে আজ মুখর হয়ে বলচে — সে তোমার স্বামী ছিল অতীতে, কাল তাকে ভালোবাসতে, আজ নয়। [কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর] একি! কাঁদচ কেন? —

উত্তীয়

কেন কাঁদব না, বল?...আমি তো একান্ত কাঙাল। জনশূন্য সমুদ্রের অন্তহীন বারিরাশি, আর জীর্ণ এ-বজরা ছাড়া আমার আর কী আচে, রাণী?...

মঞ্জুলা

প্রিয়তম, আমার মুখের দিকে একবার তাকাও —

উত্তীয়

আমি কাঁদি। নারী, আমি কাঁদি।...ঐ দেখ উপরে মুক্ত নিশীথ-গগন — হীরে-মাণিক্যের রম্য প্রাসাদতো আমার নেই!

মঞ্জুলা

আমি তো চাইনে তোমার হীরে-মাণিক্যের প্রাসাদ, তোমার মরকতের সৌধশ্রেণী। আমি চাই এমন নিভৃত, যেথায় থাকবে শুধু তোমার আর আমার একটি বাসনা; যেথায় রইবে শুধু তোমার আর আমার একখানি কম্পিত-হিয়া।

উত্তীয়

[সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া] ও-উত্তাল-তরঙ্গকে ভয় করি কি?

[চন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া] ও-চাঁদ কি আমার শত্রু?

[মঞ্জুলা স্তব্ধ-দৃষ্টিতে চন্দ্রের দিকে তাকাইতে]

মুখ ফিরিয়ে নিলে কেন, মঞ্জুলা?

মঞ্জুলা

[অন্যমনস্কভাবে] বন্ধু! চাঁদের দিকে চেয়ে কী ভাব্‌চি, জান? ভাব্‌চি, আকাশের ললাট থেকে ওকে টেনে এনে মুকুটের মতো কোরে তোমার মাথায় যদি পরিয়ে দিতে পারতুম?... [কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর উত্তীয়র অন্যমনস্কতা লক্ষ্য করিয়া] তোমার মনে কিসের রেখাপাত হল? সাগরের দিকে অমন কোরে তাকাচ্চ কেন?...জাননা, প্রিয়! এমন শুভ মিলন-লগনে মনকে অমন উদাসী কোরে তোলায় কতো অগৌরব?...

[উদাসী উত্তীয় ধীর-ক্ষেপে বজরার কিনারায় গেল, এবং সমুদ্রের দিকে তাকাইয়া রহিল, তাহার চোখ দুইটী নির্নিমেষে যেন কী দেখিতেছিল]

[মঞ্জুলা তাহাকে অনুসরণ করিল, এবং পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া]

কী দেখচ সাগর-বক্ষে?...

উত্তীয়

মঞ্জুলা, দেখতে পাচ্চ কিছু?

মঞ্জুলা

ও তো এক ঝাঁক ধূসর-রঙা পাখী, পশ্চিমের আকাশে উড়ে যাচ্চে?

উত্তীয়

শোনো, শোনো! কান দিয়ে শোনো!

মঞ্জুলা

কী শুনবো? পাখীগুলো চেঁচাচ্চে?

উত্তীয়

মন দিয়ে শোনো ওদের গুঞ্জন, দেখবে, মানুষের কণ্ঠে ওরা কথা কইচে।

মঞ্জুলা

[বিস্ময়ে] হাঁ, শুনেচি! — ভাষা এবার বুঝতে পারচি যেন।...ওরা কে? কোথায় যাচ্চে?

উত্তীয়

যাচ্চে কল্পনাতীত আনন্দ-ভূমে।...আমাদের মাথার উপর বৃত্তাকারে ঘুরছিল ওরা! এখন চলচে ওদের গন্তব্য-পথে। ওদেরকে-ই অনুসরণ কোরবো। ওরা-ই-তো আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চলচে।...ঐ শোনো! ওরা বলচে — আমরা যাচ্চি আনন্দ-ভূমে সেথায় মানুষ হয়ে আচে চিরঞ্জীবী।...

[নাবিকগণ সহ দেবদত্তের প্রবেশ। সকলেই অত্যন্ত উত্তেজিত]

প্রথম নাবিক

ও-বজরাটা ভরা কতো মণি-মাণিক্য !

দ্বিতীয় নাবিক

কোথা-ও ফাঁক নেই —

প্রথম নাবিক

— শুধু হীরে আর জহরৎ !

তৃতীয় নাবিক

— বাক্স-বোঝাই চন্দন, গুগ্‌গুল, আরো কতো কি !

প্রথম নাবিক

গজদন্তের কতো মূর্ত্তি। তাদের চোকগুলো চুনির !

তৃতীয় নাবিক

— কতো ঠাকুর-দেবতা। তাদের কিন্তু পান্নার চোক !

প্রথম নাবিক

সমস্তটা বজরা ঝলমল কোরচে, মুক্তো আর নীলকান্ত-মণির বিভায় যেন ?

তৃতীয় নাবিক

চল, এবার বাড়ি ফেরা যাক।...যে মেয়েমানুষকে প্রথম দেখবো, তাকে-ই দেবো কতোগুলো মুক্তো।

দ্বিতীয় নাবিক

আমি যাকে প্রথম পাব, তাকে দেবো ঐ চুনির চোক-সমেত ক'টা মূর্ত্তি।

দেবদত্ত

[ইঙ্গিতে উহাদিগকে থামাইয়া]

এবার সত্যি দেশে ফিরবো, উত্তীয়। এতো অপর্য্যাপ্ত সম্পদের অধিকারী হয়েচি, আর হেথায় মন টিকচে না।...এ-তন্বীকে যখন পেয়েচ তখন আর কিসের লোভে জনহীন সমুদ্রে ঘুরে মরবে ?...

উত্তীয়

উঁহু, শেষ পর্য্যন্ত আমায় যেতেই হবে !....আর এ-নারী ? — আমার মন বলচে, এ-ও হবে...আমার পথের সঙ্গিনী।...

দেবদত্ত

ও-সব চিরঞ্জীবীরা তোমায় বিভ্রান্ত কোরেচে। না, হয়তো এ-নারী-ই প্রতিহিংসা সাধনের জন্যে তোমায় ও-পথে টেনে নিচ্চে। [মঞ্জুলার প্রতি] তুমি-ই ওকে অমন মতি-ভ্রষ্ট কোরেচ, অবশ্যম্ভাবী-মৃত্যুর দুয়ারে অমন কোরে ঠেলে দিচ্চ —

মঞ্জুলা

— মিথ্যে কথা।...উত্তীয় বলেচে, আমায় কল্পনাতীত আনন্দ-ভূমের সন্ধান দেবে।

দেবদত্ত

[অবজ্ঞা-ভরে] ও-আনন্দলোক যদি স্বপ্নের মতো অলীক হয়? বুদ্‌বুদের মতো ক্ষণিকের হয়? ধূলোর মতো অকিঞ্চিৎকর হয়? ... বদ্ধ বাতুলতা! অমন যদি থাকে-ও, তবে তা' মৃত্যুর পরপারে।...

মঞ্জুলা

না না, মৃত্যুর পরপারে নয়। এ এমন দেশ যেথায় সকল মানুষের চিন্তার ধারা ঊর্দ্ধে, বহু ঊর্দ্ধে, অসীম বিস্তারে অসহ্য-আনন্দে ছুটে যায় — যেমন আনন্দাতিশয্যে ছুটে যায় পৃথিবীর নদী-গুলো — সীমাহীন-সাগরের বুকে লুটিয়ে পড়ার কামনায়।

দেবদত্ত

[উত্তীয়কে দেখাইয়া] ওকে-ই জিজ্ঞেস করো না। সে জানে, তার পথ-চলা মৃত্যুর আমন্ত্রণে। জিজ্ঞেস কর, অস্বীকার কোরতে পারবে না।

মঞ্জুলা

[উত্তীয়কে] সত্যি তাই?

উত্তীয়

জানিনে। তবে এ জানি, আমায় যারা পথ দেখিয়ে নিচ্চে তারা সত্য থেকে বিচ্যুত হয়-না।

দেবদত্ত

— সব ছায়াবাজি! ভ্রান্তি! মায়া!...ঐ অশরীরীর ইঙ্গিত, চিরঞ্জীবীর হাসি-বিদ্রূপ-আহ্বান — সব ভুয়ো! সব ভিত্তি-হীন!

মঞ্জুলা

[ব্যাকুলিত-কণ্ঠে উত্তীয়র প্রতি] না না, এমন স্থানে আমায় নিয়ে চল, উত্তীয়, যেথায় ফাঁকি নেই, ক্ষণিকের মোহ নেই। চলো বাস্তবের দিকে, দু'জনের পরিপূর্ণ প্রেম দিয়ে রচিত ছোট্ট মোদের নীড়ে অজস্র হয়ে বর্ষিত হবে বিশ্বের যতো রস-সৌন্দর্য্য।

উত্তীয়

[উদাস-গম্ভীর কণ্ঠে] ঐ অন্তরতমের আহ্বানকে উপেক্ষা করি কী কোরে? যারা আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্চে, যারা আমায় সত্যের বাণী শুনিয়েচে তাদের ত্যাগ কোরলে আমি শান্তি পাব কেন?

মঞ্জুলা

— আমি তোমার চোক ঢেকে রাখবো আমার কেশের ছায়ে। তোমার কান স্তব্ধ কোরে দেব আমার ওষ্ঠের চুম্বনে। তুমি আর ওদেরকে দেখবে না। ওদেরকে কথা শুনবে না।

উত্তীয়

ওরা যদি অকিঞ্চিৎকর হোতো তবে তোমার কথা-ই শুনতুম। কিন্তু, ওরা যে আমার কল্পনা-লোকের সঙ্গী! বহু উর্দ্ধের উচ্ছ্বসিত-আলোকের বন্দনা-যে ওদের-ই ডানার ধ্বনিতে!...

মঞ্জুলা

ওরা যে একান্ত-ই রহস্যপূর্ণ! ওদের ইঙ্গিততো তাই আমাদের কাচে ব্যর্থ! ওদের ভাষার সত্য-মর্ম্মটুকু গ্রহণ না-কোরতে পেরে আমরা তো অলীকের ফাঁদে পড়েচি? —

উত্তীয়

মঞ্জুলা! আমাদের প্রেম এতো নিবিড়, এতো বিশাল, এতো সত্য হয়ে উঠবে-যে ওদের-ই মত সমস্ত অলৌকিককে দিনের আলোর মতো বুঝতে পারবো।

মঞ্জুলা

[ব্যাকুলকণ্ঠে] আমি তো দুর্ব্বল নারী, প্রত্যেক মুহূর্ত্তেই বুক-যে আমার কেঁপে উঠ্ছে...

দেবদত্ত

[হতাশকণ্ঠে] নাঃ, এ সব হেঁয়ালি নিয়ে থাকলে চলচে না। [নাবিকদের প্রতি] চল ও-বজরায়। আমরা নৌকো ছেড়ে দি'। এদের পাগলামোতে সায় দিলে মৃত্যু অবধারিত।

[নাবিকগণ নিষ্ক্রান্ত হইল]

উত্তীয়

[মঞ্জুলার প্রতি] ওদের সঙ্গে তুমিও যাও, মঞ্জুলা! দেবদত্ত তোমায় আশ্রয় দেবে। গৃহে পৌছে দেবে।...

দেবদত্ত

[উত্তীয়র হাত স্পর্শ করিয়া]

নিশ্চয়ই তা দেবো।

মঞ্জুলা

[দূরাবগাহী দৃষ্টি মেলিয়া অত্যন্ত গভীর স্বরে]

না।...এই নাও আমার অসি। দড়া কেটে দিয়ে তোমাদের তরী দাও ভাসিয়ে ঘরের উদ্দেশে।...আমি যাব। উত্তীয়র সঙ্গে, আমি যাব...

দেবদত্ত

[আর ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না-করিয়া]

নাঃ, আর দেরি কোরতে পারিনে। চললুম — বিদায়! বিদায়!...

[প্রস্থান]

মঞ্জুলা

দড়ার বন্ধন কেটে দিয়েচে।....ওদের তরী ভেসে চল্‌ল।...সাগরের বুকে উঠেচে ওর চলার ধ্বনি। চিরজন্মের পরিচিত ধরিত্রী, আজ কল্পনা থেকেও বিলুপ্ত হচ্চে। একান্ত অজানা-পথের পথিক আমি।...কিন্তু, ভয় কি? সাথীতো রয়েচে আমার অন্তরের প্রিয়তম।...এ যাত্রায় না আচে ক্লান্তি, না আচে শেষ, না আচে বিচ্ছেদ।...উত্তীয়! আমার চিত্তের সম্রাট! আর তো আমায় ছেড়ে যেতে পারবে না! — ঐ দেখ, নিবিড় কোরে আঁধার নেবে আসচে আকাশের অঙ্গনে। এ তমিস্র-মৌনতায় চির-যুগ ধরে কেঁপেকেঁপে থাকবে শুধু তোমার আর আমার হিয়াতল জুড়ে একটি স্পন্দন।...আমার রক্ত ছেয়ে কী অপূর্ব্ব হরষ স্বপন হয়ে নেবে আসচে। ওগো প্রভু! আমার লক্ষ যুগের স্বামী! তোমার শুভ্র কণ্ঠে আমি আমার কল্পনার গাঁথন দুলিয়ে দিচ্চি। পাখীর মৌন গানে, সাগরের মুখর ঊর্ম্মি-মালায়, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত তরুণী-আকাশের পুলকে যে-অনাহত-বাণী জেগে ওঠে, তা-ই যেন আজ আমার মনের উৎসবে ধ্বনি তুলেচে।...ওগো প্রিয়তম! আমার বক্ষে তোমার মুখখানা লুটিয়ে দাও। আমার আলুলায়িত কুন্তলদামে তোমার নয়ন দেব ঢেকে। তারপর, দু'জনে স্তব্ধ-নিঃসীমতায় আঁখি মুদে রইবো।— যা' কিছু অনির্ব্বচনীয়, যা' কিছু পরম অলৌকিক, যা' কিছু ভূমানন্দ — তা' একান্ত হয়ে আমাদের দেহ-মনের রন্ধ্রেরন্ধ্রে রোমাঞ্চ তুলবে।...

উত্তীয়

[মঞ্জুলার অজস্র কেশদাম অত্যন্ত সোহাগে তুলিয়া ধরিয়া]

মঞ্জুলা! প্রিয়তমা! আমার অন্তরের চিরন্তনী-মানসী! আমাদের অনাবিল, অফুরন্ত প্রেমে পরম সত্যকে নিবিড় কোরে পাবে। — তারপর, সে-প্রেম-সুধায় গাহন কোরে আমরা জয় কোরবো মৃত্যুকে।...আমার বীণার তন্ত্রী জুড়ে উঠবে অনাহত সঙ্গীত। তার প্রতি মূর্চ্ছনায় স্পন্দিত হবে ঐ অশরীরীদের চিরন্তন-গীতি, স্বপ্নলোকের মরমী-গুঞ্জন, শাশ্বত প্রেম-রসের উদ্বেলিত কল-গান।...প্রেয়সী! এমনি অনবদ্য আনন্দ-রভসে তুমি আমায় জানাবে গাঢ় কোরে একটি চুম্বন — তারি আভাসরাগ, রঞ্জিত হোয়ে রইবে সৃষ্টির কপোল-তলে মধু-ক্ষরিত লগনের অন্তহীনতায়।*

* ইয়েট্‌স্‌-এর "Shadowy Waters"-এর একান্ত অনুসরণে

রাত্রি

পার্ব্বতী দেবী

নভচারী আশা মেলি বিহঙ্গের মত চিত্তধায়
দিগন্তের বিলীন সীমায়।

শত শত জ্যোতিষ্কের আবর্ত্তের বেগ যায় মিলে
আমার হৃদয় তলে উষ্ণরক্ত ধমনীর নীলে।
নিশীথের অন্ধকারে ধরণীর মুখখানি ঢাকা ;
নিশাচর বিহঙ্গের দীর্ঘমুক্ত সঞ্চালিত পাখা
তোলে আর্ত্তরব ;
বসন্তের বনচ্ছায়ে অতুল বৈভব
অর্দ্ধ বিকশিত হয় মৃদু জ্যোৎস্নালোকে
আমার এ স্বপ্নময় চোখে ;
অজ্ঞাত অলক্ষ্য হ'তে নির্ঝরিত আশীর্ব্বাদ লাগে—
চিত্ত যেন জাগে
সুদীর্ঘ গুণ্ঠন খুলে আচ্ছাদিত গূঢ়বাস হ'তে
উন্মুক্ত অম্বর তলে তারার আলোতে।

এতদিন যা চেয়েছি
এতদিন যা পাইনি কাছে—
সবি যেন আছে—
মৃত্যুসম শান্তি নিয়ে অন্তরের কন্দরে গভীর
চির স্থির
প্রত্যহের পাওয়া আর প্রত্যহের ব্যর্থতম চাওয়া,
মৃদু পুষ্প গন্ধ নহে, নহে মৃদু দক্ষিণের হাওয়া
উত্তাল তরঙ্গসম বৈশাখীর ঝড়
ব্যাপ্ত করি জীবন প্রান্তর।

মোহাচ্ছন্ন যে গুণ্ঠনে ঢেকে রাখো মুখ
খুলে দেখো আজি এই আঁধারে উৎসুক
শত লক্ষ তারাময় আকাশের অন্তহীন রূপ—
তার মাঝে আনো তব আপন স্বরূপ—
তারো আছে দাম
অখণ্ড গৌরব দীপ্ত তারো আছে আপনার নাম।
জগতের এক প্রান্ত হ'তে
প্রতিদিন যাত্রা তার অন্তহীন বিশ্বের আলোতে।

'পথের দাবী' ও শরৎচন্দ্র

প্রবীরকান্তি নাগ

'পথের দাবী' শরৎচন্দ্রের অমর-লেখনী প্রসূত অপূর্ব্ব সৃষ্টি। সাধারণ একখানা উপন্যাস গ্রন্থের ভিতর দিয়ে শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীর মনোবৃত্তির ও জীবন-যাত্রার যে ছবি এঁকেছেন বাস্তবিকই তা হৃদয়গ্রাহী। বিপ্লবীদের মনোভাব অঙ্কনে তিনি যে নিপুণ অন্তর্দৃষ্টি, সহানুভূতি ও কলা-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন বাঙ্গালা সাহিত্যে তা'র তুলনা নেই।

বর্ম্মার এক নির্জ্জন অঞ্চলে—টিকিধারী ফোঁটা-তিলট-কাটা অপূর্ব্ব, ক্রীশ্চিয়ান মেয়ে ভারতী, পোলিটিক্যাল্ সস্পেক্ট সব্যসাচী, অসামান্যা রূপসী কঠিন-হৃদয়া সুমিত্রা, রামদাস তলওয়ারকর, শশী ও নবতারা এবং নীরবকর্ম্মী হীরা সিং প্রভৃতি সভ্যের সমন্বয়ে 'পথের দাবী' সমিতির সৃষ্টি। "মানুষের মনুষ্যত্বের পথে চল্‌বার সর্ব্বপ্রকার দাবী অঙ্গীকার করে আমরা সকল বাধা ভেঙে-চুরে চল্‌বো। আমাদের পরে যা'রা আস্‌বে তা'রা যেন নিরুপদ্রবে হাঁট্‌তে পারে, তাদের অবাধ মুক্ত গতিকে কেউ যেন না রোধ করতে পারে।"—এই এর সভ্যদের পণ। স্কুল করে গরীব নোঙরা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেওয়া, বস্তির মজুরদের শুধু একটীবারের তরে নিজের সত্যিকারের জোরটুকু চেয়ে দেখ্‌বার জন্যে উত্তেজিত করা ও ঘন ঘন বক্তৃতা দান পর্য্যন্ত সমিতির কাজ এক প্রকার হয়ে আস্‌ছিল; কিন্তু গোল বাধ্‌লে যত সব অপূর্ব্বকে নিয়ে, এবং এই অপূর্ব্বকে অবলম্বন করেই সভ্যদের মধ্যে এমন মনোমালিন্যের সৃষ্টি হ'ল যা'র ফলে 'পথের দাবী'কে শীঘ্রই ছত্রভঙ্গ হ'তে হয়।—এই হ'ল 'পথের দাবী'র গল্পাংশ।

'পথের দাবী' আগাগোড়া মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে পরিপূর্ণ। এতে গল্প আছে, ঘটনা আছে—কিন্তু প্রধান উপজীব্য বস্তু ভারতী ও সব্যসাচীর পরস্পর বিভিন্নপন্থী বিতর্ক। প্রধান চরিত্রগুলির ত কথাই নেই, পোষ্ট মাষ্টার, ফিরিঙ্গি ছোকরার দল, ষ্টেশন মাষ্টার, কারখানার মজুর প্রভৃতি যাহারাই এর দৃশ্যপটে একবার উঁকি মেরেছে তা'রা প্রত্যেকেই পাঠকের মনে আঁচ কেটে রেখেছে—এই হল উপন্যাসখানির বিশেষত্ব। শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব রচনা-ভঙ্গী পাতায় পাতায় রস সৃষ্টি করে তুলেছে। দু চারটী কথায় দেশের লোকের প্রতি দেশের লোকের লজ্জা ও গ্লানি এমনভাবে ফুটে উঠেছে যা দীর্ঘ রচনায়ও সম্ভব নয়।

আমাদের সামাজিক, পারিবারিক ও রাজনৈতিক জীবনে নারীর যথার্থ শক্তি, শান্তি এবং প্রীতির উৎস কোথায় ভারতীর মত চরিত্র অঙ্কন করে শরৎচন্দ্র তা' দেখিয়ে দিয়েছেন। ভারতী ইণ্ডিয়ান ক্রীশ্চানের মেয়ে; কিন্তু "নিজেকে উদ্ধত খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী রাজার জাতি মনে করে তা'র পিতার মত দর্পিতা নয়।" অপূর্ব্বর প্রতি তা'র সেবার ভিতর দিয়ে লেখক যে অসামান্য

গৃহিণীপনার আভাষ দিয়েছেন বাস্তবিকই তা প্রণিধানযোগ্য। তার কর্ম্ম জীবনই বা কি সুসংযত ও সহানুভূতিপূর্ণ! অপূর্ব্বর প্রতি তার ভালবাসা, ডাক্তারের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা, 'পথের দাবী'র শুভচেষ্টা ও সর্ব্বোপরি তা'র দেশপ্রেম সকলই যেন শুচিতা-মাখা। দেশের অশিক্ষিত জনমজুরদের দুঃখ ব্যাকুলতা বার বার তা'র অন্তরে আঘাত করেছে। এইখানেই সে সব্যসাচীর অনেক উর্দ্ধে।

"কারখানার মজুর-মিস্ত্রিদের পাপ, তাদের কু-শিক্ষা, তাদের পশুর মত অবস্থা,—এর এক বিন্দু প্রতিকারও যদি সারা জীবনে করতে পারি, তার চেয়ে বড় সার্থকতা আমার আর কি হ'তে পারে?"—এই হ'ল ভারতীর জীবনের ব্রত। ভারতী অহিংসার পক্ষপাতী। তাই সে সব্য-সাচীকে বার বার বলেছে,—"ভারতের মুক্তি আমরা চাই--অকপটে, অসঙ্কোচে, মুক্তকণ্ঠে চাই। দুর্ব্বল, পীড়িত, ক্ষুধিত ভারতবাসীর অন্নবস্ত্র, চাই। মনুষ্য জন্ম নিয়ে মানুষের একমাত্র কাম্য স্বাধীনতার আনন্দ উপলব্ধি করতে চাই। ভগবানের এত বড় সত্যে উপস্থিত হবার নিষ্ঠুর পথ ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই, এ আমি কোন মতেই ভাবতে পারিনে, দাদা। এমন বিধান কিছুতেই সত্য হ'তে পারে না। নিষ্ঠুরতার এই বারম্বার চলা-পথে তুমি আর চলো না। দুয়ার হয়ত আজও রুদ্ধ আছে, তাই তুমি আমাদের জন্যে খুলে দাও—এ জগতের সকলকে ভালবেসে আমরা তোমাকে অনুসরণ করে চলি।"

সব্যসাচী বিপ্লবী। ভারতের স্বাধীনতাই তা'র একমাত্র লক্ষ্য, তা'র একমাত্র সাধনা। এই তা'র ভাল, এই তা'র মন্দ,—এ ছাড়া এ জীবনে আর তার কোথাও কিছুই নেই।—"সকল দেশেই জন কতক লোক থাকে যাদের জাতই আলাদা। দেশের মাটী এদের গায়ের মাংস, দেশের জল এদের শিরার রক্ত; শুধু কি কেবল দেশের হাওয়া আলো,—এর পাহাড় পর্ব্বত, বন জঙ্গল, চন্দ্র সূর্য্য, নদী নালা যেখানে যা' কিছু আছে সব যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে এরা শুষে নিতে চায়! বোধ হয় এদেরই কেউ কোন্ সত্যকালে জননী জন্মভূমি কথাটা প্রথম আবিষ্কার করেছিল। এদের বেঁচে থাকা আর প্রাণ দেওয়ার মধ্যে এই এতটুকু মাত্র প্রভেদ!"—এ কথাটা সব্যসাচীর বেলায়ই খাটে। "মানুষের চল্‌বার পথ মানুষে কোনদিন নিরুপদ্রবে ছেড়ে দেয় না। হিংসার মধ্য দিয়েই তা'কে চিরদিন পা ফেলে আস্‌তে হয়,"—এই তা'র ধারণা। তাই সে ভারতীর কথায় প্রতিবাদ করে বলেছে,—"আপনাকে ভোলাবার অনেক রাস্তা খোলা আছে ভারতী, কিন্তু সত্যে পৌঁছবার আর দ্বিতীয় পথ নেই।...আমার কামনায়, আমার তপস্যায় আত্ম-বঞ্চনার অবসর নেই। এ তপস্যা সাঙ্গ হ'বার শুধু দুটি মাত্র পথ,—এক মৃত্যু, দ্বিতীয় ভারতের স্বাধীনতা।"

মনুষ্য হৃদয়ে দেশের প্রতি ভালবাসা যতটুকু পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে সব্যসাচীই তার চরম অভিব্যক্তি। দেশই তা'র জীবন—দেশই তার সব। কেউ মরে গেলেও অন্যদিকে মন দেবার তার সময় নেই—এমনিই দেশের কাজ। কিন্তু দেশের প্রতি তা'র এ ভালবাসা একমুখী।

সকল মানুষের মঙ্গলই না সত্যিকারের মঙ্গল, সকল মানুষকে ভালবেসেই না মানব হৃদয়ের ভালবাসার যথার্থ সার্থকতা,—নচেৎ এর মূল্য কোথায়? সব্যসাচীর ভালবাসা বিশ্ব মানবের মধ্যে বিস্তৃত ছিল না বলেই ভারতীর কাছে তাকে পরাজয় স্বীকার করে বল্‌তে হয়েছে,—"ভারতী, এ আমার ভয়ঙ্কর কি শান্ত মূর্ত্তি আমি নিজেই জানিনে, শুধু জানি, এ জীবনে এ রূপ আমার আর পরিবর্ত্তন হ'বার নয়।...ভারতের স্বাধীনতা ছাড়া আমার নিজের আর দ্বিতীয় লক্ষ্য নেই, কিন্তু মানব জীবনে এর চেয়ে বৃহত্তর কাম্য আর নেই এমন ভুলও আমার কোনদিন হয়নি। স্বাধীনতাই স্বাধীনতার শেষ নয়। ধর্ম্ম, শান্তি, কাব্য, আনন্দ—এরা আরও বড়।"

কিন্তু,—"রাজত্ব করার লোভে যারা সমস্ত দেশটার মধ্যে মানুষ বল্‌তে আর একটা প্রাণীও রাখেনি, স্বার্থের দায়ে ধীরে ধীরে মানুষকে অমানুষ করে তোলাই যাদের মজ্জাগত সংস্কার, এদের ক্ষমা করা যায় না,"—এই ধারণা নিয়ে যে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছে ভারতীর যুক্তির মোহ কি কখনও তাকে দমিয়ে রাখ্‌তে পারে? 'পথের দাবী'র ভেতর দিয়ে যে একদিন দেশের সব চেয়ে বড় কাজ সম্ভব হ'তেও পারে একথা সে অস্বীকার করে না; কৃষক মজুরদের দিনও যে একদিন আসবে, যখন তাদের হাতেই জাতির সকল কল্যাণ অকল্যাণের ভার সমর্পণ করতে হবে,—এও সে স্বীকার করে; কিন্তু পরাধীন দেশের উন্নতি যে শুধু বিপ্লবের মাঝ দিয়েই সম্ভব—একথা সে কখনও ভুল্‌তে পারেনি। তাই সে বুঝতে পেরেছিল,—"দরিদ্রনারায়ণের সেবা আর ম্যালেরিয়ায় কুইনিন্ জুগিয়ে বেড়ানোকেই মানুষ হওয়া বলে না। মানুষ হয়ে জন্মানোর মর্য্যাদা বোধকেই মানুষ হওয়া বলে, মৃত্যুর ভয় থেকে মুক্তি পাওয়াকেই মানুষ হওয়া বলে। এবং এইজন্যই স্নেহে, প্রেমে, করুণায়, মাধুর্য্যে ভারতীর হৃদয় পরিপূর্ণ ছিল বলেই সে তা'কে নিজের দল থেকে দূরে সরিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছিল এবং সরিয়ে রেখেছিলও। এইখানেই সব্যসাচী নিজেকে টেনে অনেক নীচে নামিয়ে নিয়েছে।

সব্যসাচী ও ভারতীর ভিতর দিয়ে শরৎচন্দ্র ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিংসা ও অহিংসার সমস্যাকে রূপক করে তুলেছেন। সব্যসাচী হিংসার প্রতীক্—তাই বলে তাকে আমরা পায়ে ঠেল্‌তে পারিনে; আবার অহিংসা মতবাদী বলে ভারতীকেও পূর্ণভাবে গ্রহণ করা যায় না। ভারতী ও সব্যসাচীর পরস্পর তর্কবিতর্কের এইখানেই সার্থকতা।

'পথের দাবীর' অপর একটী প্রধান চরিত্র অপূর্ব্ব। শরৎচন্দ্র ভারতী ও সব্যসাচী চরিত্রে যে সজীবতা অঙ্কন করতে চেষ্টা করেছেন তা মূর্ত্ত হয়েছে অপূর্ব্বকে দিয়ে। অপূর্ব্ব সনাতন-বাদী। দেশকে সে শ্রদ্ধা করে সত্যি; কিন্তু তার এ শ্রদ্ধা ততটুকু প্রোজ্জ্বল নয় যতটুকু আছে মার প্রতি তা'র ভালবাসা। মার তরে সে অন্যের গলগ্রহ হয়ে থাক্‌তেও রাজী। এইখানেই সে শিশুর মত সরল ও বাধ্য। তাই বর্ম্মা যাবার কথা নিয়ে মা যখন বল্‌লেন,—"তুই কি ক্ষেপেছিস্ অপু, সে দেশে কি মানুষে যায়! যেখানে জাত, জন্ম, আচারবিচার কিছু নেই শুনেছি, সেখানে

তোকে দেব আমি পাঠিয়ে? এমন টাকার আমার দরকার নেই।"—তার উত্তরে, "তোমার হুকুমে আমি ভিখিরী হয়েও থাক্‌তে পারি,"—এ বলাটুকু মার প্রতি তার ভক্তি ও ভালবাসার চরম নিদর্শন।

বোথা কোম্পানীর ম্যানেজার হয়ে অপূর্ব্ব বর্ম্মা আস্‌ল; কিন্তু মার সজল-চোখের এ আদেশ বা অনুরোধ সে কোনদিন ভুল্‌তে পারেনি,—"যেক'টা দিন বেঁচে আছি অপু, তুই কিন্তু আমাকে কষ্ট দিস্‌নে বাবা।"—এই ছিল তা'র জীবনের মূল মন্ত্র। তাই ভারতীকে সে শুধু ক্রীশ্চানের মেয়ে বলেই উপেক্ষা করতে চেয়েছিল। খৃষ্টান সাহেবদের অত্যাচারে দেশের প্রতি তার সুপ্ত ভালবাসা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল সত্যি, কিন্তু এ সকলই ক্ষণিকের প্রেরণা মাত্র। মাতার প্রতি ভালবাসার নিকট সকলই পরাজিত। এই ক্ষণিকের প্রেরণায়ই সে 'পথের দাবী'র সভ্যদল-ভুক্ত হয়েছিল। অপূর্ব্ব ভীরু ও দুর্ব্বল। হয়ত বা এই দুর্ব্বলতার জন্যই সে—'পথের দাবী' যে বিদ্রোহীর দল এবং ওরা যে লুকিয়ে বন্দুক ও রিভলবার রাখে—এসমস্ত প্রকাশ করে দিয়েছিল।

অপূর্ব্ব চরিত্রের ভিতর দিয়ে শরৎচন্দ্র এক মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে চেয়েছেন। জোসেফ সাহেবের অত্যাচার, পোষ্ট মাষ্টারের দম্ভ, ফিরিঙ্গি ছোঁড়াদের বুটের আঘাত, ষ্টেশনমাষ্টারের বেঞ্চ করে দেওয়া, এ সকল থেকে তিনি বার বার প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন পরাধীন জাতির শত লাঞ্ছনা ভোগ। "আমরা পরাধীন জাতি, ইংরেজ নই, ফরাসী নই, আমেরিকান নই,—কোথায় পাব আমরা অপ্রতিহত গতি? ষ্টেশনের একটা বেঞ্চে বস্‌বার আমাদের অধিকার নেই, অপমানিত হয়ে নালিশ কর্‌বার পথ ও আমাদের রুদ্ধ; শত শত ভারতবাসী এক কামরায় পঁচে মর্‌লেও রেলকোম্পানী আমাদের জন্য আলাদা গাড়ীর উপায় করে দেয় না, অথচ এই গাড়ীতেই দেখ্‌বে ইংরেজ সাহেবেরা একা একা আস্ত এক কামরা জুড়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। আমরা বস্‌লে বেঞ্চ অপবিত্র হয়, আমরা গেলে ঘরের হাওয়া কলুষিত হয়,—আমরা যেন মানুষ নই! আমাদের যেন মানুষের প্রাণ, মানুষের রক্ত মাংস গায়ে নেই!! আর এত কেবল অপূর্ব্ব বলেই নয়, সবাই মিলে লাঞ্ছনা এমন নিত্য নিয়ত সহ্য করে যাই বলেই ত এদের স্পর্দ্ধা দিনের পর দিন পুষ্ট ও পুঞ্জীভূত হয়ে আজ এমন অভ্রভেদী হয়ে উঠেছে যে আমাদের প্রতি অন্যায়ের ধিক্কার সে উচ্চ শিখরে আর পৌঁছোতে পর্য্যন্ত পারে না! নিঃশব্দে ও নির্ব্বিচারে সহ্য করাকেই নিজেদের কর্ত্তব্য করে তুলেছি বলেই অপরের আঘাত করার অধিকার এমন স্বতঃই সুদৃঢ় ও উগ্র হয়ে উঠেছে।"

'পথের দাবী'তে শরৎচন্দ্র দেখাতে চেয়েছেন পরাধীন দেশের কৃতঘ্নতা। "যাদের সেবা করবে তারাই তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখ্‌বে, প্রাণ যাদের বাঁচাবে, তারাই তোমাকে বিক্রী করে দিতে চাইবে! মূঢ়তা আর অকৃতজ্ঞতা প্রতি পদক্ষেপে তোমায় ছুঁচের মত বিঁধ্‌বে। শ্রদ্ধা নেই, স্নেহ নেই, সহানুভূতিই নেই, কেউ কাছে ডাক্‌বেনা, কেউ সাহায্য করতে আস্‌বেনা, বিষধর সাপের মত তোমাকে দেখে লোকে দূরে সরে যাবে। দেশকে ভালবাসার এই এদের পরিণাম।"

জাতিকে এ অপবাদ থেকে মুক্ত করতে হবে। নচেৎ দেশের মঙ্গল নেই।

*　　*　　*　　*　　*　　*

শরৎচন্দ্র যে দেশকে কতটুকু ভাল বাসতেন, দেশের লোক যে তাঁ'র কত প্রিয় ছিল—'পথের দাবী' পড়লেই তা'র সম্যক্ উপলব্ধি হয়। সর্ব্বপ্রকার সামজিক ও রাজনৈতিক গোলামী এবং কৃতঘ্নতাকে তিনি প্রবল ভাবে আঘাত করেছেন, ও এবিষয়ে দেশবাসীর দৃষ্টি সজাগ করে তুলেছেন। দেশের প্রতি উদগ্র ভালবাসা না থাকলে কি তিনি ভারতী ও সব্যসাচীর ন্যায় চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেন? দরিদ্র দেশবাসী যে তাঁ'র কতটুকু আপনার ছিল তা বুঝা যায় বস্তির মজুরদের উদ্দেশ্য করে ভারতীর মুখ দিয়ে তাঁর একথাটুকু বলিয়ে নেবার মাঝ থেকে—"এরা কারা অপূর্ব্ব বাবু? এরা ত আমরাই। এই ছোট্ট কথাটুকু যখনি ভুলছেন তখনই আপনার গোল বাধছে। আর ভাল? ভাল করা বলে যদি কোন কথা থাকে সেতো এখানেই। ভাল ত ডাক্তার বাবুর করা যায়না অপূর্ব্ব বাবু!"—

ব্যথার উপর ব্যথা, সমগ্র জাতির পুঞ্জীভূত বেদনার ভার, তাঁহার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তাই শরৎচন্দ্রের সাধনার মধ্য দিয়ে বাঙ্গালী জাতি নিজের অন্তরের সন্ধান পায়; শরৎ-চন্দ্রের ভিতর জাতি পায় নিজের মনের মানুষকে। দারিদ্র্যের সত্যকার দুঃখ ও বেদনা তিনি সমগ্র অন্তর দিয়ে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, আর পেরেছিলেন এদেশের সমাজ-জীবনের সর্ব্বস্তরে যে রূপ রয়েছে তাকে কবির দৃষ্টিতে ছানিয়া-ছাঁকিয়া অঙ্কন করতে। এই যে কলা, এই যে কবিত্ব, ইহা কাকে ও শিখিয়ে দেওয়া যায় না। এ বিদ্যা লাভ হয়না অনুকরণ করে। এর মূলে থাকা চাই অন্তরের প্রেরণা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্ত দৃষ্টি ভঙ্গিমা। শরৎচন্দ্র এই অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেছিলেন দেশের ও জাতির প্রতি প্রেম এবং প্রীতির প্রভাবে। গভীর এই প্রেমস্ফুরিত দৃষ্টিই তাঁকে স্বরূপের সন্ধান দিয়েছিল। সংস্কারের শত অন্তরাল এবং আচ্ছাদনের মাঝ থেকে তিনি বের ক'রে এনেছিলেন বাঙ্গালীর খাঁটি মানুষকে —জাতির দৃষ্টির সম্মুখে তাদের দাঁড় করিয়ে বলে গেছেন, "এই দেখ বাঙ্গালীর মানুষের রূপ, দেখ, একবার চোখ মেলে চেয়ে দেখ,—যাহাদিগকে এতদিন তুচ্ছ করে আসছ, তোমাদের জন্ম, ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যাবুদ্ধির গর্ব্বে উপেক্ষা করেছ আজ তাদের সত্যি-কারের রূপ দেখ।" কবির ভাষায় তিনি বলতে চেয়েছেন,—'পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।'

শরৎচন্দ্র যাই লিখেছেন নিজের বাস্তব উপলব্ধি থেকেই লিখেছেন। অনুভূতির বাইরে তিনি কখন ও কিছু লিখেন নি। তিনি নিজেই এক জায়গায় বলে গিয়েছেন,—"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলেনা কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখন ও হিসেব নিলেনা, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনও দিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার,

কত দেখেছি কুবিচার, কত দেখেছি নির্ব্বিচারের দুঃসহ সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে। সংসারে সৌন্দর্য্য-সম্পদে ভরা বসন্ত-আসে জানি, আনে সঙ্গে তার কোকিলের গান, আনে প্রস্ফুটিত মল্লিকা-মালতী জাতিযূথী, আনে গন্ধ-ব্যাকুল দক্ষিণাপবন; কিন্তু যে আবেষ্টনে দৃষ্টি আমার আবদ্ধ রয়ে গেল তার ভিতরে ওরা দেখা দিলেনা। ওদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ আমার ঘট্‌লনা। সে দারিদ্র্য আমার লেখার মধ্যে চাইলেই চোখে পড়ে। কিন্তু অন্তরে যাকে পাইনি শ্রুতি-মধুর শব্দ রাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকেই পেয়েছি বলে প্রকাশ কর্‌বার ধৃষ্টতাও আমি করিনি। এমনি আরও অনেক কিছুই এ জীবনে যাদের তত্ত্ব খুঁজে মেলেনি—স্পর্দ্ধিত অবিনয়ে মর্য্যাদা তাদের ক্ষুন্ন করার অপরাধও আমার নেই। তাই সাহিত্য-সাধনার বিষয়-বস্তু ও বক্তব্যও আমার ব্যাপক নয়, তারা সঙ্কীর্ণ, স্বল্প-পরিসরবদ্ধ। তবুও এটুকু দাবী করি—অসত্যে অনুরঞ্জিত করে তাদের আজও আমি সত্য ভ্রষ্ট করিনি।"

বাস্তবজীবনেও শরৎচন্দ্রের দেশ সেবার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। তাঁহার প্রিয় বন্ধু ৺জলধর সেন মহাশয় শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে লিখেছেন,—"শরৎচন্দ্র যে কত বড় পরদুঃখকাতর ছিলেন তাহা বুঝিতে পারিবেন যদি আপনারা আজ শরৎচন্দ্রের গ্রামের চতুষ্পার্শবর্ত্তী গ্রামে যান। দেখিবেন রূপনারায়ণের তীরে তীরে তাঁহার মৃত্যুতে দরিদ্রের মর্ম্মভেদী হাহাকার উঠিয়াছে। পূজার পূর্ব্বে বাড়ী যাওয়ার সময় তাঁহার কাছে গিয়া একদিন দেখিলাম, তিনি ২।৩ বাণ্ডিল কাপড়ের কাছে বসিয়া ৬০।৭০ টাকার সিকি দু আনি গুণিতেছেন। অনেক পীড়াপীড়ির পর তিনি বলিলেন, তাঁহার গ্রামে অনেক লোক খাইতে পায়না, তাদের চালে খড় নাই, ঘরে অন্ন নাই তাহাদিগকে একখানা দুআনি কি একখানা সিকি দিলে তাহারা কত সুখী হইবে—এই বলিয়া শরৎচন্দ্র চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। আমি বুঝিলাম এ চোখের জলের মূল্য মণিমুক্তা কহিনুরের অপেক্ষা অনেক বেশী।"

যেখানে অবহেলা, শরৎচন্দ্রের সহানুভূতি সেইখানে। কি পশু জীবন—কি মানবজীবন—সর্ব্বত্রই তাঁহার অসীম সহানুভূতি ছিল তুচ্ছতমদের প্রতি। দেশী কুকুরকেও যে তিনি কত ভালবাস্‌তেন তার পরিচয় পাওয়া যায় ঢাকা চারুবাবুর বাসায় তাঁর বাসকালে। সেখানকার একটী দেশী কুকুরের প্রতি তাঁর যত্ন দেখে একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে ঐ কুকুরটার প্রতি তাঁর এত পক্ষপাতিত্ব কেন? তাহাতে তিনি উত্তর করেন, "ওকে ত তোমরা কেউ দেখনা—ওর প্রতি তোমাদের অযত্ন আর অবহেলা আছে বলেই আমি ওকে ভালোবাসি।" পথের ধারের দেশী কুকুরের প্রতি তা'র এরূপ মায়ার আরও পরিচয় পাওয়া যায় যখন তিনি ঢাকায় মোটর ড্রাইভারকে বলে দেন, "দেখ, যদি রাস্তায় কুকুর চাপা দাও তো আমি গাড়ী থেকে নেমে যাব—সাবধানে চালিয়ো কিন্তু। কোলকাতায় আমার ড্রাইভারকে আমি ব'লে দিয়েছি সে যদি কোন কুকুর চাপা দেয় তো তার চাকুরী যাবে।"

শরৎ চন্দ্র যে একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন তা'তে আর সন্দেহ নাই। শেষ বয়সে তিনি রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানও করেছিলেন। দেশের ও সমাজের যেখানে অভাব ছিল, কুসংস্কার ছিল, মিথ্যা ধারণা ছিল, শরৎচন্দ্রের লেখনী বরাবর তাকেই রূপ দিয়েছে। অপূর্ব্ব, ভারতী ও সব্যসাচীর মুখ দিয়ে তিনি এমন কথাগুলো বার করিয়ে নিয়েছেন যা পাঠ করলে মানুষের নিজের অজ্ঞাতসারেই জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হয়—আপনাকে, দেশকে, জাতিকে এবং সমাজকে সে ভালবাস্‌তে শেখে। এই ভাবেই একদিন জাতীয় জাগরণ সম্ভব হয়। দেশের প্রতি খাঁটি ভালবাসা না থাকলে দেশবাসীর অন্তরের পুঞ্জীভূত প্রচ্ছন্ন বেদনাকে তেমন দরদ দিয়ে রূপ দিতে পারেন কে?

———

পাঁচটা থেকে ছ'টা

বীণাপাণি রায়

বেশ, তবে তুমি বলো,—বলে সে ক্ষান্ত হোল; কিন্তু কোন জবাব এলো না।

বলি তুমি কি কানের মাথা খেয়েছো যে আমার কথা শুনচো না? কী চুপ করে আছ যে? পঞ্চান্ন বছরের বুড়ো ধাড়ি, এক গুঁয়ে ছেলের মত অভিমান করে বসে আছেন! ভগবান! আমাকে কার সংসারেই না এনে ফেলেছ!

হায়, সংসারই বটে, যেখানে কেউ কারু সঙ্গে কথা বলে না, শুধু গুমরনো অভিমান। হৃদয়হীনতা ও আতঙ্কে আরো কণ্টকিত। জড়পিণ্ডের মতো ওখানে এমন করে কেনো সে বসে আছে? এ কী নেশার ফল না অসুখ, না কোন কিছুই নয়, তবে কি?

মহিলাটী চীৎকার করে বললো, দোহাই ভগবানের, কথা কও। বিকেল পাঁচটা হতে এখানে বসে আছো, এখন ছয়টা বাজতে চললো; চা খাবে না? সব ঠিক, এখন দয়া করে উঠে এসো। মহিলাটী বৃদ্ধের দিকে আবার ঝুঁকে বললো। ক্রোধে মুখমণ্ডল স্ফীত ও প্রদীপ্ত, কিন্তু লোকটী একেবারে নির্বাক। সে আবার তার মুখের উপর চেঁচিয়ে বললো। তুমি কি ক্ষেপেছো? কিন্তু কোন জবাব এলো না, তার বড় হাতখানা পকেটে ঢুকালো ও রুমাল বের করে মুখ হতে ঘাম মুছে নিলো। তার বিরাট দেহ ওভারকোট উপচিয়ে পড়ছিলো, হাত দুখানা হাঁটুর উপর ন্যস্ত, দৃষ্টি চুল্লীর দিকে নিবদ্ধ।

স্ত্রীলোকটী আগ্নেয় গিরির ন্যায় ওখানে দাঁড়িয়ে স্বামীর উপর গায়ের ঝাল মিটালো, প্রত্যুত্তরে কিছু জবাব পাবে এরূপ আশাও ছিলো।

এ সব বাজে বকুনি রেখে একটু ওঠো, দেখো তোমার বাবার কি হয়েছে? আমি তো কিছুই বুঝছি না, ঘরে ঢুকে সে তার ছেলেকে বললো।

শক্তি, মহাশক্তি! এ বিরাট শক্তি দিয়েই বা মহিলাটী কী করবে? সেত মরন্ত আগুন। তার এর প্রয়োজনই বা কত! প্রতিদিনের শক্তি, জীবনের সামর্থ্য, কোন কিছুর আজ প্রয়োজন নেই। এসব এখন আর সহ্য হয় না।

এ নিছক ভণ্ডামি। যে ভোরে কাজে যাওয়ার সময়ও দিব্যি ভালো ছিলো এখন তার অসুখ করেছে? হায় পোড়া অদৃষ্ট! তোমার ঘ্যানর ঘ্যানর এখন থামাও। চীৎকার শুনে তার ছেলে বেরিয়ে এলো, আবার দেরাজের নিকট গেলো এবং বই খাতা কলম নিয়ে লিখতে সুরু করলো।

মার দিকে না তাকিয়ে শুষ্কভাবে বললো ক্ল্যারা এখনো বাড়ী ফেরেনি?

না, সে কি আর এত সকালে ফেরে, অবশ্য অজুহাত তার তৈরী থাকে।

আমি কিন্তু ওকথা বলছি না।

কথায় বেশ একটু শ্লেষ দিয়ে মা বললো, তুমি আবার পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছো না কি? আহা মরি!

হ্যাঁ তাই বটে, কিন্তু আমি অন্য কথা বলছি।

তোমার বাবার কি হয়েছে? তাকেই বরং একথা জিজ্ঞেস করো না?

এ রকম মেজাজ দেখিও না, বলে মা শলার মত আঙ্গুল দিয়ে টেবিল ঘাটতে সুরু করল। টেবিলের একদিকটা তার বইয়ের স্তূপে ঢাকা, বাকী অংশে খাওয়ার জন্য কাপড় পাতা হয়েছে। মা ও ছেলে পরস্পরের খুব কাছে দাঁড়িয়ে, কিন্তু তাদের মধ্যে কত দুস্তর ব্যবধান!

ক্ল্যারার কথা বলছো কেনো? আরেকটা যে অকেজো গণ্ডমূর্খ আছে সে কোথায়? আহা সে কাজ পায় না শুনলে হাসি আসে। তাকে কাজ পেতেই হবে, সে জন্য তার শরীর থাকে কি যায়। আমার মত তাকে খুঁজে কোথা হতে কাজ বের করতে হবে। সে তো অলস নয়। আরেক কথা, ঠিক মনে আসছে না, আমার উপর পড়ে থাকার অবশ্য তার কারণ আছে। তুমি সত্য সত্যই পরীক্ষায় পাশ করতে চাও? বিনা টাকায় তো ওখানেও চলবে না। তিনটী গিনি দক্ষিণা, তবে তোমার কৃতিত্বের পুরষ্কার। পরীক্ষকদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করো তবে তো! বোকার মত কোরো না, আমি খুব চালাক নই তবে আমার সব দিকেই চোখ আছে। আট ছেলের মা শুধু এমনি এমনি হওয়া যায় না। এ পঙ্গপালকে আতুর ঘরেই চিতার কাঠি ছোঁয়াইনি সেই-ই বেশী।

অনেক হয়েছে, আর নয়, আমাকে পড়াশুনা করতে হবে। এখন যাও মা।

বড় কথা শিখেছ, না? নয়া ইস্কুলমাষ্টার, তারই এতো চাল? বলে মা কাষ্ঠহাসি হাসলেন।

একথা বলে বার বার আমাকে বিরক্ত করো না, আমি তোমাকে বহুদিন বলে আসছি; এ স্কুলমাষ্টারী আমি অত্যন্ত ঘৃণা করি। পঞ্চাশটী ভেড়া মানুষ করা। প্রতিদিন আটঘণ্টা খেটে বাড়ী

এসে আবার এদের খাতা পত্র ঘাটা, তার উপর আবার নিজের ডিগ্রির জন্য পড়াশুনা ইত্যাদির পর কিনা ভাগ্যে জোটে সপ্তাহে তিন শিলিং। এর উপর অপমান! শিক্ষা সমিতির সাহায্য লওয়ায় সুদের চাপ ইত্যাদি বলতে বলতে ক্রমেই সে উত্তেজিত হয়ে উঠছিলো।

মাষ্টার মশাই, এখন থামো।

এদিকে কান দেওয়ার মতো তার মনের অবস্থা ছিল না, চেঁচিয়ে হাত নেড়ে সে বলতে সুরু করলো, এর উপর আবার ক্ল্যারা হোয়েছে ঘরের জঞ্জাল, আমার আর এখানে সহ্য হচ্ছে না। এগুলিই ত সব নয়। মা, আজকাল ক্ল্যারার চালচলন লক্ষ্য করছো? বলে হঠাৎ থেমে হা করে মার দিকে তাকিয়ে রইলো।

চালচলন! তা না হয় একটু দেখালো এ এমন দোষের বা কী? সে আমার নিকট যে সব গল্প করে এতো তারই প্রথম অধ্যায়।

এ ছাড়া তার বিরুদ্ধে আমার আর কিছু বলবার নেই। আমি এখন কাজ করবো মা।

সপ্তাহে আরো তিন শিলিং। এভাবে আরো তিনবছর কঠিন পরিশ্রম, বেশ তো। পরীক্ষকগণ মনে করেন আমরা সকলেই বেশ জ্ঞানী আর শুধু তারা ভাবী চালাক। এ ভাবতেও কেমন লাগে। তোমার ভাইটী আছে লাল ঝাণ্ডা নিয়ে। লোকে বলে লাল ঝাণ্ডা দেখিয়ে যখন যা খুসী আদায় করা যায়, অন্তত সপ্তাহে তিন শিলিংএর বেশী। আরে ওদিকে তাকিয়ে দেখো মকরমুখো বুড়ো কেমন বসে আছে, কথাটি নেই। বোধহয় এখনো ক্ষিধে পায়নি, ক্ষিধে না পেলে কারো মুখ খোলে না।

তাই নাকি? বাবা বোধ হয় ভাবছেন।

আঃ চুলোয় যাক ভাবনা, এ সব তার চালাকী। আমি এ বাড়িতেই তোমাদের সব মানুষ করেছি, এজন্য গাধার মতো খেটেছি, তোমরা এ সব জান, না বোঝ? ঐ পুরুষটীর হাতে পড়ার পূর্বে আমি সপ্তাহে আধা ক্রাউন পেতুম। তখন শ্রমিকের জন্য দরদ ছিল।

মা, আমি তোমাকে বলেছি না যে পড়তে চাই! এখন যাও। এ সব শুনতে আমার ঘৃণা হয়।

কী ঘৃণা? মা তেড়ে উঠলেন।

আহা না, না, তেমন কিছু মনে করে বলিনি। ঐ যে সে আসছে। কে?—বলে মা দরজার দিকে তাকালো। ঝাণ্ডাওয়ালা,—বলে সে বইয়ের উপর ঝুঁকে কলমের আচর কাটতে লাগলো।

দোর খুলে অন্য ছেলে ঘরে ঢুকলো। মাঝারি রকমের চেহারা, মুখ চোখ লাল, যেন সদ্য সদ্য দৌড়ে এসেছে; টুপীটা ছুঁড়ে টেবিলে রাখলো ও তারই এক কোনে বসে পড়লো। মা তাকে একেবারেই আমল দিলো না। ঘরের অন্যদিকে একটী পাত্রের উপর ঝুঁকে বললো, ঝাণ্ডা উড়িয়ে ক্ষিধে পেয়েছে, না? রান্নাঘর একেবারে নিঝুম।

আরেকটী নিশান উড়াও। একটি তোমার বাবার উপর উড়িয়ে দাও, ঐ যে ওখানে বসে আছেন, একজন একনিষ্ঠ করিৎ-কর্মা, আটত্রিশ বৎসর তিনি মিঃ শিয়ারের জন্য গতর খাটিয়েছেন, মুখে টু

শব্দটী না করে; একজন বোম ভোলানাথ! এখন চুপ করে বসে আছেন। কোন অসুখ করেছে নাকি, আমার তো তা মনে হয় না। সব চালাকী। আজকালকার ফিকিরফন্দিই এরূপ! একটু দেখলেই সব বোঝা যায়। পণ্ডিত লোকেরা সব গভীর জলের মাছ।

মা কড়াইয়ে হাতা চালাতে লাগলো। ছোট ভাই সবে মাত্র ঘরে ঢুকেছে, কাজেই একটা চেয়ার টেনে টেবিলের ধারে ভাইয়ের নিকট বসে গল্প করার চেষ্টা করলো। মা তাদের দেখছিলো।

বাবার কোন অসুখ করেছে মনে করে ছেলে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, তোমার কি হোয়েছে বাবা?

চেয়ারে উপবিষ্ট বৃদ্ধ তার ছেলের দিকে তাকালো। তার মুখ কাঠের মত কঠিন প্রাণলেশহীন, ঠোঁট ঝুলে পড়েছে, মুখ ও পেশী স্ফীত।

তোমার কি হয়েছে বাবা?

মা বলে উঠলো তিনি মেজাজ চড়িয়ে আছেন, এ-ই তার অসুখ।

তালায় চাবি লাগানোর শব্দ শোনা গেলো। ঐ যে আমাদের রূপককুমারী ফিরেছেন—বলে মা দুটি প্লেটে কিছু ষ্টু ও টি-পটে চা দিয়ে দরজার ধারে গেলেন। মা ও মেয়ে খুব কাছে এলেও কোন কথা হোলো না।

মা উপরে শোবার ঘরে চলে গেলো, মেয়ে কোট খুলে দরজার কাছে রেখে ধীরে ধীরে রান্না ঘরে গিয়ে বসলো।

স্কুলমাষ্টার চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলো, ও ছাই খাবার দিয়ে তুমি কি করলে?

ধর, খেয়ে ফেলেছি—বলে তাড়াতাড়ি চা খেতে সুরু করলো।

দিদি বাবাকে দেখেছো, বলে ছোট ভাই চুল্লীর দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালো। একটু নড়ে চেয়ে দেখাও মেয়ে প্রয়োজন মনে করলো না।

যা চিরদিন দেখে আসছি তা আর নতুন করে দেখার কি আছে?—বলে সে খেতে লাগলো; কিন্তু পরক্ষণেই হাত নেড়ে বললো, বাবার হোয়েছে কি? সে অস্থিরভাবে খাচ্ছে। দুভাই তা দেখছিলো। ছোট ভাই বললো বাবা যে কী অদ্ভুতভাবে গুম ধরে আছে। মা, আমি, জেরী সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করছি এ প্রশ্ন আমাদের পক্ষে খুব স্বাভাবিক। শতহোলেও তো আমাদের বাবা। আজ ত্রিশ বছর যাবৎ প্রতিদিন ভোরে বাবা কাজে চলে যান, হাসি মুখে প্রফুল্লচিত্তে বিকেলে বাড়ী ফিরে আসেন। আজ তিনি যেনো মামির মতো ওখানে বসে আছেন চুপটী করে, কথা বলার ঠিক চেষ্টা আছে। বিনা কারণে মানুষ এমন ডাঙ্গার মাছের মতো হতে পারে না। আমাদের কথা ঠিক শুনছে। বাবার এ অবস্থাতে দুঃখ হয়। পাকঘর হতে চীৎকার করে সে বললো, বাবা, বাবা তুমি কি আমরা যা বলছি শুনছো?

বোনটী তার খাওয়ার প্লেট এদিকে ওদিকে টেনে রুটীর খোসা দিয়ে তার উপর গোলরেখা

টানছিলো। সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গুলের দাগ কেটে আপন চাঞ্চল্যের পরিচয় দিচ্ছিলো। তারপরে প্লেটটী উঠিয়ে রুটীর খোসাগুলি রান্নাঘরের বাইরে ছুড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

মা ঘরে ঢুকে জানালার ধারে একটী চেয়ার টেনে বসলো, হঠাৎ মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললো উপরের ঘর হতে জানালা দিয়ে আমি সব.........................

মেয়ে বললো এতো তুমি সব সময় করো, নিশ্চয়ই কোন ভালো জিনিষ দেখেছো ?

হ্যাঁ সিগনেল ঘর হতে সেই হতচ্ছাড়া ডেভেনেকে দেখেছি, বাবা, কি অদ্ভুত জীব ! সে বোধহয় তোমার প্রতীক্ষায় । মুখে বেশ হাসিটী লেগে আছে, দেখলেই চাপকাতে ইচ্ছে করে।

বড় ছেলে বললো আমার পড়াশুনা করতে হবে, দয়া করে তোমরা একটু থাম। কী আশ্চর্য এক বেলার জন্য তোমরা চুপ করতে পারো না, আমার আর সহ্য হয় না, আর কত ? প্রফেসরদা, বাড়ীটা নেহাৎ ছোট, তাই এমন হচ্ছে।

হ্যাঁ লালঝাণ্ডা আরো কিছুদিন উড়াও তাহোলেই গোষ্ঠী শুদ্ধ সবাইর বড় বাড়ীতে যাওয়া যাবে,—বলে বোন টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লো।

ঠিক বলেছ, এরূপ হোলে, তোমার কপালের জোরই বলতে হবে, বুঝেছ দিদি।

প্রতিদিন সাতটা হতে ছয়টা পর্যন্ত আমার খাটতে হয়, নিশান উড়াবো কখন ? বিকেলে বাড়ী ফিরে দেখি প্রফেসার মশায় তার একই জায়গায় মুখ চোখ টেনে বসে আছেন, মা তার অতীত জীবন সম্বন্ধে ভাবছেন। ফ্যাক্টরী ছাড়বার সময় দেখলুম দু একজন লোক তোমার দিকে কেমন করে তাকাচ্ছে। তুমি অমনি ধরে নিলে সকালে ফোরম্যান ধর্মঘট করাবে। আচ্ছা বলছি, তোমার ডাক কবে পড়বে ? আমি আসার সময় দেখলুম পোষাকবিক্রেতার দোকানে আর এক হতভাগা ঘুড়ে বেড়াচ্ছে, কিসের জন্য তা অবশ্যই তুমিই জান।

মা আর চুপ করে থাকতে পারলো না, মেয়েকে বললো, তুমি কি আজ বেরুবে ?

না, শুতে চলছি, বিছানায় একেবারে মরার মত পড়ে থাকবো। আর কোন কথা নেই,—এ বলে মেয়ে উঠে গেলো। খাবার ঘরে আবার থম্‌থমে্‌ নীরবতা। শুধু তার উপরে ওঠার শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিলো।

মা মাথা বুকের দিকে ঝুকে বসে আছে। ছোট ছেলে খাচ্ছে। বড়টী জোরে জোরে পড়তে সুরু করলো।

টিউডরদের আমলে............

ছোট ভাই বাধা দিয়ে বললো, দোহাই দাদা বেচারী টিউডরদের আর জ্বালিও না ; সারাদিন কাজের জন্য ঘুরতে হোয়েছে, প্রশ্নের পর প্রশ্ন, সাক্ষীর কাঠগড়া বা ডিগ্রীর জন্য ও এতো প্রশ্নের জবাব দিতে হয় না। ফল কী ? অকর্মণ্যের সামান্য বেতন নিয়ে চাকুরীতে ঢোকা, কিন্তু তাতেও স্বস্তি নেই। অন্য ব্যবস্থা হলেই কাজ ছাড়তে হবে।

মা বললো তবু মন্দের ভালো, অন্তত একজনের চাল আর হাঁড়িতে ছাড়তে হবে না।

তোমার দাদাটী তো মাথা খুঁড়ে মরছে শিক্ষা বিভাগ হতে ধারের টাকা কি করে আদায় করবে। তোমার তো ও সব বালাই নেই, পেটের দায়ে যত সব উদ্ভট কাজ করছো, হায় পোড়া পেট, কাজ পাও না কিন্তু তোমার ঝাণ্ডাটী বেশ ঠিক আছে। আজকাল তো সবারই এ ব্যবসা, সব ভেড়ার দল, অর্ধেকই না বুঝে লাফালাফি কোরছে।

হ্যাঁ, এজন্যই যত ভয়,—বলে বড় ছেলে ইতিহাসের বই রেখে গা মোড়ামুড়ি দিয়ে হাই তুললো। নেহাৎ অনাসক্তভাবে বললো বাবা কি তবে চা খাবেন না ?

এ হোলেই তো ভালোই হয়, আমরাও যেতে পারি, তুমি তাকে জিজ্ঞেস করতে পারো না ? আধ ঘণ্টা যাবৎ ওখানে চুপ করে বসে আছে। তার অসুখ বিসুখও হতে পারে,—না হয় নাই হোলো, তিনি খাবেন না, মুখে সাঁড়াশি লাগালেও কোন কথা বেরুবে না, তোমরা ওকে জান না, আমি হাড়ে হাড়ে চিনি। সবাই ত আছ যার যা কাজ নিয়ে, কারো বা পরীক্ষা, কারো বা ঝাণ্ডা। উপরে যিনি আছেন তার ত কোন চৈতন্য নেই। কবে ঝাঁটা খেয়ে বেরুতে হবে। স্বার্থপরতায় তোমরা শয়তানকে হার মানিয়েছ, মুখে তোমাদের সোহাগ উপছে পড়ে। আহা বাবার কি হয়েছে, আদরের নমুনা দেখ, কেউ খবর নিয়েছ লোকটী কেন এমন করে গুম মেরে বসে আছে। কেরিগানস্‌এ যাওয়ার সময় শক্ত কলার পরে যেতে বলছিলুম, এইতো আমার অপরাধ।

ছোট ছেলে বললো মা চল একবার এ সব বিষয় পরিষ্কার করা যাক। আজ অনেকদিন যাবত তোমার অভিযোগ চলছে, একবার সব তলিয়ে দেখা যাক।

মা একটী শুষ্ক কাষ্ঠ হাসি হেসে হঠাৎ নাটকীয়ভাবে উঠে দাঁড়ালো ও হাত নেড়ে বলতে লাগলো,—আমার দুঃখ কি ? তবে শোন তোমাদের বাবার গুমটে স্বভাব, জেরীর পাকঘরে পরীক্ষার পড়া তৈরী করতে হয়, আমাদের কপালে কি আছে সে বোঝে, কারণ তোমাদের চেয়ে তার ঘটে কিছু বেশী বুদ্ধি, সে বিয়ে করতে পারে না, কখনো পারবে বলে মনে হয় না, ছেলে তাড়িয়ে খেয়ে দেয়েই তার জীবন যাবে। তুমি কাজ পাও না কিন্তু বিশ্ব সংসার চষে বেড়াচ্ছ, এ কাজ তোমার মত লক্ষ্মীছাড়ারই উপযুক্ত। হলুদের মত আবার সব কিছুতেই আছো। তোমার বাবা একটী গণ্ডমূর্খ মাথায় ঘিলু বলে কোন পদার্থ নেই। কাল কি দুচার রোজ আগে তাকে জিজ্ঞাসা কোরছিলুম—ওগো ভবিষ্যতের কি ব্যবস্থা কোরছো ? প্রথমে এক চোট হেসে নিয়ে বললো, আমি সেজন্য দায়ী নই। 'কেন' প্রশ্ন করায় বললো মিঃ শিয়ার্সের এর নিকট সব বন্ধক। আহা যেনো দয়ার অবতার মিঃ শিয়ার্স। ক্ল্যারা, সে উচ্ছ্বাস প্রবণ। রাবার কারখানায় দাগা খেয়েও তার রঙীন নেশা কাটেনি। আশা কত ! এগুলির ভিতর আমার অভিযোগ কোনটী বলো ; একটীও না। এমন কপাল নিয়ে এসেছি যে কোন কিছু বলতে পারবো না। সংসারই বটে। নিজের ইচ্ছায় গাধার মত খাটছি, তোমরা যা চাও তা পেলেই খুসী, এতে আমি চুলোয় যাই কি থাকি !

রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ মহিলাটী থেমে গেলো। তার স্বামী তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে ঝোলান থলিতে পেন্সিল খুঁজছে, হাতে একটুকরো কাগজ। পেন্সিল নিয়ে বসে ধীরে ধীরে

লিখতে শুরু করলো। সবাই অবাক হয়ে ওদিকে তাকিয়ে আছে—কি করছে দেখতে; বড় ছেলে আবার ইতিহাসের বই খুলে কলম নিয়ে লিখতে সুরু করলো।

মা চেঁচিয়ে বললো। তোমরাতো চোখের মাথা খেয়ে বসোনি, দেখছো না তোমাদের বাবা যে একবারে কবি হতে চলেছে।

আমি গিয়ে দেখে আসি, বাবা কী লিখছে—ঠিক ভীমরতীতে ধরেছে, বলে ছোট ছেলে উঠলো।

মুখে যা আসে তাই বলো না, বিনা কারণে মানুষ এমন করে না,—মা উত্তর দিলো।

দোহাই ভগবানের তোমরা চুপ করো আর পারছি না, এ দক্ষযজ্ঞের মধ্যে কার সাধ্য পরীক্ষায় পড়া করে, শুধু পরীক্ষা হোলে হোত, তার উপর আবার পঞ্চাশটী ছেলের জন্য আগামী দিনের বাড়ীরপড়া বেছে রাখতে হবে। স্কুলের গোলমাল ছেড়েই দিলুম, এর উপর যদি বাড়ীতেই মাথা গোঁজবার জায়গা না থাকে, তবে সহ্য করা যায় কত। দেখবে কোনদিন আমি একটা কী করে বসি, হায়, স্থান সমস্যাই দেখছি সব চেয়ে বড় সমস্যা। আমরা অত্যন্ত ঘেঁষাঘেঁষি করে আছি। পরস্পরের সান্নিধ্য যেন পরস্পরকে ক্রুশের মতো বিদ্ধ করছে, সব সময়ই ভাবছি এ সব অদ্ভুত জগাখিচুড়ী কেন হোলো! এর চেয়ে নরক অনেক ভালো। তোমরা বেরুতে হোলে এখনই যাও, মানুষের বিরুদ্ধে মনের ঝাল যদি কিছুটা আজ রাত্রে না মিটিয়ে এসো, তার অন্তর্দাহ ভোগ করতে হবে। তোমরা ডোবার জলের মত অচল।

হিংসা বিদ্বেষের উৎপত্তিই ওখানে। বুঝেছ, আমার আর সহ্য হয় না।

প্রফেসরদা, আমি তোমার কাজের জন্য দশ বছর দিতে রাজী আছি আর বকো না বলে ছোট ভাই তার বাবার নিকটে গেলো।

বৃদ্ধ তখন পেন্সিল হাতে নিয়ে কাগজটী শক্ত করে ধরে আছে। ছেলে তার উপরে ঝুকে পড়ে বলছে, বাবা শোন, অসুখের ভান করে এমন পাগলামী করছো কেন? এতোদিন যেমন খেয়ে দেয়ে আসছ আজও তেমন করো না। আমরা এখনো তোমাকে বাবার মত ভক্তি করি, এক মুহূর্তের জন্য ভুলি না তুমি আমাদের জন্য আজীবন কত পরিশ্রম করেছ। এজন্য বাস্তবিকই আমরা তোমাকে সম্মানের চোখে দেখি।

কথা, না যজ্ঞের চণ্ডীপাঠ বলে মা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠলো।

হ্যাঁ আটত্রিশ পৃষ্ঠার চণ্ডী, অবজ্ঞার প্রাচীরে ঘেরা। এ প্রাচীর লোহা বা পাথরের চেয়ে শক্ত, শুধু প্রয়োজনের খাতিরে এ ভাঙ্গবে না। হৃদয়ের পরশ চাই।

আর সহ্য হয় না, তোমার বাবা উঠেছে, কি যেনো বলবে, দরদী ছেলেরা এখন উঠছে না যে। এ সব ন্যাকামি অনেক দেখেছি।

বড় ছেলে বই খাতা পেন্সিল নিলো কিন্তু পরক্ষণেই বইপত্র বাক্সে রেখে কোট পরে বেরিয়ে গেলো। পিছনে দরজা বন্ধ করার শব্দ হলো। প্রচণ্ড শব্দ ধীরে ধীরে অর্থ ও সঙ্গতিতে পরিমূর্ত্ত হয়ে উঠলো। ও যেন সবার উপরে টেক্কা দিয়ে গেলো।

আমাদের সর্বনাশ, মা শীগ্‌গীর এসো, ছ্যাখো বাবা কী লিখছে। তার নিশ্চয়ই মাথা বিগড়ে গেছে।

ছোট ছেলে স্থুল হাঁটুর উপর এলানো হাতে কাগজের টুকরাটা তুলে নিলো। বৃদ্ধের হাত আজ বিবশ, বিস্রস্ত ও কর্মপঙ্গু।

'আমার মতো সাদাসিধে লোককে এরা আজ বড় অপমান করেছে।'

ছেলে চেঁচিয়ে উঠলো, সে ভালোই হয়েছে। শুনছো, বাবার মতো নিরীহ লোক, তারো অন্তের অপমান গায়ে লাগে।

অপমান! মা বলে উঠলো, তার সে বোধ আছে? আমার কাছে শোন, অপমানটা হোল বোকাদের চালাকি ফলাবার ব্রহ্মাস্ত্র। অপমান, এ হতে পারে না, সম্পূর্ণ ভুল; যদি হোয়ে থাকে তো অপমান আমারই হোয়েছে। শুনছো, অপমান হোয়েছে আমার। আমি সব বুঝি, আমার কাছে ফাঁকি চলে না। চল্লিশ বছর সপ্তাহে দুটাকা বেতনে খেটেছি, এক কপর্দকও বেশী হোল না। ঠিকই বলেছো, তোমার বাবা একটী উইয়ের ঢিপি,--একবারে ভীমরতীতে পেয়েছে। আবার বলছে কিনা অপমান! স্বামীর মুখের উপর গিয়ে চেঁচিয়ে বললো, অপমান, মিঃ শিয়ারের বিশ্বস্ত কর্মচারীকে অপমান করে এমন সাধ্য কার? ধা করে ছেলের দিকে ঘুরে বললো—এখন তোমার পালা, খুব ঝাণ্ডা নাড়, নূতন কিনে যত খুসী মাথার উপর উড়াও। সাদা সূতোয় লিখে দাও—'অপমান'। আমি এর অর্থ বুঝি ও চুপ করে কখন থাকতে হয় তাও জানি। তোমাদের মতো চালাক না হোলেও আমার অজানা কিছুই নেই। শাণয়ে তোলা বুদ্ধি, আমায় ঠকাতে পারবে না। মিট মিট করে চাওয়া, বড়মানুষী চাল, শুষ্ক হাসি, স্মিত মুখ—এ সব ফন্দি। অপমানের কথা বলছো, নিজেতো আমাকে কম অপমান করে নি। স্বামীর হাঁটুতে হাত ঠুকে বললো—তোমার অনাদর, তোমার মৌনতা দিয়ে কি আমাকে কম অপমান করেছো? তার জবাব কোন্ দিন দেবে? আমি সব ভুলতে পারি, এমন কি আমাদের সঙ্কট-সঙ্কুল ভবিষ্যৎ কিন্তু অপমান পারি না। কোনদিন লোকে বলে বেড়াবে—আমরা সোজা পাত্র নই। এখন একজন কর্মঠ, দরদী স্বামী সেজে বসে আছো। লোকের উপর, যীশুর উপর কতই না বিশ্বাস! এখন এরা কোথায়? নিরেট গাধা কোথাকার। তুমি সারা জীবন আমাকে পিষে মেরেছ; আজ আমি ডুবতে বসেছি, চারিদিকে সব হিংস্র জন্তু। একটী এখানেই, আরেকটী উপরে, অন্যটী বেরিয়ে গেলো। বড় মন, বিতৃষ্ণায় ভরা, কারণ অন্য লোক তার চেয়ে চালাক এবং রাস্তার ২০০ নং বাড়ীতে আমাদের ঠেসে দিয়েছে পরস্পরের সঙ্গে কুকুরের মত কামড়া কামড়ি করতে।

ধপ করে চেয়ারে বসে কেঁদে উঠলো। ছোট ছেলে কাগজটী জড়িয়ে আগুনে ফেলে দিল। দরজায় ধাক্কা শুনে বললে,—কে? উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলো।

ডাক্তারবাবু যে, কে ডেকে পাঠিয়েছে? ও ক্ল্যারা বুঝি? মা, ডাকতো তাকে নীচে।

মা আঁচলে চোখ মুছে নিলো।

লম্বা, স্থূলাকৃতি, ফিটফাট্ এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলো, মুখে স্মিত হাসি।

মেয়ে নীচে নেমে এলো।

ছেলে বললো, ডাক্তারবাবু দয়া করে এখানে আমার একটু কথা শুনুন। অবশ্য বলবার মতো তেমন কিছু নেই। বাবা কী জানি, কেমন করছে। পাঁচটার সময় বাড়ী ফিরেই চুপ করে চেয়ারে বসে আছে। পৌনে ছয়টা হতে চলেছে এখন। এ এক অদ্ভুত। আমাদের প্রথম মনে হচ্ছিলো, তার মেজাজ চড়েছে কিন্তু তাও তো না। খেতে পর্যন্ত চায় না। মাথা বিগড়িয়েছে বা অন্য কিছু হোয়েছে।

ডাক্তার যেন কিছুই শোনেনি ভাবে জিজ্ঞোসা করলো, মিঃ চালি বার্নস্ এখনো চাকুরীতে আছেন?

ছেলে জবাব দিলো, এখন নেই।

ডাক্তার মুখ ফিরিয়ে বুড়োর নিকট গেলো এবং সবাইকে কয়েক মিনিটের জন্য রান্নাঘর ছেড়ে যেতে বললো। সব চলে গেলে দরজা বন্ধ করলো।

ব্যবসাসুলভ সৌজন্য দেখিয়ে ডাক্তার বললো, মিঃ বার্নস, ব্যাপারখানা কি বলতো?

চেয়ারে উপবিষ্ট বৃদ্ধ ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট ফাঁক করার চেষ্টা করল। ক্ষীণ আওয়াজ শোনা গেলো।

যা মনে করছি তাই বলে ডাক্তার রোগীর হাত ও মুখে টোকা দিয়ে দেখতে লাগলো।

লোকটী নিষ্পলকে তার দিকে তাকিয়ে আছে। 'আপনারা এখন আসতে পারেন' সবাই আবার ঘরে ঢুকলো।

আপনার স্বামী কি কখনো মানসিক আঘাত পেয়েছেন?

গিন্নি শুধু মাথা নাড়লো।

নিশ্চয়ই পেয়েছেন। তা না হোলে এরূপ হোতে পারে না। আপনার স্বামী বোবা ও বধির হয়ে গিয়েছেন।

মহিলাটী পক্ষাঘাতের মতো, চেয়ারে বসে পড়লো।

আমি তাকে লিখে দিতে বললাম, তিনি এ কাগজে লিখে দিয়েছেন। দেখ, বলে ছেলের দিকে বাড়িয়ে দিলো।

আজ আমি অপমানিত হোয়েছি। মিঃ শিয়ার্শ বললেন আমার আর কাজ করতে হবে না। চল্লিশ বছর পরে আমাকে জবাব দিলেন। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। তাই জিজ্ঞেস করায় মিঃ শিয়ার্স বললেন চিরকালই তোমাকে আমার রাখতে হবে? আমার মুখে কোন কথা এলো না। বেতনের খামে শুধু লিখে দিলুম কিন্তু......'

গিন্নি বললো, এর উপর আর কি বলার আছে? কিছুই না!

জেমস্ হেন্‌লে লিখিত 'From Five till Six' গল্প হতে।

স্মৃতির ব্যথা

প্রফুল্লরঞ্জন দে

অতীতের স্মৃতি হারাইতে চাহি—
অজানা আঁধার গহনে ;
ভুলে যেতে চাই মরমের ব্যথা,
রয়েছে যেগুলো গোপনে।
ছুটে চলে যেতে চঞ্চল চরণে,
সহসা যেন কী স্বপনে,—
কাহার উজল মধুর স্মৃতিটী,
হৃদয়ের কোণে ধীরে ওঠে ফুটি,
রহিয়া রহিয়া অতীতের কথা—
জাগাইয়া দেয় এ মনে ,
নয়নে আমার শ্রাবণের ধারা,—
বহিছে প্রবল প্লাবনে।

বিস্মৃতি-বুকে চাহিনু হারাতে—
যে জন দিয়েছে ফাঁকি ;
চলে যাক্ দূরে, চিত্ত মুকুরে,
রাখিব না তারে আঁকি।
তবু কেন পথে চলিতে চলিতে,
তাহার পরশ লাগে ;
ভুলিব কেমনে যে স্মৃতি নয়নে,
রঙিন হইয়া জাগে।
অতীতের মাঝে হারাইতে চাহি,
পুরাণো স্মৃতির ব্যথা ;
তবু জাগে মনে ভুলিব কেমনে,
হৃদয়ে যে আছে গাঁথা ॥

সামন্ত ভারত

সুনীল দাস

বিশ্বের দুয়ারে ভারতের দ্বৈত পরিচয় কোন বিস্ময়ের উদ্রেক করে না। বৃটিশ রাষ্ট্রনীতির এমন অপরূপ অভিব্যক্তি সাম্রাজ্যের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে আছে। সাম্রাজ্যের তাগিদে পৃথিবীর ঘাটে ঘাটে বৃটিশ বণিক যে পসরা সাজিয়ে গেছে তারই সমারোহ কোথাও বা বিচ্ছেদের মধ্যে মিলন এনেছে কোথাও বা এনেছে মিলনে বিচ্ছেদ। কালের এই যাত্রায় ভারতবর্ষও বাদ পড়ে নাই। আজও ভারতবাসী 'ভারতবাসী' এই পরিচয়ের যোগ্যতা অর্জন করে নাই। ইতিহাসের নির্দেশে 'বৃটিশ ভারত' অথবা 'সামন্ত ভারত' এর তক্‌মা নিয়ে ভারতবাসী পরিচিত হোয়ে ফেরে—স্বদেশে এবং বিদেশে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাষ্ট্রকুশলতার যশ নিয়ে বিড়ম্বিত হয় নাই, কিন্তু শাসন বৈষম্যের রাজপথে বহিঃশক্তির বনিয়াদ পাকা হয়, রাষ্ট্রনীতির এই অ, আ, ক, খও তার অজানা ছিল না। ভারতীয় জাতীয়তা সেই আমল থেকেই লাঞ্ছিত, ভারতের দ্বৈত বিধানেরও সুরু সেই কালেই। ভারতবর্ষের এক-তৃতীয়াংশে আটকোটি ভারতবাসী অধ্যুষিত প্রায় ছয় শত দেশীয় রাজ্যে সামন্ত শাসনের অচলায়তন জাতির ঐক্যের পথ রোধ কোরে আছে—এ ঐতিহাসিক সত্য অপ্রিয় হলেও উপেক্ষণীয় নয়। বিগত পঞ্চাশ বছরের জাতীয় আন্দোলনে 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যালিজম' ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে জাতির রাষ্ট্রচেতনায়—রাষ্ট্রের বীক্ষণাগারে নয়, অধুনা বৃটিশ গভর্মেণ্ট পণ করেছে এই অসাধ্য সাধন করবে রাষ্ট্রের বীক্ষণাগারে। বৃটিশ পার্লা-মেণ্টের রসায়নাগারে এক অপূর্ব রসায়ন তৈরী হোয়েছে—১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ফেডারেশান বা যুক্তরাষ্ট্র। স্যার স্যামুয়েল হোর ও লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ডের যুগ্ম-আশীর্বাণী বহন করে শাসনতন্ত্রের নবরসায়ন সামন্ত ভারতের স্বৈর-শাসন ও বৃটিশ ভারতের স্বায়ত্ব শাসনের সমন্বয় ঘটাবে—সিমলার দপ্তর ও বিলাতের দপ্তর 'হোয়াইট হল' (White Hall) এই আশ্বাসবাণী গত দু'বছর ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত কোরে তুলেছে। তবুও, দেশে পুলকের বান ডাকে নাই—না 'বৃটিশ ভারতে' না 'সামন্ত ভারতে'।

পুরাতত্ত্বের আলোচনায় ইতিহাসের ক্রমপর্যায়ে সামন্ত ভারতের স্থান খুঁজে নিতে অসুবিধা হবে না। উনিশ শতকের প্রারম্ভে মারাঠা শক্তি আসন্ন নির্বাণের অপেক্ষায়, আর এদিকে কোম্পানীর বনিয়াদও পাকা হোয়ে ওঠে নাই। সেই কালে দেশীয় রাজ্য ও কোম্পানীর সম্পর্ক ছিল সমকক্ষতার ('on a more or less equal footing.')। পর পর বিভিন্ন নীতির আশ্রয় নিয়ে দেশীয় রাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার কোরতে কোম্পানীর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। কোম্পানীর অঙ্গনে লর্ড ওয়েলেস্‌লীর অগ্রসর নীতি (forword policy) বৃটিশ সীমানা বৃদ্ধি করে, আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ের অঙ্ক ও স্ফীত ক'রে তোলে। কর্ণওয়ালিস বৃটিশ নীতির কর্ণধার হোয়ে

নিরপেক্ষতা-ই (policy of isolation) নীতির সেরা ভেবে বৃটিশ অধিকার যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ করেন। অতঃপর লর্ড ডালহৌসী আসরে নেমে কালক্ষয় না কোরে আত্মসাৎ নীতিতে (policy of annexation)আস্থা স্থাপন করে ক্রমে ক্রমে অধিকৃত রাজ্যগুলিকে অসমমিত্রের (subsidiary ally) পর্যায়ে নিয়ে বৃটিশ শক্তির সম্পূর্ণ করায়ত্ত করে নিলেন। ["The fundamental policy in establishing subsidiary alliance is to place the states in such a degree of dependence on the British Power as may deprive them of the means of prosecuting any measure hazardous to the security of the British Empire."]

হৃত ক্ষমতা পুনঃ প্রাপ্তির আশায় সিপাহী বিদ্রোহের বিক্ষোভে যামন্ত শক্তি কোম্পানীকে অকাতরে সাহায্য কোরে ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইনে অনেক সুবিধা পেল এবং মহারাণীর ঘোষণায় রাজ্যের অভ্যন্তরে নৃপতির সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হয়। তারপর ক্ষমতার বাঁটোয়ারায় কেবলই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন চলেছে। কখন ও বা সার্বভৌম শক্তির (Paramount Power) সদিচ্ছার উপর নৃপতির অধিকার (rights) নির্ভর করেছে, এমন কি লর্ড কার্জনকেও বলতে শোনা গেছে "সার্বভৌম শক্তির ক্ষমতা অবাধ ও নিরঙ্কুশ"—(The sovereignty of the crown is everywhere unchallenged.") কার্যকালে হয়েছেও তাই। সিপাহী বিদ্রোহের কিছুকাল পরেই সার্বভৌম শক্তির ক্রমবর্ধমান হস্তক্ষেপ দেশীয় রাজ্যের যথাযথ অধিকার কায়েমী কোরে সাম্রাজ্যের বনিয়াদ পাকা করে। দেশীয় রাজ্যের ইতিহাসে সার্বভৌম শক্তির হস্তক্ষেপের দৃষ্টান্ত নিতান্ত কম নয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এরূপ একটি ঘটনা মণিপুরের বিদ্রোহ নামে খ্যাতি লাভ করেছে। বিদ্রোহী সর্দার টিকেন্দ্রজিতের বহিষ্করণ দাবী সার্বভৌম শক্তি জানালে, দরবার সে দাবী অগ্রাহ্য করায় আসামের চীফ কমিশনারের নেতৃত্বে মণিপুর অভিযানে চীফ কমিশনার কুইনটন নিহত হয়। মণিপুর যুদ্ধে টিকেন্দ্রজিৎ বন্দী ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। মণিপুরে সার্বভৌম শক্তি সার্বভৌমত্বের (Paramountcy) সুস্পষ্ট পরিচয় দেয়। স্যার উইলিয়াম-লী ওয়ারনার (Lee Warner) মণিপুরে অনুসৃত নীতির এই ব্যাখ্যাই দেন। এতো অনেকদিনের কথা, কয়েক বছর পূর্বে আলোয়ার ও নাভায় অনুরূপ নীতি অনুসৃত হোয়েছে।

সে যাই হোক, বৃটিশ ভারত বিশ্বের প্রগতির বার্তাগুলি যখন সাগ্রহে গ্রহণ করছিল সামন্ত ভারত মধ্যযুগের নিশ্চিন্ত আরামে সুপ্তির কোলে আশ্রয় নিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে এ এক অপূর্ব যোগাযোগ। যোগাযোগই বা কেন, সাম্রাজ্য দীর্ঘায়ু করবার পন্থা-ই তো এই। প্রগতিকামী বৃটিশ ভারত ও তমসাচ্ছন্ন সামন্ত ভারতের দৃঢ় গ্রন্থি ই সাম্রাজ্যের বৈজয়ন্তী।

সাম্রাজ্যবাদীর হিসাবেও ভুল হয়। উদ্বর্তনের আরোহে স্থাণুর ধর্ম অচল, সামন্ত ভারতের ক্ষেত্রেও তার নড়চড় নাই—এ সত্য সাম্রাজ্যবাদী খেয়ালে নেয় নাই। আন্দোলন ও আলোড়নের মহড়ায় বৃটিশ ভারতে মানুষের অধিকার স্বীকৃত হচ্ছিল ধাপে ধাপে, আর তারই

ওপাশে দেশীয় রাজ্যে সার্বভৌম শক্তি ও রাজন্যের ক্ষমতার বাঁটোয়ারায় প্রজার অধিকারের ঘরে কেবলই শূন্য জমে উঠছিল। শাসন বৈষম্য সত্ত্বেও বৃটিশ ভারত ও সামন্ত ভারত নানাপ্রকার বাণিজ্য চুক্তি ও অন্যান্য আর্থিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সান্নিধ্য পেয়েছে—আর্থিক স্বার্থের সহযোগিতায় দুস্তর ব্যবধান অস্পষ্ট হোয়ে উঠছিল। বর্ত্তমান শতকে বৃটিশ ভারতকে অনেকবার সংগ্রামের সম্মুখীন হোতে দেখেছে—প্রতিবারই বৃটিশ ভারতের প্রবুদ্ধ রাষ্ট্রচেতনা কিছু কিছু সঞ্চয় কোরে ফিরেছে। সামন্ত ভারতেও এ ঢেউ লেগেছে, বৃটিশ ভারতে জাতীয় আন্দোলনের বেনোজল প্রহরা এড়িয়ে সামন্ত ভারতের প্রাঙ্গণে হানা দিয়ে এসেছে। সাম্রাজ্যবাদ বৃটিশ ভারতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কবুল করেছে, দাবী অস্বীকার করবার উপায় ছিল না বলে—মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার, মণ্ট-ফোর্ড শাসন সংস্কার ও ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার কমবেশী তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু, সামন্ত ভারতে সার্বভৌম শক্তি (Paramount Power), Treaty Rights ইত্যাদি নাম্নায় প্রাচীরে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও রাষ্ট্রিয় অধিকারের মৌলিক দাবী আহত হোয়ে ফিরছিল। ভারতের এক অংশে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তরিত করার দায়িত্ব যাদের, আর এক অংশে অনুরূপ আয়োজনের দায়িত্ব ও তাদেরই—এ নিতান্ত সাদা কথা। বিখ্যাত রাষ্ট্রনীতি বিদরাও এই সাদা কথা তাঁদের আমবদ্য ভাষায় বলেছেন।

"The Paramount Power, having decided that it is proper that the people of British India should be encouraged to exercise political power, cannot logically maintain the view that the Indian states should deny their subjects the right to advance in political status. It seems clear, therefore, that the crown should endeavour by the use of its authority to secure the gradual extension of political rights to the people,"—Berreidale Keith.)

ভারতের জাতীয় সংহতি "ন্যাশনাল কংগ্রেস" সমগ্র ভারতের স্বাধীনতার শপথ নিয়েছে। স্বায়ত্ব শাসন ভারতবাসীর ন্যায্য অধিকার—সে সামন্ত ভারতের অধিবাসী হউক কিংবা ব্রিটিশ ভারতের অধিবাসী-ই হউক। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হোয়েছিল, ১৯৩৫ সালে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে তা পুনর্বার গৃহীত হয়—"কংগ্রেস পরিষ্কার করে বলতে চায় যে দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদের ভারতের অবশিষ্ট অংশের অধিবাসীদের ন্যায় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার আছে এবং ভারতের প্রতি প্রান্তে রাষ্ট্রের ও ব্যক্তির অনুরূপ স্বাধীনতা কংগ্রেসের উদ্দেশ্য। কিন্তু রাজ্যের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা সংগ্রাম চালনা করবে সেখানকার প্রজামণ্ডল।" ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের সুরক্ষিত দুর্গে কংগ্রেসের এই অভিযান নূতন না হোলেও সুস্পষ্ট তীব্রতায় প্রথম। ১৯২৩-২৪ সালে নাভার অন্তর্গত জাইতোতে সত্যাগ্রহী প্রেরণ করে কংগ্রেস সর্বপ্রথম

দেশীয় রাজ্যের আন্দোলনে যোগ দেয়। শিখ ধর্মগ্রন্থ 'অখণ্ড্ পাঠ' পঠন নিয়ে সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয় এবং আচার্য গিদ্ওয়ানী ও ডাঃ কিচলু প্রমুখ নেতারা তাতে যোগ দেন।

লক্ষ্ণৌ প্রস্তাবের পূর্বে এবং পরে বিভিন্ন রাজ্যে প্রজামণ্ডল স্বায়ত্ব শাসনের দাবী জানাতে সুরু করে। প্রজামণ্ডল কন্‌ফারেন্সে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রজাশক্তি সংহত হয়। ("The States People's Conference represents the doctrine of the common interests of the people of the states as against their rulers.") প্রজামণ্ডলের সংহতি সামন্ততন্ত্রের ভাবনার বাইরে,—স্বৈর শাসনের টনক নড়ে উঠ্‌লো। বিকানীর মহারাজা কন্‌ফারেন্স অবৈধ ও নিয়মতন্ত্র বহির্ভূত বলে মত দিলেন আর উপযাজক হোয়ে উপদেশ দিলেন—"তোমাদের বক্তব্যগুলি নিজ নিজ রাজার নিকট আবেদন কর।" প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রনীতিবিদ বেরিডেল কীথের মতে বিকানীরের আপত্তি অর্থহীন। ("...it is in vain that the Maharajah of Bikanir contends that the conference is in principle unconstitutional and illegal and that most of the people of each state may organize to make suggestions to the rulers.") প্রজা আন্দোলনে কোথাও কোথাও খুচ্‌রো এবং ভুয়ো শাসন সংস্কার করা হোয়েছিল। মহীশূর, কাশ্মীর, বরদা, ভুপাল, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে সাড়ম্বরে স্বায়ত্ব-শাসন অভিনীত হয়েছে—কোথাও রাজন্যের স্বৈরাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা নেই। ('In no case is there a state constitution which is binding on the rulers.')

৯৩৭ সালে কংগ্রেস শাসনতন্ত্র গ্রহণ কোরে ব্যক্তি স্বাধীনতার পরিধি বিস্তৃত করে। ফলে, অবদমিত উন্মুখতা বহুদিন পর মুক্তি পেয়ে সমগ্র দেশ প্লাবিত করে। সামন্ত ভারতেও ব্যক্তি স্বাধীনতা ও স্বায়ত্ব শাসনের আকাঙ্ক্ষা দুর্বার হোয়ে, কাশ্মীর হোতে ত্রিবাঙ্কুর, রাজকোট হোতে ত্রিপুরা পর্যন্ত ভারতের প্রতিটি রাজ্যে, এক বিরাট গণ-আন্দোলনে রূপ নেয়। ইতিমধ্যে হরিপুরা কংগ্রেসে দেশীয় রাজ্য সম্পর্কে নূতন নীতি গৃহীত হয়েছে। লক্ষ্ণৌ-এ সংগ্রামের বরাদ্দ ছিল প্রজামণ্ডলের উপর, হরিপুরায় কংগ্রেস-ই সে ভার নেয়। পণ্ডিত জওহরলালের ভাষায়—'নিরপেক্ষতার কথা অবান্তর'। ('There was no question of non-intervention.') "কংগ্রেসের গতিবিধি অবাধ এবং অপ্রতিহত।...ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে চেয়ে যে কোন ব্যাপারে কংগ্রেসের হস্তক্ষেপ করা কর্তব্যও বটে, করার অধিকারও আছে।" ("...the Congress as representing the will of the Indian people recognised no bars which limit its freedom of activity in any matter pertaining to India and her people. It is its right and privilege and its duty to intervene in any such matter whenever the interests of India demanded it....") হরিপুরা নীতি দেশীয় রাজ্যে গণ-আন্দোলনের দীপ-বর্তিকা। কিন্তু হরিপুরার পরেও কংগ্রেস নেতৃত্ব নিরপেক্ষতার ঘোর কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে নাই। নেতৃত্বের চিন্তায় ছিল অস্বচ্ছতা ও অস্পষ্টতা, তাঁদের হাতে

দেশীয় রাজ্যের গণ-আন্দোলন স্থানীয় হোয়েই রইলো, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হোয়ে বিরাট সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে তার রূপান্তর ঘট্‌লো না। লুধিয়ানায় গত প্রজামণ্ডল কনফারেন্সে জওহরলালের অনুরূপ আহ্বান নেতৃত্বের মর্মে পৌঁছায় নাই। ("The time has come, therefore, for the integration of these various struggles in the states inter se. with the major struggle against British Imperialism.")

বিভিন্ন রাজ্যের আন্দোলন আলোচনা করলেই দেখা যাবে সংগ্রামের মাহেন্দ্রক্ষণ সত্যই উপস্থিত হোয়েছিল। কাশ্মীর ও আলোয়াড়ে কিষাণ বিদ্রোহ, মহীশূরের 'রাম রাজ্য' (গান্ধীজীর আখ্যা) ষ্টেট্‌ কংগ্রেসের সাফল্যে বিদুরাশ্বথম নামক গ্রামে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ—স্বৈরাচারের শেষ অধ্যায় ঘোষণা করছিল। ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান চুক্তি রফা সবই 'Scrap of paper'—এক টুকরো কাগজ বলে অগ্রাহ্য করে এসেছে। ফ্রান্সের সমায়তন ভারতের বৃহত্তম দেশীয় রাজ্য, হায়দারাবাদ সর্বাপেক্ষা অনগ্রসর। ব্যক্তি স্বাধীনতার নির্মম উপেক্ষায় ষ্টেট্‌ কংগ্রেস ও হিন্দু প্রতিষ্ঠান সত্যাগ্রহ আরম্ভ করতে বাধ্য হয়। সাম্প্রদায়িক লোকাপবাদের ভয়ে কংগ্রেস সত্যাগ্রহ থেকে সরে দাঁড়ায়। ছয় মাসের অধিককাল সত্যাগ্রহ করার পর সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখা হয়েছে—সম্প্রতি নিজাম সরকারের সাম্প্রদায়িক শাসন সংস্কার প্রবর্তনে। সংস্কার ছিটে কোঁটাও হয় নাই, ক্ষমতাও স্বস্থানে রয়েছে। দমননীতির ধারাগুলি ইতিমধ্যেই আর একবার সদরে হাঁক দিয়ে গেছে। জয়পুরে যমুনালাল বাজাজ আজও রাজ-অতিথি রামদুর্গে (কর্ণাটক) কিষাণদের বন্দীশালা আক্রমণ, কোলাপুরে প্রজাপরিষদ নিষিদ্ধ করা, কিষাণদলের লিম্বদীরাজ্য পরিত্যাগ করে ব্রিটিশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ, কাথিয়াবাড়, ভবনগর, ইন্দোর, কাচ, মনসা ও পাতিয়ালা—সর্বত্রই গণজাগরণ ও সংগ্রামের ইতিহাস।

উড়িষ্যার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করতে হয়। সম্প্রতি উড়িষ্যা প্রজামণ্ডল অনুসন্ধান কমিটি (States People Enquiry Committee) অত্যাচার ও পীড়নের ভয়াবহ কাহিনী গোচরে এনেছে। কমিটির রিপোর্টে দেখা যায় বিংশ শতাব্দীতেও উড়িষ্যায় দাসপ্রথা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। সেখানে এখনও বছরে একশ দিন রাজ্যের অথবা রাজকর্মচারীর প্রয়োজনে, বিনা বাক্যব্যয়ে যে কোন সময় চাষাকে বেগার খাটতে হয়। ফ্রান্সে প্রাক্‌বিপ্লব যুগে যে ব্যবস্থা কৃষককুলের জীবন দুর্বহ কোরে তুলেছিল, আজ দেড়শ বছর পরে উড়িষ্যায় সামন্ত অঞ্চলে সে অবস্থা Bourbons স্বৈরাচারের পরিণতি স্মরণ করিয়ে দেয়। আবহমানকাল অত্যাচারিত উড়িষ্যার দেশীয় প্রজা অপরিমেয় সহনশীলতার অপবাদ ঘুচিয়েছে—রাণপুরে পলিটিক্যাল এজেন্ট ব্যাজালগেটেকে হত্যা করে। ঢেনকানল ও তালচেরের প্রজারা দলে দলে পৈতৃক বাসভূমি ছেড়ে ব্রিটিশ ভারতে আশ্রয় নিয়েছে। এই অভিনব উপায়ে প্রায় পঁচিশ সহস্র প্রজা স্বেচ্ছায় প্রবাস গ্রহণ করেছে। অন্যান্য রাজ্যে যেখানে সার্বভৌম শক্তির অদৃশ্য ইঙ্গিত প্ররোচনা দিয়েছে দমনের, উড়িষ্যায় সেখানে Paramount Power স্বয়ং আসরে নেমেছে। উড়িষ্যার সহকারী পলিটিক্যাল

এজেণ্ট মেজর হেনেসী ও হরেকৃষ্ণ মহাতাবের মধ্যে রফা অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি সার্বভৌম শক্তি পালন করে নাই। ভারতবন্ধু এনড্রুস ও সার্বভৌম শক্তির নিকট আবেদন করে ব্যর্থকাম হয়েছেন।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পটে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনিশ্চিত অবস্থান ও সেই একই সময়ে ভারতে সাম্রাজ্যের সুরক্ষিত দুর্গে শত্রুর ব্যূহ রচনা, সাম্রাজ্যবাদীর নিকট সুসংবাদ নয়। তাই, সার্বভৌম শক্তি কালক্ষয় না কোরে প্রজা আন্দোলন দমনে স্বৈরশাসনের অকুণ্ঠ সহায়তা করেছে। লর্ড কার্জন সাম্রাজ্যবাদীকে এক নূতন মন্ত্র দিয়ে গেছেন,—Indian state forces are a second line of defence—সাম্রাজ্যের শেষ দিন পর্যন্ত এ মন্ত্র সে ভুলবে না। লর্ড কার্জনের পূর্বে দেশীয় রাজ্যের সৈন্যবল সীমান্ত রক্ষায় ব্যবহৃত হোত। কার্জনের কূটবুদ্ধি সামন্ত সেনার বিপুল সম্ভাবনা লক্ষ্য করে। ফলে, সাম্রাজ্যের বনিয়াদ দৃঢ় করতে পঞ্চাশ সহস্র সামন্ত সেনার সাহায্য নিশ্চিত হোল। বিগত মহাযুদ্ধে ও আফগান যুদ্ধে সামন্ত সেনা সাম্রাজ্যের স্বার্থে বহির্ভারতে প্রেরিত হয়। স্বৈরশাসন অক্ষয় থাকলে সাম্রাজ্যের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাবে—এই সহজ সত্যটি ব্রিটিশ গভর্মেণ্ট উপলব্ধি কোরে সাম্রাজ্যের সমর সংস্থান (War reserve) এই দেশীয় রাজ্যগুলি বিপন্ন করবে না।

হরিপুরার নীতি সত্বেও কংগ্রেস নিরপেক্ষ মনোভাব ত্যাগ করে নাই। এই নীতির বিফলতা লক্ষ্য কোরে ত্রিপুরীর অব্যবহিত পূর্বে গান্ধীজী বলেছিলেন "কংগ্রেস কর্তৃক এ পর্যন্ত নিরপেক্ষ নীতির জন্য আমিই দায়ী। কিন্তু কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থায় রাজ্যসমূহে অনুষ্ঠিত অবিচারের সম্মুখে আমার পক্ষে এই নীতি সমর্থন করা অসম্ভব। যদি কংগ্রেস মনে করে যে সার্থকভাবে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা তাহার আছে, তাহা হইলে আহ্বান আসিবামাত্র কংগ্রেস তাহা করিতে বাধ্য হইবে।" ত্রিপুরীতে এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়। "...The great awakening that is taking place among the people of the states may lead to a relaxation or the complete removal of the restraint which Congress imposed upon itself, thus resulting in an ever-increasing identification of the Congress with the states people."

ত্রিপুরীর পরে গান্ধীজীর নির্দেশে কংগ্রেসের দেশীয় নীতি ক্রমাগত পরিবর্তিত হচ্ছে। রাজকোটে এই আবর্তন আরম্ভ হয়। কাথিয়াবাড়ের ক্ষুদ্র রাজ্য রাজকোট গান্ধীজীর অনুগ্রহে খ্যাতি লাভ করেছে বিশ্বযোড়া। অর্বাচীন রাজা কথার খেলাপ করে, গান্ধীজী জীবন পণ কোরে উপবাস করলেন রাজাকে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করাবেন। সার্বভৌম শক্তি স্বার্থ-সচেতন। তাঁরা ভাবলেন তুচ্ছ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে গান্ধীজীর প্রাণ রক্ষাই বুদ্ধিমানের কাজ—বড়লাটও তাই করলেন। কিন্ত, শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী রাজকোটের রঙ্গমঞ্চ থেকে রিক্ত হস্তে বিদায় নিলেন—রেখে গেলেন তিক্ততা ও বিহ্বলতা। রাজকোটের বিভ্রাটে জওহরলাল বিমূঢ় হোয়ে বলেছেন "রাজনৈতিক আন্দোলন কি করে এভাবে চলতে পারে তা আমার বুদ্ধির অগম্য।...রাজকোটের

পর আমি আরও অসহায় বোধ করছি, যা ঘটে গেল তা আমার বুদ্ধির অগম্য, বুদ্ধি যেখানে অচল সেখানে কাজ করাও আমার পক্ষে অসম্ভব," ("I do not see how a political movement can be guided in this way...That sense of helplessness increases after the Rajkot events. I cannot function where I do not understand, I do not understand at all what has taken place.")

রাজকোটের ঘূর্ণীতে 'সার্থকভাবে হস্তক্ষেপ' (effective intervention) করার সংকল্প চুরমার হোয়ে গেল। দেশীয় রাজ্যের সংগ্রাম হবে বিচ্ছিন্ন (localised), সত্যাগ্রহ প্রতিটি রাজ্যে বন্ধ থাকবে, রাজকোটের সংগ্রামও মুলতুবী থাকবে এই ত্রিবিধ অনুজ্ঞা প্রচার করে গান্ধীজী নূতন ব্যবস্থা দিলেন—খদ্দর ও চরকার সংগঠন। ('Constructive work of Khaddar and Charka.") কিছুদিন পূর্বেও ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান কংগ্রেসের হস্তক্ষেপে উষ্মাপ্রকাশ কোরে সার্বভৌম শক্তির দোহাই দিলে গান্ধীজী বলেছিলেন "এ যেন শিশুর হাতের তাল্ দিয়ে দুর্বার বন্যা প্রতিরোধ করবার অলস চেষ্টা।" গণ-আন্দোলনের সার্থকতার উপর গান্ধীজীর আস্থা কোথায় নিমেষে অন্তর্হিত হোল? রাজকোটের 'অমূল্য রসায়নাগারে' গান্ধীজী 'নূতন আলোর' (New Technique) সন্ধান পেলেন আর সেই সঙ্গে সামন্ত প্রজাদের ভাগ্যে জুটলো সংগ্রামের পরিবর্তে আবেদন নিবেদনের পরিত্যক্ত পথ। গান্ধীজীর নিজের ভাষায়—"তালচের রাজকোটেরও অধম। রাজকোটে শাসকের প্রতিশ্রুতির খেলাপ হয় আর তালচেরে হয় সার্বভৌম শক্তির।" (Talcher promises to be much worse than Rajkot. In Rajkot it was the Ruler's word that was broken. In Talcher it was the Paramount Power's." রাজকোটের সমাধান আমরা পেয়েছি! তালচেরের সমাধান আবার কোন্ নূতন বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে?

চারিদিকে রব উঠেছে দেশীয় রাজ্যে মুহুর্মুহু কংগ্রেস টাল খাচ্ছে কেন? কিসের ইসারায় নীতির এই সন্দিলতা?

শাসনতন্ত্র গ্রহণ করার পর থেকেই কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এক দলের নিয়মতান্ত্রিক মনোভাব সুস্পষ্ট হোয়ে উঠেছে। প্রস্তাবিত ফেডারেশন গ্রহণ বা বর্জন নিয়েই দক্ষিণী আর বামদলের বিরোধ প্রথম অভিব্যক্ত হয়। সাম্রাজ্যবাদের দূরদৃষ্টি আছে—'Times'এর ভাষায় "imaginative statesmanship." আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি, জাগ্রত জনমনের উদ্বুদ্ধ রাষ্ট্রচেতনা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রী সংগ্রাম—এ সব ভাবনা-চিন্তা করে পূর্বাহ্নেই সাম্রাজ্যবাদী তৈরী হোয়েছে। তার দিক থেকে সামন্ত ভারত ও ব্রিটিশ ভারতের প্রস্তাবিত ফেডারেশনের প্রয়োজনীয়তা এইখানেই। ক্ষমতা সংরক্ষণের (safeguards) বেড়াজাল দিয়েও ফেডারেল ব্যবস্থাপক সভায় রাজাদের মনোনীত প্রতিনিধির (প্রজার নির্বাচিত নয়) ব্যবস্থা করে অবাস্তব (mock) ও পঙ্গু ফেডারেশন

রাষ্ট্র প্রগতির পথে 'চীনের প্রাচীর' হোয়ে থাকবে—প্রতিক্রিয় অবস্থা হবে কায়েমী। ("It has been done to maintain the conservative character of the Princes.")

দক্ষিণীরা সমাজে শোষণ স্বীকার করলেও, শোষণের অবসান ঘটাবেন শোষকের অন্তর শুচি করে। কিষাণ মজুরের অধিকার দাবী, সমাজতন্ত্রী আন্দোলন তাঁদের 'সত্য' ও 'অহিংসা'র বুকে—জওহরলাল যাকে বলেছেন "sheet-anchor for vested interests and status quo"—আঘাত দেয়। সত্যান্বেষী দক্ষিণীরা তাই নিয়মতান্ত্রিক মার্গে ফেডারেশন গ্রহণ কোরে স্বরাজের দুয়ারে পৌঁছে যাবেন, গণ-আন্দোলনের বন্ধুর পথে নয়। কিন্তু, তাঁদের ফেডারেশনের কিছু রদ বদল চাই—ফেডারেল ব্যবস্থাপক সভায় দেশীয় রাজ্যের প্রজাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকবে, উপরন্তু, দ্বিতীয়তঃ সংরক্ষণ বিধিগুলিও (safeguard) পরিহার কোরতে হবে। মোটা মুটি এই ব্যবস্থায় ফেডারেল সভায় কংগ্রেসের প্রাধান্য থাকবে—উজিরীও মিলে যাবে। প্রথম ব্যবস্থায় ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের আপত্তি নাই। Safeguards-এর কথাটা একটু স্বতন্ত্র, রাজপ্রতিনিধির আশ্বাস মিলবে প্রাদেশিক ক্ষেত্রে যেমন তাদের ব্যবহার নাই সর্ব ভারতীয় ক্ষেত্রেও তাদের সেইরূপ সাধারণ প্রয়োগ হবে না। বিলাতে স্যার ফ্রেডারিক হোয়াইট, লর্ড লোথিয়ান ও লর্ড স্যামুয়েল ইঙ্গিত করেছেন কংগ্রেস ফেডারেশন গ্রহণ করবে। মাদ্রাজ এবং অন্যান্য দু একটি কংগ্রেস প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব গৃহীত হোয়েছে যদি ফেডারেশন পরিবর্তিত হয় তবে কংগ্রেস তা চালু করতে রাজী হবে। এখানে মনে রাখতে হবে মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী রাজাজী গান্ধীজীর শিষ্যদের অন্যতম। ভুলাভাইয়ের ডেপুটি সত্যমূর্তি ফেডারেশন মন্ত্রে মুগ্ধ। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যুক্তরাষ্ট্র চালু করতে দক্ষিণীদের সহযোগিতা পাবে এ আশা করেন নাই। অবস্থান্তরে দেশীয় রাজ্যে তাই সার্বভৌমশক্তি ও কংগ্রেস নীতি সমান তালে পা ফেলে চলছে—কংগ্রেসের নীতি নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সেই অনুসারে। পার্লামেণ্টে আর্ল উইনটারটনের জবাব—দেশীয় রাজ্যে স্বায়ত্ত শাসন দিলে সার্বভৌমশক্তির ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হবে না—ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান সি, পি, রামস্বামী আয়ারের পীড়নের জন্য নয় দক্ষিণীদের দাবী পূরণের জন্য। বিগত অধিবেশনে নরেন্দ্র মণ্ডলের নিকট বড়লাটের ভাষণ একই কারণে দেশীয় রাজ্যে শাসন সংস্কারের ইঙ্গিতে ও উপদেশে পরিপূর্ণ। (...."that no pressure will be brought to bear on him in this respect by the Paramount Power nor will any obstruction be placed in his way by the Paramount Power should he wish to give effect to constitutional advances consistent with his treaty obligations.") সার্বভৌম শক্তি, সামন্ত নৃপতি ও কংগ্রেস দক্ষিণী এই ত্রয়ীর যোগ ঘট্‌লেই ফেডারেশনের শুভলগ্ন সমাগত হবে। রাষ্ট্রের যাঁরা পাঁতি দেন তাঁদের বিশ্বাস ১৯৪১ সালে এই যোগাযোগের সম্ভাবনা আছে। সার্বভৌম শক্তির ফেডারেশন চাই-ই, কারণ, বিশ্ব-সমর আসন্ন -ভারতবর্ষে ও গণঅভ্যুত্থানের রব পড়ে গেছে। ফেডারেশনের সূত্রে তার সামন্ততন্ত্রের প্রয়োজন ও দক্ষিণী দলের সাহচর্য অপরিহার্য। দক্ষিণীদলের তুষ্টি বিধানে

Paramount Power উন্মুখ হোয়ে আছে তা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এখন যা কিছু বাধা সৃষ্টি কোরছে সামন্ত শাসন।

১৯৩১ সালে বিলাতে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে নরেন্দ্রমণ্ডল স্যার তেজবাহাদুর সাপ্রুর আমন্ত্রণে সামন্ত-সত্ত্বা বজায় রেখে সর্বভারতীয় ফেডারেশনে যোগ দিতে রাজী হয়। তখন ছিল আইনঅমান্য আন্দোলনের দুর্যোগ। ফেডারেশনের বর্ম পড়ে প্রতিক্রিয়ার ঘাঁটি আগলে ভারত শাসন করবে যৎসামান্য ত্যাগ স্বীকার করে, সেই দিনে এই মনোরম কল্পনা নরেন্দ্রমণ্ডলের হৃদয় জুড়ে ছিল। কংগ্রেসের শাসনতন্ত্রগ্রহণ সে আশা পরাহত করেছে; Instruments of Accessionএ (ফেডারেশনে যোগদান করার সর্তসম্বলিত নিদান) ত্যাগের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে—এ ধারণার থেকে ভয় জন্মেছে যে ফেডারেশনের রাহু ক্রমে রাজ্যগুলি গ্রাস করে বসবে। অন্যদিকে, ফেডারেশন বৃটিশ ভারতের সঙ্গে সামন্ত ভারতের সম্বন্ধটা ঘনিষ্ঠ করে তুলবে, প্রগতির অপ্রসান্নিধ্য অনতিকালেই সেখানেও মধ্যযুগের আবিলতা মুছে ফেলবে। কোনটাই নিরাপদ নয়, তাই নরেন্দ্রমণ্ডলের এতো দ্বিধা ও সঙ্কোচ' বৈঠকের পর বৈঠক বসিয়েও স্থিরসিদ্ধান্তে এতকাল তারা আসতে পারে নাই। অবশেষে সেদিন বোম্বাইএর অধিবেশনে নরেন্দ্রমণ্ডল রায় দিয়ে দিল 'Instrument of Accession' এর খসড়া সন্তোষজনক নয়। অদৃষ্টের উপর ভর করে নরেন্দ্রমণ্ডল দাবা খেলে দিল। সাম্রাজ্যবাদের পোষ্য হোয়ে তাকে অস্বীকার করবে এমন সাহস নরেন্দ্রমণ্ডলের নাই, তবুও দরকষাকষি করে যদি আরও কিছু আদায় করা যায় এ ভরসায় তারা জবাব দিল—"না," কারণ আর নাই যদি কিছু মিলে ফেডারেশন তো রইলোই। অদৃষ্টকে তারা ধিক্কার ও দেয় না পরিহার ও করে না, সাম্রাজ্যবাদও ছাড়ার পাত্র নয়। 'না' কে 'হাঁ' করবার কৌশল তাদের অনায়ত্ত নয়। ১৫ই জুলাই সম্মতি দেবার শেষ তারিখ ছিল সেটা এখন ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বোম্বাইয়ের 'না' সাম্রাজ্যবাদের প্ল্যান উলটে-পালটে দিয়েছে, নূতন কোরে তাদের মতলব আঁটতে হবে। সাম্রাজ্যবাদের মুখপত্র "The Times" ('দি টাইমস্') পত্রিকা ইতিমধ্যেই নরেন্দ্রমণ্ডলকে তোষণ ও বর্ষণ করেছে—"এই তোমাদের সুযোগ এ সময় ফেডারেশন গ্রহণ কর", (Accept the Federation when the terms are easy')...."যদি নৃপতিরা ফেডারেশন গ্রহণ করতে রাজী না হয়, তারা যেন মনে রাখে সার্বভৌম শক্তি অনন্তকালের জন্য স্বৈরশাসন চলতে দিতে পারে না, কারণ, ইংলণ্ডের জনমতের ওপর সার্বভৌম শক্তি দাঁড়িয়ে আছে", ("If the Princes refuse to come into the Federation, let them know that the Paramount Power, which after all, rests on the public opinion in England, cannot go on indefinitely maintaining the Princes in their existing positions of absolute authority.") সুবিধামত ইংলণ্ডের জনমতের দোহাই দিয়ে সায়েস্তা করার ভয় দেখান চলে, কিন্তু, ভারতের জনমত ?—......'the dogs will bark but the caravan will pass on.'

সাম্রাজ্যবাদ পুরুষকারে বিশ্বাসী তার ওপর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জরুরী তাগিদও আছে। যবনিকার আড়ালে কানাকানি সুরু হোয়েছে ফল ও পাওয়া গেছে বিস্তর। মাত্র এক মাসের ব্যবধানে 'না' 'হ্যাঁ' হোতে চলেছে, ভারত শাসন আইনের ৫ ধারা (The states, the rulers whereof will be entitled to choose not less than 52 members of the council of state and the aggregate population whereof amounts to one half of the total population of the states shall have accorded to the Federation.) অনুযায়ী অধিকাংশ রাজন্যবর্গ ফেডারেশনে সম্মত এইরূপ শোনা যায়। গোয়ালিয়ার, মহীশূর, বরদা, কোচিন, পাঞ্জাব ষ্টেট্‌স্, কাথিয়াবাড় এমন কি ত্রিবাঙ্কুর পর্যন্ত রাজী। চারিদিকে তাড়াহুড়ো পড়ে গেছে কে কার আগে সম্মতি দেবে। কায়ার সঙ্গে ছায়ার দ্বন্দ্ব সম্ভব নয়, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সামন্ততন্ত্রের দ্বন্দ্বও তেমনি অসম্ভব। বোম্বাই-এর 'না'তে কোন সঙ্কট দেখা দেয় নাই, সামান্য একটা বুদ্‌বুদ্ উঠে মিলিয়ে গেছে।

যে সীমান্তে ঝড় উঠ্‌বে সেখানকার আকাশে মেঘ কৈ? সেখানে জাতীয় সংহতির নেতৃত্ব কংগ্রেসের সাম্রাজ্যবাদের মিতালি খুঁজছে। 'New Technique' দেশীয় রাজ্যে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে তুলেছে, সার্বভৌম শক্তিও তাতে সায় দিচ্ছে। ধামী রাজ্যে গুলিতে ত্রিশজন নিহত হোয়েছে, পাঞ্জাবের আম্বি রাজ্য নয়শত অধিবাসী নির্বাসিত করেছে; গান্ধীজী নীরব—নেতৃত্ব নীরব। এদিকে, গান্ধীজীর 'New Technique' নরেন্দ্রমণ্ডলের প্রশংসা পেয়েছে—the suspension of Satyagraha is a step in the right direction. জাতীয় সংহতির বিপুল সম্ভাবনা ধূলিসাৎ করে দিয়ে দক্ষিণী নেতৃত্ব সামন্ততন্ত্র তথা সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম দিনগুলি পিছিয়ে দিতে চাইছে। ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেওয়া চলে না, যুগপ্রভাবও এড়ান যায় না। সাম্রাজ্যবাদের ঐশ্বর্য নিঃশেষ হোয়ে, স্রোতের মত সঙ্কট এসে ক্রমাগত ভিড় কোরছে। প্রবুদ্ধ ভারতের বর্ধিষ্ণু গণচেতনা ফেডারেশনের ফাঁকি উপেক্ষাভরে ঠেলে দিয়ে প্রকৃত ভারতীয় ঐক্য সাধন করবে। সামন্ত ভারতের নিরাপদ পথ আপদ সঙ্কুল।

পুনশ্চ

বর্তমানে দেশীয় রাজ্যের গণ আন্দোলন ভারতের বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনের সাথে আঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কাজেই দেশী রাজ্য সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞাতব্য তথ্য ও একটী নিবন্ধিকা এ আলোচনার উপসংহারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

হায়দারাবাদ—

বিস্তৃতি ৮২,৬৯৮ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ১৪,৪৩৬,১৪৮। হিন্দু ৮৫% ও মুসলিম ১০.৫%। মোটামুটি তিনটি ভাষায় (তেলেঙ্গানা, মারাথ্বদা ও কর্ণাটক) জনসাধারণ বিভক্ত। কথ্য ভাষা তেলেগু, মারহাটি, কেনারিস ও উর্দু। উর্দু সাধারণতঃ মুসলিম সমাজেই প্রচলিত ও রাজভাষা হিসাবে বিশেষ আদরণীয়।

হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ৮৫ হলেও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাদের কোন অধিকার নেই। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ৮২ জনের মধ্যে মাত্র ৭ জন হিন্দু।

রাজ্যের আয় ৮৪,২০১,০০০ ও ব্যয় ৭,৮১৩,০০০ টাকা। ব্যয়ের মোটা অংশ নিজাম ও রাজ পরিবারের জন্য খরচ হয়। এরপর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জাতি সংগঠনের জন্য অতি সামান্যই থাকে। নিজাম নিজে রাজকোষ থেকে ৫০ লক্ষ ব্যতীত জায়গীরের আয় বাবদ প্রতি বছর ২ কোটি টাকা পান।

নামেমাত্র একটি ব্যবস্থা পরিষদ আছে। ২১ জন সভ্যের ভিতর ১১ জনই রাজকর্মচারী, ৬ জন গবর্ণমেণ্ট মনোনীত। পরিষদের অধিবেশন বছরে ২।৩ বার হয়। ব্যবস্থা পরিষদে প্রস্তাবিত হওয়ার পূর্বেই অনেক আইন প্রচলিত হয়ে যায়। নিজাম স্বয়ং সকল ক্ষমতার একচ্ছত্র প্রতিনিধি। কাজেই পরিষদ একান্তই ভূয়া। সম্প্রতি চুক্তির ভিত্তিতে নূতন শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা হোয়েছে। তাতে মুসলমানের সংখ্যা লঘিষ্ঠতা সত্ত্বেও হিন্দু ও মুসলমানকে সমান আসন দেওয়া হোয়েছে।

কাশ্মীর—

দেশীয় রাজ্যের মধ্যে আয়তনে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। ৮৪,৪৭১ বর্গ মাইল তার বিস্তার। লোক সংখ্যা ৩,৬৭৬,২৪৩। এর ভিতর মুসলিম ২,৮১৭,৬৩৬, হিন্দু ৭৩৬,২২২, শিখ ৫০,৬৬২ বৌদ্ধ ৩৮,৭২৪, খৃষ্টান ২,২৬৩ ও জৈন ৫৯১। মুসলিমদের সংখ্যা শতকরা ৮০ হলেও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে হিন্দু প্রাধান্যই প্রবল।

রাজ্যের আয় ২৮,৭২৭,০০০ ব্যয় ২৪,৫৭৭,০০০ টাকা। আয়ের শতকরা ব্যয়—১৬% স্বয়ং মহারাজ, ১৯% সৈন্য সংরক্ষণ, ৯% শিক্ষা ও ৬% কৃষির জন্য। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও আইন প্রণয়নের একমাত্র অধিকারী হলেন মহারাজ। তাঁর মনোনীত মন্ত্রী দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত হয়।

শাসন পরিষদ ১৯৩৪ সালে প্রথম স্থাপিত হয়। ৭৫ জন সভ্যের মধ্যে ৪২ গবর্ণমেণ্ট মনোনীত, ৩৩ জন সাধারণের নির্বাচিত। সরকারী অনুমোদনে সভাপতি নির্ধারিত হয়। কিছুদিন পূর্বে শাসনসংস্কারের নামে পূর্বাবস্থাই পাকাপাকি করা হয়েছে। জনসাধারণের সাথে কর আদায় ভিন্ন রাষ্ট্রের আর কোন যোগসূত্র নেই। প্রজাগণ অত্যন্ত দরিদ্র ও অশিক্ষিত। কৃষিকার্য একমাত্র সম্বল। শোষণ ও শাসনের ফলে অধিবাসীদের (বিশেষ করে মুসলমানদের) অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়।

মহীশূর—

আয়তন ২৯৪৭৫ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ৬,৫৫৭,৩০২। আয় ৩৪,৩৭৩,০০০ টাকা। শিক্ষা ও শিল্পোন্নয়নের জন্য ৬,৯২৪,৫২৯ টাকা ব্যয় হয়।

শাসন ও ব্যবস্থার জন্য দু'টি পরিষদ আছে। মহারাজ শাসন কার্যের জন্য একজন দেওয়ান ও দু'জন ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য নিয়ে এক কাউন্সিল গঠন করেছেন। পরিষদে ৫০ জন সভ্যের মধ্যে ২০ মনোনীত ও ৩০ জন নির্বাচিত।

বরদা—

আয়তন ৮,১৬৪ বর্গ মাইল। লোক সংখ্যা ২,৪০৩,০০৭, আয় বাৎসরিক ২৪,৭৩০,০০০ টাকা। রাজ্যের অধিপতি গাইকোয়ার দেওয়ান ও পরিষদ মণ্ডলীর সাহায্যে শাসনকার্য নির্বাহ করে। শতকরা ১৮ জন লোক শিক্ষিত ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রচলিত।

রাজ্যের নাম	আয়তন (বর্গ মাইল)	লোক সংখ্যা	বার্ষিক আয় লক্ষ টাকা
রাজপুতনার অন্তর্গত বিশিষ্ট রাজ্য			
মেরওয়ারা	১২,৯২৩	১,৫,৬৬,৯১০	৮০·৬
যোধপুর	৩৬,০২১	২৪,০০০০	১৪·৯১৭০০৫
জয়পুর	১৬,৬৮২	২,৮৩১৭৭৫	১২৫
আলওয়ার	৩১৫৪	৭৪৯,৭৫১	৩৮
ভরতপুর	১,৯৭৮	৫৮৬,৯৫৪	৩১·৬৭০০
বিকানির		৯৩৬,২১৮	১০০
মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ৮৮টি রাজ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য			
গোয়ালিয়র	২৬,৩৬৭	৩,৫২৩,০৭০	২৪১·৭৯০০০
ইন্দোর	৯,৯০২	১,৩২৫,০০০	১৩৮
ভূপাল	৬,৯২৪	৫২২,৯৫৫	৮০
রেওয়া	১৩,০০০	১,৫৮৭,৪৪৫	৬০
দেওয়াস ১	৪৪৯	৮৩,৩২১	৬¼
দেওয়াস ২	৪১৯	৭০,৫১৩	৩¼
উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত উল্লেখযোগ্য রাজ্য			
চিত্রল	৪,০০০	৯৯,০০০	৫·২০৪২২
সিকিম	—	—	
ভুটান	১৮,০০০		
মাদ্রাজের অন্তর্গত ৫টি রাজ্য			
ত্রিবাঙ্কুর	৭৬২৫	৫,০৯৫,৯৭৩	—
কোচিন	১,৪১৭	১,২০৫,০১৬	৮৮·৩৭
পদুয়াকোট্টাই	১,১৭৯	৪০০,৬৯৩	১৩·১১
বানগানাপল্লী	২৭৫	৩৯,২৩৯	৪·৫৮
সান্দুর	১৬৭	১৩,৫৮৩	২·২৩

রাজ্যের নাম	আয়তন (বর্গ মাইল)	লোক সংখ্যা	বার্ষিক আয় লক্ষ টাকা
পশ্চিম ভারতীয় রাজ্য কাথিয়াবারের অন্তর্গত ২০০ রাজ্যের বিশিষ্ট রাজ্য			
ভাবনগর	—	৫০০,২৭৪	১৬৬'৬২৭৮৫
নবনগর	৩৭৯১	৪০৯,১৯২	৯৪
রাজকোট	২৮৩	৭৫,৭৪০	১২½
দাক্ষিণাত্য ও কোলাপুর ষ্টেট্‌স			
কোলাপুর	৩,২১৭	৯৫৭,১৩৭	১২৭
বাঙ্গলা দেশে			
কুচবিহার	১,৩১৮	৫৯০,৮৬৬	
ত্রিপুরা	৪,১১৬	৩৮২,৪৫০	২০
পাঞ্জাব ষ্টেট্‌স			
পাতিয়ালা	৫,৯৪২	১৬২১,৫২০	১৪৫
নাভা	৯৪৭	২৮৭,৫৭৪	
কপূরতলা	৫৯৯	৩১৬,৭৫৭	৩৬
ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্য			
যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত			
রামপুর	৮৯৩	৪৬৫,২২৫	৪৯
আসাম ষ্টেট্‌স			
মণিপুর	৮,৬২০	৪৪৫,৬০৬	

উড়িষ্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেটস্‌গুলির মধ্যে—

ঢেনকানেল, গাঙ্গপুর, জাসপুর, কেওনঝার, ময়ূরভঞ্জ, সেরাইকেলা, শোনপুর, শূরগুজা, হিন্দোল, খারসওয়ান, উল্লেখযোগ্য।

খাসিয়া ষ্টেটস্—

২৫টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ষ্টেটস্। ৩,৬০০ বর্গ মাইল আয়তন। খাইরিম ও মিলিয়েম এর ভিতর বড়। শাসন পদ্ধতি গণতান্ত্রিক।

রাজপুতনা—আয়তন ১৩৩,৮৮৬ বর্গ মাইল। বৃটীশ আজমীর মেরওয়ার ভিন্ন ছোট বড় ২১টি দেশীয় রাজ্য আছে। এর ভিতর ১৯টি রাজ্যের অধিপতি রাজপুত।

অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫০ জন কৃষিকার্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, জাট, মহাজন, চামার, বলাই, রাপুজত, মিন, গুজর, ভিল ও মালী।

পাথেয়

জ্যোতির্ম্ময় রায়

গৃহলক্ষ্মীর আসন হ'তে নেবে এসে শিক্ষয়িত্রীর আসনের জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল লসিতা। চেষ্টা ও অর্থের কাঠ-খড় পুড়িয়ে কোন প্রকারে 'য়্যালমা-মিটারে' বিদ্যার তাপকে বি-এ কি এম্-এ ডিগ্রি পর্য্যন্ত তুলে জীবনভর প্রলাপ বকবার একটা ব্যবস্থা করে নেওয়া।—

জীবিকা হিসেবে কোন ব্যবস্থাকে মেনে নেবার প্রয়োজন লসিতার জীবনে হয় নি—হবেও না। পুরুষানুক্রমে ঐশ্বর্য্য বস্তুটা লসিতার পিতৃ-পরিবারের অঙ্গে যেন পুলিশের ছাতার মত এঁটে গেছে, সুখের ছায়াকে ধরে রাখবার জন্যে প্রচেষ্টার কোন প্রয়োজন হয় না। সম্পত্তির সেই পুরুষানুক্রমের পরে পুরুষের একচেটিয়া দাবির অঙ্গহানি করেও দক্ষিণাবাবু যে কন্যার জন্যে একটা সুব্যবস্থা করে যাবেন এ কথাটা লসিতা নিজে এবং পরিবারের অন্যান্য সকলে স্পষ্ট করেই জানে। তথাপি বিদ্যা বিতরণের উদ্দেশ্যে বিদ্যা আহরণে লসিতার এ প্রয়াস শুধু নিজের বিস্তৃত ভবিষ্যতে নিজেকে ব্যাপৃত রাখবার একটা পথ করে নেওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। কৃতিত্বের সঙ্গে আই-এ পাশ করার পর পড়বার আগ্রহ তার কম ছিল না, কিন্তু মুখের উপর এমন একটি দুর্লভ শ্রী নিয়ে কলেজে দু' ধাপের ঊর্দ্ধে ওঠা সম্ভবপর হয় নি। কারণ ছাত্রীর চেয়ে পাত্রী হিসেবেই সে কোন কোন অধ্যাপকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বসলো বেশী; তন্মধ্যে দক্ষিণাবাবুর অনুমতিক্রমে লসিতাকে 'বিশেষরূপে বহন' ক'রে ঘরে তুলবার অধিকার পেল অর্থনীতির অধ্যাপক সুপ্রকাশ সোম। কলেজের সমগ্র আবহাওয়াটাকে ক্ষুব্ধ করে লসিতা যেদিন পাঠ্যজীবন শেষ করলো, ভাবতেও পারে নি চার বছর পর একদিন ব্যর্থ ও অভিশপ্ত জীবন নিয়ে পুনরায় সেখান থেকেই তাকে সুরু করতে হবে।

বি-এ পরীক্ষার আর তিন মাস বাকি। দিনরাত লসিতা পড়াশোনা নিয়েই ব্যস্ত। কিন্তু এ ব্যস্ততার সঙ্গে তার কুমারী জীবনের ব্যস্ততার যেন মস্ত একটা পার্থক্য আছে, এর মধ্যে ব্যাপ্তিটাই বড়, গভীরতা কম, পড়তে বসে কেবলই সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। দোতালায় শয়ন কক্ষের জানলার পাশে একটা আরাম-কেদারায় লসিতা বসে আছে। কোলের উপর একখানা খোলা বই। বইয়ের সঙ্গে মনের যোগসূত্রটা বহুক্ষণ হয় ছিন্ন হয়ে গেছে; দূরে একটা নারকেলগাছ নাগরিক স্বার্থকে অক্ষুন্ন রেখে দুটো বাড়ীর মাঝ দিয়ে মুক্ত পরিসরে মাথা মেলে দাঁড়িয়েছে—এলোমেলো চিন্তা নিয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছে লসিতা। নুয়ে-পড়া লম্বা পাতাগুলো ধীর হাওয়ায় আন্দোলিত হচ্ছে, কোনটা মানুষেরই মত অর্থহীন গাম্ভীর্য্য নিয়ে কেবলই মাথা নাড়ছে, কোনটা সোহাগ ভরে ঢলে পড়ছে অন্যটার গায়, সেটা হয়তো যাচ্ছে তফাতে সরে—পাতাগুলোর এই অর্থপূর্ণ ভঙ্গীর দিকে তাকিয়ে একটানা অনেকটা সময় কেটে যায় লসিতার।

পরদা সরিয়ে দক্ষিণাবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন। হাতে একখানা চিঠি। পুরু পেবল্‌সের চশমার ভিতর দিয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লেফাফার উপরকার লেখাটার দিকে তাকিয়ে বললেন—লসিতা, তোর একখানা চিঠি। দেখতো মা কে লিখেছে।

চিঠি এলে সাধারণতঃ ভৃত্যই পৌঁছে দিয়ে যায়, বাবা নিজে নিয়ে এসেছেন দেখে লসিতা ত্রস্তে উঠে এসে চিঠিখানা হাতে নিল। ঠিকানার হস্তাক্ষরের দিকে দৃষ্টি পড়তেই মুহূর্তের জন্যে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। কন্যার মুখের দিকে চেয়ে দক্ষিণাবাবু বললেন—সুপ্রকাশের হাতের লেখা বলে মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ, তারই।

—কি লিখলো আবার সে। বলে, বৃদ্ধ খাটের একটা কোণ ঘেঁষে বসে পড়লেন। সুপ্রকাশের নাম শুনলেও অন্তর তাঁর ঘৃণায় ভরে ওঠে। প্রায় দু' বছর হতে চললো, এযাবৎকাল খবর দেবার বা নেবার দায় থেকে উভয় পক্ষই মুক্ত বলে নিশ্চিত জানা হয়ে গেছে; হঠাৎ এত দিন পর এ অবাঞ্ছিত লোকটির কাছ থেকে কি সংবাদ এল জানবার জন্যে দক্ষিণাবাবু উৎকণ্ঠিত আগ্রহে অপেক্ষমান দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলেন লসিতার মুখের দিকে।

এক লাইনে সমাপ্ত চিঠিখানা প্রয়োজনাতিরিক্ত অনেকটা সময় কঠোর দৃষ্টির সুমুখে মেলে রেখে লসিতা পিতার হাতে তুলে দিল। চিঠিতে লেখা রয়েছে, আমার প্রথম সন্তানের জন্যে তোমার কাছ থেকে শুভেচ্ছা কামনা ক'রে এ চিঠি দিচ্ছি।—ইতি, নিরপরাধ সুপ্রকাশ।

দক্ষিণাবাবু লাইনটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে কাগজটা বিছানায় ফেলে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। একটু চুপ করে থেকে তিক্ত ও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন—নিরপরাধ... ! আর কাউকে যদি স্পর্শ না করতো, ওকে অভিশাপ দিতাম। বলে, একখানা হাত লসিতার মাথার 'পর রেখে মৌন হয়ে রইলেন। পিতা হয়ে আজ তিনি আশীর্ব্বাদ করতে অক্ষম—এর চাইতে বড় বিড়ম্বনা আর কি থাকতে পারে; দক্ষিণাবাবুর চোখ সিক্ত হয়ে আসে। যে কোন অবস্থায়ই হ'ক প্রতিকারের কোন পথই খোলা থাকবে না সাত পাকের এই এক তরফা বাঁধন—অচ্ছেদ্য এই প্রসিতির বিপক্ষে, এমন কি নিজের সুদৃঢ় সংস্কারের বিরুদ্ধে মন তাঁর বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

দক্ষিণাবাবু চলে গেলে লসিতা স্তব্ধ হয়ে আরাম-কেদারাটায় বসে রইল। 'নিরপরাধ' কথাটা যেন আগুনের হলকা দিয়ে তার মনের 'পরে লিখে দেওয়া হয়েছে। কথাটার সত্যিকারের তাৎপর্য্য দক্ষিণাবাবু জানেন না—জানবেনও না। লসিতাকে লাঞ্ছনা দিয়ে বিতাড়িত ক'রে পুনর্ব্বার দার-পরিগ্রহ করেও নিজেকে যে সুপ্রকাশ অপরাধী মনে করে না, এটা দম্ভ ভরে জানিয়ে দেবার জন্যেই যে কথাটা সে লেখেনি সে-কথা জানে একমাত্র লসিতা নিজে।—কারণ শব্দটা তারই শেষকথার জবাব।

বিয়ের পর কিছু দিনের মধ্যেই সুপ্রকাশের মা'র শ্বাশুড়ীসুলভ উৎপীড়ন থেকেই লসিতার বিবাহিত জীবনে অশান্তির প্রথম সূত্রপাত। স্বামীর সঙ্গেও তেমন একটা মনের মিল ছিল বলা

চলে না। প্রকাশিত হয়ে পড়বার মত মোটা রকমের গড়মিল না হলেই বাঙালী দাম্পত্য-জীবনের পক্ষে যথেষ্ট—লসিতার দিন এক রকম কেটে যাচ্ছিল। গড়মিলের প্রধান কারণ সুপ্রকাশের খিটমিটে মেজাজ, যেটা বাড়ীর বাইরে সর্ব্বত্র চাপা পড়ে থাকে ভদ্রাবরণের নীচে। সামাজিক জীবনে ভদ্রতা ও সৌজন্যের দিক দিয়ে সুপ্রকাশের সুনাম প্রচুর, যা দেখে একদিন দক্ষিণাবাবুও মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু তার স্বভাবের আটপৌরে দিকটা নিকটতমদের পক্ষে শান্তিজনক নয় মোটেই। সুপ্রকাশের সঙ্গে লসিতার প্রথম বিরোধ রুচির। লসিতা সংযত ও স্বল্পভাষিণী, সুপ্রকাশ ঠিক তার উল্‌টো, এমন কি রাগত অবস্থায় তার ভাষা ও প্রকাশভঙ্গী হয়ে ওঠে রীতিমত আপত্তিকর। বিশেষ ক'রে লসিতা সম্পর্কে তার ভেতরে একটা দৈন্যবোধ ছিল; লসিতার ব্যক্তিত্ব-বোধকে মনে করতো সে বড়লোকি, সংযতভাবকে মনে করতো অহঙ্কার। তাই সেখানটায় আঘাত করবার একটা হীন প্রবৃত্তি তার ভালবাসাকে রাখতো আচ্ছন্ন করে। লসিতা জানতো মেনে তাঁকে না নিলেও মানিয়ে তাকে চলতেই হবে, সেই হেতু সব কিছুই নীরবে সয়ে যেত। বছর দু' পেরিয়ে যেতেই শাশুড়ী বধূ নিগ্রহের এক নূতন অস্ত্র হাতে পেলেন। বংশে বাতি দেবার উত্তরাধিকারীর আবির্ভাব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে কথায় কথায় সুরু করলেন খোঁটা দিতে। চতুর্থ বছরে খোঁটাটা হয়ে উঠলো কর্কশভাবে স্পষ্ট। সুরুতে সুপ্রকাশ কথাটা শুনেই গেছে, যোগও দেয়নি প্রতিবাদও করে নি। কিন্তু ক্রমাগত প্রসঙ্গটা কাণে এসে একটা অভাববোধ জাগিয়ে তুলেছিল বলেই হ'ক বা নিছক আঘাত করবার জন্যেই হ'ক, শেষ পর্য্যন্ত রাগ হলে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সে-ও এদিক দিয়ে ইঙ্গিত করতে লাগলো। অন্তরের বড়ত্ববোধ দিয়ে দৈনন্দিন সকল অশান্তিকেই লসিতা তুচ্ছজ্ঞানে পার হয়ে আসছিল, কিন্তু এ আঘাতের কাছে ক্রমশই যেন নিজেকেই বোধ করতে লাগলো দুর্ব্বল ও নিরুপায়। অক্ষমতার আভাস পেয়ে দিনের পর দিন আকাঙ্খাটা তার নিজের মধ্যেও দেখা দিতে লাগলো তীব্র হয়ে। এ অবস্থায় একদিন সামান্য একটা বিষয় নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর কলহটা একটু বেশী দূর গড়িয়ে গেল। লসিতার মেজাজও সেদিন তেমন ভাল ছিল না; সুপ্রকাশের একটা আপত্তি-জনক ইংরিজী গালির বিপক্ষে তীক্ষ্ণ মন্তব্য প্রকাশ করে' সসম্মানে কথা বলবার দাবি জানাতেই সুপ্রকাশ হঠাৎ অসঙ্গত ভাষায় অত্যন্ত নগ্নভাবে সেদিন জানিয়ে দিল যে-স্ত্রীলোকের মা হবার ক্ষমতা নেই সে শুধু পুরুষের ভোগ্য বস্তু—স্ত্রীর সম্মান দাবি করবার অধিকার তার নেই। সবচেয়ে দুর্ব্বল স্থানে অমন নির্ম্মম আঘাত পেয়ে লসিতাও আত্মবিস্মৃত হয়ে জবাব দিল, 'ঐ জন্যে অপরাধী যে তুমি নও তাই বা জানলে কি করে!'—'কী, যা মুখে আসছে তাই বলছো...বেরোও বলছি ঘর থেকে!' সুপ্রকাশ লাফ দিয়ে উঠে লসিতার সুমুখে গিয়ে বাইরের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করলো। লসিতা একটু ভীত বা সন্ত্রস্ত ভাব দেখালেই হয়তো সুপ্রকাশ সরে যেত কিন্তু এমনি স্থির ও নিশ্চল হয়ে রইল সে, যে অত বীরদর্পে উঠে গিয়ে চুপচাপ ফিরে আসতে সুপ্রকাশ পারলো না। একটা হাত ধরে জোর করে লসিতাকে ঘরের বার করে দিয়ে বললো, 'যাও...বেরোও বাড়ী থেকে'—এ ঘটনার পর সত্যি-সত্যিই সেদিন লসিতাও বাড়ী পরিত্যাগ করে চলে গেল তার বাবার কাছে।—

লসিতার বাপের বাড়ী চলে আসবার তিন মাস পর সংবাদ পেয়েছিল তার শেষ কথার প্রতিক্রিয়ার, আজ পেল প্রত্যুত্তর। কিছুক্ষণের জন্যে মনটা তার নিঃসাড় হয়ে গেল। সুপ্রকাশ পুনর্ব্বার বিয়ে করে পুনর্ম্মিলনের পরে পূর্ণচ্ছেদ টেনে লসিতার নারীত্বকে করেছে লাঞ্ছিত, কিন্তু তার এ দম্ভোক্তি করলো অবমানিত। ধীরে ধীরে লসিতার মনে এ প্রশ্নটাই তীব্র হয়ে দেখা দিল, তবে কি সত্যি তার সর্ব্বাঙ্গিনতায় অজ্ঞাত কোন ত্রুটি রয়ে গেছে! কিন্তু নিজের পূর্ণতায় অবিশ্বাস করতে মন তার কিছুতেই চাইল না।—দেহটাকে ব্যবচ্ছেদ করে একবার যদি সে দেখতে পারতো।...চার বছর জীবনের কতটুকু, তা' দিয়ে সমস্ত ভবিষ্যৎকে বিচার সে কেন করবে! এও তো হতে পারে, এ বিশেষ সংযোগের ফলে তারা দু'জনেই হয়েছিল নিষ্ফল। আজ সুপ্রকাশের অন্তরে স্বার্থকতার আনন্দ...লসিতার মাথায় যেন আগুন ধরে গেল—

'লসিতার বৌদি নমিতা মেয়েটি বড় ভালো। দোষের মধ্যে কথায় কথায় চোখ দিয়ে তার জল এসে পড়ে! লসিতা ঠাট্টা করে' কতদিন ব্যবস্থা দিয়েছে মোটরের গ্লাস-ওয়াইপারের মত একজোড়া ইলেকট্রিক ওয়াইপার দু'গালে ফিট করে নিতে। বিকেলের দিকে এক মাসের শিশুর উদ্দেশে তৈরী এক পাতা একটা ফর্দ্দ হাতে নিয়ে নমিতা সিক্ত চোখে এসে দাঁড়ালো লসিতার দরজায়।—ছেলের চেয়ে আড্ডাই হলো বড়, চায় না সে ওর সাহায্য। এই কেনাকাটিটুকু সে নিজেই করতে পারে—নেহাতই অতটুকু শিশু ফেলে বাইরে যেতে মন সরে না বলে। লসিতার পছন্দের পরেও তার আস্থা আছে, ঘরে ঢুকে অনুরোধ করতে গিয়ে লসিতার মুখের দিকে তাকিয়ে সে থেমে গেল।

নমিতার চোখের জল কারুর মনেই প্রশ্ন জাগায় না, লসিতা জিজ্ঞেস করলে—কি বৌদি, কিছু বলবে?

নমিতা ভরসা পেয়ে অনুনয়ের সুরে বললো—লক্ষ্মীটি ঠাকুরঝি, একবারটি মার্কেট থেকে ঘুরে আসবে?...গাড়ী বার করতে আমি বলে এসেছি।

লসিতার মুখের অস্বাভাবিক ভাবটা নমিতার সরল চোখেও ধরা পড়েছে, তবে কিনা নিজের বাইরে কৌতূহলটা তার খুবই কম। সেদিক দিয়ে কোন প্রশ্ন না করে, পাছে লসিতা 'না' বলে বসে তাই শ্রম বাঁচানোর একটা পন্থা আবিষ্কার করে বললো—অরুণকে না হয় সঙ্গে নিয়ে যাও, দরদস্তুর করবার হাঙ্গামটা সে-ই পোয়াবে, তুমি শুধু পছন্দ করে দিও।

অরুণ! হ্যাঁ, অরুণ বলে তাদের গ্রামের একটি দরিদ্র যুবক এখানে থেকে এম-এ পড়ে বৈ কি। শান্ত লাজুক ছেলে। দাতার গৃহে দৈন্য নিয়ে নীচের তলার একটা কোণে পড়ে থাকে; তার সঙ্কীর্ণ সত্বা ভালো করে' কোনদিন লসিতা অনুভবও করে নি। কি একটু চিন্তা করে লসিতা বললো—রেখে যাও ফর্দ্দটা।

ফর্দ্দ ও টাকা রেখে নমিতা চলে গেল। স্বল্পক্ষণের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে লসিতা নেমে এল নীচে। এক পাশের ছোট্ট একটা কামরায় অরুণ থাকে, লসিতা এসে ঢুকলো সেই ঘরে। অরুণ টেবিলে

ঝুঁকে পড়ে কি যেন লিখছিল, হাই-হিলের ঠুক্ ঠুক্ শব্দে পেছনে তাকিয়ে সসম্মানে উঠে দাঁড়ালো।

—কিছু কাজ করছো? লসিতা জিজ্ঞেস করলো।

চোখ না তুলে অতি নম্রভাবে অরুণ জবাব দিল—না, এক বন্ধুর কাছে চিঠি লিখছিলাম। বলে, আর্দ্ধেক লেখা কাগজটা কুঁচ্‌কে-মুচ্‌কে হাতের মুঠোয় একটা গোল পাকিয়ে ফেললো।

—বন্ধু না বান্ধবী?

লসিতাকে বাড়ীর সবাই ভয় করে চলে: যদিও লসিতার সংস্পর্শে আসার সুযোগ অরুণ কোনদিন পায় নি, তবু অন্যান্যের মনোভাবের সংক্রাম তার মনকেও স্পর্শ করেছিল। তাই সন্ত্রস্ত হয়ে অমন একটা অন্যায় কাজ যে সে করছিল না,—অনেকটা যেন সেটাই প্রমাণ করতে কোঁচকানো কাগজটা খুলে ধরে বললো—না, এই যে... ; আবার কুঁচকে ছুঁড়ে দিল জানলার দিকে। একটা শিকে বেধে ফিরে সেটা ঘরের মধ্যেই এসে পড়লো।

লসিতা হেসে বললো—ফাঁক লক্ষ্য করে ফেললে শিকে বেধে যায়, শিক লক্ষ্য করে ফ্যালো, ঠিক দেখো, ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে।

অরুণও হাসলো। লসিতা বললো—তোমাকে আমার প্রয়োজন আছে..., কথাটা নিজের কাণেই কেমন ঠেকলো, একটু থেমে বললো, আমার সঙ্গে একবার বেরুতে হবে।

অরুণ সার্ট গায়ে চড়িয়ে নিয়ে বললো—চলুন।

বাইরের ঘরে লসিতার দাদা বিমলের দৈনন্দিন আড্ডা বেশ জমে উঠেছে। বাড়ীর সুমুখে দাঁড়ানো বন্ধুদের সব চোখা, চ্যাপ্টা, বেঁটে, লম্বা, হরেক কিছিমের নাকওয়ালা গাড়ী। বন্ধুমহল লসিতার বিয়ের পরও যেমন নিরাশ হয়েছিল, বিচ্ছেদের পরও হয়েছে তেমনি নিরাশ। নিজেদের বোন, নমিতা, দু'একটি বিবাহিত বন্ধুর স্ত্রী, সুবিধামত সান্ধ্য বৈঠকে যোগ দেয়; যোগ দেয় না শুধু লসিতা। গান শোনাবার নাম করে যদিই বা লসিতাকে ধরে আনা হয়, অনুরোধ রক্ষা করে' পড়াশোনার অজুহাতে একটু পরেই উঠে যায়।

দরজায় দাঁড়িয়ে লসিতা বিমলকে বললো—দাদা, আমি গাড়ী নিয়ে বেরুচ্ছি, ফিরতে রাত হবে।

—আচ্ছা, দরকার হলে যে কারুর একটা নেব'খন, তুই নিয়ে যা!

আর সবার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে লসিতা গিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলো। অরুণ বসতে যাচ্ছিল ড্রাইভারের পাশে, লসিতা ডেকে এনে পাশে বসালো।

গাড়ী চলছে। কোন একটা কথা বলবার জন্যেই অরুণ প্রশ্ন করলো—পরীক্ষার জন্যে কেমন তৈরী হলেন?

—মোটেই না। সরস্বতীর স্বজাতি-প্রীতিটা কম, আধুনিকাদের মত বড় বেশী পুরুষ-ঘেঁষা!

অরুণ হেসে বললো—কেন, আপনার আই-এ'র রেজাল্ট তো শুনেছি খুবই ভাল হয়েছিল। তা ছাড়া মেয়েরা আজকাল পড়াশোনায় তো খুবই এগিয়ে গেছে।

—জাতধর্ম্ম খোয়ালে কিছুটা হয় বৈকি। শুধু পড়াশোনায় কেন, বাধ্য হয়ে চাকরী-বাকরী অনেক কিছুতেই তারা এগিয়ে যাচ্ছে।

লসিতা যেন অনেকটা আপন মনেই বলে চললো, এ এক মস্ত কৌতুক! লতা গাছ হতে গিয়ে লতাত্ব হারায়, গাছও হতে পারে না, মাঝখানে হয়ে দাঁড়ায় ডাঁটা; যার মধ্যে লতার শ্রী, গাছের শক্তি কোনটাই থাকে না।

লসিতা নিজে কেন লেখাপড়া নিয়ে আছে অরুণ তা জানে, তাই সেদিকে দিয়ে কোন প্রশ্নই সে করলো না। লসিতার সঙ্গে কথা বলে মেয়েদের সম্পর্কে অরুণের অনভিজ্ঞ মনের ধারণাটা যেন বদলে গেল। লসিতাদি'র বিদ্যা-বুদ্ধির প্রতি মন তার হয়ে উঠলো শ্রদ্ধাবান।

কোথায় সহজ হতে পারা যায় মানুষের সহজ অনুভূতির মধ্যেই তা ধরা পড়ে। বাহ্যিক সঙ্কোচ না ঘুচলেও অরুণের মনের সঙ্কোচ এতটুকুতেই অনেকটা কেটে এসেছিল। সে বললো—একদিন এ সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে আলোচনা করবো।

ছুটোছাঁটা কথা বলে পথটা কেটে গেল। হগমার্কেটে নেমে লসিতা ফর্দ্দটা দিল অরুণের হাতে, বললো—বৌদির হুকুম সব তোমাকে করতে হবে, আমার' পরে ভার শুধু পছন্দের।

হাসি-গল্প করে' দু'জনে মার্কেট ঘুরে জিনিষ কিনতে লাগলো। বৌদির ফর্দ্দ শেষ করে লসিতা এটা ওটা দেখে বেড়াচ্ছিল। একটা সো-কেসের ভেতরে কাগজের কঙ্কলোভী কতকগুলো কলম শুকনো বুক নিয়ে পাশাপাশি শুয়ে আছে, লসিতা একটা লেডিজ-পেনএর দিকে নজর করে দেখছে, অরুণ অতশত না বুঝে একটা জেনটস্-পেন দেখিয়ে বললো—এ পেনটা ভারি সুন্দর, না লসিতাদি'?

—পছন্দ হয় তোমার? দোকানদারকে বললো, দেখি কলমটা।

শীফারের কলম, দাম পঁচিশ! ভ্যানিটি-ব্যাগ থেকে টাকা ক'টা গুনে দিয়ে কলমটা বাড়িয়ে ধরলো অরুণের দিকে। অন্যান্য জিনিষের মত অরুণ কলমটা হাতে নিল।

লসিতা বললো—এটা তোমার।

আশ্চর্য্যের সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে অরুণ বললো—আমার! এত দামী কলম দিয়ে কি করবো আমি!

—লিখবে। দামী কলম কেনবার ক্ষমতা না থাকলেও তা দিয়ে লিখবার ক্ষমতা তোমার আছে, পরখ করে' দেখো!—দাঁড়িও না, চলো।

অরুণ অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলো। ভয়ে ভয়ে ছাড়াছাড়া কথার মধ্য দিয়ে আপত্তি জানাতেও চেষ্টা করলো। লসিতা মার্কেট হ'তে বেরিয়ে ঢুকলো গিয়ে রেষ্টুরাণ্টে। একটা কেবিনে বসে বয়কে ডেকে বেশ সমারোহের সঙ্গে দিল চা'এর আজ্ঞা। অরুণের ভয় ও জড়তা অপসারণের উদ্দেশ্যে লসিতা হালকা কথার অবতারণা করলো, জিজ্ঞেস করলো—তুমি সিগারেট খাও?

—না।

—আচ্ছা, সত্যি তোমার কোন বান্ধবী নেই ?'

না লসিতাদি' সত্যি নেই। জীবনে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার বাইরে কোন মেয়ের সঙ্গে আলাপই করি নি।......সিগারেটও আমি খাইনে। আপনাদের দয়ায় আমি মানুষ হচ্চি, তা ছাড়া আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি, আপনার কাছে মিথ্যে আমি বলবো না।......এ সব ব্যাপারে ছাত্র-মহলে আমার সুনামও আছে।

অরুণ মনে করেছিল লসিতাদি' তাকে যাচাই করে দেখছে, এবং তার কথা শুনে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবে। লসিতা উল্টো রকমের জবাব দেবে সে আশা করেনি।

লসিতা বললো—নাম কেনার সস্তা পথটা বেশ চিনে নিয়েছ দেখছি। মানুষ হিসেবে গর্ব্ব করবার মত বস্তু যাদের মধ্যে থাকে না, তারাই বেছে নেয় প্রবৃত্তি নিরোধের পথ।

অরুণ যেন একটু কেমন হয়ে গেল, বললো—আপনি কি ও গুলোকে ভাল বলেন ?

—আমি কি বলি পরে বলবো। তুমি তোমার পুথিপত্তর আজই আমার ঘরে নিয়ে আসবে, দু'জনে একত্র বসে পড়বো।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পরিদৃশ্যমান সব কিছুর রং এমন ভাবে বদলে যেতে পারে অরুণ কোন কালে ভাবতেই পারে নি। তার জীবনে এ এক অভিনব দিন, নিজের সত্তাকে যেন সে আজ নূতন করে অনুভব করলো।—

দিন দু'এর ভিতর লসিতা কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারের মধ্য দিয়ে অরুণের মনে এনে দিল বন্ধুত্বের সাহস ও সহজ ভাব। সুমুখে খোলা বই রেখে দু'জনে গল্প করছে। লসিতা কাত হয়ে কনুই-এ ভর করে আড়া-আড়িভাবে বিছানায় শুয়ে, অরুণ বসেছে খাটের গা ঘেঁষে একটা চেয়ারে। কথার মাঝে কিছুক্ষণ চুপ করে' লসিতার মুখের দিকে তাকিয়ে অরুণ বললো—আমি ভাবি, সুপ্রকাশবাবু আপনার মত......

—রত্নকে কেন চিনতে পারলো না, এই তো বলবে ? তোমার মত জহুরীর চোখ হয়তো তার নেই। বলে লসিতা হাসলো।

সুপ্রকাশ সম্পর্কে এই প্রথম আলোচনা। অরুণ বললো—এমন একজন শিক্ষিত লোক হয়ে সুপ্রকাশবাবু এ কাজ কি করে' করলেন বুঝতে পারি নে।

—যা করবার শিক্ষিত প্রথায়ই করেছেন। চাপা গলায় দাঁত খিঁচিয়ে একটা জীবনের শান্তিকে কি ভাবে চেপে মারা হয় সে তোমরা বুঝবে না, বুঝবে আমার মত আধুনিক মেয়েরা।... অবিশ্যি পরের স্তরটায় ও একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

অরুণের মুখের' পরে ঘৃণার ভাবটা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো। কপাল কুঞ্চিত করে' এমন ভাবে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসলো, মনে হলো সুপ্রকাশ সম্বন্ধে অনেকগুলো কঠোর মন্তব্য তার ঠোঁটের কাছে এসে আটকে আছে।

লসিতা সেটা লক্ষ্য করে ঠোঁটের কোণে একটু বিজ্ঞতাসূচক হাসি টেনে বললো —তা বলে বাড়ীর আর সকলের মত তুমিও ভেবে নিও না, সে আস্ত একটা জানোয়ার। অন্ধের হাতী চেনার মত করে' মানুষ চিনতে গেলে ভুল করবে। এই আমি না হয়ে অন্য মেয়ে হলে হয়তো মানিয়ে নিয়ে জীবনটা বেশ কাটিয়ে দিত......তাই আমার মনে হয় মেয়েদের মানুষ করে না গড়ে মেয়ে করে গড়াই ভালো।

কিছুক্ষণ উভয়েই রইলো চুপ করে। সুপ্রকাশের প্রসঙ্গকে চাপা দেবার জন্যে অরুণ প্রশ্ন করলো—আচ্ছা লসিতাদি' বি-এ পাশ করে এম-এ পড়বেন তো ?

—বি-এ'ই পাশ করবো কিনা ঠিক কি। পড়তে আমার ভালো লাগে না...... জীবন-মরুভূমিটা পাড়ি দিতে মনকে শুধু উটের পা করে' তুললেই হয় না, জমার ঘরেও কিছু থাকা দরকার—যা নিয়ে বাঁচা যায়।...আচ্ছা অরুণ, সুপ্রকাশবাবু না হয় আমাকে চিনতে পারে নি, তুমি তো চিনেছ ; আমার মত কাউকে পেলে তুমি খুব সুখী হও, না ?

—যান্, কি যে বলেন। অরুণ লজ্জিত হয়ে জবাব দিল।

লসিতা মাথাটাকে একটা বালিশের উপর চিত করে' ছাতের দিকে দৃষ্টি রেখে বলতে লাগলো—তোমাকে কিন্তু আমার ভারি ভালো লাগে...যদি একটা পথও চোখের সুমুখে খোলা থাকতো—

ভয়, আনন্দ, লজ্জা ও গর্ব্ব সংমিশ্রিত এক জটিল অনুভূতি নিয়ে অরুণ স্তব্ধ হয়ে চেয়ারে বসে রইলো। নিজের কানে শুনতে পাচ্ছিল সে নিজের বুকের স্পন্দন। অনেকটা সময় কেটে গেল কোন কথা না বলে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে, ঘরের মধ্যে হালকা অন্ধকার, অরুণের কম্পিত শীতল একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে লসিতা বললো—আইন গড়বার ক্ষমতা না থাক, আইন অমান্য করবার ক্ষমতা আমাদের আছে—

অদ্ভুত এই পরিস্থিতির মধ্যে বসে লসিতার মনে হলো পুরুষের ব্যঙ্গাকৃতির হাত ধরে সে আজ কদর্য্য এক অভিনয় করে চলছে।

লসিতার প্রবল অপরাজেয় আকর্ষণের কাছে অরুণ তৃণের মত গেল ভেসে। নিজের গতি-বেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যেন তার একেবারেই লুপ্ত হয়ে গেছে। প্রাণে তার ভয়, মনে তার উচিত অনুচিতের একটানা দ্বন্দ্ব। বন্ধুত্বের সাহস ও স্বাচ্ছন্দ্য আতিশয্যের গণ্ডিতে এসে ফেলেছে হারিয়ে। চূড়ান্ত প্রশ্রয়ের মধ্যে লসিতা এমন একটা স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রেখে চলে যার কাছে অরুণ নিজের অস্তিত্বকে বোধ করে পুতুলেরই মত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর। 'দি' শব্দটা ছেঁটে ফেলা দূরে থাক অনুরুদ্ধ হয়ে পর্য্যন্ত 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' উচ্চারণ করতে সে পারে নি। দিনের পর দিন শান্তিতৃপ্তিহীন মন তার নিরন্তর একটা পালাবার পথ খুঁজে ফিরতে লাগলো।—

সেদিন ঘরে ঢুকে অরুণ দেখলো লসিতা আরাম কেদারায় বসে নিবিষ্ট মনে তাকিয়ে আছে বাইরের দিকে। অরুণ এসে পাশে দাঁড়ালো, তার উপস্থিতি টের পেয়েও কথা বলা তো দূরের

কথা লসিতা একবার চোখ ফিরিয়েও দেখলো না। লসিতার মুখের ভাব লক্ষ্য করে কোন কথা উচ্চারণ করতে অরুণ ভরসা পেল না, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে' ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে গেল।

আগ্রহ ও আকাঙ্খা দ্বারা সমাচ্ছন্ন ছিল যে সমস্যা, আজ তা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সমস্তটা দিন লসিতা তারই সমাধানের পথ খুঁজে বেড়াতে লাগলো।—হয়তো এ কিছুই নয়, এ শুধু একটা সম্ভাবনা। কিন্তু সম্ভাবনা যদি সত্য হয় তার জন্যে প্রস্তুত তাকে হতেই হবে। এরই মধ্যে রয়েছে তার জীবনের স্বার্থকতা, ভবিষ্যাতের সম্বল। শুধু সম্ভাবনার উপরই সে তার দম্ভ, মান, পরিস্থিত ভবিষ্যৎ সব কিছু পণ করে বসবে। বিরাট এক পরীক্ষায় প্রবেশ করবার সঙ্কল্প নিয়ে লসিতা উঠে দাঁড়ায়। এ পরীক্ষায় প্রেরণার উদ্ভব শুধু তার অক্ষমতার লজ্জা থেকে নয়, এ প্রেরণা নিবিড়ভাবে মিশে আছে তার প্রাণশক্তির প্রতি বিন্দুতে বিন্দুতে।

কাগজ কলম টেনে নিয়ে লসিতা বসে গেল চিঠি লিখতে।—

পরের দিন সন্ধ্যায় দক্ষিণাবাবু বৈঠকখানায় বসে কাগজ পত্র দেখছেন, এমন সময় সুপ্রকাশ এসে প্রণাম করে' জড়সড় হয়ে এক পাশে দাঁড়ালো। প্রথমটা দক্ষিণাবাবু চিনতে পারেন নি, একটু লক্ষ্য করে চিনতে পারবার পরও যেন বিশ্বাস করতে পারলেন না। কিছুক্ষণ হতভম্বের মত সুপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। বসতে বলা দূরে থাকুক, কি প্রয়োজনে সে এসেছে তাও জানতে চাইলেন না।

সুপ্রকাশ কিছুটা সময় একভাবে দাঁড়িয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললো—লসিতা ভোরে এক-খানা চিঠি পাঠিয়েছিল দেখা করবার জন্যে.......বিশেষ নাকি জরুরী দরকার—

দক্ষিণাবাবু চমকে উঠে বিস্ময়ের সঙ্গে বললেন—লসিতা! লসিতা চিঠি পাঠিয়েছে.......কই আমাকে তো সে কথা বলে নি!

ভৃত্যকে ডেকে দক্ষিণাবাবু খবর পাঠালেন লসিতার কাছে। ভৃত্য ফিরে এসে জানালো, দিদিমণি জামাইবাবুকে ওপরে ডেকে পাঠিয়েছেন। দক্ষিণাবাবু কিছুই না বুঝতে পেরে শুধু বললেন—যাও, ওপরে যাও—

লসিতা সংক্ষিপ্ত ও সংযত অনুরোধের মধ্য দিয়ে সুপ্রকাশকে জানালো যে মাস কয়েকের জন্যে সে পশ্চিমে যাবে মনস্থ করেছে, সুপ্রকাশকেও তার সঙ্গে যেতে হবে। তার এই আকস্মিক খেয়ালের কারণ সম্পর্কে কারুর কোন প্রশ্নই কোন প্রশ্রয় পেল না—এ যাওয়াটা নাকি তার নিছকই খেয়াল, তবে সুপ্রকাশের অনুগমনের একটা প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা পরে সে সুপ্রকাশকে জানাবে। এতদিন পর অকস্মাৎ লসিতার তরফ থেকে এ অনুরোধই যথেষ্ট, তার কারণ খোঁজ করবার বা ঔচিত্যানৌচিত্বের বিচার করবার মত বিশেষ আগ্রহ সুপ্রকাশের মধ্যে দেখা গেল না; মানসিক কোন্ সংঘাতের ফলে লসিতার এ পরিবর্তন এবং আগ্রহ তা অবহিত হবার মত অবসর সুপ্রকাশ এখন পাবে সে জানে। জেদের বসে সুপ্রকাশ যা-ই করে থাক, মন তার অনুক্ষণই কামনা করছিল লসিতার সঙ্গ। লসিতার সঙ্গে রূপ-গুণ বিদ্যা-বুদ্ধি কোন দিক দিয়েই সুপ্রকাশের

দ্বিতীয় স্ত্রীর কোন তুলনাই চলতে পারে না। দৈনন্দিন জীবনে প্রতিপদে লসিতার তুলনামূলক শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করে' সুপ্রকাশ তার প্রাক্তন ব্যবহারের জন্যে প্রতিনিয়তই নিজেকে আজকাল ধিক্কার দেয়।

পরের দিনই সুপ্রকাশ নিল চার মাসের ছুটি। লসিতার এ দুর্বোধ্য খেয়াল আঘাত করেছিল দক্ষিণাবাবুকেই সব চাইতে বেশী; রওনা হবার মুখে লসিতা যখন তাঁকে প্রণাম করলো, দুঃখ এবং অপমানের মধ্যেও এতদিন পরে কন্যাকে প্রাণভরে আশীর্ব্বাদ করবার সুযোগ পেয়ে বৃদ্ধের অন্তর যেন তৃপ্তিতে ভরে উঠলো। সুপ্রকাশ যখন প্রণাম করতে এগিয়ে গেল দক্ষিণাবাবু মুখ ফিরিয়ে নিলেন। মীমাংসাতীত সমস্যায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে কন্যাকে তিনি বিদায় দিলেন।

তিন মাস পরের কথা। ক্লান্তিকর বিতৃষ্ণা ও বিস্বাদের মধ্য দিয়ে লসিতা পেল মাতৃত্বের প্রথম আস্বাদ—মন তার স্বার্থকতার আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। সে আজ আর প্রেয়সী রমণী নয়, আজ সে মহীয়সী নারী, দেহময় তার মাতৃত্বের বিরাট মহিমা। একটা অবলম্বন, একটু শান্তি খুঁজে বা'র করবার জন্যে আর তাকে বিশ্বময় হাতড়ে বেড়াতে হবে না, তারা আজ ধীরে ধীরে মূর্ত্ত হয়ে ফুটে উঠছে তার আত্মসত্তার অন্তস্থলে।

লসিতা কলকাতা ফিরে আসবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলো। সুপ্রকাশের ইচ্ছা ছিল ছুটিটা পুরোই কাটিয়ে যায়, কিন্তু লসিতা রাজি হলো না কিছুতেই; শেষ পর্য্যন্ত বাধ্য হয়েই রওনা হয়ে পড়বার জন্যে সুপ্রকাশকে প্রস্তুত হতে হলো।

লসিতাকে নিয়ে পুনরায় সংসার পাতবার যে প্ল্যানটা সুপ্রকাশ করেছে সেই একাধিকবার বলা প্ল্যান সম্পর্কে লসিতার কি মত স্পষ্ট করে' জানবার সময় এসেছে, তাই সারাটা পথ সুপ্রকাশ কেবল সে-আলোচনাই করলো। লসিতা ওখানেও যেমন 'দেখা যাবে', 'করা যাবে একটা কিছু' বলে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছে, সমস্ত পথটাও ঠিক তেমনি করেই দিল কাটিয়ে।

বাড়ীর গাড়ী অপেক্ষা করছিল ষ্টেশানে, দু'জন গিয়ে তাতে চেপে বসলো। গাড়ী চলছে, সুপ্রকাশ বললো—কই কিছুই তো বললে না, সে অনুযায়ী ব্যবস্থা তো আমাকে করতে হবে।

এক পাশের অপসৃতমান বাড়ীগুলোর দিকে চোখ রেখে লসিতা জবাব দিল—সময় তো পালিয়ে যাচ্ছে না, বলবো বই কি!

গাড়ী এসে থামলো লসিতাদের গেটের সুমুখে। লসিতা নেবে সুপ্রকাশকে ভেতরে রেখেই দরজাটা ঝপ্ করে দিল বন্ধ করে। বললো—আর একটা মেয়ের' পরে এতবড় অন্যায় করতে সাহায্য তোমাকে আমি করবো না......ড্রাইভার, বাবুজীকো কোঠি পৌঁছা দেও।......

বলে, সুপ্রকাশকে কোন কথা বলবার অবকাশ না দিয়ে বাড়ীর ভেতর গিয়ে প্রবেশ করলো। নমিতা হাসিভরা মুখে এগিয়ে আসতেই কথা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলো অরুণের খবর।—

অরুণ চাকরীর অজুহাতে বাড়ী ছেড়ে চলে গেছে—লসিতা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়লো। নিজের ঘরে ঢুকে আরাম কেদারাটায় গা এলিয়ে দিয়ে চক্ষু মুদে সে বসে পড়লো।

নারী

সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত

হে নারী, তোমার বক্ষে এত সুধা এল কোথা হোতে ;
কোন্ মধু মন্দাকিনী-স্রোতে !

ধমনীর অন্তরালে নিত্য তব কি রাগিণী বাজে,
সর্ব্বকালে ভুবনের কল্যাণের নানা ধারা-মাঝে ।
তোমার ছন্দের মাঝে কভু তুমি ব্যক্ত নাহি হও,
আপনার ছন্দ-মাঝে আপনি যে সদা স্তব্ধ রও ।
তোমার অন্তর মাঝে যে সুর-ঝঙ্কার সদা ঝরে,
উথলে আকুল সিন্ধু, চন্দ্র তার বক্ষ দেয় ভরে ;
অনাদি উর্ব্বশী তুমি রূপময়ী ছলনা মায়ার,
কান্ত কর রূঢ় আলো মিশাইয়া লাবণ্য ছায়ার ।
যুগযুগান্তের লোক পাদপদ্মে দেয় উপহার,
তুমি শুধু কটাক্ষেতে কীর্ণ কর হাস্য সুধাধার,
তোমার অঙ্গের আভা পদ্ম বনে সতত শিহরে ;
সূর্য্যের কিরণসম স্বর্গে মর্ত্ত্যে চঞ্চলি বিহরে ।
তুমি যে সৃষ্টির শক্তি, চিরন্তনী লীলাময়ী তুমি,
সবার হৃদয় মর্ম্ম অন্তঃস্থল সদা আছ চুমি ;
পাদপদ্ম বুকে রাখি তুমি দেবী আছ অন্তরালে,
তাইত ধমনী রক্ত নাচে সদা করতাল তালে ।
বাহিরে তোমারে দেখে আকর্ষণে যত ছুটে যাই,
উদ্বেগে ফিরিয়া আসি সেথা তোমা খুঁজিয়া না পাই ।
দেশ নাই কাল নাই যেথা রহ সর্ব্ব সাধারণী,
নিখিল মনুজ-চিত্ত-পদ্ম-মাঝে সদা সঞ্চারিণী ।
কোথাও রূপের গর্ব্বে ঝলমলি রয়েছ রূপসী,
কোথা দেখি রূপ নাই সবার অলক্ষ্যে আছ বসি ;
কোথা দেখি বিদেশিনী, ভাষা তব কিছু নাহি বুঝি,
তবু তুমি চিরন্তনী অর্থ তব কিছু নাহি খুঁজি ।

নিত্য প্রয়োজনে বাঁধা সর্ব্ব মানুষের যত ভাষা,
সেও না জানাতে পারে বক্ষের গভীর যত আশা।
রবির কিরণসম দেখি তোমা হিল্লোলে হাসির,
অনাদি সঙ্গীত সেথা নিত্যকাল বাজিছে বাঁশীর,
তোমার বক্ষের মাঝে রয়েছে সে চিরন্তন মোর পরিচয়,
সে ত মাত্র নহে দুদিনের সে ত কভু আজ শুধু নয়।
তাইত আমারে ছাড়ি করি যবে তোমার কল্পনা,
দেখি শুধু নারী তুমি নিত্য নিত্য নূতন ছলনা।
তোমারে লইয়া বক্ষে দেখি সদা একরূপ তব,
তাই ফোটে নানা দেশে কোটি কোটি রূপ লয়ে নব।
সর্ব্ব মানুষের হিয়া নিত্য তুমি মথিছ রূপসী,
হৃদয় সাগর হোতে চির কান্তা উঠিলে উর্ব্বশী।
তোমাতে আমার জন্ম, তুমি মোর দুগ্ধের শৈশব,
তুমি গো যৌবন-বন্ধু পূর্ণ করে আছ তুমি সব,
আনন্দেতে গর্ভে ধর, আনন্দেতে কর গো পালন,
যৌবনের বক্ষে তোল আনন্দের চঞ্চল প্লাবন।
সুখে দুঃখে সম রহ বার্দ্ধক্যের তুমি যে বিশ্রাম,
পুরুষের চিত্ত নিত্য বক্ষে তব লভিছে বিরাম;
সৃষ্টি স্থিতি লয় হয় যে আনন্দ মহোদধি হোতে,
মহীয়সী সেই শক্তি নবরূপে নিত্য তব স্রোতে।

সেজদা

অমলেন্দু দাশগুপ্ত

পুত্রের জন্য পিসিমা তাঁর ভাইকে পত্র দিলেন। গ্রাম ছাড়িয়া সেজদা একদিন সহরে চলিয়া আসিলেন। সেজদা এতদিন গ্রামের মাইনর স্কুলে বিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন। ফি ক্লাসে দুই বছর করিয়া কাটাইয়া পাকা ও পোক্ত হইয়া অবশেষে তিনি মাইনর ক্লাশ পার হইয়াছেন। গ্রামের স্কুলের সরস্বতীর শক্তিতে আর কুলাইতেছিল না, তিনি সেজদাকে ছাড়িয়া দিলেন, এবার পুত্র সহরের সরস্বতীর সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া আসুক এই মতলবে। কাজেই সেজদার সহরে আগমন হইল।

মফঃস্বলের সহর—গ্রামের ছেলেকে অবাক করিতে পারিল না। সেজদা দু'দিন ঘুরিলেন এবং এই সময়টুকু ব্যয় করিয়াই ছোট্ট সহরের অলিগলি সুদক্ষ সেনাপতির মত নখদর্পণে আঁকিয়া লইলেন। এবং পুরা সাত দিনের একটা সপ্তাহ পার হইল না, সেজদা সহরবাসীর প্রায় সকলের পরিচিত হইয়া গেলেন। আগুন কখনও কাপড়-চাপা থাকে না, সেজদাও নিজেকে চাপা থাকিতে দিলেন না।

সেজদা আলোর মতই প্রকাশধর্ম্মী। প্রথম রাত্রিতেই তাঁর পরিচয় পাইলাম—

উকীল পাড়ায় এই বাড়ীগুলি ছোট্ট একটী মাঠের তিনদিকে পাশাপাশি গা ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া অবস্থিত। মাঠটী নানা জনের নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। দিনের বেলা ছাগল-গরু-ভেড়া এখান হইতে ঘাস আহরণ করে; দুপুরে এক পাশে কামিনী ফুলের ঝাড়ের তলায় বসিয়া পাড়ার ঠাকুর-চাকরেরা তাস খেলে; বিকালের দিকে এটী পাড়ার ছেলেদের দখলে আসে; ফুটবল, হাডুডু, দৌড়দৌড়ি ইত্যাদিতে তারা ব্যস্ত হয়। গ্রীষ্মকালে রাত্রে যেদিন গরম অসহ্য বোধ হয়, সেদিন বয়স্ক উকীল বাবুরাও শয্যায় মেয়েমানুষ ফেলিয়া রাখিয়া এই মাঠে চেয়ার পাতিয়া বসেন, গরমের ধাক্কা সামলাইয়া কিছু ঠাণ্ডা হইয়া অন্দরে ঢোকেন।

এই মাঠের পাশেই বাহিরের দিকের একটী ঘরে বাড়ীর ছেলেরা আমরা অধ্যয়ন, শয়ন ইত্যাদি আবশ্যকীয় কর্ম্ম করিতাম। সেজদা এই ঘরেই জায়গা পাইলেন এবং আমার সঙ্গে একই শয্যার অংশীদার হইলেন। সেজদার স্বাস্থ্য বড় বেশী ভালো ছিল এবং শরীরে শক্তিও প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল। গ্রামের ভেজালশূন্য আলোবাতাসে যথেষ্ট চড়িয়া বেড়াইবার ফলেই দেহ সম্বন্ধে তিনি এমন সম্পত্তিবান্ হইয়াছিলেন। আমার চাইতে তার প্রয়োজন বেশী, এই বোধে বিছানার বারো আনা সেজদাকে ছাড়িয়া চারি আনার মালিক আমি একপ্রান্তে অপরাধীর মত পড়িয়া থাকিতাম।

প্রথম দিনেই লক্ষ্য করিলাম যে, গ্রামবাসী এই লোকটীর বড় সজাগ ঘুম। এবং নিদ্রার এই সজাগ স্বভাবের জন্য সারারাত্র অপরের জাগিয়া থাকিতে হয়। আশা করিয়াছিলাম, শরীর যখন এত ভালো, তখন ভাল মানুষের মত বিছানায় গা দিয়াই ঘুমাইয়া পড়িবেন এবং ভারী নিঃশ্বাসের শব্দে আমার ঘুম বড় জোর কিছুক্ষণ ঠেকাইয়া রাখিতে পারিবেন। ঠেকাইয়া তিনি রাখিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু শ্বাসপ্রশ্বাসের হাঁপের-শব্দে নয়, অন্য ভাবে। তাহাই বলিতেছি।—

আলো নিভাইয়া ঘর অন্ধকার করিয়া লইয়া শুইয়া পড়িয়াছি কিছুক্ষণ হয়। ঘরের মধ্যে কি একটা খচ্ খচ্ শব্দ শুনিয়া সেজদা কাণ খাড়া করিলেন। দিনে পৃথিবীর বস্তুগুলি রূপ নিয়া দেখা দেয়, রাত্র হইলেই অন্ধকারে রূপ খুলিয়া ফেলিয়া তারা নগ্ন হইয়া শব্দময় শরীরে ঘুরিয়া বেড়ায় স্রোতের মত।—এই খচ্ খচ্ শব্দটা কিসের? সেজদা আমাকে কহিলেন—"ইঁদুর বোধ হয়।"

—"হুঁ", বলিয়া সংক্ষেপে সায় দিলাম।

বিছানা নড়িয়া উঠিল, সেজদা অতি সন্তর্পণে বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া গেলেন। চোখ মেলিয়া দেখিলাম, গুটি গুটি পা ফেলিয়া তিনি আগাইয়া গেলেন। এর বেশী দেখিতে পাইলাম না, বা তিনি কি করিতেছেন অন্ধকারে তাঁর কার্য্যের কোন কিছু অনুসরণ করিতে পারিলাম না। তবে অনুমানে বুঝিলাম, তিনি ঘরের মধ্যে কোথাও বসিয়া পড়িয়াছেন।

কয়েক মিনিট পরে থপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গেই সেজদার গলা শুনিলাম—"এই, লণ্ঠনটা ধরা তো!"

মুঠোর মধ্যে একটা ইঁদুর ধরিয়া সেজদা দাড়াইয়া আছেন।

উঠিয়া আজ্ঞামত লণ্ঠন জ্বালাইয়া ঘর আলো করিলাম। দেখি, মুঠোর মধ্যে একটা ইঁদুর ধরিয়া সেজদা দাঁড়াইয়া আছেন। জলের মধ্যে হাত ডুবাইয়া দিয়া খাল-বিল পুকুর হইতে মাছ তুলিতে দেখিয়াছি, এ ভাবে অন্ধকারে হাত চালাইয়া ইঁদুর শিকার এই প্রথম দেখিলাম। সেও নয় গেল, হস্তকৌশল তাঁর অদ্ভুত এও না হয় মানিয়া নিলাম। কিন্তু লোকটা অন্ধকারেও কি চোখে দেখিতে পান!

—"একটু দড়ি দে তো। শক্ত সূতো হলেও হয়।"

কাপড়ের পাড় ছিঁড়িয়া তাঁর আজ্ঞামত দড়ি যোগাইলাম। কহিলেন—"এ জায়গাটা ভালো করে বেঁধে দে দেখি, শক্ত করে বাঁধিস কিন্তু।"

ইঁদুরের পিছনের দুই ঠ্যাং সেজদা টানিয়া বাহির করিয়া বন্ধনের স্থান নির্দ্দেশ করিলেন। কথামত দুই ঠ্যাং-এ বেশ শক্ত করিয়া গিঁঠ দিয়া বাঁধিয়া দিলাম। সেজদা দড়িটী বেড়ার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিলেন, ইঁদুরটী নিম্নমুখ হইয়া দড়ির অপর প্রান্তে শূন্যে ঝুলিয়া রহিল। পরে আমাকে কহিলেন—"আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় চুপ করে বসে থাক। ডাকলেই আলো জ্বালাবি—বুঝেছিস্?" বলিয়া তিনি টেবিল ও আলমারীর ফাঁকে বসিয়া পড়িলেন।

অন্ধকারে সেজদা এই ভাবে সারারাত্র ইঁদুরের জন্য ওৎ পাতিয়া বসিয়া থাকিবেন, আর কখন আলো জ্বালাইবার হুকুম আসিবে সে প্রতীক্ষায় আমাকে বিছানায় জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে—এ ব্যবস্থা আমার মোটেই ভালো লাগিল না; তবু যেন কেমন একটা কৌতুক বোধ করিতেছিলাম। জীবনে এই ভাবে রাত্রে নিজের ঘরে চোরের মত বসিয়া থাকিয়া ইঁদুর-শিকার করা—এ আমার অভিজ্ঞতার বাহিরে।

এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিল, খচ্ খচ্ শব্দ আর শোনা গেল না। ঘুমও আসিতেছিল। কহিলাম,—"শোও এসে, আজ আর আসবে না। কালকে আবার ধ'রো।" আলো আগেই নিভাইয়াছিলাম, শুইয়া পড়িলাম।

সেজদা আসিলেন না, উত্তরও কিছু দিলেন না। মৎস্য-শিকারীর ধৈর্য্য নিয়া তিনি অন্ধকারে চোখ পাতিয়া বসিয়া রহিলেন। ইঁদুরেরা সেজদার হাতে ধরা দিবার জন্য বোধ হয় আর কোন আগ্রহ দেখাইতে রাজী ছিল না। মিনিট পোনের পর বিছানা নড়িয়া উঠিল, মশারি ফাঁক করিয়া সেজদা ভিতরে আসিলেন, চোখ জড়াইয়া আসিতেছিল, সরিয়া তাঁর বারো আনার জায়গায় চৌদ্দ আনা বিছানা ছাড়িয়া দিলাম। সেজদা কৈফিয়ৎ দিলেন—"আজ আর আসবে না।"

কহিলাম—"নাও, এখন ঘুমোও।"

কিছুক্ষণ বেশ নির্ব্বিঘ্নেই পার হইল। সেজদা ঘুমাইয়াছিলেন কিনা জানি না, কিন্তু আমি প্রায় সুষুপ্তি ছুঁই ছুঁই হইয়াছিলাম। হঠাৎ ধাক্কা খাইয়া জাগরণের উপর আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িলাম।

সত্য কথাই বলিব, এ জন্য সেজদাকে দোষী করিতে পারা যায় না।—মাঠে আমাদের ঘরের শিওরের কাছেই শেয়াল ডাকিয়া উঠিয়াছে—হুক্কা-হুয়া। সেজদা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন—যেন মৃত প্রিয়জন ফিরিয়া আসিয়া তাঁর নাম ধরিয়া বহুদিন পরে অকস্মাৎ ডাক দিয়াছে। যে ডাকে সেজদা এমন করিয়া উঠিয়া বসিয়াছেন এবং আনমনা হইয়াছেন, সে ডাকেই আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। এজন্য, কাজেই সেজদাকে দায়ী করিতে পারিলাম না।

সেজদা ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিলেন।

সেজদা বসিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন জানি না। তবে এটুকু বুঝিলাম যে এ বস্তু তিনি এখানে আশা করেন নাই। গ্রামেই ইহারা যাম-ঘোষণা করিরা থাকে, সহরেও যে রাত্রের প্রহর গণনা করিতে আসিবে—এ সেজদার কল্পনার অতীত।

সেজদা বলিলেন—"এ্যাঁ, শেয়াল!"

কাকে বলিলেন বুঝা গেল না, হয়ত বা নিজের অবিশ্বাসী মনকেই বলিয়া থাকিবেন।—এই সহরের পাশেই গ্রাম-জঙ্গল মাঠ, সেখান হইতেই এই শৃগাল রাত্রে খাদ্য অন্বেষণে সহরে চলিয়া আসে, চোর-লম্পট ইত্যাদির ন্যায় সহরে রাত্র বাস করিয়া ভোরের দিকে নিজ নিজ আস্তানায় ফিরিয়া যায়। তাদেরই একজন আমদের প্রায় শিওরের কাছে ডাক দিয়া উঠিয়াছে—হুক্কা-হুয়া।

শুনিয়া পাড়ার কুকুরগুলি যে যেখানে ছিল ডাকিয়া উঠিল এবং শব্দ লক্ষ্য করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মাঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। শেয়াল যেখানে দাঁড়াইয়া ডাকে, সেখানেই সে গাছের মত ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিবে—তার সম্বন্ধে এ রকম কোন কথা শুনি নাই।

শেয়াল কখন কোথায় সরিয়া পড়িয়াছে তার ঠিক নাই, অথচ কুকুরগুলি মাঠে আসিয়া জটলা করিয়া সমস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। বোধ হয় ভীরু পলাতকের পিছনে এতগুলি কণ্ঠের ধিক্কারধ্বনি পাঠাইয়া তারা তাকে ফিরাইয়া আনিবার দুরাশা মনে মনে পোষণ করিতেছিল। মানীর অপমান বজ্রাঘাত তুল্য সন্দেহ নাই—কিন্তু ধিক্কারে শৃগালের সম্মানে চেতনা ফিরিয়া আসিবে, সে কথা কোন পুঁথিতেই লেখা নাই।

দিনের বেলা ছেলেদের দখলে মাঠ থাকে—রাত্রিতে কুকুরগুলি মাঠ আয়ত্তে পাইয়া তাদের চেয়ে বেশী দাপাদাপি করিয়া ফিরিতে লাগিল, আর চীৎকারে রাত্রিটাকেও ব্যস্তসমস্ত করিয়া তুলিল।

মাঠের ধৈর্য্য অসীম, এতে তার হয়তো কিছু যায় আসে না। কিন্তু জ্যাঠামহাশয় মাঠ নন, আর কুত্তার চীৎকার তিনি সুমধুরও মনে করেন না। ও-ঘরে তাই জ্যাঠামহাশয়ের গলা শোনা গেল, তিনি বিছানায় থাকিয়াই কুকুর খেদাইতেছেন—"দূর—দূর!"

সেজদা শুইয়া পড়িয়াছিলেন, আমার কানের কাছেই তিনি স্বগত মন্তব্য করিলেন—"শালা কুকুরের জ্বালায় দেখছি ঘুমাবার যো নেই।" বলিয়া মশারি তুলিয়া বিছানা হইতে নামিয়া পড়িলেন। দরজা খোলার শব্দও পাইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোথায় যাচ্ছ?"

—"আসছি।"

মাঝে মাঝে এক একটা কুকুর কেঁ-উ করিয়া উঠিতেছিল। অনুমানে বুঝিলাম সেজদা অন্ধকারে লক্ষ্যভেদ করিতেছেন। রাস্তার পাশেই খোয়া-ভাঙ্গা স্তূপ করিয়া রাখা ছিল, সেখান হইতে আবশ্যক মত আহরণ চলিতেছে বুঝিলাম। আমাদের বেড়ার পরও লক্ষ্যভ্রষ্ট ঢিল কয়েকটা আসিয়া পড়িল। ওদিকের নবীনবাবু উকীলের বৈঠকখানা ঘরের টিনের বেড়ার 'পরই বেশী পড়িতে লাগিল—শব্দের সংখ্যা বিছানায় থাকিয়াই গণিতেছিলাম।

অতি সত্বরই কুকুরের ডাক বন্ধ হইল। ঘরে যে লোক ইঁদুরের খচ্‌খচ্‌ শব্দ বন্ধ করিতে পারেন, মাঠে তিনি কুকুরের ঘেউ-ঘেউ বন্ধ করিতে পারিবেন এ আশ্চর্য্য কিছু নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য তাঁর স্বভাব ও উৎসাহ—যার তাড়নায় রাত্রিবেলা বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে হয়, এবং অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়িয়া কুকুর খেদাইয়া ফিরিতে হয়।

দরজা বন্ধ করিবার শব্দ তন্দ্রার মধ্যে শুনিতে পাইলাম। যুদ্ধবিজয়ী তবে ফিরিলেন? সেজদা পাশে আসিয়া শুইয়াছেন। পাড়াটা এতক্ষণে আবার শান্ত নিস্তব্ধ রাত্র ফিরিয়া পাইল।

কিন্তু এ নির্ব্বিঘ্ন নিশীথ শান্তি বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। সেজদার কণ্ঠস্বর কানের কাছে শুনিতে পাইলাম—"শালারা আবার ফিরে এসেছে" সদ্য ঘুমভাঙ্গা বুদ্ধি প্রথমটা ধরিতে পারে নাই, পরে বুঝিলাম, শালারা মানে কুকুরগুলি। সেজদা উঠিয়া পড়িয়াছেন, দরজা খুলিয়া সন্তর্পণে বাহির হইয়া পড়িয়াছেন।

তারপর—ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিল। তেমনি কেঁউ শব্দ, তেমনি বেড়ার উপর ভারী ঢিলের সশব্দে পতন, ক্লান্তিহীন যোদ্ধার তেমনি খোয়ার স্তূপ হইতে যুদ্ধোপকরণ আহরণ চলিতে লাগিল। বুঝিলাম, সারারাত্র আজ এই খেলাই চলিবে। পানা ঠেলিয়া দিলে পুকুরের জল দেখা যায় বটে, কিন্তু খানিক সময়ের জন্য শুধু। আবার পানা ফিরিয়া আসিয়া আগের মতই জল ঢাকিয়া লয়। ঢিল ছুঁড়িয়া সেজদা মাঠটাকে কুকুরমুক্ত করেন, রাত্রির গভীর শান্তি তখন থমথমে হইয়া দেখা দেয়। কিন্তু সেজদা ফিরিয়া শয্যায় আসিতে না আসিতেই আবার উহারা মাঠে ফিরিয়া আসে, রাত্রের নৈঃশব্দের উপর আগের মতই আবার শব্দের আচ্ছাদন নামে।—আমার চোখেও ঘুম নামিতেছে।

এক সময়ে সেজদা ফিরিয়া আসিলেন, সেই সঙ্গে ফিরিয়া আসিল আমার আর একবার জাগিবার সৌভাগ্য। বালিশে মাথা দিয়া তিনি বলিলেন—"এবার পাড়া ছাড়িয়ে পার করে দিয়ে এসেছি!"

—"ভালোই করেছ, এখন ঘুমোও দেখি।"

সেজদা হয়তো সত্য কথাই কহিয়াছেন। রাত্রিবেলা কুকুরের পিছনে তাড়া করিয়া পাড়া হইতে খেদাইয়া তাদের হয়তো বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াই তিনি আসিয়াছেন। কিন্তু পাড়ার কুকুর পাড়ায় ফিরিয়া আসিবার রাস্তা চিনিবে না—এ তিনি কেন মনে করিলেন!

মিনিট দশেক ভালোই কাটিল। শুধু ইতিমধ্যে তিনি একবার জানিতে চাহিয়াছিলেন—"মশা ঢুকেছে নাকি রে?"

—"না, মশা ঢুকবে কোত্থেকে। আরও কয়েকবার এ রকম মশারি তুলে যাও—" কথা শেষ করিলাম না। বক্তব্য যতটুকু হইয়াছে, তাতেই মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিয়াছি, বিশ্বাস হইল। সেজদা চুপ করিয়াই রহিলেন। উত্তর দিতে গিয়া মন যেটুকু উত্তপ্ত হইয়াছিল, তা ঠাণ্ডা হইবার পথে আসিতে আসিতে ভাবিতে বাধ্য হইল—আচ্ছা মানুষের পাল্লায় পড়িয়াছি। সারারাত্র ইঁদুর,

কুকুর ইত্যাদি খেদাইবেন, আর এদিকে যে আমাদের ঘুমগুলিও খেদানো হয়—এ তাঁর খেয়ালই নাই। কাল জ্যাঠামশায়কে বলিয়া তাঁর এই নবাগত ভাগ্নের জন্য পৃথক্ শয্যার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নইলে বাধ্য হইয়াই আমাকে গুড়াকেশ হইতে হইবে দেখিতেছি। জানি, লক্ষ্মণ চৌদ্দ বছর একপলক ঘুমও চোখে চাখিয়া দেখে নাই, কিন্তু সে উদাহরণে আমি উৎসাহিত হইতে পারিলাম না। আজ রাতটা কোনমতে কাটাইয়া উঠিতে পারিলেই হয়।—

পাড়ার কুকুর পাড়ার মাঠে ফিরিয়া আসিয়াছে—শব্দ করিয়া ডাকিয়া প্রচার করিল।

কানের কাছে শুনিলাম—"আচ্ছা।" সেজদা মশারির বাহির হইয়াছেন। দরজা খুলিবার শব্দ শুনিলাম। আচ্ছা, ঐ যে 'আচ্ছা' বলিয়া একটুখানি শব্দ উচ্চারণ করিলেন—তাতে সে জদা কি বুঝাইতে চাহিলেন। যাক্ গে ছাই—তবে তাঁর সঙ্কল্পের দৃঢ়তার একটা ছাপ আমার মনে রাখিয়া গেলেন। তাহা লইয়াই স্বপ্নের পথ ধরিয়া ঘুমের দিকে আগাইয়া চলিলাম।

কতক্ষণ গিয়াছে জানি না। হাতের ঠেলায় জাগিলাম। তখন পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়গুলি ভালো করিয়া সজাগ হয় নাই—শুধু এটুকু সম্বন্ধে সচেতন হইলাম যে সেজদা আমাকে ডাকিতেছেন। জড়তা কাটিয়া গিয়াছে, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনের যোগ হইয়া গিয়াছে, শুনিলাম—"ম্যাচ্‌টা কোথায় রেখেছিস্, খুঁজে পাচ্ছি না।"

হাত বাড়াইয়া শিওরের কাছে টেবিলের নিভৃত কোণ হইতে ম্যাচটা উদ্ধার করিয়া দিলাম।

সেজদা লণ্ঠন জ্বালাইয়া নিয়া কহিলেন—"একটু ওঠ দেখি।"

অনিচ্ছায় উঠিতে হইল। নিতান্ত দরকার না পড়িলে সেজদা আলো জ্বালিয়া এমন ভাবে ডাকিতেন না বুঝিয়াই উঠিয়া পড়িলাম।

দেখি, সেজদা জলে ভিজিয়া আসিয়াছেন, ভিজা কাপড় হইতে জল ঝরিতেছে। হাতে খানিকটা ছেঁড়া ন্যাকড়া।

কহিলেন—"আইডিন আছে? দে তবে।"

"আগে কাপড় ছেড়ে নেও,"—বলিয়া আলমারীর ভিতর হইতে আইডিনের ছোট্ট শিশিটা বাহির করিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি হয়েছে? আইডিন কেন?"

উত্তরে তিনি ডান পায়ের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইলেন, হাঁটুর নীচে একটা জায়গা হইতে রক্ত বাহির হইয়া পা ভিজিয়া গিয়াছে, তখন রক্ত পড়া বন্ধ হয় নাই। আমাকে কহিলেন—"আর দরকার নেই, তুই শুগে যা।" কিন্তু শুইতে যাইতে পারিলাম না। দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম।

সেজদা কাপড় বদলাইয়া লইলেন। ন্যাকড়া দিয়া ক্ষত মুছাইয়া আইডিন মাখাইয়া লইলেন। আইডিনের কামড়ে মুখ সামান্য কুঞ্চিত করিয়া সহিয়া গেলেন। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করিয়া মশারি তুলিয়া বিছানা ঝাড়িলেন, হাতে হাওয়া করিয়া মশক সরাইলেন। কহিলেন—"যা, ভিতরে যা।"

আজ্ঞামত ভিতরে গিয়া চীৎ হইয়া শুইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। মশারি ফেলিয়া ধারগুলি ভালো করিয়া গুঁজিয়া লইলেন। 'পরে লণ্ঠনটা নিভাইয়া সেজদা ভিতরে আসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কেমন ক'রে হোল?"

—"কুকুরে কামড়েছে।"

—"কুকুরে কামড়েছে? কেমন করে কামড়ালে?"

কেমন করিয়া কুকুরে কামড়াইয়াছে সেজদা সংক্ষেপে বলিলেন। সেই কেমন-করিয়া ব্যাপারটা এই—

কুকুরকে তাড়া করিয়া পাড়ার বাহির করিয়া দিবার পলিসি ফলপ্রদ না হওয়ায় সেজদা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করেন। স্থির করিলেন যে, একটা কুকুরকে ধরিয়া এবার এমন শিক্ষা দিবেন যা দেখিয়া বাকীগুলিও শিক্ষালাভ করিবে। তাতেই স্থায়ী ফললাভের সম্ভাবনা আছে।

পিছনের দুই ঠ্যাং ধরিয়া কুকুরটাকে তিনি হ্যাচড়াইয়া টানিয়া নিয়া চলিলেন।

এই মতলবে বিস্তর অনুসরণ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া একটী বড় কুকুরকেই সেজদা ধরিয়া ফেলিলেন। পিছনের দুই ঠ্যাং ধরিয়া কুকুরটাকে তিনি হ্যাচড়াইয়া টানিয়া নিয়া চলিলেন। মাঠের পরেই রাস্তা, রাস্তার ও ধারেই পুকুর, পুকুরের কোণায় মিউনিসি-প্যালিটির কেরোসিনের আলো মাথায় লইয়া যে পোষ্ট খাড়া আছে, যে তার সন্নিকট ঘাট—তাহাই সেজদার গন্তব্য স্থান। জায়গাটায় খানিক আলোও আছে।

পুকুরে চুবাইয়া জল খাওয়াইয়া কুকুরকে শায়েস্তা করিবার মানসে সেজদা ওটাকে ঠ্যাং ধরিয়া টানিয়া হেচ্ড়াইয়া সেখানে নিয়া আসিলেন। সারা পথ কুকুরটা চীৎকার করিয়া সেজদার কাজের প্রতিবাদ করিয়াছে। পিছনের দিকটা মাটী হইতে আল্‌গা হইয়া অপরের অধিকারে রহিয়াছে, এই অবস্থায় সেই অপরের আকর্ষণে মুখ সম্মুখে রাখিয়া পিছনের দিকে আগাইয়া পড়িতে হইতেছে—কুকুরটীর এ মোটেই আরামপ্রদ মনে হইতেছিল না। প্রতিবাদ করিল—কোন ফল হইল না, ঠ্যাং মুক্ত করিতে চেষ্টা করিল—তাতেও ফল হইল না, ফল হইবার কথাও নহে, যে কঠিন মুঠা যেন পুলিশের হাতকরা।

কিন্তু সেজদা যখন অগ্রে নিজে পার হইতে নীচে নামিয়া পরে সঙ্গীকে সেদিকে টানিতে লাগিলেন, তখন নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কুকুর সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িল। হঠাৎ তার চীৎকার

ভয়ানক উচ্চ হইয়া উঠিল এবং ঠ্যাং দু'টা ছুটাইয়া লইবার জন্য শরীরে অত্যধিক ক্রিয়াশক্তি দেখা গেল। চীৎকারে সেজদা আরও চটিয়া গেলেন।

"আয় শালা"—বলিয়া এক হেচ্‌কা টানে তাকে জলের কিনারায় আনিয়া ফেলিলেন।

আত্মরক্ষার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিতে অন্তিম-প্রচেষ্টা জাগিল, মরিয়া হইয়া শরীর ও ঘাড় বাঁকা করিয়া কুকুর ঘেঁ-ং করিয়া সেজদার ডান পা কামড়াইয়া ধরিল।

বাঁ পায়ে চাপিয়া ধরিয়া উপর নীচ দুই চোয়ালের ফাঁক হইতে সেজদা হাতের জোরে ঠ্যাং কাড়িয়া লইলেন। তারপর পূর্ব্বের মত পিছনের দুই ঠ্যাং ধরিয়া সেজদা নিজেই হাঁটুজলে নামিলেন এবং শেষে সঙ্গীকেও সেখানে নামাইয়া লইলেন।

এর পরে চলিল জলযুদ্ধের পর্ব্ব। বর্ণনা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"কুকুরটা মরে নি তো?"

—"না...মরেছে! মরার মত পড়ে আছে, এতক্ষণ হয়তো উঠে পালিয়েছে।"

শুইয়া শুইয়া সেজদার স্বভাবের কথা ভাবিতেছিলাম। এ পৃথিবীতে কত রকমের লোকই যে আছে, তার অন্ত নাই। কিন্তু সেজদার স্বভাবের লোক আর আছে কিনা জানি না।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ কি, উঠছ যে?"

—"বড় জ্বালা করছে, যাই বাইরে বাতাসে একটু ঘুরে আসি। চারটা দাঁতই ছিদ্র হয়ে বসেছে। তুই ঘুমা।"—বলিয়া মশারি তুলিয়া সেজদা শয্যা হইতে নামিলেন এবং দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পায়ে জ্বালা হওয়া অসম্ভব নয়। বাতাসেও হয়তো জ্বালা কমিতে পারে। কিন্তু আমার কেন জানি মনে হইল যে, শুধু পায়ের জ্বালাতেই সেজদা বাহির হন নাই, মনের কোণে আরও কিছু তাঁর ছিল যা গোপন রাখিয়াছেন। কিন্তু স্বস্তির থাকিতে পারিলেন না। কুকুরটা এতক্ষণে উঠিয়া চলিয়া যাইবার মত শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে, না সত্যই মরিয়া গেল—না জানিয়া হয়তো সেজদা ঘুমাইতে পারিতেছিলেন না।

সেজদা সত্বর ফিরিয়া আসিলেন, আসিয়াই কহিলেন—"মরে নি রে, উঠে পালিয়েছে।" স্বরে মুক্তির আনন্দ প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন।

কহিলাম—"শোও এসে।"

একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার এর পর হইতে দেখা যাইত। সেজদাকে দেখিলে বা তাঁর গলার আওয়াজ পাইলে পাড়ার কুকুর পালাইয়া অদৃশ্য হয়।

সোভিয়েটে শ্রেণী বৈষম্যের সমাধান

মহেন্দ্র নাথ

সমগ্র দুনিয়ায় জাতীয় জীবনের অভ্যুন্নতির পথে সোভিয়েট রাশিয়ার দান অপরিসীম। যেখানে জারের আমলে প্রায় দেড়শ বিভিন্ন জাতি এবং দু'শ বিভিন্ন ভাষার প্রচলন ছিলো, সেখানে আজ শুধু একটী মাত্র জাতি—আর সেই জাতিকে মাতিয়ে রেখেছে একটী মাত্র সুর, একটী মাত্র আদর্শ, একটী মাত্র চিন্তাধারা! রাশিয়ার বঞ্চিত, অত্যাচারিত জাতীয় জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সোভিয়েট যে কৃতিত্ব এবং কর্ম্ম তৎপরতার পরিচয় দিয়েছে, তা বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার! একদিন যেখানে দারিদ্র্য আর অজ্ঞানতার একচ্ছত্র অধিকার ছিলো, আজ সেখানে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রচলন হয়েছে—বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চলছে, নানাবিধ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অবিমিশ্র দুঃখ-কষ্ট, শঙ্কা-সংশয়ের মাঝে, যাদের দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর কেটে গিয়েছে, আজ তাদের দেহে মনে, তাদের শোণিত স্রোতের প্রতি রক্ত কণিকায় নূতন প্রেরণা জন্মলাভ কোরেছে—তারা নবতমরূপে নিজেদের প্রকাশ করতে পেরেছে, অনগ্রসর জাতির ধাপের পর ধাপ উন্নতির সাথে সাথে রাশিয়ার শক্তি অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পেয়েছে, বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্পে, সাহিত্য ও চারুকলার মণিকোঠায় সে সমস্ত জাতির দান বর্দ্ধিত হয়ে চলেছে।

বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে লেনিন বোলেছিলেন—To leave even a few representatives of the bourgeoisie in the government, to leave such notorious kornilovistz in power...is to throw the door wide open to famine and inevitable economic catastrophe, which the capitalists are intentionally accelerating and intensifying—" আবার তিনি বোলেছিলেন—"The Soviet Government must immediately proclaim the abolition of private property in the land of estate without compensation, and place this lands under the control of peasant committees, pending the decision of the constituent assembly."

তারপর ১৯১৭ সালের ১৪ই নবেম্বর শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্যগণকে সম্বোধন কোরে বোললেন—"If power is in the hands of the Soviets, the land-owners' lands will immediately be declared the property and heritage of the whole people. সেই বৎসরের মে মাসে "সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক লেবার পার্টি"র কর্ম্ম তালিকায় তিনি প্রচার কোরলেন—"The constitution of the Russian Republic must ensure:—The sovereignity of the people; the supreme power of the

state must be vested entirely in the people's representatives, who shall be selected by the people and be subject to recall at any time."

অক্‌টোবার এবং নবেম্বার বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব্বে যে আদর্শ, লেনিন রাশিয়ার সমস্যা-পূর্ণ এবং বিঘ্নসঙ্কুল জাতির সম্মুখে ধরেছিলেন, সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে রুশিয়েরা তাঁর স্বপ্নকে প্রত্যক্ষ বাস্তবে রূপ দিয়েছে। তারপর শাসন ব্যবস্থার ক্ষমতা যখন সোভিয়েট সরকারের হাতে এলো, তখন লেনিনের উপরোক্ত বিবৃতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়।

রাশিয়া যে অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অভিযান চালিয়ে সফলতা লাভ কোরেছিল, তার বিস্তৃত আলোচনা করা প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়—প্রবন্ধের উদ্দেশ্য কী কোরে সোভিয়েট সরকার শ্রেণী বৈষম্যের সমাধান কোরলেন তারই আলোচনা। অবশ্য ইহাও আমাদের মনে রাখতে হ'বে—শ্রেণী সংগ্রাম এবং শ্রেণী বৈষম্যের সমাধানের জন্যই লেনিন মার্কসএর Das capital হ'তে উপকরণ সংগ্রহ কোরে Class Warএর অবতারণা করেন। তার এই সূত্র অবলম্বন কোরেই সোভিয়েট সরকার শ্রেণী বৈষম্য সমাধান (Liquidation of classes) কোরতে সমর্থ হ'য়েছেন।

শ্রেণী বিভাগ ও তার ধ্বংস স্তূপের কালো যবনিকা ভেদ কোরে' সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র কী কোরে' একটা সম্পূর্ণ নূতন সমাজ গড়ে উঠলো, এ প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে জাগে। যুগ মানব লেনিনের State and Revolution বইখানাতে এ সমস্যা প্রাঞ্জলভাবে আলোচিত হয়েছে। লেনিন বোলেছেন :—

What does "the abolition of classes mean ? Everyone, who calls himself a socialist, recognizes this as the final aim of socialism, but not everyone realises its practical significance. Classes are large groups of people, which are distinguished from each other by their place in an historically determined system of social production, by their relation to the means of production, by their roll in the social organisation of labour..... Classes are groups of people, who can appropriate the fruits of each other's labour. Thanks to the variety of their positions in a given social order."

এতে স্পষ্টই বোঝা যায়, the abolition of classesই সোস্যালিজম্‌এর মূল নীতি। শ্রেণী বৈষম্যের অপসারণ ব্যতীত সোস্যালিজম্‌এর প্রতিষ্ঠা কিছুতেই সম্ভব হ'তে পারে না। সেইজন্য class distinction সোস্যালিজম্‌এর সাংঘাতিক শত্রু—এবং ইহাই যতো রকম অমঙ্গলের সৃষ্টি করে, তাই শাসনের ভার যখন সোভিয়েট সরকারের হাতে এলো, তখনই আরম্ভ হ'লো শ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভিযান—আর সেই সাংঘাতিক বিরুদ্ধতার মাঝে,

রাশিয়ায় কেবলমাত্র একটী জাতির পুনর্বিকাশ সম্ভব হ'লো। শ্রেণী বৈষম্যের ঐতিহাসিক ধ্য়া তুলে' যারা পরের রক্ত-জল-করা শ্রমের ফলটুকু আরামের সাথে ভোগ কোরে আসছিলো,—জাতীয় জীবনের সেই সব সুবিধাবাদী ধুরন্ধরদিগকে আজ সত্যিই রাশিয়া হ'তে নিশ্চিহ্ন কোরে দেয়া হ'য়েছে। শোষিত আর শোষক বোলে যে রাশিয়ায় কোনো জাতি নেই—ইহা অবিসংবাদী সত্য। তারপর দু'টি বিপ্লব এবং নিয়মতান্ত্রিক কর্ম্ম প্রণালী রাশিয়ায় এই স্বর্ণফল প্রসব কোরেছে। এরূপ সুশৃঙ্খলভাবে সেখানে শ্রেণী মিশ্রণ সম্ভব হ'য়েছে যে, আজ রাশিয়ায় কোনো পুঁজিপতি, কোনো ধনী কৃষক অথবা কোনো অর্থপিপাসু বণিক ব্যবসায়ীর নামগন্ধও নেই; আজ সেখানে সকলেই সমান—রাষ্ট্রে, সমাজে সকলেরই সমান অধিকার।

কিন্তু ইহাও একবারে মিথ্যা নয় যে, আজও রাশিয়ায় ধনতান্ত্রিক ব্যক্তি, স্বাতন্ত্র্যবাদ এবং উৎপাদন প্রণালীর ব্যক্তিগত অধিকার কিয়ৎ পরিমাণে বর্ত্তমান। সেই জন্যই সোভিয়েট শাসন ব্যবস্থা এমন আইন কানুনের সৃষ্টি কোরছেন—যাঁতে তারা অন্যের শ্রমের উপর জুলুম কোরে' তার ফলভোগ কোরতে না পারে। যদিও পারিবারিক স্বাতন্ত্র্যবাদ অদ্যাপিও রাশিয়ায় বর্ত্তমান তবুও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী, কৃষক এবং শ্রমিকশ্রেণীর মাঝে কয়েক বছর আগেকার শ্রেণী বৈষম্য বর্ত্তমানে রাশিয়া হতে চিরতরে অপসারিত করা হয়েছে। বর্ত্তমানে সমাজতান্ত্রিক কর্ম্মপ্রণালীর অনুসরণ কোরে সমবায় প্রথায় শ্রমিক ও কৃষকগণ সমস্ত সমাজের প্রতিভূ হিসেবে এবং সমস্ত সমাজের মঙ্গলের জন্য কাজ কোরে থাকে। সমাজতন্ত্রের নীতি অনুসারে উৎপাদন প্রণালী ব্যবস্থিত হওয়ায় কৃষকগণ সমষ্টিভূত ফার্ম্মে, সেই ফার্ম্মের উৎপাদক যন্ত্র পাতির সাহায্যে একত্রে কাজ কোরে থাকে। এ ছাড়া ট্রাক্‌টার প্রভৃতি অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্র M. T. S. (Machinery Tractor Station) এর মারফতে সর্ত্তাধীনে সমবায় প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, সোভিয়েট সরকারের অভিভাবকত্ব এবং তত্ত্বাবধান সমাজতান্ত্রিক কৃষি প্রণালীকে ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগিয়ে দিতেছে। কিন্তু কথা উঠতে পারে, এই অভিনব সমাজ ব্যবস্থার মাঝে সমবেত প্রণালীতে কাজ কোরে কি কোরে কর্ম্মীরা সমষ্টিভূত সামাজিক আয় হ'তে, তাদের নিজ নিজ লভ্যাংশ পেয়ে থাকে। উত্তরে বলা যায়—"the working class and the collectivistist peasants receive their share of the social income from the public, social and socialist income of society as a whole." সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্ত কোরতে পারি যে, সোভিয়েট ইউনিয়নে শ্রেণীমিশ্রণের অভিযান প্রায় সাফল্যের [illegible]পে উপনীত হয়েছে। শ্রেণী বৈষম্য অপসারণে লেনিনের বাণী "He, who will not work, neither shall he eat" আজ রাশিয়ায় অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হয়। কমরেড় ষ্ট্যালিন বোলেছেন—দু' একটা ব্যতিক্রমের কথা বাদ দিলে, রাশিয়ার সমগ্র জন সমষ্টি শ্রমিক, সমবায়ীকৃষক এবং বুদ্ধিজীবিদের নিয়েই গঠিত। সমাজতন্ত্র ব্যবস্থিত কর্ম্ম প্রণালীতে সমবেত ভাবে তারা কাজ করে এবং সামাজিক লভ্যাংশ হ'তে তাদের নিজ নিজ অংশ পেয়ে থাকে।

He, who will not work, neither shall he eat নীতির প্রতি লেনিন বিশেষ কোরে তাঁর সহকর্ম্মীদের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছিলেন। এই সাথে তিনি বিরুদ্ধবাদী স্বার্থালিপ্সুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভিযানের ব্যবস্থাও দিয়ে গেছেন। আজ অকুণ্ঠিত ভাবে এই কথা বলা যেতে পারে যে, সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরাট জনসমষ্টি স্ব স্ব শ্রমোৎপাদিত উপার্জ্জনের উপর নির্ভর কোরেই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যে সমস্ত নরনারী নিজেরা কোনো রকম পরিশ্রম না কোরে অন্যের শ্রমোৎপাদিত ফল বিলাসের, আরামের মাঝে ভোগ কোরে আসছিলো; সোভিয়েট ইউনিয়ন হ'তে, সে সমস্ত সুবিধাবাদী জাতীয় জীবনকে নির্ম্মূল কোরে দে'য়া হ'য়েছে! কারণ, তারা রাষ্ট্রের শত্রু, সমাজের শত্রু; সমষ্টিগত জাতীয়সংহতির ক্রমবিকাশের পথে তারাই একমাত্র বাঁধা।

সোভিয়েট ইউনিয়নে "From each according to his ability, to each according to his labour." নীতি প্রত্যক্ষ কর্ম্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হয়েছে। এই নীতি যে কেবল মাত্র ষ্টেট্ ফাক্টরীতেই নিয়োজিত হ'য়েছে তা নয়—এই নীতি সমস্ত সমবায় প্রতিষ্ঠানেও নিয়োজিত হ'য়েছে। সেখানে শ্রমঅধিকারবাদ নীতির উপরও যথেষ্ট জোর দে'য়া হ'য়েছে। স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে সমাজ কল্যাণ কামনায় প্রত্যেক নাগরিককেই কাজ কোরবার সুযোগ দেয়া হ'য়েছে। সোভিয়েট ইউনিয়নের সমাজতন্ত্রবাদ পল্লীগ্রামেও পরিপূর্ণভাবে সাফল্য লাভ কোরেছে। আজকাল সমবায় প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্ম্মী সমপরিমাণে শ্রমজীবনের ফলভোগ কোরে' থাকে। এবং এই সমবায়নীতি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে এক নিবিড় মিলনে আবদ্ধ কোরে গ্রাম্য জীবনের জাতীয় সংহতি এবং সংস্কৃতিকে উন্নত হ'তে উন্নততর গতিতে পরিচালিত কোরে আসছে।

রাশিয়ার যুগান্তরকারী সমাজতান্ত্রিক বৈপ্লবিক অভিযান এবং আনুষ্ঠানিক কর্ম্মপ্রণালী যদিও শ্রেণী-বৈষম্য দূরীকরণে সফলতা লাভ কোরেছে, তবুও Comrade Stetzki বোলেছেন—We must not forget that the process of abolition of classes has not yet been concluded, that the abolition of the classes is still proceeding.

একটা প্রশ্ন স্বভাবতই আমাদের মনে জাগে; অদ্যাপি শ্রমিক শ্রেণী বোলে একটা সম্প্রদায় রাশিয়ায় আছে, এই উক্তি সত্য কিনা? এবং বর্ত্তমানে রাশিয়ায় সর্ব্বহারা বোলে' কোন সম্প্রদায় আছে কিনা? অথবা রাশিয়ার শ্রমিক কর্ম্মীদের সর্ব্বহারা (Proletariat) বলা যায় কিনা? সোভিয়েট ইউনিয়নের শ্রমিকদের জাতীয় জীবন এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিপ্লবের পর এমন অত্যাশ্চার্য্যভাবে পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে যে, আমরা রাশিয়ার বর্ত্তমান শ্রমিকশ্রেণীকে কোনো মতেই প্রোলিটারিয়ান বোলতে পারি না। সমাজতান্ত্রিকগণ "an exploited class of wage-workers in a capitalist society"কে প্রোলিটারিয়ান বোলতেন; উৎপাদন প্রণালীতে তাদের কোনো অধিকার ছিল না—নগণ্য জীবন ধারণের জন্য তাদের কায়িক শ্রম পুঁজিপতি দস্যুদের নিকট বিক্রয় কোরতে হ'তো; কিন্তু ঘটনা স্রোতের দুর্নিবার আবর্ত্তে তাদের শোষিত

জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হ'লো। ঘটনা স্রোতের আবর্ত্তে পড়ে' সেই সর্ব্বহারার দল ক্ষমতা আয়ত্ত কোরল; ধনতন্ত্রবাদীদের জাতীয় জীবন হ'তে অপসারিত কোরে' ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামাজিক এবং জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত কোরল; নিজেরাই শাসন ব্যবস্থার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্বের ভার নিলো; এক কথায় তারা তাদের—সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব (Proletarian Dictatorship) প্রতিষ্ঠা কোরল। সুতরাং অতীত ও বর্ত্তমানে 'প্রোলিটারিয়ান'এর ব্যাখ্যার মাঝে পরিবর্ত্তন সাধিত হ'য়েছে। কাজেই এখন আমরা রাশিয়ার শ্রমিকদের কোনো মতেই 'প্রোলিটারিয়ান' (In old sense) বোলতে পারি না। আজ তারা সত্যিই বুর্জ্জোয়া দস্যুদের শোষণের কবল হ'তে চিরতরে মুক্ত; নতুন দিনের আলোর স্বপন আজ সত্যিই তাদের জাতীয় জীবনকে এক অভিনব লীলাচাঞ্চল্যে মাতিয়ে রেখেছে।

বর্ত্তমানে সোভিয়েট রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণীর প্রাধান্যই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। সোস্যালিজম্‌এর পরিপূর্ণ প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব এবং পরিচালনার ভার আজ তাদের উপরই ন্যস্ত—আর তাদের সাথে সম্মিলিত করা হ'য়েছে—রাশিয়ার কৃষক সম্প্রদায়কে। সুতরাং রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর বর্ত্তমান অবস্থা তাদের পূর্ব্ব অবস্থা এবং ধনতন্ত্রের দস্যুবৃত্তি সম্পন্ন অভিভাবকত্বে পরিচালিত শ্রমিক শ্রেণীর অবস্থা হ'তে সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

শ্রেণী বৈষম্য সমাধানে সোভিয়েট সরকার যে অদ্ভুত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবুও বর্ত্তমানে রাশিয়ায় সম্পত্তি বিভাগে একটু বৈষম্য দেখা যায়। প্রথমতঃ—The State or People's property form; দ্বিতীয়তঃ—The co-operative collectivist property form. এই বৈষম্যটুকু আমাদের মনে রাখতে হ'বে।

সুতরাং দেখা যায়, শ্রেণী বৈষম্য অপসারণে সোভিয়েট সরকার এখনও সাফল্যের শেষ ধাপে উঠতে পারেন নি। এবং পরিপূর্ণ সফলতা লাভ কোরতে হ'লে, সোভিয়েট সরকারের আরও অনেক দূর অগ্রসর হ'তে হ'বে। রাশিয়ার তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা করা হ'য়েছে এবং আশা করা যায় বর্ত্তমান পরিকল্পনায় রাশিয়া পরিপূর্ণ সফলতা লাভ কোরতে সক্ষম হ'বে। শ্রেণী বৈষম্য সমাধানের চরম সাফল্য সম্বন্ধে মহাত্মা লেনিন সিদ্ধান্ত কোরেছেন ঃ—

"It is clear that in order to abolish the classes completely, it is necessary not only to overthrow exploiters, the rich land-owners, and capitalists, not only to abolish their private property, but also to abolish every other form of private property in the means of production and country, but also the difference between town and country, but also the difference between men who perform physical labour and men, who perform brain work."

শ্রেণী বৈষম্য সমাধানের চরম অবলম্বনীয় পন্থা সম্বন্ধে লেনিন বোলোছেন যে, ইহা—"Is a protracted business. In order to attain it, a tremendous step forward in the development of productive forces is necessary and we must overcome the resistance (often passive, particularly obstinate and particularly difficult to counter act) of the innumerable remnants of the small scale production and the tremendous power of custom, habit and narrow-mindedness, which is part of these remnants."

রাশিয়ায় শ্রেণী সংগ্রামের অভিযান লেনিনের এই উপদেশ অনুসারেই পরিচালিত কোরতে হ'বে। যতোদিন পর্য্যন্ত এই কর্ম্মপন্থা কার্য্যে পরিণত না হয়, ততোদিন পর্য্যন্ত আমরা কোনো মতেই এ কথা বোলতে পারি না যে, রাশিয়ায় সোস্যালিজম্‌এর প্রতিষ্ঠা পরিপূর্ণতা লাভ কোরেছে এবং নিরাপদ অবস্থায় উপনীত হ'য়েছে। সোস্যালিজম্ বর্ত্তমানে নিরাপদ কিনা কমরেড ষ্ট্যালিন তাঁর Victory of socialism in Russia বইয়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কোরেছেন। সেই চরম অবস্থায় উপনীত হ'তে হ'লে রাশিয়াকে আরও অধিকতর সাংঘাতিক অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে চলতে হ'বে। সোভিয়েট নায়কগণের মত এই যে ভবিষ্যতের সেই সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর উপরই তার ভার দিতে হ'বে। কারণ, তারাই সেখানকার—"The most advanced class in socialist society" আপাত দৃষ্টিতে যদিও শ্রমিক এবং কৃষক শ্রেণীর মাঝে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না, তবুও শ্রমিকরাই রাশিয়ায় সব চাইতে প্রগতিশীল আলোকপ্রাপ্ত এবং সংস্কৃত সম্প্রদায়। ষ্টেখানব আন্দোলনের (Stakhanov Movement) প্রতি দৃষ্টিপাত কোরলেই এই উক্তির যৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হ'বে এবং এই ষ্টেটখানব আন্দোলন আমাদিগকে সত্যিই রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর অপ্রতিহত ক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দেয়! জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার কথা বাদ দিলেও --অন্যান্য সংস্কার কার্য্যেও তারা সব সময় পুরোভাগেই স্থান পায়।

শ্রমিক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা অপ্রতিহত হলেও রাশিয়ার বর্ত্তমান পরিস্থিতি লক্ষ্য কোরলে ইহা বুঝা যায় যে, ভবিষ্যতে রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির নির্দ্দেশ অনুসারেই তারা পরিচালিত হ'বে এবং শ্রমিক সম্প্রদায়ও তাদের নেতৃত্ব স্বীকার কোরে নেবে। তবু রাশিয়ার জাতীয় আন্দোলনে শ্রমিকদের প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই সেখানকার নেতৃস্থানীয়গণ স্বীকার কোরবেন। রাশিয়ায় সোস্যালিজ্‌ম্-এর প্রতিষ্ঠা পূর্ণভাবে সংস্থাপিত হ'লেও শ্রমিক শ্রেণীর প্রাধান্য ও প্রয়োজনীয়তা ভবিষ্যতেও স্বীকৃত হ'বে।

দুনিয়ার গতি পরিবর্ত্তনশীল। বিশেষ কোরে বর্ত্তমান দুনিয়ার রাজনীতি এতো পরিবর্ত্তনশীল যে, এর সাথে সমান তালে পা ফেলে চলা, বিভিন্ন জাতির পক্ষে আজ সত্যই অসম্ভব। ভবিষ্যতে যদি রাশিয়ার এই প্রোলিটারিয়েট ডিক্‌টেটারসিপও রাজনীতির ঘূর্ণাবর্ত্তে প'ড়ে দুনিয়া হ'তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তা' হ'লে আমরা আদর্শচ্যুত হবো—কিন্তু বিস্মিত হবো না। এবং ইহাও সত্যি যে,

একদিন না একদিন এই শাসনব্যবস্থার মাঝেও চরম পরিবর্ত্তন আসতে পারে। সেই চরম পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে জাতীয় সংহতির প্রতি লক্ষ্য রেখে স্থানকালের বিবেচনায় রাশিয়ার বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির মাঝেও পরিবর্ত্তন আসতে পারে এবং এই পরিবর্ত্তন একবারে অবাঞ্ছনীয় নয়।

রাশিয়ার সোস্যালিজম্ এখনও নিরাপদ নয়। কমরেড ষ্টেজাকি বোলেছেন ঃ—

"There are still remnants of the class enemy left in our country and they will oppose the dictatorship of the Proletariat to the utmost of their power with all recklessness and energy and they will continue to do so, as they will exist."

রাজনীতির কূট রঙ্গমঞ্চে রাশিয়া ভবিষ্যতে কী ভাবে, কোনরূপে অভিনয় কোরবে তা কে জানে? এখনও রাশিয়ার সোস্যালিজম্ সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়। বৈদেশিক বিরুদ্ধবাদী রাষ্ট্রসমূহের কথা বাদ দিলেও, রাশিয়ায় আজও এমন লোক নিশ্চয়ই আছে, যারা রাশিয়ার সোস্যালিজম্-এর পরিবর্ত্তে ইতালীর ফ্যাসিজম্-এর প্রতিষ্ঠা কামনা করে। এদের মাঝে ট্রট্স্কী পন্থীরাই উল্লেখ-যোগ্য। তারপর বৈদেশিক শক্তিপুঞ্জের কথা তো আছেই—যার মাঝে জার্ম্মাণী, ইতালী, জাপানই রাশিয়ার সাংঘাতিক শত্রু।

কে জানে রাজনৈতিক পরিস্থিতির ঘূর্ণাবর্ত্তে প'ড়ে রাশিয়ার সোস্যালিজম্ কোন্ মুহূর্ত্তে দুনিয়ার ইতিহাসের পাতা থেকে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়। তবে ইহা অতি সত্যি কথা যে, আজও রাশিয়ার সোস্যালিজম্ অপরাজেয় শক্তি এবং গৌরবময় ইতিহাস নিয়ে রাশিয়া তার আদর্শগত অভ্যুন্নতির পথে এগিয়ে যাক্—আমরা তাই চাই!
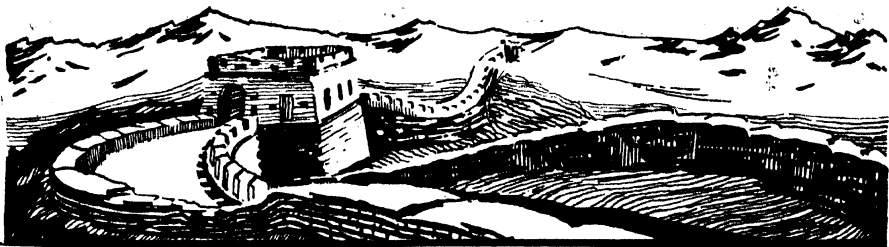
কবি

অমিতা দেবী

মিছে কথার জাল বোনো গো, কবি,
আলো-ছায়ায় আঁকো কেবল সুখের ছবি !
ফুল মালা, কেবল ফুলের ডালা
কেবল মধু, কেবল শুধু আঙুর-পেষা তাজা মদের পান-পেয়ালা !
কেবল শীষা, সাকী এবং শরাব
গুলবাগিচায় বুলবুল্‌. আর বিরহ, আর গোলাপ ফুলের খোয়াব ?
মধুর রসের মিষ্টি রসায়ন,
এই কি শুধু মানব-জীবন ?

চোখ্‌ বুজে কি শুধুই শোনে কান
পাখীর ডাক্‌ আর হাল্কা গজল গান ?
জলতরঙ্গের রিণিরিণি সুর
বিষণ্ণ, বিধুর
বাঁশের বাঁশীর সুললিত কোমল কানাকানি,
আর পাপিয়ার ভাঙা কান্না, পিয়া-পিয়া বাণী,
কোয়েল পাখীর কুহু কুহু, দোয়েল পাখীর শিষ্‌
শুধুই অহর্নিশ,
পূর্ণিমা, আর চাঁদের আলো, আর জ্যোছনার বান
নরম কথার বাষ্প-বিলাস, ভালোবাসার অনুপম আদান-প্রদান :
কেবল পীলু-খাম্বাজ, আর করুণ বেহাগ
ঠুংরী-খেয়াল, চটুল ঢঙের রঙ্‌-বেরঙের হাল্কা রাগ
দেহে এবং শিরায় শিরায় মধুর কচায়ন,
এই কি শুধু মানব-জীবন ?

জানো নাকি বিশ্বভ'রে লোহার শিকল বাজে ঝন্‌ঝনিয়ে
মাথার উপর ছুর্য্যোগ-রাত,
আকাশ ছেয়ে আসে কালো মেঘ ঘনিয়ে ;
বিদ্যুতে আর বজ্রানলে দগ্ধজ্বালায় মানুষ মরে
ঘরে ঘরে ;
রাখ নাকি খবর ?
জ্যোৎস্না কোথায় ? হেথায় কেবল চিরছুঃখের শীতল্ ক

পথে পথে মৃত্যু আছে বুভুক্ষিত জন্তুর মতন
সে খবর কি রাখ না কখন্ ?
জ্বল্‌ছে শুধু আলোর দীপালিকা
সকল প্রদীপ এক নিমেষেই হবে নাকি আঁধার বিভীষিকা ?
ঠোঁটের ওপর হাসির আলো
এক পলকে হবে নাকি কালোয় কালো ?

জীবন ভ'রে ঝড়ের অট্টলীলা,
বইছে কেবল সাইক্লোন আর টর্ণেডো কুটীলা,
ধরিত্রীময় উন্মাদ ভূঁইচাল।
ক্রুদ্ধ মহাকাল
ছু' হাত দিয়ে মরণ-বীজ ছড়ায় দিক্‌দিগন্তে
শরৎ-শীতে-বর্ষায়-বসন্তে
বিষম্-পদী ঝাঁপতালেতে নটরাজের বন্ধহারা প্রচণ্ডনাচন
তারি সঙ্গে সৌরলোকের করতালে তালে তালে উত্তাল ঝন্ ঝন্.
আত্মহারা, উন্মাদ ডম্বরু
অমাবস্যার শ্মশান-গীতি ঐক্যতানে করেছে যে শুরু ;
এ সব কিছু শুনতে পাও না তুমি
জগৎ জুড়ে দেখো কেবল রসের লীলাভূমি ?
তোমার কানে আসে কেবল গজল গান আর মিহি প্রেমের সুর
রসাল, ভরপূর
জ্যোৎস্না রাতের বুল্‌বুল্ আর নার্গিসের ফুল,
এতেই আছো মগ্ন ও মশগুল্ ?

নেশার চোখে দেখ্‌ছো কেবল লীলা সুললিতা
দেখ্‌তে পাওনা, বিশ্বভরে জ্বলছে আজি অনির্ব্বাণ চিতা,
আকাশ ছেয়ে উঠেছে তার লাল আগুণের শিখা
এ ধরিত্রীর ললাটে আজ পরায়েছে প্রজ্বলন্ত দুখের রক্তটীকা।
কলরোলা দুখের বন্যা জলে-স্থলে !
অমৃত হারায়ে গেছে অফুরন্ত তিক্ততার গরলে।

মিছে কথার কেন গাঁথো মালা ?
ভীরু প্রাণে সয়না, কবি, সত্য কথার বিষম জ্বালা ?
জীবন নিয়ে, দোহাই তোমার, বুনো'না আর মরীচিকার মিথ্যা মায়া,
গেঁথে গেঁথে ভুল আলেয়ার ছায়া
বেঁধোনাকো বাসা ;
ছড়ায়োনা মিষ্টিরসের গহন কুয়াশা !

The slough of unamiable liars,
bog of stupidities,
Malevolent stupidities, and stupidities......
........The air without refuge of silence,
the drift of lice, teething,
And above it the mouthing of orators,
the arse-belching of preachers.

– EZRA POUND.

—ডাউনিং স্ট্রীট্ থেকে ওয়ার্দ্ধা পর্য্যন্ত আজ কেবল ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

চারিদিকে শুধু একনিষ্ঠ অসত্যের চর্চ্চা, ভণ্ডামি আর নির্লজ্জ বোকামি। প্রতিবেশ কলুষিত; সত্যের নামে মিথ্যার আবিলতায় ভরা। শান্তি নেই। স্বস্তি নেই; একদিকে পশুনীতির প্রতিমূর্ত্তিদের Cleon-এর মত 'nonsensical spouting' আর একদিকে রাজনীতির পীঠস্থানের টিকিওয়ালা পাণ্ডাদের 'political wisdom'—এই নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

ডান্‌জিগ্ সীমান্তে সব চুপচাপ্। কিন্তু তাতে আমাদের অস্বস্তি আরও বেড়ে গেছে। কারণ ফ্যাশিষ্টদের আক্রমণের যে নীতি তার উপরে শান্তির একটা পাত্‌লা পর্দ্দা থাকেই। তা ছাড়া আক্রমণের রীতি দু'রকমের। একটা জবরদস্তির, কতকটা দিনে ডাকাতির মত। আর একটা হ'চ্ছে স্থানীয় 'মাস্তুতোভাই'-দের লেলিয়ে দেওয়ার। যে-দেশকে আত্মসাৎ করতে

হবে সে-দেশের অবস্থা যখন একান্ত অসহায় হয় এবং তার রক্ষকেরা যখন প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হ'য়ে পিছন ফিরে দাঁড়ায়, তখন ফ্যাশিষ্টদের পক্ষে প্রথম রীতিটাই কার্য্যকরী হয় বেশী। এই রীতিতে অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্ম্মান্ ফুরহার আত্মসাৎ করেছেন। ডান্‌জিগের ব্যাপারে দ্বিতীয় রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। তার কারণ অবশ্য রক্ষকদের মুখোমুখী দাঁড়ান নয়, পোল্যাণ্ডের অবিচলিত প্রতিবাদ। পোল্‌রা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে একা যদি জার্ম্মানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতেই হয়, তাতেও তারা পেছপাও নয়। পোল্‌রা শপথ করেছে—'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'। হিট্‌লার সেইজন্যই তাঁর সুর কয়েক পর্দ্দা নীচে নামিয়েছেন এবং ডান্‌জিগ্ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আজ তিনি উদ্‌গ্রীব। শোনা গেছে নাৎসীপার্টির আগামী বাৎসরিক কংগ্রেস হবে 'শান্তি কংগ্রেস'। এ আর কিছু নয়—বাজী একই, চালটা ঘুরিয়ে দেওয়া। এখন লক্ষ্য হবে পোল্যাণ্ডের নাৎসীপন্থী নেতাদের ধীরে ধীরে উস্কে দিয়ে একটা গোলযোগের সৃষ্টি করা। তারপর এই অশান্তি দূর করে' শান্তি আনা হবে ডান্‌জিগ্‌কে আত্মসাৎ করে'। 'বাহবা' দিতেই হবে হিট্‌লারকে, কারণ তাঁর কথাই ঠিক থাকবে। বিনা কামান বিস্ফোরণে ডান্‌জিগ্ আয়ত্তে আসবে, কারও কোন আপত্তি থাকবে না।

নাৎসীদের এই শান্তির অর্থ আরও পরিষ্কার হবে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলে। পোল্যাণ্ড, আল্‌সাস্‌-লোরেন্ ও সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্তে প্রায় একলক্ষ নাৎসী সৈন্য মোতায়েন্ আছে। এ তো গেল খুব সাদাসিধে ব্যাপার। সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার হ'চ্ছে নাৎসী গোয়েন্দাদের কীর্ত্তি। পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে নাৎসী গোয়েন্দারা নিজেদের কাজে অত্যধিক ব্যস্ত। এই সব দেশে গোয়েন্দাগিরি করার একটা বড় সুবিধা হ'চ্ছে যে এদের প্রতি এখানকার শাসনকর্ত্তা ও অর্থপ্রভুদের বেশ কিঞ্চিত দরদ আছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের দু'জন সাংবাদিককে বন্দী করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হ'চ্ছে যে তাঁরা নাকি 'গেষ্টাপো' এজেণ্টদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং পার্লামেণ্টারী রক্ষণ কমিটির এক গুপ্ত বৈঠকের খবরাখবর সব তাঁরা এই সব এজেণ্টদের কাছে বেচে দিয়েছেন। অত্যন্ত জঘন্য প্রবৃত্তি। কিন্তু আঁৎকে ওঠার কিছু নেই খোঁজ করে' দেখা গেছে যে 'গেষ্টাপো'-র সঙ্গে যোগাযোগের এই সূত্র ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-সচিব মঁশিয়ে বোনে পর্য্যন্ত পৌঁছেচে। সংবাদপত্রে 'Why die for Danzig'—এই ধরণের প্রবন্ধ প্রকাশ করে' জনগণের মধ্যে নাৎসীদের দুরভিসন্ধি সমর্থন করে' ব্যাখ্যা করা হ'চ্ছে। এতে আমরা আদৌ বিস্মিত হইনি। কারণ ফ্রান্স বহুদিন ধরেই 'মহাজ্ঞানী' চেম্বারলেনের পথ অনুসরণ করছে।

ক্র্যাকোতে মার্শাল স্মিগ্‌লি রিজ্ যদিও খুব উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিয়েছেন এবং বলেছেন, "Danzig is Polish and shall remain Polish"—"Danzig a lung in our organism"—তা হ'লেও ভয় হয় যে বিক্ষত ফুস্‌ফুস্ নিয়ে তাঁকে পরে আফ্‌শোষ করতে হবে

এবং তাঁর সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করার মত ইউরোপে অন্ততঃ আর কেউ থাকবে না। হের ফোয়েষ্টারের বক্তৃতায় এরই আভাস পাওয়া যায়।

এখানে কেউ কেউ বলতে পারেন, "গণতন্ত্রী দেশ যদি বলতে হয় তো ফ্রান্স। কারণ যদিও আজ জানা গেছে মঁশিয়ে বোনের পর্য্যন্ত নাৎসীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তা হ'লেও সোভিয়েট ইউনিয়নের মত ডিক্টেটরী কায়দায় ফ্রান্স তাঁদের কোতল করেনি।" এই কোতল করা না-করার মধ্যে ক্যাপিটালিষ্ট্ ডেমক্রাসী ও সোশ্যালিষ্ট্ ডেমক্রাসীর মধ্যে পার্থক্যটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। ফ্যাশিষ্ট্ গোয়েন্দাদের পক্ষে সোভিয়েট্ ইউনিয়নের চোখে ধূলো দেওয়া কঠিন, কারণ সোভিয়েট্ সোশ্যালিষ্ট্ রাষ্ট্র, সেখানে সকলের চক্ষুই উন্মীলিত। বকধার্ম্মিকের মত উপরওয়ালারা সেখানে চোখ বুজে জেগে থাকার ভাণ করেন না। তাঁরা জানেন যে তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি। সেখানে স্বার্থের কোন মারপ্যাঁচ বা ভেদাভেদ নেই। সুতরাং বিশ্বাসঘাতকদের সেখানে জনগণের ট্রাইব্যুনালে বিচার করা হয় এবং অপরাধের গুরুত্ব বুঝে সাজারও ব্যবস্থা হ'য়ে থাকে। সস্তা বাজারী সেন্টিমেণ্টের কোন প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। আর ফ্রান্স বা ইংল্যণ্ডে বিচার করবেন যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে ফ্যাশিষ্টদের নাড়ীর টান রয়েছে। সকলেই মূলধন আর সুদের বংশজাত এবং রক্তের টান বড় টান। তাই সব অপরাধ এই সব দেশে ধামা চাপা পড়াই স্বাভাবিক।

এই অব্যবস্থা থেকে মাত্র একটি উপায়ে মুক্তি সম্ভব। গ্রেট্ বৃটেন্ ও ফ্রান্সের প্রগতিপন্থী শক্তিগুলিকে সুসংহত হতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাশিষ্ট্-পন্থী চেম্বারলেন ও দালাদিয়ে গবর্ণমেণ্টকে বিতাড়িত করতে হবে। সেইজন্য গ্রেট্ বৃটেনের লেবরপার্টি, সোশ্যালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট্ এবং ফ্রান্সের সোশ্যালিষ্ট্ ও কম্যুনিষ্টদের 'ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট্' গঠন করতে হবে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে। এ ভিন্ন ফ্যাশিষ্ট স্বৈরাচার ও আক্রমণ প্রতিরোধের কোন উপায় নেই।

ফ্যাশিষ্টদের স্বৈরাচার ও আক্রমণের পথ দিন দিন আরও পরিষ্কার হ'চ্ছে কারণ সোভিয়েট রাশিয়া, গ্রেট্ বৃটেন্ ও ফ্রান্সের মধ্যে যে একটা ফ্যাশিষ্ট্-বিরোধী চুক্তি হবার কথা গত ছ' মাস ধরে' শুনে আসছি তার আজও কোন মীমাংসা হয় নি। রয়টারের মারফৎ শোনা গেছে যে এই আলোচনায় নাকি সম্প্রতি কিছু আশার লক্ষ্মণ দেখা যাচ্ছে। হ'তেও পারে। কারণ যে-চুক্তিতে সামরিক গুরুত্বই বেশী, সেখানে সামরিক বিভাগের সঙ্গে আলোচনা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গ্রেট্ বৃটেন্ ও ফ্রান্সের সামরিক বিভাগের প্রতিনিধিরা রাশিয়ার সমর বিভাগের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেছেন। এতেও যদি কিছু মীমাংসা না হয় তা হ'লে আর কোন সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা

যাচ্ছে না। এ বিষয়ে আলোচনা মস্কোতে খুব কমই হ'য়ে থাকে। কোন প্রকারের সমরাতঙ্ক যা'তে সোভিয়েট অধিবাসীকে উত্তেজিত না করতে পারে তার জন্য সাংবাদিকরা বিশেষ যত্নবান। পত্রিকায় শুধু সামান্য কয়েকটি লাইনের মধ্যে গ্রেট্ বৃটেন ও ফ্রান্সের সমর প্রতিনিধিদের মস্কো পৌছানোর সংবাদ প্রকাশিত হ'য়েছিল। এ-ছাড়া কিছুদিন আগে সুপ্রীম সোভিয়েটের ডেপুটী চেম্বারলেনের এই দীর্ঘসূত্র নীতি ব্যাখ্যা করে' 'প্রাভ্দা'-তে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ল্যাটভিয়া, এস্থোনিয়া ও ফিন্ল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা আক্রমণকারীরা ক্ষুন্ন করলে তাদের তৎক্ষণাৎ সাহায্য করার সর্ত্তে চুক্তি করতে গ্রেট্ বৃটেন্ রাজী হ'চ্ছে না। বৃটেনের অজুহাত হচ্ছে যে এই রাষ্ট্রগুলি ঐ ধরণের চুক্তি চায় না। আসলে এ অজুহাত অর্থহীন ও ভিত্তিহীন। এই রকমের নানা রকম অজুহাত দিয়ে বৃটেন এই চুক্তিতে বাধা দিচ্ছে অথচ প্রেসের মারফৎ তাদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে ঢাক পিট্তে কুণ্ঠিত হ'চ্ছে না। সংক্ষেপে, আজও গ্রেট্ বৃটেনের মনোভাবের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নি, বরং উত্তরোত্তর প্রতিক্রিয়াশীলতাই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী চুক্তির পথে এই সব নানারকম অন্তরায়ের মধ্যে রুজভেল্টের নিরপেক্ষতার বিল সংশোধন করার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার সংবাদে আমরা সকলেই আঘাত পেয়েছি। নিরাশ হই নি। কারণ সেনেটের এই সাম্প্রতিক জয়ের আয়ু সম্বন্ধে সকলেই বিশেষ সন্দিহান। তবে পরাজয় ক্ষণস্থায়ী হ'লেও এর প্রতিক্রিয়া খুব দ্রুত গতিতে সুরু হয়েছে। বৃটেনের ফ্যাশিষ্ট-পন্থী বৈদেশিক নীতি যখন অপরিবর্ত্তনীয় তখন রুজভেল্টের এই পরাজয় সাময়িক হ'লেও শান্তি প্রতিষ্ঠার পথের দুর্গমতা এতে অনেকখানি বাড়ল।

এর প্রথম প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রাচ্যে দেখা যায়। তিয়েনৎসিনের বিদেশী এলাকায় জাপানের ঔদ্ধত্য বেড়ে গেছে। ক্রেইগি-আরিতা চুক্তি চেম্বারলেনের বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এই চুক্তিতে চীনের গণতান্ত্রিক স্বার্থ যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হয়েছে। পাঠকের নিশ্চয় স্মরণ আছে স্পেনের যুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্কোর সৈন্যরা বিমানপোত থেকে বোমা বর্ষণ করে' যখন বৃটিশ জাহাজ ও সৈন্যদের ধ্বংস করত তখন চেম্বারলেনের কাছে কৈফিয়ৎ তলপ্ করলে তিনি গোপাল ভাঁড়ের মত হেসে সব অপমান গলাধঃকরণ করে' দিব্যি সাফাই গাইতেন। নিওঁ চুক্তি তখন ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে। মিনর্কার ব্যাপারে ডেভন্শায়ারের কথাও আমরা ভুলি নি। সুদূর প্রাচ্যে আজ তারই পুনরাবৃত্তি। স্পেনীয় অন্তর্বিপ্লবে 'নিরপেক্ষ নীতি'র প্রতিলিপি হ'চ্ছে সুদূর প্রাচ্যের 'ক্রেইগি-আরিতা' চুক্তি।

ক্রেইগি-আরিতা চুক্তির সারমর্ম্ম হ'চ্ছে' বৃটেন জাপানের বশ্যতা স্বীকার করেছে। চীনে যে সব অঞ্চল জাপান দখল করেছে সেখানে শৃঙ্খলা রক্ষার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা জাপানের আছে। বৃটেন কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করবে না। চীনে জাপানের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বৃটেন কোন রকম বাধা দেবে না। স্মরণ থাকা উচিত, গত ৯ই এপ্রিল উত্তর চীনের একজন কাষ্টাম্‌স্ সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট্ চ্যাং শি-ক্যাং-কে হত্যা করার জন্য চারজন চীনাকে অভিযুক্ত করা হয়। জাপান এই ব্যাপারটা একটা নিরপেক্ষ কমিশনের কাছে পর্য্যন্ত তদন্ত করতে দিতে রাজী হয় না। ফলে গত ১৪ই জুন তিয়েনৎসিনের বিদেশী এলাকা আক্রমণ করা হয় এবং সেখানকার বৃটিশ বাসিন্দাদের উপর অকথ্য অত্যাচার, জুলুম চলতে থাকে। আজ চেম্বারলেন সাহেব তাদের জাপানীদের হাতে নির্লিপ্তভাবে সমর্পণ করতে স্বীকার করেছেন। দু' জনকে খুনের অপরাধে এবং আর দু' জনকে অবৈধ সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে। বৃটিশ প্রেস এর তীব্র প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু তাতে কি হবে? বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর এই নির্লজ্জ criminalityর কোন মার্জ্জনা নেই। এর প্রতিদান আছে। চীনের জনগণ এর উপযুক্ত প্রতিদান দেবেই। শুধু তাই নয়। পৃথিবীর জনগণের এই প্রতিদান দেবার পূর্ণ প্রস্তুতির আর দেরী নেই।

সুদূর প্রাচ্যে যে ষড়যন্ত্র ভারতবর্ষে আজ তারই প্রতিচ্ছায়া। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মেঘ বেশ জমে উঠছে। এ-অঞ্চলে, সে-প্রান্তে বিদ্যুতের ঝিলিকও চোখে পড়ে। ফেডারেশন কায়েম না করলে উপায় নেই। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উর্দ্ধতন বুর্জ্জোয়াগোষ্ঠীর সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তাই মনোভাবের চুক্তি হ'য়েছে। ওয়ার্দ্ধার যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব আজ বড় হরফে প্রকাশিত হ'লেও, ওয়ার্দ্ধার বিচারের কাছে তার কোন মূল্য নেই। ও-রকম অনেক প্রস্তাবই গান্ধী-প্রসাদ-প্যাটেল-নেহেরুর নোটবুকে আছে। একে একে সমস্ত 'undesirable element'কে মাথায় ঘোল ঢেলে কুলোর বাতাস দিয়ে কংগ্রেসের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। দেশাই-জী-দেও-এর পোয়া বারো। প্যাটেল হুঙ্কার দিয়ে সবরমতীর আখ্‌ড়ায় এইবার পালোয়ানী তাল ঠুকবেন। গান্ধীজী ভাবছেন এইবার ঠিক হয়েছে, বড়েটাকে আর একটা ঘর টিপে দিলেই কিস্তী মাত্। অর্থাৎ 'ফেডারেল্ ইণ্ডিয়া'। স্বাধীন ভারতের সঙ্গে তার আর এমন কি তফাৎ?

সুভাষবাবু বলেছেন তিনি আদৌ দুঃখিত হন নি, কারণ এটা স্বাভাবিক। আমরাও তাই বলি। কারণ আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবিবর্ত্তনে দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ যে ক্রমেই তীব্রতর হবে এর পিছনে ঐতিহাসিক যুক্তি রয়েছে। তা না হ'লে আজ ৯ই জুলাই-এর প্রতিবাদের বিপক্ষে এবং ওয়ার্দ্ধার বিচারের স্বপক্ষে জওহরলালের 'ন্যাশানাল্ হেরাল্ড্' আর ফিরিঙ্গিমহলের 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্' ঐক্যতানই বা গাইবে কেন? সুভাষবাবু বলেছেন তিনি আরও বেশী উৎসাহের সঙ্গে

কংগ্রেসের কাজে মনোনিবেশ করবেন। সোশ্যালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট, কিষাণসভা ও ফরোয়ার্ড ব্লক্ আজ একত্রে অভিযান সুরু করুক। জয় হবেই। বামপন্থী সমন্বয় কমিটি শক্তিশালী হবে। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের পরাজয় ঘটবে।

মূলে যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, তার দিন ফুরিয়ে এসেছে। লেবর পার্টির আজও চৈতন্য হয় নি, তাই ইউরোপে ফ্যাশিষ্ট ঔদ্ধত্য অপ্রতিহত। কিন্তু সুদূর প্রাচ্যে রীতিমত কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে। সে-পরীক্ষায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ উত্তীর্ণ হবে না। কারণ চীণ আজ সঙ্ঘবদ্ধ।

চীন-জাপান যুদ্ধের খবর পাওয়া গেছে যে চীনা সৈন্যরা দক্ষিণ চীনের পূর্ব্ব কোয়ান্টুং প্রদেশ প্রতি-আক্রমণের ফলে চাও-চো পুনরুদ্ধার করেছে। চাও-চো পুনরুদ্ধার করার ফলে আর চারটি সহর চীনাদের দখলে এসেছে,—আপু, ফু-ইয়াং, টৌপু পিচিয়াশান্ ও হান্শান্। চীনা সৈন্যরা সারারাত যুদ্ধ করে' য়্যুঙ্কি সহরও দখল করেছে। শান্সী থেকে খবর এসেছে যে চীনা গরিলা ভীষণ বৃষ্টির মাঝখানেও দু'টো জাপানী ডিভিশনকে হটিয়ে দিয়েছে। চুংকিং থেকে চীনাদের আরও কয়েকটি সীমান্তে জয়ের সংবাদ এসেছে। উত্তর হ্যাঙ্কাউ-এর চীনা সৈন্যরা প্রতি-আক্রমণ করে' পাইপিং-হ্যাঙ্কাউ রেলপথের পাশের মিংকিং সহর অধিকার করেছে।

এ-ছাড়া জাপানের আভ্যন্তরীণ সমস্যাও ক্রমে গুরুতর হ'য়ে উঠছে। বৈদেশিক সংবাদে প্রকাশ যে ক্রমে জাপানের জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব প্রবল হ'য়ে উঠছে। একটি যুদ্ধ-বিরোধী দল উত্তর জাপানের হোপিডোতে ইওয়ামিজাওয়া রেলপথ ভেঙে দিয়েছে। ছাত্ররা কিউটোতে স্কুলঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কোরিয়া, সাইসিন্ ও রুজানে ভীষণভাবে লুঠতরাজ ও জ্বালানি আরম্ভ হয়েছে। জাপানী-কর্ত্তারা কয়েক দিনের মধ্যে যুদ্ধবিরোধী বলে' সন্দেহ করে' প্রায় ৪০০ জন জাপানীকে বন্দী করেছেন। এই সব সংবাদ ছোট হরফে প্রকাশিত হ'লেও এদের গুরুত্ব বড় হেড্-লাইনের চাইতে লক্ষগুণ বেশী।

তবু এখন চীনের দিক থেকে যুদ্ধের তৃতীয় পর্ব্ব আসে নি। তাই বিশ্বাস হয় সাংহাই আক্রমণের দ্বিতীয় বৎসর পদার্পণে মার্শাল চিয়াং কাইসেক যা ঘোষণা করেছেন তা মিথ্যা নয়। চিয়াং কাইসেক বলেছেন যে ক্রমেই চীন সাফল্যের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে। সাফল্যের আর বিলম্ব নেই। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ধ্বংস হবে। বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ধূলিসাৎ হবে।

সংগ্রামরত জাতির নেতা চিয়াং-কাই-সেক্ ও যোদ্ধা চীনাদের মত ভারতের ও বিশ্বের সংগ্রাম-সম্মুখীন নেতা ও যোদ্ধাদের কোন বিখ্যাত সত্যদর্শীর ভাষায় বলতে চাই : "Soar above

জানো নাকি বিশ্বভ'রে লোহার-শিকল বাজে ঝন্‌ঝনিয়ে
মাথার উপর দুর্য্যোগ-রাত,
আকাশ ছেয়ে আসে কালো মেঘ ঘনিয়ে ;
বিদ্যুতে আর বজ্রানলে দগ্ধজ্বালায় মানুষ মরে
ঘরে ঘরে ;
রাখ নাকি খবর ?
জ্যোৎস্না কোথায় ? হেথায় কেবল চিরদুঃখের শীতল্ কবর।

পথে পথে মৃত্যু আছে বুভুক্ষিত জন্তুর মতন
সে খবর কি রাখ না কখন্ ?
জ্বল্‌ছে শুধু আলোর দীপালিকা
সকল প্রদীপ এক নিমেষেই হবে নাকি আঁধার বিভীষিকা ?
ঠোঁটের ওপর হাসির আলো
এক পলকে হবে নাকি কালোয় কালো ?

জীবন ভ'রে ঝড়ের অট্টলীলা,
বইছে কেবল সাইক্লোন আর টর্ণেডো কুটীলা,
ধরিত্রীময় উন্মাদ ভূঁইচাল।
ক্রুদ্ধ মহাকাল
দু' হাত দিয়ে মরণ-বীজ ছড়ায় দিক্‌দিগন্তে
শরৎ-শীতে-বর্ষায়-বসন্তে
বিষম্‌-পদী ঝাঁপতালেতে নটরাজের বন্ধহারা প্রচণ্ডনাচন
তারি সঙ্গে সৌরলোকের করতালে তালে তালে উত্তাল ঝন্ ঝন্,
আত্মহারা, উন্মাদ ডম্বরু
অমাবস্যার শ্মশান-গীতি ঐক্যতানে করেছে যে শুরু ;
এ সব কিছু শুনতে পাও না তুমি
জগৎ জুড়ে দেখো কেবল রসের লীলাভূমি ?
তোমার কানে আসে কেবল গজল গান আর মিহি প্রেমের সুর
রসাল, ভরপুর
জ্যোৎস্না রাতের বুল্‌বুল্ আর নার্গিসের ফুল,
এতেই আছো মগ্ন ও মশগুল্ ?

নেশার চোখে দেখ্‌ছো কেবল লীলা সুললিতা

দেখ্‌তে পাওনা, বিশ্বভরে জ্বলছে আজি অনির্ব্বাণ চিতা,

আকাশ ছেয়ে উঠেছে তার লাল আগুণের শিখা

এ ধরিত্রীর ললাটে আজ পরায়েছে প্রজ্বলন্ত দুখের রক্তটীকা।

কলরোলা দুখের বন্যা জলে-স্থলে !

অমৃত হারায়ে গেছে অফুরন্ত তিক্ততার গরলে।

মিছে কথার কেন গাঁথো মালা ?

ভীরু প্রাণে সয়না, কবি, সত্য কথার বিষম জ্বালা ?

জীবন নিয়ে, দোহাই তোমার, বুনো না আর মরীচিকার মিথ্যা মায়া,

গেঁথে গেঁথে ভুল আলেয়ার ছায়া

বেঁধোনাকো বাসা ;

ছড়ায়োনা মিষ্টিরসের গহন কুয়াশা !

The slough of unamiable liars,
bog of stupidities,
Malevolent stupidities, and stupidities......
.........The air without refuge of silence,
the drift of lice, teething,
And above it the mouthing of orators,
the arse-belching of preachers.

—EZRA POUND.

—ডাউনিং ষ্ট্রীট্ থেকে ওয়ার্দ্ধা পর্য্যন্ত আজ কেবল ঐ একই কথার প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়।

চারিদিকে শুধু একনিষ্ঠ অসত্যের চর্চ্চা, ভণ্ডামি আর নির্লজ্জ বোকামি। প্রতিবেশ কলুষিত; সত্যের নামে মিথ্যার আবিলতায় ভরা। শান্তি নেই। স্বস্তি নেই। একদিকে পশুনীতির প্রতিমূর্ত্তিদের Cleon-এর মত 'nonsensical spouting' আর একদিকে রাজনীতির পীঠস্থানের টিকিওয়ালা পাণ্ডাদের 'political wisdom'—এই নিয়ে সাধারণ মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত।

ডান্‌জিগ্ সীমান্তে সব চুপচাপ্। কিন্তু তাতে আমাদের অস্বস্তি আরও বেড়ে গেছে। কারণ ফ্যাশিষ্টদের আক্রমণের যে নীতি তার উপরে শান্তির একটা পাত্‌লা পর্দ্দা থাকেই। তা ছাড়া আক্রমণের রীতি দু'রকমের। একটা জবরদস্তির, কতকটা দিনে ডাকাতির মত। আর একটা হ'চ্ছে স্থানীয় 'মাস্তুতোভাই'-দের লেলিয়ে দেওয়ার। যে-দেশকে আত্মসাৎ করতে

হবে সে-দেশের অবস্থা যখন একান্ত অসহায় হয় এবং তার রক্ষকেরা যখন প্রতিশ্রুতির কথা বিস্মৃত হ'য়ে পিছন ফিরে দাঁড়ায়, তখন ফ্যাশিষ্টদের পক্ষে প্রথম রীতিটাই কার্য্যকরী হয় বেশী। এই রীতিতে অষ্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়াকে জার্ম্মান্ ফুরহার আত্মসাৎ করেছেন। ডান্‌জিগের ব্যাপারে দ্বিতীয় রীতি অবলম্বন করা হয়েছে। তার কারণ অবশ্য রক্ষকদের মুখোমুখী দাঁড়ান নয়, পোল্যাণ্ডের অবিচলিত প্রতিবাদ। পোল্‌রা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছে যে একা যদি জার্ম্মানির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতেই হয়, তাতেও তারা পেছপাও নয়। পোল্‌রা শপথ করেছে—'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী'। হিট্‌লার সেইজন্যই তাঁর সুর কয়েক পর্দ্দা নীচে নামিয়েছেন এবং ডান্‌জিগ্ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য আজ তিনি উদ্‌গ্রীব। শোনা গেছে নাৎসীপার্টির আগামী বাৎসরিক কংগ্রেস হবে 'শান্তি কংগ্রেস'। এ আর কিছু নয়—বাজী একই, চালটা ঘুরিয়ে দেওয়া। এখন লক্ষ্য হবে পোল্যাণ্ডের নাৎসীপন্থী নেতাদের ধীরে ধীরে উস্কে দিয়ে একটা গোলযোগের সৃষ্টি করা। তারপর এই অশান্তি দূর করে' শান্তি আনা হবে ডান্‌জিগ্‌কে আত্মসাৎ করে'। 'বাহবা' দিতেই হবে হিট্‌লারকে, কারণ তাঁর কথাই ঠিক থাকবে। বিনা কামান বিস্ফোরণে ডান্‌জিগ্ আয়ত্তে আসবে, কারও কোন আপত্তি থাকবে না।

নাৎসীদের এই শান্তির অর্থ আরও পরিষ্কার হবে কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিলে। পোল্যাণ্ড, আল্‌সাস্-লোরেন্ ও সুইজারল্যাণ্ডের সীমান্তে প্রায় একলক্ষ নাৎসী সৈন্য মোতায়েন্ আছে। এ তো গেল খুব সাদাসিধে ব্যাপার। সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপার হ'চ্ছে নাৎসী গোয়েন্দাদের কীর্ত্তি। পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্সে নাৎসী গোয়েন্দারা নিজেদের কাজে অত্যধিক ব্যস্ত। এই সব দেশে গোয়েন্দাগিরি করার একটা বড় সুবিধা হ'চ্ছে যে এদের প্রতি এখানকার শাসনকর্ত্তা ও অর্থপ্রভুদের বেশ কিঞ্চিত দরদ আছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের ছু'জন সাংবাদিককে বন্দী করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ হ'চ্ছে যে তাঁরা নাকি 'গেষ্টাপো' এজেন্টদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং পার্লামেণ্টারী রক্ষণ কমিটির এক গুপ্ত বৈঠকের খবরাখবর সব তাঁরা এই সব এজেন্টদের কাছে বেচে দিয়েছেন। অত্যন্ত জঘন্য প্রবৃত্তি। কিন্তু আঁৎকে ওঠার কিছু নেই খোঁজ করে' দেখা গেছে যে 'গেষ্টাপো'-র সঙ্গে যোগাযোগের এই সূত্র ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-সচিব মঁশিয়ে বোনে পর্য্যন্ত পৌঁছেচে। সংবাদপত্রে 'Why die for Danzig'—এই ধরণের প্রবন্ধ প্রকাশ করে' জনগণের মধ্যে নাৎসীদের দুরভিসন্ধি সমর্থন করে' ব্যাখ্যা করা হ'চ্ছে। এতে আমরা আদৌ বিস্মিত হইনি। কারণ ফ্রান্স বহুদিন ধরেই 'মহাজ্ঞানী' চেম্বারলেনের পথ অনুসরণ করছে।

ক্র্যাকোতে মার্শাল স্মিগ্‌লি রিজ্ যদিও খুব উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিয়েছেন এবং বলেছেন, "Danzig is Polish and shall remain Polish"—"Danzig a lung in our organism"—তা হ'লেও ভয় হয় যে বিক্ষত ফুস্‌ফুস্ নিয়ে তাঁকে পরে আফ্‌শোষ করতে হবে

এবং তাঁর সেই মর্ম্মান্তিক দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করার মত ইউরোপে অন্ততঃ আর কেউ থাকবে না। হের ফোয়েষ্টারের বক্তৃতায় এরই আভাস পাওয়া যায়।

এখানে কেউ কেউ বলতে পারেন, "গণতন্ত্রী দেশ যদি বলতে হয় তো ফ্রান্স। কারণ যদিও আজ জানা গেছে মঁশিয়ে বোনের পর্য্যন্ত নাৎসীদের সঙ্গে যোগাযোগ আছে তা হ'লেও সোভিয়েট ইউনিয়নের মত ডিক্টেটরী কায়দায় ফ্রান্স তাঁদের কোতল করেনি।" এই কোতল করা না-করার মধ্যে ক্যাপিটালিষ্ট্ ডেমক্রাসী ও সোশ্যালিষ্ট্ ডেমক্রাসীর মধ্যে পার্থক্যটা পরিষ্কার হ'য়ে যাবে। ফ্যাশিষ্ট্ গোয়েন্দাদের পক্ষে সোভিয়েট্ ইউনিয়নের চোখে ধূলো দেওয়া কঠিন, কারণ সোভিয়েট্ সোশ্যালিষ্ট্ রাষ্ট্র, সেখানে সকলের চক্ষুই উন্মীলিত। বকধার্ম্মিকের মত উপরওয়ালারা সেখানে চোখ বুজে জেগে থাকার ভাণ করেন না। তাঁরা জানেন যে তাঁরা জনগণের প্রতিনিধি। সেখানে স্বার্থের কোন মারপ্যাঁচ বা ভেদাভেদ নেই। সুতরাং বিশ্বাসঘাতকদের সেখানে জনগণের ট্রাই-ব্যুনালে বিচার করা হয় এবং অপরাধের গুরুত্ব বুঝে সাজারও ব্যবস্থা হ'য়ে থাকে। সস্তা বাজারী সেন্টিমেন্টের কোন প্রশ্রয় দেওয়া হয় না। আর ফ্রান্স বা ইংল্যাণ্ডে বিচার করবেন যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে ফ্যাশিষ্টদের নাড়ীর টান রয়েছে। সকলেই মুলধন আর সুদের বংশজাত এবং রক্তের টান বড় টান। তাই সব অপরাধ এই সব দেশে ধামা চাপা পড়াই স্বাভাবিক।

এই অব্যবস্থা থেকে মাত্র একটি উপায়ে মুক্তি সম্ভব। গ্রেট্ বৃটেন্ ও ফ্রান্সের প্রগতিপন্থী শক্তিগুলিকে সুসংহত হতে হবে। প্রতিক্রয়াশীল ফ্যাশিষ্ট্-পন্থী চেম্বারলেন ও দালাদিয়ে গবর্ণ-মেণ্টকে বিতাড়িত করতে হবে। সেইজন্য গ্রেট্ বৃটেনের লেবরপার্টি, সোশ্যালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট্ এবং ফ্রান্সের সোশ্যালিষ্ট্ ও কম্যুনিষ্টদের 'ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট্' গঠন করতে হবে বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে। এ ভিন্ন ফ্যাশিষ্ট স্বৈরাচার ও আক্রমণ প্রতিরোধের কোন উপায় নেই।

ফ্যাশিষ্টদের স্বৈরাচার ও আক্রমণের পথ দিন দিন আরও পরিষ্কার হ'চ্ছে কারণ সোভিয়েট রাশিয়া, গ্রেট্ বৃটেন্ ও ফ্রান্সের মধ্যে যে একটা ফ্যাশিষ্ট্-বিরোধী চুক্তি হবার কথা গত ছ' মাস ধরে' শুনে আসছি তার আজও কোন মীমাংসা হয় নি। রয়টারের মারফৎ শোনা গেছে যে এই আলোচনায় নাকি সম্প্রতি কিছু আশার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। হ'তেও পারে। কারণ যে-চুক্তিতে সামরিক গুরুত্বই বেশী, সেখানে সামরিক বিভাগের সঙ্গে আলোচনা হওয়াই বাঞ্ছনীয়। গ্রেট্ বৃটেন্ ও ফ্রান্সের সামরিক বিভাগের প্রতিনিধিরা রাশিয়ার সমর বিভাগের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে আলোচনা করতে গেছেন। এতেও যদি কিছু মীমাংসা না হয় তা হ'লে আর কোন সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা

যাচ্ছে না। এ বিষয়ে আলোচনা মস্কোতে খুব কমই হ'য়ে থাকে। কোন প্রকারের সমরাতঙ্ক যা'তে সোভিয়েট অধিবাসীকে উত্তেজিত না করতে পারে তার জন্য সাংবাদিকরা বিশেষ যত্নবান। পত্রিকায় শুধু সামান্য কয়েকটি লাইনের মধ্যে গ্রেট্ বৃটেন ও ফ্রান্সের সমর প্রতিনিধিদের মস্কো পৌঁছানোর সংবাদ প্রকাশিত হ'য়েছিল। এ-ছাড়া কিছুদিন আগে সুপ্রীম সোভিয়েটের ডেপুটী চেম্বারলেনের এই দীর্ঘসূত্র নীতি ব্যাখ্যা করে' 'প্রাভ্দা'-তে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া ও ফিন্ল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা আক্রমণকারীরা ক্ষুন্ন করলে তাদের তৎক্ষণাৎ সাহায্য করার সর্ত্তে চুক্তি করতে গ্রেট্ বৃটেন্ রাজী হ'চ্ছে না। বৃটেনের অজুহাত হচ্ছে যে এই রাষ্ট্রগুলি ঐ ধরণের চুক্তি চায় না। আসলে এ অজুহাত অর্থহীন ও ভিত্তিহীন। এই রকমের নানা রকম অজুহাত দিয়ে বৃটেন এই চুক্তিতে বাধা দিচ্ছে অথচ প্রেসের মারফৎ তাদের আন্তরিকতা সম্বন্ধে ঢাক পিট্তে কুণ্ঠিত হ'চ্ছে না। সংক্ষেপে, আজও গ্রেট্ বৃটেনের মনোভাবের কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নি, বরং উত্তরোত্তর প্রতিক্রিয়াশীলতাই বৃদ্ধি পা'চ্ছে।

ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী চুক্তির পথে এই সব নানারকম অন্তরায়ের মধ্যে রুজভেল্টের নিরপেক্ষতার বিল সংশোধন করার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার সংবাদে আমরা সকলেই আঘাত পেয়েছি। নিরাশ হই নি। কারণ সেনেটের এই সাম্প্রতিক জয়ের আয়ু সম্বন্ধে সকলেই বিশেষ সন্দিহান। তবে পরাজয় ক্ষণস্থায়ী হ'লেও এর প্রতিক্রিয়া খুব দ্রুত গতিতে সুরু হয়েছে। বৃটেনের ফ্যাশিষ্ট্-পন্থী বৈদেশিক নীতি যখন অপরিবর্ত্তনীয় তখন রুজভেল্টের এই পরাজয় সাময়িক হ'লেও শান্তি প্রতিষ্ঠার পথের দুর্গমতা এতে অনেকখানি বাড়ল।

এর প্রথম প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রাচ্যে দেখা যায়। তিয়েনৎসিনের বিদেশী এলাকায় জাপানের ঔদ্ধত্য বেড়ে গেছে। ক্রেইগি-আরিতা চুক্তি চেম্বারলেনের বিশ্বাসঘাতকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। এই চুক্তিতে চীনের গণতান্ত্রিক স্বার্থ যথেষ্ট ক্ষুন্ন হয়েছে। পাঠকের নিশ্চয় স্মরণ আছে স্পেনের যুদ্ধের সময় ফ্রাঙ্কোর সৈন্যরা বিমানপোত থেকে বোমা বর্ষণ করে' যখন বৃটিশ জাহাজ ও সৈন্যদের ধ্বংস করত তখন চেম্বারলেনের কাছে কৈফিয়ৎ তলপ্ করলে তিনি গোপাল ভাঁড়ের মত হেসে সব অপমান গলাধঃকরণ করে' দিব্যি সাফাই গাইতেন। নিওঁ চুক্তি তখন ওয়েষ্ট পেপার বাস্কেটে। মিনর্কার ব্যাপারে ডেভন্শায়ারের কথাও আমরা ভুলি নি। সুদূর প্রাচ্যে আজ তারই পুনরাবৃত্তি। স্পেনীয় অন্তর্বিপ্লবে 'নিরপেক্ষ নীতি'র প্রতিলিপি হ'চ্ছে সুদূর প্রাচ্যের 'ক্রেইগি-আরিতা' চুক্তি।

ক্রেইগি-আরিতা চুক্তির সারমর্ম্ম হ'চ্ছে' বৃটেন জাপানের বশ্যতা স্বীকার করেছে। চীনে যে সব অঞ্চল জাপান দখল করেছে সেখানে শৃঙ্খলা রক্ষার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা জাপানের আছে। বৃটেন কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করবে না। চীনে জাপানের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে বৃটেন কোন রকম বাধা দেবে না। স্মরণ থাকা উচিত, গত ৯ই এপ্রিল উত্তর চীনের একজন কাষ্টাম্‌স্ সুপারিন্‌টেন্‌ডেন্ট্ চ্যাং শি-ক্যাং-কে হত্যা করার জন্য চারজন চীনাকে অভিযুক্ত করা হয়। জাপান এই ব্যাপারটা একটা নিরপেক্ষ কমিশনের কাছে পর্য্যন্ত তদন্ত করতে দিতে রাজী হয় না। ফলে গত ১৪ই জুন তিয়েনৎসিনের বিদেশী এলাকা আক্রমণ করা হয় এবং সেখানকার বৃটিশ বাসিন্দাদের উপর অকথ্য অত্যাচার, জুলুম চলতে থাকে। আজ চেম্বারলেন সাহেব তাদের জাপানীদের হাতে নির্লিপ্তভাবে সমর্পণ করতে স্বীকার করেছেন। দু' জনকে খুনের অপরাধে এবং আর দু' জনকে অবৈধ সঙ্ঘের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য অভিযুক্ত করা হয়েছে। বৃটিশ প্রেস এর তীব্র প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু তাতে কি হবে? বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর এই নির্লজ্জ criminalityর কোন মার্জ্জনা নেই। এর প্রতিদান আছে। চীনের জনগণ এর উপযুক্ত প্রতিদান দেবেই। শুধু তাই নয়। পৃথিবীর জনগণের এই প্রতিদান দেবার পূর্ণ প্রস্তুতির আর দেরী নেই।

সুদূর প্রাচ্যে যে ষড়যন্ত্র ভারতবর্ষে আজ তারই প্রতিচ্ছায়া। দ্বিতীয় সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের মেঘ বেশ জমে উঠছে। এ-অঞ্চলে, সে-প্রান্তে বিদ্যুতের ঝিলিকও চোখে পড়ে। ফেডারেশন কায়েম না করলে উপায় নেই। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের উর্দ্ধতন বুর্জ্জোয়াগোষ্ঠীর সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তাই মনোভাবের চুক্তি হ'য়েছে। ওয়ার্দ্ধার যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব আজ বড় হরফে প্রকাশিত হ'লেও, ওয়ার্দ্ধার বিচারের কাছে তার কোন মূল্য নেই। ও-রকম অনেক প্রস্তাবই গান্ধী-প্রসাদ-প্যাটেল-নেহেরুর নোটবুকে আছে। একে একে সমস্ত 'undesirable element'কে মাথায় ঘোল ঢেলে কুলোর বাতাস দিয়ে কংগ্রেসের বাইরে তাড়িয়ে দেওয়া হ'ল। দেশাই-জী-দেও-এর পোয়া বারো। প্যাটেল হুঙ্কার দিয়ে সবরমতীর আখ্‌ড়ায় এইবার পালোয়ানী তাল ঠুকবেন। গান্ধীজী ভাবছেন এইবার ঠিক হয়েছে, বড়েটাকে আর একটা ঘর টিপে দিলেই কিস্তী মাত্। অর্থাৎ 'ফেডারেল্ ইণ্ডিয়া'। স্বাধীন ভারতের সঙ্গে তার আর এমন কি তফাৎ?

সুভাষবাবু বলেছেন তিনি আদৌ দুঃখিত হন নি, কারণ এটা স্বাভাবিক। আমরাও তাই বলি। কারণ আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ক্রমবিবর্ত্তনে দক্ষিণপন্থীদের আক্রমণ যে ক্রমেই তীব্রতর হবে এর পিছনে ঐতিহাসিক যুক্তি রয়েছে। তা না হ'লে আজ ৯ই জুলাই-এর প্রতিবাদের বিপক্ষে এবং ওয়ার্দ্ধার বিচারের স্বপক্ষে জওহরলালের 'ন্যাশানাল্ হেরাল্ড্' আর ফিরিঙ্গিমহলের 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্' ঐক্যতানই বা গাইবে কেন? সুভাষবাবু বলেছেন তিনি আরও বেশী উৎসাহের সঙ্গে

কংগ্রেসের কাজে মনোনিবেশ করবেন। সোশ্যালিষ্ট, কম্যুনিষ্ট, কিষাণসভা ও ফরোয়ার্ড ব্লক্ আজ একত্রে অভিযান সুরু করুক। জয় হবেই। বামপন্থী সমন্বয় কমিটি শক্তিশালী হবে। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের পরাজয় ঘটবে।

মূলে যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, তার দিন ফুরিয়ে এসেছে। লেবর পার্টির আজও চৈতন্য হয় নি, তাই ইউরোপে ফ্যাশিষ্ট ঔদ্ধত্য অপ্রতিহত। কিন্তু সুদূর প্রাচ্যে রীতিমত কঠিন পরীক্ষা দিতে হবে। সে পরীক্ষায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ উত্তীর্ণ হবে না। কারণ চীণ আজ সঙ্ঘবদ্ধ।

চীন-জাপান যুদ্ধের খবর পাওয়া গেছে যে চীনা সৈন্যরা দক্ষিণ চীনের পূর্ব্ব কোয়ানটুং প্রদেশ প্রতি-আক্রমণের ফলে চাও-চো পুনরুদ্ধার করেছে। চাও-চো পুনরুদ্ধার করার ফলে আর চারটি সহর চীনাদের দখলে এসেছে,—আপু, ফু-ইয়াং, টোপু পিচিয়াশান্ ও হান্‌শান্। চীনা সৈন্যরা সারারাত যুদ্ধ করে' য়ুঙ্কি সহরও দখল করেছে। শান্সী থেকে খবর এসেছে যে চীনা গরিলা ভীষণ বৃষ্টির মাঝখানেও দু'টো জাপানী ডিভিশনকে হটিয়ে দিয়েছে। চুংকিং থেকে চীনাদের আরও কয়েকটি সীমান্তে জয়ের সংবাদ এসেছে। উত্তর হ্যাঙ্কাউ-এর চীনা সৈন্যরা প্রতি-আক্রমণ করে' পাইপিং-হ্যাঙ্কাউ রেলপথের পাশের মিংকিং সহর অধিকার করেছে।

এ-ছাড়া জাপানের আভ্যন্তরীণ সমস্যাও ক্রমে গুরুতর হ'য়ে উঠছে। বৈদেশিক সংবাদে প্রকাশ যে ক্রমে জাপানের জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধ-বিরোধী মনোভাব প্রবল হ'য়ে উঠছে। একটি যুদ্ধ-বিরোধী দল উত্তর জাপানের হোপিডোতে ইওয়ামিজাওয়া রেলপথ ভেঙে দিয়েছে। ছাত্ররা কিউটোতে স্কুলঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। কোরিয়া, সাইসিন্ ও রুজানে ভীষণভাবে লুঠতরাজ ও জ্বালানি আরম্ভ হয়েছে। জাপানী-কর্ত্তারা কয়েক দিনের মধ্যে যুদ্ধবিরোধী বলে' সন্দেহ করে' প্রায় ৪০০ জন জাপানীকে বন্দী করেছেন। এই সব সংবাদ ছোট হরফে প্রকাশিত হ'লেও এদের গুরুত্ব বড় হেড্-লাইনের চাইতে লক্ষগুণ বেশী।

তবু এখন চীনের দিক থেকে যুদ্ধের তৃতীয় পর্ব্ব আসে নি। তাই বিশ্বাস হয় সাংহাই আক্রমণের দ্বিতীয় বৎসর পদার্পণে মার্শাল চিয়াং কাইসেক যা ঘোষণা করেছেন তা মিথ্যা নয়। চিয়াং কাইসেক বলেছেন যে ক্রমেই চীন সাফল্যের দিকে অগ্রসর হ'চ্ছে। সাফল্যের আর বিলম্ব নেই। জাপানের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ ধ্বংস হবে। বৃটিশের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত ধূলিসাৎ হবে।

সংগ্রামরত জাতির নেতা চিয়াং-কাই-সেক্ ও যোদ্ধা চীনাদের মত ভারতের ও বিশ্বের সংগ্রাম-সম্মুখীন নেতা ও যোদ্ধাদের কোন বিখ্যাত সত্যদর্শীর ভাষায় বলতে চাই : "Soar above

the conspiring clouds, and say: we see the sun." ধনিকবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ অস্তাচলে। পূর্ব্বাচলে রক্তিম আভায় সমাজতন্ত্রবাদের আগমনী।

শেষকালে একটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার প্রবল ইচ্ছা হ'চ্ছে। দৃষ্টান্তটি আমার নয়। কিছুদিন আগে লণ্ডনে যে বিশ্বশান্তি সম্মেলন হ'য়ে গেল, সেই সম্মেলনে এক কাফ্রি তরুণ এই দৃষ্টান্তটি দিয়েছিলেন। এক বৃদ্ধ মনিব রোজ গাড়ীতে করে' বেড়াতে যেতেন। পথে গাড়ীর ঘোড়াকে বোল্‌তায় কামড়াত। মনিব বিরক্ত হতেন। একদিন হঠাৎ যেতে যেতে দেখেন এক জায়গায় একটা বোল্‌তার চাক্ হয়েছে। দেখে, মহা আনন্দে মনিব কোচমান্‌কে বল্‌লেন, "প্লুটো, ভালই হয়েছে, সব বোল্‌তাগুলোকে এইবার একসঙ্গে মেরে ফ্যালো।" প্লুটো বল্‌লে, "না মশাই, তা হয় না। ওরা সঙ্ঘবদ্ধ রয়েছে।"

প্লুটোর উত্তরের মধ্যে আমাদের অনেক কিছু চিন্তার খোরাক আছে।

১৪ই আগষ্ট, ১৯৩৯ বিনয় ঘোষ

কলিকাতা

আধ্যাত্মিকতা ও মায়াবাদ

অনিলবরণ রায়

আমার শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র রায় কয়েকটি গুরুত্ব-পূর্ণ প্রশ্ন তুলিয়াছেন। এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে সেইগুলির আলোচনা করিব।

শঙ্করের মায়াবাদ ভারতের একটি মজ্জাগত ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে*। এই দৃঢ় মূল ব্যাধির প্রতিকার না হইলে ভারতে নব জাতি, নূতন জীবন গঠনের সকল স্বপ্নই ব্যর্থ হইবে। অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, শাঙ্করমায়াবাদের দোষ নাই, মায়াবাদের অপব্যাখ্যা বা ভুল ধারণা হইতেই ভারতবাসী পৃথিবী-বিমুখ হইয়া ইহকাল পরকাল হারাইয়াছে। কিন্তু যে মায়াবাদের, যে গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্বের এরূপ সাংঘাতিক অপব্যাখ্যা ও ভুল ধারণা করা সম্ভব জনসাধারণের মধ্যে তাহার এরূপ বিস্তৃত ও ব্যাপক প্রচার করা কি ঠিক হইয়াছিল? মায়াবাদ হইতে লাভবান হইতে পারে এমন কয়েকজন উপযুক্ত ও অধিকারী শিষ্যের নিকটে শঙ্কর যদি উহা বিবৃত করিতেন এবং অনধিকারীর নিকট, সাধারণের নিকট যাহাতে উহা উত্থাপন করা না হয় তাহার নির্দ্দেশ দিতেন তাহা হইলে ভারতের আজ এই শোচনীয় দুর্গতি হইত কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের স্থান আছে।

* স্বামী বিবেকানন্দ, আধুনিক অধ্যাপকগণ, এমন কি মহাত্মা গান্ধী পর্য্যন্ত ইহার প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই।

গীতা এইরূপ বিভ্রাট আশঙ্কা করিয়া অনেক পূর্ব্বেই সাবধান করিয়া দিয়াছিল,

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥ ৩।২৬

জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিবেন, কিন্তু যে-সব অজ্ঞ ব্যক্তি বাসনা ও আসক্তি লইয়া কর্ম্ম করিতেছে তাহাদের বুদ্ধিভেদ ঘটাইতে নাই, কারণ ঐরূপ কর্ম্মের ভিতর দিয়াই তাহাদের প্রকৃতির, তাহাদের চরিত্রের বিকাশ হইতেছে, ঐ অবস্থায় যদি তাহারা কর্ম্মে উৎসাহ হারায়, কর্ম্ম পরিত্যাগ করে তাহা হইলে তাহাদের সর্ব্বনাশ হইবে। শঙ্কর আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষে যে মায়াবাদের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে ভারতবাসী বুঝিয়াছিল এই সংসার, এই সংসারের জীবন ও কর্ম্ম সবই মিথ্যা, মায়া—এই সাংসারিক জীবন হইতে সরিয়া নিশ্চল, নীরব নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মে লয় হওয়াই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া কেহ কি জীবনের, সংসারের উন্নতি করিতে প্রেরণা পাইতে পারে, উৎসাহ পাইতে পারে ?

শঙ্কর অবশ্য বলিয়াছিলেন, এই সংসারের ব্যবহারিক সত্তা আছে, যতদিন সংসারে রহিয়াছ ততদিন কর্ম্ম করিতে হইবে। কারণ কর্ম্মের দ্বারাই জ্ঞান লাভে সহায়তা হয় এবং তখনই এই সংসাররূপ মায়া হইতে মুক্তি। কিন্তু মানব জীবনকে সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ ও বিকশিত করিয়া তুলিবার জন্য যে বিরাট কর্ম্মের প্রয়োজন, তাহার প্রেরণা এই শিক্ষার মধ্যে নাই। চিত্তশুদ্ধির জন্য যতটুকু প্রয়োজন পূজা আহ্নিক প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম এবং কোনরকম জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই যথেষ্ট। আর, যখন জ্ঞানলাভ হইয়াছে তখন আর এ-সব কর্ম্মেরও প্রয়োজন নাই—যতদিন এই দেহটির পতন না হইতেছে ততদিন কৌপীন সম্বল করিয়া ভিক্ষার উপর নির্ভর করিয়া ঘুরিয়া বেড়ান—ইহাই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য ও শ্রেষ্ঠ পরিণতি !

বৌদ্ধ ভিক্ষুরা যে আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সেইটিকেই আরও বহু বিস্তৃত ভাবে প্রচার করিলেন, কৌপীন ও গেরুয়া পরিহিত কর্ম্মহীন ভিক্ষাবলম্বী সন্ন্যাসীগণ দেশময় ঘুরিয়া সমস্ত দেশের জীবনের গতিকেই ঘুরাইয়া দিলেন। সকলেই অবশ্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারে নাই, কিন্তু সংসারকেও তাহারা আর ভাল চক্ষে দেখিতে পারে নাই। সংসার করাটা যেন একটা মহা অপরাধ, এক রকম শাস্তিভোগ, নরকভোগ—এই ধারণা লইয়া যাহারা সংসার করে তাহাদের দ্বারা দেশের, জাতির কতটা উন্নতি হইতে পারে ? ভারতের অন্যান্য জাতি যখন এই পৃথিবীটাকে পূর্ণভাবে ভোগ করিবার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা পাইয়া বিপুল কর্ম্মে মত্ত,

গিয়া সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে

সকার্য্য সাধনে অগ্রসর হইতেছে, তখন ভারতের পল্লীতে পল্লীতে ধ্বনিত হইতেছে,

কি ছার আর কেন মায়া
কাঞ্চন কায়া ত রবে না !

গীতা এই বিপদ আশঙ্কা করিয়াই অতি স্পষ্টভাবে পৃথিবীকে ভোগ করিবার আদর্শ ভারতবাসীর সম্মুখে ধরিয়াছিল, ভোক্ষ্যসে মহীম। আর যাহাতে ভারতবাসী কর্ম্মে বিমুখ না হয়, সেজন্য ভগবান নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিয়াছিলেন, সংসারে আমার নিজের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও আমি অতন্দ্রভাবে কর্ম্ম করি, বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি। গীতার এই সুস্পষ্ট শিক্ষাকে কূট তর্কের দ্বারা বিকৃত করিয়া শঙ্কর প্রচার করিলেন, সংসার ত্যাগ, কর্ম্ম ত্যাগ মানব জীবনের প্রকৃত অর্থ এবং চরম লক্ষ্য। বর্ত্তমানে গীতাই হিন্দুর প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র, অধ্যাত্মশাস্ত্র—কারণ বেদ উপনিষদের অর্থ বুঝা সহজ নহে ; গীতা বেদ ও উপনিষদের সার, গীতার ভাষা সকলেরই বোধগম্য, সকলেই উহা হইতে নিজ নিজ অধ্যাত্ম জীবন গঠন উপযোগী শিক্ষাগুলি করিতে পারে। কিন্তু ভারতের বিংশ কোটি হিন্দুর সম্বল এই গীতার যে ব্যাখ্যা শঙ্কর করিয়া দিয়াছেন* তাহাতে গীতা হইতে তাহারা সংসারিক জীবনের উন্নতিতে কোন প্রেরণা বা উৎসাহ লাভ করিতে পারিবে না, তাই স্বর্গীয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের মত বলিতে হয়,

শিরে কৈলা সর্পাঘাত
কোথায় বাঁধিবি তাগা।

অনেকেই আজকাল বলিতেছেন যে, শঙ্করের মায়াবাদ জগৎকে উড়াইয়া দেয় নাই। জগতের একটা ব্যবহারিক ও সাময়িক অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করিয়াছেন। সেটি কি রকম, মরুভূমিতে মরীচিকার দৃষ্টান্তের দ্বারাই তাহা বেশ বুঝা যায়। মরীচিকায় জল দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ জল কাহারও কল্পনার সৃষ্টি নহে, শুধু একজন লোকই ঐ জল দেখে না। যত লোক সেই সময়ে সেখানে উপস্থিত থাকে সকলেই জল দেখিতে পায়। অথচ যেখানে জল দেখিতে পাওয়া যায় সেখানে উপস্থিত হইলে জলের চিহ্ন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় না। মরুভূমির সেই স্থান যেমন ঊষর বালুতে পূর্ণ ঠিক তেমনিই থাকে, তাহার কোন পরিবর্ত্তন হয় না, অথচ কিছুকালের জন্য তাহার উপর জলের একটি দৃশ্য সৃষ্ট হয়। এই দৃশ্য মোটেই মিথ্যা নহে, ইহা বাস্তব সত্য। জগৎটা এইরূপই একটা দৃশ্য, মায়া কর্ত্তৃক ক্ষণিকের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, যতক্ষণ আমরা এই মায়ার অধীন ততক্ষণ উহা সত্য, মায়ার শেষ হইলেই উহার শেষ। ইহাই সংক্ষেপে শঙ্করের মায়াবাদ। কিন্তু ইহাতে জগতের যে বাস্তবটা স্বীকৃত হইল—ইহা হইতে কেহ কি ঐ জগতের উন্নতি করিবার, ঐ জগতের জীবনকে সকল দিক হইতে পূর্ণ ও সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার প্রেরণা পাইতে পারে ? বস্তুতঃ মানুষ যেমন স্বপ্ন দেখিয়া হাসে কাঁদে, এই জগতের হাসি কান্না তেমনিই অলীক। ইহার কোন সার্থকতাই নাই।—স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে এ-সব কিছুই থাকিবে না—থাকিবে শুধু এক অদ্বিতীয় শাশ্বত আত্মার মধ্যে অনন্ত শান্তি। সংসারের জ্বালায় জর্জ্জরিত লোকের পক্ষে এই নির্ব্বাণ ও শান্তির বাণী অতিশয় মুগ্ধকর। আজকাল পাশ্চাত্য দেশের লোকও উত্তরোত্তর ইহাতে মুগ্ধ হইতেছে।

* বর্ত্তমানে আমাদের দেশে গীতার যত সংস্করণ প্রচলিত আছে সে-সবই হইতেছে মূলতঃ শাঙ্কর ভাষ্যের অনুযায়ী এবং মায়াবাদমূলক।

এই নির্ব্বাণের শান্তি আমাদিগকে লাভ করিতেই হইবে। বর্ত্তমান মানব জীবন যেরূপ দ্বন্দ্ব ও অশান্তিতে পূর্ণ ইহার মধ্যে প্রকৃত সুখ ও আনন্দের আশা করা মরীচিকায় জলের আশা করার মতই বৃথা। আর এই শান্তিলাভের উপায় হইতেছে জ্ঞান—ব্রহ্ম জ্ঞান। আমরা যে আমাদের ক্ষুদ্র অহংকেই আমাদের প্রকৃত সত্তা বলিয়া মনে করি, এবং নিজদিগকে জগতের আর সব ব্যক্তি, সব বস্তু হইতে পৃথক বলিয়া মনে করি—এই অহং জ্ঞানই আমাদের যত দুঃখ ও দ্বন্দ্বের মূল—এই অহংভাব আমাদিগকে দূর করিতেই হইবে, জ্ঞানলাভের দ্বারা উপলব্ধি করিতে হইবে যে, এ বিশ্বের কেবল একটি সত্য বস্তু আছে, ব্রহ্ম, এবং আমরা সকলেই সেই ব্রহ্ম। এই পর্য্যন্ত শঙ্করের সহিত আমাদের কোন বিরোধই নাই—আর এইটি হইতেছে অধ্যাত্ম জীবনের, দিব্য জীবনের ভিত্তি। কিন্তু ইহার জন্য কি জগৎকে, জগতের জীবনকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার অবশ্য প্রয়োজনীয়তা আছে?

শঙ্কর বলিয়াছেন, জগৎ কখনও সৃষ্ট হয় নাই, উহা কেবল ভ্রম; মরুভূমি মরুভূমিই, সেখানে জল কোথাও নাই, আছে শুধু জলের মায়া-সৃষ্ট দৃশ্য। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান দেখাইয়াছে যে, মরীচিকায় যাহা দেখা যায় তাহা বাস্তবিকই জল, তাহা মায়াও নহে, ভ্রান্তিও নহে। কেবল জলটি যেখানে আছে সেখানে না দেখিয়া সেটিকে অন্যস্থানে দেখা যায়—ইহাই মরীচিকার ভ্রম। একটা সোজা ছড়ির আধখানা জলের নীচে রাখিলে সেটাকে বাঁকা দেখায়, কারণ জলের নীচে ছড়িটা যেখানে রহিয়াছে সেখানে সেটাকে আমরা না দেখিয়া আর একটু দূরে দেখি—ইহাকে বলে Refraction। মরুভূমির বালুর উত্তাপে বায়ুর বিভিন্ন স্তরের densityতে যে বিভিন্নতা হয় তাহারই ফলে এই refraction হয়—মরুভূমিতে Oasis (ওয়েসিস) যেখানে রহিয়াছে সেখানে তাহা দেখিতে না পাইয়া আমরা সেটিকে অন্য স্থানে দেখি, সেইজন্যই সেখানে উপস্থিত হইয়া আর জলের চিহ্নও দেখিতে পাই না। জগৎ সম্বন্ধে আমাদের ভ্রান্তি অনেকটা এইরকমই। জগৎ সত্য সত্যই আছে। ব্রহ্মই এই অসংখ্য জীব ও জগৎ হইয়াছেন নিজেকে অনন্তভাবে আস্বাদন করিবার জন্য, তিনি সচ্চিদানন্দ, জগতের প্রত্যেক জিনিষই মূলতঃ সচ্চিদানন্দ, কিন্তু জগতের এই প্রকৃত স্বরূপটি আমাদের কাছে ঢাকা রহিয়াছে আমাদের অহংভাবের অজ্ঞানের দ্বারা এবং ইহাই মায়া। এই অজ্ঞান দূর করিতে হইবে, আমাদের মধ্যে ভগবানের যে সত্তা রহিয়াছে, যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ রহিয়াছে তাহাকে প্রকট করিতে হইবে, জগতে যে সত্য, শিব, সুন্দর প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার প্রকট করিতে হইবে। সকল মানুষের সহিত আমাদের একত্ব অনুভব করিতে হইবে। নিজেদের পূর্ণতার জন্যই সকলের পূর্ণতা সাধন করিতে হইবে, এইভাবেই মানুষের ভিতর দিয়া ভগবানের বিশ্ব-উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে এই মাটির পৃথিবীতেই দিব্য জীবনের প্রতিষ্ঠা হইবে। এই মত অনুসারে জগৎ ব্রহ্মের লীলা আত্ম-প্রকাশ, ব্রহ্মকে লাভ করিতে হইলে এই জগৎকে, জগতের জীবনকে ছাড়িয়া যাইবার কোন প্রয়োজন নাই; সর্ব্বত্র সকল কর্ম্মে, সকল মনুষ্যের মধ্যে ব্রহ্মের সন্ধান করিতে হইবে, তাহার সহিত নিবিড়ভাবে মিলিত হইতে হইবে। কিন্তু শঙ্করের মতে

এই জগৎ ব্রহ্মের লীলা নহে, ইহা একটা nightmare এর মত, এক কূট অবিদ্যা মায়া শক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, সে মায়া কাহার, কোথা হইতে আসিয়াছে, কেমন করিয়া ব্রহ্মের মধ্যে সে এই জগৎ ভ্রমের সৃষ্টি করিতেছে, কেন করিতেছে—এ-সব-প্রশ্নের কোন উত্তর শঙ্করের মায়াবাদে নাই। এই দুইটি মতের কোনটি সত্য এখানে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব না, বস্তুতঃ ইহা যুক্তি বিচারের জিনিষ নহে, ইহা অধ্যাত্ম দৃষ্টি ও অনুভূতির জিনিষ। মায়াবাদ আমাদের হৃদয়ে সাড়া তুলিতে পারে না, গীতায় কোথাও আমরা এই মায়াবাদের সমর্থন পাই নাই। শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভূতি এই মায়াবাদের বিরোধী, তিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন, "যে ইট, চুন, সুরকি থেকে ছাদ, সেই ইট চুন সুরকি থেকেই সিড়ি। যিনি ব্রহ্ম তাঁর সত্তাতেই জীব জগৎ।" তিনি বলিয়াছেন যে, এই জগৎ ব্রহ্মের শক্তির দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, যে শক্তি জড়, অবিদ্যা, মায়া নহে। সে শক্তি চিন্ময়ী সচ্চিদানন্দময়ী তাহা হইলে এই সংসারের জীবন ছাড়িয়া যাইবার স্বার্থকতা কোথায়? যে-সকল জিনিষ সংসারে আনন্দময়ীর আনন্দের প্রকাশকে। সত্য, শিব, সুন্দরের প্রকাশকে বাধা দিতেছে, সেইগুলিকে দূর করাই আমাদের জীবনের সাধনা হওয়া উচিত; যেন জগৎ মাঝে আনন্দময়ী মায়ের রাজ্য চির-প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্প্রতি ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের একজন সভ্য বলিয়াছিলেন যে, জাতি সকলের ফেডারেশন এবং বিশ্ব-পার্লামেণ্ট স্থাপনের উদ্দেশ্য লইয়া প্রধান মন্ত্রীর কর্ত্তব্য প্রেসিডেণ্ট রুজ্‌ভেণ্টের সহিত পরামর্শ করা। ইহার উত্তরে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে সম্প্রতি মিঃ বাটলার পার্লামেণ্টের সভায় ঘোষণা করিয়াছেন, "The present circumstances do not seem propitious for any such initiative. অর্থাৎ এরূপ চেষ্টা আরম্ভ করিবার মত উপযোগী পরিস্থিতি এখনও হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ইহা বলাই বাহুল্য, কিন্তু এই আদর্শের পথে প্রকৃত বাধা কি, কি করিলে বর্ত্তমান পরিস্থিতির প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন হইতে পারে, প্রত্যেক দেশের গবর্ণমেণ্ট তাহাদের দেশবাসীর কোন পথে পরিচালিত করিলে একদিন জগতে বিশ্ব-মানব-পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়া চির-শান্তি বিরাজ করিবে—এ-সব প্রশ্ন লইয়া কোন দেশের রাজনীতিকগণ বিশেষ মাথা ঘামাইতেছেন বলিয়া কোন পরিচয় এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। শ্রীঅরবিন্দ বাইশ বৎসর পূর্ব্বে Arya পত্রিকায় প্রকাশিত The Ideal of Human Unity গ্রন্থে এই প্রশ্নগুলির যে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করিয়াছিলেন—তাহার গভীর সার্থকতা ও সততা পরবর্ত্তী ঘটনা সমূহের দ্বারা বিশেষভাবেই প্রমাণিত হইয়াছে ও হইতেছে। ঐ পুস্তকে তিনি সকল দিক হইতে বিবেচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সমগ্র মানব জাতির মিলন—এ সবই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপটিকে পাইতে পারে আধ্যাত্মিকতাকে ধরিয়া। আদর্শ মানব সমাজে মানুষ কেবল ধর্ম্মীয় স্বাধীনতাই পাইবে না পরন্তু তাহার ভিত্তিই হইবে আধ্যাত্মিকতা। সে সমাজে ব্যক্তি ব্যক্তিকে, জাতি জাতিকে পর ভাবিয়া গ্রাস করিয়া হজম করিয়া সমৃদ্ধ হইতে

চাহিবে না, পরন্তু মূল সত্তায় সকলে সকলের সহিত ঐক্য উপলব্ধি করিয়া পরস্পারের সহিত মুক্ত আদান প্রদানের দ্বারাই সমৃদ্ধ হইবে। গীতায় যেমন বলা হইয়াছে,

পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ।

তাহা হইলে একমাত্র যে জিনিষটির মধ্যেই জীবনের সকল সমস্যার চরম সমাধান নিহিত রহিয়াছে ঠিক সেইটিকেই অবজ্ঞা করিলে, সেইটির দিকেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রাখিলে চলিবে কেন ?

অনিলচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন গীতার "স্বধর্ম্ম" সম্বন্ধে। মানুষের দেহ, প্রাণ, মন কোনটিই তাহার প্রকৃত "স্ব" নহে, এগুলি কেবল তাহার "স্ব"কে বিকশিত করিবার, প্রকট করিবার যন্ত্র ও নিমিত্ত মাত্র। মানুষ কোন্ জন্মে কোন্ দেহ গ্রহণ করিবে, কোন্ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিবে তাহা তাহার "স্ব"এর বিকাশের অবস্থা ও প্রয়োজনের উপর নির্ভর করে, গীতা কথায় স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে। এই "স্ব" বা স্বভাব কি বস্তু ? গীতায় বলা হইয়াছে প্রত্যেক জীবই হইতেছে ভগবানের অংশ, মমৈবাংশঃ, প্রত্যেকেই ভগবানের একটি শক্তি, একটি ভাবকে প্রকট করিবার জন্য বিশ্ব লীলায় আবির্ভূত হইয়াছে, সেইটিই তাহার স্বভাব, সেইটিই তাহার জন্ম জন্মান্তরের গতি নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়। মানুষের কর্ম্ম কোন বাহ্য বিধি নিষেধ বা আদর্শ দ্বারা, কোন বাহ্য প্রয়োজনের দ্বারা নির্দ্ধারণ না করিয়া তাহার এই ভিতরের স্বভাব অনুযায়ী যদি নির্দ্ধারণ করা হয় তাহা হইলেই তাহার আত্মবিকাশের সুব্যবস্থা হয়। এ সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার Essay on the Gita গ্রন্থে Swabhava and Swadharma প্রবন্ধে সকল দিক দিয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া গীতার গভীর অধ্যাত্ম তত্ত্বটি বুঝাইয়া দিয়াছেন*।

* শ্রীঅরবিন্দের ঐ প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেছে।

গ্রন্থ-পরিচয়

Enquiry Committee Report

—Orissa States, 1939, Cuttack, Rs. 5/- pp. 290

উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যে জনসাধারণের আর্থিক, সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার সম্যক্ বিবরণ সংগ্রহের জন্য হরেকৃষ্ণ মহাতবের সভাপতিত্বে এক অনুসন্ধান কমিটি বসে। আলোচ্য রিপোর্ট উক্ত কমিটি কর্তৃক কিছুদিন হয় প্রকাশিত হয়েছে। সামন্ত রাজ্যে শাসনের নামে কিরূপ শোষণ, উৎপীড়ন ও ব্যভিচার চলে এবং বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুসভ্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আওতায় এমন নগ্ন বর্বরতা সম্ভব, এ রিপোর্ট না পড়লে বিশ্বাস হয় না। এ মূল্যবান রিপোর্ট প্রণয়নে দেশীয় রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে অনেক খবর দেশবাসীর নিকট প্রকাশিত হল। সামন্ত রাজ্যে আজকাল গণআন্দোলন, ও প্রজাবিক্ষোভ কেন এত প্রবল ও ব্যাপক কমিটি তার কারণ নির্দেশ করেছে।

উড়িষ্যায় ২৬টি ছোট বড় সামন্ত রাজ্য আছে। শাসন কার্যে এখনও মধ্যযুগীয় স্বৈরাচার-নীতি প্রচলিত। সমাজ, ধর্ম ও অর্থনৈতিক অবস্থা আদি ঐতিহাসিকে যুগের চেয়ে বিশেষ উন্নত বলা চলে না। এজন্য কমিটীকে বিশেষ প্রতিকূল অবস্থায় অনুসন্ধান ও রিপোর্ট তৈরী করতে হয়েছে। প্রায় ২,০০০ হাজার লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ ও প্রশ্নোত্তর সংগ্রহ করা হয়েছে। দু'খণ্ড রিপোর্টের মধ্যে প্রকাশিত প্রথম খণ্ডে দেশীয় রাজ্য সমস্যা সম্বন্ধে সাধারণ প্রস্তাবনা ও ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যগুলির বিশেষ আলোচনা হয়েছে। অপ্রকাশিত ২য় খণ্ডে গৃহীত বহুল সাক্ষ্য হতে কতগুলি বিশেষ সাক্ষ্য ও মৌলিক দলিল পত্র সঙ্কলিত হবে।

কমিটির সাধারণ বিবৃতির মধ্যে উড়িষ্যার সামন্ত রাজ্যে গণআন্দোলনের ইতিহাস, কৃষক ও প্রজাদের অবস্থা, রাজস্ব বিভাগ, রাজপরিবারের ব্যয়, শাসন পরিচালন, ব্যক্তিস্বাধীনতা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা আছে।

কর ও রাজস্ব বিভাগ

জনসাধারণ অত্যন্ত করভারে পীড়িত। আদায়ের জন্য বল প্রয়োগ বিশেষভাবে প্রচলিত। রাজপরিবারের ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীর উৎসব ব্যসনের জন্য প্রজাদের অতিরিক্ত কর দিতে হয়। লবণ, কেরসিন ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য অনেক জিনিষের উপর শাসকের এক চেটিয়া

অধিকার। কৃষিজাত দ্রব্য বিক্রয়ে নানা বাধা, শাসন কার্যে উশৃঙ্খলতা ও ব্যভিচার, ব্যক্তি স্বাধীনতার একান্ত অভাব ইত্যাদি সব মিলে এক বর্বর যুগের পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে।

কমিটির মতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যে করভার অত্যন্ত বেশী। জমির জন্য উচ্চহারে রাজস্ব আদায় ভিন্ন আরো সেলামী, চৌথ, পথকর, জলকর ইত্যাদি বহু রকম অবৈধ শোষণ প্রথা আছে। আখ চাষ, আখপেষার কল, গরু, ঘোড়ার উপরও কর ধার্য হয়। বিড়ি, তামাক, পান, নারিকেল ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ ও করমুক্ত নয়।

কৃষক

কিষাণান্দোলন ও জনবিক্ষোভের মূলে অর্থনৈতিক দুরবস্থা। কৃষকগণ অত্যন্ত দরিদ্র, ঋণভারে প্রপীড়িত, ও শাসক শ্রেণীর অত্যাচারে জর্জরিত। বিনা মাহিনায় রাজা অথবা রাজকর্মচারীর জন্য অন্ততঃ বছরে ১০০ দিন কাজ করতে হয়। এ জন্য যে কোন সময় প্রজাগণ আহূত হতে পারে। এমন কি জমি রোপন বা কর্ত্তনের সময়ও শাসকদের হুকুম তামিল না করে উপায় নেই। তার উপর আবার ছোট কর্মচারীদের তুষ্ট রাখার জন্য বহু ব্যক্তিগত কাজ করতে হয়। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্‌কালে এক কৃষক সম্রাটের নিকট আবেদন করেছিল 'Most merciful Emperor. for two days in the week I must accompany the lord when he goes out hunting, for two days I must graze his cattle, for two days I must till his land, and the seventh belongs to God. Consider, most merciful Emperor, how can I pay dues & taxes.' উড়িষ্যার বর্ত্তমান অবস্থায় প্রত্যেক কৃষকই একথা বলতে পারে। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে কমিটির মন্তব্য—

১। নারী জাতির কোন সম্মান নেই। সুন্দরী ও যুবতী নারীর বিপদ সবার চেয়ে বেশী। রাজাদের মধ্যে ২।১ জন অবিবাহিত মেয়ে সংগ্রহের জন্য লোক নিয়োগ করে। এমন কি খবরের জন্য টাকা দেয়। মাঝে মাঝে রাজার মটর গাড়ী অতর্কিতভাবে গ্রামে ঢুকে যুবতী স্ত্রীলোক নিয়ে উধাও হয়। কর্মচারিগণও এ ব্যভিচারের সুযোগ নেয়।

২। প্রজাগণ শাসকের অসন্তোষভাজন হলে মিথ্যাভিযোগে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

৩। সহজে বশ্যতা স্বীকার করে না এরূপ প্রজাকে বাড়ী ঘর উৎখাত করে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

৪। রাজার দেশ পর্যটনের জন্য প্রজাদের ব্যয়ভার বহন করতে হয়।

৫। রাজ পরিবারে বিবাহাদি উৎসবে অর্থ উপঢৌকন দিতে হয়। শোষণের আরো অসংখ্য ব্যবস্থার কথা রিপোর্টে উল্লেখ আছে।

কমিটির মতে দেশীয় রাজ্যে স্বৈরাচারের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের দায়ীত্ব অনেক বেশী। বর্ত্তমানে বৃটিশ নীতি হল দেশীয় নৃপতিদের পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি করা। তোপধ্বনি, নূতন সনদের সাহায্যে প্রজার উপর ক্ষমতা দান, নরেন্দ্রমণ্ডলে (Chamber of Princes) সভাপদ প্রদান ইত্যাদির

দ্বারা সরকার রাজন্যবর্গের মনস্তুষ্টি করে। এ উদ্দেশ্য সিদ্ধি ১৯৩১ সালে রাজনৈতিক বিভাগের বিশেষ কর্ম্মচারী মিঃ লোথিয়ান ভারত সরকারকে দেশীয় রাজ্যের স্বৈরাচারে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করেন। উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরস্থিত সামন্ত রাজ্যের পলিটিকেল এজেন্টদের উপর যে গোপন নির্দ্দেশ আছে তার কিছুটা উদ্ধৃত করা গেল :

'The Political Agent should endeavour to convince chiefs who are in charge of the management of their States, that he is anxious to interfere as little as possible, & to treat them as friends. He should never allow it to be thought that he welcomes, far less encourages, petitions against their authority or orders...... His duty in regard to such states is one of general watchfulness & friendly advice & support............'

ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা ও অত্যাচার সম্বন্ধে আলোচনায় ধেনকানেল, তালচের, রাণপুর, গাঙ্গপুর ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

ধেনকানেলে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে নৃশংস বর্বরতা ও ব্যভিচার করা হয়েছে। যুবতী মেয়েদের বলপূর্বক প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া, উলঙ্গ অবস্থায় নৃত্য করতে বাধ্য এবং দলবদ্ধভাবে তাদের উপর পাশবিক অত্যাচার করা রাজপরিবারে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার; এ সকল ব্যাপার বৃটিশ পলিটিকেল এজেন্টের অগোচরে হয়নি। এরূপ অত্যাচার ও অবিচারের ফলে যখনই কোন গণ-বিদ্রোহ হয় তখনই বৃটিশ সৈন্যের সাহায্যে দমন করা হয়। অত্যাচারের ফলে এক বছরের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী তালচের ছেড়ে বৃটিশ প্রদেশে পালিয়ে এসেছে। জ্বলন্ত লৌহ শলাকার সাহায্যে বহু লোককে দাগ মেরে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

রণপুর, গাঙ্গপুরে ও এরূপ দৃষ্টান্ত বহু উল্লেখ করা যায়। বর্তমান গণ-বিক্ষোভ ও গণ-আন্দোলন আলোচনায় কমিটির মন্তব্য হল, 'The present unrest & discontent in Orissa States are not a temporary affair. They have their roots in a situation which is full of potential danger. No temporary expedients or makeshifts are likely to solve the problem.' বহু বছরের অত্যাচার ও শোষণের ফলে যে স্থিত-স্বার্থের উদ্ভব হয়েছে, তা সামান্য আঘাতে বিনষ্ট হবে না। গণ-শক্তির প্রবল প্লাবনে শুধু এ স্থিত-স্বার্থের ভিত্তিভূমি বিধ্বস্ত হতে পারে।

উড়িষ্যা দেশীয় রাজ্য সম্মেলনের কর্মকর্তাগণ এরূপ বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট প্রয়ণন দ্বারা দেশবাসীর কৃতজ্ঞভাজন হয়েছেন নিঃসন্দেহ।

পরিশিষ্টে একখানা নির্বন্ধিকা ও প্রশ্নপত্র থাকায় রিপোর্টখানা অনেকাংশে সমৃদ্ধ হলেও একখানা উড়িষ্যার ম্যাপের অভাব পাঠক মাত্রই অনুভব করবেন। আশা করি ভবিষ্যৎ সংস্করণে এ ত্রুটি থাকবে না।

Bhawani Dayal Sannaysi

By. Prem Naraian Agrawal. M. A. Price Rs. 1/12

দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত যোহান্‌সবার্গ সহরে ১৮৯২ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর স্বামী ভবানী দয়াল জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ও মাতার নাম—শ্রীযুক্ত জয়রাম সিংহ, এবং শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী। তিনি একজন অক্লান্ত কর্মী ও দেশ প্রেমিক। বর্ত্তমান দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনৈতিক, সামাজিক সকল প্রকার উন্নয়নের মধ্যে স্বামীজির প্রচেষ্টা জড়িত আছে। ভারতবর্ষেও তাঁহার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত। ১৯৩০ সনের সত্যাগ্রহ আন্দোলনে তিনি দণ্ডিত হন। তিনি একজন সাহিত্যিক, বক্তা এবং প্রচারক।

এই বইখানাতে স্বামীজির বহুমুখী কর্ম প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ দেখ্‌তে পাই তা বিশেষ প্রশংসনীয়। কর্মী মাত্রই বইখানা পড়লে বিশেষ উপকৃত হবেন মনে হয়।

রেণু সেন

স্বপ্ন-কামনা

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তরুণ কবি কিরণশঙ্করের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কুড়িটি কবিতার সঞ্চয়ণ, কবি জীবনানন্দের ভূমিকা সম্বলিত। রুচি সম্মত বহিঃসৌষ্ঠব। ছাপা পরিস্কার—এবং গোটা বইয়ে মোটে দুটি বানান-বিভ্রাট—অতএব ভালো। দাম এক টাকা।

কিরণশঙ্করের কবিতার আমি ভক্ত, 'পরিচয়' 'কবিতা' ও 'জীবাণুর' পৃষ্ঠায় তাঁকে প্রতিবারেই খুঁজি, না পেলে ক্ষুব্ধ হই। ভক্তিটা যে অহৈতুকী তা নয়। কিরণশঙ্করকে চাই যখন কবিতা পড়ি নিছক কাব্যানন্দের জন্যে, তাও আবার ডেক্‌-চেয়ারে শুয়ে। কিরণশঙ্কর সহজ কথা সহজ ভাবে বলতে ভালো বাসেন, কঠিন কথার মধ্যে বড়ো একটা থাকেন না, আধুনিকতার জন্যেই আধুনিকতা—এমন কথাকে হয়তো তিনি আমল দেন না। এক কথায়,—ভাবেব গভীরে যা তাঁর কাছে সত্য বলে ধরা দিয়েছে, অভাবের ভাঙা হাটে ঠুনকো ফ্যাশানের খাতিরে তিনি তা নষ্ট হতে দেন নি।

কাব্যের স্থাপত্য বিষয়ে কবির প্রতিভা সচেতন। "স্বপ্ন-কামনা"র কুড়িটী কবিতায় পদ্য ও গদ্যছন্দে তৈরী লিরিক্‌, সনেট্‌, অনুবাদ, কথা অনেক কিছুই পাওয়া গেল। জীবনানন্দের ইঙ্গিত যে পদ্য ছন্দেই কবি তাঁর সার্থকতা খুঁজে পাবেন হয়তো সত্যি নয়। 'হে ললিতা, ফেরাও নয়ন এর চেয়েও "দুইরূপ" কবিতা হিসেবে উৎকৃষ্ট। আমার তো মনে হয় "দুইরূপ", বা "আছি" আধুনিক শ্রেষ্ঠ বাংলা সনেটের পর্যায়ে পড়ে। তবুও মনে হয় গদ্য কবিতাতেই কিরণশঙ্করের মুক্তি। পদ্য কবিতার বাঁধাধরা সীমানায় তাঁর আবেগের জোয়ার পদে পদে প্রতিহত হয়; অতি শোচনীয়

রকমের ছন্দ পতন -যা প্রায় প্রতি কবিতাতেই কাণকে অপমান করে—হয়তো এই বন্দী-দশারই অবচেতন প্রতিক্রিয়া। আবেগকে সংহত করবার ধৈর্যও হয়তো কবির নেই।

কাব্যের বিষয় বস্তুকে কিরণশঙ্কর সঙ্কীর্ণ করে নিয়েছেন কেন এ প্রশ্ন মনে জাগা স্বাভাবিক কিরণশঙ্কর তরুণ; আজকের দিনে বাস করে' বিচিত্রাকে মর্মে মর্মে অনুভব করবার লোভ তিনি কেন বর্জন করলেন, বোঝা সহজ নয়। বাইরের বিপুল ঘাত-প্রতিঘাত, ব্যষ্টি এবং সমষ্টির জীবনে নতুনতরো সম্ভাবনা, সুখ-দুঃখের অগণিত তরঙ্গ কি কবিকে চঞ্চল করেনি? আজকের শিল্পী যে বিশ্বরূপ দর্শনকে শিল্পের চরম আধেয় বলে মেনে নিয়েছেন, তা থেকে বহুদূরে, নিজের নিরালা ভবনে, প্রিয়ার সঙ্গে নিষ্ফল বা সফল আসঙ্গলীলায় তরুণ কবি কেমন করে প্রহর অতিবাহিত করছেন? যুগের প্রভাবকে এড়িয়ে কোথায় তিনি তাঁর ঘর বাঁধবেন? এর উত্তর তিনি নিশ্চয়ই তাঁর পরবর্তী কবিতায় দেবেন। তাঁর কাব্যজীবনের তো সবে মাত্র সুরু।

কিরণশঙ্করের স্বকীয়তার কথা ভূমিকায় কবি জীবনানন্দ উল্লেখ করেছেন। শুধু গদ্য কবিতায় নয়, পদ্য-কবিতাতেও তার প্রমাণ রয়েছে। রবীন্দ্রের প্রভাবকে অতিক্রম করা সহজ নয়। কিরণশঙ্কর কেন, আধুনিকদের মধ্যে যাঁরা কবিতরো তাঁদের কাছেও রবীন্দ্রোত্তরণপর্ব একটা দুঃস্বপ্নের মতই রয়ে গেছে। যাই হোক,—'হে নিরুপমা, আঁখি যদি আজ করে অপরাধ করিয়ো ক্ষমা'র সঙ্গে 'আমি নহি স্বর্গের দেবতা'র যে সম্পর্ক সে একটা বিলীয়মান আর একটা নবায়মান যুগের সন্ধিকেই সূচিত করছে।

নির্ম্মল দত্ত।

প্রাপ্তি সংবাদ :—

Sriharsha—anniversary number, 1939

Report :—Dhakeswari Cotton Mills Limited, 1938

সম্পাদকীয়

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ওয়ার্দা অধিবেশনে যে ক'টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তৎসম্পর্কে ১। সুভাষবাবুর শাস্তিমূলক বিধান, ২। বাঙ্গলার অনশন ব্রতী রাজনৈতিক বন্দী, ৩। আন্তর্জাতিক সমস্যা ও ভাবী যুদ্ধে ভারতের কর্তব্য, ৪। সিংহল-ভারত সমস্যা, ৫। দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় প্রবাসী ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১। সুভাষবাবু ও ওয়ার্কিং কমিটির বিধান—

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির দু'টি প্রস্তাবের বিরুদ্ধে গত ৯ই জুলাই তারিখ সুভাষবাবুর নেতৃত্বে যে সর্বভারতীয় প্রতিবাদ-দিবস পালিত হয় ওয়ার্কিং কমিটি সেজন্য নিয়ম ও শৃঙ্খলার নামে সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে এ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে। 'গুরুতর শৃঙ্খলাভঙ্গ হেতু ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাস হতে ৩ বছরের জন্য শ্রীযুক্ত সুভাষবাবুকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সভাপতি পদের এবং কোন কংগ্রেস কমিটির নির্বাচিত সদস্য পদের অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হল'। এ দণ্ডাদেশের 'Iron feature' 'Valvet glove'এ ঢাকার জন্য প্রস্তাবের যে সুদীর্ঘ প্রশস্তিকা আছে তাও উধৃত করা গেল, 'প্রদেশগুলিতে সত্যাগ্রহ এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীমণ্ডলীর সহিত প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পর্ক, এ দু' বিষয়ে বোম্বাইএ নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবদ্বয়ের সম্পর্কে সুভাষবাবুর আচরণে ওয়ার্কিং কমিটি বিশেষভাবে বিবেচনা করেছে। এ সম্পর্কে সুভাষবাবুর যে দীর্ঘ পত্র লিখেছেন তাও ওয়ার্কিং কমিটি আলোচনা করেছে কিন্তু গভীর দুঃখ ও অনিচ্ছাসত্ত্বে তারা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, যে রাষ্ট্রপতির ঘোষণায় উল্লিখিত মুখ্য বিষয়টি তিনি মোটেই অনুধাবন করেন নি। রাষ্ট্রপতির নির্দেশ সম্পর্কে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ পাবার পর জাতির সেবক হিসাবে উহা বিনা দ্বিধায় পালন করাই তার কর্তব্য ছিল, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি হিসাবে একথাও তার উপলব্ধি করা উচিত ছিল। রাষ্ট্রপতি নির্দেশ সম্পর্কে আপত্তি থাকলে তিনি ওয়ার্কিং কমিটি অথবা নিঃ ভাঃ রাঃ সমিতির নিকট অনায়াসে আপীল করতে পারতেন, কিন্তু রাষ্ট্রপতির নির্দেশ থাকাকালীন তিনি উহা কোনক্রমেই অমান্য করতে পারেন না—নিষ্ঠাসহকারে তা পালন করতে তিনি বাধ্য ছিলেন। কোন প্রতিষ্ঠানের কার্য্য যথাযথভাবে চালাবার পক্ষে এ হল প্রথম সর্ত্ত। বিশেষতঃ কংগ্রেসের মত বিরাট প্রতিষ্ঠান, যা

পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও সুগঠিত সাম্রাজ্যের সহিত জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত, তার সম্পর্কে এ সর্ত্ত অপরিহার্য। শ্রীযুক্ত বসুর পত্রে যেরূপ বলা হয়েছে অর্থাৎ যে কোন সদস্যই নিজ অভিপ্রায়মত কংগ্রেসের গঠন তন্ত্র ব্যাখ্যা করতে পারেন, এ যুক্তি যদি গৃহীত হয় তা হলে কংগ্রেসের মধ্যে পূর্ণ অরাজকতা ঘটবে এবং অবিলম্বে উহা ভেঙ্গে যাবে। এ সকল বিষয় বিবেচনা করে ওয়ার্কিং কমিটি দুঃখের সহিত এ সিদ্ধান্তে এসেছে যে যদি তারা শ্রীযুক্ত বসু কর্তৃক এরূপ স্বেচ্ছাকৃত এবং সুস্পষ্ট শৃঙ্খলা ভঙ্গ সমর্থন করে তা হলে তাদের কর্তব্য পালন করা হবে না। ওয়ার্কিং কমিটি ভরসা করে যে সুভাষবাবু নিজের ভ্রম বুঝতে পেরে স্বেচ্ছায় এ শাস্তিমূলক বিধান মেনে নিবেন।

সমগ্র প্রস্তাবটির পিছনে যে আক্রোশমূলক প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-বুদ্ধি নগ্নভাবে পরিস্ফুট হয়েছে, নিয়ম ও শৃঙ্খলার কথা ও মুসাবিদার মুন্সীয়ানায় তা ঢাকা পড়েনি। বামপন্থীদের ক্রমবর্দ্ধমান শক্তি গান্ধীপ্রমুখ দক্ষিণপন্থীদের নিকট এক আতঙ্কের কারণ হয়েছে। সুভাষবাবু রাষ্ট্রপতি পদে পুনঃ নির্বাচনের পরই মহাত্মাজী অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। সুভাষবাবুর নির্বাচনে মহাত্মাজী নিজের পরাজয় ('My defeat') হয়েছে বলেই স্বীকার করেছেন। মহাত্মার সে পরাজয়ের অসহিষ্ণু আত্ম-বিক্ষোভ ও 'অহিংস' প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় হরিজনে প্রকাশিত 'এর অন্তর্নিহিত অর্থ' (Its Implications) প্রবন্ধে। 'কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী দল প্রবেশ লাভ করেছে, সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করলে এরা কংগ্রেসের কর্মনীতির আমূল পরিবর্তন সাধন করবে। এখন পর্যন্ত সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে পারেনি বলে আমি বিন্দুমাত্র স্বস্তিবোধ করছি না' (Rival groups have come into being which would radically change the congress programme, if they could secure the majority. That they have so long failed hither to secure it, is no comfort to me.) পরাজয়ের জ্বালা ও কংগ্রেসে আত্ম প্রাধান্য লোপের আশঙ্কা মহাত্মাজীকে সুভাষবাবুর প্রতি 'Carthegenian' প্রতিশোধ নিতে প্রবুদ্ধ করেছে। কংগ্রেসে সংখ্যা-গরিষ্ঠ সিদ্ধান্তের অবশ্য পালনীয়তা, ডিসিপ্লিনের বাধ্য-বাধকতা ইত্যাদির যে ভাষ্যই মহাত্মাজী ও তাঁর কৃপাপুষ্ট দক্ষিণপন্থীরা করুন না কেন তাতে তাদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ঢাকা পড়েনি।

১৯২১ সালের ৮ই ডিসেম্বর তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় মহাত্মাজীই লিখেছিলেন, 'My plea is for every one to act according to his belief. The congress provides the widest platform. Its creed is incredibly simple. A full-fledged co-operator as well as a nationalist who wants a change in the programme can work in it. Let us not push the mandatory theory to ridiculous extremes and become slaves to resolutions of majorities. That would be a revival of brute force in a violent form.'

'অবশ্য-পালনীয়তা ও বাধ্যবাধকতার দাবী নিয়ে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করলে হাস্যজনক হবে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সকল সিদ্ধান্ত নির্বিচারে মানতে হবে এরূপ ব্যবস্থা শেষ পর্য্যন্ত পাশবিক বলের প্রাধান্যই অত্যুগ্র আকারে দেখা দিবে' এ সকল কথা, ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব ও মহাত্মাজীর বর্ত্তমান কর্মপদ্ধতির সামঞ্জস্য কোথায় ? যে মহাত্মা ১৮ বছর আগে কংগ্রেসে এতটা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ও ভিন্ন মতবাদ স্বীকার করতেন তিনি আজ এত ভেদঅসহিষ্ণু হলেন কেন ? গান্ধীজী তাঁর রাজনৈতিক জীবনে অনেক 'পর্বততুঙ্গ ভুল' (Himalayan Blunders) করেছেন ; 'ঐশবাণী', 'নূতন আলোকে'র সাহায্যে ওসকল ভ্রান্তি অনেকবার নিরসনও করেছেন কিন্তু এবার সুভাষবাবুর ক্ষেত্রে অহিংসাবাদী গান্ধীজী--Ye, infirm of purpose, give me thy dagger' রূপ যে মনোবৃত্তি দেখিয়েছেন তা কি ভাবে দূর করবেন ?

সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে ওয়ার্কিং কমিটির বড় অভিযোগ হ'ল 'গুরুতর শৃঙ্খলা-ভঙ্গ'। কিন্তু সুভাষবাবু কি সত্য সত্যই শৃঙ্খলা-ভঙ্গ করেছেন ? ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের প্রতিবাদকল্পে সুভাষবাবুর নেতৃত্বে ৯ই জুলাই নিখিল-ভারত দিবস পালন করা হয়। কংগ্রেস কন্সটিটিউশ্যনের, বা তার পূর্ণ অধিবেশনের প্রস্তাবে এমন কোন বিধান নেই যার ফলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কোন নির্ধারণের সমালোচনা বা প্রতিবাদ কেহ করতে পারবে না। কাজেই কংগ্রেস কন্সটিটিউশ্যানানুযায়ী সুভাষবাবুকে নিয়মভঙ্গের দোষ দেওয়া চলে না। কংগ্রেস-পন্থীদের প্রতিবাদ ও সমালোচনা করার অধিকারের সীমা নির্দেশ করবার জন্য সুভাষবাবু রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদের নিকট যে সুদীর্ঘ পত্র দিয়েছিলেন তারও কোন সন্তোষজনক জবাব পান নি। রাজেন্দ্রপ্রসাদ অবশ্য ৯ই জুলাই নিখিল-ভারত-দিবস উদ্‌যাপন প্রত্যাহার করার জন্য সুভাষবাবুকে অনুরোধ করেছিলেন বা আদেশই দিয়েছিলেন ; কিন্তু সে অনুরোধ রক্ষা বা আদেশ পালন যদি ব্যক্তিগত মতবাদ ও আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করে তবে তা কতদূর বাধ্যতামূলক ও প্রতিপালনীয় সে প্রশ্ন আসে।

এ প্রসঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটি দেশবন্ধু দাসের স্বরাজ্যদল গঠনেব পূর্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিপদ ত্যাগ করার কথা উল্লেখ করেছে। শুধু পদত্যাগ করার জন্যই যদি দেশবন্ধুকে বিদ্রোহিতার জন্য শাস্তি দেওয়া না হয়ে থাকে তবে সুভাষবাবুকে প্রথম সভাপতিপদ ত্যাগ করতে বলা এবং সে আদেশ অমান্য হলে তাকে পদচ্যুত করার যুক্তিযুক্ত কারণ থাকত। সুভাষবাবু যুব-ভারতের জনপ্রিয় নেতা। দেশের জন্য তিনি সর্বপ্রকার দুঃখ, নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন। ত্যাগে, নিরলস দেশসেবায় ও কর্মগৌরবে কংগ্রেসের বর্ত্তমান নেতৃস্থানীয়গণ তার সমকক্ষ কিনা সন্দেহ। এ অবস্থায় ওয়ার্কিং কমিটির উন্মার্গগামী সিদ্ধান্ত জাতীয় ঐক্যের মর্মকেন্দ্রে আঘাত করবে নিঃসন্দেহ। সুভাষবাবুকে দণ্ড দিতে গিয়ে ওয়ার্কিং কমিটি আত্মঘাতী নীতিই অবলম্বন করেছে। যুবভারতের হৃদয়ানুরাগ অগ্রাহ্য করে ওয়ার্কিং কমিটি যে দেশব্যাপী বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছে তার ফল অবশ্য কমিটিকে ভোগ করতে হবে।

ভবিষ্যৎ যুদ্ধ ও কংগ্রেস—

বর্তমান আন্তর্জাতিক সমস্যা ও সমরাশঙ্কার ফলে ভারতবর্ষকে ভাবীযুদ্ধে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এর প্রতিরোধকল্পে ওয়ার্কিং কমিটি শুধু প্রস্তাব গ্রহণ করে ক্ষান্ত হয় নি। সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছে যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ভারতকে কোন যুদ্ধবিগ্রহে জড়িত করার চেষ্টা করলে কংগ্রেস সর্বতোভাবে তার বিরোধিতা করবে। 'গণতন্ত্রের মর্যাদা' প্রভৃতি ফাঁকা বুলিতে এবার ভারত ভুলবে না। ভারতীয় সৈন্য ও ভারতীয় অর্থে যুদ্ধে জয়লাভের পর বৃটনের হাতে 'গণতন্ত্র' কিরূপ নিরাপদ আছে তার প্রমাণ আমরা আবেসিনীয়া, চীন, চেকোশ্লোভাকিয়ায় ও স্পেনে দেখেছি। ভারতের জনমতের প্রতিনিধি ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসএর এ সুস্পষ্ট নির্দেশ সময়োচিত হয়েছে নিঃসন্দেহ। কংগ্রেস নির্দেশ কার্যকরী করার জন্য ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের কংগ্রেসী সদস্য কর্তৃক পরিষদের আগামী অধিবেশন বয়কট ও প্রাদেশিক মন্ত্রীমণ্ডলের পদত্যাগ ইত্যাদি সুস্পষ্ট কর্মনীতি অবলম্বন করা হয়েছে। দেশের জনমতের বিরুদ্ধে ভারতসরকার কর্তৃক মিশর ও সিঙ্গাপুরে সৈন্য প্রেরিত হয়েছে। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ দেশব্যাপী আন্দোলন হলেই ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবের স্বার্থকতা আসবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সম্বন্ধে প্রস্তাব

দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় প্রবাসীগণ মৌলিক অধিকার রক্ষা কল্পে যে নির্যানত ভোগ করছেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাব গ্রহণ করে তাদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ সংগ্রাম সমগ্র ভারতবাসী কর্তৃক সমর্থিত হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার সংগ্রাম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামেরই অংশ। কাজেই ইহা ভারতবাসীর সর্বথা সমর্থন যোগ্য।

হায়দারাবাদে শাসন সংস্কার

প্রথমে হায়দারাবাদ ষ্টেট্ কংগ্রেস ও পরে হিন্দু সভা ও আর্য সমাজ ছয় মাসের অধিককাল সত্যাগ্রহ পরিচালনা করার পর নিজাম সরকার শাসন সংস্কার ঘোষণা করেছে। শাসন সংস্কারে যুক্ত নির্বাচন প্রথা ও বৃত্তির ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা কোরে নিজাম সরকার এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কাগজওয়ালাদের প্রশংসা পেয়েছে। হায়দারাবাদে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা সাতাশীজন ও মুশলমানের সংখ্যা শতকরা বারজন। এ অবস্থায় শাসন পরিষদে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত নির্বাচন প্রথার সমান সংখ্যক আসনের বরাদ্দ গণতন্ত্রের আগমনবার্ত্তা না জানিয়ে সাম্প্রদায়িকতার বিজয় ঘোষণা কোরব। বিভিন্ন সম্প্রদায়কে স্বীকার কোরেও সাম্প্রদায়িকতার কুফল দূর করার জন্য যুক্ত নির্বাচনেব ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হোয়েছে। নিজাম সরকারের যুক্ত নির্বাচনে সেই উদ্দেশ্যের ছাপ কোথাও নাই। হায়দারাবাদে এ পর্য্যন্ত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী ক্ষমতার অধিকারী হোয়ে বসবাস করছিল। নূতন ব্যবস্থায় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ছিটে ফোঁটা ক্ষমতা দিয়ে, সংখ্যার তুলনায় অতিরিক্ত প্রধান্য এখনও তাদের থাকবে। হায়দারাবাদে শতকরা ৮০ জন কৃষক, তাদের স্বার্থ

সম্বন্ধে শাসনসংস্কার উদাসীন। কোন্ কোন্ শ্রেণী থেকে অর্থাৎ কি কি বৃত্তির ভিত্তিতে কতজন প্রতিনিধি নির্বাচন তা লক্ষ্য কোরলেই দেখা যাবে এদের স্বার্থ কি রকম বিড়ম্বিত হোচ্ছে। আইন সভার মোট ৮৫ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১৬ জন কিষাণ প্রতিনিধি ২ জন শ্রমিক প্রতিনিধি, অর্থাৎ জনসাধারণের শতকরা প্রায় ৯০ জনের জন্য মোট ১৮ জন প্রতিনিধি আর নগর ও জায়গীরদারদের জন্য ১৪ জন প্রতিনিধি। ধনিক শ্রেণীর পক্ষ থেকে নির্বাচিত হবেন ৬ জন প্রতিনিধি।

নির্বাচিত প্রতিনিধির মোট সংখ্যা হবে ৪২। বাকী চার জন অন্যান্য বৃত্তির ভিত্তিতে নির্বাচিত হবেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্যেও প্রতিক্রিয়াশীলদের প্রাধান্য বজায় রাখা হোয়েছে, এ ছাড়া সরকার মনোনীত করলে ২৮ জনকে, শাসন পরিষদের সদস্য থাকবে ৭ জন। এই প্রতিক্রিয়ার আড়ালে জন স্বার্থ যে কোথায় অন্তর্ধান করবে তা সহজেই অনুমেয়। এ ছাড়াও বিধান রয়েছে শাসন কার্য্যের জন্য কেন্দ্রিয় শাসন পরিষদ (Executive Council) আইন সভার নিকট আদৌ দায়ী থাকবেন না। এ ছাড়া নিজাম বাহাদুরের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা বহাল রয়েছে।

বৃত্তির ভিত্তিতে নির্বাচনের সপক্ষে অনেক কথা বলা যেতে পারে কিন্তু যেখানে আইন সভার রূপ স্বৈরাচারের অভিব্যক্তি সেখানে উদ্দেশ্য গণতান্ত্রিক হোলেও কাঠামোর চৌহদ্দি তাকে নিস্ফল কোরে দেয়।

দেশীয় প্রজাদের প্রতি গান্ধীজীর উপদেশ—

৫ই জুলাইয়ের 'হরিজনে' গান্ধীজী দেশীয় রাজ্যে প্রজাদের পরিচালনার জন্য নিখিল ভারত প্রজা কন্ফারেন্সের স্থায়ী কমিটির দ্বারস্থ হোতে বলেছেন। এ যাবৎ গান্ধীজী নিজেই দেশীয় রাজ্যের আন্দোলন পরিচালনা করে এসেছেন। ধামী রাজ্যে গুলিবর্ষণের পর গান্ধীজীর মতান্তর ঘটেছে। ধামীর ঘটনা উপলক্ষ্য করে তিনি বলেছেন—"সমস্ত নৃপতিরা রাইফেলের যথেষ্ট ব্যবহার করছেন। তাঁদের ধারণা সার্বভৌম-শক্তির থেকে কোন রকম বাধা তাঁরা পাবেন না। কংগ্রেসকেও তাঁরা গ্রাহ্য করেন না।" গান্ধীজীর কৃতকর্ম্মের ফল দেখে বিলাপ করছেন। এ নিস্ফল বিলাপে আত্মদৈন্য প্রচার করা ছাড়া প্রজামণ্ডলের আর কোন উপকার হবে না, আমরা বার বার শুনে আসছি—"দেশীয় প্রজাদের পরিচালনার ভার সময় উপস্থিত হোলে কংগ্রেস ছেড়ে দিতে পারে না" (Congress cannot give up its duty of guiding the states people in the hour of their need.), কিন্তু, প্রতিবারেই তার বিপরীত ব্যবস্থা লক্ষ্য কোরে আসছি। প্রজা কন্ফারেন্সের স্থায়ী কমিটিও গান্ধীজীর নির্দেশ ছাড়া চলবে বলে আমাদের মনে হয় না। সুতরাং গান্ধীজীর নীতি পরিবর্তিত না হোলে দেশীয় রাজ্যে প্রজা-আন্দোলনের নূতন কোন অভিব্যক্তি আশা করা যায় না।

অহিংসনীতির পরিবর্তন—

হয়ত অধিকাংশ কংগ্রেসকর্মীই বিশ্বাস করে যে আমার ব্যাখ্যাত অহিংসার দিন ফুরিয়ে এসেছে। তাই যদি হয়, তবে কংগ্রেসীদের বৈঠক বসিয়ে স্থির করা উচিত যে অনুসৃত অহিংসনীতি

ও তার আনুসঙ্গিক গঠনমূলক পদ্ধতির পরিবর্তন কোরে কংগ্রেসের বর্তমান মনোভাব অনুযায়ী কোন্ নূতন নীতি ও পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত।—২৯শে জুলাইয়ের হরিজনে সত্যাগ্রহ উপলক্ষে ডাঃ লোহিয়ার পত্রের উপর গান্ধীজী উপরিলিখিত মন্তব্য করেন।

গান্ধীজীর মতে তাঁর সত্যাগ্রহের ধারণাই জন্ম দিয়েছে তাঁর গঠনমূলক পদ্ধতির—দুটোর মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য যোগ রয়ে গেছে। নূতন পদ্ধতির সঙ্গে সত্যাগ্রহের সংযোগ তাই তার ধারণার অতীত। সত্যাগ্রহ সংগ্রামের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ অবদান সন্দেহ নাই। যেটা একজনের বিশ্বাসকে আশ্রয় করে রয়েছে (article of faith) সেটা সহস্রজনের টেক্‌নিক হোয়ে দাঁড়ালে তার রূপান্তর ঘটলেও কার্যকারীতা কমবে এমন কথাও জোর করে বলা যায় না। গান্ধীজী আজ বিশ বছর পর নিজেই দুঃখের সহিত জানাচ্ছেন যে শিক্ষিত কংগ্রেসীদের কাছে তাঁর পদ্ধতি আদর পায় নাই, তার মূলে রয়েছে তাদের অহিংসায় দীপ্ত-বিশ্বাসের অভাব। ('I am painfully conscious of the fact that my programme has not made a general appeal to the congress intelligentsia. I have already pointed out that the reason for the apathy of congressman is not to be sought in any inherent defect in the programme, but that is due to the want of living faith in 'ahimsa'.) অহিংসার ভাস্বরদীপ্তি মূঢ়জনের চিত্তে আলোকসম্পাত করতে কত যুগ লাগবে তা না জানলেও ইতিহাসের ইঙ্গিতে গঠনমূলক পদ্ধতি ও সত্যাগ্রহের বিচ্ছেদ ঘটছে—এ কথা বলতে পারি।

বাঙ্গলার রাজনৈতিক বন্দিগণ--

দমদম ও আলীপুর জেলের অনশনব্রতী রাজনৈতিক বন্দিগণ দু' মাসের জন্য অনশন স্থগিত রাখায় ওয়ার্কিং কমিটি তাদের ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ ও নিম্নরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছে—'ওয়ার্কিং কমিটির দৃঢ় অভিজ্ঞতা এই যে, মুক্তি অর্জনের জন্য বন্দিদের, রাজনৈতিক বন্দী হউন আর যে কোনরূপ বন্দীই হউন, অনশন করা কা'রও উচিত নয়। ওয়ার্কিং কমিটির এও অভিমত যে অনশন অবলম্বন দ্বারা যদি বন্দীগণ মুক্তি অর্জন করতে পারে, তা হলে সুশৃঙ্খলভাবে গবর্ণমেন্টের কাজ করা অসম্ভব হবে।'

এ প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে অনশনব্রতী বন্দী সম্পর্কে মহাত্মা যে বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাতেও প্রায় একথাই ছিল 'অনশন-ধর্মঘটিরা অনুরূপ অবস্থাধীন বন্দীদের সমক্ষে একটি খারাপ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। এরূপ অনশন ধর্মঘটের অনুকরণ হলে সমস্ত শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে এবং সুনিয়ন্ত্রিত-ভাবে শাসন কার্য পরিচালনা অসম্ভব হবে'। গান্ধীজী অনেকবার অনশন করেছেন। শান্তি ও শৃঙ্খলা তখন কি ভাবে রক্ষা পেয়েছিল ?

বোম্বাই-এ বক্তৃতা প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল অনশন ব্রতী বন্দীদের সম্পর্কে যে উক্তি ও আইনের ভাষ্য করেছেন তা একান্ত অশোভন ও প্রকারান্তরে গবর্ণমেন্টের কার্যের

সমর্থনই হয়েছে। বাঙ্গলার বন্দীমুক্তি সমস্যাকে তিনি মৌলিক বলে মনে করেন না, এ নেহাৎ স্থানীয় এবং বিশ্ব সমস্যার সম্মুখে অতি নগণ্য ও তুচ্ছ। এ ক্ষুদ্র সমস্যা নিয়ে তাঁর মত 'বৃহৎ নেতৃত্ব' বিব্রত থাকলে বিশ্বের বিরাট সমস্যা কে দেখবে? তাই তিনি উপদেশ দিচ্ছেন স্থানীয় সংগ্রামে লিপ্ত (wrapped up in local struggles) না হতে। ব্যাপক সংগ্রাম ('Major Struggle') কী এ সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেননি। মন্ত্রীত্ব রক্ষা করে নিয়মানুবর্তীতার পথে কোন সময়ই 'Major Struggle' আসবে না, এ নিশ্চিত।

বন্দীমুক্তি সম্বন্ধে ওয়ার্কিং কমিটির মন্তব্য, মহাত্মাজী ও জওহরলালের উক্তি, মন্ত্রী-সঙ্কট এড়াবার জন্যই হয়েছে নিঃসন্দেহ।

পণ্ডিত নেহেরুর সিংহল ভ্রমণ—

সিংহলে ৮০০০ ভারতীয় শ্রমিক জীবিকার্জন করে। অর্থনৈতিক সঙ্কটের দিনে অর্থনৈতিক স্বাধিকার (economic nationalism) বজায় রাখতে সব দেশই সচেষ্ট হোয়ে ওঠে, কারণ, আর্থিক জগতে এই পথটাই সহজ ও সুগম। সিংহল সেই পথে চলতে গিয়ে ৮০০০ ভারতীয় শ্রমিককে নিরন্ন করে সেখানে সিংহলী শ্রমিক নিযুক্ত করতে প্রয়াস পেয়েছে—যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রশ্ন এখানে অবান্তর।

কংগ্রেস এই ভারতীয় বিতাড়ন সঙ্কল্পের প্রতিবাদ করে এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে ভারতবাসীর পক্ষ থেকে এ ব্যবস্থার মীমাংসা করতে সিংহলে যাবার অনুরোধ করে। সিংহলী মন্ত্রীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেও আসল ব্যাপারে তাদের সুর নরম করতে পণ্ডিতজী সক্ষম হয়েছেন বলে মনে হয় না। সিংহলী মন্ত্রীরা ভারতবর্ষ ও সিংহলের ভৌগলিক সংস্থান এবং মৈত্রী-বন্ধন স্বীকার করেও ভারতীয়দের বিদেশী হিসাবেই গ্রহণ করেছে—পণ্ডিতজীর স্বাজাত্যবোধ সিংহল-মন্ত্রীদের মর্ম স্পর্শ করে নাই। এ বিষয়ের ফলাফল সম্বন্ধেও পণ্ডিতজীর সংশয়ের অবকাশ আছে।

পণ্ডিতজীর সিংহল-ভ্রমণে কতকগুলি গৌণ ফল পাওয়া গেছে। সিংহলী-ভারতীয় সম্পর্কে যে ক্লেদ ও গ্লানি জমে উঠেছিল, পণ্ডিতজী মনে করেন যে তার উপস্থিতি তা দূর কোরে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছে। যেখানে আর্থিক দুর্গতি রাজনীতির অনুগমন কোরে পরপীড়ক হয় সেখানে প্রীতির স্থায়িত্ব আশা করা যায় না। জওহরলাল নিজেই বলেছেন, "Yet it must be recognised that the tension was not only largely due to economic causes, but also due to political background which seeks to utilise the economic causes for other purposes." দুনিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি ও বিশেষ করে ভারতবর্ষ ও সিংহলের ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক সংস্থান ভারতবর্ষ ও সিংহলের মধ্যে একটা অর্থনৈতিক সাম্য দাবী করে। সিংহলী মন্ত্রীদের এ বিষয়ে অবহিত হওয়া কর্তব্য।

ইতিমধ্যে সিংহলী মন্ত্রীরা ভারতীয় বিতাড়ন বন্ধ করেন নাই। প্রত্যহই বহুসংখ্যক দিন-মজুর মাদ্রাজ পৌঁচাচ্ছে। ভারত-সরকার এ সমস্যার মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত সিংহলের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি করতে অসম্মত হয়েছে এবং সিংহলে অনিপুণ শ্রমিক পাঠান নিষিদ্ধ করেছে। সিংহল-সরকারের চৈতন্যোদয় করতে হোলে চাই জাঞ্জিবারের লবঙ্গ বর্জনের ন্যায় আন্দোলন যা সামান্য ভাবে ত্রিবান্দ্রমে সিংহলের শুষ্ক-নারিকেল বর্জন নিয়ে আরম্ভ হয়েছে।

কামাথ ও কৃপালানী—

জাতীয় শিল্পোন্নয়ন কমিটির সম্পাদক মিঃ কামাথ বিতর্কমূলক রাজনীতিতে যোগ দিলে ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পণ্ডিত জওহরলালের নির্দেশে পদত্যাগ করেন। কামাথের পদত্যাগ উপলক্ষে খবরের কাগজে অনেক বাগ্‌বিতণ্ডা হোয়েছে। গত সভাপতি-নির্বাচনকালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কৃপালানী বিতর্কমূলক রাজনীতিতে যোগ দিয়েও নিয়মানুবর্তিতার কোপে পড়েন নাই, বরং নিরঙ্কুশ সমালোচনায় নির্বাচিত সভাপতিকে পর্যুদস্ত করেছেন। কামাথের পদত্যাগ উপলক্ষে এঁদের দু'জনের শৃঙ্খলাভঙ্গের তুলনামূলক আলোচনা বর্তমান বিতণ্ডার উপজীব্য। কৃপালানীর পক্ষ নিয়েছেন অধ্যাপক কে, কে, ভট্টাচার্য ও কামাথের পক্ষ নিয়েছেন অধ্যাপক আদারকার—দু' জনই এলাহাবাদের। কামাথ রাজনীতির বিনিময়ে সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন নাই এবং মনে রাখা উচিত যে শিল্পোন্নয়ন কমিটি কংগ্রেসের সৃষ্টি হলেও পুরোপুরি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান নয় (it is not a purely congress affair)। কারণ, অনেক অকংগ্রেসী এর সভ্যপদে বৃত হয়েছেন। উপরন্তু, কামাথের বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল কংগ্রেসের রাজনীতি, শিল্পোন্নয়ন কমিটির সঙ্গে যার কোন সম্পর্কই নাই। নিয়মানুবর্তিতার কথা উঠলে বলতে হয় যে কৃপালানী সম্পাদকের পদ ইস্তাফা না দিয়ে সভাপতির বিরুদ্ধে প্রচার করে শৃঙ্খলাভঙ্গ করেছেন। শাস্তি যদি কারও পাওনা থাকে তবে তারই আছে। কিন্তু রাজনীতির গতি বিচিত্র। কামাথ যদি আজ ক্ষমতাপন্ন দক্ষিণীদের স্বপক্ষে প্রচার করতেন তবে তাঁর রাজনীতি বিচারের কাঠগড়ায় লাঞ্ছিত না হোয়ে সপ্রশংস অনুমোদন লাভ করতো। অধ্যাপক আদারকার তাই বলেছেন যে দক্ষিণীরা ১৯৩৫ ভারতশাসন ধ্বংস করতে গিয়ে কংগ্রেসের শাসনতন্ত্র ধ্বংস করবার অক্ষয় গৌরব অর্জন করেছেন। ("The more one studies the constitutional antics practised by the Right-wingers in recent months, the move is one confirmed in one's belief that a party, which sallied forth to 'wreck by working' the constitution Act of 1935, has in effect succeeded in 'wrecking' the only constitution that matters viz, the constitution of the congress.")

ভারতীয় নৌসম্মেলন—

ভারতে নৌ-সম্মেলন (Indian Shipping Conference) নাম দিয়ে সিমলায় যে নৌ-সম্মেলনের প্রহসন হ'য়ে গেল তাতে ভারতীয় ব্যবসায়ী মহলের কেউ উপস্থিত ছিলেন না

বলেই খবরে প্রকাশ। নূতন কমার্স মেম্বরের এই ধরণের নূতন প্রচেষ্টা হাস্যকরভাবে অসফল হয়েছে বলেই আমরা মনে করি কারণ ভারতীয় নৌ-ব্যবসায়ের প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য একজন ভারতীয়কেও ডাকা হয়নি। ভারতবাসীর পক্ষ থেকে ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বারস্ অব কমার্স, ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এবং ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব মার্চেণ্টস্ যুক্তভাবে এবং পৃথক চিঠিতে সম্মেলনের তারিখ এক মাস পিছিয়ে দিয়ে ভারতীয় নৌ-ব্যবসায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগের আমন্ত্রণ জানাতে অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু স্থিত-স্বার্থ ইংরেজ বণিকের স্বার্থ যাতে কিছুমাত্র বিপন্ন না হয় তার জন্যই তাড়াহুড়ো করে নির্ঝঞ্ঝাটে নূতন বাণিজ্য সচিব স্যার রামস্বামী অধিবেশন সমাপ্ত করেছেন।

চটকল শ্রমিক ছাঁটাই সমস্যা—

১৯৩৮ সালের পাট অর্ডিনান্সের জের সামলিয়ে উঠ্‌তে না উঠ্‌তেই আবার এক প্রচণ্ড আঘাত চটকল শ্রমিকদের উপর পড়লো। সাপ্তাহিক কার্যকাল হ্রাস করে ৪০ ঘণ্টা করেই মিল মালিকেরা সন্তুষ্ট হয়নি তারা বারো চৌদ্দ হাজার শ্রমিক ছাঁটাই কর্চ্ছেন। পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধের আয়োজন এবং অপরিহার্য উপকরণ হিসেবে পাটের থলের চাহিদা গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকেই অসম্ভাবিত রূপে বেড়ে গেছলো, এ সত্ত্বেও লাভের বখ্‌রা ট্যাকে পুরে মিল মালিকেরা এরূপ ব্যাপক শ্রমিক-সঙ্কোচন প্রয়োজন বলে মনে কর্লেন। অনন্যসম্বল শ্রমিক গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও সাধারণ ধর্মঘটের আয়োজন হচ্ছে। চটকলের এই সঙ্কট শুধু শ্রমিক সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ থাক্‌বে না। এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে পাট উৎপাদনকারী কৃষক সমাজেও। তাঁত বন্ধ ও শ্রমিক সঙ্কোচনের পরোক্ষ ফল হেসিয়ানের বর্ধিত চাহিদাকে আপাততঃ সঙ্কুচিত করে দেখানো যাতে করে কাঁচা পাটের দামটা চাহিদা অনুপাতে বাড়তে না পায়। একেতো সম্বল-বিহীন দরিদ্র কৃষক এক মুহূর্ত পাট ঘরে রেখে ন্যায্য মূল্যের জন্যে দর কষাকষি কর্তে পারে না তার উপর যদি চাহিদার দিকটাও মন্দা বলে জানিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে নামমাত্র মূল্যে পাট বিক্রয় করার জন্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে। এদিকে ফট্‌কা বাজারের কারসাজিতে বাড়তি পাটের বাজার পড়তির দিকে চলেছে। গবর্ণমেণ্টের সাবধান বাণীর যথেষ্ট প্রচার হয়নি, আর হলেও, ঘরে মাল মজুদ রেখে সুদিনের জন্যে অপেক্ষা করবার মতন আর্থিক সঙ্গতি বাঙলার পাট চাষীর নেই।

পাট ব্যবসায় নিয়ন্ত্রণ—

পাট ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রিত কোর্‌বার জন্যে বাঙলা সরকারের নূতন প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ হ'লেও নীতিহিসাবে সমর্থনযোগ্য। এযাবৎ এদিক্ দিয়ে শুধু একতরফা সুবিধা ভোগ করে আস্‌ছিল মিলমালিক ও স্থিত-স্বার্থ ব্যবসায়ীগণ। হক মন্ত্রীমণ্ডলীর নির্বাচন প্রতিশ্রুতিতে পাটের দর বাড়িয়ে দেবার কথা ছিল কিন্তু সরকার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে এতকাল উত্তর পাওয়া গেছে "বড় কঠিন ব্যাপার, মুখের কথায় অম্‌নি বাড়িয়ে দেওয়া যায় না"। আসলে অর্থনৈতিক অসুবিধা বা

প্রয়োগক্ষেত্রের ব্যাপকতা সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার অছিলামাত্র। জনসাধারণের মরণ বাঁচন যে একমাত্র অর্থকরী ফসলকে অবলম্বন করে তার নিয়ন্ত্রণে এই নিদারুণ তাচ্ছিল্য কুখ্যাত গবর্ণমেণ্টের অপকীর্তির অন্যতম নিদর্শন। যাহো'ক্ বিলম্বে হ'লেও গভীর ঔদাসীন্যের অবসান ঘটেছে এত দিন বাদে এটা সুখের বিষয়। গত ৫ই ও ১১ই তারিখে দুটি ইস্তাহার বা'র করে গবর্ণমেণ্ট জানিয়েছে তাদের ইচ্ছা "to place the entire business of jute from the time of its sowing to its sale, manufacture, export and future dealings on a sound footing," পাট বুনন থেকে সুরু করে, বিক্রী, পাটের কাপড় তৈরী, বিদেশে রপ্তানী এমন কি ফটকা বাজারের একটা সুরাহা পর্যন্ত বাংলা সরকারের কর্ম তালিকায় স্থান পেয়েছে।

সত্যি সত্যি পাটের চাষকে চাষীর কাছে অর্থকরী ফসলের মর্যাদা দিতে হ'লে বুনন থেকে আরম্ভ করে ফটকা বাজারের বেচাকেনার ওপর পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ দরকার। কারণ দেখা গেছে ফসলের ফলন অপেক্ষাকৃত কম হওয়া সত্ত্বেও অর্থনীতির চাহিদা-যোগানের নিয়মকে অগ্রাহ্য করে পাটের মূল্য অনেক সময়ই নীচুর দিকেই গিয়েছে। হয়তো ফটকা বাজারের কারসাজি অথবা মিলমালিক ও স্থিতস্বার্থ সম্প্রদায়ের সম্মিলিত ক্রয়নীতিই এরূপ সংঘটন কর্তে সমর্থ হ'য়েছে। পাটের নিম্নতম ধার্য মূল্য করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আমরা ইতিমধ্যেই মিল মালিকদের পক্ষ থেকে মিঃ বার্ণের বিবৃতি পেয়েছি। তিনি বল্‌ছেন পাটের চাষ কমালে বাংলার রাজস্বের ক্ষতি হ'বে কারণ পাটের ট্যাক্সের টাকা যা কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট উৎপাদক প্রদেশগুলোকে দিয়ে থাকে তা উৎপন্ন শস্যের ক্রমানুগতিক হারে। যেখানে চাষী ন্যায্য দাম পাবে আপনার শ্রমের, সেখানে রাজস্বের ছিটে ফোঁটার কথা অবান্তর। দ্বিতীয় কথা, বাংলা দেশের সঙ্কুচিত উৎপাদনের সুযোগ নিয়ে বিহার আসাম লাভবান হ'বে মিঃ বার্ণের বিবৃতিতে এরও উল্লেখ আছে। কেন? আপনাদের স্বার্থ সম্বন্ধে কি মানুষ এমনই উদাসীন?

ইক্ষু-নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে বিহার ও যুক্তপ্রদেশ যে পারস্পরিক সহযোগিতা দেখিয়েছে শতকরা ৯০ ভাগ উৎপাদনকারী প্রদেশের সাথে পাট চাষ ব্যাপারে দুটো কংগ্রেস প্রদেশ কি সেই সহযোগিতা দেখাতে পেছপা হবে? তিনি বল্‌ছেন, এ'তো হ'লো, কিন্তু চাষ নিয়ন্ত্রণটা কার্যে পরিণত করা অতো সহজ নয়। চা-কফি-রবারের বেলায় তা আশানুরূপ ফল দেয়নি। কথাটা আংশিক সত্য, চা-রবারের বেলায় ফেল করেছে বলে টিনের বেলায় তা ফেল করেনি, উৎপাদন-নিয়ন্ত্রণ করে টিনের বাজার আজও লাভজনক রাখা হ'য়েছে। তাছাড়া পাট সম্বন্ধে এ যুক্তির ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। পাট একটা প্রদেশের একচেটিয়া উৎপাদন পণ্য, আর বদলি ফসল দিয়ে পাটের স্থান পূর্ণ করার চেষ্টা আজও সফল হয়নি। বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিয়ন্ত্রণ কর্তে পারলে পাটের মূল্য বাড়াবার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবন্ধকই দাঁড়াতে পারে না।

টোকিও চুক্তি—

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সুদূর প্রাচ্যে জাপানকে অবাধ বিচরণের সুযোগ দিয়েছে টোকিও চুক্তি অনুমোদন করে। টোকিও ফরমুলা অনুযায়ী জাপানী অধিকার স্বীকৃত হোয়েছে, রাজ্যগঠনের স্বাধীনতা দিয়েছে। জাপানী বর্বরতায় চেম্বারলেনের 'রক্ত টগবগ্' (it makes my blood boil) করলেও অপমান পরিপাক করে চীনকে জাপানের হাতে সঁপে দিতে চেম্বারলেনের বিবেক দংশন হয় নাই। কারণ হিসাবে চেম্বারলেন দেখালেন অক্ষমতা—(it is impossible...commitments in the Far East and there are limits to which it is prudent for us to undertake.) বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতিতে সঙ্কোচন ও সম্প্রসারণের অবকাশ আছে যা একমাত্র স্বার্থের নির্দ্দেশেই ঘটে। বৃটিশ-ফরাশী-সোভিয়েট আলাপ-আলোচনা ও ইউরোপের পরিস্থিতি সোভিয়েটকে অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছে। বৃটেনের প্রয়োজন সোভিয়েটের শক্তি খর্ব করা তাই সুদূর প্রাচ্যে জাপানের সন্তোষ-বিধান চলেছে। চীনের ভূতপূর্ব সহ-সভাপতি ওয়াং-চিং-ওয়াই শত্রুপক্ষে যোগ দিয়ে চীনে শান্তির চেষ্টা করছে। ঠিক এই সময়ে ওয়াং-চিং-ওয়াই আবার একটি শান্তির আবেদন প্রচার করেছে। কালক্রমে বিজিত চীন ক্ষুধিত জাপানকে শান্ত করবে ও সোভিয়েটের প্রতিদ্বন্দ্বী হোয়ে বৃটেনের বাসনা পূর্ণ কোরবে, এই ভরসাই ব্রিটেনের প্রাচ্য নীতি নিয়ন্ত্রিত করছে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী চায় গণ্ডূষে সমুদ্রপান করতে। জাপান ও চীনে কারেন্সীর একচ্ছত্র অধিকার দাবী করছে। শুধু তাই নয়—তিয়েনৎসিন ব্যাঙ্ক-এ চীনের গচ্ছিত রৌপ্যের জন্য দাবী জানাতেও কসুর করে নাই। বৃটিশ প্রতিনিধি স্যার রবার্ট ক্রেইগী ক্রমবর্দ্ধমান দাবী মেটাবার চেষ্টায় টোকিওতে কালক্ষেপণ করছেন। এ দিকে জাপান ও রোম-বার্লিন অক্ষের সঙ্গে যুদ্ধ-চুক্তি (military alliance) করার হুমকি দেখিয়ে বৃটেনের সঙ্গে দর হাঁকছে। জাপানের ভাগ্য ভাল সোভিয়েটের দৌলতে চীনের বখরা তার পুরোই মিলবে।

পূর্ব্ব ইউরোপ—

এই আগষ্ট মাসেই পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে দাবানল জ্বলে উঠেছিল, আজ পূর্ব ইউরোপে ডানজিক পঁচিশ বছর আগের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ১৫০,০০০ জার্মান সৈন্য পোল্যাণ্ডের দুয়ারে মোতায়ান রয়েছে, পোল্যাণ্ডেও সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে, এক ওয়ারসতেই ৮০টি সৈন্য সংগ্রহের কেন্দ্র খোলা হয়েছে। নাৎসী ঝটিকাবাহিনী পোল্যাণ্ডের সীমান্তে হানা দিয়েছে বিউথেন হোতে এ খবর পাওয়া গেছে। ১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে চেম্বারলেন এবং ফরাসী গভর্মেণ্ট পোল্যাণ্ডকে অভয় দান করেছে। তারই ফলে আজ সুদূর প্রাচ্যে অঙ্গুলি হেলন করতে চেম্বারলেন নারাজ। হিটলার ডানজিক নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে না, ডানজিক করিডার দখল করে পূর্ব এশিয়াকে রাইখের অন্য অংশের সঙ্গে যুক্ত করাই তার অভিপ্রায়। কিন্তু, পূর্ব ইউরোপে তার ফলাফল হবে অত্যন্ত শোচনীয়। ডানজিক নাৎসী কবলিত হোলে পোল্যাণ্ডের সমুদ্র পথ বন্ধ হবে—পোল্যাণ্ডের ও চেকোশ্লোভাকিয়ার দশা ঘটবে।

পোল্যাণ্ড রক্ষার জন্য সোভিয়েটের সঙ্গে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের চুক্তিবদ্ধ হওয়া দরকার। খসড়ার পর খসড়া টেনেও আজ পর্যন্ত চুক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায় নি। ভরসা এই ত্রিশক্তি ও পোল্যাণ্ডের সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়েছে। এই আলোচনা নাৎসী আস্ফালন কিছুটা প্রশমিত করেছে। সে যাই হোক ডানজিক এখনও ইউরোপের বারুদস্তূপ। ত্রিশক্তি চুক্তির সমাধা ও কার্যকারিতার উপরই ডানজিকের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, সেদিনও ওয়াশিংটনে পোলিশ দূত কাউন্ট বোটোস্কি বলেছেন ডানজিক গ্রাস করলেই যুদ্ধ অনিবার্য।

একদিকে চেম্বারলেন ত্রিশক্তি আলাপের অভিনয় করে সাম্যবাদের 'অশুচি' থেকে ইংলণ্ডকে রক্ষা করতে ও অন্য দিকে ইউরোপে ফ্যাশিস্তবাদের বিস্তার বন্ধ করতে চান। সাম্রাজ্যবাদের এই স্ববিরোধী দোটানায় পড়ে অসহায় চেম্বারলেন আজও ত্রিশক্তি চুক্তি শেষ করতে পারেন নাই—ইউরোপও অনিশ্চয়ের চতুর্দোলায় দোল খাচ্ছে।

পরলোকে সুবোধ মজুমদার

জন্ম ১৯০৯, পাইকপাড়া,
মৃত্যু ৩০শে জুলাই, ১৯৩৯
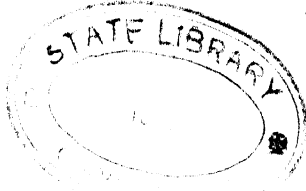
স্মৃতি-তর্পণ

বিগত ১৯২০ সালে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিক্রমপুর পাইকপাড়ায় জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হোলে সুবোধ বাবু কিছুদিনের জন্য সেখানে অধ্যয়ন করেন। তখন হোতেই দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে অনুকূল যাবতীয় আন্দোলনে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০—৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেছিলেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি মধ্য কলিকাতা কংগ্রেস কমিটির কার্য নির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন।

যে সম্পদ অনায়াসে পাওয়া যায় তার হিসেব আমরা রাখিনি। সহজাত সম্বলটুকু হারিয়ে গিয়ে তার মূল্য জানিয়ে দিয়ে যায়। আমাদের সমধর্মী ও সহকর্মী সুবোধ মজুমদার আজ আর আমাদের পাশে নেই। আকস্মিক মৃত্যুর নির্মম হস্ত অদৃশ্য নিঃশব্দ জাল বুনে দিয়ে তাঁর চারি পাশে, সেই কথাটাই বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে। আমাদের ক্ষতি অপূরণীয়, বেদনা ভাষাতীত। তাঁর নিঃশব্দ ত্যাগ, নীরব কর্ম ও সহজ প্রীতি আমাদের মনে জাগরূক হয়ে রইলো।

শূন্য দেউল

শ্রীসুধীরকুমার রায়ের সৌজন্যে
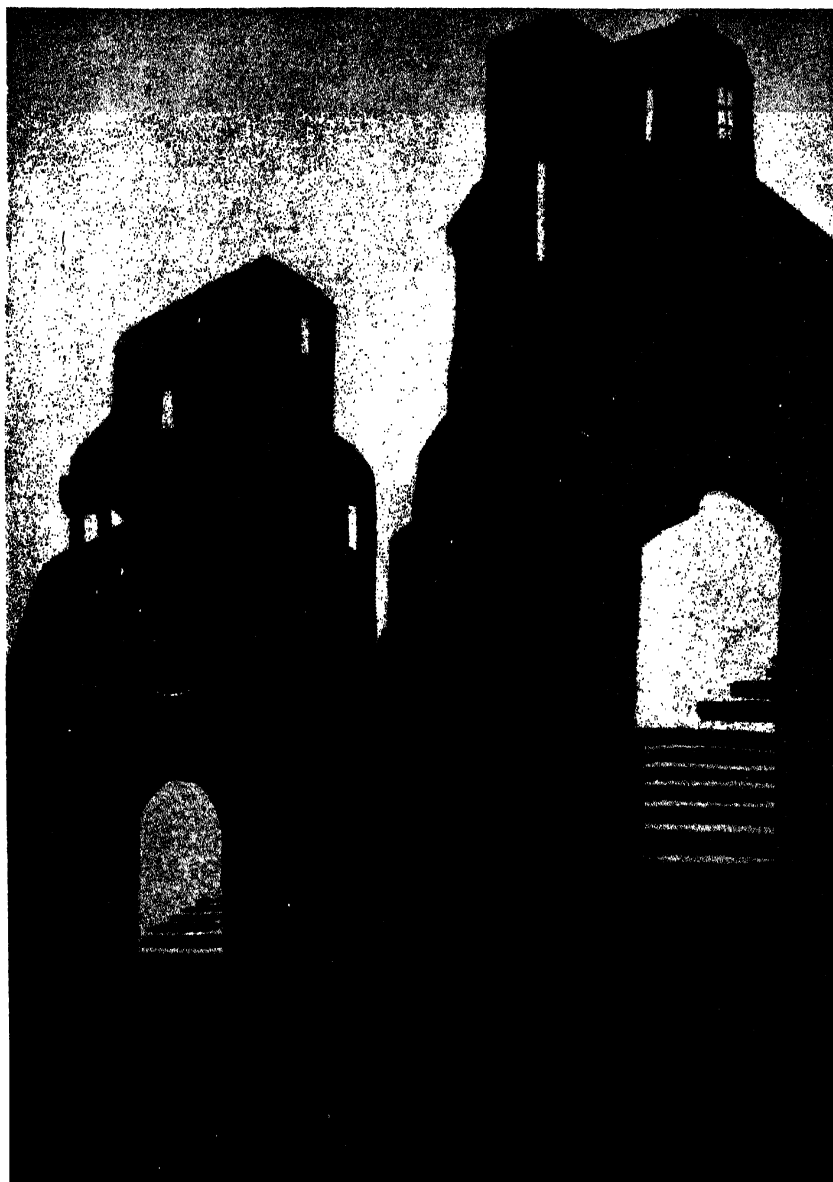
অষ্টম বর্ষ | আশ্বিন ১৩৪৬ | চতুর্থ সংখ্যা

স্মরণে

অনিলচন্দ্র রায়

পথিক-বন্ধু, পথের দিশারি, আজিকে বারম্বার
স্মরণ-করুণ প্রণতি জানাই, লহ এ নমস্কার।
মৃত্যু-তরণী বাহিয়া তরিলে জীবনের পারাবার
পশ্চাত-পথে পথিক আমরা করিগো নমস্কার।

তুফানের পাখী! গাহিয়া গেলে গো ঝড়ের পরম গান
সকলের ঋণ শুধিতে করিলে চরম মূল্য দান।
ভিক্ষার ঝুলি ভরিতে মোদের সব দিলে আপনার
নিঃস্বে জোগালে পথ-সম্বল পথে পথে চলিবার।

শোণিতের টিপ ললাটে পরিলে, কাঁটার মুকুট শিরে
গলায় পরিলে বেদনার মালা গাঁথিয়া অশ্রুনীরে।
দুঃখ বিছায়ে আসন রচিলে অপরূপ করুণার
বুকের পাঁজর বাজায়ে শোনালে গান গাহি' মমতার।

কণ্টক-বনে বসিয়া হাসিলে কুসুমের মধুহাসি
দীর্ণ বুকের রন্ধ্র ভরিয়া বাজাইয়া গেলে বাঁশী।
মরণের বীণে তুলিলে, বন্ধু, জীবনের ঝঙ্কার
পথিক-বন্ধু! পথের দিশারি! জানাই নমস্কার।

/

ঈশা বাস্যম্।

সুরমা মিত্র

ঈশোপনিষদের প্রথম শ্লোকটি এই—

ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥

শঙ্করাচার্য্য ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে এই জগতে যাহা কিছু আছে সকলই পরমাত্মার দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সেই সত্য পরমাত্মার চিন্তা বা ভাবনা করিলে অনাত্মবিষয় যে মিথ্যা এই জ্ঞান লাভ হয় এবং ইহার ফলে মিথ্যাবস্তুকে অনায়াসে ত্যাগ করা যায়। সুতরাং মিথ্যাবস্তুত্যাগের দ্বারা নিজের বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপকে পালন করা যায় এবং ধন সম্পদ্ প্রভৃতি, যাহা আত্মা নহে, তাহা নিজেরই হউক্ বা পরেরই হউক—তাহাতে নির্লোভ হওয়া যায়। তিনি আরও বলিয়াছেন—সমস্তই যখন আত্মার দ্বারাই ব্যাপ্ত তখন পরের ধন বলিয়া আত্মব্যতিরিক্ত কিছুই 'ত' নাই সুতরাং তাহাতে লোভ করা একেবারে মিথ্যা ও নিরর্থক। অন্য কোথাও কোথাও একটু ভিন্নরূপে এই শ্লোকটির ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কিন্তু সকলগুলি হইতেই এই কথাটিই ভাসিয়া আসে যে সকল বস্তুতেই যখন একই পরমাত্মস্বরূপ বিরাজিত—তখন সকলেই সেই আত্মা, সকলেই এক, অভিন্ন, অপরের সহিত নিজের ভেদ মিথ্যা, সুতরাং অপরের যাহা, তাহা পরমাত্মার বা আমারই কাজেই লোভ করা নিরর্থক ও বৃথা, লোভের কোন ক্ষেত্রই নাই। এই যে সকলের সহিত পরম ঐক্য—ইহা শুনিতে ও ভাবিতে ভালো লাগে সন্দেহ নাই। কিন্তু একটি প্রশ্ন ওঠে এই যে আমি ও অন্যব্যক্তি সকলেই যখন এক, কারণ একই বৃহৎ পুরুষের মধ্যেই আমাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়—যেমন সমুদ্রের মধ্যে তরঙ্গ উঠিয়া সমুদ্রেই বিলীন হয়, তখন অন্যকে না দিয়া আমিই বা গ্রহণ করি না কেন? আমার ও অন্যের সহিত যদি কোন ভেদ না থাকে, তবে আমার ভোগে অপরেরও ভোগ, কাজেই আমিই যদি ভোগ করি এবং অপর ব্যক্তি যদি চাহিয়া দেখে তাহাতে ক্ষতি কি? আমার ধনে অপরে লোভ না করুক এবং আমার ভোগে অপরে তৃপ্ত হউক্ এইরূপে যদি বলি তাহাতেই বা দোষ কি? আরও একটি কথা ওঠে যে অপরের ধনে লোভ না হয় না করিলাম কিন্তু নিজেরটি ত্যাগই বা করিব কেন?

এই প্রশ্নের সমাধান বড় সহজ কথা নহে। সমাধান সহজ না হইলেও অন্ততঃ শ্লোকের চারিটি চরণের অর্থের মধ্যে কোনও অসঙ্গতি বা অসামঞ্জস্য না থাকে এইরূপ একটি চেষ্টা করা যাইতে পারে এবং সেইপথে সমাধান হওয়া অসম্ভব নহে। ঈশ্ ধাতুর অর্থ নিয়ন্ত্রণ করা—শাসন

করা—অতএব ঈশ্ মানে যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। সেজন্যই ঈশা বাস্যমিদমিত্যাদির ব্যাখ্যায় বলা যায় যে একটি পরম নিয়ন্ত্রী শক্তির দ্বারা সমস্ত জগৎসংসার বিধৃত হইয়া রহিয়াছে। অণুপরমাণুর মিলন ও সঙ্ঘাতে তৃণলতা গুল্ম বনস্পতিতে চেতন জীবলোকে সর্ব্বত্র তাহারই নিয়ম ও শৃঙ্খলা আবর্ত্তিত হইতেছে। যে নিয়মে ফুল ফোটে, বৃক্ষ অঙ্কুরিত হয়, সেই নিয়মেই প্রাণিজীবনও নূতন নূতন কেন্দ্রে প্রস্ফুরিত হইয়া ওঠে ও আবার বিনষ্ট হয়। সেই নিয়মেরই বিধানে সৃষ্টির নিত্য নূতন অভিব্যক্তির লীলা চলিয়াছে। তাহাকে শক্তি বলি বা পরমাত্মা বলি বা প্রকৃতির স্বভাব বলি—সেই সংজ্ঞাভেদে কিছু আসে যায় না কিন্তু কোনও একটি অনতিক্রমনীয় বিধান যে সৃষ্টির মূলে রহিয়াছে যাহার দ্বারা বিশ্বজগৎ পরিচালিত ও অভিব্যক্ত হইতেছে তাহার অস্তিত্ব খুব বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকেরাও স্বীকার না করিয়া পারেন না। প্রথম দুইটি চরণের অর্থ পূর্ব্বোক্তরূপে করিয়া পরবর্ত্তী দুইটি চরণ সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে সেই নিয়ন্ত্রণরীতিতে, বিশেষ বিশেষ ঘটনাপরম্পরায়, অবস্থার বৈচিত্র্যে যাহার ভাগ্যে যাহা আসে, তাহাকেই মানিয়া লওয়া, তাহাতেই আনন্দ পাওয়াকেই আমরা বলিতে পারি—তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ। সেই শক্তির দুর্লঙ্ঘ্য কার্য্যনিয়মে যাহা তোমার জন্য উৎসৃষ্ট হইয়াছে, যাহা তাহার দ্বারা তোমার জন্য 'ত্যক্ত' হইযাছে, তাহাকেই গ্রহণ কর ভোগ কর ; মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্—অপরের কাছে যাহা আসিয়াছে তাহাতে লোভ করিও না। একই শক্তির আবর্ত্তনে সৃষ্টির বিকাশ হইলেও সে বিকাশ বহুমুখী, কোন একটি সৃষ্ট বস্তু অপরটির সহিত অভিন্ন নহে। যাহা আমার মধ্যে প্রস্ফুরিত হইয়াছে অপরের মধ্যে তাহা নাই সেখানে বিভিন্নরূপও ভিন্ন প্রকারের সন্নিবেশ হইয়াছে। কাজেই অমরা প্রত্যেকে বিভিন্ন, সেই বৈশিষ্ট্যেই আনন্দ উপভোগ কর—অন্যের যাহা তাহাতে লোভ করিও না!

প্রকৃতির ক্রমবিকাশের ধারা লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাই বৈষম্যের দ্বারাই তাহার বিচিত্র সৃষ্টি ও নূতন নূতন স্তরের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছে। নানা অবস্থার বৈচিত্র্যে, ঘটনার ভেদে, সৃষ্টির সহস্রদলটি বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, নূতন রূপ ও নূতন জীবনের আবির্ভাব হইয়াছে। একই বৃক্ষের পত্রগুলির দিকে চাহিলে দেখি যে কোনও দুইটি পত্র এক নহে। কোনটি আলোকে উত্তাপে সরস ও শ্যামল, কোনটি তাহার অভাবে বিশুষ্ক, অপরিণত। একই শাখায় কোনও পুষ্প বৃহৎ ও সুন্দরতর, কোনটি তাহা নহে। রসসংগ্রহের সুবিধা, আলোকের তারতম্য প্রভৃতি কারণে পত্রপুষ্পের পরিণতি, গঠন ও সৌন্দর্য্যের ভেদ হয়। পশুপক্ষী বা মনুষ্যজীবনেও তাহাই দেখিতে পাই। যদি প্রশ্ন করা যায় এই বৈষম্য কেন, তবে তাহার উত্তর এই যে ইহাই স্বভাব বা নিয়ম। যদি বলি—কেন অগ্নি উষ্ণস্বভাব, জল কেন শীতল, বায়ু কেন বহনশীল, পর্ব্বত কেন কঠিন তবে তাহার উত্তরে বলিতে হয় যে ইহাই প্রকৃতির বিধান, অন্যবিধ বৈষম্যসম্বন্ধেও সেই উত্তরই দেওয়া যাইতে পারে। ভালই হউক্ বা মন্দই হউক্ এই নিয়মে বিশ্বসংসার পরিচালিত হইতেছে। আর ইহার স্বপক্ষে প্রধান কথা এই যে বৈষম্যেরই ফলে জগতের বহুমুখী বিকাশ ও বৈচিত্র্য সম্ভব হইয়াছে। যদি সকল বস্তুই একই ধর্ম্মবিশিষ্ট হইত তাহা হইলে বিভিন্ন-

স্তরের উৎপত্তি হইত না। যদি সকল ফুল ও পাতা একই প্রকারের হইত—সৌন্দর্য্যের বিবিধ বিকাশ হইত না। অতএব প্রকৃতির লীলার একটি চরম বিকাশ সেখানে অর্থাৎ মানুষের জীবনে, সেখানেই বা বৈষম্যকে বাদ দেওয়া যায় কি প্রকারে? কেহ বুদ্ধিমান, কেহ নির্ব্বোধ, কেহ সুন্দর, কেহ কুৎসিত—সকলপ্রকার বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যে সমাজ ও জাতির জীবন গড়িয়া উঠিতেছে। অলঙ্ঘনীয় নিয়মের দ্বারা যাহার জন্য যতটুকু নির্দ্দিষ্ট বা 'ত্যক্ত' হইয়াছে তাহাই তাহার জীবনে আসিয়াছে—তাহারই ভোগে তাহার অধিকার। তাহাই তাহার ক্ষেত্র—সুতরাং বলা হইয়াছে 'তেন ত্যক্তেন তুঞ্জীথাঃ।'

এই বৈষম্যের সমাধানরূপে শাস্ত্রে কর্ম্মবাদের উল্লেখ ও আলোচনা আছে, কিন্তু তাহাও এই মূলগত বৈষম্যকে অস্বীকার করিতে পারে নাই। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলে বর্ত্তমান জন্মের ভাগ্য নির্দ্দিষ্ট হয়;—কিন্তু একই জাতীয় মানুষ কেন বিভিন্ন কর্ম্ম করে,—সেই সুদূর অতীতে সৃষ্টির আদিতে কেন বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছিল—এইরূপ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠিতে পারে। দ্বিতীয়টির উত্তরে বলা হয়—আদি বা প্রথম বলিয়া কিছু কর্ম্মবাদে নাই—ইহা অনাদি, অর্থাৎ ভিন্ন কথায় বলিতে গেলে ইহাই দাঁড়ায় যে এই প্রশ্নের কোন উত্তর নাই। প্রথমটির উত্তরে বলা হইয়াছে মানুষের একটি স্বতন্ত্র ইচ্ছাশক্তি আছে সেইজন্য প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করে ও তদনুযায়ী ফলভোগ করে। কোথাও কোথাও এমনও বলা হইয়াছে যে সৃষ্টিকর্ত্তার ইচ্ছা অনুসারে বৈচিত্র্যের জন্য মানুষের মনে কিছু কিছু মালিন্যের 'লেপ' প্রথম হইতেই আছে—তাহারই ফলে সংসারের বিবিধ বিকাশ হইয়াছে। আরও একটি কথা এখানে প্রয়োজনীয়, তাহা এই যে শাস্ত্রে মানুষের সুখদুঃখাদি ভোগের কারণস্বরূপেই কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, মানুষের চরিত্রগত বা প্রকৃতিগত ভেদের কারণ বলিয়া কর্ম্মের নির্দ্দেশ করা হয় নাই—অথচ এই ভেদের দ্বারা মানুষের ভাগ্য অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়। ইহা ছাড়া এই প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা উঠিতে পারে যথা কর্ম্মের ভালো মন্দের উপরেই যখন সব নির্ভর করে তখন তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট মানদণ্ড (standard) থাকা উচিত। কিন্তু কর্ম্মের বিচারের পদ্ধতি সকল দেশে, কালে ও সমাজে এক নহে; স্থানভেদে, কালভেদে, যখন সেই ভালো মন্দ প্রভৃতি বিচারের পার্থক্য ঘটে তখন তাহার দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মের বর্ত্তমান ফলাফল নির্ণয় করা সম্ভব নহে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতে পারে কিন্তু তাহার জন্য ভিন্ন প্রবন্ধ লিখিতে হয়। এই প্রসঙ্গে এইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে কর্ম্মবাদেও মূলগত বৈষম্যকে স্বীকার করিতে হইয়াছে।

আধুনিককালে যে সাম্যবাদের উদ্ভব হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক, তাহার বিস্তৃত আলোচনাও এখানে প্রাসঙ্গিক নহে। কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পারে যে আর্থিক সাম্য প্রভৃতির ক্ষেত্র মানুষের সমগ্র জীবনের তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসর—একান্ত প্রয়োজনীয় আহার ও বস্ত্র সমস্যা ছাড়া মানুষের যে অনন্ত চিত্তলোক আছে তাহার অনেক সুখদুঃখই আর্থিক সুখদুঃখ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিস্তৃত। কেবলমাত্র আর্থিক দিক হইতেও সাম্য সম্ভব কিনা তাহার সমাধান

আজও হয় নাই। সকলেরই জীবনধারণের উপযোগী দ্রব্যাদিতে দাবী স্বীকার করিলেও যোগ্যতা ও শক্তির বৈশিষ্ট্য অনুসারে একজন আর একজন হইতে কেন অধিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হইবে না, বা সকল ব্যক্তিকেই যোগ্য অযোগ্য নির্বিচারে একই পংক্তিতে ফেলিলে সমাজের কল্যাণ ও অভ্যুদয় হইবে কিনা ইহা গুরুতর চিন্তার কথা। সে প্রশ্ন ছাড়িয়া দিয়াও মানুষের জীবনে—আর্থিক সুখদুঃখ ব্যতীত যে অনন্ত প্রকারের সুখ দুঃখ আছে তাহার সমাধানে বৈষম্যকে মানিয়া লওয়া ছাড়া গত্যন্তর নাই। তাহাদের আমরা দুইভাবে দেখিতে পারি। কতকগুলি মানসিক বৈচিত্র্য—জনিত, কতগুলি বহির্ঘটনার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয়। অনেক স্থলে সুখের অনেক উপকরণ থাকিলেও স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার জন্য বিদ্বেষে, সন্দেহে, ঈর্ষায় মানুষ ক্লিষ্ট হয়, লোভে জর্জ্জরিত হয়। কেহ বা স্বল্প উপকরণেই সুখী হয়। কাহারও নিজের অন্তর হইত নিত্য আনন্দ ও প্রসন্নতা উৎসারিত হইতে থাকে—কাহারও দৈন্যের শেষ কিছুতেই হয় না কেবল অশান্তি, কেবল অতৃপ্তির গ্লানিতে পীড়িত হইতে থাকে। কাহারও জীবনে অনেক সুযোগ সুবিধা ঘটনার স্রোতে আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়, কাহারও তাহা হয় না। কিন্তু এই দ্বিবিধ ভোগই, তাহা প্রকৃতিগত বা বহির্ঘটনা-জনিত যাহাই হউক না কেন, সেই বিশ্বনিয়ন্ত্রী শক্তির নিয়ম হইতে উৎপন্ন ইহাই স্বীকার করিতে হয়। যে নিয়মে তরুলতাগুল্মের মধ্যে বৈচিত্র্যের উদ্ভব সেই নিয়মেই প্রাণিজগতের আন্তর বিশিষ্টতা ও ভেদ এবং বাহিরের ঘটনার অনুকূলতা বা প্রতিকূলতার উদ্ভব হয়। ইহার সমাধানে তাই বলিতে হয় যে বিশ্ব প্রকৃতির নিয়ম বলিয়া—সকল ভেদ ও বৈষম্যকে মানিয়া লওয়া, বরণ করিয়া লওয়াই একমাত্র পথ। তাই উপনিষদ্ বলিতেছেন 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ' যাহা তিনি দিয়াছেন তাহাই উপভোগ কর, তাহাই তোমার, যাহা আসে নাই—যাহা অপরের, তাহার জন্য ক্ষোভ করিও না, মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্, অপরের সৌভাগ্যে লোভ করিও না ঈর্ষাপরায়ণ হইও না। যে সুখী, যে ধনী, যে দুঃখী, যে দরিদ্র, সকলেরই জীবন সেই একই নিয়মের লীলায় স্পন্দিত হয়, প্রস্ফুটিত হয় আবার ঝরিয়া পড়ে। আমাদের সুখে দুঃখে, উত্থান পতনে, স্খলনে ত্রুটীতে বিচ্যুতিতে, মহত্ত্বে সেই মূল প্রাণধারার তরঙ্গায়িত প্রকাশ সৃষ্টির পরম সার্থকতা আবাহন করিতেছে—ইহাতে ক্ষোভের স্থান কোথায়? সেই উৎসে আমরা হর্ষে শোকে বেদনায় আনন্দে নিত্য অবগাহন করিয়া ধন্য হইতেছি। অনন্ত অসীম সৃষ্টির আমরা প্রকাশ, আমরা সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, তাহা ভাবিয়া মুদিত হও প্রসন্ন হও—আনন্দিত হও। যে ভূতধাত্রী প্রকৃতি নিত্য নানা আকারে, উৎপত্তি ও ধ্বংসের মধ্য দিয়া তাহার মহৎ সৃষ্টি নিপুনভাবে চালনা করিয়া চলিয়াছে, আমাদের বৈশিষ্ট্যে আমরা তাহার উপকরণরূপে তাহাকে প্রকাশ করিতেছি ইহাতেই আমাদের সার্থকতা।

এখানে একটী প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে আমাদের ভাগ্য, সুখ দুঃখ, মানসিক বৈশিষ্ট্য, সকলই যদি প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন হয়, তাহা হইলে পুরুষকারের স্থান কোথায়? তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে ইহার সহিত পুরুষকারের কোনও বিরোধ নাই। আমাদের প্রত্যেকের ভাগ্যের সীমা আমাদের জানা নাই, উদ্যোগ ও প্রয়াসের দ্বারা প্রাপ্তির সম্ভাবনা সকল সময়ই

আছে। যতখানি হইতে পারে তাহার পরিমাপ চেষ্টা না করিলে জানিবার উপায় নাই। প্রকৃতির বিধানে যাহা আমাদের জীবনে আসিবে তাহা ত' সিদ্ধ হইয়া পরিনিষ্পন্ন হইয়া নাই—তাহা গড়িতে হইবে. তাহা বর্দ্ধমান, ক্রমশঃ বিকাশোন্মুখ, গতিশীল, স্থিতিশীল নহে। বটের বীজ হইতে বটবৃক্ষই উৎপন্ন হইবে তমাল বৃক্ষ নহে, কিন্তু সেই বীজের মধ্যে যে ভবিষ্যৎ মহীরুহের সম্ভাবনা নিহিত আছে, তাহা জলবায়ু ও মৃত্তিকার রসসংযোগে অঙ্কুরিত হইবে তবেই একদিন তাহার বিরাট পরিণতি লাভ করিতে পারিবে। গন্ধরাজের কলিকা কখনও গোলাপ হইয়া প্রস্ফুটিত হয় না বা কুমুদ কখনও শতদল হয় না—কোথাও না কোথাও প্রত্যেকের জীবনের একটি নির্দ্দিষ্ট গতি, সীমা, বা মর্য্যাদা আছে কিন্তু কুঁড়ির অবস্থা হইতে প্রস্ফুটিত হওয়ার জন্য পরিণতির প্রয়োজন আছে, এবং সেই কুঁড়িটীর জীবনে চরম বিকাশের সম্ভাবনা তাহার পক্ষে অনন্তই বটে। তেমনই আমাদের প্রত্যেকের জীবনে একটী গন্তব্য আছে, প্রাপ্তব্য আছে—যাহা পাওয়ার সাধনা আমাদের কাছে অনন্ত। যাহা পাইয়াছি ও যাহা পাইব—তাহাই আমাদের শ্রেয় ও কল্যাণ। এই শ্রেয়ঃকে নূতন নূতন রূপে উপলব্ধি করিবার পথ শত সহস্রভাবে উন্মুক্ত রহিয়াছে, তাহা কেন একই প্রকারের হইল না—ইহাতে ক্ষোভের কারণ নাই—তাহা যে বিভিন্ন তাহাতেই সৃষ্টির গৌরব, আমাদের বৈশিষ্ট্যে ও বৈচিত্র্যেই আমাদের গৌরব। প্রাচীনকালেও দেখি যে মানবজীবনের চরম লক্ষ্য মুক্তি বা মোক্ষের স্বরূপ সকল দর্শনেই বিভিন্ন ছিল, আধুনিক দৃষ্টিতে ও আমরা শ্রেয়ের বিভিন্নতাকে, স্বাতন্ত্র্যকে, বহুমুখী বিকাশকেই স্বীকার করিয়া ধন্য হইতে চাই। সন্তোষে আনন্দে ও নির্লোভতায় চিত্তকে নির্ম্মল রাখিয়া নিরন্তর জীবনের পথে অগ্রসর হওয়ার তপস্যায় আমরা ব্রতী হই, দুঃখে সুখে হর্ষে বেদনায়, ভাগ্যের ঘাত সঙ্ঘাতে, অন্তরের বিচিত্র অনুভূতির লাবণ্যবিলাসে—বিশ্বসংসারের যিনি নিয়ন্তা তাঁহার অজস্র আত্মপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া যেন সার্থক হইতে পারি—ইহাই—আমাদের পরম কল্যাণ ও চরম শ্রেয়ঃ। প্রাণ প্রবাহের আনন্দ লীলায় অংশ গ্রহণ করিয়া ঈর্ষাবিদ্বেষের গ্লানিকে ধৌত করিয়া উপনিষদের পূতমন্ত্র—পরম বাণী মনে প্রাণে উচ্চারণ করি—'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।' সকল বিক্ষোভে ও দ্বন্দ্বে অবিক্ষুব্ধ ও অপরাজিত থাকাতে যে তেজস্বিতা আছে—বীর্য্য আছে—তাহাতে উদ্দীপ্ত হইয়া, আনন্দময়ের আনন্দে অভিষিক্ত হইয়া স্নিগ্ধতায়, শুচিতায় এই পরম তথ্যটী যেন বুঝিতে পারি যে, আমরা কেহই তুচ্ছ নহি, দীন নহি, বিরাট বিশ্বের লীলায় আমরা একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহার মহিমায় মহিমান্বিত। সকল ক্ষোভ ও লোভ হইতে মুক্ত হইয়া—জীবনের গৌরবে, প্রাণের সম্পদে পরিপূর্ণও সমৃদ্ধ হইয়া উঠি। সৃষ্টির মহামহিমান্বিত রহস্যকে আবাহন করিয়া করিয়া বলি—তোমার আপন স্বরূপে আমাদের প্রত্যেকের চিত্তে প্রকাশিত হও—আবিরাবির্ম এধি।

আগমনী

সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

পরাণে আমার আগমনী আজি বাজে
উন্মাদ আমি চঞ্চল আমি মন নাহি লাগে কাজে।
এ নৈঃশব্দ্য স্তব্ধতা নয়,
অস্ফুট মধু মর্ম্মর ময়,
কোথা হ'তে যেন ঢেউ দোলা বুকে লাগে
নয়নে আমার নব অনুরাগে উৎসুক দিঠি জাগে।

আজি এ বাতাসে না জানি কি যাদু আছে,
বাসনা বেদনা উন্মাদনায় প্রাণ মোর ভরিয়াছে।
দেহ বন্ধন টুটি অবহেলে
এ মধু সমীরে তুমি ভেসে এলে ?
হেরি অরূপারে মৌনার বাণী শুনি,
অথবা পবন ঘনায়ে কেবল স্বপনের জাল বুনি ?

খধূপ

জানিনা কি চোখে আমি
চাহিনু তোমার পানে,
কি অনপনেয় টানে
ছুটে চলি নাহি থামি,
শূন্য খধূপ পারা,
গতি যার অফুরান,
প্রিয়া যার ধ্রুবতারা,
সীমাহারা ব্যবধান।

আঁধারের বুক চিরি'
অনলের রেখা টানি'
কেবল ছুটিতে জানি,
থামিবেনা এ ফকিরি।
যাত্রার অবসানে
ঝরিব হাজার গানে।

পরিবর্ত্তন

মোর চোখে বাসনার বহ্নি,
তুহিন ধরিছ তব চক্ষে,
তোলপাড় জাগে মোর বক্ষে.
হিমাদ্রি চূড়া তুমি, তন্বী।
সুদীর্ঘ ব্যবধান মধ্যে,
ছন্দ হারায় মোর কবিতা,
পরিণত হয় শেষে গদ্যে,
পুড়ে পুড়ে ছাই যেন সলিতা।

সেই তুমি বিগলিত ঝরণা
নেমে এস এ উষর ক্ষেত্রে,
অভিসারে চঞ্চল চরণা,
বহ্নি নিভাও মোর নেত্রে।
ভাবিনি নামিবে মোর মরুতে
ভরি দিবে তারে তৃণ তরুতে।

মাদকবর্জ্জন আন্দোলন

অধ্যাপক নীরদ কুমার ভট্টাচার্য্য

কংগ্রেসশাসিত প্রদেশগুলিতে অনুসৃত মাদকবর্জ্জন নীতি সাফল্যমণ্ডিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যাপক আইন প্রণয়ন করা হইয়াছে ও এতৎসম্পর্কে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টকে মাদকদ্রব্য পরিহার যাহাতে বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে তজ্জন্য ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এই ক্ষমতার বলে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টও অল্পবিস্তর দ্রুতগতিতে মাদক বর্জ্জনে পরিকল্পনার প্রসারে তৎপর হইয়া উঠিয়াছে ও সম্প্রতি বোম্বাই সহর ও সহরতলীতে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে। এ যাবৎ যাহা দুঃসাহসিক বলিয়া অনুমিত হইত তাহা বোম্বাইএর কংগ্রেস মন্ত্রীমণ্ডলী সাফল্য মণ্ডিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। এইরূপ দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার জন্য কংগ্রেসই প্রশংসাই সন্দেহ নাই এবং ইহার সাফল্য ব্যতীতও এইরূপ পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টার একটি বিশেষ মূল্য আছে। আইনদ্বারা কোন জাতিকে সৎপথানুগামী করিবার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ জাগিতে পারে কিন্তু ইহাও সত্য জাতীয় সংগঠন ও চরিত্রগঠন কার্য্যে গভর্ণমেণ্ট ও তৎপ্রণীত আইনব্যবস্থার একটি বিশেষ স্থান আছে। ধর্ম্মগত ও নীতিগত প্রশ্ন ছাড়িয়া দিলেও জাতীয় অর্থসম্পদ ও মানুষের কার্য্যক্ষমতার একটা প্রশ্ন আছে ও শেষোক্ত প্রশ্নের দিকটাই বর্ত্তমান যুগে বিবেচনার ন্যায্য বিষয়বস্তু বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

ভারতে জনসাধারণের আর্থিক অসচ্ছলতা ও তাহাদের আয় ব্যয়ের অসামঞ্জস্য দারিদ্র্যের একটি প্রধান কারণ। বিশেষ করিয়া একটি জার্ম্মান প্রবাদ আছে যে "A man is what he eats." বিচক্ষণতার সহিত অর্থব্যয়ের অভাব আমাদের দেশে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং এটি দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে বেশী করিয়া খাটে কারণ অধিকাংশ দেশেই দরিদ্র লোকেরা দারিদ্র্য বশতঃই তাহাদের যৎসামান্য আয় সম্পর্কে উদাসীন ও অবিবেচক। শিক্ষার অভাব ও প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইহার জন্য অনেকটা দায়ী কারণ খরচের সময় খরচকারীর সমস্ত দায়িত্ব ও বিবেচনা প্রয়োজন হলেও আয়ের সময় এইরূপ একমাত্র আয়কারীর উপর নির্ভর করা চলে না। সত্যি কথাই বলা হয় যে "To spend money well is a harder task than to earn money well." এইরূপ অবস্থায় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহের অবকাশ নাই কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থারও সংশোধন আবশ্যক এবং এইখানেই গভর্ণমেণ্ট ও আইনের কর্ত্তব্য সুরু হয়। সুযোগ ও সুবিধার প্রয়োজনমত পরিবর্ত্তন করিতে পারাই প্রগতিশীল সমাজের কর্ম্মক্ষমতার পরিচায়ক।

ভারতীয় শ্রমিকের আয়ের শতকরা অন্যূন চারিভাগ মাদকদ্রব্য ক্রয়েই ব্যবহৃত হয় ও নিম্নস্তরের শ্রমিকদের আরও অধিকতর অংশ—যথা শতকরা দশভাগও এইরূপ ব্যয়িত হয়। এই

অনুমান খুবই অপর্য্যাপ্ত—এবং ইহা বোম্বাইয়ের শ্রমিকদের ব্যয়ের তালিকা হইতেই মালুম পাওয়া যায়। তাহারা তাহাদের আয়ের শতকরা ৪৬ ভাগ খাদ্যে, ৭ ভাগ জ্বালানি ও আলোতে, ৮ ভাগ পোষাকে ও ১৩ ভাগ বাসস্থানে ব্যয় করে। অবশিষ্ট ২৬ ভাগ আমোদপ্রমোদে, ঋণের সুদ ও মাদকদ্রব্যে ব্যয় করে। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন ব্যতীত সম্পদবৃদ্ধির কথা চিন্তা করা যায় না। অবশ্য নিম্নস্তরের কার্য্য করিতে হইলে, আমোদপ্রমোদ একান্ত প্রয়োজন—মানসিক শ্রান্তি অপনোদন একান্তই আবশ্যক কিন্তু মাদক ব্যবহারে কৃত্রিম উত্তেজনা ও শারীরিক ক্ষতির সম্ভাবনাই সমধিক। মাদকবর্জ্জন সফল করিতে হইলে এই অশিক্ষিত ও নিরন্ন জনসাধারণের জন্য নির্ম্মল আনন্দের ব্যবস্থা করা উচিত এবং সে ব্যবস্থা ব্যয়সাধ্য হইলে উদ্দেশ্য বিফল হইতে বাধ্য। শ্রমিকের আয়ের মধ্যে সঙ্কুলান হয় এইরূপ আমোদপ্রমোদের ব্যবস্থা করা গভর্ণমেণ্টেরই কর্ত্তব্য। জার্ম্মানীতে সরকারের ব্যয়ে অল্পমূল্যে সিনেমা ও দেশভ্রমণের ব্যবস্থা শ্রমিকদের জন্য করা হইয়া থাকে, তাহাদের আনন্দবর্দ্ধনের জন্যই।

ইহাও অনেকটা সত্য যে এই ব্যয়ের অসমতার খানিকটা কারণ মাদকদ্রব্যের বিপণির বাহুল্যের জন্য শ্রমিকের আয় তাহার গৃহ পর্য্যন্ত পৌছায় না। মাদকবর্জ্জনের প্রচেষ্টার ফলে এই আয় গৃহপর্য্যন্ত পৌছিতে পারে।

মাদক ব্যবহার বৃদ্ধির কথা অস্বীকার করা যায় না। মাদকদ্রব্যের উপর আবগারী শুল্কবাবদ গভর্ণমেণ্টের ১৮৬১-৬২ সালে নীট আয় হইয়াছিল ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা, ১৯২৯-৩০ সালে ইহার পরিমাণ ছিল ১৮ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা; ১৯৩৬-৩৭ সালে ইহার পরিমাণ হ্রাস পাইয়া ১৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই আবগারী শুল্ক বৃদ্ধির একমাত্র কারণ যে মাদকদ্রব্য ব্যবহারের বৃদ্ধি তাহা নহে। অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে আবগারী শুল্কের হার বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও কয়েক শ্রেণীর আর্থিক স্বচ্ছলতা উল্লেখযোগ্য। তবে ইহাও নিঃসন্দেহ যে মাদকদ্রব্য ব্যবহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। মাদকদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া তাহার ব্যবহার হ্রাস করিবার প্রচলিত পদ্ধতি বহু দিন হইতে অনুসৃত হইতেছে কিন্তু অপরিমিত মূল্যবৃদ্ধির দরুণ বে-আইনী মাদকউৎপাদন হইবার আশঙ্কা থাকায় যথোপযুক্ত মূল্য বৃদ্ধি করা হয় নাই এবং মাদকবর্জ্জনও হ্রাস পায় নাই এবং এ যাবৎ কোন প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টই আবগারী শুল্ক হইতে আয় পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছুক ছিল না, আজও বাংলা ও সিন্ধু প্রদেশের সরকার মাদকদ্রব্য বর্জ্জন আইন করিতে এই কারণেই অনিচ্ছুক। এ যাবৎ মাদকদ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ উত্তরোত্তর হ্রাস করিয়া কালক্রমে মাদকব্যবহার হ্রাস করিবার নীতি সমীচীন বলিয়া গণ্য হইতেছিল। কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পূর্ব্বেও মাদকবর্জ্জননীতি মাত্র নীতিহিসাবেই গৃহীত হইয়াছিল। ১৯২৪ সালে বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্ম্মে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল যে বিশ বৎসরের মধ্যে মাদকদ্রব্য বর্জ্জন সম্পুর্ণ সাফল্যমণ্ডিত করা হইবে। কংগ্রেস এই নীতির পরিবর্ত্তে তিন বৎসরে মাদকবর্জ্জন সফল করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে।

কংগ্রেস মন্ত্রীত্বগ্রহণের পর এই পরিকল্পনার উদ্ভব হয় নাই। গত বিশ বৎসর যাবৎ মাদক-

বর্জ্জন কংগ্রেসের গঠনমূলক কর্ম্মতালিকার অন্তর্গত ছিল। কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে গৃহীত Fundamental Rightsএর ১৩ ধারায় স্পষ্ট বিবৃত ছিল যে, "intoxicating drinks and drugs shall be totally prohibited except for medicinal purposes." অসহযোগ আন্দোলনের বিষয়বস্তুর একটি ভিত্তি ছিল মাদকব্যবহার নিবারণ। নির্ব্বাচনী প্রতিশ্রুতির ইহা একটি অঙ্গ সুতরাং মাদকবর্জ্জন আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত করিবার চেষ্টা না করিলে কংগ্রেস বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্যই করিতেন। তিন বৎসর সময় নির্দ্ধারণ সম্পর্কে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে শিক্ষাপ্রসার প্রভৃতি অন্যান্য গঠনমূলক কার্য্য ক্ষতি না করিয়া যত শীঘ্র সম্ভব মাদকবর্জ্জন সফল হইলে ভালই হয়, কারণ এ সমস্ত বিষয়ে কালক্ষেপ ও ধীরগতি এই আন্দোলনের শক্তি হ্রাস করিয়া ফেলে। মাদকব্যবহার নিবারণের ফলে গভর্ণমেণ্টের আয় হ্রাস হইবে ও এই ক্ষতি যথাসম্ভব পূরণ করিতে সক্ষম হইলে, সঙ্গে সঙ্গে লোকশিক্ষার প্রচার করিতে পারিলে, সুলভে দরিদ্র জনসাধারণের অবসর বিনোদনের ব্যবস্থা করিতে সক্ষম হইলেও বে-আইনী মাদকব্যবহার যথাসম্ভব হ্রাস করিতে পারিলে যত শীঘ্র মাদক ব্যবহার পরিহার করা যায় ততই দেশের মঙ্গল উপরন্তু তিন বৎসর সময়ও খুব সামান্য নহে।

আবগারী শুল্ক প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের আয়ের একটি প্রধান অঙ্গ—ইহা হ্রাস পাইলে গঠনমূলক কার্য্যের ক্ষতি হওয়া স্বাভাবিক। তিন বৎসরে এই আয় প্রায় বন্ধ হইয়া যাইবে। মাদ্রাজ প্রদেশের ১৯৩৭-৩৮ সালে মোট ১৬ কোটি টাকার আয়ের মধ্যে ৪ কোটি ৩ লক্ষ টাকা আবগারী শুল্ক বাবদ আয় হয়। বোম্বাইএর মোট ১২ কোটি টাকা আয়ের মধ্যে ৩ কোটি ২০ লক্ষ টাকা আবগারী শুল্কের আয়। মধ্যপ্রদেশের ৪ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা আয়ের মধ্যে ৩৩ লক্ষ টাকা আসে আবগারী শুল্ক হইতে। যুক্তপ্রদেশে ১৩ কোটি টাকার মধ্যে আবগারী শুল্কের আয় ১ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা। উড়িষ্যার ১ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা আয়ের মধ্যে আবগারী শুল্কের আয় প্রায় ৩৩ লক্ষ টাকা। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের সমগ্র আয়ের (ভারত সরকারের সাহায্য ব্যতীত) প্রায় নয়ভাগ আসে আবগারী শুল্ক হইতে—পরিমাণ ৮ হইতে ৯ লক্ষ টাকার মধ্যে। সমস্ত কংগ্রেস শাসিত প্রদেশেই Prohibition Acts পাশ হইয়া গিয়াছে ও প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টে উত্তরোত্তর বিস্তৃত ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করিতেছে। সর্ব্বপ্রথম, মাদ্রাজে ১৯৩৭ সালের ১লা অক্টোবর হইতে সালেম জেলায় মাদকবর্জ্জন সুরু হয় ও পরে কুদাপ্পা ও চিত্তুর জেলায় মাদকবর্জ্জন আইন কার্যকরী করা হয় এবং এই বৎসর উত্তর আর্কট জেলায় মাদক ব্যবহার বন্ধ করা হইবে। এই চারিটি জেলার পরিমাপ ২৩,৮১৯ বর্গ মাইল অর্থাৎ সমগ্র প্রদেশের এক-পঞ্চমাংশ এবং ফলে গভর্ণমেণ্টের আয় ⅚ কোটী টাকা হ্রাস পাইবে। বোম্বাই প্রদেশের আমেদাবাদ সহর, উত্তর ও দক্ষিণ দাসক্রয় তালুক, ব্রোচ ও পাঁচমহল বিভাগ ও আমেদনগর ও উত্তর কানাড়া জেলার কয়েকটি তালুকে মাদকবর্জ্জন আইন কার্যকরী করা হইতেছে ও সর্ব্বাপেক্ষা সাহসিকতার কার্য্য হইতেছে যে বোম্বাই সহর ও সহরতলীতে এই আইন সম্প্রতি প্রচলিত করা হইয়াছে। ইহাতে গভর্ণমেণ্টের প্রায়

১ কোটী ৮০ লক্ষ টাকা আয় হ্রাস পাইবে। মধ্যপ্রদেশে আকোলা ও ওয়ার্দ্ধা জেলা সমেত সমস্ত প্রদেশের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ স্থানে মাদকবর্জ্জন করা হইতেছে এবং ফলে ৮½ লক্ষ টাকা পরিমাণ আয় হ্রাস পাইবে। যুক্তপ্রদেশে গত বৎসরে এটোয়া ও মণিপুরী জেলায় ও এ বৎসরে বাদাউন ফরাক্কাবাদ, বিজনোর ও জৌনপুর জেলায় মাদকবর্জ্জন সুরু হইয়াছে ও গভর্ণমেণ্টের আবগারী শুল্কের আয় ১৫২ লক্ষ টাকা হইতে ১১৫ লক্ষ টাকায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই মাদকবর্জ্জন প্রচেষ্টার ফলে যুক্ত প্রদেশের মদ্য বিক্রয় হ্রাস পাইয়াছে শতকরা ৩০ ভাগ, চরস শতকরা ২৫ ভাগ, গাঁজা শতকরা ৪৩ ভাগ ও আফিং শতকরা ২৫ ভাগ। বিহারে ১৯৩৮ সালের ১লা এপ্রিল সারণ জেলায় মাদক ব্যবহার নিষেধ করা হয়—রাঁচি ও হাজারীবাগ জেলায় শীঘ্রই অনুরূপ করা হইবে ও ফলে আরও ১০ লক্ষ টাকা আয় হ্রাস হইবে। উড়িষ্যায় বালেশ্বর জেলায় অহিফেন সেবন সম্পর্কে মাদক বর্জ্জন আন্দোলন সুরু হয়, অন্যত্রও চেষ্টা হইতেছে—ফলে ৯½ লক্ষ টাকা আয় হ্রাস পাইয়াছে। সীমান্ত প্রদেশে ডেরাইসমাইল খাঁন জেলায় মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা হইতেছে ও আসামে সমগ্র প্রদেশে দুই বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে অহিফেন বর্জ্জনের পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইতেছে। এই আর্থিক ক্ষতি প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টগুলিকে পূরণ করিবার জন্য আপাততঃ নূতন কর ধার্য্যের আশ্রয় লইতে হইয়াছে, তন্মধ্যে পেট্রোল, বৈদ্যুতিক শক্তি, তামাক, আমোদপ্রমোদ, কয়েকটি পণ্য বিক্রয়, সহরস্থ স্থাবর সম্পত্তি, উর্দ্ধতন চাকুরী, শব্দবিন্যাস প্রতিযোগিতা প্রভৃতির উপর করধার্য্য করা হইতেছে। ইহার কয়েকটি কর মধ্যবিত্ত ও জনসাধারণের উপর চাপ দিবে সন্দেহ নাই কিন্তু এই পন্থা নিন্দা করিবার পূর্ব্বে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ, সকল করধার্য্যেই কেহ না কেহ আপত্তি করিয়া থাকে, দ্বিতীয়তঃ মাদকবর্জ্জন ও জাতিগঠনমূলক কার্য্য, তৃতীয়তঃ, প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হস্তে কর ধার্য্যের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ, চতুর্থতঃ, আবগারী শুল্কবাবদ আয়ের পরিমাণ খুব সামান্য নহে। মাদক বর্জ্জন সম্পূর্ণরূপে সফল হইলে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট তাহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য আয়করের (income-tax) অংশ দাবী করিয়া ভারত গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিতে পারে এবং এই দিকে মনোযোগ দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তাহা হইলে জনসাধারণের উপর করভার লাঘব হইতে পারে। উপরন্তু ইহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে অকংগ্রেসী শাসিত প্রদেশে মাদকবর্জ্জন করা হয় নাই ফলতঃ তাহাদের আয় হ্রাস পায় নাই অথচ এইরূপ প্রদেশগুলিতেও নূতন কর ধার্য্য করা হইতেছে।

এই আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে জোর করিয়া বলার সময় এখনও আসে নাই তবে কয়েকটি স্থানের ফলাফল নৈরাশ্যজনক নহে। মাদ্রাজ ও আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে সালেম ও মাদ্রাজের অন্যান্য স্থানের জনসাধারণ পূর্ব্বাপেক্ষা আয়ের অধিকতর অংশ খাদ্যদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যয় করিতেছে। মাদকবর্জ্জনের পূর্ব্বে সালেমের জনসাধারণ আয়ের শতকরা ৪০ ভাগ খাদ্যে, ২৯ ভাগ মাদক দ্রব্যে, ৫ ভাগ বস্ত্রাদিতে ও ৯ ভাগ আমোদ প্রমোদে ব্যয় করিত। বর্ত্তমানে তাহারা শতকরা ৬১ ভাগ খাদ্যে, ৪ ভাগ আমোদপ্রমোদে ও ৭

ভাগ বস্ত্রাদিতে ব্যয় করিতেছে। পালাপাত্তি নামক একটি গ্রামে ৪৮ জন ভূতপূর্ব্ব মদ্যপায়ী তাহাদের ঋণ পরিশোধ করিতে সমর্থ হইয়াছে। সালেমে বে-আইনী কার্য্যের সংখ্যা পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা হ্রাস পাইয়াছে। মাদকবর্জ্জন আইনের বিরুদ্ধতা খুব সামান্যই হইয়াছে বা বে-আইনী মাদক প্রস্তুতির সংখ্যাও অল্প। নারীগণ মাদকবর্জ্জনের বিশেষ সহায়তা করিতেছে। অনেকে মনে করেন যে মাদক নিরোধ সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে, অধিক সংখ্যক সরকারী কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইবে—বে-আইনী কার্য্য নিরোধের নিমিত্ত, সুতরাং ব্যয়বাহুল্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু বর্ত্তমানে কংগ্রেসের বিরাট প্রতিষ্ঠান পশ্চাতে থাকিলে ও কংগ্রেসের প্রতি জনসাধারণের সহানুভূতি সহায় হইলে মন্ত্রীমণ্ডলীকে কর্ম্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হইবে না। বোম্বাইতে Honorary Prohibition Guardsএর দৃষ্টান্ত আমরা ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছি। তবে অকংগ্রেসী শাসিত প্রদেশগুলিতেও মাদক ব্যবহার নিরোধের জন্য আন্দোলন করা কর্ত্তব্য নচেৎ এই সমস্যার জটিলতা বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব!
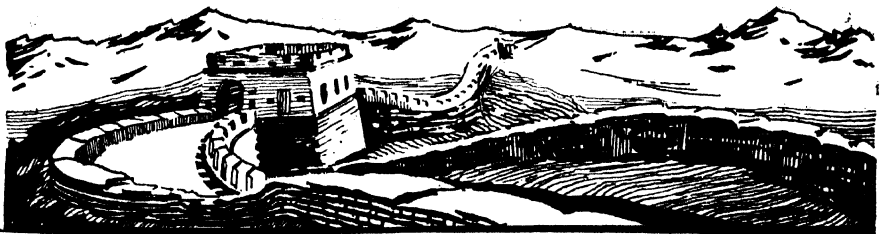
মন ও মান

বাণী মজুমদার

চারটে বাজে ; সারদা প্লেটগুলো ধুতে ব্যস্ত ; খুব দেরী হয়ে গিয়েছিল বলে সে খুব তাড়াতাড়ি কাজ সারছিল। তারতো চা খাবার সময় আবার ঠিক চারটে। পৃথিবী ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলেও এ সময় তার চা খাওয়া চাই। ইস্ প্লেটে তেলের হলুদ দাগ একটুও ওঠেনি। সান্‌লাইট সোপ দিয়ে ঘসে ঘসে ধুয়ে ফেল্‌লো। হাঁ, এইবার আরামের সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস সে ফেলবে। ফেলতে পারবে। না, দামীগহনার ওপর তার বিরক্তি ধরে গেছে। এমন শান্তস্নিগ্ধ মন্দিরের প্রদীপটীর মতো নম্র সারদা। এইতো কিছুদিন আগে তখন স্বামী মরেন নি।—সে ছিল পাকা গিন্নী একটা ছোট খাটো ভদ্র পরিবারের গৃহিণী। বিধবা হবার পরও কি তার সম্মান এতটুকু খর্ব্ব হয়েছিল ? টাকাকড়ির অভাবই না তাকে দাসীবৃত্তির স্তরে নাবিয়েছে। সারদা—দাসী !

অমন শান্ত, স্বভাবের জন্যে ওর একটা ভাল কাজ পাওয়া উচিত ছিল, যেমন কোন বড়লোকের বাড়ী ঝিয়ের কাজ বা কোন বিপত্নীকের সংসারের কর্ত্তৃত্ব পেলে ভাল হোতো, তাহলে সে নামের আগে শ্রী বা শ্রীমতী লিখতে পারতো। কিন্তু তা আর হোলো না। সে গিয়ে জুটলো মিস্ রায়—মিস্ হেমাঙ্গিনী রায়—সেই বুড়ী স্কুল ইনস্‌পেক্টেসের ওখানে। বুড়ী প্রথমেই জিজ্ঞাসা করলেন, নাম কি তোমার ?

"সারদা"

"ওঃ, সরি !" মিস্ রায় বল্লেন, "বেশ ভাল করে কাজ টাজ করো।"

সারদা রাগে জ্বলে যাচ্ছিল আর কি ; কিন্তু অদৃষ্টের কথা ভেবে চুপ করে গেলো।

প্লেটগুলো শুকিয়ে এসেছে। সারদা প্লেটগুলো মুছে চা তৈরী করলো। দৌড়দৌড়ি করে তার পা ধরে গিয়েছে ; খালি ঘোরা আর ঘোরা, যেন ঠিক মেলার কুকুর। সে ভগবানকে ধন্যবাদ দিল, বুড়ীটা বাইরে বেরিয়েছে। ছ'টোর আগে ফিরবে না নিশ্চয়ই—তবু একটু হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যাবে।

সে একটা ইঁন্দুরের গর্ত্ত নূতন আবিষ্কার করে সেইদিকে করুণভাবে তাকিয়ে রইলো ! নাঃ,—ইন্দুরের জ্বালায় আর পারা গেলো না। এক্ষুণি সমস্ত খাবার নোংরা করে দেবে। সারদার ভেতরে নির্লিপ্ততা ঘনিয়ে এলো। ময়লা করুক গে ; বুড়ী একটু ময়লা খাক্‌না ! ইঁদুর নিয়ে সে আর মাথা ঘামাতে পারবে না।

সারা দেহে তার ক্লান্তি এসেছে। আর সে পারে না। এর চেয়ে মরণ ভাল। হঠাৎ যদি সে খুব ছোট হয়ে যেতে পারতো তাহলে ইঁদুরের পেছন পেছন ইঁদুরের গর্ত্তের মধ্যে চলে

যেতো এবং চিরজীবন সেখানে থাক্‌তো। হেমাঙ্গিনীর দাসীপনার চেয়ে বরং ইঁদুরের সঙ্গিনী হওয়া শত শতগুণে ভালো।

—হেমাঙ্গিনী রায়—মিস রায়—ডাইনীবুড়ী—হাড়গিলের মতো চেহারা। আবার ফ্যাসান দেখো! এই বুড়ো বয়সে শাড়ীর কি বাহার! সারদাকে অমন নিত্য নূতন শাড়ী পড়লে ওর চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর দেখাতো।

কাজ করতে করতে সারদার শরীর অবশ হয়ে আসছিল। তবুও তাকে ৭টার আগে সমস্ত কাজ শেষ করতে হবে।

তারপর—তারপর সে তার বস্তিতে ফিরে যাবে, তার সেই নোংরা ঘরে কাটাতে হবে রাত—কি বিস্বাদ, কি তিক্ত তার জীবন! ঘরটুকুও তার নিজের নয়। সারদার বুক ঠেলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো! এখন তার মরবার ফুরসৎ নেই,—অবিশ্যি কাজকে সে ভয় করে না—কিন্তু ঘেন্না ধরে গেছে এই সব ইতরের কাজ করে করে। কিন্তু কাজের চেয়ে কাজের মর্য্যাদা তার কাছে বেশী। ঐ যাঃ—তাকে আবার বুড়ীর ফেরবার আগেই শোবার ঘর মুছ্‌তে হবে।

ঘর মুছ্‌তে গিয়ে নিজেকে আয়নার ভেতর দেখতে পেলো। চোখ যেন আর ফেরান যায় না। কী ভদ্র, সুন্দর চেহারা! শাড়ীর ঝলকানি, পাউডার আর সেন্টের ঝড় তুলে সে যে-কোনো সমাজে নিজেকে চালিয়ে নিতে পারে। শরীরটা কী চমৎকার, সাপের মতো লিক্ লিকে; মুখখানা আরও সুন্দর; হাঁ, ফ্যাসান দুরস্ত সমাজে চলা ওর পক্ষে কঠিন নয়। তবুও, সারদা যেন রাগে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল, আমায় কিনা 'সরি' বলে ডাকে ঐ বুড়ীটা।

হঠাৎ দরজায় ঘা পড়লো। সারদা তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখলো বেশ সুন্দর একটী যুবক সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। তার সারা দেহে আভিজাত্য প্রকাশ পাচ্ছিল। বুড়ীর তো বন্ধুর অভাব নেই!

ছেলেটি নমস্কার জানিয়ে বল্লে, "মিস্ রায়, বাড়ী আছেন?"

সারদা আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ফেললো। ছেলেটী তাকে ভদ্রঘরের বলে চিনতে পেরেছে। ভাগ্যিস, সে ঝাড়নটা ফেলে দিয়েছিলো! ক্ষণিকের একটা আনন্দের ঢেউ তাকে যেন পাগল করে তুললো।

সারদা এক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবলো। মনে মনে বল্লে—সে তার জীবনে এই প্রথম একটা দুঃসাহসের কাজ করবে।

সারদা একটু ঝুঁকে পড়ে খুব নম্রস্বরে বল্লে, "হাঁ, আছেন। কেন? তাঁর কাছে আপনার কি দরকার?"

এক ঝলক পড়ন্ত রোদ এসে ছেলেটীর চুলে পড়ে চক্‌চক্ করছে। মুখখানা ও বেশ লালচে দেখাচ্ছিল। ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি। ছেলেটী কিছুক্ষণের জন্য উত্তর দিল না। সে

সারদার চোখে নিজের প্রশংসার যে আলো দেখলো তাকে তাড়াতাড়ি যেনো কথা বলে নিবিয়ে দিতে চাইলো না। তারপর সে পকেট থেকে একটা ছোট্ট পার্শেল বার করলো।

"আমি সরকার বাদার্স থেকে এসেছি; আপনি আজ সকালে যে সেপটীপিনটা অর্ডার দিয়েছিলেন, এই নিন, এখানে একটা সই করে দিন।" এই বলে সে একটা পেন্সিল ও একটা রিসিট্ খুব ভদ্রতার সঙ্গে এগিয়ে দিলে।

সারদা পেন্সিলটা তুলে নিলো। পেন্সিলটা তার আঙ্গুলের ফাঁকে দু'বার কেঁপে উঠলো। ছেলেটী তখন প্রশংসার চোখে তাকিয়েছিলো তারই দিকে।

সে খুব পরিষ্কার ও সুন্দরভাবে সই করলো। মুক্তোর মতো অক্ষরগুলো! ছোটবেলায় সে যখন স্কুলে পড়তো তখন লেখার জন্য অনেক পুরস্কার পেয়েছে। "Miss H. Roy."

সে একবার কি ভেবে নিলো। তারপর সে ডিগ্রীটাও জুড়ে দিলো।

Miss. H. Roy, M. A. B. T.

"অনেক ধন্যবাদ", বলে আরেকবার তাকে নমস্কার করে ছেলেটী তার ধন্যবাদ দেবার আগে পথে নেমে পড়লো।

ফুলের মাদকতা নিয়ে রোদ যেন তার মাথার ওপর ঝরে পড়তে লাগলো। সারদা আস্তে আস্তে তার কাজ করতে চলে গেলো। আর সে ইঁদুরের সঙ্গে নিজের সঙ্গে কোনো তুলনা করবে না।

অন্ততঃ, পৃথিবীর একটী লোক তো জেনেছে যে, সে সরি নয়—সে সারদা—সে সম্ভ্রান্ত, সে ভদ্র; এই একটী লোকের মনের রঙে তার পৃথিবীকে সে তৈরী করবে। দাসত্ব আর দারিদ্র্য, বস্তীর অন্ধকারের জীবন তাকে ঘিরে থাকবে, কিন্তু স্পর্শ করতে আর পারবে না তাকে।

বিদেশী গল্পের ছায়া অবলম্বনে

পরিশেষ

উমা দেবী

হে কাল ! বেদনাহীন উদাসীন তুমি
অনন্ত তোমার স্থিতি, অগণিত ক্ষণ :
আমি পূবালিয়া মেঘ কোমল মন্থর
হয়তো ভাসিয়া যাবো মুহূর্তে কোথাও ! !
তাই আজি দান চাই নিমেষ কয়েক
মেঘমুক্ত পশ্চিমের দূর নীলাকাশ
পশিয়া সূর্যের কর হৃদয়ে আমার
বিচিত্র বর্ণের ছটা উদ্ভাসিয়া দিক ।

মোর প্রিয়তম যদি বিমুগ্ধ নয়নে
চেয়ে দেখে সে মুহূর্তে, অন্তহীন হবে
ভীরু প্রেমখানি মোর জীবনে তাহার
ব্যর্থতার হাত হ'তে আমি মুক্ত হবো ।
নিজেরে প্রিয়ের মাঝে রেখে দিয়ে যাবো—
—কে জানে কোথাও যদি ভেসে চলে যাই ! !
কাল প্রাতে গিয়েছিনু আঁধারের পারে
দেখিনু জীবন-স্রোত । স্বচ্ছ স্রোত ধার
মুকুরে দেখিছে মুখ নির্মল আকাশ—
দেখিছে আপন-রূপ অযুত তারকা
গ্রহ-উপগ্রহ-শ্রেণী । আমিও দেখিনু
দেখিনু স্বরূপ মোর আলো দিয়ে গড়া
সর্বগ্লানি-হানিকর স্বরূপ আমার
স্বচ্ছ-জীবনের স্রোতে, আঁধারের পারে ।

কতবার মেঘভার কালো কোরে গেছে
আমার হৃদয়াকাশ । পঙ্কিল প্রবাহ
কতবার ঢেলে গেছে বিষাক্ত বাষ্পেরে
ভাবিয়াছি স্রোত মোর রুদ্ধ হোলো বুঝি ।
কাল প্রাতে দেখিলাম, জীবন-প্রবাহে
হাসিছে নির্মলরূপ প্রভাত সূর্যের ।

চীন-জাপান সংঘর্ষের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

অমূল্য চক্রবর্ত্তী

৭ই জুলাই চীন জাপান সংঘর্ষের দ্বিতীয় বর্ষ পূর্ণ হইল। ইহার সুরু হইয়াছে মার্কোপলো পুলের নিকট সামান্য সংঘর্ষে এবং বর্ত্তমানে ইহা প্রাচ্যের দুইটি প্রধান শক্তির জীবন মরণ সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ সৈন্য ইহাতে নিযুক্ত রহিয়াছে, বড় বড় নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। অগণিত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে। এই যুদ্ধের স্থিতিকাল এবং অপব্যয়িতার দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে ইতিপূর্ব্বে প্রাচ্যে যত যুদ্ধ হইয়াছে তন্মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও ব্যাপক। এই যুদ্ধ যে কবে শেষ হইবে এবং এর পরিণতি যে কিভাবে হইবে তাহা বলা যায় না।

প্রথমে মনে হইয়াছিল জাপান কেবল উত্তর চীন দখল করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিবে। এখন তাহারা সমস্ত চীন-উপকূল দখলে আনিয়াছে এবং চীনের দূর অন্তর্দেশেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে; হাইনান্ এবং স্পাটলি দ্বীপ অধিকার করিয়া চীনসমুদ্রে তাহাদের অনেক সুবিধা করিয়াছে। সুরুতে তাহারা আংশিক চীন দখল করিতে চাহিয়াছিল। এখন দেখা যাইতেছে যে তাহারা পূর্ব্ব এশিয়ার সমস্তটাই গ্রাস করিতে চায়।

চীন পূর্ব্বেই অনুমান করিতে পারিয়াছিল যে জাপানের সঙ্গে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। চীয়াং এই জন্যই যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতেই একটা সুনির্দ্দিষ্ট পথ ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন।

১। চীয়াং-এর রণচাতুর্য্য।

সামরিক দৃষ্টিতে চীনের ঘটনাবলী তিন ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথমতঃ, রক্ষণোপায়—জাপানীদের আক্রমণ বিশেষ ধারা নেওয়া পর্য্যন্ত, দ্বিতীয়তঃ, গরিলা যুদ্ধ—নিজেদের প্রধান শক্তি সমূহকে পুনর্গঠিত করিতে যতদিন সময়ের প্রয়োজন ততদিন আক্রমণকারীদের প্রতিহত রাখিবার জন্য, তৃতীয়তঃ, প্রতি আক্রমণ। বর্ত্তমান যুদ্ধ দ্বিতীয় ধারা অনুসরণ করিয়া চলিতেছে।

১৯৩৪ সালে চীয়াং কয়েকটি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই সকল বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন কিভাবে চীন শত্রুকে বাধা দিবে। বক্তৃতাগুলি এতদিন অপ্রকাশিতভাবে ছিল। কারণ তখনও এই দুই জাতির মৌখিক সৌহার্দ্য ছিল। চীয়াং বলেন "জাপান মনে করে ইচ্ছা করিলে সে সমস্ত চীন দখল করিয়া ফেলিতে পারে।...আমাদের হাতে এখন কত সময় আছে তা' আমরা সহজেই বুঝিতে পারি, সময় খুব অল্প—মাত্র তিন, পাঁচ কি দশ বৎসর।" তিনি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন যুদ্ধ বাধিবার ঠিক তিন বৎসর পূর্ব্বে।

চীয়াং ভাবিয়াছিলেন কেবল একা তাহাকেই জাপানীদের বিরুদ্ধে লড়িতে হইবে না, অন্য শক্তিও আসিয়া জাপানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে। "আমেরিকাকে পশ্চাতে রাখিয়া সোভিয়েটকে

দক্ষিণে এবং ইংরাজকে বামে রাখিয়া জাপান চীন জয় করিতে পারিবে না। শক্তিমান শত্রুসমূহ তাহাকে দক্ষিণ সমুদ্রে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। এইরূপ আন্তর্জাতিক অবস্থাই জাপানের দুর্বলতার কারণ। এই অবস্থা দেখিয়া আমরা আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। আমাদেরও সাবধান হইতে হইবে এবং শত্রুকে বাধা দিবার মত প্রচুর শক্তি অর্জ্জন করিতে হইবে।"

চীয়াং জাপান আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য শক্তি অর্জ্জনের দিকে খুব চাপ দিয়াছিলেন। তিনি তখন বলিয়াছিলেন "আমাদের বিশেষ লক্ষ্য দিতে হইবে জনসাধারণকে সংগঠিত এবং শিক্ষিত করিবার দিকে—যাহাতে যুদ্ধের সময় দেশের সমস্ত অংশ হইতে সাহায্যের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। আমাদের অনেক অসুবিধা এবং বিপদ আছে। আমাদের শত্রু শক্তিমান। এই সকল বাধা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও শত্রুর সহিত যাহাতে ভালভাবে লড়িতে পারি তাহার উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। এখন আসল কথা হইতেছে যে আমাদের এইরূপ একাগ্রতা এবং শৌর্য্য আছে কিনা যাহাতে অবিরাম আমরা তাহাদের বাধা দিতে পারি।"

২। যুদ্ধের প্রথম পর্ব।

সুরুতে তিনটি প্রধান যুদ্ধ সংঘটিত হইতে দেখা যায়। চীনারা প্রত্যেকটাতেই পরাজিত হইয়াছে। এই সকল যুদ্ধে চীয়াং অসংখ্য সৈন্য পাঠাইয়াছেন। বিমান এবং যুদ্ধাস্ত্র যতদূর সম্ভব তিনি এই সকল যুদ্ধে ব্যবহার করিয়াছেন। যদিও তাঁহার সৈন্যেরা হারিয়াছে কিন্তু কখনও শত্রু দ্বারা বেষ্টিত হয় নাই অথবা কখনও সম্পূর্ণরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নাই। যুদ্ধের শেষ দিকে তাহারা সকল সময়েই সরিয়া পড়িয়াছে।

উত্তর চীনের যুদ্ধে চীয়াং খুব শক্তভাবে দাঁড়াইতে পারেন নাই। তিনি উত্তরেও সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু ভাল সৈন্যদলগুলিকে সাংহাইতে পাঠাইয়াছিলেন। সাংহাইতে জাপানের স্বার্থ আছে বেশী। তাড়াতাড়ি উত্তর চীনের কার্য্য সমাপন করিয়া তাহারাও সাংহাই রওনা হইল। এখানে যুদ্ধ চলিল তিন মাস। চীনা সৈন্য এখানে খুব বেশীভাবে পরাজিত হইল। চীনাদের মৃত্যুসংখ্যা জাপানীদের তুলনায় তিন গুণ অধিক ছিল। ইহার পর জাপান চীনের রাজধানী নান্‌কিং অবরোধ করে এবং বেশী কষ্ট না করিয়াই দখল করিয়া ফেলে। এই সময়ে কিছুদিনের জন্য যুদ্ধ শান্ত আকার ধারণ করিল। জাপানীরা ভাবিল যুদ্ধে তাহারা জিতিয়াছে এবং টোকিওতে পাঁচ দিন যাবৎ বিজয়োৎসব চলিল। কিন্তু চীনারা কোন রকম শান্তি স্থাপনের প্রার্থনা জানায় নাই এমন কি তাহারা এ সম্বন্ধে কোন আলোচনাও করে নাই। তাহারা নান্‌কিং হইতে রাজধানী হংকৌতে স্থানান্তরিত করিল। সুচাউতে তাহারা শক্তি বাড়াইতে লাগিল এবং জাপানীদের আক্রমণের অপেক্ষায় রহিল। পুনরায় এখানে যুদ্ধ বাধিল এবং তিন মাস স্থায়ী হইল। টেইয়ার চীয়াংএ জাপানীরা খুব সাংঘাতিকভাবে পরাজিত হইল। কিন্তু শেষ অবস্থায় চীনাদের তা'রা হারাইয়া দিল এবং চীয়াংকে সৈন্য সরাইয়া নিতে বাধ্য করিল। হিসাবে দেখিতে পাওয়া যায়

এই যুদ্ধে জাপানীদের প্রতিজনে চীনাদের দুইজন্য করিয়া সৈন্য নিহত হইয়াছিল। ইহার পরে যুদ্ধ বাধিল হংকৌতে। এখানেও পূর্ব্বের ন্যায় তিন মাস ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। গভর্ণমেণ্ট চাংকিংয়ে স্থানান্তরিত করা হইল। চীয়াং এখানে ভালভাবে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও হারিয়া গেলেন। কিন্তু কোনরকম সন্ধির প্রস্তাব মনেও স্থান দিলেন না। হংকৌ পতনের পরেই যুদ্ধের প্রথম পর্ব শেষ হইল। জাপান তখন চীনের অনেক জায়গা দখল করিয়া ফেলিয়াছে; ইচ্ছামত সেই সকল জায়গায় চলাফেরায় বাধা দিবার কেহই রহিল না। চীয়াং তাহার সৈন্যদের অপেক্ষাকৃত পার্ব্বত্য অঞ্চলে লইয়া যাইতে লাগিলেন। বহু সৈন্য একত্রে যুদ্ধ করিবার যে রীতি এতদিন চলিতেছিল তাহা ত্যাগ করিয়া কম সৈন্য লইয়া গরিলা যুদ্ধ চালাইবার ব্যবস্থা হইতে লাগিল।

৩। যুদ্ধের তৃতীয় পর্ব

জাপানীরা চীনের ভিতরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে সত্য কিন্তু তারা খুব বেশী রাজ্য অধিকার করিতে পারে নাই। তাহাদের অধিকারে যে সমস্ত যাতায়াতের পথ আছে তাহা ধরিয়া ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে। অন্তর্দেশসমূহ চীনাদের অধিকারেই আছে এবং সেই স্থানের শাসন স্থানীয় চীনারাই পরিচালনা করিতেছে। জানিতে পারা যায় যে উপকূল প্রদেশেরও লক্ষ লক্ষ লোক এখন পর্য্যন্ত একজনও জাপানী সৈন্য দেখে নাই। চীয়াংএর বর্ত্তমান লক্ষ্য এই সমস্ত লোককে সংগঠন করার দিকে। যাহাতে ইহারা জাপানীদের পদে পদে বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিতে পারে। কার্য্যতঃ এই উপায়ে বিপক্ষীয় সৈন্যদল ভাঙিয়া দেওয়া হইতেছে, ছোট ছোট দলগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইতেছে, রেল যাতায়াত বাধা দিতেছে এবং অধিকৃত স্থানসমূহে শান্তি স্থাপনে জাপানীরা খুব বেগ পাইতেছে। চীয়াং আশা করেন যে জাপানীদের এইভাবে আটক করিয়া রাখা যাইবে এবং জাপানীরা চীনে তাহাদের যত সৈন্য আছে তাহাদের ভরণপোষণে বাধ্য হইবে এবং শৃঙ্খলার সহিত কাজ করিতে পারিবে না। এই অবসরে চীয়াং নিজের সৈন্য খুব ভালভাবে তৈয়ারী করিয়া লইতেছেন যাহাতে প্রতিরোধ ফলপ্রসূ হয়।

৪। সরবরাহ সমস্যা (The problem of supply)

যুদ্ধ যত অগ্রসর হইতেছে, যুদ্ধলিপ্ত সৈন্যদের ভরণপোষণ চালাইতে চীয়াংএরও তদ্রূপ ক্রম বর্দ্ধমান অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে, খাদ্য সামগ্রী তাহাদের যথেষ্টই আছে। গত দুই বৎসর তাহারা জমি হইতে প্রচুর শস্য পাইয়াছে। চীন প্রধানতঃ কৃষি প্রধান দেশ বলিয়া রেল ও জল পথের প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও খাদ্য দ্রব্যের খুব অল্পতা দেখা দেয় নাই। আবার চীনের অন্তর্দেশ সহরগুলির উপর নির্ভরশীল না হওয়ার দরুণ তাহাদের অভাবেও অন্তর্দেশের খুব ক্ষতি হয় নাই প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ এবং স্থানান্তরিত করাই এখন চীনাদের সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে ছোটখাট অস্ত্রশস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত করিবার সুবিধা এখন চীনাদের নাই। যুদ্ধের প্রথম বৎসরে তাহারা বিদেশীদের নিকট হইতে ইচ্ছামত যুদ্ধাস্ত্র আমদানী করিতে পারিত। কিন্তু

একটি একটি করিয়া সবগুলি বন্দরই প্রায় জাপানীদের হাতে চলিয়া যাইতেছে। যুদ্ধের খুব অল্প জিনিষই এখন বিদেশ হইতে আসিতেছে। বন্দরগুলি অন্যের হাতে যাইবার পর হইতে চীয়াং দেশের ভিতর দিকে রাস্তা তৈয়ার করিতে লাগিলেন যাহাতে বিদেশী দ্রব্য স্থলপথে দেশের অভ্যন্তরে আনা যায়।

প্রধানতঃ তিনটি পথ দ্বারা চীন বহির্জগতের সহিত যুক্ত। প্রথমটি চীনের বর্ত্তমান রাজধানী চাংকিং হইতে আরম্ভ হইয়া রাশিয়ার টার্ক-শিব (Turk-sib) রেলওয়ের সহিত মিশিয়াছে। দ্বিতীয়টি চাংকিং হইতে ফরাসী বন্দর হাইফং পর্য্যন্ত বিস্তৃত। তৃতীয়টি চাংকিং হইতে কুনমিং পর্য্যন্ত এবং সে স্থান হইতে বার্মা প্রান্তস্থিত লাসিও (Lashis) পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই নূতন রাস্তাগুলি চীয়াংএর সমস্যা খুব বেশী মিটাইতে পারে নাই। প্রথম রাস্তাটির আশে পাশে কোথাও গ্যাস পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় রাস্তাটিতে গাড়ী খুব আস্তে চলে এবং দিন ভিন্ন অন্য সময়ে গাড়ী চলাচল বন্ধ থাকে। তদুপরি জাপান ফরাসীদের চাপ দিয়া এমনি করিয়াছে যে এখন তাহারা বেশী যুদ্ধোপকরণ পাঠাইতে নারাজ। তৃতীয় রাস্তাটিই অপেক্ষাকৃত নিরাপদ; কিন্তু এ রাস্তা বিশেষ কাজে আসে না। বর্ষার সময় এই রাস্তা টিকাইয়া রাখা কষ্টকর হইবে। যদিও এই রাস্তার পাশ দিয়া রেলপথ নির্ম্মাণ করা হইতেছে কিন্তু তাহা শেষ হইতে অনেক দিন লাগিবে। বিদেশী ট্রাক এই সমস্ত নূতন রাস্তায় ব্যবহার করা হইতেছে। পুরাতন যানবাহন পদ্ধতিও প্রসারলাভ করিয়াছে। টানা গাড়ী এবং কুলীর সাহায্যও নেওয়া হইতেছে। জলপথে যাতায়াতই খুব বাড়িয়া গিয়াছে।

চীনের শিল্প দ্রব্য প্রস্তুতের কল কারখানা খুব কম। তাই যেখানে সম্ভব হইতেছে চীয়াং শিল্পভবনগুলি নষ্ট করিয়া সেখানকার কলকব্জা দেশের দূর অভ্যন্তরে পাঠাইয়া দিতেছেন। এরোপ্লেন, মালগাড়ী, ট্যাঙ্ক ইত্যাদি চালন চীনে অসুবিধাজনক নয় তবে যার জোরে ইহারা চলিবে সেই গ্যাসেরই অভাব এবং গ্যাস বিদেশ হইতে আনিতে হয়।

৫। যুদ্ধের ব্যয়

চীন যদিও খুব গরীব দেশ তবু দেখা যায় যে যুদ্ধের ব্যয় তাহাদের স্বভাবগত মিতব্যয়িতার জন্য অনেক লঘু হইয়াছে। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্ব বছরে চীন গভর্ণমেণ্ট মোট ৩৩০,০০০,০০০ (আমেরিকান) ডলার ব্যয় করিয়াছে। চীনাদের জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব বিপদের দিনে তাহাদের সাহায্য করিয়াছে। ১৯৩৭ সনের চীন গভর্ণমেণ্টের আয় নিম্নে (আমেরিকান ডলারে) দেওয়া হইল:—

আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক	১০৫,৯৯০,০০০ ডলার
লবণ	৬৩,০৬০,০০০ ,,
অন্যান্য কর	৫৭,৫৬০,০০০ ,,
অন্যান্য পাওনা	২৯,৭২০,০০০ ,,
ধার	৭৩,৮৯০,০০০ ,,

জাতীয় গভর্ণমেণ্ট তার বিভিন্ন বিভাগের জন্য ১৯৯,২২০,০০০ ডলার ব্যয় করিয়াছেন। ইহার ভিতর সামরিক ব্যয় ১০৭,৩০৩,১০০ ডলার।

বন্দরগুলি জাপানীদের হাতে চলিয়া যাওয়ায় শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ আমদানী রপ্তানী শুল্ক হাতছাড়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের বেশীর ভাগ রাজস্বই আসিত সমুদ্রতীরের সহরগুলি হইতে। এগুলিও হাত ছাড়া হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে যে প্রদেশগুলির রাজস্ব নানকিংএ পৌঁছিত না চীনারা এখন ভিতরে প্রবেশ করার দরুণ সেই করগুলি জাতীয় গভর্ণমেণ্টে জমা হইবে।

অধিকন্তু গভর্ণমেণ্ট দুইটি প্রধান উপায়ে মুদ্রা বিনিময় (Currency) এবং যুদ্ধের ব্যয় ঠিক রাখিতে পারিতেছে। ১ম—রৌপ্যকে মান মুদ্রা করা। ২য়—কারেন্সি ঠিক রাখিতে ইংরাজের সাহায্য লাভ।

৬। বিজিতের সুযোগ সুবিধা নষ্ট করা

জাপান চীনে বিশেষ সামরিক জয় লাভে সমর্থ হইয়াছে। সমুদ্রতীরবর্তী যে কোন স্থানে বিনা বাধায় তাহারা চলাফেরা করিতে পারে। কিন্তু অধিকৃত স্থান সমূহে পুরোপুরি প্রাধান্য স্থাপনে এখনও সমর্থ হয় নাই। অসহযোগ আন্দোলন বেশ সংহত ও ব্যাপক ভাবে চালান হইতেছে। জাপানী মাল বয়কট আন্দোলনের বিশেষ অঙ্গ। জাপান ভাবিয়াছিল চীনদেশ তুলা উৎপন্নের ক্ষেত্র এবং কৃষকের সাহায্যে তাহা হইবে, কিন্তু জাতীয়তাবাদী চীনেরা কৃষকদের তুলার পরিবর্তে খাদ্য দ্রব্যের চাষ করিতে বলিতেছে।

স্থানীয় জাপানী সৈন্যদের সুযোগমত আক্রমণ করা, যাতায়তের রাস্তা কাটিয়া দেওয়া চীনাদের এক বড় কাজ। যে সকল স্থান বহুদিন জাপানী অধিকারে আছে তাহাও গরিলা যুদ্ধের সাহায্যে চীনের অধিকারে ফিরিয়া আসিতেছে।

অনেকস্থানে জাপানীগণ পুনরাক্রমণ করিয়াও প্রাধান্য বিস্তারে সমর্থ হয় নাই।

৭। চীন-চরিত্র

চীনারা অদৃষ্টবাদী জাতি। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য এবং আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ ইত্যাদি অসুবিধা তাহারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ভোগ করিয়া আসিতেছে। যুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করিতেছে চীনাদের প্রতিরোধ-শক্তির উপর। চীয়াং চেষ্টা করিতেছে যাহাতে জাতির বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। ইহাতে জাপানীদের পরাজয় করা সম্ভব হইবে এবং জাতিও পুনর্জীবন লাভ করিবে।

চীন জাতির একটি বৈশিষ্ট্য এই যে তাহারা মিটমাট করিতে খুব অভ্যস্থ। ব্যবসায়ীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারা পুনরায় শত্রুর সহিত ব্যবসা চালাইতে পারে। জাতীয়তাবাদী চীনারা বাস্তববাদী এই সকল ব্যবসায়ীদের ধারণা বদলাইতে পারিবে কিনা এখন বলা যায় না।

৮। বর্ত্তমান অবস্থা

গ্রেটওয়ালের দক্ষিণে জাপানীদের প্রায় ৯০০,০০০ লোক আছে। চীন সৈন্য সংখ্যায় প্রায় ২,০০০,০০০। যুদ্ধ কতদিন চলিবে এবং কে জিতিবে বলা অসম্ভব। চীনারা আভ্যন্তরীণ গোলমাল মিটাইয়া সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিলে জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে। চীনারা এভাবে চলিলে জাপানে নিজেদের ভিতর অবসাদ আসিবে। জাপানকে জয়লাভ করিতে চীনের উদ্বুদ্ধ দেশাত্মবোধকে বিনষ্ট করিতে হইবে, কিন্তু ইহারও সম্ভাবনা অতি সামান্য। যতদূর মনে হয় শেষ পর্য্যন্ত হয়ত একটা আপোষ মীমাংসা হইবে এবং সাময়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। কিন্তু ইহাতে ভবিষ্যতে সংঘর্ষের সম্ভাবনা দূরীভূত হইবে না। তবে যদি চীন ইত্যবসরে বিদেশীর সাহায্য পায় এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয় চীন-জাপান যুদ্ধও অন্যরূপ লইবে নিঃসন্দেহ। চীয়াং এই আশায়ই যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং এখনও তিনি সে আশা লইয়া কাজ করিতেছেন।

যুদ্ধারম্ভ হইতে ১৯৩৯ সালের মে মাস পর্য্যন্ত জাপানীদের হতাহতের সংখ্যা ৮৬৪,৫০০ বলিয়া চীনের রণসচিব জেনারেল হো হিং চিং প্রকাশ করিয়াছেন। গত এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যেই ১০৫,৭৩৭ জন জাপানী ছোট বড় ১৬৬৫টি যুদ্ধে নিহত হয়েছে। রণসচিবের বিবরণে আরো প্রকাশ যে জাপানের যুদ্ধ ক্ষমতা প্রায় শেষ হওয়ার পথে আসিয়াছে। কাজেই চীনের অভ্যন্তরে আক্রমণ চালান আর সম্ভব হইবে না।

নানচাঙ পরাজয়ের পর জাপান আর আপনার সমর শক্তি সংগঠন করার সময় পায় নাই। কারণ চীনাগণ ক্রমাগত আক্রমণ চালাইয়া জাপানী সৈন্যদলকে বিধ্বস্ত করিতেছে। গত এপ্রিল মাস হইতে বিভিন্ন যুদ্ধ কেন্দ্রে শত্রু সৈন্য আক্রমণ সুরু হয়। অধিকৃত প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে গরিলা ও স্থায়ী সৈন্যগণ রাস্তাঘাট, বাসস্থান নষ্ট করিয়া জাপানীদের বিব্রত করিতেছে। গত এপ্রিল মাস হইতে মে মাস পর্য্যন্ত একটি নির্বন্ধিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

	এপ্রিল সংখ্যা	মে সংখ্যা
১। যুদ্ধ	৮২৭	৮৩৮
২। নিহত শত্রু সৈন্য	৫৩,৮৪৬	৫১,৮৯১
৩। ধৃত শত্রু ও সাধারণ সৈন্য	১,০৬৮	৪৮৬
৪। নিহত অশ্ব	৭৭৪	৮৩৬
৫। ধৃত রাইফেল	২,০১৩	১,৫৮৭
৬। ,, মেশিনগান	৯৯	১৮৩
৭। ,, বড় কামান	২৫	১৩

৮।	ধৃত ও বিধ্বস্ত আরমার কার	১৭১	২৭২
৯।	গুলি গোলা	৬৮,৯৩৪	৬৭,৭৪৮
১০।	শত্রু পক্ষের বিনষ্ট গান বোট্	১১	১৩
১১।	,, ,, বিমান	১২	২৪
১২।	অধিকৃত প্রদেশের বড় রাস্তা	১০৪	১০৭
১৩।	,, ,, ,, রেল লাইন	৯০	৩৬
১৪।	পুনঃ অধিকৃত ছোট নগর	৩৭	,,
১৫।	,, ,, বৃহৎ ,,	৬৭	,,

চিয়াং কাইসেকের মতে চীন বহুদিন জাপানের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে। কারণ চীন কৃষি প্রধান দেশ, শিল্পজাত দ্রব্যের উপর নির্ভরশীল নয়। বিদেশ হইতে বেশী জিনিষ আমদানী করিতে হয় না বলিয়া চীন কখনই অভাবের দায়ে সন্ধি ভিক্ষা করিবে না। আজকাল অনেক বিষয়ে চীন আত্মনির্ভর। হংকঙ ও সাঙ্হাই শত্রু কবলে পতিত হওয়ার পর চীন বুঝিতে পারিয়াছে যে দৈনন্দিন জীবনে তার শিল্পদ্রব্যের কোন প্রয়োজন নাই। বিমান আক্রমণে বিশেষ ক্ষতি সাধিত হয় না কারণ দেশ কৃষি প্রধান, এজন্য জনবল ও অর্থ সম্পদ কোথাও কেন্দ্রীভূত নয়। পশ্চিম চীনের বিশাল অনাবিষ্কৃত প্রদেশ আছে। ঐগুলির অভ্যন্তরে রাস্তাঘাট প্রস্তুত হইতেছে এবং ইহার অনেক ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আছে।

জাপানের সাথে সন্ধি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই। চিয়াংএর মতে একজন জাপানী সৈন্য চীনে থাকা পর্য্যন্ত কোনরূপ সন্ধি হইতে পারে না। জাপানী সৈন্য বিতাড়িত করাই চীনের উদ্দেশ্য। কাজেই ইহা সাধন না করিয়া জাতীয় গভর্ণমেণ্ট কখনই সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপন করিবে না। চুংকিঙএ সাময়িক ভাবে রাজধানী স্থাপিত হইয়াছে। যদিও অনেক যায়গায় ইহা বিধ্বস্ত হইয়াছে তবু মোটামুটি অবস্থা একেবারে খারাপ নয়। চীনাগণ নিজ নিজ কাজ করিতেছে বিশেষ কোন আতঙ্ক দেখা যায় না। সহরের যেস্থানে গভর্ণমেণ্ট ও যুদ্ধ বিভাগের অফিস ছিল সে অংশ ধূলিসাৎ হইয়াছে সত্য কিন্তু বাকী অংশ জাপানী আক্রমণের পূর্বাবস্থায়ই আছে। চুংকিঙএ এখনও ২০০,০০০ চীনবাসী আছে। বিমান আক্রমণের ভয় ইহারা বড় একটা করে না। বিপদের সম্ভাবনা দেখিলে নিরাপদ স্থানে ঢুকিয়া পড়ে।

চুংকিঙএ খাদ্য দ্রব্য দিন দিন অত্যন্ত দুর্মূল্য হইতেছে। ইহাতে জনসাধারণের দুর্দ্দশা বাড়িলেও জাতীয় সংগ্রামের জন্য ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইবে না।

এ সংগ্রামে চীন বিজয়ী হইবে এরূপ আশা সকল চীনবাসীর মনে বদ্ধমূল হইয়াছে। সানইয়েটসনের আদর্শ সমস্ত জাতিকে এখনও উদ্বুদ্ধ রাখিয়াছে।

নূতন সমাজ

প্রমথরঞ্জন দত্ত

রামবাবু ক্লাইভ ষ্ট্রীট মহলের কেরাণী। এক সওদাগরী অফিসের বড়বাবু। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। সারাদিনের খাটুনী খাটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। কাতারে কাতারে অফিস ফেরত বাবুরা ছুটিয়াছে, কেউ ছাতা হাতে; কারও হাতে কাগজের বাণ্ডিল; কেউ বাড়ীর জন্য দুইটা ফুলকপি নিয়াছে। বড় সাহেবের গাড়ী হাঁকাইয়াছে, দলে দলে যে লোকস্রোত চলিয়াছে তারি মধ্যে গা ঘেঁসাঘেঁসি করিয়া রামবাবুও মিশিয়া চলিয়াছেন। গতি তাঁহার ক্লাবের দিকে। এই হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া বাড়ীর ওই চেঁচামেচি, লোকজনের ঘ্যানঘ্যানানী ভাল লাগে না, তাহা ক্লাবে গিয়া তাস খেলিয়া মাথাটা হাল্‌কা করিয়া নিতে হয়। হন্‌হন্‌ করিয়া যখন লালদিঘীর মোড়ে আসিয়া উপস্থিত তখন ধর্ম্মতলার অভিমুখী এক ট্রাম আসিয়া দাঁড়াইল। দৌড়িয়া এক দল লোক তখন তাহার দিকে ছুটিয়া চলিল। ট্রামের দরজার সামনে হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল! যাহারা নামিতেছে ও যাহারা উঠিতে চায় তাহাদের মধ্যে ঠেলাঠেলিতে যে দৃশ্য সৃষ্টি হইল তাহা বর্ণনাতীত। ট্রাম ছাড়িয়া দিয়াছে। বহু কষ্টে রামবাবু তখন ঢুকিয়া পড়িয়াছেন। ঢুকিতে কাহার ছাতার শিকে লাগিয়া তাঁহার আদ্ধির পকেটের কতকটা ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ট্রামের ভিতরে যাহার পাশে গিয়া বসিলেন সে জনৈক মাড়োয়ার নিবাসী। সিটের উপর এক পা তুলিয়া নির্ব্বিকারচিত্তে বাদাম ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া গলাধকরণ করিতেছে। বাদামের খোসাগুলা যে ট্রামের ভিতর পড়িয়া নোংরা করিয়া দিতেছে সেদিকে হুঁস নাই। রামবাবু পার্শ্বে বসিয়াছেন; ভদ্রতার খাতিরে যে পাখানা নামাইয়া বসিবে তাহার বড় খেয়াল নাই; বোধ হয় উহা যে ভদ্রতা সাপেক্ষ তাহা তাহার মগজেই আসিতেছে না। ট্রাম ছাড়িয়াছে; এমন সময় খং করিয়া তিনি গলা পরিষ্কার করিয়া যাহা নির্গমন করিলেন তাহা ফেলিতে গিয়া পড়িল এক বেচারা ঠেলা গাড়ীর কুলীর গায়ে; লোকটী যেমন চীৎকার ছাড়িয়া উঠিবে, তখন গাড়ী হন্‌হন্‌ করিয়া তীব্র বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। কুলীর বৈদিক ভাষা তাহার কাণে পৌছিল না। কারেন্সী অফিসের মোড় ফিরিয়া বাঁয়ে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল; ডানে লাট সাহেবের বাড়ী ফেলিয়া ট্রাম চলিল। ধর্ম্মতলা রাস্তার উপর দিয়া যখন চলিয়াছে তখন দেখিতে পাইল সিনেমার সম্মুখে ভীষণ ভীড়। নূতন ছবি আসিয়াছে। চাহিদা বড় বেশী। টিকেট ঘরের সামনে যে ভীড় হইয়াছে, কালী মন্দিরেও তত ভীড় হয় না। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে ক্লাবের সামনে গাড়ী থামিল। আর এক দফা ঠেলাঠেলি পর্ব্বের মধ্য দিয়া রামবাবু নামিয়া পড়িলেন। সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতেছেন। দোতালায় "অফিস ক্লাব"। সিঁড়ির বাঁকে বাঁকে থুকদানি। তথাপি দেয়ালের গায়ে গায়ে যে চিহ্ন আছে তাহাতে মনে হয় থুকদানিটা অনর্থক সাক্ষী গোপাল; যেন আধুনিক

শিক্ষিত ভদ্রলোকের শিক্ষাদীক্ষার উপহাস করিবার জন্য দাঁড়াইয়া। ক্লাবের ভিতরে কোথাও বৃদ্ধের দল পাশা পাতিয়াছে; কোথাও অন্যেরা তাসের আড্ডা খুলিয়াছে; কোথাও আবার ছেলে ছোকরারা পটাং পটং করিয়া পিংপং খেলিতেছে। তারি মধ্যে এক কোণে রসজ্ঞরা সঙ্গীত চর্চ্চায় নিমগ্ন। রামবাবু ঢুকিতেই কেউ বলিল 'গুড্ ইভিনিং' কেউ বলিল সনাতন পদ্ধতিতে—"এই যে, রামবাবু যে, নমস্কার, আসুন"; অধিকাংশই কিন্তু নিবিষ্টচিত্ত। রামবাবুও এক আড্ডায় গড় পাতিলেন। ঘর ধোঁয়ায় ভরপুর। রাত্রি এগারটায় রামবাবু বাসায় ফিরিলেন, ওটা এক গৃহিণীহীন গৃহ। আধুনিক ভাষায় মেস আখ্যায় খ্যাত, বোধ হয় চারিদিকেই শৃঙ্খলাহীন বলিয়া তাহার নাম 'মেস'। উপরে উঠিতেই সিঁড়ির পাশে ভাঙ্গা ডাকবাক্সটা একবার হাতড়াইয়া নিলেন। তাঁহার নামে দুখানা চিঠি ছিল। চিঠি দুইটা পকেটস্থ করিয়া উপরে উঠিয়া কাপড় চোপড় বদলাইয়া হাত পা ধুইয়া কানু ঠাকুরের সেই সনাতন রান্না গলাধকরণ করিয়া বিছানার উপর অর্দ্ধ উপবিষ্ট অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় চিঠি দুখানা পড়িলেন, গৃহিণী লিখিয়াছেন—'যাহারা সেইদিন তাঁহার মেয়ে দেখিতে আসিয়াছিলেন তাহারা চিঠি মারফতে জানাইয়াছে মেয়ে তাঁহাদের মোটেই পছন্দ হয় নাই। যদি নগদ দুই হাজার টাকা দেওয়া যায় এবং আরও এক হাজার টাকার গহনাপত্র মিলে তবে একবার বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন।' দ্বিতীয় চিঠিতে বাবাজীবন হোষ্টেল হইতে লিখিয়াছে তাহার বিবাহ বিষয়ে পিতা যে সদ্বংশজাতা পাত্রীর সন্ধান দিয়াছেন, তাহাকে বিবাহ করিতে সে মোটেই রাজী নহে; কারণ, কোন দিনও তাহার সঙ্গে এতটুকু পরিচয় নাই যে তাহার প্রতি সে আকৃষ্ট হইতে পারে। বরঞ্চ সে তাহার কলেজেরই এক ছাত্রীর প্রতি আকৃষ্ট, বাবাজীবন লিখিয়াছে—সে দেখিতে গৌরবর্ণা না হইলেও একেবারে বিশ্রী নহে; জাতিতে একটু সমান ঘরের না হইলেও শিক্ষাদীক্ষা ও চর্চ্চায় বিশেষ উচ্চাঙ্গের! সুতরাং তাহাকে বিবাহ না করিলে সে কোনমতেই সুখী হইতে পারিবে না। পিতার ত চক্ষু স্থির। মগজের ভিতর হুহু করিয়াই অনেক সমস্যা ছুটিয়া চলিল –যেন অফিস ফেরতা ট্রাম গাড়ী, মুক্তির আশায় চিঠি দুইটা বালিশের তলায় পুরিয়া রাখিয়া পাশ হইতে আনন্দবাজার পত্রিকাখানা তুলিয়া নিলেন। সকাল বেলা অফিসে যাওয়ার তাড়াতাড়িতে পড়া হয় নাই। সম্পাদকীয় পাতা খুলিতেই চোখে পড়িল "নারী নির্য্যাতন"। আনন্দবাজার তাহার নিজস্ব অননুকরণীয় জলদ গম্ভীর ভাষায় লিখিয়াছে চারিদিকে যেভাবে হিন্দু নারী হরণ চলিয়াছে তাহাতে হিন্দু যদি সজাগ না হয়, হিন্দু যদি আপন স্ত্রী কন্যাকে রক্ষা করিতে না পারে তবে কাল হিন্দুর স্থান কোথায়? পড়িয়াই রামবাবুর যেন মনে হইল তাহার ভারাক্রান্ত মগজে কে আরও ২০ মণ ওজনের মাল বোঝাই করিয়া দিয়াছে। দূর! করিয়া আনন্দবাজার পত্রিকাখানা দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। বালিশের উপর উপুড় হইয়া রামবাবু ট্রাম গাড়ী, বাড়ী ঘর, গাড়ী ঘোড়া জনতার মধ্য দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, রামবাবু ঘুমে অঘোর।

পাঠকের সাম্‌নে রামবাবু নামধেয় যে কাল্পনিক ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবন যাত্রার মাত্র ছয়

ঘণ্টার আলেখ্য উপস্থিত করিলাম, তাহা আমাদের আধুনিক সামাজিক জীবনযাত্রারই প্রতিবিম্ব। রামবাবুর সুখ দুঃখ বা সামাজিক সমস্যা আমাদের আজকালকার জাতীয় সমস্যা। আজ আমরা যে অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছি, একশো বছর আগে তাহা ছিল না। তখন দেশবাসীরা থাকিত গ্রামে, দুই গ্রামে মিলিয়া ছিল এক একখানা হাট বাজার; নদীর পাড়ে পাড়ে মাঝে মাঝে বন্দর; রাজপ্রাসাদের আশে পাশে ছোটখাটো নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল মাত্র, কিন্তু এখানকার মত জাঁক জমকশালী অভ্রভেদী অট্টালিকা সমন্বিত, বড় বড় মহানগরী গড়িয়া উঠে নাই এবং দেশবাসীও তাহার দিকে ধাইয়া আসে নাই। তখনকার দিনে ছিল গ্রাম্য সভ্যতা; এখনকার সভ্যতা সহুরে সভ্যতা। এই সহরে সভ্যতা রেল, ষ্টীমার, কলকারখানা সৃষ্টির প্রতিকূল। যখন রেল ষ্টীমার বা এরোপ্লেন ছিল না, আজকালকার মত এক মাসের পথ এক দিনে বা এক ঘণ্টায় যাওয়া যাইত না, তখন সমাজ বিশেষভাবে ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। আশে পাশের কয়েক যোজন পর্য্যন্ত ছিল তাহার দৃষ্টি শক্তি। আজ যান বাহনের ওলট পালটে রাজধানীর আশে পাশে, বন্দরের চারিদিকে কলকারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। শিল্প বাণিজ্য আজ দেশের শিরায় শিরায় ছড়াইয়া নাই; আজ তাহা কেন্দ্রীভূত। গ্রামবাসী আজ কাজের অন্বেষণে ছুটিয়া আসিয়াছে এই কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রকে কেন্দ্রীভূত করিয়া যে সামাজিক জীবন গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা আধুনিক সহুরে সভ্যতার দান। যে দেশে কলকারখানা ব্যাপকভাবে গড়িয়া ইঠিয়াছে সে সব দেশে সহুরে জীবন শতকরা নব্বই জনের এবং এই জীবন ষোল আনায়, যে দেশে নানা কারণে তাহার বৃদ্ধি অত্যধিক হয় নাই, সে দেশে সহুরে জীবন ও গ্রাম্য জীবনে এক খিচুড়ি পাকাইয়া গিয়াছে, যেমন আমাদের দেশে। আমরা আজ যে অবস্থায় আসিয়াছি তাহা কাহারও দোষে বা গুণে নয়; তাহা ঐতিহাসিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার ফল।

এই সহুরে জীবনে সামাজিক আবহাওয়া গ্রাম্য জীবনের সামাজিক আবহাওয়া হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গ্রামের মধ্যে দুই তিন মাইলের মধ্যে যাহারাই আসুক না কেন, একে ছিল অন্যের সহিত পরিচিত। হয়ত বা কাহারও পরিচয় পরস্পরের সহযোগিতায়; কাহারও বা তিন পুরুষের মোকদ্দমায় বা লাঠালাঠিতে। তথাপি পরিচয়ের অভাব নাই। সহরের মধ্যে দুই তিন হাতের তফাতে চির জীবন কাটাইয়া দিয়াও কেহ কাহাকে বড় একটা চেনে না। এক বাড়ীর একতলায় এক পরিবার, দোতালায় আর এক পরিবার—অথচ মুখ চেনাচেনি নাই। সহুরে জীবনের পরাকাষ্ঠা হোটেল জীবন। হোটেল জীবনের নমুনা দেখিয়া মনে পড়ে—ভোজনং যত্র তত্র (বা রেষ্টুরেণ্টে বা কাফেতে); শয়নং হট্ট মন্দিরে (বা হোটেলে)। হোটেলবাসীর পারস্পরিক সম্বন্ধ দেখিয়া মনে হয়—"এক বৃক্ষসমারূঢ়া নানা পক্ষবিহঙ্গমাঃ। প্রভাতে তু দিশো যান্তি কাকস্য পরিবেদনা।"

এই সহরে জীবন আমাদের সামাজিক চলাফেরা ও সামাজিক নীতির অনেক পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছে। এখন রেলে ষ্টীমারে আমরা জাতির বর্ণ নির্ব্বিশেষে পাশাপাশি বসিয়া চলাফেরা

করি। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীমণ্ডলীকে দেখিয়া কে বলিবে আমাদের সামাজিক জীবনে ভেদাভেদ আছে। এখানে ভট্টাচার্য্যি মহাশয়কে মেথরের পাশে বসিতে হয়; বিধবাকে বসিতে হয়—তাহার ভাষায় বলিতে গেলে—যত সব অজাত কুজাতের সঙ্গে। মেসের খাওয়া ঘরে গিয়ে দেখুন সেখানে রামবাবু শ্যামবাবু সব এক। আজ এই সহুরে সভ্যতার ফলে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের সকলেরই পাঠাধিকার; সকলেই পাশাপাশিভাবে বসিয়া লেখাপড়া করিতেছে।

এই সহুরে সভ্যতা কিন্তু আমাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িয়াছে। আমরা ইহার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাই আজ আমরা কাজে ও চিন্তায় সামঞ্জস্য রাখিতে পারিতেছি না। মুখে বলি এক, কাজে করি অন্য। সমাজে বিবাহ ব্যাপার দিতে এখনও জাতিবর্ণ মানি, নির্ব্বিভেদে খাওয়া দাওয়া করিনা; যদিও মেসে হোটেলে বা রেষ্টুরেণ্টে কোন প্রভেদ বা বাদবিচার মানি না। বাড়ীতে নমঃশূদ্র চাষা গেলে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখি বহুদূরে; রেলে ষ্টীমারে কিন্তু বসি তাহারই সাথে; তাহারই পাশে। আমাদের জীবনে আসিয়া পড়িয়াছে এই অসামঞ্জস্য। শুধু মাঝে মাঝে নিজের চোখে ধূলা দিয়া বলি "প্রবাসে নিয়মো নাস্তি"। হায়রে দেবভাষা, তোমার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিলেই হয়ে যায় শাস্ত্রীয় বিধান; বেদবাক্য!

এই সহুরে সভ্যতার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না বলিয়াই ইহা আমাদের দৈনন্দিন দুঃখমাত্রা বাড়াইয়া দিতেছে। নূতন সমাজের জীবন যাত্রার জন্য যে নূতন স্মৃতি দরকার তাহা আমরা এখনো হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। তাই ছোঁয়াচে রোগ নিয়া চলি সাধারণের যানবাহনে। দশ জনের সঙ্গে যেখানে বসিয়াছি বা দশ জনে যেখানে চলাফেরা করে, সেখানে দশের সুবিধার দিকে নজর রাখি না; পা তুলিয়া ট্রামে বসি; ট্রামে, বাসে বাদাম খাইয়া খোসা ছড়াই। রেলে ষ্টীমারে বা সিঁড়িতে সিঁড়িতে যেখানে নিত্য বসি, চলাফেরা করি, সেখানে ফেলি থুথু, পানের পিক। বুঝি না এ গ্রাম নয়, যেখানে অফুরন্ত ধরিত্রী, অপরিমেয় আলো বাতাস, জনবিরল আবাস। যতই কফ থুথু ফেলি না কেন, তাহাতে স্বাস্থ্য খারাপ হয় না। সেখানে স্বাস্থ্য খারাপ হয় অপরিষ্কার জলাশয়ে বা জঙ্গলে। এই সব কারণে নয়। এই নূতন সমাজের জন্য নূতন সামাজিক কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞান সজাগ হওয়া দরকার। যখন দেখি রাস্তায় লোকে জলের কল খুলিয়া চলিয়া গিয়াছে, আর অবিরল ধারায় জল পড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইতেছে; যখন দেখি লোকে দোতালা বা তেতালা ছাদের উপর হইতে জল বা নোংরা নিরীহ পথচারীর গায়ে ফেলিয়া দিতেছে; যখন দেখি থিয়েটারে, বাসে, ট্রামে, পোষ্ট অফিসে বা রেলে জনতা ধাক্কাধাক্কি করিতেছে—কে আগে গায়ের জোরে কাজ সারিয়া নিতে পারে, তখন মনে হয় আমরা এই নূতন সভ্যতার এখনও উপযুক্ত হয়নি। এই সভ্যতা আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া পড়িয়াছে মাত্র; আমরা ইহাকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করি নাই; আমরা নূতন সভ্য সমাজের উপযুক্ত নই। নগরবাসীর এই কর্ত্তব্য ও দায়িত্ব জ্ঞানকে ইংরেজীতে সিভিক সেন্স বলে; আমরা ইহাকে নগরবাসীর কর্ত্তব্য বলিতে পারি। আমাদের আজ এই নাগরিক কর্ত্তব্য সজাগ করিতে হইবে। নাগরিক সভ্যতা আমরা আজ

তাড়াইতে পারিব না। সে আশা করা বৃথা, তাই যদি হয় তবে কেন আমাদের সামাজিক জীবনকে নূতন ছাঁচে গড়িয়া তুলি না?

এই পারস্পরিক কর্ত্তব্য জ্ঞান ও দায়িত্ব জ্ঞান ততই বাড়িবে যতই আমরা পরস্পরকে আপন বলিয়া বুঝিতে পারিব। মানুষকে মানুষ বলিয়া সম্মান করিতে শিখিলে; সকলেই একই সমাজের ও একই জাতির অংশ মাত্র বুঝিতে পারিলে; সামাজিক ও জাতীয় সুখ ও শ্রীবৃদ্ধিতে স্বীয় সুখ ও কল্যাণ এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে; এবং আমি যাহা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য চাই তাহা তেমনি অন্যেরও প্রাপ্য এই কথাব সার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিলে, আমাদের এই নূতন সমাজে নূতন নাগরিক কর্ত্তব্যবোধ বিশেষভাবে সজাগ হইতে পারিবে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইহার বিরূপ। আমাদের এই নূতন জীবনে পরস্পরের মনের বাঁধন খসিয়া গিয়াছে। আগেই বলিতেছিলাম আমরা হইয়াছি সমাগত রাত্রিতে দিক বিদিক হইতে এক বৃক্ষে সমাবিষ্ট নানা বিহঙ্গকুল; কাহারও সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখি না এবং দরকার হইলে যে যার কাজে ছুটিয়া যাই। এই অভাব পূরণ করিবার প্রয়াস হইয়াছে ক্লাব স্থাপন করিয়া ও ক্লাবের মেলামেশার মধ্য দিয়া। নাগরিক সভ্যতা যেখানে যতই বেশী সেখানে ক্লাবের ততই প্রাধান্য। ক্লাব উচ্চাঙ্গের দর্শন আলোচনা করিবার স্থান নয়; ইহা খোস গল্প করিবার কেন্দ্র। এখানে আসিলে কর্ত্তৃপক্ষ গলবস্ত্র হইয়া করজোড়ে বলিবেনা—"আসুন! আসুন! আপনার উপস্থিতিতে বড়ই কৃতার্থ হইয়াছি, বড়ই বাধিত হইয়াছি।" ক্লাবে আসিলে সম্পাদক বা সভ্য সকলে সমস্বরে বলিবে—"কি হে, বড় যে মুখ দেখা যায় না; শ্বশুরবাড়ী নেমন্তন্ন ছিল বুঝি? দুই দিন ধরে ছিলে কোথায়?" এখানে তাস, পাশা, কেরম, দাবা—কিংবা আরও একটু সাহেবী হইলে পিং পং, বিলিয়ার্ড প্রভৃতির ধূম। ক্লাব হইল আমাদের সনাতন চণ্ডীমণ্ডপের আধুনিক সংস্করণ এখানে এক নিঃশ্বাসে উজীর নাজীর মরে; জীবন্ত মরিয়া যায় আবার মরা বাঁচিয়া উঠে; এখানে ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে গরু চুরির মোকর্দ্দমা পর্য্যন্ত সর্ব্ব বিষয়ের মীমাংসা হয়। এখানে চক্ষু বুজিয়া ক্রোড়াধিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখা যায়—চক্ষু মেলিয়া কালকের খোরাকের চিন্তা করিতে হয়। ক্লাবে সর্ব্বত্র সাম্য, বিষয়ের ভেদাভেদ নাই, সামাজিক ভেদাভেদ নাই, ধর্ম্মের ভেদাভেদ নাই; বয়সের ভেদাভেদ নাই, সব এক; সব খোস মেজাজী; ফুর্ত্তিতে মসগুল। ক্লাবের মধ্য দিয়া মানুষে মানুষে যে সৌহার্দ্দ স্থাপন করা যায় তাহা অন্য কোথাও সম্ভবে না।

নাগরিক সভ্যতার আগমনের পর হইতে আমাদের দেশেও ক্লাব স্থাপন হইতেছে। কিন্তু সব কি একই আদর্শে প্রণোদিত? সব কি মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধনকারী? তা নয়। অনেক সময় ক্লাবই হইল সামাজিক মনোমালিন্যের কেন্দ্র। ক্লাবে পিংপং এর টেবিল আসিবে, না বিলিয়ার্ডের টেবিল বসিবে, এই নিয়া ঝগড়া ও মনোমালিন্য হইয়া থাকে; সামাজিক বা রাজনৈতিক হাতাহাতি বা মারামারিতে পরিণত হয়। ক্লাবের দলাদলিতে মত্ত হইয়া অনেকে সমাজ বিগর্হিত কাজ করিয়া বসে। এখানেও প্রমাণ আমরা এখনও সামাজিক আচার ব্যবহারে

নূতন সমাজের উপযুক্ত হই নাই। ক্লাব স্থাপন করিয়াছি বটে; কিন্তু অনেকাংশে আমরা তাহার উপযুক্ত হই নাই। আমরা কেহ ভাবিয়া দেখি নাই তর্ক করিতে গিয়া ঝগড়া করি কেন? মতানৈক্যতে মনোমালিন্য আসিয়া পরে কেন? কারণ, আমরা পরমত অসহিষ্ণু। কারণ, আমরা স্বাধীন চিন্তার সম্মান করিতে জানিনা। যদি আজ নাগরিক সভ্যতার সঙ্গে, সামাজিক পার্থক্য উঠিয়া গিয়া মানুষে মানুষে সাম্য স্থাপিত হইয়া থাকে, সমাজে ছেলে বুড়ো, উচ্চ নীচ সব সমানাধিকার পাইয়া থাকে তবে তাহা শুধু ব্যহ্যিক না হইয়া অন্তরেও হইতে হইবে। যে স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তা আমার আছে বলিয়া আমি মনে করি, সে স্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তার অধিকার অন্যেরও আছে এই কথাও মানিয়া নিতে পারি। যদি তাই হয়, কেউ যদি তাহার স্বাধীন চিন্তায় আমার চিন্তাধারার পথে না চলে তবে কি ভাবে বলি তুমি বিপথে যাইতেছ; তুমি অন্যায় করিতেছ? বলিতে পারি তোমার সঙ্গে আমি একমত নই। সুতরাং এখানেই তর্কের শেষ হইয়া যায়। আমরা কিন্তু তা না করিয়া চোকা চোকা কথায় অন্যের ঘাড়ে এমন দোষারোপ করি বা তাহার চিন্তা, চরিত্র ও চলাফেরার উপর এমনি কটাক্ষ করি যাহাতে সে স্বভাবতই চঞ্চল ও উষ্ণ হইয়া উঠে। এমনি ভাবেই কলহ বাঁধিয়া যায়। কাহারও অসাক্ষাতে তাহার সমালোচনা করি বলিয়া, সাক্ষাতে তাহার উপর কটাক্ষ করি বলিয়াই মনোমালিন্য পাকাইয়া উঠে। সবার পশ্চাতে আছে আমাদের এক অখণ্ড সত্যে বিশ্বাস এবং সে অখণ্ড সত্য আমারই আয়ত্ব এই ধারণা; তাহারও পশ্চাতে আছে মানুষকে মানুষ হিসাবে সম্মান করিতে শিখি নাই বলিয়া। যদি তাই শিখিতাম তবে মতভেদে সামাজিক ভেদাভেদ বাড়াইয়া তুলিতাম না। তাই ক্লাব করি বটে; কিন্তু দুই দিন পরে তাহাতে ভাঙ্গাভাঙ্গির স্রোতে গা ঢালিয়া দিই; রাজনৈতিক দল করি বটে; কিন্তু কিছুদিন বাদে তাহাতে বাঁধাইয়া দিই দলাদলি। মনে মনে ভাবি ইহা স্বাধীন চিন্তা; কার্য্যতর কিন্তু তাহা স্বাধীনতার অসম্মান। স্বাধীনতার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, অন্যের স্বাধীনতায় তাহার উপর দোষারোপ করিতাম না। তাই বলিতেছিলাম—নূতন সমাজে নূতন তন্ত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে।

তারপর যখন আমরা ক্লাব হইতে বা কর্ম্মস্থল হইতে বাহিরে গিয়া দাঁড়াই তখন সামাজিক বিবিধ সমস্যা মাথার ভিতর হু হু করিয়া জাগিয়া উঠে। অনেকে হয়ত বা বহুদিনই বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছেন—শুধু সমাজের চাপে ও চিন্তায়। কেউ হয়ত নগরে বাসা স্থাপন করিয়া আছেন—বাড়ী নয়। তাহা সেই পাখীর 'বাসা'রই সামিল। বাসা মানে গৃহিণীহীন গৃহ। তিনি হয়ত সামান্য বেতনে সহরে কাজ করেন; সুতরাং এমন সাধ্য নাই যে গ্রাম হইতে গৃহিনী আনিয়া গৃহ পাতেন। আজ বাড়ী ছাড়িয়া আসিয়াছেন হয়ত দুই বছরেরও উপর। তিনি এই দুই বছর নীরস জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন। ঠাকুর চাকরের, আজ "আলু-কচু-থোড়", কাল "থোড়-কচু-আলু"র ঘণ্ট খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া আছেন। অন্য কেহ হয়ত বাড়ী পাতিয়াছে গৃহিণী নিয়া। কিন্তু বাড়ী নিয়া গৃহিনীর মুখে যে আলাপাদি শুনিলেন তাহা তাহার চিন্তাধারার সঙ্গে

মোটেই খাপ খায় না। স্ত্রীর চিন্তা স্বামীর রাজ্যের খবরই রাখেনা। শিক্ষা দীক্ষায় স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে এতই পার্থক্য। কোথায় আপন প্রিয়জনকে ভার দিয়া স্বামী স্বীয় চিন্তাভারের লাঘব করিবেন ; তাহা না হইয়া স্ত্রীর গৃহ সমস্যারও ভার কিছু স্বামীকে নিতে হয়।

এই নূতন সমস্যার উৎপত্তি নূতন সমাজের সৃষ্টিতে ; এই সমস্যার কারণ. আমরা এই নূতন সমাজের সহিত তাল সামলাইয়া চলিতে পারিতেছিনা বলিয়াই। অর্থনৈতিক বিপ্লবের পূর্ব্বে যখন সামাজিক জীবন গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তখন স্বামী স্ত্রীর সুখের ঘরকন্নার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য সাত সমুদ্র তের নদী ছিল না। দুই জনেই অঙ্গাঙ্গিভাবে কাজ করিয়া নিজেদের পরিশ্রমে, উদ্যমে, প্রীতি ও ভালবাসার সুখের নীড় বাঁধিয়া থাকিত। কিন্তু আজ সেই নীড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। স্বামী কর্ম্মান্বেষণে সহরে চলিয়া গিয়াছে; স্ত্রী গ্রামের এক কোণে পড়িয়া আছে। সে এখন স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনীও নয় সহধর্ম্মিণীও নয়; কারণ স্বামীর কর্ম্মের ও স্বামীর ধর্ম্মের সহযোগিতা প্রদান করিবার তাহাব সুযোগ নাই, এখন তাহার কাজের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে শুধু রান্না করা ও ছেলে পোষণ করা। দুইটাই সংসারের বড় কাজ সত্যি ; কিন্তু স্বামী স্ত্রী দুই পারিবারিক জীবনের এক প্রধান সুখ হইতে বঞ্চিত। যাহারা স্ত্রীকে নিয়া সহরে ঘর সংসারও করিতে যায়, অথচ তাহাকে শিক্ষায় ও চলাফেরার আধুনিক জীবনের উপযুক্ত করিয়া তোলে নাই সে পরে আরও মুস্কিলে। স্ত্রী সহুরের জীবনের সঙ্গে এতই অনঅভ্যস্ত থাকিয়া যায় যে, সে হয় বোঝার সামিল। হয়ত বা বোঝা হইতেও বেশী। কারণ, পথে ঘাটে মাল পত্র কাহারও বা পুলিশের হেফাজতে রাখা যায় ; কোন স্ত্রীলোককে তাহাও যায় না। মাল হারাণো গেলে অর্থ চায় ; স্ত্রী হারাণো গেলে সর্ব্বস্ব যায়। অন্যথা এমন দৃশ্যই দেখা যায় দুই বন্ধু পথে হঠাৎ মিলিত হইয়া খুব খোসমেজাজে কথা বলিতেছেন, আর একজনের সহগামিনী স্ত্রী পশ্চাতে একহাত ঘোমটা টানিয়া জড়সর হইয়া দাঁড়াইয়া, এমনি ভাবেই স্ত্রীলোক এই নূতন সমাজে পঙ্গু হইয়া আছে, সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে পারিবারিক জীবনের অর্দ্ধেক সুখ। যাহাকে আশৈশব স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি, শিক্ষা ও দীক্ষায় আধুনিক সমাজের উপযুক্ত করিয়া তোলা হয়নি, তাহাকে কি করিয়া এই নূতন সমাজে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে? দোষ স্ত্রীলোকের নয় ; দোষ সকলেরই।

আর ঐ যে মেয়ের বিবাহের কথা বলিলাম, তাহারও কারণ অনেকাংশে আমরা আধুনিক জীবনের উপযোগী হইয়া চলিতেছি না বলিয়াই। ইহা খুবই সত্যি যে যদি কেহ কাহারও মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহে, তবে সে তাহাকে না দেখিয়া শুনিয়া কি প্রকারে বিবাহ করিবে? যখন আমাদের সমাজ কয়েক গ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিত, গ্রাম্য জীবনের স্বাভাবিক মেলামেশার দরুণ কাহারও মেয়েকে অন্য কাহারও চোখ হইতে লুকাইয়া রাখা যাইত না। আর এখন কলিকাতায় বসিয়া ঢাকার এক ছেলে যদি মেদিনীপুরের এক মেয়েকে বিবাহ করিতে চাহে, তখন ছেলেকে বা অন্ততঃপক্ষে ছেলের বন্ধু বান্ধবকে, কাহাকেও না কাহাকে, মেয়েকে দেখিতেই হইবে। এই মেয়ে দেখা যে অতি প্রয়োজনীয় তাহা কাহারও অস্বীকার করিবার যো নাই। অথচ ইহার

পিছনে নিত্য নৈমিত্তিক কত যে হৃদয়হীনতা, মানুষের আত্মার প্রতি অবমাননা, মেয়ের জন্মদাতা ও গর্ভধারিণীর প্রতি অপমান স্তূপীকৃপ হইতেছে, তাহার ঠিক ঠিকানা কেউ রাখে না। অথবা রাখিয়াও চোখ বুজিয়া থাকে। কেউ যদি মেয়ে দেখিতে আসে ইহা কোন দিনই স্থির নিশ্চয় করিয়া আসে না যে, সে এই মেয়েকে গ্রহণ করিবেই। তাহা হইলে সে মেয়ে দেখিতে আসিত না। মেয়ে শুনিল তাহাকে দেখিতে আসিবে, ছেলেকে দেখিয়া পছন্দ করিবার অধিকার তাহার নাই, অথচ তাহাকে দেখিয়া পছন্দ করিবার অধিকার ছেলের আছে। এইত গেল এক নম্বর, দুই নম্বর —সে প্রদর্শনীর সামিল। আমাদের কাহাকেও যদি নিখিল ভারত প্রদর্শনীর মধ্যে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিয়া সকলের দর্শনীয় সামগ্রীর মত করিয়া রাখে, তাহাতে কি আমাদের আত্মা বিদ্রোহ ঘোষণা করিবে না? অথচ আমরাই আমাদের ঘরের মেয়েকে দিনের পর দিন লোক সমক্ষে দেখাইয়া ভিক্ষা করিতেছি—অর্থ নহে, এক কণা কৃপা। অপমানের এখনও শেষ হয় নি, মেয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বে, কিংবা আবদ্ধ ইচ্ছা ও আগ্রহে, মনে মনে ভাবী স্বামীর কল্পনাকে বরণ করিয়া সাজিয়া গুজিয়া হাজির হইল। পাঠক মনে মনে কল্পনা করিতে পারেন—সে সাজিবার সময় একবার গলার হার পরিয়া, একবার কপালে সিন্দুরের টিপ পরিয়া, একবার মুখে পাউডার মাখিয়া—নানা অঙ্গ ভঙ্গীতে আয়নার সামনে বারে বারে আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া নিজের সৌন্দর্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে। একটু ভীত, একটু আনন্দিত, একটু গর্ব্বিত হইয়াছে। তাহার সখীরা বলিয়াছে—"এবার তোকে বেশ মানাচ্ছে ভাই", তারপর তাহাকে দর্শকের সামনে হাজির করা হইল, তাহারা পরীক্ষা করিয়া বিদায় নিল, কয়দিন বাদে জানা গেল—মেয়ে পছন্দ হয় নি। ইহার চেয়ে মানুষ মানুষের আত্মার প্রতি অধিক কি অবমাননা করিতে পারে। সকলের চেহারা সমান হয় না। কেউ যদি অন্য কাহারও চেহারা দেখিয়া বলে তাহা আমার পছন্দ হয় না তবে কি তিনি শুনিয়া অপমানিত বোধ করিবেন না? ঐ উক্তির বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন না? অথচ এই প্রকার অবমাননা দিন দিন ঘরে ঘরে এক একটি মেয়ের উপর বর্ষিত হইতেছে, তাহার এই চেহারার জন্য কি সে দায়ী? এই জন্য কি জনকজননী অপমান বোধ করিবেন না? অথচ যেখানে বিবাহ দুই পক্ষেরই অন্ধ আত্মসমর্পন, অথবা চোখ মেলিয়া মেলামেশা পরিচয় ও আকর্ষণের মধ্য দিয়া না হয় সেখানে এই প্রকার প্রথা থাকিবেই। মেয়ে না দেখিয়া কেমন করিয়া অজ্ঞাত কুল-শীলার নির্ব্বাচন চলে?

তারপর আসে পণের কথা। এই পণপ্রথা প্রচলিত হইয়া সমাজে বিবাহকে পণ্যের সামিল করা হইয়াছে। অবসর সময়ে পণপ্রথায় দোষ সকলেই স্বীকার করেন; ও তজ্জন্য ছি ছি করেন। সুযোগ পাইলে অনেকেই লোকচক্ষুর অন্তরালে পণগ্রহণ করেন ও সেই খবর লোক জানাজানি হইলে ঘোষণা অন্যের ঘাড়ে চাপাইয়া লোকচক্ষে ধূলা দিবার বৃথা চেষ্টা করেন। আবার কিন্তু নিজের মেয়ের বিবাহের সময় পুনর্মূষিক হইয়া চিঁচিঁ রবে ডাক ছাড়েন। এই পণের নিমিত্ত সমাজে কতজনের কালো চুল সাদা হইয়াছে, যৌবনে জরা আসিয়াছে, পৈতৃক বাড়ীভিটা মহাজনের

হাতে উঠিয়াছে, তাহার খবর সকলেই রাখে। এই পণপ্রথার নিমিত্ত মেয়ের জীবনের উপর কত যে গ্লানি বর্ষিত হয়, তাহাও সকলে বোঝে। স্বামী-স্ত্রীর যৌবনের পবিত্র ভালবাসা যখন বহু আশা ও আকাঙ্ক্ষা নিয়া ফলপ্রসূ হইল, তখন দেখা গেল সে কন্যারূপিণী। পিতামাতা প্রীত হইলেন, কিন্তু ভীতও কম হইলেন না! নাম রাখা হইল "প্রীতিলতা"। তাহার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পিতামাতার অন্তরে ভীতিলতাও শাখাপ্রশাখা নিয়া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ওদিকে কন্যাজন্ম যখন সংখ্যায় একের পরে একে বাড়িতে লাগিল, তখন পিতামাতার মনের কথা প্রকাশ পাইল মেয়ের নামকরণে। তাঁহাদের তৃতীয় মেয়ের নামকরণ হইল—"আন্নাকালী"—"মাকালী", আর না, বহু হয়েছে। এই যে একটা আত্মার জন্ম হইতে মাতাপিতাও তাহার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিলেন, তাহাকে একই বৃন্তের একই সন্তান, ছেলে হইতে পৃথকভাবে গ্রহণ করিলেন—ইহার কারণ নয় কি বিবাহ সমস্যা—পণপ্রথা সমস্যা? অথচ এই পণপ্রথা বহু সমাজ সংস্কারকের চেষ্টা সত্ত্বেও কেন আজ আমাদের সমাজের কলঙ্কস্বরূপ দাঁড়াইয়া? কেন শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার লোপ পাওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ বৃদ্ধি পাইতেছে? কেন ছেলে যতই শিক্ষিত হয়, তাহার বিবাহে পণ কম হওয়া দূরে থাকুক, বেশীই হয়? বিবাহযোগ্য ছেলের চেয়ে বিবাহযোগ্যা মেয়ের সংখ্যাও যে বেশী তাহাও তো নহে। বাংলাদেশে সাধারণতঃ ছেলের বিবাহ হয়, ২০ হইতে ৩০ বৎসরের মধ্যে, ও মেয়ের বিবাহ হয় ১০ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে। ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনার মতে বাংলাদেশে ২০ হইতে ৩০ বছরের অবিবাহিত হিন্দু যুবকের সংখ্যা ৬,০১,৭৪৪; এবং ১০ হইতে ২০ বৎসর বয়স্কা অবিবাহিতা হিন্দুমেয়ের সংখ্যা ৫,৯১,৯২৯; অর্থাৎ প্রায় দশ হাজার কম।

পণ প্রথা ও বিবাহ সমস্যা কিন্তু আধুনিক সমাজের দান নয়; তাহা পুরাতন সমাজের জের। আধুনিক সমাজ যদি আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতে পারিতাম তবে হয়ত তাহা অনেকাংশে উঠিয়াই যাইত। ভগবানের কোন এক অপূর্ব্ব নিয়মে পুরুষ ও নারীর অন্তর পরস্পর মিলনের আকাঙ্খায় ঘুরিয়া বেড়ায়, এই আকাঙ্খা সামাজিক বিধি সম্ভূতও নহে, বা প্রয়োজন সম্ভূতও নহে। ইহা সনাতন নিয়ম। সামাজিক বিবাহ প্রথা পুরুষ ও নারীর মিলন সমাজ ও আইনের অন্তর্ভূত করে মাত্র। আমাদের সমাজে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যে প্রথা প্রচলিত আছে তাহার স্বরূপ আগে বিবাহ, তারপরে প্রেম ও ভালবাসার আকর্ষণ। সেই প্রেম ও ভালবাসা স্বাভাবিক হইতে পারে; কারণ, দুই একটা ব্যতিক্রম বাদ দিলে অধিকাংশ স্থলে যে কোন পুরুষ যে কোন নারীকে আপনার হিসাবে পাইলে পরস্পর ঠিক ভালবাসার আকর্ষণ অনুভব করে। সেই প্রেম ও ভালবাসা গভীরও হইতে পারে একই কারণে, কিন্তু ঐ বিবাহের আগে ভালবাসা বা আকর্ষণের কণাটুকুও নাই বলিয়া, ছেলে বা ছেলের অভিভাবকবর্গেরা বেশ নির্ব্বিকার চিত্তে মেয়ের রং বাছে, জাতি বাছে, এবং মেয়েকে গ্রহণ করিবার কৃপাটুকু দানের মূল্য চাহে পণ। সমাজে যখন মেয়ের আলাদা সত্তা নাই—বাল্য হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত কাহারও না কাহারও উপর নির্ভর করিয়া

থাকিতে হয়, তখন মাতাপিতাকেও যে কোন মূল্য দানে মেয়েকে বিবাহ দিতেই হইবে। আমরা পরিয়াছি এক ঘূর্ণাবর্ত্তের মাঝখানে—যদি মেয়েকে বিয়ে দিতে পণ দিতে হয় তবে ছেলের বিয়ে দিয়া পণ নিব না কেন। আর যদি ছেলের বিবাহ দিয়া পণ নিই, তবে অন্যে কেন মেয়ের বিবাহে পণ চাইবে না। সমস্যা-বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধিবে কে? আজ যে নূতন সমাজ আমাদের দ্বারে উপস্থিত তাহা অবাধ মেলামেশারই সমাজ। যদি ইহার সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়া মেয়ে ও ছেলের অবাধ মেলামেশা চলে, তবে ইহা নিশ্চিত যে ছেলে ও মেয়ে যতই কুরূপ বা কুরূপা হৌক না কেন, যৌবনের স্বাভাবিক ধর্ম্মে কুরূপ ছেলেও এমন কোন মেয়েকে পাইত যে তাহাকে ভালবাসে; এবং তদ্রূপ কুরূপা মেয়েও এমন কোনও ছেলেকে পাইত যে সেও তাহাকে ভালবাসে। যখন এই ভালবাসা গভীর হইয়া উঠিত, তখন যে শুধু মুখ দেখাদেখি প্রভৃতি পুঞ্জীভূত অপমানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত তাহা নহে, কোন সামাজিক নিয়ম, কোন অর্থের লোভ সেই পরস্পরের ভালবাসা ও বিবাহের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইতে পারিত না। তখন পণ প্রথার আয়ুষ্কাল ফুরাইয়া আসিত।

শুধু তাহাই নহে। আমাদের দেশ হইতে অসমান ও অসংলগ্ন বিবাহ লোপ পাইত। আমাদের দেশে পঞ্চাশ বছরের বুড়ার পক্ষে ষোল বছরের তরুণীকে বিবাহ করার সুযোগ হয় শুধু এই কারণেই যে মেয়েকে তাহার স্বামী পছন্দ করিবার অধিকার দেওয়া হয় না; অথবা তাহার প্রতি কোন যুবক আকৃষ্ট হইবার সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। তদ্রূপ আমাদের দেশে টাকার জোরে বা ছলনার জোরে আতুর, হাবা, বিকৃত মস্তিষ্ক প্রভৃতি ভদ্রঘরের ছেলের পক্ষে সুন্দরী যুবতী স্ত্রী লাভ সম্ভব হয়, শুধু এই কারণেই। যদি মেয়ের স্বাধীনতা থাকিত তবে সে কখনই এমন পুরুষকে স্বামীরূপে বাছিয়া নিত না। আর যদিও বা নেয় তাহা স্বাধীন চিত্তে ও সানন্দ হৃদয়ে—কাহারও কর্তৃক বাধ্য হইয়া নয়। আরও বলি, এই নিমিত্তই আমাদের দেশে এক স্ত্রী বর্ত্তমান থাকিতে পুরুষের অন্য স্ত্রীলাভ সম্ভব হয়। সকলেই জানে—সর্ব্বান্তঃকরণে যেখানে ভালবাসার অভাব হয়, সেখানে ব্যর্থপ্রেম স্বামী বা স্ত্রীর ঈর্ষা হওয়া খুবই স্বাভাবিক। যদি কোন নারী জানিতে পারে যে কোন পুরুষের এক স্ত্রী বর্ত্তমান আছে, সে কি তখন স্বাধীনচিত্তে সেই পুরুষকে আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে? কখনই নহে, তখন বহু বিবাহ প্রথা সম্ভব হইত না। তবে আজ বহু বিবাহ আমাদের সমাজে বড় সমস্যা নহে। আইনে না হইলেও অর্থ নৈতিক চাপে কার্য্যক্ষেত্রে তাহা একরকম উঠিয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশে বাল্য বিবাহ প্রথা এখনও পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে, তাহার কারণ আমরা এখনও মনে করি বিবাহের চিন্তা করিবার অধিকার ছেলে ও মেয়ের নাই। সেই চিন্তাতেই শুধু তাহার মাতা পিতা বা অভিভাবকবর্গের অধিকার। তজ্জন্য মাতা পিতা ছেলের ও মেয়ের স্বাধীন চিন্তা, স্বাধীন ভালবাসা প্রভৃতি জন্মিবার আগে নিজ নিজ ধারণা ও নীতির বশবর্তী হইয়া ছেলে মেয়ের বাল্য বয়সে বিবাহ দিবার কল্পনা করিতে পারে। ছেলে মেয়েকে ত জিজ্ঞাসা করা হয়

না যে তাহাদের বিবাহে পরস্পরের মত আছে কি না ; তাহা জিজ্ঞাসা করা যদি বিবাহ প্রথার অঙ্গ হইত, তবে কখনই ইহা সম্ভব হইত না যে বার বছরের ছেলে ও তিন বছরের মেয়েকে বিবাহ বেদীর উপর বসাইয়া রাখিয়া হাতে সন্দেশ দিয়া বিবাহ কর্ম্ম সম্পন্ন হইতেছে। কোথায় কন্যা সম্প্রদান হইবে—সেখানে প্রধান সম্প্রদান হইল 'সন্দেশ'।

আমাদের সমাজের স্তরে স্তরে আজ প্রভেদের ইয়ত্তা নাই। এই সূক্ষ্ম জাতিভেদ যাহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানে না তাহাদের ত অনুমোদিত নহেই ; এমন কি যাহারা বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মানে তাহা-দেরও শাস্ত্রসম্মত নহে। বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের চারি বর্ণ আজ সহস্র স্তরে পরিণত। এই স্তরভেদকে অভ্রের স্তরভেদের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। আজ শিক্ষা দীক্ষার প্রচারে, মেলামেশার প্রাবল্যে ও সর্ব্বোপরি অর্থনৈতিক চাপে—এক স্তর ও অন্য স্তরের পার্থক্য নাই বলিলেও চলে। এই সমাজে চাষী, মজুর, ধনী, মধ্যবিত্ত এই প্রকারের নূতন সমাজের নূতন শ্রেণী বিভাগ তৈয়ারী হইতেছে। চাষী মজুরের বৃত্তি এখনও জন্মগত রহিয়া গেলেও, মধ্যবিত্তদের মধ্যে বৃত্তিভেদ জন্মগত না হইয়া স্বেচ্ছাকৃত হইয়া উঠিতেছে। তাই আজ শিক্ষকও যেমন ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সব শ্রেণীরই আছে, তেমন ব্যবসায়ী ও চাকুরিয়াদের মধ্যেও ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ নির্বিভেদে আছে। অথচ শুধু বিবাহ বিষয়েই ওই স্তর ভেদ পুরাপুরি মানিয়া নিই। একটি দাস গোষ্ঠির ছেলেকে অন্য স্তরে সেন গোষ্ঠীর মেয়ের সহিত বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত। সত্য বটে চাষীর ঘরের মেয়ে শিক্ষকের ঘরে আসিলে তাহার স্বামীর চলাফেরা, আদব কায়দা ধরিয়া নিতে তাহাকে বেগ পাইতে হইবে। কিন্তু গঙ্গোপাধ্যায় ঘরের শিক্ষকের মেয়ে তেমনই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঘোষের ঘরে আসিলে কি যে গরমিল হইবে তাহা বোঝা বড় কষ্ট। যখন জন্মগত স্তর ভেদের মধ্যে, আচার ব্যবহার, শিক্ষাদীক্ষার কোন বিভেদ নাই, মেলামেশায়, খাওয়া দাওয়ায় কোন পার্থক্য নাই, তখন শুধু কেন বিবাহ বিষয়ে এক স্তর অন্য স্তরে যাইতে পারিবেনা ? তাহাতে কি আমরা নিজেরাই নিজেদের ছেলেমেয়েদের বরকন্যা নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রের মধ্যে সীমারেখা টানিয়া দিই না ? একেত শিক্ষা, চর্চ্চা, সৌন্দর্য্য ও উপার্জ্জন ক্ষমতা প্রভৃতি বাছিয়া অভিভাবকবর্গের সর্ব্বগুণ সমন্বিত পাত্রপাত্রী বাছিয়া নিতে বেগ পাইতে হয় ; তার উপর জাতিস্তর বিচার করিয়া কেন সেই সমস্যাকে শতগুণ বাড়াইয়া দেওয়া হয় ? এইজন্যই নয় কি অনেক সময় শুধু জাতি বাঁচাইতে গিয়া ২৬ বছরের কন্যাকে বৃদ্ধের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয় ! সহুরে জীবনের সঙ্গে এই বিচার কিছু কিছু করিয়া উঠিয়া যাইতেছে, যদি ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা থাকিত এবং তাহার মধ্য দিয়া প্রেম ও ভাল-বাসার সূত্রে স্বাধীন চিত্তে যুবক যুবতীর বিবাহ সম্পন্ন হইত, তবে সামাজিক এই স্তর ভেদ অনেকাংশে উঠিয়া যাইত। ঐ যে বাবাজীবন পুত্রধন লিখিয়াছে—সে যাহাকে বিবাহ করিতে চায় সে বিশেষ গৌরবর্ণা না হইলেও বিশ্রী নহে, সমান ঘরের না হইলেও শিক্ষা প্রভৃতিতে বেশ উচ্চাঙ্গের—তাহাই স্বাভাবিক হইত। তখন ছেলেমেয়ের রং বিশ্লেষণ নিয়া, জাতির স্তর বিভাগ নিয়া সমাজ ও পরিবারের মধ্যে এত জটিলতা আসিয়া জুটিত না। উচ্চাঙ্গের শিক্ষা ও চর্চ্চাকে

পদদলিত করিয়া, চামড়ার রংকে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মুখে ফেলিয়া বিশ্লেষণ করিয়া মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি যে অবজ্ঞা করা সম্ভব হইতেছে তাহা শুধু এই কারণেই।

আমাদের দেশে নারীর স্বাধীন চলাফেরা ও মেলামেশা এখনও নাই বলিয়াই দেশে স্ত্রীশিক্ষা মোটেই বাড়িতেছে না। এই স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষে পুনরায় ওকালতি না করিলেও চলিবে। অথচ পাঠকবর্গের অনেকেই বাহিরে দেশ বিদেশের দশ কথা আলোচনার পর যখন বাড়ী ফিরেন, তখন হয়ত স্ত্রী আসিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি বাজার থেকে কি রকম ডাল এনেছ, মোটেই সিদ্ধ হচ্ছে না। তোমাকে সবাই ঠকায়, বুদ্ধিটা বোধ হয় একটু মোটা।" এইত অনেক শিক্ষিত পুরুষের স্ত্রীর সহিত নিত্য নৈমিত্তিক আলাপ আলোচনার সীমা। স্ত্রীর ভাব ও চিন্তার বিষয়বস্তু রান্নাঘর হইতে বাহির বাড়ীর উঠানের সীমার মধ্যে আবদ্ধ, তাই অধ্যাপকেরা বাহিরে বহু ছেলে পড়াইয়া কৃতকার্য্যতার প্রশংসা পাইলেও, বাড়ীতে স্ত্রীর কাছে ফেল হইয়া যান; তাই বহু বিচারক বাহিরে বিচারে পারদর্শী হইলেও নিজের ঘরে তিনি ঠাঁই পান না। আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক সুখ সুবিধার মধ্যে ডালগুলা যে সিদ্ধ হওয়া নিতান্ত দরকার তাহা খুবই স্বীকার্য্য, কিন্তু তাহাই, বা ঐ রকম বিষয়ই, যদি স্বামী স্ত্রীর আলোচনার নিত্যকারের বিষয় হয় তাহা হইলে স্বামী স্ত্রীর চিন্তা ও ভাবের সামঞ্জস্য কোথায়? অথচ ইহার জন্য কি স্ত্রী দোষী? তাহাকেও শিক্ষা দিয়া তাহার চিন্তার প্রসারতা লাভ করিবার সুযোগ দেওয়া হয় নাই। এই স্ত্রীশিক্ষা দেওয়া অনেকে প্রয়োজনীয় বোধ করিলেও নানা কারণে তাহা হইয়া উঠিতেছে না। তন্মধ্যে একটি কারণ মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান করিতে হয়। অর্থাভাবে বাংলাদেশে পাঠশালা ও স্কুল প্রভৃতির বড় অভাব। অনেক স্থলে ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয় না। তদুপরি মেয়েকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আলাদা স্কুল কর, মেয়ে শিক্ষয়িত্রী রাখ; গাড়ী রাখ, ইত্যাদি। অথচ ছেলেমেয়েরা যদি একসঙ্গে পড়িত তবে মেয়েদের শিক্ষা খুবই সহজ হইত। এই ছেলেমেয়েদের আলাদা শিক্ষা দেওয়ার দৌড় আজ এতদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে যে, আগে যেখানে প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলিতে ছোট ছোট শিশুগুলিকে একত্র শিক্ষা দেওয়া হইত, সেখানেও আজ পর্দ্দা পড়িয়াছে। মেয়েদের জন্য আলাদা স্কুল করিতে হয়। এখনকার কলেজগুলিতে যদি যুবক যুবতীরা এক সঙ্গে পড়িতে পারে, তবে পাঠশালাগুলিতে কোমলমতি বালক বালিকারা কেন পারিবে না ইহা বুঝা বড়ই শক্ত।

সকলেই জানে, আমাদের বাঙ্গলা দেশে নারী ধর্ষণ, নারী হরণ প্রভৃতি কিভাবে বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা আমাদের নারীদিগকে বিশেষভাবে অবরোধ করিয়া রাখিয়াও এই লজ্জা ও কলঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছি না, যাহাকে এত করিয়া আগলাইয়া রাখিলাম তাহাকে নিয়া গেল বাহির করিয়া—ইহার চেয়ে প্রহসনের বিষয়, আমাদের কাপুরুষতার বিষয়, আর কি হইতে পারে? স্থানে স্থানে নারীরক্ষা সমিতির উদয় হইতেছে। তাহাদের প্রধান কার্য্য অর্থ দিয়া; মোকর্দ্দমা খাড়া করিয়া দুর্ব্বৃত্তদের দণ্ডবিধান করা। আর এমনিই যে প্রহসন—এক মোকদ্দমা

নিয়া হৈ চৈ চলিতেছে, অন্য দিকে আর পাঁচটা নারী হরণ চলিতেছে। অথচ যদি নারীকে বদ্ধ না রাখিয়া স্বাধীন করিয়া দেওয়া যাইত তবে এই নারী হরণ অনেকাংশে উঠিয়া যাইত। নারী সাহসী হইয়া উঠিত। অপ্রতিভ নারীকেই হরণ করিতে পারা যায়। তেজোদীপ্ত নারীর গায়ে হাত দিবার সাহস কেউ করে না। আত্মরক্ষার্থে নারীকে পুরুষের সমান বলীয়সী হইবার দরকার হইত না। নারী যে শুধু নিজের সম্মান নিজেই রক্ষা করিতে পারিত তাহা নহে, তাহাকে হরণ করিবার প্রয়োজনই হইত না। অতৃপ্তকাম ব্যভিচারী পুরুষের কোন দেশেই অভাব নাই; কোন যুগে তাহাদের অভাব হয় নাই। তদ্রূপ অতৃপ্তকামা ব্যভিচারিণী নারীরও অভাব নাই। তাহাদের উচ্ছেদ কোন যুগেই হইবে না। অথচ যদি স্ত্রীপুরুষ স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিত, এই দুই পক্ষের মিলন অনায়াসে সম্পন্ন হইত। ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীকে নিয়া আপন মনে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতে পারিত ও পরিণামে তাহাদের পাপের জন্যই তাহারা শাস্তিভোগ করিত। অন্যদিকে সমাজের নিরীহ নারীরা রক্ষা পাইত। পুরুষের পাপের জন্য নারীকে দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না। যে জিনিষ আবরণের মধ্যে লুকাইয়া রাখা হয়, তাহা উন্মোচন করিয়া দেখিবার ইচ্ছা মানুষের প্রকৃতিগত, যেমন গুপ্ত রহস্য উদ্ধার করিবার আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক, তাই আজ পথেঘাটে শত সহস্র পুরুষের মধ্যে একটি নারী আবির্ভূতা হইলে লোকে তাহাকে আড়চোখে বা বিস্ফারিত নেত্রে তাকায়—কেউ কেউ হাঁ করিয়া যেন গিলিয়া ফেলে। আর যেখানে পথে ঘাটে আশে পাশে শত সহস্র নারীর চলাচল, সেখানে কাহারও প্রতি কাহারও দৃষ্টি করিবার অবসর নাই; দরকারও হয় না।

বাঙ্গালা দেশে চারিদিকে নারী ধর্ষণ, নারী হরণ বৃদ্ধি পাইতেছে। কোথাও জরা জর্জ্জরিত বৃদ্ধ যুবতী ভার্য্যার পাণি গ্রহণ করিতেছে: সুন্দরী ষোড়শী কন্যাকে রুগ্ন ও বিকলাঙ্গের হাতে অর্পণ করা হইতেছে; বিধবা কন্যা যৌবনের জ্বালায় ও অবলম্বন হীনতার লাঞ্ছনায় দিনরাত চোখের জল ফেলিতেছে। ইহার সঞ্চিত পাপ ও কলঙ্ক হইতে মুক্তি পাইতে হইলে নারীকে মুক্ত করিয়া দিতে হইবে। তাহাকেও এই নূতন সমাজের উপযুক্ত করিয়া নিতে হইবে। আমরা বহু বৎসর ধরিয়া নারীকে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু পারি নাই। পারি নাই বলিয়াই তাহাকে যেখানে সেখানে অপাত্রে ফেলিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছি। আজ সেই অসামর্থ্যের কলঙ্কের বোঝা নিয়া সরিয়া পড়া ভিন্ন উপায় নাই। নূতন সমাজে তখন নারীরা নিজেরাই নিজেকে রক্ষা করিবে।

পাঠকবর্গের সামনে এই নূতন সমাজের এক দিক উন্মোচন করিয়া দেখাইলাম, ইহার অন্য দিকও আছে। আজ এখানেই শেষ করা যাক্।

গান্ধীবাদের একদিক

অমিত সেন

গান্ধীবাদ এবং গান্ধীর নেতৃত্ব সম্বন্ধে আলোচনা এত বেশী হয়েচে যে তা বিশেষ করে বলবার আর বড় একটা কিছু অবশিষ্ট নেই। তবু আমার মনে হয় যে এই জিনিষটার মধ্যে এখনো অনেক ভাববার আছে যা আলোচনা করতে গেলে ঐতিহাসিক দৃষ্টি ভঙ্গির একান্ত প্রয়োজন।

আপাতঃ দৃষ্টিতে গান্ধীজীর রাজনৈতিক জীবন যে ভাবে দেখা যায় তাই প্রথম আলোচনা করা উচিত। যদিও তীক্ষ্ণতর পর্য্যালোচনায় এ ধারণার পরিবর্ত্তন হতে বাধ্য। প্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকার থেকেই ধরা যাক। আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে সেখানে গান্ধীজী গিয়েছিলেন কতকগুলো ভারতীয় ব্যবসায়ীর পক্ষ অবলম্বন করে। সেখানে শ্বেতাঙ্গদের বর্ণ বিদ্বেষ সর্ব্বপ্রথম তাঁর মনে বিপ্লবাত্মক প্রেরণা দেয়। এর মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে এই যে তাঁর মনে বিপ্লবের অভিলাষ জেগেছিল ভারতীয় কুলী মজুরদের জন্য নয়; আর্থিক হীনতার জন্য তাদের প্রতি খারাপ ব্যবহারটা তত বিসদৃশ বলে গান্ধীজীর কাছে বোধ হয় নি। গান্ধীজী আন্দোলন করবার প্রেরণা পান তাদের জন্য যারা আর্থিক দিক দিয়ে শ্বেতাঙ্গদের সমকক্ষতা দাবী করতে পারে; অথচ বর্ণগত অসাম্যের জন্য তা তারা পায় না; যাদের ট্রেণে ফার্ষ্ট ক্লাশ টিকিট কিন্‌বার সঙ্গতি আছে, অথচ বর্ণ বিদ্বেষের জন্য ফার্ষ্ট ক্লাশ কামরায় উঠবার অধিকার তারা পায় না। কাজেই সমাজের অর্থগত বৈষম্যের চেয়ে বর্ণগত বৈষম্যের বিরুদ্ধেই মহাত্মাজী প্রথম বিদ্রোহ করেন।

এই জন্য ভারতীয় কংগ্রেসেও গান্ধীজী কখনও বণিক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারেন নি। এই মানসিক আবহাওয়ায় তিনি ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের পৌরহিত্যের ভার নিলেন। তার পিছনে রইল বিরাট ভারতীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়। তাদের প্রচুর সাহায্যে এবং প্রচারের ফলে প্রাক্-সমর যুগের ক্ষীণ-কলেবর কংগ্রেস সমরোত্তর কালে তার চতুর্গুণ কলেবর প্রাপ্ত হল। গান্ধীজী যে ১৯২০ তে অসহযোগ ও বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলন স্থুরু করলেন এর পিছনেও তাদের প্ররোচনা নিতান্ত কম ছিল না। এই আন্দোলনের ফল হল আশাতীত; বোম্বের অগণিত মিলগুলো ধীরে ধীরে স্ফীত হয়ে উঠলো। আর বণিকেরা কংগ্রেসকে এমন স্বার্থ-সিদ্ধির অনুকুল দেখে ক্রমেই তার উপর আরও বেশী করে নির্ভর করতে লাগ্‌লেন। কংগ্রেস যে এই অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের প্রতিনিধিত্বমূলক জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল তার পিছনে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের সামান্য চাঁদা এবং জনবলই যথেষ্ঠ ছিল না, তার পিছনে ছিল এই বণিকদের অগণিত অর্থ সাহায্য। গান্ধীজী হয়ে দাড়ালেন তাদেরই প্রতিনিধি, তাদের সমর্থক, তাদের স্বার্থের প্রধান ধারক। ১৯৩০ সালে গান্ধীজী হঠাৎ অনেকটা অপ্রস্তুত দেশকে নিয়ে আইন অমান্য

আন্দোলন স্থুরু করে দিলেন। বণিক সম্প্রদায় এই সময় তাদের পথের কাঁটা দূর কোরতে ব্যস্ত হোয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলন কি করে ব্যর্থ হল তার ইতিহাসটা অপ্রাসঙ্গিক। কিন্তু নানা ভাবে এই ব্যর্থতার ফল হল মর্ম্মান্তিক। একদিক দিয়ে পৃথিবীব্যাপী আর্থিক ভাটার ঢেউ ও অন্যদিকে দিয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিষ্পেষণ দেশবাসীর মন বিপর্য্যস্ত করে গেল। এই পরিস্থিতির মধ্যে গান্ধীজী রাজনৈতিক আন্দোলন একেবারে ছেড়ে দিলেন; ফিরে গেলেন গ্রামে; হরিজন আন্দোলন আর পল্লী উন্নয়ন হল তার আদর্শ। অধিকন্তু তাঁর এই অপসরণের কারণও ছিল: প্রথমতঃ, আন্দোলন তাঁর আশানুরূপ ব্যাপক হয় নি, দ্বিতীয়তঃ গোল টেবিল বৈঠকে যোগ দিয়ে তিনি নিজেই করলেন একটা মস্ত ভুল। এর পর, তিনি যে অনুন্নতদের জন্য সংগ্রাম করলেন সেটা উল্লেখযোগ্য এই হিসাবে যে যদিও তাঁর সংগ্রামে মুখ্যতঃ বণিক স্বার্থের জন্য তবু যারা হীন, যারা অত্যাচারিত তাদের প্রতি একটা বেদনা বোধ তিনি এম্নি করেই প্রকাশ করেছেন। তবে এই দুর্গতদের ভিতরেও এক শ্রেণীর লোকের প্রতি কিন্তু তাঁর ঔদাসিন্য মর্ম্মান্তিক, অথচ অসমঞ্জস্য নয়। এই শ্রেণী হচ্ছে কারখানার শ্রমিকরা। এদের জন্য যে তাঁর দরদ-বোধ ছিল না তা হয় তো নয়; কিন্তু যে বণিকদের সহায়তায় এত বড় হয়েছেন তাদের স্বার্থহানি তিনি হয়তো করতে চান নি। এর চেয়ে বড় কারণ হচ্ছে এই শ্রেণীর প্রতি তাঁর ভয়। এই সময়ে মজুরদের সংঘবদ্ধ করবার প্রচেষ্টা বেশ বেড় উঠেছে; আর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এই সম্পত্তি বর্জ্জিত জাতি সহজেই সমাজতন্ত্রবাদে আকৃষ্ট হোতে পারে। কিন্তু কৃষকরা ব্যক্তিগত সম্পত্তির মর্য্যাদা বোঝে; তাদের উপর সেদিক দিয়ে অনেক বেশী নির্ভর করা চলে। কাজেই কৃষকরাই গান্ধীজীর নিকটতর।

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে ক্রমাগত পট বদ্‌লাতে লাগ্‌ল। এল সোস্যালিজ্‌ম্‌, এল কম্যুনিজ্‌ম্‌, এল কৃষাণ সভা। ট্রেড্‌ ইউনিয়নগুলোও ফেঁপে উঠতে লাগ্‌ল। ফেডারেশন এবং অটোনমির বিরুদ্ধে দেশে উট্‌ল তীব্র বিক্ষোভ। এ অবস্থায় গান্ধীজী যা করেন তারই গুরুত্ব প্রচণ্ড। অনেকেই আশা করলো গান্ধীজী এবারও অটোনমির বিরোধী হবেন, যেমন এর আগে ১৯১৯ এর ভারত শাসন আইনের বিরোধী হয়েছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য যদিও এবারকার অটোনমিতেও আসল কলকাঠির একটা চাবিও আমাদের হাতে আসে নাই, গান্ধীজী এটা গ্রহণের সপক্ষে মত দিলেন। মন্ত্রীত্ব গ্রহণের গোড়াকার উদ্দেশ্য ছিল—শাসন ব্যবস্থায় অচল অবস্থার সৃষ্টি করা। আসল উদ্দেশ্যটা বোঝা গেল মন্ত্রীত্ব গ্রহণের পরে, যখন দেখা গেল যে মন্ত্রীরা অচল অবস্থা আন্‌তে যত্নবান্‌ না হয়ে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। বোঝা গেল গান্ধীজীর সংগ্রামাত্মক মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয়েছে। কেন এমন হল? স্থবিরত্ব এল নাকি গান্ধীজীর মনে? উত্তর দিতে যেয়ে দেশের আর একটা ক্রমবর্দ্ধমান শক্তির কথা তুলতে হয়। সমাজতন্ত্রবাদ নামে একটা ধনতন্ত্রবিরোধী আন্দোলন ক্রমেই যে প্রবল হয়ে উঠ্‌ছে গান্ধীজী সে বিষয়ে সচেতন ছিলেন অনেক পূর্ব্বেই। এই সময়েই যদি আবার কংগ্রেস কোন

সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে তো তার শক্তি আরও বেড়ে উঠ্‌বে। শেষটায় যে তারাই কংগ্রেসের অধিনায়কত্ব করবে না এ কথাই বা জোর করে কি করে বলা চল্‌তে পারে? তার চেয়ে এখনি শাসন-বিধি হাতে নিয়ে এই আন্দোলন নিরোধের চেষ্টা করা যাক্।

গত দু' বছর গান্ধীজীকে পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এই সময় তাঁর প্রধান বিশেষত্বই হচ্ছে সমর-বিমুখতা। তাঁর আগেকার অহিংসার নীতি অনেক বদ্‌লে গেছে। আইন-অমান্যের মধ্যে পিকেটিংএর মধ্যে সর্ব্বত্র তিনি হিংসার স্পর্শ দেখ্‌তে পেলেন। তিনি বল্লেন, এই নিগূঢ় হিংসার ছদ্ম-অস্তিত্বের জন্য গত আন্দোলনগুলো ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু এইভাবে অহিংসার সত্যিকারের রূপটা যেখানে এসে দাঁড়াল, তাতে তাকে আর সংগ্রামের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা সম্ভবপর নয়। কিন্তু গান্ধীজীর প্রতি সুবিচার করতে হলে মনে রাখ্‌তে হবে যে অহিংসা তাঁর কাছে একটা অস্ত্রমাত্র নয়, অহিংসা তাঁর ধর্ম্ম। যতদিন পর্য্যন্ত অহিংসা-যুদ্ধ সেই সব যুযুধানদের হাতে ছিল যাদের উপর এটুকু নির্ভর করা যেতো যে তারা কোন রকমের হিংসার কাজ করে বস্‌বে না, ততদিন অহিংসা সম্বন্ধে এত কড়াকড়ি, এত সীমানিরুপণের আবশ্যকতা ছিল না। কিন্তু আজ যখন গণ-বিপ্লবের সম্ভাব্যতা প্রতি পদে পদে অশিক্ষিত অসংযত লোকদের হাতে অহিংসার লাঞ্ছনার সম্ভাবনা প্রকাশ করছে, অহিংসাকেও সে ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আগের থেকে সাবধান হতে হয়। গান্ধীজী এভাবে স্বধর্ম্ম রক্ষার পরিচয় দিয়েছেন ; কোন রকম অসঙ্গতি দেখাননি।

তারপর গত কয়েক মাসে ভারতীয় রাজনীতিতে যে দ্রুত পরিবর্ত্তন ঘটেছে তার ইতিহাস সবাই এত বেশী জানেন যে ঘটনাগুলোর উল্লেখ না করে শুধু এর পিছনে গান্ধীজীর কি উদ্দেশ্য ছিল তার কথাই আলোচনা করব। লোকে যাই বলুক, প্যাটেল বা দেশাই ফেডারেশনটা সংস্কার করে নেবার জন্যে যত বেশী ব্যস্ত, গান্ধীজী তা নয়। ফেডারেশনের অনুপযোগিতা তিনি খুব ভাল করেই জানেন। তবুও তিনি এও জানতেন যে ভারতের এই অবস্থায় আন্দোলন আরম্ভ করলে সমাজ বিপ্লব দ্রুত এগিয়ে চলবে। বাস্তবিক, যে পদ্ধতি নিয়ে গান্ধীজী কাজ করেছেন তাতে তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। গান্ধীজীর সঙ্গে যদি ধরে নেয়া যায় যে সমাজতন্ত্রবাদ দেশের পক্ষে অকল্যাণকর তাহলে সুভাষবাবুকে যে তিনি পরোক্ষভাবে দেশের শত্রু বলেছেন তার যথার্থতা বোঝা যাবে।

গান্ধীজী পূর্ণ স্বাধীনতা না চাইলেও কানাডা এবং সাউথ আফ্রিকার যে অবস্থা সে রকমটা পেলে তবেই সন্তুষ্ট হতে পারেন। এই রকম ইঙ্গিত তিনি আগে আগে কয়েকবার দিয়েছেন। বৃটিশের সঙ্গে ভারতের নামমাত্র সম্বন্ধ বজায় রাখার সুবিধা এইটুকু যে তাতে তাঁর অহিংসা ও প্রীতির আদর্শ প্রচারের প্রশস্ততর ক্ষেত্র পায়। তিনি অত্যাচার নিরোধ করতে চান, কিন্তু অত্যাচারীর প্রতি তাঁর কোন অভিযোগ নাই ; অত্যাচার না করে তারা প্রভুত্ব করুক তাতে আপত্তি নাই, ভাবটা এই। কিন্তু অবস্থার গুণে তিনি এখন এর চেয়ে অনেক কম ক্ষমতাও গ্রহণ করতে বাধ্য। কারণ যা আগে বলেছি, বর্ত্তমানে সংগ্রাম বাধলে তা জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে

পড়বে ; তা আর নিছক আন্দোলনই থাকবে না, তা হবে বিপ্লব। আর বর্ত্তমান যুগে বিপ্লবমাত্রই সোস্যালিজ্‌মের পরিপোষক। অথচ সমাজতন্ত্রবাদ গান্ধীজী চান না।

ভাসা ভাসা দৃষ্টি নিয়ে দেখ্‌তে গেলে গান্ধী-বিশ্লেষণ এইখানেই শেষ হয়। গান্ধীজীকে আমরা পাই ধনিক স্বার্থের মিত্ররূপে। কিন্তু গভীরতর আলোচনার ফলে এই সিদ্ধান্তে এক জটিল পরস্পর বিরোধী সমস্যার উদ্ভব হয়। প্রশ্ন ওঠে যার জীবন যাত্রায় বাহুল্যের লেশমাত্র নাই সে সমানাধিকারবাদের বিরোধী হয় কিরূপে ? সাধারণ লোকের প্রতি তাঁর সহানুভূতি একেবারে নেই তাই বা কি করে বলি ? 'বার্দ্দোলী ক্যাম্পেন্' তো তিনিই চালিয়েছিলেন তিনিই তো চরকা এবং কুটীর শিল্পের কথা বলে যন্ত্র সভ্যতার বিরোধীতা করে অগণিত দরিদ্র শিল্পীর জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করে দিতে চেয়েছিলেন। হরিজন আন্দোলন, পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা তাঁরই দান। এ কথা তো স্বীকার না করে পারা যায় না যে তিনি যে সমাজবিধির পরিকল্পনা করেছিলেন তার ভিত্তি ছিল শান্তি আর সাম্য। শ্রেণীভেদ মানলেও তিনি সেটা যে আকারে দেখ্‌তে চেয়েছেন তাতে সমাজের রূপ কিছুটা বদলে যেত। যন্ত্র সভ্যতার কাজ হচ্ছে পুঁজিপতি সৃষ্টি করা ; সেটা গান্ধীর ঈপ্সিত নয় বলেই তিনি দেশে কুটীর শিল্পের প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন বারবার। হয়তো হতে পারে যে এই অবাস্তব পরিকল্পনার দ্বারা তিনি যন্ত্র সভ্যতার ক্ষতি না করে বরং সাহায্যই করেছেন ; কিন্তু তাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহ করবার কোন কারণ নেই। তবে কেন সমাজতন্ত্রবাদ পরিহার করতে গান্ধীজীর এত আয়োজন ?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে মনে রাখ্‌তে হবে যে গান্ধীজীর রাজনৈতিক প্রেরণা এসেছে বহুলাংশে ধর্ম্মগত মনোভাবের থেকে। ছোট বয়সে তিনি নিশ্চয়ই অসামাজিক ছিলেন, এবং তার ফলে যা হওয়া স্বাভাবিক, তিনি সমাজের চল্‌তি পথে গা ভাসিয়ে দিতে চাইলেন না। সত্য পথকে, ধর্ম্ম পথকে শ্রেষ্ঠ পথ বলে আঁকড়ে ধরলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মনে, অন্ততঃ অবচেতন মনে, সেই তরুণ বয়সেই এই ধর্ম্মহীন সমাজে নতুন ধর্ম্মের সাড়া জাগাবার ইচ্ছা জেগেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে যেয়ে তিনি প্রথম নিরস্ত্র লোকদের পক্ষে অহিংস সংগ্রামের যে প্রবল নৈতিক শক্তি আছে তার পরিচয় পান। তিনি টলষ্টয় এবং ওয়াল্ট হুইট্‌ম্যানের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ক্রমে ক্রমে অহিংসাকে এত বড় করে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন যে শেষ পর্য্যন্ত এইটে তাঁর কাছে বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলে প্রতিভাত হল। এই নতুন যুগের নতুন ধর্ম্মের তিনি ঠিক প্রবর্ত্তক না হলেও তিনি এর এমন একটা বাস্তবরূপ দিতে চাইলেন যাতে এর প্রবল নৈতিক শক্তির কথা জনসাধারণের কাছে সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন বল্‌তে গেলে এই অহিংসা ধর্ম্মের একটা বিরাট পরীক্ষাস্থল। এই পরীক্ষার সফলতার উপরে এই ধর্ম্ম আন্দোলনেরও প্রচারগত সাফল্য নির্ভর করে। এখন এই যে অহিংসা ধর্ম্মের আন্দোলন তিনি হলেন এর কর্ণধার। এবং ধর্ম্ম প্রচার সূত্রেই যা হয়ে থাকে---তিনি গুরু শিষ্যের ভেদ স্বীকার না করে পারেন না। এ ধারণা তিনি কিছুতেই সহ্য

করতে পারেন না যে তাঁর অনুগামীরা তাঁকে তাদেরই একজন ভাব্‌বে, আর মনঃপূত না হলেই তাঁর ধর্ম্মের সমালোচনা করবে। তাঁর কাছে এই সমালোচনা হচ্ছে প্রত্যেক ধর্ম্ম শাস্ত্রের বহু নিন্দিত অশ্রদ্ধার রূপান্তর। খৃষ্টও এই রকমই ভাব্‌তেন; বুদ্ধের ধারণাও এই রকমই ছিল। এককথায় পরমত-অসহিষ্ণু যে নয় সে ব্যক্তি ধর্ম্ম প্রচারক হবার অনুপযুক্ত। কারণ কোন ধর্ম্ম প্রচারকই নিজেকে ভগবানের দূত এবং তাঁর বাণীকে অভ্রান্ত সত্যের প্রতীক মনে না করে পারেন না। বস্তুতঃ, এই মনে করার মধ্যে যে অন্ধ বিশ্বাস আছে তার প্রবল মানসিক শক্তিতেই ধর্ম্ম প্রচারক সাধারণের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারেন। আর গান্ধীজীর মনেও আছে সেই অভিলাষ এবং বিশ্বাস যাতে তিনি নিজেকে এই ধর্ম্ম প্রচারকদের সম স্তরের না হোক্‌ অন্ততঃ সমশ্রেণীর মনে করেন। অল্‌ডাস্‌ হাক্সলী তাঁর 'জেষ্টিং পাইলেটে' গান্ধীজীকে বলেছেন 'সেইন্ট্‌' এবং এই কথাই যে সত্য তার প্রমাণ পাওয়া যাবে যদি 'হরিজন' পত্রিকায় গান্ধীজীরই লেখা প্রবন্ধগুলো পড়ি। 'নতুন আলোর সন্ধানে' তাঁর যে ব্যাকুলতা, সেই আলোকিত পথে জনসাধারণকে চালিত করে নিয়ে যাবার তাঁর যে প্রতিশ্রুতি তা এই 'মিষ্টিক' জীবনের প্রমাণ দেয়। এখন গান্ধীজীর চালক আর চালিতের পার্থক্যটা অনেকাংশে সহজাত হয়ে গেছে। স্বভাবতঃই মানুষের মধ্যে এই যে অধিকার ভেদের প্রশ্ন, একে যে সমাজতন্ত্রবাদ অস্বীকার করে তাকে তিনি গ্রহণ করবেন কি করে? বাধ্য হয়ে তাঁকে ধনিক শ্রেণী যারা সমাজে পার্থক্য স্বীকার করে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে হল।

গান্ধীজীর এই ধর্ম্ম প্রচারকের রূপটা মনে রাখ্‌লেই তাঁর সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত সংশয় দূর হবে। ডেমোক্র্যাট্‌ বল্‌তে যা বোঝায় তিনি নিশ্চয়ই তা নন; বরং ফ্যাসিষ্টদের সাথে তার মিল আছে এই হিসাবে যে ফ্যাসিষ্টদের মত তিনিও রাজ্য বিস্তার করতে চান; তবে বাহুবলের নয়, ধর্ম্মের। মনে রাখ্‌তে হবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র নয়; তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বাধীনতা-অর্জ্জনের সংগ্রামের ভিতর দিয়ে অহিংসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা। সেইজন্যেই তিনি, মধ্যবিত্তরা যারা অহিংসার নীতি বুঝ্‌তে পারে, উত্তেজনার মধ্যে আত্মসংবরণ করতে জানে, তাদের মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখ্‌বার পক্ষপাতী। কারণ গান্ধীজীর ঐ ধারণা সত্যিই অমূলক নয় যে জনসাধারণের মধ্যে যদি বিপ্লব প্রসারিত হয় তারা অহিংসার মর্য্যাদা রক্ষা নাও করতে পারে; আর হিংসা দিয়ে যদি ভারতে স্বাধীনতাও আসে তাতে তাঁর লাভ কি? এর উপরে আবার সাম্যবাদের ভয় আছে। এইজন্যেই দেশীয় রাজ্যের ব্যাপক প্রজা আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য তাঁর এত চেষ্টা দেখা গেছে। আমাদের এ কথা স্পষ্টভাবেই বুঝ্‌তে হবে যে এই গণ-বিপ্লবের সম্ভাবনা যতই বাড়ছে; গান্ধীজীর মনেও অসহযোগ আন্দোলনের তৃষ্ণা ততই কম্‌ছে। এর জন্যে যদি তাঁর উপর আমরা দোষারোপ করি সেটা হবে শুধু তাঁকে আমরা ভুল বুঝ্‌ছি সেইটে প্রমাণ করা। গান্ধীজীকে আজ প্রতিক্রিয়াশীল বলে যারা দোষ দিচ্ছে তারা দেখ্‌তে পাচ্ছে না যে গান্ধীজী তাঁর মূলনীতির উপর অবিচলিত নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করছেন বলেই আজ ভারতের

পরিবর্ত্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল মনে হচ্ছে। গান্ধীর নেতৃত্ব বা সহ-নেতৃত্ব কামনা করতে হলে ধর্ম্ম প্রচারক গান্ধীকে বাদ দিয়ে শুধু রাজনৈতিক গান্ধীকে নিয়ে কাজ করায় বিপদের সম্ভাবনা আছে কিনা সেইটেই বিচার করে দেখ্‌তে হবে আগে। সে বিচার সহজও নয়, আর বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যেরও বাইরে।

'প্রবেশ নিষেধ'

ত্রৈলোক্য বিশ্বাস

ভোরবেলাকার নরম সোনালী রোদ
ডাকে নাই কেহ এসেছে নিজে
তরু শিরে শিরে লতায় পাতায় আরো
ঘাসের ডগায় শিশিরে ভিজে।
ডাকে নাই কেহ এসেছে সে নিজে তাই
ভেদাভেদ তার একটু নাই।

যত ধনীদের প্রাসাদশিখরে
বাতায়নঢাকা পর্দার 'পরে
নীরবে নামিয়া করে বিহার
সোনালী আলোক ভোরবেলার।
ঘাসের ডগায় নরম সোনালী রোদ
শিশিরে ভিজে
এসেছে নিজে।

পথের ওধারে গরীবের চাল—
ধনীর প্রাসাদ উঁচুও বিশাল,—
দাঁড়ায়ে রয়েছে করিয়া আড়াল—
ভোরের সোনালী আলোর তাই
'প্রবেশ নিষেধ' সেথা সদাই।

দ্বন্দ্ব

(নাটক)

প্রভাত দেব সরকার

চরিত্র

অবিনাশ ঘোষাল	...	লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবীন ব্যবহারজীবি।
সোমেশ্বর প্রসাদ	...	উদীয়মান, তরুণ ব্যবহারজীবি।
গোবিন্দ	...	অবিনাশবাবুর কনিষ্ঠ পুত্র।
বিজনবিহারী	...	ঐ জ্যেষ্ঠ জামাতা।
ধর্ম্মদাস	...	ঐ মুহুরী।
তারিণী ও শ্রীমন্ত	...	খুনী আসামীদ্বয়—অবিনাশবাবুর মক্কেল।
স্নেহময়ী	...	অবিনাশবাবুর স্ত্রী।
সুচারু	...	ঐ কনিষ্ঠা কন্যা।
মেনকা	...	ঐ জ্যেষ্ঠা কন্যা।
দয়াবতী	...	সোমেশ্বরের মাতা।
নীলিমা	...	ঐ ভগ্নি।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য : অবিনাশবাবুর বৈঠকখানা।

[সকাল আটটা। ঘরটা আবছা অন্ধকার। পূবদিকের চাপা জানালা দিয়ে যেটুকু আলো আসচে তাতে টেবিলটার মাঝখানটা আলোকিত হয়েচে। লম্বা ঘরটার চতুষ্কোণে ছেঁড়া-ছেঁড়া অন্ধকার জমে আছে। বাইরে থেকে হঠাৎ ঘরে ঢুকলে কড়ি-কাঠ-ছোঁয়া আলমারীগুলোর অস্তিত্ব এক নজরে ঠাহর হয় না। দক্ষিণের চলনের পথ দিয়ে বাইরে থেকে ঘরে ঢোকবার দরজাটা ভেজান,—পশ্চিম কোণের শেষপ্রান্তে অন্দরমহলের দরজাটা পর্দ্দা-সমেত আধভেজান ;—উত্তর দিকের খোলা দরজাটার মধ্য দিয়ে একটা আধময়লা মশারীর কিছুটাও তক্তাপোষের একটা কোণ দেখা যাচ্ছে। পূবের দুটো জানালাতেই আধখানা ক'রে পাতলা কাপড়ের পর্দ্দা লাগান,—একটার আবার দুটো কোণ খোলা।

উত্তর দিকের দরজা থেকে হাত তিনেক সোজা দক্ষিণে এলে অবিনাশবাবুর ঘোরান চেয়ারটার কাছে পৌছান যায়। চেয়ারটার মাথায় একটা আধময়লা সাদা ঘেরাটোপ,—তার উত্তর মেরুটা তেলে আর ধূলোয় হল্‌দে ধোঁয়াটে।—হাতল দুটোর প্রান্তদেশ ছিঁড়ে নারকেল ছোবড়া বেরিয়ে পড়েচে।

টেবিলটার বাঁ-পাশে (চেয়ারে বসলে বাঁ দিকে) একটা হাই-ব্যাক বেঞ্চ লম্বালম্বি পাতা। ডান দিকে দুখানা ও সামনে দুখানা চেয়ার পাতা। চেয়ারগুলোয় এককালে বেতের ছাউনী ছিল—উপস্থিত ভেনেস্তা আঁটা। টেবিলটার ওপরে বাঁ দিকে বেতের বাক্সে কাগজপত্তর ভর্ত্তি ;—ডান দিকে হাতের নাগালের কাছে ইতস্ততঃ মসীলিপ্ত দোয়াতদানী, পাঁচ-সাতটা কলম। আশে-পাশে আইন-বই ছড়ান।

ঘোরান চেয়ারে বসে' অবিনাশবাবু মকদ্দমার ব্রীফ দেখছেন, তাঁর রগের দু'পাশের চুলে পাক ধরেছে,—কপাল থেকে মাথার চাঁদি ছাড়িয়ে চকচকে টাক,—গৌরবর্ণ আঁট-সাট চেহারা—মুখখানা না লম্বা, না গোল ;—বরাবর খাড়া নাকটার ডগাটা কিঞ্চিৎ চাপা,—প্রশস্ত কপালের উপর চশমাটা তোলা। বয়েস আন্দাজ পঞ্চান্ন।

বেঞ্চটার শেষপ্রান্তে তারিণী ও শ্রীমন্ত ঘেঁযাঘেঁষি হয়ে বসে আছে। দুজনেরই ভ্রূ অত্যন্ত কুঞ্চিত হওয়ায় কপালে তিন চারটে খাঁজ পড়েচে। শ্রীমন্তর গায়ে কালো কোট—তারিণীর গায়ে ময়লা ফতুয়া, কাঁধে পাকান উড়ানী]

অবিনাশ বাবু

হুঁ, এবার সবিস্তারে ঘটনাটা বলদেখি—কিছু রেখে-ঢেকে ব'লো না, কেস্ ফেসে যেতে পারে।

তারিণী (এগিয়ে এসে)

আজ্ঞে, তা তো ঠিক। জজের কাছে ঢাক্‌তে পারি, আপনার কাছে কী ঢাক্‌তে পারি !

শ্রীমন্ত (নড়ে উঠে)

তা ঠিক। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস, আর খেঁড়ি ডিঙিয়ে খেলা, এক-ই।

অবিনাশ বাবু

আচ্ছা, আচ্ছা—এখন ঘটনাটা বল। একটুও যেন বাদ না পড়ে।

তারিণী

আজ্ঞে, ব্যাপারটা এমন কিছু লয়—এরকম আক্‌ছারই হয়! তবে কিনা এবারটা বড় জানা জানি হয়ে পড়েচেন।

শ্রীমন্ত

ওরকম আমরা বছরে দুচারটে করে' থাকি। বেটা চৈতন্য সামন্তর বেটা দুচারদিন সহরে ঘুর-ঘুর করে' চালাক হ'য়ে পড়েচে, তার লেগে না এত কাণ্ড !

তারিণী

ছুঁচোটাকে ঠাণ্ডা করবার ব্যবস্থা হাতেই ছিল, বড্ড ফস্‌কে না! উঃ!!

শ্রীমন্ত

বড্ড চোখে ধুলো দিলে! সেদিন ঘুরঘুট্টী আঁধারে হাতে সড়কি নিয়ে ইষ্টিশানের পথ আগলে বসেছিলুম, সাড়ে দশটার ট্রেরেন বেইরে গেল। সড়কি বাগিয়ে ধরলুম—ব্যস, তারপর যে কাণ্ডটা হলো, সকাল বেলায় শুনে আপশোষে মরি—কোথায় চৈতনের বেটা, কোন এক ভিন্ গায়ের বৈরিগী! বড্ড ভোগাচ্ছে, খুনই দুচারটে বেড়ে গেল—বেটাকে কাহেল করতে নারলাম।

তারিণী

এখন একটার দায় কাটাতে তিন চারটেতে জড়িয়ে পড়েচি।

শ্রীমন্ত (অবিনাশ বাবুর পা জড়িয়ে ধরে)

প্রাণ দিতে আমাদের বাধে না। কিন্তু ঐ জেল, ওটাকেই বড় ডর! রক্ষে করুণ কর্ত্তা।

অবিনাশ বাবু

জেল কী, তোদের তো দেখছি ফাঁসি হ'বে। এক সঙ্গে একই দিনে দুটো খুন করেছিস্, বলিস কী!

তারিণী

ফাঁসি হয় হোক, তার আগে চৈতনের বেটাকে কিছু শিক্ষা দিয়ে দিন।

অবিনাশ বাবু

মরা মানুষ কী আর খুন করতে পারে? সাবধান, এই জামিনের অবস্থায় যেন ও দুর্বুদ্ধি আর না হয়—বাঁচান যাবে না! চৈতন্য সামন্তকে কেন খুন করলি শুনি?

তারিণী

ধান জমির সীমানা নিয়ে লাগে গণ্ডগোল চৈতন খুড়ো সঙ্গে—কিছুতেই মেটে না। এক পাড়ায় বাস অনেক সয়ে' সয়ে' শেষ পর্য্যন্ত লাটালাঠি। আচমকা আমার লাঠিটা ঠিক্‌রে গিয়ে পড়লো খুড়োর মাথার উপর, আর শ্রীমন্তর লাঠিটা কাঁখে। মাথাটা ফেটে তখুনি চৌচির,—কোমরটা একেবারে ভেঙে গেল।

শ্রীমন্ত

আর সেই দিন রাতে বৈরাগীটা খুন হ'লো! চৈতনের বেটাটা ভারি ধড়িবাজ।

অবিনাশ বাবু

হুঁ, খুব কাজ করেচো! আর মুখ নাড়তে হ'বে না! চৈতন্য সামন্তর খুনটা প্রমান হ'লে, বৈরাগী খুনটাও বেরিয়ে পড়বে। কাজগুলো সবই কাঁচা করে' ফেলেচো, বাঁচানই দায়। দেখতে পেলেতো এখন তোমাদের বিরুদ্ধে লড়চে দুপক্ষ—সরকার আর চৈতন্যর ছেলে। না, আমার দ্বারা হ'বে না বাপু!

শ্রীমন্ত

আজ্ঞে, আপনি না বাঁচালে, কে আর বাঁচাতে পারে? আপনার মত আইনে ঝাঁনু কে আর আছে?

তারিণী

আলীপুর তো কোন ছার, এই পিরথীবিতে আছে নাকি?

অবিনাশ বাবু

কেন, তোমাদের ঐ সোমেশ্বর?—ছোক্‌রা উকিল, বোঝেন ভাল!

শ্রীমন্ত

আরে, রাম ঃ! তেনার কথা বাদ দিন—সেদিনকার ছেলে আইনের বোঝে কী?

তারিণী

মুখে এখনো দুধের গন্ধ, হ্যাঁ—

অবিনাশ বাবু

কেন, নাম-ডাক তাঁর খুব,—যাও না তাঁর কাছে !

শ্রীমন্ত

ছাই, হয় কে, লয় করতে না-পারলে আবার উকিল !

তারিণী

উনি যে আবার সত্যপীর ! ওক্‌লাতি করতে এসে যুধিষ্ঠিরের সোদর হ'তে চান—ভাবি আমার ইয়ে—

অবিনাশ বাবু

সেই তো ঠিক ব্যবস্থা ।

শ্রীমন্ত

ওরকম হ'লে আমিও ওক্‌লাতি করতে পারি । আমার দুধের ছেলেটাও পারে !

অবিনাশ বাবু

কেন, আমার কাছে যেমন বললে, ওঁর কাছেও তেমন বলবে ।

তারিণী

আপনাতে আর ওঁনাতে ? চাঁদে আর বাঁদরে !

শ্রীমন্ত

দু'পাতা পড়লেই আর আইন জানা যায় না । কই, আপনার মত 'হয়কে, লয়' করুক দিকি—তবে না বুঝি !

তারিণী

সেবার 'ননীবালা' খুনের মামলায় আপনি না দাঁড়ালে সবাই জানতো আসামীদের নিদেন পক্ষে দ্বীপান্তর বাঁধা । কিন্তু কিছু কী হ'লো ? আপনার মত আইন জ্ঞান কজনার আছে ?

শ্রীমন্ত

জজকে পর্য্যন্ত স্বীকার করতে হ'লো মামলাটা আগাগোড়াই বানান । হুঁ, আইনের পরামর্শ নেব কিনা ঐ দুধের ছেলের কাছে । কি যে বলেন !

তারিণী

ধর্ম্মপুত্তুর !—নাবালক কোথাকার !!

অবিনাশ বাবু

না, না—তোমরা বোঝ না, সোমেশ্বর বাবু বোঝেন ভাল, নাম-ডাক খুব !

শ্রীমন্ত.

নাম-ডাক না, ছাই! কে চেনে ওঁনাকে? আমরা চিনি?

অবিনাশ বাবু

আঃ, তোমরা না চিনলে, আর কেউ চিনতে নেই? বুঝলে ওঁর নাম ডাক খুব—যাও না ওঁর কাছে। দেখ না উনি পারেন কিনা! মনে হয় উনি লাগলে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। দেখতে দোষটা কী?

তারিণী (অবিনাশ বাবুর পা জড়িয়ে ধরে)

আপনি ঠেল্‌লে আমরা বাঁচিনা। আপনার আশায় এদ্দ্‌র এগিয়ে,—ঠেলবেন না।

অবিনাশ বাবু

আচ্ছা, আচ্ছা সে হবেখন। তবে, বৈরাগী খুনের ব্যাপারটা অমন ওলোট করে' আর কারু কাছে বলো না। ও সম্বন্ধে একেবারে চেপে যাবে, বুঝলে? রাতে বৈরাগী খুন হ'লো তাতে তোমাদের লাভটা কী?

শ্রীমন্ত

তা তো ঠিক। আমাদের কী?

অবিনাশ বাবু

আর দেখ, এ ব্যাপারে কিছু দক্ষিণে বেশী লাগবে। আমার মুহুরীর কাছে সব খবর নিয়ে যোগাড়যন্ত্র করে' এসো। আমি এখন উঠলুম।—উপযুক্ত সাক্ষী টাক্ষী যোগাড় করে এসো বুঝলে।

[পশ্চিমের দরজা দিয়ে প্রস্থান]

তারিণী

বুঝলি না, নেহাৎ চামার! ওনার টাকাটাই বড় হ'লো—আমাদের জানটা কিছু লয়! তোকে গোড়ায় বলেছিলুম চল সোমেশ্বর বাবুর কাছে, তা তো শুনলি না! এখন লাও ঠেলা সামলাও—

শ্রীমন্ত

কী আর হ'বে, যে রোগ তার তো আর চারা নেই, ভালয় ভালয় এখন বেরুতে পারলে হয়।

তারিণী

গর্ব্ব দেখলি না লোকটার, যেন সোমেশ্বর বাবু কিছু লয়!

শ্রীমন্ত

গরজ বড় বালাইরে ভাই, কী আর হ'বে ভেবে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

গোবিন্দর পড়বার ঘর।

[পরের দিন বেলা আন্দাজ ন'টা। ঘরটী প্রশস্ত। দক্ষিণ ও পূবদিকের জানালা দিয়ে প্রচুর আলো এসে টেবিলের ওপর পড়েচে। পশ্চিমের দেওয়াল ঘেঁসে ঘর-জোড়া আলমারী, দক্ষিণের টেবিলের পাশে একটা বুক-কেস। দেয়ালে ছবির মধ্যে বেশীর ভাগই সিনারিও পেন্টিং, টেবিলটা দক্ষিণের জানালা ঘেঁসে পাতা থাকায়, তিন দিকে তিনখানা চেয়ার,—ঘরের উত্তর দিকে কুশন সমেত মস্ত একটা সোফা। ঘরের চতুর্দ্দিকের দেওয়ালই আধখানা ফিকে সবুজের কোটিং, মধ্যে চওড়া কালো বর্ডার।]

গোবিন্দর বয়েস আন্দাজ পনের থেকে ষোলর মধ্যে। বাপ উকিল বলেই হোক, আর নিজের স্বভাবগুণেই হোক, এখন থেকেই উকিল হবার উচ্চাকাঙ্ক্ষাটা পুরামাত্রাতেই আছে। উপস্থিত সে একখানা ইংরেজী দৈনিকে গভীর মন দিয়ে আছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে যে, কোন পাঠ্যপুস্তকের দাগাই জায়গাটা মগজস্থ করতে সমাধিস্থ—খবরের কাগজটা এমনি কায়দায় বইএর মাপে ভাঁজ করা। টেবিলটার ওপর বইখাতা এমন ভাবে ছড়ান যে দেখলে মনে হবে ছাত্রটী বিশেষ মনোযোগী ও পরিশ্রমী। তবে ছাত্রটীর বিশেষত্ব এই যে, তার মুখ-চোখে প্রখর বুদ্ধির দীপ্তি—যা সচরাচর স্বভাব বালক কিশোরদের মধ্যে দেখা যায়।—দুটো পাতলা ঠোঁট অনর্গল কথা কইতে চায় যেন!

[উত্তরের দরজা দিয়ে পা টিপে টিপে সুচারু গোবিন্দর চেয়ারের পেছনে এসে দাঁড়াল। সুচারু গোবিন্দর চেয়ে বছর তিনেকের বড়।—নাতিদীর্ঘ দোহারা চেহারা,—পরণে একখানা রঙিন সাড়ি,—হাতে দু' গাছা সরু রুলি, কানে পাথর বসান দুটি সরু দুল। সমস্ত অবয়বের মধ্যে বিশেষত্ব হচ্চে সুগৌর দীর্ঘ গ্রীবাটি।—সেই গ্রীবার ওপর হাতে-পাকান কুঞ্চিত কবরীটি আধ-ভাঙা। বার দুই গোবিন্দর মাথায় হাত ঠেকাতে ঠেকাতে তুলে নিলে তার চোখে মুখে চাপাহাসির বিচ্ছুরণ]

সুচারু (কৃত্রিম আধিপত্যের সুরে)

এই বুঝি তোমার পড়া হচ্চে? এমন সময় খবরের কাগজ—তাও আবার stories from Law Court! দাঁড়াও বাবাকে বলে দিচ্চি।

গোবিন্দ (চমকে উঠে)

ওঃ, দিদি? আমি মনে করি—(সুর বদলে) কী বলছিলে? তা তুমি যাও না বলগে। আমিও মাকে তোমার 'সেই' কথা বলে দিচ্চি।

সুচারু (অবাক হ'য়ে)

কী সেই-কথা শুনি!

গোবিন্দ

শুনে আর কী ক'রবে বল, মনে মনে বেশ জান। সেই যে সে-দিন সন্ধ্যে বেলায় তুমি আর নীলাদি এস্-পি-এম্-দের—

সুচারু (রাঙা হ'য়ে)

সে-দিন আবার কোন দিন? এস্‌-পি-এম্‌টা কী? মিছে কথা বলো না ভাল হবে না বলচি!

গোবিন্দ

বারে, এর মধ্যে আবার মিথ্যে কথা এলো কোত্থেকে! তোমরা যা' করেছিলে তাই বলবো সেই সে-দিন সন্ধ্যে বেলায়—হুঁ।

সুচারু

কী সে-দিন, তাই বল্‌ না। কেবল বাজে কথা যত—মিথ্যুক কোথাকার!

গোবিন্দ

মিথ্যুক বৈকি! জান সব, আবার ভিজে বেড়াল সাজা হচ্চে। দাঁড়াও আমি যাই মার কাছে—

[গমনোদ্যত]

সুচারু (পেছন পেছন গিয়ে)

লক্ষ্মীটি যাস্‌নে। (কথা ঘুরিয়ে) নাঃ, খবরের কাগজ পড়া ভাল—out knowledge বাড়ে নয়? আমরা তো আর খবরের কাগজ পড়িনা, তাই ছেলেদের মত বেশী জানি না। কী পড়চিস ভাই?

গোবিন্দ (চেয়ারে বসে)

সোমেশ্বর বাবুর একটা কেসের 'হিয়ারিং'।

সুচারু

কে সোমেশ্বর বাবু?

গোবিন্দ

তুমি বুঝি জান না? ওঃ!

সুচারু

উকিল বাবু? যাঁকে নিয়ে সেদিন খুব হৈ চৈ হ'লো!

গোবিন্দ

হৈ চৈ মানে? যাঁর পাণ্ডিত্যে সবাই স্তম্ভিত। হুঁ, তোমরা শুধু হৈ চৈ শিখে রেখেচো?

সুচারু

তবে বাবা যে বলেন, তিনি মোটে যুক্তির ধার ধারেন না—কেবল বিদঘুটে যুক্তি দিয়ে কুট তর্ক করেন! তবে বলবার ক্ষমতা আছে।

গোবিন্দ

Here you are! ঐটেইতো আসল! Gift of the gab না থাকলে আবার উকিল হওয়া যায় নাকি?

সুচারু

কিন্তু বাবা বলেন, Reasoning না থাকলে Pleadershipএর কোন মানে হয় না!

গোবিন্দ

বাবার কথা বাদ দাও। উনি সেকেলে মতের পক্ষপাতী, বলেন Law is made—

সুচারু

এ সম্বন্ধে তোমাদের সোমেশ্বর বাবু কী বলেন?

গোবিন্দ

যা বলবার তাই বলেন। 'Law is rationalised common sense, therefore, it always grows and changes'.

সুচারু

কথাগুলো শুনতে ভাল, কিন্তু ভুয়ো! উনি মনে করেন ঘুরিয়ে কথা বললেই খুব বড় কথা বলা হয়।

গোবিন্দ

হুঁঃ, তোমরা Lawএর কী বুঝবে! Botany আর বাঙলা নিয়ে ভারিতো I.A. পাশ করেচো! পড়তে Civics, Logic—

সুচারু

দরকার নেই আমার Civics Logic পড়ে। বুঝতেই পারচি তোমাদের সোমেশ্বর বাবু একজন মস্ত বড় মাতব্বর। Logic না পড়লেও ওরকম ঘুরিয়ে কথা আমিও বলতে পারি।

গোবিন্দ

কখনই পার না। জান উনি কখনো Logic পড়েন নি।

সুচারু (মুখটিপে)

আরো ভাল! ঐ জন্যেই যত কূট তর্ক করেন। বাবা ঠিকই বলেন।

গোবিন্দ

বাবা তো সবই ঠিক বলেন! Logicটা যে common sense ছাড়া কিছু নয় এটি ভুলে যাও কেন!

সুচারু

রেখে দে তোর common sense! বাবার মত পড়াশোনা করলে আর ওঁকে ওকথা বলতে হয় না!

গোবিন্দ

পড়াশোনা করেন নি মানে? জান বরাবর first হ'য়ে এসেচেন!

সুচারু

তা' হ'লে কী হয়! বেশী পড়ে বুদ্ধি খুইয়েছেন—কেবল মুখস্থ গদ, তোতা পাখীর মত আওড়ান।

গোবিন্দ (রেগে)

সে পার তোমরা,—বুদ্ধি তো তোমাদের খুব, চোক কান বুজে আছ—বুদ্ধির কী ধার ধার তোমরা শুনি? As a rule women are led more often by their hearts than by their understandings.

সুচারু

তা তুই যাই বল, তোদের সোমেশ্বর বাবুর বুদ্ধি একেবারেই নেই!

গোবিন্দ

তুমি বললেই তো আর হ'লো না! তোমার মতটা তো আর শেষ মত নয়।

সুচারু

কেন হবে না। হাতে হাতে প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি, তার সাক্ষী তোমাদের সোমেশ্বরবাবু! বাবার মত 'কেস' conduct ক'রতে পারতেন তো বুঝ্‌তুম—কেবল হেরে মরেন।

গোবিন্দ

হেরে মরেন, মানে? জান, উনি এ পর্যান্ত একটাও 'কেসে' হারেননি!

সুচারু

না হারলেও, হারার সামিল। জজের সঙ্গে বন্ধুত্ব বলেই না!

গোবিন্দ (চটে)

যাও, যাও তোমার সঙ্গে আমি তর্ক ক'রতে চাই না। মেয়েছেলেগুলো মাত্রেই Biased!

সুচারু

তা তুই যাই বলিস্, তোদের সোমেশ্বরবাবুকে আর বাবার সঙ্গে পারতে হয় না!

গোবিন্দ (উঠে পড়ে)

যাও, আমায় বিরক্ত করো না, বলচি। তোমরা যদি Genius চিন্‌তে তা' হ'লে আর ভাবনা ছিল না। উকীল বলতে তো তোমরা কেবল বাবা আর আশুবাবুকেই শিখে রেখেচো।

সুচারু

বাঃ! যে বড়, তাকে বড় বলবো না? গায়ের জোরে তো আর বড় হওয়া যায় না!

গোবিন্দ

বেশ, বেশ ! তোমার মত তো আমি চাইচি না, কেন বিরক্ত করচো ?

সুচারু (হেসে)

যাক্, ভদ্রলোকের দেখচি এর মধ্যে অনেক চেলা জুটে গেচে,—উন্নতি নাই হোক, হুজুকে মাতাবেন দেখ্‌চি সকলকে। হতুম আমি ওঁর প্রতিদ্বন্দ্বী, টেরটা পাইয়ে দিতুম !

গোবিন্দ

হুঁ, 'কত হাতী গেল তল, মশা বলে কত জল !'—যাও, যাও তোমার মত অমন ঢের দেখা আছে। পাঞ্জাবের মালতী গোয়েঙ্কাকে চেন, সেই যে Rivalry ক'রতে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত Rivalকেই—

সুচারু (সহসা গম্ভীর হ'য়ে)

তোর বড় মুখ হ'য়েচে, যা তা বলিস্ ! দাঁড়াও যাচ্চি বাবার কাছে।

গোবিন্দ

আমিও যাচ্চি মার কাছে। সেই সেদিন সন্ধ্যে বেলায় 'এস্-পি-এম'দের বাড়ি—(চীৎকার করে) মা তোমার মেয়ে সেদিন সন্ধ্যে বেলায়—　　[দৌড়াইয়া প্রস্থান

সুচারু (পেছন পেছন যেতে যেতে)

লক্ষ্মীটি যাস্‌নে। তোকে উলএর একটা চমৎকার Pull-over বুনে দেব—ওরে শোন লক্ষ্মীটী—

[ক্রমশঃ

পোল্যাণ্ড

রেমণ্ড লেস্‌লি বুয়েল (Raymond Leslie Buell)

বিশিষ্ট রাষ্ট্র বলে পরিগণিত হবার শক্তি পোল্যাণ্ডের প্রচুর। ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে পোল্যাণ্ডের জনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। পনেরো বৎসরের মধ্যেই তা ফরাসী দেশের সমান হয়ে দাঁড়াবে। এক ভৌগলিক অবস্থানহেতুই ইউরোপে এর সামরিক ও রাষ্ট্রনৈতিক গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ পোলরা বুদ্ধির উৎকর্ষের দিক দিয়েও অতি অগ্রসর। একজন লেখক এদের সম্বন্ধে বলেছেন, ফরাসী ব্যতীত পোলদের ন্যায় স্বভাবতঃ ধীসম্পন্ন জাতি ইউরোপে আর নেই। বিশ্ব সংস্কৃতিতেও পোল্যাণ্ডের দান নগণ্য নয়। জ্যোতির্বিদ কপারনিকাস পোল ছিলেন। আমেরিকা-বিদ্রোহের তিনজন প্রখ্যাত বিদেশী নেতাদের অন্যতম কাউন্ট পুলাস্কি (Pulaski) ও জেনারেল কসিয়াস্কো (Kosciuszko) দুজনই ছিলেন পোল। পরবর্তী শতাব্দীতে সিনকিয়েউইজ (Sienkiewicz) এর উপন্যাসরাজি এবং চোপিন (Chopin) এর সঙ্গীতে পারদর্শিতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করে। অধুনা পাদেরেউইস্কি (Paderewski), রুবীনস্‌টাইন (Rubinstein), কন্‌র‍্যাড্‌ (Conrad), রেমণ্ট (Reymont) এবং মাদাম কুরীর (Curie) নামের খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। ইউরোপে সর্বপ্রথম পোল্যাণ্ডেই শিক্ষার জন্য একটী স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। জাতীয় পরিষদ স্থাপন এবং নাগরিক অধিকারের ঘোষণাতেও এই দেশ অগ্রগণ্য।

পোলদের জীবিকার প্রধান অবলম্বন কৃষি। এজন্যেই দেশের আর্থিক অবস্থা মোটেই সন্তোষজনক নয়। পোল্যাণ্ডের মোট জনসংখ্যা ৩ কোটী ৪৫ লক্ষ। এখানকার বসতির ঘনত্ব বেলজিয়ামের এক-তৃতীয়াংশের চেয়েও কম। কিন্তু বেলজিয়াম শিল্পোন্নতির প্রায় চরমে উঠেছে আর পোল্যাণ্ড রয়ে গেছে মুখ্যতঃ কৃষিজীবি। পোল কৃষকরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামে একত্রিত হয়ে বাস করে। ফসল বপন ও সংগ্রহের সময় প্রতিদিনই তারা স্ব স্ব ক্ষেতে শ্রমে রত থাকে। তথাপি এদের জীবন ধারণের আয়োজন অতি সংক্ষিপ্ত। আহার্যের মধ্যে গোল আলু এবং রাই-ই এদের প্রধান অবলম্বন। বৎসরের খাদ্যের সঙ্কুলান কোন রকমে হলেও আর্থিক সংস্থান এদের একেবারেই নেই। পোল কৃষকের দারিদ্র্য কিম্বদন্তীর বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ রকমও শোনা গিয়েছে যে বিগত ব্যবসা মন্দার সময়ে তারা দেশলাইয়ের একটা কাঠিকে চার-পাঁচ ভাগে চিরে নিয়ে জ্বালত। আলু সিদ্ধ করবার জন্য একই জল পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করা হত যাতে করে লবণটুকু বাঁচান যায়। কৃষক পল্লীতে রাত্রিকালে প্রায়ই আলোর চিহ্নমাত্র লক্ষ্য করা যায় না। জনৈক লেখক পোল্যাণ্ডের দরিদ্রতম উত্তর-পূর্বাংশের এইরূপ বর্ণনা দিয়েছেন: প্রত্যেকবার শীতের শেষে ঘোড়ার খাদ্য যখন নিঃশেষিত হয়ে আসে তখন অবলম্বনের সাহায্যে এই আশায় তাদের দাঁড় করিয়ে রাখা হয় যে বসন্তের আগমন পর্য্যন্ত যদি তারা মৃত্যু কবলিত না হয় তবে তাদের চারণ

ক্ষেত্রে বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে। ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য জ্বরে পীড়িত হয়ে কৃষকরাও হয়ে পড়ে অস্থিচর্মসার। তাদের পরিধেয় শত ছিন্ন বস্ত্র আর পাদুকা গাছের বাকল। পোলদের মধ্যে অনেকে এই বর্ণনাকে অতিরঞ্জিত মনে করলেও পোল কৃষকদের দুঃস্থতা পশ্চিমদেশবাসীর পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন।

১৯৩৩ সনে, মন্দার সময়ে, দেশের মধ্যে যাদের অবস্থা অন্য সবার চেয়ে অধিক স্বচ্ছল ছিল জনসংখ্যার শতকরা সেই ৭ জনের মাসিক গড়পড়তা আয়ের পরিমাণ ছিল ২৭ ডলার (প্রায় ৯০ টাকা), অবশিষ্ট লোকের অনূধ ৪॥০ ডলার (প্রায় ১৫ টাকা)। ১৯৩৭ সনে জাতীয় সম্পদ ২০ গুণ বেড়েছে। তথাপি আমেরিকার সঙ্গে তুলনায় ব্যষ্টির অংশ এখনও অতি অকিঞ্চিৎকর। সমগ্রভাবে দেখতে গেলে কিন্তু দেশের অবস্থা স্বচ্ছল বলেই প্রতীত হয়। নগরগুলি বেশ সমৃদ্ধ। শ্রমিকদের অবস্থাও কৃষকের অবস্থার চেয়ে অনেক উন্নত। স্বাস্থ্যবান সুবেশধারী জনতা পথে-ঘাটে এবং রেঁস্তোরাতে যথেষ্ট দেখতে পাওয়া যায়।

গৌরবময় অতীতের স্মৃতি আধুনিক পোল জীবনে নব অনুপ্রেরণার সৃষ্টি করেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে পোল রাজ্য ক্রিমিয়া থেকে বালটিক সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জার্মাণদের সঙ্গে বহু বর্ষব্যাপী কঠোর সংগ্রামের পরে পোলরা বালটিক সাগরের উপকূলবর্তী স্থান দখল করেছিল। সে সময়ে পোল্যাণ্ড ছিল উত্তর ইউরোপের সংস্কৃতি কেন্দ্র, আর বিভিন্ন দেশে ধর্ম ও রাজনৈতিক কারণে নির্যাতিত ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থল। কিন্তু পোল্যাণ্ডের মধ্যযুগের এই সমৃদ্ধি অচিরেই বিনষ্ট হল। জাতীয় পরিষদে একটা অদ্ভুত প্রথা গড়ে উঠেছিল। এর বলে যে কোন প্রতিনিধিই এর কার্য স্থগিত রাখবার দাবী করে সঙ্গে সঙ্গে পরিষদের পূর্বেকার সমস্ত সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে পারত। এভাবে ১৬৫২ থেকে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পরিষদের যত অধিবেশন হয়েছিল তার চারি-পঞ্চমাংশের সমস্ত কার্য পণ্ড হয়ে যায়। পরিষদ ছিল এরকম পঙ্গু, আর রাজারও সমর বিভাগ ও কোষাগারের উপর কোন ক্ষমতাই ছিল না।

শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার অভাবে ষোলো-সতেরোটী বৃহৎ পরিবারের পক্ষ থেকে পৃথক পৃথক দরবার পরিচালনা করা হত, এবং তাঁরা আপনাদেরকে স্বাধীন নরপতি বলে ঘোষণা করতেন। এঁদের পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও রেষারেষির ফলে ঘোর অরাজকতার সৃষ্টি হয় এবং দেশ বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। রুশিয়া, প্রুশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া প্রত্যেকে এই সুযোগে পোল্যাণ্ডের কোন কোন অংশ স্ব স্ব রাজার অন্তর্ভুক্ত করল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মধ্যে পূর্বোক্ত রাষ্ট্রত্রয় পোল্যাণ্ডের দুই-তৃতীয়াংশ স্থান আত্মসাৎ করে নেয় এবং অপর তৃতীয়াংশও রুশিয়ার অধীনস্থ সামন্ত রাজ্যে (Protectorate) পরিণত হয়।

এইরূপে পোল্যাণ্ডের বন্দীদশা সুরু হল। পোলরা বহুবার বিদ্রোহ করেও মহাসমরের পূর্বে পর্যন্ত এই অবস্থার কোন পরিবর্তন করতে পারে নি। অবশেষে শান্তি চুক্তির ফলে এবং রুশিয়ার সঙ্গে দুই বৎসর সংগ্রামের পর পোল্যাণ্ড তার স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং পূর্বেকার

রাজ্যের তিন-পঞ্চমাংশ পরিমিত স্থানে পুনরায় স্বীয় অধিকার বিস্তার করে। বর্তমানে পোল্যাণ্ড ইউরোপের ষষ্ঠ বৃহৎ রাষ্ট্র। রাজ্যের বিস্তৃতির দিক থেকে কেবলমাত্র রুশিয়া, জার্মেণী, ফরাসী ও সুইডেন, এবং জনসংখ্যাতে রুশিয়া, জার্মেণী, ফরাসী, ব্রিটেন ও ইটালী এর চাইতে শ্রেষ্ঠ।

মহাসমরে এক বেলজিয়াম ব্যতীত অন্য সবদেশ অপেক্ষা পোল্যাণ্ড বেশী বিধ্বস্ত হয়েছিল। প্রায় ২০ লক্ষ ইমারত অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়, ১ কোটী ১০ লক্ষ একর জমি ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে, ৬ লক্ষ একর বনভূমি বিনষ্ট হয়। যুদ্ধ শেষে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে অষ্ট্রো-জার্মান বাহিনী ৭৫০০ সেতু এবং ৯৪০টি রেল ষ্টেশন ধ্বংস করে। অধিবাসীদের দুর্দশা পৌঁচেছিল চরমে। সংখ্যাতীত গৃহহীন ব্যাধিপ্রপীড়িত লোক, বুভুক্ষু শিশুতে সমস্ত দেশ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। কেবল মাত্র অপূর্ব সহনশীলতার গুণে আর কতকটা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে পোলগণ সেবারকার দুর্গত অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল।

দেশের পুনর্গঠনের সমস্যা ছিল অতি দুরূহ। বন্দীদশাতে আইন, সামাজিক বীমা ও সাধারণ-শাসন সম্পর্কিত যে তিনটি বিভিন্ন পন্থা অনুসৃত হত সেগুলির সমন্বয়ের আশু প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এটা বিশেষ কৃতিত্বের বিষয় যে পোল্যাণ্ড যুদ্ধ পরবর্তীকালে নিপুণ কর্মচারীবৃন্দের দ্বারা সুশৃঙ্খল কেন্দ্রীয় শাসন প্রবর্তিত করেছে, দেশময় বিস্তৃত পথঘাট নির্মাণ করেছে, রেল লাইন বসিয়েছে, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফের সুব্যবস্থা করেছে, উন্নত প্রণালীর কারেন্সীর প্রচলন করেছে এবং সর্বোপরি ডাইনিয়ার (Gdynia) বিরাট বন্দর নির্মাণ করেছে। অপটু বলে পোলদের যে দুর্ণাম ছিল তার সম্পূর্ণ অপনোদন তারা করেছে। লয়েড জর্জও আর এখন বিদ্রূপ করে বলতে পারবেন না যে বাঁদড়ের হাতে ঘড়ি দিলে তার যে অবস্থা হবে উত্তর সাইলেসিয়ার (Upper Silesia) ভারও পোলদের হাতে ছেড়ে দিলে তার কোনই ব্যতিক্রম হবে না। বন্দীদশায় পোল্যাণ্ডের অংশত্রয়ে পরস্পরের প্রতি যে বিরুদ্ধ মনোভাবের উদ্ভব হয়েছিল বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় এবং সামরিক আবশ্যিক (Compulsory) শিক্ষার ফলে ক্রমশঃই তা দূর হয়ে যাচ্ছে এবং অভিনব এক জাতীয়তাবোধ তার স্থান অধিকার করেছে।

জাতীয় ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার একটিমাত্র প্রতিবন্ধক হ'ল পোলরাষ্ট্রের মধ্যে ভিন্ন জাতীয়দের বৃহৎ সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অবস্থিতি। মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এরা দখল করে আছে। তন্মধ্যে জার্মান (৭½ লক্ষ), ইহুদি (১৩ লক্ষ) এবং ইউক্রেনিয়ানরা (৫০ লক্ষ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ জার্মানই "জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ" (National Socialism)-এ পূর্ণ সহানুভূতি-সম্পন্ন। তবে তারা সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে রয়েছে, আর তাদের মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই। ইহুদীগণ এদের চাইতেও বেশী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে। পক্ষান্তরে ইউক্রেনিয়ান-গণ দক্ষিণ-পূর্ব পোল্যাণ্ডে সঙ্ঘবদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলরূপে বর্তমান। রাষ্ট্রনীতিক অধিকার সম্বন্ধেও তারা অত্যধিক সচেতন। রুশিয়া, পোল্যাণ্ড এবং রুমানিয়ার ইউক্রেনিয়ানরা আত্মনিয়ন্ত্রণের

অধিকার লাভের জন্য বহু কাল থেকে চেষ্টা করে আসছে। এ জন্যেই অধিক সংখ্যায় ইউক্রেনিয়ানদের পোল্যাণ্ডে অবস্থিতি যুদ্ধের সময় দেশের শক্তিহানির কারণ হ'তে পারে।

গণতন্ত্র বলতে আমেরিকাতে যা বোঝায় পোল্যাণ্ডে তার সাক্ষাৎ পাওয়া ভার, কিন্তু তা বলে স্বৈরতন্ত্রের (totalitarianism) প্রচলনও এখানে নেই। মধ্যপথ-অনুসারী দলই জাতীয় পরিষদে প্রাধান্য লাভ করে থাকে। সমরবিভাগও এদেরই সমর্থন করে। সরকার কখনো কখনো স্বৈরতন্ত্রশাসিত দেশগুলির ন্যায় অন্তরীণ বিধির প্রবর্তন করেছে এবং বিচারকের হুকুমনামা ব্যতীত শান্তি ও শৃঙ্খলাভঙ্গের অজুহাতে লোক গ্রেফতার করে সমাবেশ শিবিরে (concentration camp) বন্দী করে রেখেছে। সরকারী বেতার কেবলমাত্র মন্ত্রীত্ব ভারপ্রাপ্ত দলের সমর্থনকারীরাই ব্যবহার করতে পারে। এ থেকেই বোঝা যায় নাগরিক অধিকারের গণ্ডী সেখানে অতি অপরিসর। তথাপি জাতীয় পরিষদের বাম ও দক্ষিণপন্থী উভয় প্রকার মন্ত্রীত্ব-বিরোধী দলগুলিই সভাসমিতি আহ্বান করে প্রচার কার্য চালনা করে থাকে এবং তাদের পক্ষ থেকে সংবাদপত্রাদিও প্রকাশিত হয়। ইউরোপে পোল্যাণ্ডেই ইহুদীদের সংখ্যা সব চেয়ে বেশী হলেও জার্মেনীর মত কোন ইহুদী-বিরোধী আন্দোলন এখানে নেই।

পোল্যাণ্ড কম্যুনিজম্ ও ফ্যাসিজম্ উভয় মতবাদকেই সমভাবে প্রতিরোধ করে আসছে। দু'দিকে দু'টি বিরাট স্বৈরতন্ত্রশাসিত দেশের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে এর অবস্থা হয়েছে অতি সঙ্গীন। পোলরা স্বভাবতঃই একটু বেশী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যপরায়ণ, এবং এ জন্যেই তারা স্বৈরতন্ত্রবিরোধী। বিশেষতঃ, আয়র্লণ্ড ভিন্ন অন্য কোথাও ক্যাথলিক চার্চের এতটা প্রভাব লক্ষ্য করা যায় না। আর, পোল্যাণ্ডের চার্চের রুশিয়া ও জার্মেনীর চার্চের পথ অনুসরণ করবার মতও কোন লক্ষণ নেই। বৃটেন ও ফরাসী প্রভৃতি শক্তিগুলি যদি পোল্যাণ্ডকে যথোপযুক্ত সাহায্য করে তবে এ তাদের বিরোধী শক্তিদেরও অবশ্যই বাধা দেবে। একাধিক ভাবে ইউরোপের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি পোল্যাণ্ডের হাতে। রুশিয়া ও জার্মেনীর সহিত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ স্থাপনের উপর পোল্যাণ্ডের ভাগ্য নির্ভর করছে। এই শক্তিগুলি যদি কখনো পরস্পরের সহিত সমরে লিপ্ত হয় তবে অনিবার্যরূপে তার প্রেক্ষা হবে পোলভূমি। যে পক্ষই বিজয়ী হোক না কেন পোল-স্বাধীনতা তাতেই ব্যাহত হবে। পোল্যাণ্ড এত দীর্ঘ দিন ধরে রুশিয়া ও জার্মেনীর করতলগত ছিল যে পুনরায় তার ভূমিতে বিজয়ী সেনার অবস্থান তার পক্ষে মোটেই তৃপ্তিকর হবে না। পক্ষান্তরে সমগ্র মধ্য-ইউরোপ এই আশঙ্কা করছে যে অচিরেই রুশিয়া ও জার্মেনীর মধ্যে একটা আপোষ হয়ে যাবে। (এই প্রবন্ধ রচনার পরে রুশ ও জার্মানদের মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি হয়ে গেছে)। ১৮০২ থেকে ১৮৭৯ খৃঃ পর্যন্ত এরা পরস্পরের সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। তাতে দু'পক্ষই লাভবান হয়েছে। এই দুই দেশের অন্তর্শাসন ক্রমশঃই এক পর্যায়ের হয়ে উঠছে বলে মনে করা একেবারে অসঙ্গত নয়। উভয় দেশেরই সমরবিভাগের বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ সন্ধির পক্ষপাতী যাতে করে জার্মেনী রুশিয়ার কাঁচামাল সহজে আহরণ করতে পারবে এবং রুশিয়া শিল্পোন্নতির জন্যে অপরিহার্য বিশেষজ্ঞদের

সহায়তা লাভ করবে। এদের মধ্যে সংগ্রাম ঘটলে যেমন পোল্যাণ্ডের তাতে গুরুতরভাবে জড়িত হয়ে পড়বার নিশ্চিত সম্ভাবনা রয়ে গেছে, পরস্পরের মধ্যে সন্ধিতেও তার কোন ব্যতিক্রম হবে না। কেন না এই সন্ধির ফলে আবার হয়ত পোল্যাণ্ডকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।

এইহেতু পোল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হ'ল রুশিয়া ও জার্মেনীকে একত্র হতে না দেওয়া, এবং এদের যে কারো দ্বারা আক্রান্ত হলে বহিঃশক্তির সহায়তা লাভ করা। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা কতটা অক্ষুণ্ণ থাকবে এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করে তার জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধ করবার দৃঢ়সঙ্কল্পের উপর। পোলরা যদি বিনা সংগ্রামে ডানজিগ, করিডর এবং উত্তর সাইলেসিয়া (Upper Silesia) হস্তচ্যুত হতে দেয় তবে পোলরাষ্ট্রের ধ্বংস অনিবার্য। অন্ততঃ একমাসকালও জার্মান-অভিযানকে ঠেকিয়ে রাখতে পারলে বাহিরের সাহায্য এসে পৌঁছবে এরূপ আশা করা যায়। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কারণে ফরাসী ও বৃটেন চেকোশ্লোভাকিয়ার সুদৃঢ় দুর্গের সমরোপযোগিতা এবং সুদক্ষ চেকবাহিনীর ক্ষমতাকে অস্বীকার করেছে বটে কিন্তু বৃহৎ পোলবাহিনীর প্রতি অনুরূপ অবহেলা তাদের বিশেষ অদূরদর্শিতার পরিচয় বলে গণ্য হবে। এ পর্যন্ত পোল্যাণ্ড জার্মান-আক্রমণের বিরুদ্ধে কখনো রুশিয়ার সাহায্যপ্রার্থী হয় নি। যদিও রুষ এবং পোল উভয়েই বৃহত্তর শ্লাভজাতির অন্তর্ভুক্ত এবং বংশপরম্পরায় জার্মানদ্বেষী কিন্তু মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে কম্যুনিজমের প্রচণ্ড বাধা। পোলদের ভীতি আছে যে রুষেরা একবার কোন গতিকে পোলভূমিতে প্রবেশপথ পেলেই কম্যুনিজমের প্রচারকার্য সুরু হবে। অবশ্য বলশেভিক বিদ্রোহের পূর্বে থেকেই পোল ও রুষদের মধ্যে দারুণ রেষারেষি বর্তমান ছিল। পোলরা মনে করত যে অনেকটা এশিয়া-ভাবাপন্ন রুষের প্রভাব থেকে ইউরোপকে তারাই রক্ষা করবে। তা হলেও জাতীয় স্বার্থের দিক দিয়ে বিবেচনা করে সম্ভবতঃ পোল্যাণ্ড এখন রুশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে অগ্রসর হবে। কারণ পোলদের সামরিক ভাবে সাহায্য করতে ফরাসী কিংবা বৃটেনের অপেক্ষা রুশিয়ার সুবিধা অনেক বেশী।

দেশের ভিতরে ও বাহিরে এ সমস্ত দুরূহ সমস্যা নিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সম্মুখীন হবার সাহস এক পোলজাতিরই আছে। পোলদের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, অতীতের প্রতি মমতা এবং বলিষ্ঠ আদর্শবাদই এদের বাঁচিয়ে রাখবে। আর যদি একান্তই ভাগ্য তাদের প্রতি বিমুখ হয় তবে সুগভীর জাতীয়তাবোধের অনুপ্রেরণায় সঞ্জীবিত হয়ে সকল দুঃখদুর্দশা এরা অতি সহজে বহন করবে।

হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।

স্থবির ঈশান—

বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

ছাড়ো—ছাড়ো পথ ; মিছে দাও বাধা, কেন ডাকো অকারণ ?
তরুণ-হিয়ার জয়-যাত্রার এইত শুভক্ষণ !
এই পথ, এই তিমিরা যামিনী, আকাশ—নিকষ-কালো,
ক্বচিৎ আশার তড়িৎ প্রভার কনক কিরণে আলো ;
এ'রি মাঝে মাঝে যেতে হ'বে নব-জীবনের অভিযানে,
আকাশ মুখর, বাতাস মুখর, তা'রি সে বিজয়-গানে ।

ওই বেজে ওঠে কালের কণ্ঠে দুর্জ্জয় আহ্বান—
বাজে তরুণের চির আগমনী, চিরন্তনীর গান,
শোনো না কি ওই, বন্ধু, গগনে বজ্রের গুরু গুরু
প্রলয় প্রদোষে যুগ-দেবতার যাত্রা যে হ'ল সুরু,
তা'রি সাথে সাথে যেতে হ'বে নব-জীবনের অভিযানে,
আকাশ মুখর, বাতাস মুখর, তা'রি সে বিজয় গানে ।

ওই ঘুরে যায় কালের চক্র—ঘর্ঘর, ঘর্ঘর ;
লুটাইয়া পড়ে জীর্ণ জগৎ তুলিয়া আর্ত্ত স্বর,
ধূলি হ'য়ে ওড়ে অতীত জীবন, ঝঙ্কার লাগে দোল,
প্রলয়-সিন্ধু মথিয়া জাগিছে সৃজনের কলরোল ;
এ'রি মাঝে মাঝে যেতে হ'বে নব-জীবনের অভিযানে,
আকাশ মুখর, বাতাস মুখর, তা'রি সে বিজয়-গানে ।

তুমি কে হেথায় শীর্ণ, স্থবির, আছ আগলিয়া পথ ?
বৃথা ক্রন্দনে রোধিবারে চাও বিশ্ব-দেবের রথ ?
নয়ন-সলিলে নিবাইতে চাও দুর্জ্জয় দাবানল ?......
ওই ডাকে মহা-প্রলয়-সিন্ধু কল্ কল্ ছল্ ছল্ ;
তা'রি মাঝখানে যেতে হ'বে নব-জীবনের অভিযানে,
আকাশ মুখর, বাতাস মুখর, তা'রি সে বিজয়-গানে ।

তুমি কে ?—ঈশান ?—স্থবির ঈশান ?—জীর্ণ এ কঙ্কাল ?
কোথায় তোমার প্রলয়-বিষাণ ?—বিদ্যুজ্জটাজাল ?
কোথায় ডমরু ? কোথায় ত্রিশূল ? ফণী কোথা জটাভারে ?—
ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ ললাট-বহ্নি নিভে গেছে একেবারে ?
জানো না বন্ধু, যেতে হ'বে নব-জীবনের অভিযানে ?—
আকাশ মুখর, বাতাস মুখর, তা'রি সে বিজয়-গানে !

তাণ্ডব—সে কি ভুলে গেছ আজি ? ওগো ভিক্ষুক ভোলা !
স্কন্ধে তোমার কে দিল ঝুলায়ে ভিক্ষার ঝুলি-ঝোলা ?
ত্রিশূল কাড়িয়া কে দিয়েছে করে দণ্ড-আলম্বন ?
আপনারে আজি চিনিতে পারো না ?—বিধির বিড়ম্বন !
তবু যে বন্ধু, যেতে হবে নব-জীবনের অভিযানে,
আকাশ মুখর, বাতাস মুখর, তা'রি সে বিজয়-গানে।

হে ঈশান ! ওগো স্থবির ঈশান ! কোরোনা কোরোনা মানা ;
অন্ধকারের দুর্গ-দুয়ারে দিতে হ'বে আজি হানা,
মৃত্যুর মুখে দেখে নিতে হবে অমৃত-লোকের হাসি,
ধ্বংসের গানে শুনে নিতে হ'বে সৃজন দিনের বাঁশি ;
আর তা'রি মাঝে যেতে হ'বে নব-জীবনের অভিযানে,
আকাশ মুখর, বাতাস মুখর, তা'রি সে বিজয়-গানে !

তুমি সরে' যাও, তোমারে চাহিনা—পঙ্গু, জীর্ণ, জড় !
চাহি প্রলয়ের প্রাণের মাতন্, জীবন-জাগানো ঝড় !......
তবু ছাড়িবে না ? তবে উঠে এস, ছুটে এস আরবার,
ত্রিশূলের তেজে জ্বলিয়া উঠুক্ পথেরি অন্ধকার ;
তা'রি মাঝে চল তরুণের সাথে জীবনের অভিযানে,
আকাশ মুখর, বাতাস মুখর ; তা'রি সে বিজয়-গানে।

জানি জানি সখা, তুমি নহ জড়—মিথ্যা ও জরাভারে
কোন্ কুহকীর কুহক-মন্ত্রে ভুলে গেছ আপনারে ?......

হয়ত এখনো জ্বলিছে বহ্নি ভস্ম-প্রলেপ তলে,
হয়ত এখনো লুকানো বজ্র খুঁজে পথ মেঘ-দলে !
জানি, তোমারেও যেতে হ'বে নব-জীবনের অভিযানে,
আকাশ মুখর, বাতাস মুখর ; তা'রি সে বিজয় গানে।

স্থবির—তরুণ ! বল, ভোলো নাই অরুণ-আলোর গান,
নব-জীবনের প্রণব-মন্ত্র, নূতনের আহ্বান্—
তা'র পরে এস—এ মহা-যাগের তুমি চির-ঋত্বিক—
স্থবির ঈশান ! বাজাও বিষাণ কাঁপায়ে দিগ্বিদিক্ ;
ওই জাগে আলো—যেতে হবে নব-জীবনের অভিযানে,
আকাশ মুখর, বাতাস মুখর ; তা'রি সে বিজয়-গানে।

তে-মাথার মোড়ে যে জলের কলটি—

ক্ষিতীন মিত্র
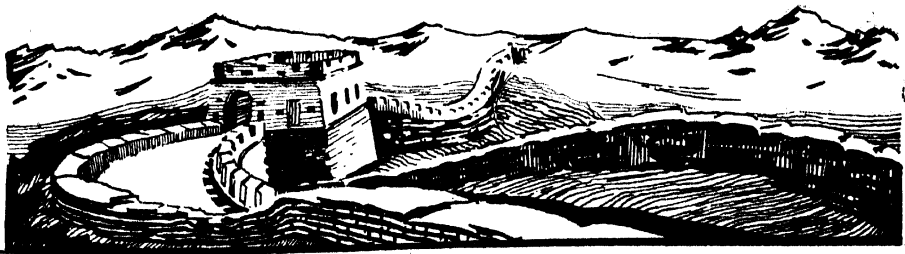
লণ্ডন-ভিলা রোড আমাদের বিশেষ পরিচিত। আগাছা-বেছে-ফেলা নির্মল ঘাসের সবুজে ফুটপাথগুলা বিস্তৃত পরিসর রাস্তাটি—ত্ব' পাশে সার বাঁধিয়া দাঁড়ান, একই দর্জির হাতে ছাটাই করা অনুরূপ নমুনার কোটের মত এক ছাঁচের পাকা কুটিরগুলি, মাথায় লাল টালির ইউনিফরম হ্যাট্; রঙীন ছবির মত দেশী-বিলিতি হরেক রকম ফোটা-ফুলের মস্ত বাগানের মাঝখানে অল্প জায়গায় কয়েকটি মাত্র বড় ঘর, পরিবারের লোক খুব কম, আর্দালি, বাবুর্চি, দরোয়ান, মালী, আয়া, কেরাণী, প্রাইভেট টিউটার, প্রাইভেট সেক্রেটারী এসবের ভিড় বেশী; দিনের বেলায় বাড়ীগুলি পক্ষীহীন নীড়ের মত নিষ্প্রাণ পড়িয়া রহিলেও, বিকাল পড়িতেই প্রচণ্ড জাগরণের সাড়া পাওয়া যায়—রেডিও, অর্গেন, পিয়ানো, বেহালা, গিটার, বেঞ্জো, বলনাচ, মোটর হর্ণ—এদের উল্লাস-কোলাহল, সৌখীন রঙ্গমঞ্চের আবহ—অর্কেষ্টার মতো সাড়া দিয়া ওঠে; এই উপভোগের মুহূর্তকে আরো সরস করিয়া তোলে –চা, কফি, টোষ্ট্, রোষ্ট্, বিয়ার, হুইস্কি –ইত্যাদির আকণ্ঠ পরিবেশন।...

এই আলোকিত বিশ্বের নিবিড়-কালো ছায়াতলে শ্লথ-শিথি জগত ম্রিয়মান পড়িয়া থাকিয়া ম্লানিমার মসী বিন্দুতে ওর সীমান্তরেখা আঁকিয়াছে। সর্বস্বান্তদের দেশ—দীর্ঘ দোচালার তলে গৃহ-শাবকগুলি ঠাসাঠাসি করিয়া মাথা গুঁজিয়া আছে; পথের বাঁধান নর্দমা কাঁচা নালায় পরিণত হইয়াছে—ফুলের গন্ধ পচা হুর্গন্ধে পথ হারাইয়াছে, স্ফূর্তির স্পন্দন কোলাহল আত্মপ্রকাশ করিয়াছে নরক গুল্‌জারে।

এই স্থানটির সংস্পর্শে আসিয়া জাঁকালো পথটি দোমনা মনের মত সেখানে হুদিকে আগাইয়া চলিয়াছে ক্ষীণ উদ্দীপনায়, সেই তে-মাথার মোড়ে দাঁড়ান, একটি গা-থেৎলান জলের কল—অভাবনীয় উপেক্ষায় যার পিছনে গা ঢাকিয়া আছে কত লোকের সুখ ছুঃখের ইতিহাস, কেহ জানে—কেহ জানে না।

সৃষ্টির প্রথম রেখাপাতে শিল্পীর ব্যঙ্গ।—কলা-কুশলী অঙ্গুলি স্পর্শে কলটিতো সিংহ মুখশ্রীই লাভ করিয়াছে, কিন্তু এক-কাণের পরিহাসে সে জর্জরিত।

নীচের দিকে শিল্পী কোথাও সৃজনের প্রয়াস পান নাই। কলের আকণ্ঠ-দেহ পুরু লোহার থামের মত খাড়া হইয়া আছে। অসমাপ্ত সৃষ্টিকে যেন তিনি কোনমতেই পরিপূর্ণতার দিকে বহিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হইলেন না। সুন্দরের উপাসক তিনি, দারিদ্র্যের ছায়াতলেও সুন্দরকে সুন্দরতররূপে প্রকাশিত দেখিয়াছেন, কিন্তু পঙ্কিলতার যে গভীর আবর্তে পা আট্‌কাইয়া পড়ায় মানবতা হীন পৈশাচিকতায় রূপান্তরিত, সেই ঘোর তমিস্রার উৎকট বিভীষিকায় তার অনুভূতি

স্তব্ধ—সৃজন প্রবৃত্তি নিষ্ক্রিয়। যে দুঃখের পিছনে বিরাজিত অনন্ত দুঃখ, মানুষের সকল কর্মোদ্দীপনা সেখানে পথ-বিভ্রান্ত।—নির্য্যাতিতের অসীম বেদনার দম্-আটকান করুণ নিঃশ্বাস, বুঝি শিল্পীর বুকে আলোড়ন তুলিয়াছিল।

প্রতিবেশীর অন্যায় আব্দারে কলটির দুর্দশা।

এই সম্পদটুকু লইয়া কাড়াকাড়ি—মাংস খণ্ড নিজস্ব করিবার প্রলোভনে কুকুরেরা যেমন দ্বন্দ্ব করিয়া মরে। ঝগড়া করে, এরা জের টানিতে হয় বেচারা কলের। যখন ইট-বৃষ্টি সুরু হয়, কলটি মোটেই রেহাই পায় না—গায়ের কত জায়গা থেৎলাইয়া যায়। পরে, পথের গুলিবারুদ ফুরাইয়া আসিবে, সকলের চোখ পড়ে এর বাঁধান পাদানির উপর। পাদানি ভাঙিয়া চুরিয়া রণ-চালনা করিয়া যায়, এতটুকু যদি কলের প্রতি কৃতজ্ঞতা থাকে! বোবাকল কাদাটে জলে বাণ-ভাসি ঘরের মত বিষাদে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

এদের ঝগড়ার সময়টি কাটাইয়া উঠিতে পারিলেও কলের নিস্তার নাই। পুরু-ধারায় জল পাইবার জন্য লোকেরা ওর কাণ ধরিয়া কি ঝাঁকুনি-ই না দেয়। তার ফলে কাণটির জোড়ায় কি হইয়াছে, সব সময় এটা খট্খট্ করিয়া নড়ে। অনেক সময় দেখা যায়, ঐ ঢিলা কাণটির উপরে হঠাৎ জোর আঘাত লাগিয়া, কল বিকল হইয়া গিয়াছে—জল পড়া বন্ধ। সে কি বিপদ! ঝগড়ায় আর ঝাঁকুনিতে তখন কি চাল ভিজে? একান্ত নিরাশ্রিতের মত কর্পোরেশান বাবুর আসা যাওয়ার পথের দিকে অনিমেষ নয়নে চাহিয়া থাকিতে হয়।

এইত গেল দুঃসময়ের কথা। কলে যখন বিস্তর জল, হতভাগ্যগুলির তখন হাত দিয়া কাণ ঠেলিয়া রাখিবার মত ধৈর্য্যের অভাব হইয়া পড়ে। যাতে হাত না দিয়াই অনবরত জল পাওয়া যায়, সেই মতলবে কাণের ভিতর দিয়া আন্দাজ মত একটা বাঁশের কঞ্চি আঁটিয়া লয়, এতে কাণের দফা-রফা হোক এদের পরোয়া নাই।

কলটি প্রতিবেশীর জন্য ভাণ্ডার মুক্ত করিয়া আছে, একেবারে নিঃশেষ না হওয়া অবধি, সে নিজেকে বিলাইয়া দেয়। বস্তির লোকগুলিও একে পাইয়া বসিয়াছে, একান্ত আপনার করিয়া, কিন্তু এর ভাণ্ডারের দাম আর কতটুকু! যদি এমনিভাবে একটিবার এরা দলবাঁধা পুঁজিওয়ালা মানুষগুলির কাছে অভাবের দাবী পেশ করিয়া ফেলিতে পারিত হয়ত কিছু লাভের আশা থাকিত! কিন্তু—এরা ঐ মানুষগুলিকে যেন ডরায়, মরে তবু মুখ খোলে না।...

কাকের ঘুম-ভাঙানো ডাকে দিনের প্রথম আলোয় নিদ্রার জড়তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া কাজের স্বচ্ছ জোয়ারের জলে ডিঙি ভাসাইয়া চলিয়াছিলাম—দুপুর বেলা প্রবল তৃষ্ণার্ত ক্লান্ত-রোদের সাগর শুষি চুমুকে এখন সেটি ভাটির টানে ঘরমুখো ভিড়িতেছে।

পথের উপরকার মানুষের বোঝা এখন হাল্কা। কর্ম-তৎপর জনতার ভার অসীম আগ্রহে পুনরায় বুকে টানিয়া লইবার জন্য যে নব-সঞ্জীবনের আয়োজন, এই ঝাঁকে আয়েসের মধ্য দিয়া তা' আহরণ করিবার জন্য, তার কী বিপুল প্রয়াস! চলার পথটির চোখে-মুখে নিঝুম তন্দ্রালুতা।

তার নিশ্চিন্ত সুপ্তিকে নিঃশেষ করিয়া লইল, মোড়ের কল-ঘেরা ঐ একদল মানুষের জট্‌লা-পাকানো। কি কাণ্ড বাঁধাইয়াছে কে জানে, তবে এই সময় কলের গোড়ায় মানুষের ভিড় হওয়া, তেমন আশ্চর্যের কিছুই ছিল না। মুটে মজুরের আড্ডা, ওদের তো আর আফিসের রুটিন্ নাই, যদি দুটি জুটিল তো ঐখানে বসিয়াই যাহোক্ গল্প গুজব করিবে,—ইতিমধ্যে দু এক পশ্‌লা ঝগড়া হইয়া যাইতেই বা কতক্ষণ! গায়ে রক্ত-মাংস থাক বা না থাক, মেজাজ আছে তো? একটী লঙ্কাকাণ্ড বাঁধাইতে অসুবিধা কোথায়?

তথাপি, দু'টো লাল পাগড়ী চোখে পড়িতেই, যেন একটু মুষ্‌ড়াইয়া গেলাম। পরিস্থিতি যে গুরুতর হইবে তাতে আর সন্দেহ রহিল না।

কলের কাছে পৌঁছিতেই লক্ষ্য করিলাম, এতগুলি লোক কিসের দিকে আটাস্ হইয়া চাহিয়া আছে। মুখে রা অল্প—চোখে জড়ান আহত মনের গভীর বেদনার ম্লান ছায়া। কারো কারো মুখে একান্ত আপশোষের রকমারি বাণী। মনে হইল, আমরা সহজে কর্তব্যবোধকে হারাইয়া ফেলিয়া কর্তব্য কাজ এড়াইয়া চলি, কিন্তু আমাদের ভাবপ্রবণতায় পাইয়া বসিলে গলিয়া জল হইয়া যাই। পরোক্ষভাবে মানুষকে সর্বস্বান্ত করিতে কুণ্ঠা নাই, অথচ মানুষের গায়ে রক্ত বিন্দু দেখিলে আমরা বিগলিত হইয়া পড়ি।

এ-যে মানুষেরই গায়ের টাট্‌কা রক্ত! কলটির পাদানীর উপরে প্রতিদিন যে কাদাটে জল জমিয়া থাকে আজ তা' কাল্‌চে লাল রং ধরিয়াছে। আমার সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। কে জানে কার সর্বনাশ হইয়াছে! কাকে কি যেন জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলাম, কণ্ঠস্বর গলায় ঠেকিয়া রহিল। আশে পাশে যে লোকগুলি কথা বলাবলি করিতেছিল, তাদের কথায় জানিলাম—বস্তির বাসিন্দা এক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কি লইয়া একটা ঝগড়া বাধিয়াছিল, বিষয়টি ছিল নাকি অতি তুচ্ছ। এখন কলহের পরিণাম খুবই ভয়ঙ্কর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বৌটিকে অজ্ঞান অবস্থায় হাঁসপাতালে পাঠান হইয়াছে, আসামী এখনো ধরা পড়ে নাই, কোথায় সে লুকাইয়া আছে।

স্তম্ভিত হইবার কিছু ছিল না, বরঞ্চ মাঝে মাঝে এরূপ একটা কিছু না হওয়াই আশ্চর্যের বিষয়।

অবসাদগ্রস্ত মনটি লইয়া এখানে আর ক্ষণকালও অপেক্ষা করিলাম না। বড় কষ্ট হইল ভাবিয়া যে, যারা সমস্ত প্রাণ দিয়া শুধু একটু শান্তির কামনা করে, নির্ঝঞ্ঝাটে দুটি খাবার পেটে পড়িলে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া খাটিবে, কথাটি বলিবে না, বরং গালি হজম করিয়া যাইবে তবুও প্রতিবাদ তুলিবে না, গাছের নীচে পাখীর মত খড় কুটার ঘর বাঁধিয়া বসবাস করিবে, অথচ সহজে কোন কিছু লইয়া বিদ্রোহ করিয়া বসিবে না—শান্তির এত কাঙাল যারা, অকারণে কেবল নির্বুদ্ধিতার ফলে তাদের জীবন কিভাবে অব্যক্ত অশান্তির নিলয় হইয়া ওঠে!

পথ চলি আর মনে মনে ভাবি, কি অদ্ভুত এই মানুষগুলি, কি বিচিত্র এদের জীবন যাত্রার

প্রণালী ! আমাদের দিন চলার সাথে যেন ওদের জীবন যাপনের কোনই সাদৃশ্য নাই। আমাদের রাজ্যে বায়ুকোণের কালো মেঘ হইতে ঝড় নামে। ওদের দেশে প্রকৃতি বে-আইনী চলে, হিসাব করিয়া কিছু বুঝিবার যো নাই। হেমন্তের শান্ত আসরে বৈশাখের রুদ্র-নৃত্য কখন কিভাবে জাগিয়ে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে এরূপ অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়া বসে যার কারণ হয়ত একেবারেই অকিঞ্চিতকর।

এইতো ভোরের বেলা, কাজে বাহির হইবার সময় এই বস্তির শিব মূর্তি চাক্ষুষ করিয়া গিয়াছি। বস্তিটি সুনিবিড় শান্তিময় নীড়ের মত সকালের কাজকর্মে নীরবে প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিল।...

সমুখে আবর্জনার স্তূপ লইয়া, ঐ টিনের-ছাউনী কাঁচা বাড়ীটি আপন মনে পড়িয়াছিল। একদিকে এঁটো-কাঁটা, পাশে ছেলে-পিলেদের ময়লা ; নর্দমার এক পাশে ইট-পাথরগুলি কাদায় বসিয়া গিয়া মূত্র জমাট করিয়া রাখিয়াছে ; হাড়গিলে পাগল কুকুরটা কি ছাইভস্ম গিলিয়া ফেলিয়াছিল এখন বমি করিয়া কূল কিনারা পায় না ; অদূরে মরা বিড়ালটি পচিয়া গিয়া বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়াইতেছে।—এরই গা-ঘেসা ঘরগুলিতে পরম নির্লিপ্ততায় গল্পগুজব, খেলাধূলা, হাসি তামাসা চলিতেছে। হাত চারেক দূরে ঐ কলের চারদিক জুড়িয়া যেন জনসাধারণের কিসের পরিষদ বসিয়াছে।

আবহাওয়ায় বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নাই। সমবেত জনগণ সত্যমিথ্যা দূর-নিকট সম্পর্কে আবদ্ধ ; দাদা, দিদি, মাসি, পিসি, জামাই—মুখে মুখে এসব সম্বোধন খই ফুটিতেছে। অবস্থা দেখিয়া মনে প্রশ্ন জাগিয়া উঠিয়াছিল, বাঙালীদের মধ্যে একতা নাই, এরূপ একটি অমূলক অভিমত কেমন করিয়া মানুষের মুখ দিয়া বাহির হইতে পারে ?

একটি উড়ে বামুন কলের কাণ টিপিয়া ধরিয়া কলসীতে জল ভরিতেছে। চাতকের দল চারিদিক ঘিরিয়া গল্পগুজবে জলের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

এদের মধ্যে সুধু যে বিভিন্ন প্রদেশের লোক আছে তা নয়—একাধারে নারী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, সুস্থ-অসুস্থ, গরীব-অতিগরীব সকল ধাঁচের লোকই বর্তমান।

বসিবার কতো রকম আসন। যাদের তবিলে পিতলের কলসী, লোহার বালতী বা বড় টিন আছে, ঐগুলি উল্টাইয়া লইয়া তারা দিব্যি গ্যাঁট লইয়া বসিয়াছে। আসনের অভাব হইল তাদের, মাটির কলসী, বাটি, বা ছোট টিনের কৌটো ছাড়া যাদের আর কোন সম্বল ছিল না। অবশ্য, ফুটপাথ্ থাকিতে তাদেরকেও দাঁড়াইয়া থাকিবার ক্লেশ ভোগ করিতে হয় নাই।

আমাদের চোখে এদের স্থান যেখানেই হোক না কেন, এরা নিজেদের কিন্তু কখনো কম-জান্তা বলিয়া ভাবিতে পারে না। তা' ভাববেই বা কোন্‌দুঃখে, যে আকারেই হোক্ সংবাদ তো এরা কম সরবরাহ করেনা। সময়ের অল্প পরিসরের মধ্যে ওদের যে আলাপটুকু শুনিলাম, তাতে যাবতীয় বিশিষ্ট খবরের মধ্যে কোনটা বাদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইল না।

কোমর অবধি নুইয়া-পড়া দেহ জনসাধারণের বুড়ী-পিসি প্রথম আলাপ সুরু করে—ডাঁটা চচ্চরিতে চিংড়ি দিস্‌নি লা, ইলিস যা' সস্তা, দুটো কাঁটা ফেলে দিলে দিব্যি খাসা হয়ে যায়! ...কি বলছিস্ লা জামাই ?

বস্তির সকলে লোকটিকে জামাই বলিয়াই জানে। সে সুধু প্রাচীন নয়, এই মহলে তার যথেষ্ট বিক্রম আছে। সে বিশেষজ্ঞের মত উত্তর দিল—যা' বলেছ পিসি। ...ইলিস কে খায় এতো উঠেছে।...ওদিকে গাঁজার দর যা' চড়া দেখছি আমাদের চক্কোত্তি এবার না দুঃখে মরে যায়।...আহা, বেচারী! বড্ড ভাল মানুষ, একটান্ ধোঁয়া মারল তো মেজাজ একদম খোস্।, ...কি বলিস্ হ্যালা ?

নন্দকিশোর অনেকদিন হইল এই সম্পর্কটি স্বীকার করিয়া লইয়াছিল, কারণ সে সময়মত ঘর ভাড়ার টাকা দুটি যোগাড় করিয়া উঠিতে পারেনা। বিপদের সময় তার যে একমাত্র জামাই ভরসা।

সে জামাইয়ের প্রস্তাবটি বিশেষভাবে সমর্থন করিয়া বলিল,—নেশ্চয়! চক্কোত্তি বড্ড ভালো, আর তার চেয়ে বেশী ভালো আমাদের জামাই। হে—হে।...

জনমণ্ডলীর অপর প্রান্ত হইতে কে জোরে হাঁকিয়া উঠিল—জামাই...শুনছ ভাই!...কাগজে দেখলুম, যুদ্ধ একটা বাঁধবেই...আর জানো, লিখেছে...গান্ধীজি আদতে লোকটি ভাল নয়। বুড়ো, কংগ্রেসটাকে নাকি ডুবালো। ও ব্বাবা, বুড়োর পেটে এত প্যাঁচ।...

এদের সকলের যৌথ সম্পদ বস্তির মাসীটি এতক্ষণ এখানে উপস্থিত ছিল না। ইতিমধ্যে কি প্রয়োজনে কোথা হইতে উর্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া অশ্লীল ভাষায় চোখ পাকাইয়া গর্জন করিতে লাগিল—কার পেটে-ই বা প্যাঁচ্ কম দেখলে বাপু?...ফুলিটা না বড্ড সাধু?...বলি, কাল রাত্তিরে যে কেলেঙ্কারীটা করলে...

উদগ্রীব জনতা বিস্ময়ে সোরগোল করিয়া উঠিল—কেলেঙ্কারী? কই জানিনাত?

—তা' জান্‌বি কেনে? ওতো আর তোদের ক্ষেতি নয়?...পালিয়েছে, বেঁচেছি, মরুকগে হতচ্ছাড়ি বেটি।...বলি আমায় মারলি কেনে? দু'এক মাস নয় তিন মাসের ঘর ভাড়া বাকী।... তোদের বলছি, সাবধান! ঘর ভাড়া আমি ফেলে রাখতে পারব না। হাঁ, দিন দু'য়ের মধ্যে সব পরিষ্কার চাই। তখন আর মাসি-মাসি চলবে না জানিস্।

মাসী ঘাড় দোলাইতে দোলাইতে হন্ হন্ করিয়া চলিয়া যাইতেই, পিয়ারী বলিয়া উঠিল—লক্ষ্মী বেটি হামাদের লছ্‌মী।...উ বেচারী না খেয়ে মরবে। ...হাঁ।

কালু মুচি এই কথা প্রসঙ্গে যোগ দিয়া বলিতে লাগিল—লছমির বেটা ধর্মঘট করেছে সে'ত মাসেক হতে চলল।...চালের দাম বাড়ছে, ওদিকে বাবুরা মজুরী কমাচ্ছে। ওরা সব্বাই বল্লে, সাহেব, আমরা পেটভরে খেতে পাইনে। সাহেব মুখে বল্লে, দেখবো'খন, কাজে কিন্তু সেই-সেই।...

পিয়ারী কথার মাঝখানে বলিতে লাগিল—কি হোবে এসব করে। নকড়ি না মিলেতো হামাদের মরতে হোবে। কেষণ, রোমেশ এরা ঘরে বসে আছে। এখোন খাবে কি ওরা ?

এই বস্তির অনেকেই ধর্মঘটে বিপদগ্রস্থ। সপ্তাহের রোজগারে সপ্তাহটি যাদের কোনমতে চলে, আজ একটি মাস তাদের যে কিভাবে কাটিতেছে, সে বিষয় সামান্য তলাইয়া দেখিতে গিয়া জনতা করুণ বিষাদে ডুবিয়া গেল।

এই ম্লানিমাটুকুর স্থান জুড়িয়া বসিল দারুণ বিপদের আশঙ্কা।—মোটর বাইকের ফট্ ফট্ শব্দ। এদিকেই আসিতেছে। ভূ-কম্পের হাল্‌কা ধাক্কার পর মূহ্যমান জনতা পরবর্তী মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এরা যা আশঙ্কা করিয়াছিল, তাই হইল। ঐ খাগি কোট-প্যাণ্ট পরনে, কাঁধে পিতলের ইংরাজী অক্ষর ফিট্ করা অফিসার বাবুটি। আবার একটা ফাঁদে পড়িতে না হয়! ভয় এদের লাগিয়াই থাকে, অন্যায় কিছু করিয়া বসিয়াছে তার জন্য নয়, নীতিবোধ এদের খুবই কম। শাস্তি পাইবার একটা কল্পিত আশঙ্কা বুক কাঁপাইয়া তোলে।

জনতার মুখে শব্দটি নাই, বাড়ী ভাড়ার জোর তাগিদ, রাজনীতিক আলোচনা, ধর্মঘট আন্দোলনের ভাল-মন্দ হিসাব—এসব অবান্তর কাজগুলি ছুটিয়া পলাইবার পথ পায় না। এখন ভালোয় ভালোয় এই আগন্তুকটিকে বিদায় করিতে পারিলেই বাঁচা যায়।

অন্ধ জগতের এক-চক্ষু জামাইটি একটি ঢোক গিলিয়া, লইয়া বলিল—নমস্কার, কর্পোরেসান বাবু।

অফিসারটি পকেট হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া লইয়া, তার দিকে দৃষ্টি ফেলিয়া গম্ভীর স্বরে সহজ বাংলায় বক্তব্য বিষয় বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আমাদের অফিসে নালিশ এয়েচে, এই বস্তিতে নাকি কয়েকটি খারাপ মেয়ে মানুষ বাস করে।...

সকলের মধ্যে একটা সকাতর চোখ-চাওয়া ও ফিস্-ফিস্ আলাপ সুরু হইল। সন্ত্রাসে কেউ গলার আওয়াজ বাহির করে না। দোষ হয়ত এদের আছে, কিন্তু অধিকাংশ সময় দোষ না করিয়াই শাস্তি পায় বেশী। এরা কলম লইয়া যুদ্ধ করিতে পারেনা, টাকার মোহেও লোককে বসে আনিতে পারে না, তাই দোষ করিয়া সরিয়া পড়াত দূরের কথা, লোকের চোখে অকারণে সন্দেহের কারণ হইয়া কত ভাবে মারা পড়ে। এদের যে মাথা নাই!

আর যা-ই হোক মাসীটি সহজে বিচলিত হইবার পাত্রী ছিল না। সে আস্‌মান হইতে পড়িয়া বলিল—হুজুর, যত সব ঘেন্নার কথা। আপনি কাণে ধরবেন না। আমি এক লাগাত্ বিশ বছর এখানে বাস কত্তিছি, এমন কেলেঙ্কারীর কথাতো শুনিনি গো ?

—শোন আর নাই শোন, একথা রিপোর্ট হয়েছে।...আর শোন, ঐ মেয়েদের অশ্লীল কথা-বার্তা আর কুৎসিৎ চলাফেরায় ভদ্দর লোকদের টেকা দায় হয়ে উঠেছে।...

এবার পিসিটি একটু আগাইয়া কাঁদ কাঁদ সুরে বলিতে লাগিল—আমরা কার ঘরে সিঁধ কেটেছি লা ?...ছিঃ ছিঃ আমাদের এত তুন্নাম দিল কে লা ?...তোদের কি মরণ নেই লা...

—চুপ্ এখন সব্বাইকে বল্‌ছি।—সাবধান, যদি ফের এমনি রিপোর্ট পাই হাতকড়া লাগিয়ে টেনে নিয়ে যাব।

নিকটে একজন ভদ্রবেশী লোক দাঁড়ান ছিলেন। অফিসারটি তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি নিশ্চয় এখানকার বাসিন্দে ?

—Sir, বস্তির ওপাশের দোতালা বাড়ীটি আমার।

—বেশ, তা আপনি কি করেন ?

—Retired Corporation, Sir,

—Oh, I see....

অফিসারটি হাসি চাপিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—দেখুন, আপনার চক্ষে কখন পড়েছে কী ?

—Sir...not sir...ওদিক্ কি আর তাকাই ?

—Good.

আপন মনে হাসিতে হাসিতে অফিসারটি চলিয়া গেলেন।

মোটর সাইকেলটি অদৃশ্য হইতেই পূর্ব কোলাহল জাগিয়া উঠিল। ভদ্রবেশী লোকটি বাদশাহী মেজাজে বলিয়া উঠিলেন—দেখলে, এবার তোমাদের spare করলুম কি না ?

জামাই বুদ্ধির তারিফ করিয়া বলিল, নিশ্চয়। এখন থেকে দাদাকে সব্বাই খুড়ো বলে ডাক্‌বো।

একটা হাসির ছোটখাট ঝড় বহিয়া গেল। তারপর রাইচাঁদ বুকটানিয়া চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিল—জান্‌লে খুড়ো, ও ছালা যেন ছাইকেলের ছিটে বসেনি, ছমরাটের ছিংহাছনে বছেচে।...যতছব...

মাসী উত্তর দিল—মাথা তুলে বড় যে বকছিস্। এতক্ষণ ছিলি কোন ধামার তলে ?

নবীন ময়রা বলিয়া বসে—মাসি, রাইচাঁদটা একেবারে হপ্‌লেস। এ্যা, কি বল ?

এরই মধ্যে কালু মুচি গর্জন করিয়া ওঠে—বদমাইসের দাদা হলগে ঐ কানাই ছালা। ছালা দিনরাত বাইরে বাইরে বন্ধুত্ব দেখাবে আমাদের ছাথে, আর ভিত্‌রে ভিত্‌রে রিপোর্ট করবে ছই আচ্ছা ধুরন্দরতো বাবা তুমি ছালা ?

জামাই বিচার করিয়া বলিল—যা বলেছিস্, চল্ ওকে এক্ষুণি শিক্ষা দিয়ে ছাড়বো।

বলিতে বলিতে একদল লোক বোধহয় কানাইয়ের বাড়ীর দিকেই ছুটিয়া গেল। ওকে বিভীষণ-গিরির পুরস্কার না দিয়া কিছুতেই এরা 'ছাড়বে না।

কানাইয়ের অবস্থা দেখিবার আকাঙ্খা থাকিলেও, সময় ছিল না, কারণ ভোরের বেলা বিশেষ কাজেই ছুটিয়া যাইতেছিলাম। হাত ঘড়ির দিকে তাকাইয়া দেখি, এতটা দেরী করিয়া ফেলিয়াছি যে নিজের অবস্থাই আশঙ্কাজনক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।....

ভোরের অভিজ্ঞতাটুকু ভাবিতে ভাবিতে ভাবিতে ভারি মনে বাড়ী গিয়া পৌছিলাম।

স্নানের পর খাইতে বসিয়া স্ত্রীর মুখে ঐ ঘটনার পূর্বাপর সকল বৃত্তান্ত বিশেষভাবে শুনিতে লাগিলাম।

লছমি মেয়েটা আমার চেনা শুধু নয়, বিশেষ প্রিয়। ওর স্বামী কিষণকেও ভাল বলিয়াই জানি। ওরা মিলেছে বেশ—যেমন দেবা, তেমনি দেবী। ওদের মধ্যে এরূপ একটা জঘন্য ব্যাপার আমরা কল্পনায়ও আনিতে পারিনা।...

কারখানায় একটি স্থায়ী চাকুরীতে ভর্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কিষণ নাকি গাঁজার ধোঁয়া টানিতে শিখে। যদিও লছমি মা-বাপের মত আমাদের দেখে, সকল সুখ দুঃখের কথা বলে, স্বামীর কু-অভ্যাসের কথাটি লুকাইয়া রাখিবার মত দুর্বলতা ওর ছিল। পাছে আমরা কিষণকে কড়া শাসন করি এবং তা'তে ওদের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়, এই ভয়ে সে সর্বদা সঙ্কুচিত থাকিত।

যাহোক দিনগুলি ভাল-ই কাটিয়া যাইতেছিল।

মাসখানেক হইল কিষণদের কারখানায় ধর্মঘট চলিতেছে। প্রথম যেদিন ওর গাঁজার খরচে টান পড়ে সেদিন কি একটা সামান্য বিষয় লইয়া এক ঝলক ঝগড়া হইয়া যায়। লছমি এতটা ভয় পাইয়াছে যে, সে আর কোন বিষয় লইয়া স্বামীকে কথা শুনায় না। গরীব হইতে পারে কিন্তু স্বামীকে সে স্বামীর মত করিয়াই দেখিয়াছে। নিজেদের মধ্যে কোনকালে বিচ্ছেদ আসিতে পারে সে কিন্তু তা ধারণাই আনিতে পারে না। তার হিসাবে, কিষণকে হারাইয়া লছমির বাঁচিবার কোন অর্থ হয় না; সন্তানহীন নারী—ফল-ফুলহীন গাছের মত। তার অস্ফুট যৌবন মাতৃত্বের আকাঙ্খায় প্রলুব্ধ হইয়া রহিয়াছে। সে পূর্ণতা লাভের আশাটুকু নির্মূল হইয়া গেলে সে কি বাঁচিবে?

তাইতো সে স্বামীকে সর্বদা পরিতুষ্ট রাখিবার জন্য এত উদ্বিগ্ন। এই একটি মাস সে পরিচিত বাবুদের বাড়ী-বাড়ী ভিক্ষার মালা হাতে করিয়া গোপনে ঘুরিয়া মরিয়াছে। যা' কিছু জুটিয়াছে, তা' দিয়া সকলের আগে বেশী করিয়া গাঁজা কিনিয়া রাখিয়াছে, তারপর স্বামীর জন্য ভাতের ব্যবস্থা করিয়াছে, নিজের জন্য চিড়ে-মুড়ি একটু কিছু হইলেই যথেষ্ঠ হইত। দেহের উপর জুলুম করিয়া অন্তঃসার শূন্য হইয়া পড়িয়াছে।

ক্রমেই গাঁজার পরিমাণ কমিয়া আসিতেছিল। আজ শত ঘুরিয়াও সমস্ত বিশ্বের কোনখানে লছমী তাহার স্বামীর জন্য গাঁজা কিনিবার পয়সা খুঁজিয়া পায় নাই।

হতভাগী ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া মাটিতে পড়িয়াছিল। কিষণ ঘরে পা দিয়াই গাঁজার তল্লাস করিতে লাগিল। সমস্ত শিশি কৌটা তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও ঐ বস্তুটির দর্শন পাওয়া গেল না।

একেত কোথা হইতে উষ্ণতালু হইয়া আসিয়াছে, তার উপর সমস্ত দেহ-মনের খোরাকটি নিশ্চিহ্ন—ওদিকে বৌটা বেশ আরামে পড়িয়া আছে।

কিষণের মত ঠাণ্ডা মানুষ রাগে সকল হিতাহিত বোধ হারাইল। শরীরের রক্ত মাংসের মধ্য দিয়া যেন অসহ্য আগুনের ফুল্কি অনুভব করিতে লাগিল। সমুখের শূন্য-গর্ভ কালো ভাতের হাড়ীটার দিকে চাহিয়া বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল—ভাত রাধিস্নি কাহে, খানা হোবে না?.... বদ্‌মায়েস ছোরি?

লছমি শেষ কথাটি প্রতিবাদ করিয়া বলিল—ধ্যেৎ......

আর সে যায় কোথায়। গালি প্রহারে পর্যবসিত হইয়া তাকে অতিষ্ঠ করিয়া তোলে। সে ক্রমে বুঝিতে পারিল যে, স্বামীর মাথা ঠিক নাই, রাগের ঝোঁকে এমন কি সে খুনও করিয়া ফেলিতে পারে।

লছমি সরিয়া পড়িবার জন্য রাস্তায় বাহির হইয়া যায়। কলটির সমুখে পৌঁছিতেই সে ধরা পড়িয়া গেল। কিষণ তাকে এমনি জোরে ধাক্কা দিয়াছে যে টাল সামলাইতে না পারিয়া ঐ কলটির উপরে গিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িল।

লছমির এখন আর এতটুকু উদ্বিগ্নতা নাই—সকল বিঘ্নের পরপারে সে আশ্রয় লইয়াছে—অচেতনের দেশে! এদের হাড় নাকি খুবই শক্ত, ভাঙিয়াও ভাঙে না, এতটুকু রক্তপাতে ওদের নাকি কিছু আসে যায় না—এমনি সারিয়া যায়। কিন্তু লছমির জীবনে এই সত্যটি যেন খাটিল না। তার স্বাস্থ্যটুকু এবার বুঝি চিরতরে ভাঙ্গিয়া পড়িল। যখন তাকে এম্বুলেন্সে ধরিয়া তোলা হইল, সে বাঁচিবে বলিয়া যেন কেহই আশা করিতে পারিল না।

বিকাল বেলা পায়ে হাঁটিতে হাঁটিতে হঠাৎ লক্ষ্য করিলাম—পাশের হাসপাতালেই না লছমীকে আনা হইয়াছে? ওকে একটিবার চোখের দেখা দেখিয়া গেলে কেমন হয়?

ওর আঘাতে মর্মাহত হই নাই। বেচারা যদি আর না-ই বাঁচে—এরূপ একটি অদ্ভুত ভীতি আমাকে হাসপাতালের ভিতরে টানিয়া লইয়া গেল। মানুষের মরণের ইঙ্গিত বুকে এত দুর্বহ আলোড়ন তোলে। মরণের সঙ্গে আমাদের সকলেরই অন্তিম সম্বন্ধ আছে কিনা! অপরের অন্তিমকাল আমাদের মনে সেই ভবিষ্য মুহূর্তটির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। আমরা চঞ্চল হইয়া উঠি।

একটা খাটিয়ার উপরে লছমিকে শোয়াইয়া রাখা হইয়াছে।

আমি তাকে ডাকিয়া বিরক্ত করিলাম না। তাকে ঘন ঘন চোখ চাহিতে দেখিয়া অনুমান হইল, যেন সে কার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। আমাকে চিনিতে না পারিয়া বলিয়া বসিল—কেষণ...কেষণ...তোর সাথ হামি বাৎ করবে না......

—ভয় নেই লছমি, আমি তোদের বাবুজী।

—চিনিতে পারিয়াছে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানিয়া লইয়া আবার ছাড়িয়া দিয়া বলিতে লাগিল—বা...বু...জী,...কে...ষণ...কোথা ?...

গলার স্বরটি ভারি হইয়া উঠিয়া কণ্ঠনালীর কোন্‌খানটায় আট্‌কাইয়া গেল। চাওয়া চোখ দুটি বুঁজিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেত্রকোণে দেখা দেয় দু' ফোটা জল। ওর কি হইল—সে কথাটি জিজ্ঞাসা করিবার কত মনে সাহস হইল না।

অন্তরে নিহিত যে গোপন বাণী, সে নিজেও স্পষ্ট করিয়া শোনে নাই, কণ্ঠে শক্তি থাকিলেও যা' ভাষায় প্রকাশ করিতে হয়তো সক্ষম হইত না—বুঝি তা' এই—সে স্বামীর ব্যবহারে যে অবিচার লাভ করিয়াছে তার দুঃখ, স্বামীকে ফিরিয়া পাওয়ার আনন্দের অনুপাতে নগণ্য।

কিছুক্ষণ পরে আবার যেন ওর হুস হইল। বাঁধ-স্বরে একান্ত-ই অসহায়ের মত অন্তরের শেষ খবরটি জানাইল—বা—বু—জী....হামি...বাঁচ্‌---বেনা।

তাতে বিবেকের সায় থাক আর নাই থাক, এই প্রশ্নের মাত্র একটি চিরাচরিত উত্তর আছে। সেটাই পরিপাটি ভাষায় ব্যক্ত করিলাম—পাগ্‌লী মেয়ে, কি ছাই ভস্ম বক্‌ছিস্‌ ? সেরে উঠ্‌লি বলে ?

বানান হইতে পারে, কিন্তু আশ্চর্য, আমার এত বড় একটা সান্ত্বনাকে সে যেন গায়ে মাখিল না। গ্রহণ না করিবারই কথা—অনুভূতি যে হৃদয়ে সুগভীর, মন-ভুলান হাল্কা কথা সে স্তরে গিয়া পৌঁছে না।

লছমি এবার প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়া চোখ মেলিল। আমার মুখের প্রতি তার নির্লিপ্ত উদাস দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিল—হা—মার...কসুর...নেই।...কে....ষণ ..

—সব শুনেছি লছমি। বুর্বক কেষণটা নেশা ধরেছে...গাঁজার পয়সায় টান পড়েছে বলে বৌকে ধরে মারপিঠ লাগিয়েছে। আচ্ছা রোস্‌...দেখাচ্ছি তোর বজ্জাতিপানার মজা...এবার বেটাকে ফাঁসে না ঝুলিয়ে ছাড়ছিনে।...তুই ভাল হয়ে ওঠ বেটি !

—বা—বুজী...ওর ফাঁসি...হোবে ?

—হাঁ—হাঁ...নেশ্চয়।...

—ওর...কসুর....নেই।

—কে বল্‌লে ?

—হামি...বল্‌বে....বা—বু—জী।

—তুই ?...বলিস্‌ কি...ক্ষ্যাপেছিস্‌ ?

—হাঁ...বা—বু—জী...হামি বল্‌বে...হামি...নিজে...পড়ে...গিছি।...হ্যাঁ...হামি...ভাল...হোবে,...কে—ষণ...খালাস্‌...হোবে...

মিলনের কি বিপুল প্রয়াস। আশ্রয়হীনের উঠিয়া দাঁড়াইবার আশা।

কিষণ খালাস হইয়াছিল কিনা সে খবর জানিনা, লছমি যে চিরদিনের জন্য বেদনার গ্রাস হইতে মুক্তি পাইয়াছে, সে সংবাদ কাণে আসিয়াছে। তবু ভুল করিয়া বসি। কলটির সমুখ দিয়া আসা-যাওয়ার পথে কলের পরে দাঁড়ান যুবতী মেয়েদের চক্ষে পড়িলে সমস্ত দেহটি সন্ত্রাসে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে।—মনে হয় এই বুঝি দস্যি কিষণটা ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ছুটীয়া আসিয়া লছমিকে শেষ করিয়া ফেলিল !

শ্রমিক ও দেশ

বান্ধবী সেন

বিগত মহাসমরের রক্তমলিন ফেনপুঞ্জ হইতে বিশ্বশান্তি কামনায় আন্তর্জ্জাতিক শান্তি, আত্মনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বহু কথার উদ্ভব হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল কথা কেবল কথামাত্রেই আজ পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত আছে, চরম সাম্যের বাণী ঐ সময় হইতে আমরা অতি উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হইতে শুনিয়া আসিতেছি। কিন্তু কার্য্যতঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির আচার অনুষ্ঠান হইতে আমরা দেখিতেছি, জাতীয় অহংবোধ উন্মাদ উত্তেজনায় বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলিকে অধিকতর সংগ্রাম পিপাসু করিয়া তুলিতেছে। বিশ্বশান্তি, সাম্য বা আত্মনিয়ন্ত্রণ—ইহাদিগকে কার্য্যকর করিয়া তুলিবার পক্ষে ঐ জাতীয় অহংবোধকে যথেষ্ট পরিমাণে দুর্ব্বল করিয়া রাখিতে হইবে অথবা বর্ত্তমানে ইহা যে পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে সে পথ হইতে ইহার গতিমুখকে ফিরাইয়া হৃদ্যতার পথে পরিচালিত করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ আক্রমণে এই জাতীয় অহংবোধকে সার্থকরূপে আহত করা সম্ভব নয়; কেননা জাতীয়তাবোধের প্রভাব মানুষের মনকে এতটা সক্রিয় করিয়া তুলিতে পারে যাহাতে জীবনের প্রতি স্বাভাবিক মমত্ববোধ মানুষ হেলায় তুচ্ছ জ্ঞান করে। এই পার্থিব সম্পদের বেচাকেনার দিনেও জাতীয়তায় মানুষ এত উন্মাদ হইয়া উঠে যে পার্থিব সম্পদকে অতি তুচ্ছ জ্ঞানে জাতীয় কলঙ্ক অপনোদনে সে আত্মাহুতি দিতে উন্মাদ হয়। যে বৃত্তির প্রভাব মানুষের উপরে এরূপভাবে কাজ করে, সাক্ষাৎভাবে সে বৃত্তির প্রতিকূল আচরণ করিয়া কোনরূপ পরিকল্পনাকে কার্য্যকর করার আশা দুরাশামাত্র। কাজেই, দ্বিতীয় পথটীকে সমীচীন পথ বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়—অর্থাৎ দেখিতে হয়, যাহাতে এই পরাক্রমশালী বৃত্তিটীর গতিমুখ অন্যপথে পরিচালিত করিয়া ইহাকে আমাদের পরিকল্পনার সহায়করূপে পাইতে পারি।

১৮৪৮ সালে কমিউনিষ্ট মেনিফেষ্টোতে "Workers have no country" এই বাণী ঘোষিত হয়। এই বাণীর মর্ম্মকথা শ্রমিকগণের মন হইতে জাতীয়তার ভাব মুছিয়া ফেলিয়া শ্রেণীগত ভিত্তিতে দুনিয়ার সমগ্র শ্রমিককে এক অখণ্ড সত্তায় সত্তাবান করিয়া তোলা। অল্লাধিক সমস্ত দেশের সাম্যবাদী আন্দোলনই আন্তর্জ্জাতিক ভ্রাতৃত্বের বনিয়াদের উপর গড়িয়া উঠিয়াছে। এবং সাম্যবাদীগণ সর্ব্বত্র আক্রমণমূলক জাতীয়তার বিদ্বেষী। কিন্তু কমিউনিষ্টগণ যেমন স্পষ্টতঃই সাম্যবাদ বলিতে আন্তর্জ্জাতিক ভিত্তিতে শ্রমিকদিগের ঐক্যকেই বুঝিয়া থাকেন, অপরাপর সাম্যবাদীগণ ঠিক সেইরূপ বোঝেন অথবা সাম্যবাদ বলিতে তাঁহারা বিশ্বমানবের ভ্রাতৃত্বকেই বোঝেন তাহা স্পষ্ট করিয়া বলা কঠিন। এই দুইটী মতবাদ বিচার করিলে দুই বিভিন্ন সিদ্ধান্তে আসিয়া আমরা পৌঁছিতে পারি। বিশ্বের

শ্রমিক ঐক্যই যদি আমাদের কর্ম্মপ্রচেষ্টার মূলভিত্তিস্বরূপ ধরিয়া লই—তাহা হইলে জাতীয়তার সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া পৃথিবীব্যাপী শ্রমিক আন্দোলনে আমাদিগকে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। এই আন্দোলনের দাবী হিসাবে সমস্ত দেশের শ্রমিকদিগকে আমাদের আহ্বান করিতে হইবে। এইরূপ সংহতি যদি তাহাদের নিজ নিজ জাতীয় রাষ্ট্রের বিরোধী হয় তথাপি তাহাদিগকে এক হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। অপর দিকে, শ্রেণী বৈষম্যের প্রতি দৃকপাত না করিয়া বিশ্বভ্রাতৃত্বের দাবীতে যদি আমরা সকলকে এক হইতে বলি তাহা হইলে যেভাবে আমাদের কর্ম্মপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে তাহার প্রকৃতি হইবে ভিন্ন রকমের। বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিব এই যদি আমাদের কাম্য হয় তাহা হইলে শ্রমিক আন্দোলন সার্থক হউক কি নিরর্থক হউক এদিকে না চাহিয়া কোনরূপ সংগ্রামে আমরা লিপ্ত হইব না, এইরূপ কর্ম্মপদ্ধতিই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। এই আক্রমণ বিরোধী নীতিকে কার্য্যকর করিবার দিকে রাষ্ট্রগুলি নিরুপদ্রবভাবে পরস্পরের সহযোগিতায় যাহাতে অস্ত্রের বহর কমাইয়া আনিতে পারে, এবং non-aggression pactএর মধ্যে আসে, এবং গঠনমূলক আন্তর্জ্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হইয়া উঠে সে চেষ্টা দেখিতে হইবে। এইভাবে আমরা দেখিতে পাই, আন্তর্জাতিক শ্রমিক ঐক্যের আদর্শ ধরিয়া যদি আমরা অগ্রসর হই তাহা হইলে ইহার যুক্তিযুক্ত পরিণতি হিসাবে বিশ্ববিপ্লবে "World Revolution"এ আসিয়া পৌঁছায়। অপরদিকে, বিশ্বভ্রাতৃত্বকে আদর্শ রাখিয়া অগ্রসর হইলে রাষ্ট্রের বর্ত্তমান পদ্ধতিকে বজায় রাখিয়াই শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার পথে আমাদিগকে চলিতে হইবে। এখন দেখা যাউক, বাস্তবক্ষেত্রে আমরা কি দেখিতে পাই। বাস্তবক্ষেত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, এক কমিউনিষ্ট সম্প্রদায় ভিন্ন অন্য সকল প্রকারের সাম্যবাদীগণই আন্তর্জ্জাতিকতা প্রতিষ্ঠাকল্পে দ্বিতীয় পথটাকেই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে করিতেছেন। সাম্যবাদ বলিতে কেবল শ্রমিক সম্প্রদায়ের ঐক্যকেই না বুঝিয়া তাহারা বিশ্বভ্রাতৃত্বকেই বুঝিতেছে, এবং ইহাকেই তাহাদের কর্ম্ম পদ্ধতির মূল অবলম্বন হিসাবে ধরিয়াছে।

ধনিকতন্ত্রের আত্যন্তিক পরিপুষ্টির ফলে সমস্ত দেশের শ্রমিকগণই যে একটা বিশেষ অবস্থার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পক্ষে ইহাদের অবস্থায়ই যে সকলের চেয়ে অধিক মনোযোগ দেওয়ার বিষয় এ সম্বন্ধে ইঁহারাও কোন সন্দেহ প্রকাশ করেন না। কিন্তু সেই হেতু ইঁহাদের অধিকাংশই এমন কথা কখনও বলেন না যে, শ্রমিকদিগের দেশ বলিয়া কিছুই নাই—"Workers have no country" অথবা এমন কথাও ইহারা স্বীকার করিতে রাজী নহেন যে, জাতি বা জাতির প্রতিভূ হিসাবে যে রাষ্ট্র সে রাষ্ট্রের কি সে জাতির উপরে শ্রমিকের কোন দায়িত্ব কি কোন কর্ত্তব্য নাই। ১৯১৪ সালের ইউরোপীয় মহাসমরের সময় উক্ত মহাদেশের তৎকালীন সোসালিষ্ট পার্টিগুলির কথা এ সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রনিধানযোগ্য। ইংরেজ, ফরাসী ও জার্ম্মাণীর সোসালিষ্ট পার্টিগুলির অধিকাংশই তখন স্ব স্ব জাতীয় রাষ্ট্রের (National State) সমর্থনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ইটালীর ক্ষেত্রে ঠিক এই সব দেশের মত ঘটে নাই, কেননা তথাকার

সোসালিষ্ট পার্টিগুলির অধিকাংশই ইতালীকে আন্তর্জ্জাতিক যুদ্ধ হইতে মুক্ত রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিল।

রুষিয়ার পক্ষেও অবস্থা স্বতন্ত্র দাঁড়াইয়াছিল। রুষিয়া ছিল স্বেচ্ছাতন্ত্রী রাষ্ট্র, কাজেই গণ-তন্ত্রী শক্তি হিসাবে তথায় সোস্যালিজম্ কোন আসন করিয়া লইতে পারে নাই, কাজেই রুষীয় সোস্যালিজমের, জারের সহিত কোন নৈতিক সম্পর্ক ছিলনা; কিন্তু তথাপি একথা বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় যে, সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানেও সোস্যাল ডিমোক্রেটদলের মধ্যে বিভেদ হইয়াছিল—কেবল তাহাই নহে, Workers have no countryর প্রচারক যে বলসেভিকদল তাহাদের মধ্যেও বিভেদ দেখা দিয়াছিল, যুযুধান দেশগুলির প্রায় সকল দেশেই কিছু কিছু লোক ছিল যাহারা যুদ্ধকে সমর্থন করিত না, কিন্তু সকলক্ষেত্রেই তাহাদের এই যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার কারণ যে সাম্যবাদমূলক ছিল এমনটা মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। জাতীয় অপচয়ই ইহাদের যুদ্ধে যোগ না দেওয়ার প্রধান কারণ ছিল, গ্রেট ব্রিটেনের ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি যুদ্ধে যোগ দিবার বিপক্ষে ছিল এবং তাহাদের এরূপ আচরণের উদ্দেশ্য সাম্যবাদমূলক নহে; অপূরণীয় ক্ষতি নিবারণই ছিল তাহাদের ঐ যুদ্ধ বিরোধীতার প্রধান কারণ।

বলসেভিকেরা কোন প্রকার সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে যোগদান বা উহাতে সাহায্য দানের বিরোধী ছিল; একমাত্র ইহাদের এই যুদ্ধ বিরোধীতাই ছিল সাম্যবাদমূলক; কিন্তু এই বলসেভিকদলের অন্যতম নেতা প্লেখানভ তাঁহার অনুরক্ত ও সহচরগণ সহ দলের অপরের সহিত মত মিলাইয় চলিতে পারেন নাই। আসলে কথা হইতেছে দেশাত্মবোধ বা "আমাদের দেশ" এ ধারণা মানুষের মন হইতে অপসারিত করা সহসা সম্ভব নয়। বিশেষ করিয়া গণতন্ত্রী শাসন ব্যবস্থা যে সকল দেশে বিদ্যমান সে সমস্ত দেশের লোকের পক্ষে ত কথাই নাই প্রচার যত উগ্রই হোক না কেন; এমন কি, নিঃস্ব যে শ্রমিক তাহার মন হইতেও "আমার দেশ" এ ধারণা মুছিয়া ফেলা সম্ভব নহে। এই ধারণা একটা সহজাত বৃত্তির মত মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে, ধনিকতন্ত্রী আমলে শ্রমিকগণ যে ভাবে বঞ্চিত হইতেছে তাহা যদি তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া যায়—তাহা হইলেই জাতীয় চেতনা বা "আমাদের দেশ" এই ধারণা তাহাদের মধ্য হইতে বিলুপ্ত হইয়া শ্রেণী চেতনা—"কিসের দেশ, কিসের জাতি, বিশ্বের যে যথায় শ্রমিক আছ তাহারাই আমার আপন"—তাহাদের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিবে—ইতিহাসের পাতার সহিত যাহাদের পরিচয় আছে তাহারা সহসা একথা বিশ্বাস করিবে না।

শ্রমিকদের মধ্যে প্রচারকার্য্যের সাহায্যে শ্রেণীচেতনা যতই উদ্বুদ্ধ করান যাউক না কেন দেশ এবং জাতি আক্রান্ত হইয়াছে, আমারই দেশে আসিয়া পরদেশী আমার দেশের নিন্দা করিতেছে কি আমার দেশকে শোষণ করিতেছে এ ধারণা একবার জন্মিলে নিঃস্ব শ্রমিকেরও আন্তর্জ্জাতিক শ্রেণী-চেতনা তলাইয়া যায়। "International class solidarity" বা, "Workers have no country" এই সকল কথা বাস্তবতার ক্ষেত্রে তখন দিবা স্বপ্নচারীর

উক্তি মাত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। নাৎসী-জার্মানী ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯১৪ সালে জার্মানী, ফরাসী, গ্রেট ব্রিটেন এই সকল দেশের শ্রমিকগণের, এমন কি রুষিয়ার শ্রমিকগণের মধ্যেও ধারণা জন্মাইল যে বৈদেশিকগণ তাহাদের নিজ নিজ দেশের উপরে আপতিত হইতেছে; তাই ধনিকতন্ত্র প্রধান হইলেও উহা জাতীয় গভর্ণমেণ্ট এবং শত্রু আক্রান্ত বলিয়া তাহারা জাতীয় গভর্ণমেণ্টের রক্ষায় আসিয়া নিজ নিজ গভর্ণমেণ্টের পিছনে দাঁড়ায়।

১৯১৪ সালে যাহা ঘটিয়াছে ভবিষ্যতেও যে তাহা ঘটিবে না এরূপ কোনও নিশ্চয়তা নাই; বরং যে সমস্ত কারণে ১৯১৪ সালের সংগ্রামে শ্রমিকগণ, শ্রেণীস্বার্থ অপেক্ষা জাতীয় স্বার্থই বড় বলিয়া স্ব স্ব গভর্ণমেণ্টের পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল সেই সকল কারণ আজ অধিক মাত্রায় বিদ্যমান।

অবস্থার জটিলতা চারিদিক দিয়াই যেরূপ প্রকট হইয়া দেখা দিতেছে তাহাতে আন্তর্জাতিক শ্রেণী চেতনায় মানুষকে অন্ততঃ এতটা পরিমাণ উদ্বুদ্ধ করা চলে যাহাতে জাতীয় চেতনা চাপা না পড়ে। বাস্তব সংগ্রাম আরম্ভ হইলেও জাতীয় চেতনায় হস্তক্ষেপ না করিয়া অন্ততঃ এতটুকু করা অসম্ভব নহে যাহাতে শ্রমিককুল জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিক শ্রেণী সম্পর্ক উভয়কেই সম্মান দিয়া চলিতে পারে; এবং তাহা সম্ভব হয় এ অবস্থা আনিতে পারিলে, যেন শ্রমিককুল স্ব স্ব রাষ্ট্রকে আক্রমণমূলক সংগ্রামে যোগ দিতে সাহায্য না করে। যে রাষ্ট্রগুলিতে শ্রেণী হিসাবে শ্রমিক শ্রেণী প্রাধান্য করিতেছে সেখানে ইহা অনেকটা সহজ হয়। কিন্তু আত্মরক্ষার প্রশ্ন যেখানে প্রবল—অর্থাৎ রাষ্ট্র ধনীকতন্ত্রীই হউক আর যে তন্ত্রীই হউক, শ্রমিকগণ যদি বিশ্বাস করে যে তাহাদের রাষ্ট্র অপরের দ্বারা আক্রান্ত—তাহা হইলে সে রাষ্ট্রের রক্ষায় অধিকাংশ শ্রমিক ছুটিবেই, এ অবস্থা হইতে শ্রমিকদিগকে ফিরান—বিশেষ করিয়া পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রশাসিত দেশগুলির ক্ষেত্রে একরূপ অসম্ভব। তবে যে সব দেশ পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র শাসিত নহে, এবং যেখানে শ্রমিক অসন্তোষ মারাত্মকভাবে প্রবল সেখানে হয়তো অবস্থা অন্য রকমও দাঁড়াইতে পারে। —রাষ্ট্রের যুদ্ধ পরিচালন পদ্ধতির মধ্যে যদি এরূপ মারাত্মক দোষ থাকে যাহাতে জনসাধারণ ঐ রাষ্ট্রকে স্বদেশ হিতকারী রাষ্ট্র বলিয়া মনে না করে তাহা হইলেই যুদ্ধনিরত শ্রমিকগণ ধনিকতন্ত্রী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব উপস্থিত করিতে উদ্বুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্র যদি যুদ্ধে হারে বা যুদ্ধে হারিবার সম্ভাবনা রাষ্ট্রের প্রায় নিশ্চিতে আসিয়া দাঁড়ায় তাহা হইলেও শ্রমিকগণের বিপ্লবী দলে যোগ দিবার একটা সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই শ্রমিকগণের বিপ্লবী হওয়ার মূলে থাকে প্রধানভাবে দেশাত্মবোধ—শ্রেণী-চেতনা নহে। এরূপক্ষেত্রে যে বিপ্লব তাহা Class revolution বা শ্রেণী বিপ্লব নহে, উহা জাতীয় বিপ্লব বা National revolution. প্রচলিত রাষ্ট্র ব্যবস্থা জাতীর স্বার্থ, জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে অসমর্থ বলিয়া উহাকে ভাঙ্গিয়া নূতন রাষ্ট্র গঠনই হয় এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য। গোটা জাতির স্বার্থের সহিত দুনিয়ার শ্রমিকদের স্বার্থেরও একটা সঙ্গতিপূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে—এ ধারণা যদি জন্মে, অন্ততঃ উভয় স্বার্থ পরস্পর বিরোধী নহে—এ কথা যদি মানুষ বোঝে তাহা

হইলেই সাম্যবাদী বিপ্লব জয়যুক্ত হইবার সম্ভাবনা থাকে। জাতীয়তাকে অগ্রাহ্য করিয়া কেবল শ্রেণী-চেতনার দোহাইয়ে বিপ্লব কদাপি সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। এই ভাবে আমরা দেখিতে পাই, মানুষের রাষ্ট্রীয় জীবন, তাহার রাষ্ট্রীয় আচার-ব্যবহার ইত্যাদি মূলে রহিয়াছে তাহার স্বাদেশিকতা, তাহার জাতীয়তা বোধ ; এবং বাস্তব ক্ষেত্রে শ্রেণীচেতনা তাহার এই স্বাদেশিকতা কি তাহার জাতীয়তা বোধকে নষ্ট করিবার পক্ষে নিতান্তই দুর্বল। জাতীয়তা বোধের পরিপুষ্টির সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া, বা ঐ পরিপুষ্টির জন্যই আবশ্যকানুরূপ শ্রেণীচেতনার অভিব্যক্তির হয়ত প্রয়োজন। মনুষ্য সভ্যতা বা বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতিষ্ঠাকল্পে শ্রেণীচেতনার অভিব্যক্তির সার্থকতা এই পর্য্যন্তই। দেশের জন্য কোন অবস্থাতেই যুদ্ধ করিব না—অনেকের মুখ হইতে এরূপ একটা কথা প্রায়ই শুনা যায়। তাহাদের এরূপ ঘোষণাবাণীর যে কোন অর্থ আছে তাহা মনে হয় না। এরূপ ঘোষণার মধ্যে একটা নৈরাশ্যের ভাবই পাওয়া যায়, কিন্তু সক্রিয় জীবনে নৈরাশ্যের স্থান নাই, অবহেলায় সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়া যেমন মানবদ্রোহিতার কাজ—দেশ, জাতি এবং সমাজের রক্ষাকল্পে সংগ্রাম যখন অনিবার্য্যরূপে আসিয়া দেখা দেয় তখন তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনও তেমনই পঙ্গুমনের পরিচায়ক।
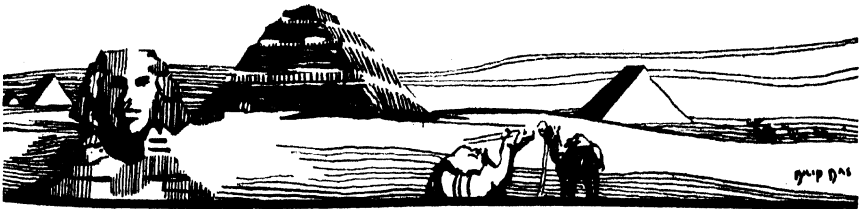
একটী ছেলে*

পূর্ণেন্দু দস্তিদার

ছোট্ট এই গল্প—কিন্তু বলতে বড় কষ্ট হচ্ছে।

আমি তখন ছোট। গ্রীষ্মে আর বসন্তে আমি প্রায় রবিবারে ছোট ছোট অনেক ছেলে জড়ো করে—মাঠে, বনে ঘুরে বেড়াতাম। পাখীর মত সুখী এই সব ছোটদের সঙ্গে করতে আমার খুব ভালো লাগত।

ছোটরাও ধূলো ও ধোঁয়ায় ভরা শহরের রাস্তা ছেড়ে গ্রামে যেতে ভালবাসত, তাদের মায়েরা তাদের জন্যে পাঁউরুটী দিত আর আমি দিতাম লজেঞ্চ কিনে। তারপর যেন মেষপালক একপাল মেষ নিয়ে চলেছে, তেমনি তাদের নিয়ে শহর ছেড়ে আমরা গ্রামের ভিতর চলে যেতাম—প্রকৃতি বসন্তের শোভায় সজ্জিত হয়ে হাসত।

সাধারণত আমরা ভোরেই যাত্রা করতাম। ভোরের উপাসনার জন্য গির্জ্জার ঘন্টা বেজে উঠত—তখন ছোট ছোট পা ফেলে আমরা ধূলো উড়িয়ে শহর ছেড়ে চলে যেতাম। দুপুরবেলায় যখন খুব গরম লাগত, তখন আমার ক্লান্ত শিশু বন্ধুগুলি খাবার খেয়ে সবুজ ঘাসের উপর ঝোপের আড়ালে ঘুমে এলিয়ে পড়ত। আর যারা একটু বড় তারা আমায় ঘিরে বসে বলত গল্প বলতে—আমি তাদের অনুরোধ রাখতাম। তাদের অর্থহীন অনর্গল কথার স্রোতে নিজেকে মিশিয়ে দিতাম। আর তখন আমার মনে হত, যদিও তাদের তুলনায় আমি কিছুটা বড়—আমার কুড়ি বছর বয়স—তবুও মনে হত অনেকগুলো প্রবীণের মধ্যে আমিই যেন একটীমাত্র শিশু।

আমাদের মাথার উপরে সীমাহীন আকাশ—সামনে সুদৃশ্য স্তব্ধ বনভূমি। মন্দ মৃদু বাতাস যেন কার কানে কানে কোন গোপন কথা বলছে—আনন্দ-চঞ্চল বনতল। আমার মনে নেমে আসত মধুর প্রশান্তি।

বিরাট নীল আকাশে শাদা মেঘের খেলা। সূর্য্যের কিরণে উত্তপ্ত পৃথিবীতে বসে মনে হচ্ছিল, আকাশ বুঝি নির্জ্জীব—মেঘগুলো আকাশের সাথে মিশে গেছে।

আর আমার চারপাশে এই সুন্দর ছোট ছেলের দল—জীবনের দুঃখ ও সুখ এখনও এদের তেমন স্পর্শ করেনি।

সেই দিনগুলো ছিল আমার আনন্দের। তখনই জীবন আমার অবসন্ন—তার ভিতরে ঐ ছেলের মেলায় মন আমার ফিরে যেত শৈশবে, যখন মন থাকে স্বচ্ছ—সরল।

একদিন আমি একদল ছেলের সঙ্গে শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়ে পড়েছি, আমাদের সঙ্গে দেখা হল ছোট্ট একটী ইহুদীর ছেলের। পায়ে তার জুতো নেই, শার্ট ছেঁড়া, মেষশাবকের মত কোঁকড়ানো চুলে তার মাথা ভরা, তেমনি কোমল।

তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে যেন কি নিয়ে বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তার ঘোলাটে চোখের

* ম্যাক্‌সিম গোর্কী 'A Boy' গল্পের অনুবাদ।

পাতাগুলো ফুলে গেছে, ব্যথায় লাল যেন—মুখে ক্ষুধার্ত্তের মলিন ছাপ। এতগুলো ছেলের দলের মধ্যে পড়ে তার একটু বিব্রত ভাব দেখা গেল। রাস্তার মাঝখানটায় সে থেমে গেল—ভোরের শিশির-ভেজা পথের ধূলোয় তার পা দুটো গভীরভাবে চেপে সে একবার দাঁড়াল, তারপর হঠাৎ এক লাফে সে ঘরের দাওয়ায় উঠে দাঁড়াল।

ছোট ছেলের দল সমস্বরে বলে উঠল, "ধর্, ধর্, ইন্দুরীর বাচ্চাকে ধর্।"

আমি ভাবছিলাম এখুনি সে পালাবে। তার শুকনো মুখে বড় বড় চোখ দুটিতে ভয়ের আভাস, তার ঠোঁট দুটি কাঁপছে। সেই কোলাহলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে—হঠাৎ সে যেন লম্বা হয়ে যেতে লাগল, বেড়ায় তার কাঁধ লাগিয়ে সে হাত দুটো পিছনে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠল।

তারপর সে শান্ত অথচ স্পষ্টভাবে বলে উঠল, "তোমরা একটা মজা দেখবে কি?"

আমি প্রথম ভেবেছিলাম, নিজেকে বাঁচাবার ওটা একটা ফন্দী ছাড়া আর কিছু নয়। ছোট ছোট শিশুগুলো মজার খবর পেয়ে তাকে ঘিরে দাঁড়াল কিন্তু যারা একটু বড় তারা সন্দেহ আর অবিশ্বাসে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। অন্য পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে আমাদের পাড়ার ছেলেদের ভাব ছিল না—এ পাড়ার ছেলেরা নিজেদের অন্যদের চেয়ে বুদ্ধি, বিদ্যায় সব কিছুতে বড়, এ কথাই ভাবত, তাই তারা কাউকে আমল দিত না।

ছোটরা অত শত বুঝল না, তারা বলল, "কৈ, দেখাও তোমার মজা?"

সুন্দর ছোট ছেলেটি বেড়া থেকে কিছু দূরে সরে গিয়ে—তার ক্ষীণ দেহখানি পেছন দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে আঙ্গুল দিয়ে মাটি স্পর্শ করলে এবং পা দুটো উপর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হাতের উপর দাঁড়িয়ে বলল, "এই মজা।"

তারপর হাতের উপর দেহটাকে রেখে সে হাত পায়ের নানা কসরত দেখাতে লাগল। তার শার্ট আর প্যাণ্টের ছেঁড়ার ভিতর দিয়ে তার দেহের ঈষৎ তামাটে রং দেখা যাচ্ছিল। তার গলার হাড়, হাঁটু আর কনুইগুলো পোষাকের মধ্য দিয়ে ছুঁচালো হয়ে বেরিয়েছে, তার বুকের হাড় দুটোকে মনে হচ্ছিল যেন ঘোড়ার জিন। আমার মনে হচ্ছিল সে যদি তার দেহকে আরও মোচড় খাওয়ায় তবে তার নরম হাড়গুলো ভেঙ্গে যাবে। গা দিয়ে তার ঘাম বেয়ে পড়ছে—পিঠের উপর তার শার্ট ঘামে ভিজে গেছে। প্রতিটি খেলার পর, ছোট ছেলেদের মুখের পানে তাকিয়ে তার এক কৃত্রিম প্রাণহীন হাসি। তার কাল চোখ দু'টি ঘোলাটে—যেন ব্যথায় অভিভূত, তাই তার শিশুসুলভ চোখে বয়স্কের উদ্বেগ। ছোট ছেলের দল চেঁচিয়ে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে—কেউ কেউ ইতিমধ্যেই তাকে নকল করে বালির উপর ডিগবাজী খেলতে সুরু করেছে—কেউ নূতন চেষ্টা করে ব্যথা পাচ্ছে, কেউ সফল হচ্ছে, কেউ বা অকৃতকার্য্য হয়ে ঈর্ষায় ও পরাজয়ে দুঃখিত।

কিন্তু যখন বালকটি নানা রকম খেলার পর অভিজ্ঞ ভঙ্গীতে খেলা বন্ধ করে তাদের সামনে হাত পেতে বলল, "বেশত—এখন আমায় কিছু দাও"—তখন হঠাৎ ছেলেদের সকল আনন্দ থেমে গেল।

তারা প্রায় সকলেই চুপ, কে একজন বলল, "পয়সা চাও নাকি ?"

বালকটি বলল, "চাই বই কি।"

"বেশ বলেছ যা হোক !"

"পয়সার জন্যে আমরাই ত ওসব খেলা দেখাতে পারতাম...ভারীত !"

পয়সার উল্লেখ হতেই দর্শকবৃন্দের মধ্যে খেলোয়াড়ের প্রতি একটা বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির ভাব ফুটে উঠল—ছেলেরা মাঠের দিকে হাসি ঠাট্টা করতে করতে হাঁটতে সুরু করল। তাদের কারো কাছেই পয়সা ছিল না, আর আমার কাছেও ছিল সাতটি পয়সা মাত্র।

তার নোংরা হাতে আমি দুটো পয়সা দিতেই সে দু' আঙ্গুলে সেগুলো তুলে নিয়ে বলল, "বড় উপকার হল বাবু।"

সে চলতে আরম্ভ করলে আমি তার ছেঁড়া জামার ভিতর দিয়ে দেখলাম, তার পিঠে কাল কাল দাগ—জামাটি তার ঘায়ের সঙ্গে আট্‌কে গেছে, জিজ্ঞেস করলাম, "ওগুলো কিসের দাগ ?"

ছেলেটি একটু থেমে আমার দিকে গম্ভীরভাবে তাকাল। তারপর আগের মত শান্তভাবে একটু হেসে বলল,

"ও, পিঠের দাগের কথা বলছেন ? গত ছুটিতে দড়ির খেলা দেখাতে গিয়ে আমরা পড়ে গিয়েছিলাম, বাবা এখনও বিছানায় পড়ে আছেন—আমি কিন্তু সেরে উঠেছি।"

আমি আস্তে আস্তে তার জামাটা উঠালাম, দেখলাম পিঠে বাঁ কাঁধের কাছ থেকে নীচে পা পর্য্যন্ত গভীর কাল দাগ, ঘা শুকিয়ে নূতন চামড়া বাঁধতে সুরু করেছে মাত্র। আমাদের কাছে খেলা দেখাতে গিয়ে ঘায়ের অনেক জায়গাতেই আবার ঐ শুকনো চামড়া ছিঁড়ে গিয়ে লাল লাল রক্ত দেখা দিয়েছে।

সে হেসে বলল, "এতে আমি এখন ব্যথা পাইনা, মাঝে মাঝে চুলকোয় শুধু..."

তারপর ঠিক বীরের মত আমার চোখে চোখে তাকিয়ে বয়স্ক লোকের মতই বলতে আরম্ভ করল: "আপনি বুঝি ভেবেছেন আমি আমার জন্যই এতক্ষণ খেলা দেখাচ্ছিলাম ? শপথ করে বলতে পারি, তা নয়। আমার বাবার জন্যেই খেলা দেখাচ্ছিলাম—আমাদের একটি পয়সাও ছিল না। আর আমার বাবার আঘাত খুব বেশী, তাই বুঝতেই পাচ্ছেন আমার কিছু কাজ করতেই হবে। তা ছাড়া আমরা ইহুদী কিনা, সেজন্যে সবাই আমাদের ঘৃণা করে...নমস্কার !"

সে বেশ হেসে হেসেই কথাগুলো বলল, তারপর তার ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটা হেলিয়ে একটা নমস্কার করে শান্তভাবে চলে গেল। আশেপাশের বড় বড় সুন্দর বাড়ীগুলোর ভিতর দিয়ে সে গেল, কিন্তু সে বাড়ীগুলো তার দিকে কোন নজরই দিল না, মূর্ত্তিমান অবহেলার মত সেগুলো দাঁড়িয়ে।

অবশ্য এই ঘটনা খুবই ছোট, বিশেষত্বহীন। তবু আমার জীবনের দুঃখের দিনগুলিতে এই ছেলেটির কথা বারে বারে আমার মনে পড়ছে।

মা মা হিংসীঃ

ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

নানা গ্রন্থ থেকে যখন আমরা প্রাচীন ভারতবর্ষের যথার্থ জীবৎ স্বভাবটির অনুসন্ধান করিতে যাই তখন বিভিন্ন যুগের নানা পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও একটি অবিচ্ছিন্ন জীবনের পরিচয় পাই। কিন্তু বর্ত্তমান ভারতবর্ষের দিকে চাহিলে এই অবিচ্ছিন্ন একটি জীবন-ধারার সাক্ষাৎ পরিচয় হওয়া অত্যন্ত দুর্ঘট হইয়া উঠে। এমন কি একটি পরিবারের বিভিন্ন স্ত্রী পুরুষের সহিত আলাপ করিলেও অনেক সময়েই একটি ঐক্যের পরিচয় পাওয়া যায় না, একটি শিক্ষিত পরিবারের মধ্যের বিভিন্ন স্ত্রীপুরুষের সহিত আলাপ করিলে দেখা যায় যে জীবনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই মতের প্রচুর বৈষম্য ও বিরোধ রহিয়াছে। এর প্রধান কারণ এই যে য়ুরোপের নানা ভাবধারা আসিয়া আমাদিগকে নিরন্তর দোলা দিতেছে। সেই সঙ্গে আমাদের প্রাচীন মনোভাব ও প্রাচীন আদর্শও আমরা একেবারে ছাড়িতে পারি নাই। এইজন্যই দেখা যায়—যে একটি পরিবারের চারটি ছেলের মধ্যে একজন হয়ত নিত্য গঙ্গাস্নান করেন, তিনবার সন্ধ্যা করেন এবং একাদশী প্রভৃতি উপলক্ষে উপবাস করেন ও খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে ও স্পর্শ সম্বন্ধে তাহাদের বুদ্ধিকে সর্ব্বদা জাগরূক ও কণ্টকিত করিয়া রাখেন; আবার আর এক ভাইর হয়ত কুক্কুট মাংস ছাড়া দৈনিক আহার হয় না। আর একজন হয়ত অত্যন্ত রাজভক্ত, আর একজন বিদ্রোহবাদী কিম্বা সমাজতন্ত্রবাদী। এমনও দেখা যায় যে স্ত্রীর এবং স্বামীর রন্ধনশালা পৃথক, স্বামীর ছোঁয়া স্ত্রী খান না, কারণ স্বামী যবনান্নভোজী ও কুক্কুটান্ত-সেবী। এ অবস্থায় ভারতবর্ষের জীবন-ধারার ঐক্য যে কোন্ দিকে সংঘটিত হইতে পারে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলা সুকঠিন এবং বলিলেও সে বিষয়ে মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। ইতিপূর্ব্বে আশা ছিল যে রাজনৈতিক আন্দোলন সম্বন্ধে ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সম্বন্ধে সকলে অনেকটা একমত হইবেন। সমগ্র ভারতবর্ষে কংগ্রেসের পতাকার অধীনে গান্ধীজী যেভাবে সকলকে সমবেত করিয়াছিলেন তাহা বিস্ময়কর। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে তাহার এ আধিপত্যও যে তাঁহার জীবৎকাল পর্য্যন্ত টিকিবে সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ইহার মধ্যেই যথেষ্ট ভাঙ্গন ধরিয়াছে। খবরের কাগজগুলির মধ্যেও দেখা যায় যে বিভিন্ন পন্থীদের মত প্রচার করিবার জন্য বিভিন্ন সংবাদপত্র বা মাসিকপত্রগুলি সচেষ্ট। এমন খুব কম কাগজই দেখা যায় যাহাতে নানা পক্ষের দৈনন্দিন তাগিদকে উপেক্ষা করিয়া ভারতবর্ষের পক্ষে সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলকর একটি উন্নতির পদ্ধতির ছবি আমাদের চোখের সামনে অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ঝড়ের ধূলি যেমন চোখ অন্ধ করিয়া দেয়, মনে হয় যে তেমনিভাবে আমাদের চোখ অন্ধ হইয়া আসিয়াছে। যাহার সম্মুখে যতটুকু পথ পড়িয়াছে—সেইটুকুই সে দেখিতে পায়। এইজন্যই ভবিষ্যৎ পথের কোন সুনির্দ্দিষ্ট আকৃতি আমাদের চোখের সামনে গড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। না পারিলেও

হয়ত নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া স্বভাব ও অবস্থার তাড়নায় একটি গতিপথ আপনি নির্দ্দিষ্ট হইয়া যাইবে। সেই গতিপথকে হয়ত বর্ত্তমান কালে চলিত সমস্ত মতবাদই কোন না কোনও ক্রমে সাহায্য করিবে। কিন্তু তথাপি ভবিষ্যৎ গতিপথ সম্বন্ধে যদি একটা অস্পষ্ট ধারণাও আমাদের চোখের সামনে থাকে তাহাতে আমাদের যথেষ্ট উপকার হইতে পারে সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

এ সম্বন্ধে লিখিতে গেলে অনেক বিস্তৃত আলোচনার আবশ্যক। ক্ষুদ্র কায়া জয়শ্রীর নিকট হইতে ততখানি দাবী করা সঙ্গত হইবে না। সেইজন্যই এই প্রবন্ধে দুই একটি মাত্র কথার উথাপন করিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। য়ূরোপ থেকে যে মতগুলি আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়াছে তাহার মধ্যে রাষ্ট্রীয় গতি সম্পর্কে মার্কসের মতই প্রধান। দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের দেশে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা মার্কসের বিজয় ধ্বনি করিয়াছেন, তাঁহারা অনেকেই মার্কসের গ্রন্থ ভাল করিয়া পড়েন নাই এবং তাঁহার মতের স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যে কী বলিবার আছে তাহাও ভাল করিয়া অনুধাবন করেন নাই। মার্কস তাঁহার গ্রন্থে communism সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন তাহা রুশ দেশেও সফল হয় নাই। রুশ দেশ কোনকালেই ধনিক-প্রধান ও ব্যবসায়-প্রধান দেশ ছিল না। এবং যে স্বভাবরীতিতে ধনিক-রাষ্ট্র হইতে সমাজ-রাষ্ট্রের পরিণতি হইবে বলিয়া তিনি ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছিলেন, সেই ঘটনাও রুশ দেশে ঘটে নাই। রুশ দেশে যে সমাজতন্ত্র ঘটিয়াছে—তাহা বল ও বিদ্রোহের দ্বারা। ধনিক ও শ্রমিকের বিরোধ এবং অর্থ সমস্যাগত বিরোধ হইতেই যে সকল দেশের ইতিহাসের সৃষ্টি হইয়াছে—একথা মার্কস কিংবা তাহার কোন অনুচর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস পরীক্ষা করিয়া দেখান নাই। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যে ঐ মত প্রযোজ্য তাহাও কেহ দেখান নাই। পরন্তু যাঁহারা ভারতবর্ষের প্রাচীন কৃষ্টি না সংস্কৃতির সহিত পরিচিত তাঁহারা এই জাতীয় মতের প্রতি কখনও সশ্রদ্ধ হইতে পারেন নাই। কেবল জনশক্তির আন্দোলনে এবং পরম্পরানুগত বিরোধে ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস গড়িয়া ওঠে নাই—একথা বলিতে আমরা সঙ্কোচ বোধ করি না। বিভিন্ন দেশের যত জড়বাদী মতই আমাদের দেশকে স্পন্দিত করুক না কেন ভারতবর্ষের সমস্ত প্রাচীনের মধ্য দিয়া একটি অতি প্রাকৃতের (transcendent) প্রতি বিশ্বাস তাহার সমগ্র সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং প্রভাবিত করিয়াছে। যাহা ভারতবর্ষের কোন ক্রমেই আত্মীয় নহে, যাহা ভারতবর্ষের চিত্তের বীজ-ধর্ম্মের মধ্যে নাই তাহা ভারতবর্ষে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিবে—ইহা কিছুতেই মনে করা যায় না। বহুবার য়ূরোপে ভ্রমণ করিয়া ও বহু বিদ্বৎ সমাজের সহিত মিশিয়া এই কথাটি বারবারই মনে হইয়াছে যে ভারতবর্ষের প্রতি য়ূরোপের যে শ্রদ্ধা আছে তাহার মূল কারণ ভারতবর্ষের এই আধ্যাত্মিক সম্পদ। জড়বাদকে একেবারে পরিত্যাগ করিলে বর্ত্তমানকালে জড়বাদ প্রভাবিত বিভিন্ন দেশীয় জাতি সমাজের মধ্যেও তাহাদের সহিত দ্বন্দ্বে ভারতবর্ষ তাহার আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। প্রাচীনকালেও দেখা যায় যে তৎতৎকালে অন্য দেশে যে জাতীয় জড়বিদ্যা

প্রচলিত ছিল ভারতবর্ষে তাহা অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। আজও সেইজন্য জড় হইতে যে শক্তি আহরণ করা প্রয়োজন ভারতবর্ষকে তাহা আহরণ করিতে হইবে; কিন্তু জড় শক্তি যে মানুষের চরম পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে ভারতবর্ষের মনে যদি এই বিশ্বাস জন্মে তবে ভারতবর্ষের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।

উপনিষদ বলেন 'ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যচিৎ ধনম্' যাহা কিছু এই সংসারে নশ্বর বস্তু রহিয়াছে তাহা ঈশ্বরের দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে বলিয়া মনে করিবে—সেইজন্য ত্যাগের দ্বারা ভোগ করিবে এবং অপরের ধনে লোভ করিবে না। জড়বাদের মধ্যে এমন কোন কারণ দেখা যায় না যাহাতে অপরের ধনের প্রতি লোভকে নিবৃত্ত করা যায়—কেবলমাত্র ভয়ই তাহার নিবর্ত্তক হইতে পারে। কাজেই বলবানের দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার নিবারণের কোনও স্বাভাবিক সঙ্গত কারণ তাহার মধ্যে দেখা যায় না, কোন সমাজতন্ত্রী দেশ কেন যে অপর দেশের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহাকে পদানত না করিবে তাহারও কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যেও যাহারা বলবান তাহারা দুর্ব্বলের প্রতি কেন যে অত্যাচার করিবে না—তাহারও কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ধনিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব হইতে যে সমাজের উৎপত্তি সেখানে ধনগত বৈষম্য মিটিয়া গেলেও অন্য জাতীয় বৈষম্যে দ্বন্দ্ব ও কলহ কেন যে উৎপন্ন হইবে না, অশান্তি সৃষ্টি করিবে না এবং সংহার মূর্ত্তিকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিবে না—তাহার কোন কারণ সমাজতন্ত্রীরা দেখাইতে পারেন নাই। ধন বৈষম্য যেমন দ্বন্দ্বের কারণ, শক্তি বৈষম্য তেমনি দ্বন্দ্বের কারণ। বর্ত্তমান রুশ দেশে এই শক্তি বৈষম্যের কোন অভাব নাই এবং এমন কোন সমাজতন্ত্রের কথা কল্পনা কয়া যায় না যেখানে কোন না কোন জাতীয় বৈষম্য আসিয়া মানুষের মধ্যে বিরোধকে সৃষ্টি করিবে না।

তবেই দেখা যাইতেছে যে মানুষের মধ্যে বিরোধকে সংযত করিতে গেলে কেবলমাত্র জড় বুদ্ধি দ্বারা তাহা করা যায় না। অধ্যাত্মবোধের গোড়াকার কথাই এই যে মানুষ মানুষকে মিত্র বলিয়া মনে করিবে, মানুষের দুঃখে দুঃখিত হইবে, মানুষের অপরাধকে ক্ষমা করিতে শিখিবে ও মানুষের সুখে সুখী হইবে। এতাদৃশ আধ্যাত্মবোধের সঙ্গেও সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে একপ্রকার সমাজতন্ত্রবাদ। এই সমাজতন্ত্রবাদ ধনিক ও শ্রমিকের লড়াইয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—এর প্রতিষ্ঠা হইতেছে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যাহাতে তাহার যে কলুষ-মলিন, হিংস্র প্রবৃত্তি রহিয়াছে তাহাকে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তাহাকে অপরের ন্যায্য দাবী সম্বন্ধে অন্ধ করিয়াছে—তাহাকে পরাভূত করিয়া অপরকে নিজের তুল্য বলিয়া মনে করিতে অভ্যস্ত করে। বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে—'সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য' সকল মানুষকে আপনার তুল্য জ্ঞান করাকেই ঈশ্বরের আরাধনা বলে। এই মন্ত্রই ভারতবর্ষের মন্ত্র। এই আত্ম সংযমের পথে মানুষকে নিরন্তর শিক্ষা দেওয়া ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধন পদ্ধতি। ইহা শুধু ধনসাম্য চায় না—ইহা চায় মানুষের সহিত মানুষের যে একান্ত ঐক্য রহিয়াছে—তাহাকে প্রেমে ও বুদ্ধিতে অনুভব করা। এই অনুভবের

ফলে যে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। জড়বাদের পরিণতিতে য়ুরোপে এখন শান্তির জন্য প্রচার করার কোন অর্থ হয় না—কারণ তাহার সমস্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাহার প্রতিকূলে গড়িয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে হিংসাকে বারণ করিবার জন্য যে অহিংস রীতি প্রচলিত হইয়াছে তাহাও হিংসারই নামান্তর। হয়ত কোন ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে এ কথা না খাটিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশের পক্ষে এই কথা প্রযোজ্য। আমি যদি কাহারও কোন বস্তুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা করিয়া বা কোন বিধানকে বিফল করিবার জন্য অস্ত্র নাই বলিয়া অনশন ব্রত অবলম্বন করি তবে সে অনশন ব্রত বলাৎকারের নামান্তরমাত্র। বলপ্রয়োগ না করিয়াও যে বলপ্রয়োগের তুল্য ফল অনেক সময় লাভ করা যায়—তাহার মূলে কোন প্রেমের বন্ধন নাই—কোন আত্মীয়তা বোধ নাই। আত্মীয়তা বোধ ব্যতিরেকে যে উপায়েই আমরা অপরকে আপনার ইচ্ছার অধীন করিতে চেষ্টা করি না কেন তাহাই হিংসা। যে বুদ্ধি অপরের প্রতি আত্মীয়তা প্রযুক্ত এবং অপরের মঙ্গলানুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে—আপনাকে সংযত ও শুচি রাখিয়া প্রেমের মাহাত্ম্যে অপরকে ন্যায়ের পথে নিতে চেষ্টা করে তাহাই যথার্থ অহিংস প্রণালী।

য়ুরোপে জড় শক্তির প্রতি শ্রদ্ধায় যে শক্তি গড়িয়া উঠিয়াছে—তাহা আজ না হয় কাল ধ্বংস হইতে বাধ্য। দুই চার শত বৎসর বা দুই চার সহস্র বৎসর ইতিহাসের চক্ষে অতি সামান্য। য়ুরোপের জড় শক্তির প্রতি শ্রদ্ধা এবং জড় বিজ্ঞানের উন্নতি তাহার এমন জায়গায় আনিয়াছে যে আজ তাহাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস না করিয়া এই দুই শক্তির আর গত্যন্তর নাই। এই ধ্বংস হইতে নূতন বোধের উৎপত্তি হইবে, যে বোধ তাহাকে আধ্যাত্মবোধের উপর, মানুষের প্রতি মানুষের ঐক্য বোধের উপর, তাহার সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে বাধ্য করিবে। আমাকে অনেকে য়ুরোপে এই কথা বলিয়াছে যে "আজ আমরা তোমার দেশের মহাবাণী শুনিতে অসমর্থ, কিন্তু এমন দিন আসিবে যেদিন সেই বাণীর জন্য আমরা লালায়িত হইব। সে দিন পর্য্যন্ত কি তোমরা তোমাদের এই মহাবাণীকে যথার্থ জীবনের দ্বারা মহামানবের কল্যাণের জন্য জাগ্রত করিয়া রাখিতে পারিবে?" এই অধ্যাত্মবোধের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দূর হইয়া যাইবে সাম্রাজ্যতন্ত্রের গ্লানি ও সমাজতন্ত্রের সঙ্কীর্ণতা। ভারতবর্ষের পক্ষে এইটেই একান্ত কর্ত্তব্য যে ভারতবর্ষ যে পথেই চলুক না কেন সে যেন তাহার প্রাচীনেরা যুগব্যাপী তপস্যায় ঐকাত্মবোধের যে প্রদীপটী জ্বালিয়া গিয়াছেন সমস্ত জীবনের সাধনাকে সেই প্রদীপের মধ্যে স্নেহ ধারায় ঢালিয়া দিয়া সেই চিরন্তন দীপটীকে সর্ব্ব মানবের মহা কল্যাণের জন্য দেদীপ্যমান রাখে। সমস্ত যাবনিক অনুকৃতি, সমস্ত ম্লেচ্ছ মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া সমগ্র ভারতের নরনারী প্রভাতে ও সন্ধ্যায়, জাগরণে ও স্বপ্নে যেন একটি মন্ত্র ঐক্যতানে গান করিয়া উঠেন—"মা মা হিংসীঃ"।

[প্রবন্ধের মতামত সম্পাদকীয় মতামত নহে। জঃ সঃ]

বিনয় ঘোষ

সেন্ট্ পল্স্ ও ওয়েষ্ট্ মিনিষ্টার এ্যাবের গির্জ্জায় সকলে গ্যাস মুখোস্ পরে' সমবেত কণ্ঠে ক্রুশবিদ্ধ যীশুর সামনে শান্তি প্রার্থনা করছে। শব্দমুখর লণ্ডন সহর নিস্তব্ধতায় সমাধিস্থ। মাঝে মাঝে উপরে শুধু বিমানের ঘর্ঘর শব্দ শুনা যায়। কৌতূহলী শিশুরা আজ স্থানান্তরে। হাইড্ পার্কে জনতার বিচিত্র সমাবেশের পরিবর্ত্তে আজ সেখানে মুখোস্ অভিনয় শিক্ষার আয়োজন হয়েছে। লণ্ডন, প্যারী, ওয়ারস, বার্লিন-এর উপর মানুষের নির্দ্দেশে অন্ধকার নেমে আসে—মগ্নমান্ তরীর যাত্রীর মত সকলে ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে—আকাশ থেকে বোমা বিস্ফোরণের শব্দ চারিদিকে তরঙ্গায়িত হয়ে যায়—শব্দ তরঙ্গে দেশবিদেশের মানুষ আমরা শুনতে পাই জাতিতে জাতিতে সংহার প্রতিযোগিতা আবার সুরু হয়েছে—

ইউরোপ আজ সমররত।

মধ্য ইউরোপ

এতদিন পরে যুদ্ধ তা হ'লে সত্যই আরম্ভ হ'ল। আমরা এতদিন ধরে' বলে এসেছি যুদ্ধ হবে না, হ'তে পারে না, অন্ততঃ এত তাড়াতাড়ি এত বড় একটা দায়িত্বকে যে ইউরোপ তথা সারা পৃথিবী বরণ করে' নেবে এ আমরা কেউ ভাবতে পারিনি। আমরা বরাবর শান্তির জন্যই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করে' এসেছি, কাগজে, কলমে, মুখে শান্তির জন্যই তর্ক করেছি। সে-তর্ক, সে-চেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হয়েছে। আমরা বলেছি ফ্যাসিষ্টদের নির্ম্মম নিপীড়ন যে কোন উপায়ে বন্ধ করা হোক্। পৈশাচিক প্রবৃত্তির কোনদিনই নিবৃত্তি সম্ভব নয়। আমরা বলেছি জার্ম্মাণী, ইটালি, জাপান প্রমুখ যে সব জাতি পশুবলের আকাশভেদী আস্ফালনে মত্ত তাদের সায়েস্তা করা হোক্। তা হয়নি। গ্রেট্ বৃটেন্, ফ্রান্স প্রমুখ বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশগুলির দিকে চেয়ে পৃথিবীর সমস্ত সন্ত্রস্ত জনগণ করুণকণ্ঠে মর্ম্মন্তুদ্ আবেদন জানিয়েছে ফ্যাসিষ্টদের উদ্ধত অগ্রাভিযান প্রতিরোধ করার জন্য, ফ্যাসিষ্টদের গর্ব্বোদ্ধত স্বেচ্ছাচারিতার সুমুখে নির্ভীকভাবে ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে সোজাসুজি দাঁড়াবার জন্য। সে-আবেদন মঞ্জুর করা হয়নি। আজ তাই ইউরোপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মাঝখানে হতভাগ্য শুশ্‌নিগ্, বেনেস্, নেগ্রিন্ এঁদের মূর্ত্তি স্পষ্ট হ'য়ে চোখের সামনে ভেসে ওঠে, শুনতে পাই স্পেনের জনগণের 'No Passaran' ধ্বনি, পাশিওনারিয়ার উদাত্ত কণ্ঠের প্রতিধ্বনি, অসহায় চেকদের হৃদয়স্পর্শী আর্ত্তনাদ, মাদ্রিদ্, ক্যাটালোনিয়া, বার্সিলোনা, প্রাগ্, ভিয়েনা এক দিকে, আর একদিকে মিউনিক্ ও মিনর্কা।

মিউনিক্ ও মিনর্কায় যে ভুল স্তূপীকৃত হ'য়ে রয়েছে, ওয়ারসতে তার প্রায়শ্চিত্তের সময় এল কি ?

সময় আসবেই। যে ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম নিজের কণ্ঠে ইউরোপের এই মহাসঙ্কটকে আহ্বান করেছেন, বিশ্বমানবতার আবেদনকে অগ্রাহ্য করে' পাশবিকতার জয় ঘোষণা করার মত যাঁর ধৃষ্টতা আছে, জার্ম্মাণীর সেই নাৎসী নেতা হিট্‌লারের মূলনীতি কি, তাঁর উদ্দেশ্যই বা কি ? আজ আলোচনার একমাত্র প্রাসঙ্গিক বিষয় তাই। নাৎসী নেতার এই মূলনীতি বুঝতে হ'লে জ্যামিতির জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। কারণ নাৎসী ও ফ্যাসিষ্টরা বলবেন যে তাঁদের রোম-বার্লিন নামক একটী "অক্ষ" (Axis) আছে, আর একটী 'ত্রিভুজ' আছে রোম-বার্লিন-টোকিও। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও আমেরিকার স্বার্থের সঙ্গে এই 'অক্ষ' বা 'ত্রিভুজের' কোন বিরোধিতা নেই। বিশ্বাস না হয়, তাঁরা বলবেন "আমাদের কোমিনটার্ণ-বিরোধী চুক্তি পড়ে দেখতে পার। আমরা যুদ্ধ করছি সাম্যবাদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ সোভিয়েট্ ইউনিয়নই আমাদের একমাত্র শত্রু।" ফ্যাসিষ্টদের এই যুক্তিকে কি গ্রেট্ বৃটেন ও ফ্রান্স ধ্রুবসত্য বলে' বিশ্বাস করেনি ? তাদের তোষণ ও উপঢৌকন নীতির মূলে কি এই বিশ্বাসের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় না ? যায়। তা না হ'লে মিউনিকে

সোভিয়েট্ ইউনিয়ন্ আমন্ত্রিত হয়নি কেন? বৃটিশ জাহাজ ডেভন্‌শায়ারে চড়ে' ফ্রাঙ্কোর সৈন্যদের মিনর্কায় যাবার কি অধিকার ছিল? কি অপরাধ করেছিল স্পেনের নির্য্যাতিত, বুভুক্ষাক্লিষ্ট জনগণ, চেকোশ্লোভাকিয়ার অধিবাসীরা যে আজ পোলিশদের মত প্রত্যক্ষভাবে দূরে থাক, তখন পরোক্ষভাবেও তাদের অস্ত্রশস্ত্র বা খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করে' সাহায্য করা হয়নি? ফ্রাঙ্কোর জয় স্বীকার করাতে এবং "চেকোশ্লোভাকিয়ার পর আমার আর কোন দাবী নেই মধ্য য়ুরোপে" হিট্‌লারের এই উক্তি বিশ্বাস করাতে কি রাজনীতিক যুক্তি ছিল? এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেলেই বোঝা যাবে যে জার্ম্মাণী,

ষ্ট্যালিন

ইটালি প্রমুখ ফ্যাসিষ্ট দেশগুলির বৈদেশিক নীতি যে রুষ-বৈরীতার উপর প্রতিষ্ঠিত গ্রেট্ বৃটেন্ ও ফ্রান্স বরাবর তাই বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করা যে ভুল হ'য়েছে সে কথা আজ অবিসংবাদিত সত্য। কম্যুনিষ্ট্ পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে ষ্ট্যালিন্ বিদ্রূপ করে' বলেছিলেন ফ্যাসিষ্টদের লক্ষ্য করে': "All 'we' have is a harmless 'Rome-Berlin axis', i.e., just a certain geometrical formula dealing with the axis... War against the interests of England, France and the United States? Nonsense! 'We' are waging a war against the Comintern, not against these states. If you don't believe it read 'the Anti-Comintern Pact' concluded between Italy, Germany and Japan. This is how Mossieurs Aggressors thought they would deceive public opinion, although it was not difficult to discern that this whole clumsy game at camouflage was preposterous because it

হিট্লার

is ridiculous to look for 'centres' of the Comintern in the deserts of Mongolia, in the mountains of Abyssinia, in the wastes of Spanish Morocco." ষ্টালিনের বিদ্রূপ কি সঙ্গত হয়নি? কোমিনটার্ণের কেন্দ্র মাঙ্গোলিয়ার মরুভূমিতে, আবিসিনিয়ার পর্ব্বত গুহায় বা স্পেনীয় মরক্কোর পোড়ো জমির মাঝখানে অনুসন্ধান করা হাস্যকর। অনুসন্ধান যাঁরা করেন তাঁরা তো নিশ্চয়ই বোকা, আর যাঁরা এই অনুসন্ধানে আস্থা রাখেন তাঁরা বোকারও অধম।

এই নির্ব্বুদ্ধিতার আস্তরণ অনেক পুরু হ'য়ে জমে' ছিল বলেই সোভিয়েট্-জার্ম্মান চুক্তি গ্রেট্ বৃটেন ও ফ্রান্সের কাছে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত মনে হ'য়েছে। অথচ এ-রকম মনে হবার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণই নেই। এই বজ্রাঘাতে স্তম্ভিত বৃটিশ ও ফরাসী প্রধান মন্ত্রী না হ'তেও পারতেন। সোভিয়েট্ রাশিয়া সে-অবকাশ তাঁদের যথেষ্ট দিয়েছিল। নাৎসী নেতার উদ্দেশ্য সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করার প্রচুর সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন। মস্কো থেকে বহুবার তার ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে' পাঠান হ'য়েছে। সতর্ক বাণী মস্কো থেকে বার বার এসেছে। সোভিয়েট্ ইউনিয়ন বহুবার তাঁদের সানন্দে অভিনন্দন জানিয়েছে ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তি মোহড়া গঠনের জন্য। অনাবশ্যক, অ-সাময়িক বলে' তখন সে অভিনন্দনকে প্রত্যাখ্যান করা হ'য়েছে। স্বদেশের প্রবীণ দূরদর্শী রাজনীতিকরা (লয়েড্ জর্জ্জ, চার্চ্চিল্ প্রভৃতি) পর্য্যন্ত বহুবার বলেছেন সন্দেহ দূর করে' সোভিয়েট্ ইউনিয়নের সঙ্গে একত্রে ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে। সুদীর্ঘ চার মাস সময়ও তাঁরা পেয়েছিলেন নিজেদের মতি স্থির করার জন্য। কিন্তু কিছুতেই কিছু হ'ল না শেষ পর্য্যন্ত। চার মাসে, চার মাসে কেন চার বছরে যা সম্ভব হ'ল না, রাতারাতি জার্ম্মাণ বৈদেশিক মন্ত্রী রিবেনট্রপের পক্ষে তাই সম্ভব হ'ল। সম্ভব হবেই। কারণ যে কয়মাস যাবৎ ইঙ্গ-সোভিয়েট্ আলোচনা চলেছে, সে কয়মাস জার্ম্মাণীর সমরকর্ত্তারা শান্তি পাননি। তাঁরা খুব বিশেষভাবেই জানতেন যে যদি সোভিয়েট্ ইউনিয়নের শক্তি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে একত্রিত হয় তা হ'লে বৃহৎ-জার্ম্মাণীর স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। রাশিয়ার লাল ফৌজ, আর্থিক শক্তি ও সুপ্রচুর
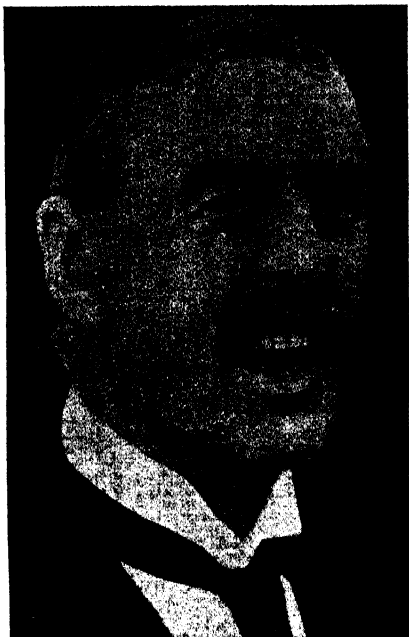
চেম্বারলেন

সমরোপকরণকে তাঁরা কোন দিনই উপেক্ষা করেননি। তাঁরা জানতেন যে ভের্সাই চুক্তিকে যদি টুক্‌রো টুক্‌রো করতে হয়, ইউরোপে ফ্রান্স ও বৃটেনের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করে' যদি বিগত মহাযুদ্ধের প্রতিশোধ নিতে হয় তা হ'লে পৃথিবীর নূতন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তিকে মিত্র হিসাবে না পেলেও, রণাঙ্গনে শত্রু হিসাবে না পাওয়ার আয়োজন সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। সুবিধা এতদিন হয়নি এবং খুব বেশী প্রয়োজনও হয়নি। ডান্‌জিগ ও পলিশ করিডোর নিয়ে যখন সত্যই বিপদ ঘনিয়ে উঠল তখন তাগিদ এল বেশী। এতদিন ধাপ্পাবাজী আর প্রতারণাতে কাজ হাসিল হয়েছে। আর সে-কৌশল চলে না। সুতরাং দ্রুত মীমাংসার প্রয়োজন হ'ল। চুক্তি করে' জার্ম্মাণী সোভিয়েট রাশিয়াকে নিরপেক্ষ অবস্থায় রাখলে। গ্রেট্ বৃটেন ও ফ্রান্সে কলরব উঠল যে রাশিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, গণতন্ত্র ও শান্তির বিরুদ্ধাচরণ করেছে। কিন্তু চীৎকার করে' সত্যকে ঢেকে রাখা যায় না, সত্য আরও প্রকট হ'য়ে চারিদিকে প্রকাশ হ'য়ে পড়ে।

সোভিয়েট্-জার্ম্মান্ চুক্তিতে যেসত্য প্রকাশিত হ'য়েছে সে হ'চ্ছে এই যে কোমিণ্টার্ণ-বিরোধী চুক্তি আজ ফ্যাসিষ্টদের বাতুলতা বলে' প্রমাণিত হ'য়েছে। জার্ম্মাণীর সোভিয়েট্ ইউনিয়নকে আক্রমণের উদ্দেশ্যের উপর আস্থা রেখে গ্রেট্ বৃটেন্ ও ফ্রান্স তাকে তুষ্ট করে' যে বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিচ্ছিল, তা আজ নির্ব্বুদ্ধিতা ও অরদূরদর্শিতার চরম বলে প্রমাণিত হ'য়েছে। সুদূর প্রাচ্যে উদীয়মান ফ্যাশিষ্ট জাপানের পশ্চিমে বার্লিনে ও রোম থেকে নিরাপত্তার নোঙর ছিঁড়ে গেছে। জাপানের অবস্থা আজ বিপুল সমুদ্রের মাঝখানে নোঙর ছেঁড়া নৌকার মত। জাপানের নূতন প্রধান মন্ত্রী আবে জার্ম্মানিকে বিশ্বাসঘাতক বলে' ঘোষণা করেছেন। আর সোভিয়েট্ ইউনিয়ন্ তার বৈদেশিক নীতির সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে উদ্দেশ্য,—"...to be careful and not to allow our country to be involved in conflicts of instigators of war, who are used to get other people to pull the chestnuts out of the fire for them."—সেই উদ্দেশ্য সফল করতে সক্ষম হ'য়েছে। নিজেরা আগুন জ্বেলে অন্যকে তার মধ্যে নিক্ষেপ করার

স্মিগলীরিজ

চেষ্টা করলে সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং উল্টে নিজেদেরই তারমধ্যে যে নিক্ষিপ্ত হ'তে হয় তার সব দহনীয়তা সহ্য করার জন্য—সোভিয়েট্ ইউনিয়ন্ তাই-ই প্রমাণ করেছে। জার্ম্মান্-সোভিয়েট্ চুক্তিতে আর যে-সত্য এবং বৃহত্তম সত্য প্রকাশিত হয়েছে সে হ'চ্ছে জার্ম্মাণী কালবিলম্ব না করে'

পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং কিছুদিন পরে বৃটেন্ ও ফ্রান্স জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে।

কে কার আগুনে নিক্ষিপ্ত হল ?

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন "Hitlerism must go"। প্রশংসনীয় ঘোষণা। নাৎসীবাদ ধ্বংস করার জন্য বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তারিফ আমরা এই উদ্দেশ্যকে করি। বৃটিশ প্রেস্ আজ নাৎসীবাদের বর্ব্বরতা প্রচারে উন্মুখ। মিউনিক চুক্তির পর 'ষ্টেট্স্ম্যান্' 'C. M. G.' নাম দিয়ে 'Chamberlain Must Go' বলে' ছোট একটি সম্পাদকীয় লিখেছিলেন, আজ সেই 'ষ্টেট্স্ম্যান্ নাৎসীবাদ কেন ধ্বংস হওয়া উচিত তারই ব্যাখ্যা করছেন। অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! ব্যাখ্যা অখণ্ডনীয়। আমরাও বলি নাৎসীবাদ ধ্বংস হোক্। জার্ম্মানির সামরিক শক্তি প্রচুর, কিন্তু ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মিলিত শক্তির কাছে জার্ম্মাণীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। জার্ম্মাণীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার সুনির্দ্দিষ্ট ইঙ্গিত জার্ম্মাণীর পরাজয়ের দিকে। 'Hitlerism will go'—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপর ?

দেলাদিয়ার

বিরাট প্রশ্ন। জবাব ইতিহাস দেবে।

লয়েড জর্জ্জ বলেছিলেন কিছুদিন আগে যে বলশেভিক্ জার্ম্মাণী বলশেভিষ্ট রাশিয়া অপেক্ষাও বৃটেনের বড় শত্রু। কথাটা উদীয়মান নাৎসীবাদকে তখন পরোক্ষে সমর্থন করেই বলা হ'য়েছিল। আজ 'Hitlerism must go'—র পরে লয়েড জর্জ্জের সেই পুরাতন শঙ্কা পুনরুদয়ের কোন সম্ভাবনা নেই কি ?

এরও জবাব আশু ইতিহাস দেবে।

আমরা কি করব ? শুনতে পাচ্ছি Imperialism, Democracy, ও Fascism (Neo-Imperialism)—এই তিনটি শক্তির দুটি নাকি যুদ্ধে রত হয়েছে। 'গণতন্ত্র' বনাম 'নব-সাম্রজ্যবাদ' (ফ্যাশিজম্), না, 'নব-সাম্রাজ্যবাদ' বনাম 'প্রাচীন সাম্রাজ্যবাদ' ? উত্তর চাই।

এই প্রশ্নের বুদ্ধিমান্ উত্তরের উপর ওয়ার্দ্ধাগঞ্জে আমরা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মীমাংসা প্রত্যাশা করি।

ভারতবর্ষ মুক্তকণ্ঠে গণতন্ত্রের দাবী করে এবং গণতন্ত্র সমর্থন করে। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর আগে চাই।

কলিকাতা, ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯

গ্রন্থ-পরিচয়

Soviet Russian Literature

—Gleb Struve, Routledge.

প্রাগবৈপ্লবিক রুশ-সাহিত্য জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারের একটী অপূর্ব সম্পদ। দেশে দেশে যুগে যুগে মানবের অন্তর-লোকে যত বেদনা, যত অশ্রু পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে রুশিয়ার তৎকালীন সাহিত্য তাকে চেতনা দিয়েছে, রক্তমাংসে তাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। যত প্রেম, যত হর্ষ, যত আনন্দবোধ মানব মনে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে, পুশকিন্, গোগোল, ডষ্টয়েভ্স্কি, টুর্গেনিভ, উস্পেন্স্কি, চেকভ, লিওনিদ, আন্দ্রেভ, টলষ্টয়, গর্কি প্রভৃতির শিল্পী মন তাকে মূর্ত করেছে। কিন্তু এ সত্বেও প্রাগবিপ্লব রুশ-সাহিত্যের জীবন চিত্রে আনন্দে সমুজ্বল নয়। সুখের রামধনু সব সময়ই বেদনার মেঘেসমাচ্ছন্ন। সমস্ত সাহিত্যের ভিতর আছে একটী মৃত্যু-ম্লান বিষাদের ছবি। এ বিষাদ-সিন্ধু মন্থন করে প্রাগবিপ্লব যুগের রুশ সাহিত্যিকগণ যে অমৃত লাভ করেছিলেন তা হল মানবতার প্রতি গভীর দয়া ও সুবিশাল সহানুভূতি। এ অমৃতের বলেই রুশ-সাহিত্য বিশ্বের দরবারে অমর ও অক্ষয় হয়ে থাকবে।

সোভিয়েট্ সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই প্রশ্ন আসে ইহা প্রাগবিপ্লব যুগের সাহিত্য হতে সম্পূর্ণ প্রকৃতিগত না বিকাশ ভঙ্গীতে বিভিন্ন। আলোচ্য গ্রন্থের প্রথমেই এ কথা উঠিয়েছে 'The first question which arises when one approaches the problem of present-day Russian literature is: whether there is such a thing as Soviet literature, or whether the Russian literature of to-day even if we take only the literature inside Russia, ought to be regarded as merely a phase—a very special one, determined by peculiar, extra-literary conditions—in the general evolution of Russian literature? সাহিত্যের ক্ষেত্রে এমন ছেদ-রেখা টানা অত্যন্ত শক্ত। কারণ প্রাগবিপ্লব ও বিপ্লবোত্তর সাহিত্যের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য প্রাণময় ধারা রয়ে গেছে যার ফলে শত বিভিন্নতার মধ্যে ও ঐক্য সূত্রের

কোন অভাব দেখা যায় না। তাছাড়া সোভিয়েট্ সাহিত্যকে সম্পূর্ণভাবে শ্রেণী সাহিত্য হিসাবেও বিচার করা যায় না। কারণ শ্রেণী সাহিত্য, শ্রেণী সংস্কৃতি বলে কোন বিশেষ সৃষ্টি মানব ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যায় না। পরস্পরের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, ঘাত প্রতিঘাতের ফলে বিভিন্ন সাহিত্য ও সভ্যতা সম্ভব হয়েছে। শুধু একই শ্রেণী দ্বারা সে সৃজন সম্ভব নয়।

ট্রট্স্কী তাই তাঁর Literature and Revolutionএ বলেছেন, 'there is no proletarian culture & that there never will be any....Such terms as 'Proletarian literature' and 'Proletarian culture' are dangerous, because they erroneously compress the culture of the future into the narrow limits of the present day. They falsify perspectives, they violate proportions, they distort standards and they cultivate the arrogance of small circles which is most dangerous.'

কাজেই বিপ্লবোত্তর রুশ সাহিত্যকে সোভিয়েট্ সাহিত্য হিসাবে স্বীকার করে নিতে প্রথমেই অনেক অসত্য ও অযৌক্তিকতার মুখোমুখি হতে হয়।

গ্রন্থকার ও শ্রেণী বনাম মানব-সাহিত্য সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট জবাব দেননি।

আলোচ্য পুস্তকটী মিরস্কি প্রণীত—A History of Russian Literature & Contemporary Russian Literature Vols 1, 2—গ্রন্থের অনুপূরক বলা যায়। মিরস্কি রুশ সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন তার উৎপত্তি কাল হতে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত। ১৯২৪ সাল হতে বর্তমান ক্রমবিকাশ ও পরিণতির ধারা পাওয়া যায় ষ্ট্রাভের এ পুস্তকে। বিপ্লবের পর সোভিয়েট সাহিত্যের ক্রমবিকাশকে নিম্নলিখিত পাঁচটী পর্য্যায় ফেলা যায়।

১। ১৯১৮—২০—প্রলেটারিয়ান সাহিত্য ও প্রলেটারিয়ান্ কৃষ্টি সংস্থাপনের প্রচেষ্টা।

২। ১৯২১—২৪—প্রলেটারিয়ান সাহিত্যিকগণ ভিন্ন পন্থী সাহিত্যসেবীদের (Fellow Travellers) সাথে সহযোগিতা স্থাপন ও গণ-সাহিত্য সমৃদ্ধির চেষ্টা।

৩। ১৯২৫—২৮—গণ-সাহিত্যের জন্য বিশেষ সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা ও সাহিত্যক্ষেত্রে ব্যক্তিগত রুচি বৈশিষ্ট্য ও স্বাধীনতা মেনে নেওয়া।

৪। ১৯২৯—৩২—Five-year-planএর সাথে সাহিত্যের সব কিছু যুক্ত করে দেওয়া। সাহিত্যের উপর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার প্রয়োগ ও একমুখী বিকাশ।

৫। রাষ্ট্রীয় বন্ধনের আংশিক শিথিলতা ও 'সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা'র (Socialist Realism) উদ্দেশ্য ক্ষুণ্ণ না করে সাহিত্যসেবীদের যথাসম্ভব স্বাধীনতা প্রদান।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার বলে ১৯২৯—৩২ সাল পর্যন্ত—Five Year Planএর উদ্দেশ্য ও আদর্শদে সাহিত্যের একমাত্র বিষয়বস্তু বলে নিরূপিত হয়। আমলাতন্ত্রের কঠোরতা ও কমিউনিষ্ট দলের

গোঁড়ামি তখন এত প্রবল হয় যে রাজনীতির বাইরে সাহিত্য ও শিল্পের কোন অস্তিত্ব থাকে না। ম্যাক্স্ ইষ্টম্যান তাঁর Artist in Uniform' পুস্তকে ও সময় সাহিত্য রাজনীতি দ্বারা কিরূপ পদানত ও শৃঙ্খলিত ছিল তা অতি তীব্র ভাষায় বলেছেন During Five Year Plan which drew literature into the task of 'Socialist Costruction' art in Soviet Russia has been set in motion so to speak only by 'the whiplash of doctrine and has now become merely the slavish instrument of Stalinism উগ্র কমিউনিষ্টদের নিকট 'method of creative art' ও 'method of dialectric materialism.' একই জিনিষ বলে তখন বিবেচিত হত।

রাষ্ট্রনীতির নিগড় বন্ধনে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। ধীরে ধীরে তার প্রতিক্রিয়া সুরু হয়। কমিউনিষ্ট পার্টি ও নিজেদের গোড়ামি সম্বন্ধে সচেতন হয়। ১৯২৫ সালে কেন্দ্রীয় সমিতি সাহিত্য ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দিতে সুরু করে এবং সাম্প্রদায়িকতা বর্জনে এতদূর তৎপর হয় যে 'প্রলেটারিয়ান' শব্দটি পর্য্যন্ত তাদের প্রস্তাবে ব্যবহার করেন নি। প্রলেটারিয়ান সাহিত্য না বলে একে 'art of workers and peasants who become, in the process of cultural elevation of the large masses of the people, workers and peasants' writers.'

সিদ্ধান্ত হয় যে কোন মতবাদ দল বা সাহিত্য-চক্র পার্টি'র তরফ হতে চলতে পারবে না 'no literary current, school or group must come forward in the name of the party.'

পার্টি' 'communist snobbery'কে তীব্র ভাবে নিন্দা করে প্রলেটারিয়ান লেখকদের সম্বন্ধে বলেছে 'Just because the party sees in them the future ideological leaders of soviet literature, it must fight by all means against the frivolous & contemptuous attitude to the old cultural heritage as well as to the specialists of literature'

The party must also fight against the attempt at hot-house 'proletarian' literature ?

পার্টির এ মতান্তর গ্রহণের পর হতেই রুষ-সাহিত্যে নূতন অধ্যায় সুরু হয়েছে। বাস্তবতা ও সুগভীর মানবতাবোধ এ যুগের সাহিত্যের প্রাণ। এ প্রাণ রসে উদ্‌জীবিত হয়েই শুধু সমাজতন্ত্রীসৃষ্টি সফল, সরস ও সমুজ্বল হতে পারে। সমাজতন্ত্রী বাস্তবতার উদ্দেশ্য হল 'the creation of works of high artistic significance saturated with the heroic struggle of the international proletariat, with the grandeur of the

Victory of Socialism, and reflecting the great wisdom & heroism of the Communist Party .....the creation of artistic works worthy of the great age of socialism.'

সলকভের 'কোয়াইট্ ফ্লোস দি ডন,' 'ভার্জিন সয়েল আপটার্ণড্,' প্যান ফেরভের 'ব্রুসকি' প্রভৃতি উপন্যাসে উক্ত আদর্শ অনেকটা প্রতিফলিত হয়েছে। ম্যাক্সিম গোর্কীর বাই ষ্টেণ্ডার্ড ও মেগ্নেট—দু'খণ্ডের বিরাট উপন্যাসে বিপ্লব ও পরবর্তী যুগের আশা আকাঙ্খা, আদর্শানুরাগ ও কর্মপ্রবণতা অনেকখানি মূর্ত হয়েছে। নায়ক ক্লিম সেমগিনের মুখে বর্তমান রুশিয়ার সৃষ্টি ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে বলেছেন 'Everything is possible. Everything is possible in this mad country where men are desparately inventing themselves & where all life is a bad invention.'

গোর্কীকে সত্যিকার গণ-সাহিত্যের চারণ বলা যায়। তার সাহিত্যের 'জীবন-দেবতা' হল মানুষ। তাই তিনি বলেছেন 'যতদিন পর্য্যন্ত আমরা মানুষকে আমাদের গৃহ বা সমাজের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর ও শ্রদ্ধার বস্তু হিসাবে দেখতে না শিখবো, ততদিন আমরা আমাদের ভণ্ডামি ও ভয়াবহতার হাত থেকে মুক্তি পাবো না। এই বিশ্বাস নিয়েই আমি পৃথিবীতে এসেছি। এই বিশ্বাস নিয়েই একদিন পৃথিবী থেকে বিদায় নেবো যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে সুন্দর ও পবিত্র বস্তু হচ্ছে মানুষ।'

জীবনের সকল ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যের মধ্যে ও তিনি বলেছেন 'আমাদের বাঁচতে হবে, যতক্ষণ না সহ্যের সীমা পেরিয়ে যায়। আমাদের দাঁড়াতে হবে, যতক্ষণ না আমাদের মেরু দণ্ড ভেঙ্গে পড়ে'।

গোর্কী সাহিত্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছেন 'মানুষের আত্মবিশ্বাস জাগরিত করা, সত্যের প্রতি তার আকাঙ্খাকে বাড়িয়ে তোলা, মানুষের মধ্যে যা কিছু কুৎসিত তার ধ্বংস সাধন করে সুন্দরের সন্ধান দেওয়া, আর ভিতরকার শক্তি ও সাহসকে বৃদ্ধি করে যে কোনও কাজে তাকে উদ্দীপিত করা অর্থাৎ এক কথায় সৌন্দর্য ও শক্তির পূর্ণ জ্যোতিতে মানুষকে পরিপূর্ণ করে তোলাই সাহিত্যের কাজ। গোর্কীর তিরোধানে রুষ সাহিত্যের তথা বিশ্ব সাহিত্যের যে ক্ষতি হল তা অপূরণীয়।

আলোচ্য গ্রন্থটী ১৯২৪ সালের পর হতে সোভিয়েট সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস হিসাবে বেশ সুখপাঠ্য ও তথ্যপূর্ণ হয়েছে। শেষ অধ্যায়ে সাহিত্যে সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা, জাতীয়তা বনাম আন্তর্জাতিকতা, ক্লাসিসিজম্ বনাম আধুনিকতা প্রভৃতির আলোচনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পুস্তকখানা তথ্য বহুল হয়েছে নিঃসন্দেহ কিন্তু এ সকল তথ্যের পিছনে সোভিয়েট সাহিত্যের স্বরূপ ও বিশিষ্টতা যেন সম্যক পরিস্ফুট হয়ে উঠে নি।

নির্মল দত্ত

পদ্মা-প্রমত্তা নদী (উপন্যাস)

শ্রীসুবোধ বসু প্রণীত ও চিত্রাঙ্গদা পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

দুই খণ্ডে ৩১০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। দাম তিন টাকা।

গ্রন্থকার কয়েকখানা উপন্যাস লিখে পাঠকসমাজে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর রচনার সঙ্গে কিছু কিছু পরিচয় আমার পূর্ব্বেও ছিল, আর এই আলোচ্য বইখানাকে বিশেষ যত্নের সাথেই আমি পড়েছি। সত্যি কথা বোলতে কি, খুব খুসী হতে পারি নি। যে ভাবালুতার আতিশয্যে তাঁর আগের বইগুলুকেও মেদবহুল মনে হোয়েছে, বর্ত্তমান গ্রন্থখানিও তার থেকে মোটেই মুক্ত নয়। কথার পর কথা ফেনায়িত হয়ে উঠে বইখানাকে একেবারে আচ্ছন্ন করে দিয়েছে। অথচ, কোন চরিত্রই স্পষ্ট রেখায় বিশিষ্টভাবে রূপায়িত হয়ে ওঠে নি। পাকা হাতের নিপুন স্পর্শে এ বইয়ের আকৃতি আরো অনেক কমে যেত, সে বিষয়ে মোটেই সন্দেহ নেই।

উপন্যাসখানির কল্পনা ভালোই হোয়েছে, যদিও এ ধরণের রচনা পশ্চিমে বহু হোয়েছে এবং হোচ্ছে এবং আমাদের সাহিত্যেও যে কিছু কিছু না হোয়েছে তা নয়। এই সম্পর্কে বিশেষ করে শ্রীযুত মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝির' কথা মনে পড়ে। সেখানেও পদ্মার সেই উদ্দাম রূপ। কিন্তু আবেষ্টন একরূপ হলেও পরিণতি দু' বইয়ের সম্পূর্ণ আলাদা। সুবোধবাবুর দৃষ্টিতে পদ্মার উদ্দামতা ও ভীষণতার অন্তরালে এক গভীর মঙ্গলময় মূর্ত্তি প্রতিভাত হোয়েছে। তাকেই তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন তাঁর উপন্যাসের নায়ক রজতচরিত্রের মধ্য দিয়ে। তাই কৈশোরে যে চঞ্চল, যৌবনে যে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার আদর্শে প্রণোদিত, সেই শেষে তার জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেল সর্ব্বত্যাগী শান্ত সন্ন্যাসে।

পূর্ব্বেই বলেছি, আইডিয়াটা বেশ ভালো, কিন্তু গ্রন্থকারের অক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাকে রূপ দিতে। কৈশোর পর্য্যন্ত রজতের চরিত্রকে মোটামুটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত এবং স্বাভাবিকই মনে হয়, কিন্তু গোল বেঁধেছে তার পরে। পদ্মার প্রভাব পুষ্ট যে দৃঢ় তীব্র স্বাধীন চরিত্র গ্রন্থকার আঁকতে চেয়েচেন, রজতের পরবর্ত্তী জীবনের মধ্যে যেন তার বিশেষ প্রত্যয়সূচক প্রমাণ মেলেনা। তাই তার স্বদেশীর মধ্যে কোন স্বকীয় প্রেরণা নেই; এবং শেষ পর্য্যন্ত এ কথাই মনে হয় যে সুমিত্রার প্রেমের আকর্ষণ ছাড়া শুধু স্বদেশিকতার টানে সে কোন আন্দোলনে ঝাপিয়ে পড়তো কিনা তাও সন্দেহ। তারপরে সুমিত্রার অকালমৃত্যুতে যখন আর তাদের মিলন ঘটা সম্ভব হলো না, তখন বিরহের ওরকম নাটকীয় অভিব্যক্তি এবং বাইজি-বাড়ীর তরল উত্তেজনায় তাকে ডুবিয়ে রাখার প্রচেষ্টা—এসব কিছুই রজতের কল্পিত সবল চরিত্রের

সাথে খাপ খায় না। তারপরে সুমিত্রার চরিত্রেও কোন নতুনত্ব নেই; বাস্তবে তার সাক্ষাৎ না মিলিলেও ভাবাবেগের বাষ্প ঢাকা বাংলার উপন্যাস-সাহিত্যে বার বার তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। বইয়ের আর সব চরিত্র এই তুই প্রধান চরিত্রকেই ফুটিয়ে তোলার জন্য উপস্থিত করা হোয়েছে, সেগুলু বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়।

লেখকের ভাষায় বেগ আছে, রঙ আছে, এক কথায় ঐশ্বর্য্য আছে। কিন্তু উপন্যাস রচনায় তাই একমাত্র অথবা প্রধান গুণ নয়। সব চেয়ে বড় কথা বাস্তবতা, যার একান্ত অভাব এই বইয়ে লক্ষ্য করেছি। অভিজ্ঞতার ভিত্তির ওপর না দাঁড়িয়ে শুধু কল্পনার নভোবিহারে আর যাই হোক উপন্যাস লেখা চলেনা, বাংলার ক্রমবর্দ্ধমান উপন্যাসিকদের দল কবে এ কথা ভাল করে বুঝতে পারবেন?

বিজন সেনগুপ্ত

সম্পাদকীয়

মহাজাতি সদন—

কলিকাতা চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে মহাজাতি সদনের উদ্বোধন উপলক্ষে বিশ্বকবি রবীন্দ্র নাথ তাঁর অভিভাষণের একাংশে বলেছেন 'আজ এই মহাজাতি সদনে আমরা বাংলা জাতির যে শক্তির প্রতিষ্ঠা করবার সঙ্কল্প করেছি তা সেই রাষ্ট্রশক্তি নয়, যে শক্তি শত্রু মিত্র সকলের প্রতি সংশয় কণ্টকিত। চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। বীর্য এবং সৌন্দর্য, কর্ম্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যায় এবং জনসেবার আত্মনিবেদনে, এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান। অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ হোক, বাংলা দেশের যে আত্মিক মহিমা নিয়ত পরিণতির পথে নব যুগের নব প্রভাতের অভিমুখে চলেছে। অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্দ্ধাকে দুর্গম পথে সমুখের দিকে অগ্রসর করছে সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতি সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্তরূপ গ্রহণ ক'রে বাঙালিকে আত্মোপলব্ধির সহায়তা করুক'।

বাঁটোয়ারা বিরোধী সম্মেলন—

গত ২৭শে আগষ্ট শ্রীযুত আণের সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় বাঁটোয়ারা বিরোধী সম্মেলন হোয়ে গেছে, ১৯৩৩ সালের ১৭ই আগষ্ট 'র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড' জাতীয়তা ও গণতন্ত্র বিরোধী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ভারতের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তার যে দুর্দিনের সূচনা করেছিলেন এই কয় বছরে তা' উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে জাতীয় জীবনে গ্লানিকর আবিলতায় পঙ্কিল করে তুলেছে। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতের রাষ্ট্রীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতা আমদানী হইবার পর থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব, কলহ ও দ্বেষ ক্রমবর্ধমান হোয়ে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন কার্যকরী হবার পর থেকে ভীষণ আকার ধারণ করেছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন জাতীয় জীবনে উৎকেন্দ্রিক শক্তিগুলিকে গতিবেগ দিয়ে সাম্প্রদায়িক সমস্যার আরও জটিলতার সৃষ্টি কোরে জাতীয়তার শ্বাসরোধ করবার উপক্রম করেছে।

স্বার্থ-সচেতন কতিপয় ব্যক্তির দাবী শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়ে সাম্প্রদায়িকতার এক নগ্নরূপ প্রকাশিত কোরেছে—জাতীয় ঐক্য হোয়েছে শতধা বিচ্ছিন্ন, গণতন্ত্র হোয়েছে লাঞ্ছিত। গণতন্ত্রের

প্রাথমিক আইনানুযায়ী সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজনৈতিক ঔদার্য সংখ্যালঘিষ্টের নির্ভরস্থল। এ ছাড়া সংখ্যালঘিষ্টের স্বার্থরক্ষার অন্য যে কোন প্রকার অস্বাভাবিক ব্যবস্থাই সংখ্যালঘিষ্টের ক্ষতি সাধন করে স্বৈরাচারের প্রবেশ পথ পরিষ্কার করে দেবে। ভারতের মুসলিম নেতৃত্বের এক অংশ জাতীয় সংহতি, ঐক্য, গণতন্ত্র ও সর্বশেষ ভারতের অখণ্ড সত্ত্বাকে অস্বীকার কোরেছে—র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে।

কংগ্রেসের বাইরে ভারতের হিন্দু সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে সকল অনিষ্টের মূল বলে ভুল করে বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে অভিযান করে আসছেন। কংগ্রেসও তাদের আক্রমণ এড়ায় নাই। কারণ, তাদের ধারণা কংগ্রেসের বাঁটোয়ারা সম্পর্কে 'না—গ্রহণ না—বর্জ্জন' নীতিই নাকি সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতিকে উদ্দীপিত করেছে। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ভারতের কোন শুভার্থীই সমর্থন করবে না, বরং তার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করে জাতীয় জীবনের এই কালিমাময় অধ্যায় দূর করতে সচেষ্ট হবে। কিন্তু, সবার আগে উদ্দেশ্য ও বিধেয় সম্পর্কে স্বচ্ছ দৃষ্টি প্রয়োজন।

কংগ্রেস কোনদিন অস্বীকার করে নাই যে বাংলা ও পাঞ্জাবের উপর বাঁটোয়ারা অচলায়তন হোয়ে থাকবে। বাঁটোয়ারা সম্পর্কে প্রথমটা অব্যবস্থিত থাকলেও একবার যখন কংগ্রেস ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার নিতান্ত তুচ্ছ বলে রায় দিল, সেই সঙ্গে কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকেও অস্বীকার করে নিল। কংগ্রেসের নির্বাচন ইস্তাহারে এ কথাটি পরিষ্কার করে বলা হোয়েছে। ভারত শাসন আইন কংগ্রেস গ্রহণ করেছে তাকে স্বীকার করেছে বলে নয় তার বিনাশের জন্য; 'to work it only to wreck it'. সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কোন নিরালম্ব শাসন ব্যবস্থা নয়, ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কারের অপরিহার্য অঙ্গ বিশেষ। শাসন সংস্কার বিলুপ্ত হোলে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাও বিলুপ্ত হবে এ কথা বলা বাহুল্য। কংগ্রেসের লক্ষ্য সেই দিকে; 'রিফরমিষ্টের' ছোট গলিতে তার চলাফেরা নয়। হিন্দু মহাসভার হিন্দু নেতারা ছিটে ফোঁটা স্বার্থের কথা বলে প্রতিক্রিয়াশীল মন্ত্রীদের পক্ষপাত ব্যবহারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলে দু চারজন প্রতিনিধি হয়ত পরিষদে নির্বাচিত করতে পারেন, কিম্বা, চাকুরীতেও অনুরূপ সুবিধা আদায় করতে পারেন—কিন্তু জাতীয় ঐক্যের পথে বিঘ্ন রয়েই যাবে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা দূর কোরবার নির্দেশ কংগ্রেস দিয়েছে শাসন-সংস্কার বিনাশ ব্যাখ্যায়।

গান্ধীজী ও ফেডারেশন্—

শাসন সংস্কার আইন প্রবর্তনের পর হতে গত তিন বছর যাবত বৃটিশ পরিকল্পিত যুক্ত-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও কংগ্রেস-বৃহৎ-নেতৃত্বের প্রতিবাদ ও জনমতের প্রবল আপত্তি বহুভাবে ও বহু ঘটনায় প্রকাশ পেয়েছে। ছোট বড় বহু কংগ্রেস নেতা ফেডারেশনকে 'dead issue' বলেই প্রচার করেছেন। ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার দেশ। নেতৃবৃন্দের উপরও আধ্যাত্মিকতার

প্রভাব কম নয়। কাজেই 'মৃত' হলেও কোন জিনিষ একেবারে বিলুপ্ত হয় না। মাঝে মাঝে তার আধ্যাত্মিক বা আধিভৌতিক অস্তিত্ব 'ঐশ বাণী'-প্রাপ্ত মহাপুরুষদের নিকট ধরা পড়ে।

হরিজনে প্রকাশিত মহাত্মাজীর 'স্বেচ্ছামূলক যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের জন্য অনুরোধ' (A Plea for Voluntary Federation) প্রবন্ধ তার প্রমাণ। 'মৃতে'র প্রভাব এড়াতে না পেরে মহাত্মাজী উক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন, 'বর্তমানে ভারতবর্ষ যেরূপ বিভক্ত, যুক্তরাষ্ট্র যদি চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে উহা আরো বেশী বিভক্ত হয়ে পড়বে। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যদি ঘোষণা করেন যে ভারতের উপর যুক্তরাষ্ট্র চাপিয়ে দেওয়া হবে না, তা হলে উত্তম কাজ হবে। বড়লাট মুখে কিছু না বললেও সেভাবে কাজ করছেন মনে হয়। আমার এ অনুমান যদি সত্য হয়, তবে বড়লাট সুস্পষ্ট ঘোষণা করলে তাঁর কার্য শোভন হবে এবং সম্ভবতঃ প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্র তথা প্রকৃত ঐক্যের পথ প্রশস্ত হবে। নূতন ভারত শাসন আইনে যেরূপ যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে, উক্ত যুক্তরাষ্ট্র সে শ্রেণীর হবে না। এ যুক্তরাষ্ট্র সমগ্র ভারতের স্বাধীন ইচ্ছানুসারে প্রবর্তিত হবে।' এর কিছুদিন পরই সিমলা হতে আমন্ত্রণ ও গান্ধী বড়লাট সাক্ষাৎকার। এ আমন্ত্রণ একেবারে অস্বাভাবিক বা আকস্মিক বলা যায় না। কারণ তদানীন্তন বড়লাট উইলিংডনের নিকট 'নতজানু হয়ে আবেদন' প্রত্যাখ্যানের পর বহুবার মহাত্মাজী সিমলা সরকারের নিকট হতে আমন্ত্রণ পেয়েছেন। এবারকার আহ্বানের জন্য ক্ষেত্রও বহুদিন যাবত প্রস্তুত হচ্ছিল।

গান্ধী বড়লাট সাক্ষাৎকার হয়েছে। মহাত্মাজী 'শূন্য হাতে ফিরেছেন' কিন্তু শূন্য হৃদয়ে ফিরেননি। কারণ এর পরই কেন্দ্রীয় আইন সভার যুক্ত অধিবেশনে বড়লাট ঘোষণা করেছেন 'যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ আয়োজন স্থগিত।' গান্ধীজী তাঁর প্রবন্ধেও অনুরূপ ঘোষণা প্রত্যাশা করে-ছিলেন। কাজেই তিনি 'নিরাশ' হননি।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তন কেন স্থগিত রাখা হল? বড়লাট তাঁর ঘোষণায় স্পষ্টভাবেই সে কথা বলেছেন। 'বর্তমানে আন্তর্জাতিক অবস্থা যেরূপ সঙ্কটজনক, তাতে আমাদের সমস্ত শক্তি ঐ সঙ্কট উত্তরণের জন্যই নিয়োজিত করতে হবে, সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনের সমস্ত কাজ স্থগিত রাখা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনই আমাদের উদ্দেশ্য থাকবে।'

বর্তমান পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্র অবাঞ্ছিত বা ভারতের জনমত বা জাতীয়তা-বিরোধী এ কথা গান্ধীজী ও কংগ্রেস বহুবার বললে ও বড়লাটের ঘোষণায় তার ক্ষীণ আভাষও পাওয়া যায় না। বরং বলা হয়েছে 'উদ্যোগ আয়োজন অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে এবং গত তিন বছর আমরা তজ্জন্য বহু শ্রম স্বীকার করেছি। যুক্তরাষ্ট্র প্রবর্তনই এখনও বিলাতী গবর্ণমেণ্টের লক্ষ্য।'

আন্তর্জাতিক সঙ্কট ও ভারতবর্ষ—

হিটলার ও নাৎসী নীতি ধ্বংস এবং গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষা কল্পে বৃটন বর্তমান যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। এ ঘোষণা ভারতে কে কিভাবে গ্রহণ করেছে নিম্ন উক্তিগুলি হতে কিছুটা অনুমান করা যায়।

গান্ধীজী—

সম্পূর্ণ মানবতার দিক হতে আমি নিজে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ—

জার্মাণীর বর্তমান শাসনকর্তা তাঁর ঔদ্ধত্যপূর্ণ ও অন্যায় আচরণের যে শেষ পরিচয় দিয়েছেন, তাতে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত ও বিহ্বল হয়েছে। দুর্বল ও অসহায়কে দীর্ঘকাল ধরিয়া পর্য্যায়ক্রমে (রাইখে ইহুদী নির্যাতন হতে আরম্ভ করে বীর চেকো শ্লোভাকদের স্বাধীনতা হরণ পর্যন্ত) রক্ত-চক্ষু প্রদর্শনের এ চরম পরিণতি।

ব্যক্তি বিশেষের নিজের ও তাঁর সঙ্গীদের অসার খেয়ালের মোহ চরিতার্থ করার জন্য বিশ্বব্যাপী যে নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয়েছে—মহাত্মা গান্ধী ইতিপূর্বে তীব্রকণ্ঠে তার নিন্দা করেছেন। তাঁর বাণীতে দেশবাসীর মনোভাব এবং অভিমত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। আমাদের বাণী হয়তো জার্মাণীর সে শক্তিমান নায়কের নিকট পৌছাবে না। তবে আমার আশা এই যে এ নরমেধ যজ্ঞের রক্ত-গঙ্গায় অবগাহন করে ধরণী পুনরায় শুচিস্নাতা হবে—ধরণীর বুকে নির্যাতিত ও নিপীড়িত জাতি সমূহের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির অক্ষয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হবে এবং মানবতার জয় ঘোষিত হবে।

রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃগণ আরো বলেছেন 'ভারতের প্রতি বৃটিশের নূতনভাবে দৃষ্টিপাত করবার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আমাদের নিজেদের স্বাধীনতা নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন অধীন জাতি তাদের অধীনতা বিমোচন সম্পর্কে কোন প্রকার ইঙ্গিত অথবা সম্ভাবনা না দেখতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাদের পক্ষে অপর কোন দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবার প্রকৃত উৎসাহ প্রদর্শন করা সহজ হবে না। আমরা ইহা কোন প্রকার দর কষাকষির নীচ মনোবৃত্তি লয়ে বলছি না। অথবা যে সময় একতাই একান্তভাবে প্রয়োজনীয় সে সময় একটা বিরোধিতামূলক মনোভাবের সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যও আমাদের নেই। কিন্তু ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়ের পক্ষেই যে এখন খোলাখুলিভাবে বুঝে লওয়া দরকার—আমরা এ প্রশ্নের উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছি।'

জওহরলাল—

'এ সংগ্রামে সমস্ত ঘটনার আমূল পরিবর্তন ঘটবে। পুরাতন ব্যবস্থা বর্তমানে একেবারেই অচল; এ'কে সচল করে তোলবার চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। পুরাতনের আসনে নূতনকে বসাতে হলে ধীর স্থিরভাবে ও বিবেক বুদ্ধির সহিত আমাদিগকে সে কার্য করতে হবে। আমাদের উদ্দেশ্য আমরা পরিষ্কারভাবেই ব্যক্ত করব এবং সে উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলবার জন্য এখন হতে আমরা বদ্ধপরিকর হব। এতে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই যে একদিকে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা এবং অন্যদিকে ফ্যাসিজম ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের মধ্যে যে সংগ্রাম, সে সংগ্রামে

আমাদের সহানুভূতি গণতন্ত্রের দিকেই আকর্ষিত হবে এবং আমরা কখনই ফ্যাসিষ্ট ও সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের বিজয়োল্লাস সহ্য করতে পারব না। কিন্তু গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা—এই মুখরোচক শব্দ দু'টী পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করলেই সংগ্রামটী গণতন্ত্রের সংগ্রাম বলে অভিহিত হবে না। গত মহাযুদ্ধের পরে কিভাবে অশান্তি ও স্বাধীনতার নামে গণতন্ত্রের প্রতি অমর্যাদা করা হয়েছিল তা সকলেই অবগত আছেন। এ সংগ্রামটী গণতন্ত্রের ও স্বাধীনতার সংগ্রাম কিনা, নীতিবাক্য দ্বারা না হয়ে কার্য কারণদ্বারাই তার অগ্নি পরীক্ষা হবে। ইংলণ্ড যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে, তবে ভারতবর্ষেই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাবে।'

স্যর রাধাকৃষ্ণণ—

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী শীঘ্রই যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করবেন। আমাদের মধ্যে যারা মনে করেন যুদ্ধ এরূপ ক্ষতিকর যে, হিংসা নীতির বিরুদ্ধে হিংসা প্রয়োগ করে কোন লাভ নেই, তাঁদের উদ্বেগের কোন কারণ নেই। অধিকার রক্ষার জন্য বৃটেন এ যুদ্ধে অবতরণ করেনি; নীতিরক্ষার জন্যই তারা যুদ্ধে নেমেছে। ভারতবাসী পোল্যাণ্ডের প্রতি পূর্ণ সহানুভূতি সম্পন্ন এবং এ সম্পর্কে বৃটিশ মনোভাবের প্রতি ও তাদের সহানুভূতি রয়েছে। এ সময় যদি কেন্দ্রে প্রকৃত স্বায়ত্ত শাসন প্রদান করে বৃটিশ সরকার রাজনৈতিক ভারতের নিকট আবেদন জানান, তবে বিশেষ সাড়া পাবেন।

বড়লাট—

শক্তিমানের অধিকার ও ন্যায় বিবর্জিত স্বৈরাচারকে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া হবে না—এ নীতি সমর্থনের কল্পে আমাদের আজ এ সঙ্কট অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে।...ভারত অপেক্ষা অন্যত্র এ নীতি অধিক গুরুত্বপূর্ণ নহে। ভারতে এ নীতির মূল্য যত বেশী, অন্য কোনও দেশে তত নহে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আত্মস্বার্থে এ যুদ্ধে লিপ্ত হয়নি। মানব সমাজের পক্ষে যা জীবন-মরণতুল্য তা সংরক্ষণ-কল্পেই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতি সুনিয়ন্ত্রণ বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধ মীমাংসাক্ষেত্রে বলপ্রয়োগের পরিবর্তে ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায় অবলম্বন ভবিষ্যতে যাতে নির্বিঘ্নে সমাধিত হতে পারে, তজ্জন্যই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এ সমরায়োজন।'

কেন্দ্রীয় পরিষদে তিনি আরো বলেছেন 'সত্যের যে মানদণ্ড ও যে সকল আন্তর্জাতিক নীতি উপর ভিত্তি করে জগৎ এক সঙ্গে চলতে পারে কিংবা অগ্রগমনের আশা করতে পারে তাদের সমস্তগুলি উপেক্ষা করেই প্রত্যেকটী প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হয়েছে। ও সকল বিশ্বাসভঙ্গ কেবলমাত্র প্রতিশ্রুতি ভঙ্গই নয়, ওগুলি ন্যায় বিচার লঙ্ঘনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বলদর্প ভিন্ন এ সকল প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আর কোন নীতি নেই। 'এক জাতির সহিত অপর জাতির যোগাযোগ যে সকল নীতির উপর নির্ভর করে এর ফলে তা সম্পূর্ণরূপে লঙ্ঘন করা হয়েছে...। আমরা যে

নীতির জন্য সংগ্রাম করছি তার রক্ষাকল্পে আমাদের ও আমাদের সহযোগী অন্যান্য দেশের সশস্ত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন ভিন্ন অন্য গতি নেই।'

এ ঘোষণার প্রতিধ্বনি করেছেন রাষ্ট্রীয় পরিষদে স্যার জগদীশ প্রসাদ। 'পার্থিব কোন লাভ ক্ষতির জন্য নয়, নৈতিক আদর্শ অব্যাহত রাখবার জন্য ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অধিবাসীবৃন্দ আধুনিক যুদ্ধ বিগ্রহের দুঃখ-দৈন্য বরণে যে প্রশান্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছে তাতে ন্যায়পরতাই পরিণামে যাতে জয়ী হতে পারে তজ্জন্য যথাশক্তি কর্তব্য পালনে আমারা উদ্বোধিত হব। সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সর্বতোভাবে সংগ্রামে সহায়তা ব্যতীত আমরা আর কিছু করতে পারি নে।... মানবীয় ও নৈতিক সমস্যা নিয়ে আজিকার সংগ্রাম সূচিত। এ সময় যদি আমরা কোন পুরস্কার অথবা লাভের চিন্তা পরিহার করে আমাদের মহান কর্তব্য সম্পাদন করি তবেই আমাদের আধ্যাত্মিক সংস্কৃতির......সম্মান রক্ষা হবে।

এ বিভিন্ন উক্তিগুলি হতে দু'টি জিনিব সুস্পষ্ট হয়েছে। বর্তমান যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতায় রাজনৈতিক দিক কতখানি, মানবতা ও নীতিধর্মের দাবীই বা কতখানি! আন্তর্জাতিক সঙ্কটের সম্মুখীন বিব্রত বৃটনের নিকট 'দর কষাকষি' করে কিছু আদায় করা খুব উচ্চ নীতির পরিচায়ক নয় নিঃসন্দেহ। কিন্তু যে উচ্চ আদর্শ উদ্যাপনের জন্য ভারতকে আহ্বান করা হয়েছে তার আংশিক প্রতিফলনও যদি স্বকীয় দেশে না দেখা যায় তবে ভারতবাসী সমর্থনের উৎসাহে শুধু নৈতিক প্রেরণা পাবে কিনা সন্দেহ।

ভারতের 'জাতীয় দাবী' আজ বহু বছর যাবত বৃটনের নিকট উত্থাপিত আছে। বর্তমান আন্তর্জাতিক সঙ্কট বা 'যুদ্ধের চিন্তায় ভরপুর' বৃটনের সাথে এর কোন সম্বন্ধ নেই। কাজেই ওয়াকিং কমিটি যদি বৃটনের নিকট কোন সুনির্দ্দিষ্ট ও কার্যকরী প্রতিশ্রুতি চায় তবে নীতি বিগর্হিত বা রাজনীতি বিরুদ্ধ তেমন কিছু হবে না।

ম্যানচেষ্টার গার্ডিয়ানেও আমাদের এ উক্তি কিছুটা সমর্থন পাওয়া যায়। 'ভারত এ যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে লিপ্ত হয়েছে তার কারণ বৃটনের সাথে তার সম্পর্ক আছে বলে। যারা বৃটিশ সম্পর্কের বিরোধী তারা গভীরভাবে আত্মানুসন্ধান না করে বৃটনকে সমর্থন করতে পারবে না...... কংগ্রেসের সহানুভূতি সুনিশ্চিত ও গভীর, কিন্তু অভিযোগ ও সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে।'

সোভিয়েট—জার্ম্মান অনাক্রমণ চুক্তি—

রাজনীতির দ্রুতলয়ে কখনও সুদূর সম্ভাবনা নিকট বাস্তব হোয়ে দাঁড়ায় কখনও বা অসম্ভব সম্ভবতার পরিধির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে। রাজনীতিতে সচরাচর বিস্ময়ের স্থান না থাকলেও কোন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব সকল রাজনীতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে অপরিমিত বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। সোভিয়েট—জার্ম্মান অনাক্রমণ চুক্তি রাষ্ট্রের ইতিহাসে এরূপ একটি স্থান অধিকার করে থাকবে।

চার মাস কাল আলোচনা করেও ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট চুক্তি সংঘটিত হয় নাই। সেখানে মাত্র কয়েকদিনের চেষ্টায় চির বৈরী জার্ম্মানী ও সোভিয়েট রাশিয়া মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়।

পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, গ্রীস, টার্কি প্রভৃতি রাজ্যগুলি ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডের সাথে চুক্তি করে জার্ম্মানীর চতুঃপার্শে শৃঙ্খল সৃজন করে চলেছিল। ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট আলোচনার সার্থক পরিণতিতে শৃঙ্খলিত জার্ম্মানীর দুঃস্বপ্ন ফুয়েরারের গরিমা ম্লান করে সোভিয়েট-জার্ম্মান অনাক্রমণ চুক্তিস্বাক্ষর করতে প্ররোচিত করেছে।

চুক্তিতে নিম্নলিখিত সর্ত্তগুলি আছে—

১। চুক্তির স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদ্বয় পরস্পরের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ কিংবা আক্রমণ নীতি কিংবা পরস্পরকে একাকী অথবা অন্য কোন শক্তির সহযোগিতায় আক্রমণ হইতে বিরত থাকিবে।

২। স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে যদি কোন একটি রাষ্ট্রের যদি তৃতীয় পক্ষদ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়, তাহা হইলে অপররাষ্ট্র কোনভাবেই তৃতীয় পক্ষকে সমর্থন করিবে না।

৩। চুক্তির তৃতীয় সর্তে উভয়ের "সাধারণ স্বার্থবিশিষ্ট সমস্যাগুলি সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

৪। কোন শক্তিপুঞ্জ যদি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে কোন একটির বিরোধী হয়, তাহা হইলে অপর রাষ্ট্র সেই শক্তিপুঞ্জের সহিত যোগদান করিতে পারিবে না।

৫। বিরোধের মীমাংসার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবে মতের আদান প্রদান করা হইবে এবং প্রয়োজন হইলে তজ্জন্য সালিশী কমিশন নিযুক্ত করা হইবে।

চুক্তি বন্ধ হওয়া ও চুক্তি ভাঙা বর্তমান রাজনীতিতে নিত্যকার ব্যাপার। হিটলার এই ছয় বছরে এ বিষয়ে দক্ষতাও অর্জন করেছে প্রচুর।

নীতি বিসর্জন দিয়ে নাৎসীনায়ক সঙ্কট মুক্ত হয়েছেন; আর এদিকে নাৎসী সংবাদপত্রগুলি প্রচার করছে কূটনীতিতে হিটলার ইংলণ্ড ও ফ্রান্সকে পরাস্ত করেছে।

একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে যে এই চুক্তির ফলে কমিটার্ণ বিরোধী চুক্তি লোপ পেয়েছে, বৃটেনের মর্যাদা ক্ষুন্ন হোয়েছে ও সোভিয়েটের মর্যাদা সেই পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, সুদূর প্রাচ্যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তিত হোয়ে বৃটেন ও জাপান সান্নিধ্য পেয়েছে। জাপানের মন্ত্রীমণ্ডলীর পরিবর্ত্তনে এই প্রতিক্রিয়া অভিব্যক্ত হয়েছে।

সোভিয়েট-জার্ম্মান চুক্তির আড়ালে আর কোন অভিসন্ধি আছে কিনা তা অনুমান করা সহজ নয়। সোভিয়েট মন্ত্রী মলোটোভ বলেছেন "too much must not be read into the pact". এই চুক্তির মুখবন্ধে যদি কোন 'নির্গমন ধারা' (escape clause) থেকে থাকে তা হোলে চুক্তিবদ্ধ যে কোন দল পররাজ্য আক্রমণ করলে অন্যপক্ষ চুক্তি সমাপ্ত বলে ঘোষণা করতে পারবে। এ নিদান যদি সত্যিই থেকে থাকে এই চুক্তির আশঙ্কার কারণ না ও হোতে পারে।

প্যারির পত্রিকা 'Le Temps' এ চুক্তি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছে তা উদ্ধৃত করছি—

"The pact apparently means the end of Anti-commintern pact, a denial of all the doctrines of Nazi regime and an abandonment of any plan that Germany may have had for a thrust to-wards the Baltic countries, Ukraine and the Black Sea. One is inclined to believe that the Fuerhrer, in a difficult situation, wishes to act speedily to ward off the peril which he has created and is making this tragical withdrawal for saving the face of his regime by a spectacular diplomatic success."

সমর--

১৯১৯ সালের ২৮শে জুন ভের্সাইয়ের হলঘরে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল মিত্রশক্তির মতে তা ছিল ন্যায়সঙ্গত, দৃঢ় ও কায়েমী—'Firm, just and durable. যুদ্ধাবসানে স্বাক্ষরিত যে কোন চুক্তিকেই 'firm, just and durable' বলে ভাবলেও কালক্রমে বিজিত জাতির অবনমত স্পর্দ্ধা বিগত দিনের ন্যায় সঙ্গত চুক্তিকে দেশে অন্যায়ের প্রতিরূপ বলে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াস পায়। ১৮১৪ সালে নেপোলিয়ন বিজয়ের পর প্যারিতে—'A firm peace based on a just equilibrium of strength between the powers'—কায়েমী শান্তিপত্র স্বাক্ষরিত হলেও ১৮৭১ সালের ফ্রাঙ্কো-জার্ম্মাণ যুদ্ধ প্রতিহত হয় নাই। ভের্সাই আলোচনার ফলে প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন জাতিসংঘ (League of Nations)এর স্বপ্ন-সৌধ রচনা করে আন্তর্জাতিক শান্তির নীড় নির্মাণ কোরে চিরতরে যুদ্ধ নির্বাসিত করতে চেয়েছিলেন—ঘটনার আবর্তে শান্তি আজ সেখানে নির্বাসিত।

পঁচিশ বৎসর পূর্বে সার্বিয়ার সেরাজিভো নগরে আততায়ীর গুলিতে য়ুরোপে সমরানল জ্বলে উঠেছিল। ঠিক পঁচিশ বছর পূর্ণ হোতেই ইতিহাস পুনরভিনীত হোতে আরম্ভ করেছে। পরাহত জার্মেণী, নাৎসী-নায়ক হিটলারের পরিচালনায়, একটির পর ৪ কটি করে ভের্সাইএর বিধি নিষেধ বিগত পাঁচ বছর যাবৎ ক্রমাগত অনায়াসে উপেক্ষা করে ডানৎসিক ও পোলিশ করিডর তৃতীয় রাইখের অন্তর্ভুক্ত করতে সর্ব্বপ্রথম প্রতিরুদ্ধ হোয়েছে। বিগত মহাযুদ্ধে পোল্যাণ্ড নবকলেবর প্রাপ্ত হোয়েছে যার সাথে ডানৎসিককে পেয়েছে অপরিহার্য অঙ্গরূপে। 'ফ্রেডারিক দি গ্রেট্'এর উক্তিতে ডানৎসিক ও পোল্যাণ্ডের সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে ভিসচুলার মোহনা যে নিয়ন্ত্রণ করে পোল্যাণ্ডের ভাগ্য নিয়ন্ত্রাও সে-ই।' ("Who rules over the mouth of Vistula and the City of Danzig will be more master of Poland than the King who rules there."

কিন্তু 'মাইন কাম্ফ'এর রচয়িতার বিরাম নাই। মিউনিকএর পর বিশ্ববাসী আশ্বাসবাণী শুনেছিল "ইউরোপে আমার অভিযান সমাপ্ত হোয়েছে." মাত্র ছয় মাসের ব্যবধানেই বোহামিয়া,

মোরাভিয়া, শ্লোভাকিয়া, মেমেল স্বস্তিকার আশ্রয় পেয়ে আশ্বাসের রূপান্তর ঘটালো অবিশ্বাসে। মহাযুদ্ধ অবসানের পূর্ব পর্যন্ত ডানৎসিক জার্মেণীর অন্তর্গত ছিল।

সুতরাং ডানৎসিক রাইখের স্বগোত্রীয়। এই অজুহাতে হিটলারের, ডানৎসিক চাই-ই চাই। 'শান্তিকামী' হিটলার আয়ত্ত কৌশলের কথা স্মরণ করে পোল্যাণ্ডকে আপোষ করবার জন্যে আহ্বান করলেন। তার সর্ত ছিল—"greatest imaginable concession in the interest of European peace"—ডানৎসিক প্রত্যর্পণ, করিডরের মধ্য দিয়ে চলাচলের রাস্তা, ডানৎসিকে পোল্যাণ্ডের জন্য পোতাশ্রয়ের ব্যবস্থা।

হিটলারের সততায় বিশ্বাস করবে, বিশেষ করে মিউনিকের পর, এমন মূর্খ পোল্যাণ্ড নয়। প্রত্যাখাত হোয়ে ১৯৩৯এর ২৮শে এপ্রিল তারিখে মার্সাল পিলসুড্স্কির সাথে ১৯৩৪ সালে স্বাক্ষরিত দশ বছরের জার্মাণ-পোলিশ চুক্তি, হিটলার বাতিল করে দেয়।

বিগত দুই মাস ডানৎসিক ও পোল্যাণ্ডএর সীমান্তে দ্রুত পরিবর্তন ঘটে আসছে। সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র চালান, পোলিশ বিভাগের কর্মচারীদের উপর বলপ্রয়োগ, সীমান্তে হানাহানি ও সর্বশেষ ডানৎসিক অধিকার ও পোল্যাণ্ড আক্রমণ—মাত্র কয়েকদিন পূর্বের ঘটনা।

ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পোল্যাণ্ডকে অভয়দান করেছিল বিগত মার্চ্চ মাসে। পোল্যাণ্ডও তাহা গ্রহণ করেছে।

২৯শে জুন তারিখে ফরাসী প্রধান মন্ত্রী দালাদিয়ের ঘোষণা করেন—

"ফ্রান্স যুদ্ধ করতে দৃঢ় সংকল্প"—"France is determined to fight with all her strength against all attempts at domination. The Government knows that an attempt at hegemony in Eastern Europe would subsequently turn against the west."

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন ১০ই জুলাই বিবৃতি দেন—

"পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসে যুদ্ধ করা প্রয়োজন বোধ করলেই আমরা সাহায্য কোরব।" "We have guranteed to give our assistanne to Poland in the case of a clear threat to her independence, which she considers it vital to resist with her national forces, and we are firmly resolved to carry out this undertaking.

ডানৎসিকের নাৎসীনেতা হের ফোয়েরেষ্টের তথাকার জার্ম্মাণ সম্প্রদায়ের মধ্যে রাইখপ্রীতির ইন্ধন দিয়ে অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে। এদিকে জার্ম্মান সংবাদ পত্রগুলিও সুর তোলে "ডানৎসিককে অবিলম্বেও বিনাসর্তে রাইখে ফিরিয়া আসিতে হইবে। আগষ্ট মাসের শেষাশেষি ইউরোপে সর্বত্র পররাষ্ট্রসচিবদের দপ্তরগুলি সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। বের্লিনেরে বৃটিশদূত স্যার নেভিল হেণ্ডারসন ক্রমাগত লণ্ডন, বের্লিন, বার্কতেশগাদেন, সালৎবুর্গ যাতায়ত করছিলেন। কিন্তু জার্মান চ্যান্সেলার তাঁর প্রতিজ্ঞায় অটল—"পূর্ব ইউরোপীয় পরিস্থিতিতে অবাধ স্বাধীনতা চাই"।

২৪শে আগষ্ট তারিখে কমন্স সভায় চেম্বারলেন পুনরায় প্যোলাণ্ড রক্ষার প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন। ঐদিনই মার্কিণ নায়ক রুজভেল্ট—হিটলার, পোল্যাণ্ডের প্রেসিডেন্ট মোসিকি ও ইতালীর রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের নিকট শান্তির জন্য আবেদন পাঠান।

২৫শে আগষ্ট অধীর হোয়ে হিট্‌লার ফরাসী রাষ্ট্রদূত মঃ কুলদরকে জানান যে পোল্যাণ্ডের পরিস্থিতি আর সহ্য করতে প্রস্তুত নন। দালাদিয়ের আর একবার শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনায় প্রস্তাব করেন। পরদিন হিটলার সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে—"আত্মসম্মান সম্পন্ন একটা জাতি কখনও তাহার ২০ লক্ষ লোককে বিসর্জন দিতে পারে না। ডানৎসিক ও পোলিশ করিডরকে পুনরায় জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত করিতেই হইবে। জার্মানীর পূর্ব সীমান্তে ম্যাসিডোনিয়ার মত শোচনীয় অবস্থার অবসান প্রয়োজন। শান্তি বজায় রাখিয়া পোল্যাণ্ডকে একথা বলা অসম্ভব। কিন্তু যে কোন ভাবেই এ সমস্যার সমাধান অবশ্য কর্তব্য। ভাগ্যবিধাতা যদি জার্মানী ও ফ্রান্সের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটান, তাহাহইলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব। তবে পার্থক্য থাকিবে এই জার্মানী লড়াই করিবে একটা অবিচারের অবসানের জন্য আর ফ্রান্স লড়াই করিবে সেই অবিচার বজায় রাখিবার জন্য।

হিটলারের সুযোগ খুঁজে নিতে বিলম্ব হয়নি। জার্ম্মানী বাকি সংকট মোচনের জন্য প্রস্তাব করে। ১। ডানৎসিক অবিলম্বে রাইখের অন্তর্ভূত হউক ২। সার্বজনীন অভিপ্রায় ঠিক করবে করিডর রাইখের ভাগে পড়বে—কি পোল্যাণ্ডের ভাগে, আন্তর্জাতিক কমিশনের আওতায় এই গণনায় অংশ গ্রহণ করবে ১৯১৮ সালের ১লা জানুয়ারীর পর থেকে করিডরের পোলিশ অধিবাসীরা করিডরের অভ্যন্তরে জার্ম্মানীর একটি পথ।

পোলিশ গভর্ণমেণ্টের কোন দূত জার্ম্মানীর প্রস্তাব আলোচনা জন্য বের্লিনে উপস্থিত না হওয়াতে হিটলার ১লা সেপ্টেম্বর ঘোষণা করে যে পোল্যাণ্ড শান্তিপূর্ণ সমাধান কামনা করে না। পোল্যাণ্ড সৈন্য সমাবেশ করেছে, অতঃপর আমাকেও অস্ত্র দিয়ে অস্ত্র প্রতিরোধ করতে হবে। এই ঘোষণার পরই ডানৎসিক রাইখের সাথে সংযোজিত ও পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হয়।

ঐ দিন পার্লামেণ্টে চেম্বারলেনের বিবৃতিতে জানা যায় যে পোল্যাণ্ড ৩১শে আগষ্ট বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনুরোধে পোলিশ গভর্ণমেণ্ট আপোষ আলোচনায় যোগ দিবার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে নীরব থাকে। চেম্বারলেন জার্ম্মান ঘোষণার কথা উল্লেখ করে বলেন যে জার্ম্মানী মোটেই ঐ প্রস্তাব পোল্যাণ্ডের নিকট প্রেরণ করে নাই।

৩রা সেপ্টেম্বর ইঙ্গ-ফরাসী পোলিশ চুক্তি অনুযায়ী বিট্রেন ও ফ্রান্স জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯১৪ র ৪ঠা আগষ্ট আর ১৯৩৯এর ৩রা সেপ্টেম্বর। জার্ম্মানীতে অধিনায়ক কাইজার এর পবিবর্তে নাৎসী নায়ক হিটলার—পটের এই সামান্য পরিবর্তন নিতান্ত সামন্য নয়।

ইতিহাসের প্রেক্ষাতে—এ যুদ্ধ কেন, এর পরিনতি কোথায়, এ দুই প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে। শাস্ত্রে আছে 'মা ক্রুয়াৎ সত্যম অপ্রিয়ম'। বর্তমানের নিকষে যে সত্য আঁকা হোয়ে রইলো আগামী কাল তথ্যে পরিণত হলেও ইতিহাসের শিক্ষায় তার মূল্য কমবে না।

জার্মানির পরাজয় নিশ্চিত ?—

ডাঃ আইভান লাজোস নামক এক হাঙ্গেরীয়ার অধ্যাপক জার্মেনীর অস্ত্র-সম্ভার সম্বন্ধে সরকারী দলিলপত্রের মন্থন কোরে এক ছোট পুস্তক রচনা করে হাঙ্গেরীয়ান আদালতে অভিযুক্ত হয়েছেন। সম্প্রতি Gollancz তার অনুবাদ করেছে। তিনি নিশ্চয় করে প্রমাণিত করেছেন যে জার্মানীর রণসজ্জা ১৯১৪ সালের মত নয় এবং জার্মানীর পরাজয় নিশ্চিত।

ডাঃ লাজোসের সিদ্ধান্তগুলি এই—

১। 'ক্ষিপ্রগতি যুদ্ধ' জার্মেনীর পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত আবশ্যিক সৈন্য সংগ্রহ বন্ধ থাকাতে ফ্রান্সের ৫,০০০,০০০ সংখ্যক সৈন্যের তুলনায় জার্মানীতে মোট ১,০০০,০০০ সংখ্যক সৈন্য আছে।

২। জার্মানী মোটার 'ট্রানস্পোর্টের তুলনার রেল ট্রানস্পোর্ট উপেক্ষিত হয়েছে।'

৩। খাদ্যের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে। জার্মানী প্রয়োজনীয় খাদ্যের শতকরা ৮০ ভাগ উৎপাদন করে। কৃষির জন্য উপযুক্ত শ্রমশক্তি ও পুঁজি দেশে নাই। চর্বি ও পশুর খাদ্যের জন্য জার্মানীকে আমদানির উপর নির্ভর করতে হয়।

৪। জার্মানীর আর্থিক ততোধিক শোচনীয়। ক্রমাগত ক' বছর কোন বাজেট প্রকাশিত হয় নাই। আভ্যন্তরীণ পুঁজি অবশিষ্ট আর কিছুই নাই; তিন বছরে জার্মেনীর ঋণ তিনগুণ বেড়েছে, বৈদেশিক ব্যবসায়ের জন্য Foreign Exchange এর বিলক্ষণ অভাব, রপ্তানীও ক্ষীণায়মান।

৫। লেখকের বিশ্বাস যে যুদ্ধ বাধলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দেবে। আমেরিকা শস্ত্র-শিল্প সম্ভারে উন্নতির শীর্ষে উঠেছে এবং অনায়াসে সমগ্র শিল্পব্যবস্থাকে শস্ত্র উৎপাদনে অবস্থানান্তরিত করতে পারে।

৬। খনিজ তেল সম্পর্কে জার্মানীর অবস্থা সব চাইতে নিকৃষ্ট। রুমানিয়ান তেলের আট ভাগের সাত ভাগ পাশ্চাত্য অর্থ-চক্রের অধীন। অর্থাভাব হেতু জার্মানীও পুঁজি করতে অক্ষম।

৭। জার্মানীর শ্রমিককুল অতিরিক্ত পরিশ্রম করে নিকৃষ্টতর শস্ত্র উৎপাদন করছে। গত মার্চে অষ্ট্রিয়াতে জার্মানীর এক বাহিনী ৪০০ ট্রাকট্যারের মধ্যে ৪০টি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

৮। আভ্যন্তরীণ অসন্তোষেয় ধূমায়িত বহ্নি ভীষণাকার ধারণ করলে জার্মানীকে ঘরে বাইরে সংগ্রাম করতে হবে। এ অবস্থায় ক্ষিপ্রগতি যুদ্ধে জার্মানী জয় লাভ করলে দীর্ঘকালের যুদ্ধে জার্মানীর অবস্থা ক্রমাগত শোচনীয় হয়ে উঠে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী কোরে তুলবে।

ডাঃ শুসনিক—

প্যারিসের 'ল জর্ণাল' সংবাদ পত্রে প্রকাশ যে, অষ্ট্রিয়ানগণ জার্মানদের পক্ষ অবলম্বন করে যুদ্ধ করবার জন্য এক আবেদন পত্র স্বাক্ষরে অসম্মত হওয়ায় স্বাধীন অষ্ট্রিয়ার ভূতপূর্ব চ্যান্সেলার ডাঃ শুসনিগ নাৎসী গুলিতে আহত হোয়েছেন। মিউনিকের 'শোণিত-তর্পণ' (Blood-Bath)

হতে সুরু করে ইহুদীদলন, ডলফাস্ হত্যা ও অসংখ্য পাশবিক অনুষ্ঠানের পর নাৎসীবাদ যে নরমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছে তাতে শুসনিকের ন্যায় মহৎ আত্মার বিনাশ করে কলঙ্কের মাত্রা আরো বাড়াবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। নাৎসী বর্বরতার মসীলিপ্ত ইতিহাসের অধ্যায়ে শুসনিকের আত্ম-ত্যাগ চিরকাল ভাস্বর হোয়ে থাকবে।

বর্তমান যুদ্ধ ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী—

যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী নিম্নোক্ত মর্ম্মে এক বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন :

ইউরোপে যুদ্ধ ঘোষণার ফলে যে গুরুতর সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী তৎসম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়াছেন। কোন যুদ্ধ-বিগ্রহ বাধিলে ভারতের ইতিকর্ত্তব্য সম্পর্কে কংগ্রেস বহুবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন এবং মাসখানেক পূর্ব্বেও কংগ্রেস ঐ সম্পর্কে তাহাদের পূর্ব্বে ঘোষিত নীতিতেই আস্থা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং ভারতের জনমতকে উপেক্ষা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছেন। বৃটিশ সরকারের এই নীতির সংস্রব ত্যাগের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের কংগ্রেসী সদস্যগণকে পরিষদ বর্জ্জন করিতে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। তাহার পর বৃটিশ সরকার ভারতকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কতকগুলি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন, ভারত শাসন আইন সংশোধন বিল পাশ করিয়াছেন এবং এমন সমস্ত সুদূর-প্রসারী ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, যাহা ভারতীয় জনগণের উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা ও কার্য্য-শক্তিকে খর্ব্ব করিবে। ভারতীয় জনগনের সম্মতি ব্যতিরেকেই এই সমস্ত করা হইয়াছে এবং এই সকল বিষয়ে ভারতীয় জনগণের সুব্যক্ত অভিমতকে উপেক্ষা করা হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটী এই সকল বিষয়ের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ না করিয়া পারেন না। কংগ্রেস নাৎসীবাদ বা ফাসিস্তবাদের আদর্শ ও কর্ম্মপন্থার প্রতি বার বার বিরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন। নাৎসী বা ফাসিস্তদের হিংসা ও সংগ্রামলিপ্সা এবং মানবতার অবমাননায় তাহাদের উল্লাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী বহুবার বিরূপ মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছেন।

নাৎসী ও ফাসিস্তগণ বহুবার যেভাবে পররাজ্য আক্রমণে লিপ্ত হইয়াছে, সভ্যতার মানদণ্ড ও সুপ্রতিষ্ঠ মূলনীতিসমূহকে নির্ব্বিচারে পদদলিত করিয়াছে, কংগ্রেস বহুবার তাহার তীব্র নিন্দা করিয়াছেন। ফাসিস্তবাদ ও নাৎসীবাদের মধ্যে কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদের মূল নীতিসমূহকেই সুপ্রতিষ্ঠ দেখিতে পাইয়াছেন—ঐ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই কংগ্রেস বহুবর্ষ ধরিয়া সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে এজন্য কংগ্রেস দ্বিধাহীনভাবে নাৎসী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক পোল্যাণ্ড আক্রমণের নিন্দা করিতে এবং ঐ আক্রমণ প্রতিরোধে দণ্ডায়মান সকলের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে বাধ্য।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটীর বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত স্থির করিতে বেশী বিলম্ব করা চলিতে পারে না; কেননা প্রতিদিনই ভারতের দ্বারা এমন নীতির অনুমোদন করিয়া লওয়া হইতেছে, যাহার সহিত তাহার কোন সম্পর্কও নাই, অধিকন্তু যাহা সে অনুমোদন করে না। কাজেই ওয়ার্কিং কমিটী, গণতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের

অভিমত কি এবং ভারতের বেলায় সে উদ্দেশ্য কিভাবে তাহা প্রযুক্ত হইবে, এই সকল কথা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করিতে আহ্বান করিতেছেন।

অতঃপর যুদ্ধের বীভৎসতা বর্ণনাপ্রসঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটী বলিতেছেন, 'ইউরোপ এবং চীনে এই বীভৎসতা বন্ধ করিতে হইবে বটে; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত ফ্যাসিষ্ট ও সাম্রাজ্যবাদের মূল কারণ দূর করা না হইতেছে, ততদিন পর্যান্ত যুদ্ধের বিভীষিকা দূর হইবে না। এই উদ্দেশ্য সাধনে ওয়ার্কিং কমিটী সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছেন।

ওয়ার্কিং কমিটী বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষকে যুদ্ধরত দেশ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, অর্ডিন্যান্স জারী করিয়াছেন, ভারত শাসম আইন সংশোধন করিয়াছেন এবং এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেম, যাহার সহিত ভারতবাসীদের স্বার্থ বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট এবং যাহার ফলে প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টগুলির কার্য্য ও ক্ষমতা বিশেষভাবে সীমাবদ্ধ ও সঙ্কুচিত হইয়াছে। এ সম্পর্কে ভারতবাসীদের সম্মতি লওয়া হয় নাই এবং তাহাদের সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত অভিপ্রায় একবারে উপেক্ষা করা হইয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটী ইহা অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মনে করেন।

বিবৃতিতে আরও বলা হইয়াছে যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য এই সংগ্রাম করা হইতেছে বলিয়া প্রচার করা হইতেছে, সেই স্বাধীনতাই ভারতের নাই; উপরন্তু যে সামান্য স্বাধীনতা লইয়া আছে, তাহাও কাড়িয়া লওয়া হইতেছে; সুতরাং এই সংগ্রামে যোগ দেওয়া ভারতের পক্ষে সম্ভবপর নহে। ওয়ার্কিং কমিটি মনে করেন যে, ভারতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে, পররাজ্য আক্রমণের বিরোধিতা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা করিবার জন্য ভারত অন্যান্য স্বাধীন জাতির সহিত সানন্দে যোগ দিতে পারিত।

স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিকতার উপর ভিত্তি করিয়া এবং বিশ্বের জ্ঞানসম্ভার ও সম্পদ, মানব সমাজের কল্যাণে ও অগ্রগতিকে নিয়োজিত করিয়া বিশ্বে প্রকৃত শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য ভারত কার্য্য করিবে।

ইউরোপে যে সঙ্কট দেখা দিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া কমিটি এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ঐ সঙ্কট কেবলমাত্র ইউরোপেরই নয়, উহা সমগ্র মানব-সমাজেরই সঙ্কট। অন্য সঙ্কট বা সময়ের ন্যায় বর্ত্তমান জগতের মূল কাঠামো যেমন আছে, ঠিক সেমনই বজায় রাখিয়া উহা অন্তর্হিত হইবে না।

কমিটি ইহাও বলিয়াছেন যে, ভারত আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের প্রধান আদর্শ-স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছে এবং এই মূল সমস্যা উপেক্ষা করিয়া বিশ্বের নবরূপ সফলতার সহিত দান করাও সম্ভবপর নহে। সেইরূপ বিশ্বের সকলের কল্যাণের জন্য ন্যায়সঙ্গত ভিত্তিতে অর্থনৈতিক সম্পর্কেও ভারতের স্থান সর্ব্বপ্রথম।

বিবৃতিতে দেশীয় নৃপতিবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে যে, বিদেশে গণতন্ত্রকেই সমর্থন করাই যদি তাঁহাদের (দেশীয় নৃপতিবৃন্দ) উদ্দেশ্য হয় তবে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব এই যে অগ্রে তাঁহারা যেন তাঁহাদের নিজ নিজ রাজ্যে গণতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিতে তৎপর হন।

ওয়ার্কিং কমিটী ঘোষণা করিতেছেন যে, জার্ম্মাণ-জাপানী কিম্বা অন্য কোন জাতির প্রতি ভারতীয়েরা কোন প্রকার বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করে না, তবে স্বাধীনতা বিরোধী এবং অত্যাচার ও পর-রাজ্য লিপ্সার উপর প্রতিষ্ঠিত সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাহারা গভীর বিতৃষ্ণার ভাব পোষণ করে।

বিবৃতির উপসংহারে কমিটী ভারতবাসীকে সর্ব্বপ্রকার ভেদ-বিবাদ ও অনৈক্য দূর করিতে এবং এই প্রলঙ্কর মুহূর্ত্তে বিশ্বের ব্যাপকতর স্বাধীনতার আবেষ্টনীর মধ্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জ্জনের দৃঢ় সঙ্কল্প লইয়া উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ধীর স্থির চিত্তে ঐক্যবদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়াছেন।

বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কটে কংগ্রেস বাস্তবতা ও রাজনীতিকে উপেক্ষা করে শুধু মানবতা ও নীতিধর্ম্মে প্রণোদিত হয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নি, এ অতীব প্রশংসনীয়। কংগ্রেস সর্ব্বোপরি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জাতীয় প্রতিষ্ঠান। কাজেই 'জাতীয় দাবী' ও জাতিয় আশা আকাঙ্খা কখনই কংগ্রেস বিস্মৃত হতে পারে না। তা হলে তার মূল আদর্শই বিসর্জন দিতে হয়।

বর্তমান যুদ্ধ সম্বন্ধে কংগ্রেস এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে নি। কিন্তু আজই হ'ক কালই হ'ক তাকে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে হবে। প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল এ সঙ্কটময় অবস্থায় সুচিন্তিত নির্দেশ ও সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা একান্ত প্রয়োজন। কংগ্রেস ও এ গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন।

বর্তমান যুদ্ধে ইংলণ্ড কি আদর্শ বা অভিপ্রায় নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে তা বিবৃতি প্রসঙ্গে ওয়ার্কিং কমিটি জানতে চেয়েছে। কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম এ জানার উপর অনেকখানি নির্ভর করছে।

বিদেশে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে দেশীয় নৃপতিবৃন্দ যদি বদ্ধপরিকর হয়ে থাকে তবে নিজেদের রাজ্যে ভবিষ্যতে তার কিছুটা প্রতিফলন আশা করা যায়। ওয়ার্কিং কমিটি নৃপতিবৃন্দের সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেশীয় প্রজাদের প্রতি কর্তব্য ভোলে নি।

জাতীয় জীবনের এ যুগ সন্ধি ক্ষণে দেশবাসী কংগ্রেসের নিকট 'Light & Lead' দু'ই চায়। আমরা আশা করি কংগ্রেস এ গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সব সময়েই সচেতন থাকবে।

ঢাকেশ্বরী
বাংলা বস্ত্রশিল্পের
একমাত্র উদ্ধারপন্থা
বিদেশী বর্জ্জন স্বদেশী গ্রহণ
আমাদের ১নং ও ২নং মিলের
রকমারী ধুতি, সাড়ী, সার্টিং
ইত্যাদি ক্রয় করিয়া
সহস্র সহস্র শ্রমিক পরিবারের
অন্ন বস্ত্রের সংস্থান করুন।
কটন মিলস্ লিঃ

মুক্তির স্বপ্ন

শ্রীসুনীল কুমার দাশ গুপ্তের সৌজন্যে

অষ্টম বর্ষ | কার্তিক ১৩৪৬ | পঞ্চম সংখ্যা

পরিবর্তন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সমাজের গভীর পরিবর্তনগুলি অন্তরের থেকে ঘটে। বাহিরের শিক্ষা ও অবস্থার যোগে এই পরিবর্তন ক্রমশ বল পেতে থাকে। প্রথার সঙ্গে অবস্থার ও নবশিক্ষিত চিত্তবৃত্তির অসামঞ্জস্য নিয়ে বেদনাবোধ এইটে হচ্চে পরিবর্তনের প্রথম সূচনা। স্বভাবতই সাহিত্যের কাজ হচ্চে এই বেদনাকে প্রকাশ করা। তার ভালো মন্দ বিচার করা বা তার প্রতিকারের উপায় নির্ণয় করা রসসাহিত্যের কর্তব্য বলে মনে করিনে। দেশের মেয়েরা এখনো রয়েছে সাবেককালে। তাদের শিকড় বাঁধা সমাজের গভীরে, এই কারণেই বর্তমান যুগ যখন নড়ে চড়ে ওঠে তখন কঠিন টান পড়ে মেয়েদের জীবনে; তারা দুঃখ পায়। সেই দুঃখের কথাই আমার লেখায় অনেকবার প্রকাশ পেয়েছে। এই দুঃখের নিরন্তর আঘাতে সেই চিত্তবৃত্তি ভিতর থেকে আপনি গড়ে উঠবে যা অবস্থান্তরের সঙ্গে আপন সামঞ্জস্য ঘটিয়ে তুলবে। রাশিয়ায় যা ঘটচে বা য়ুরোপে যা ঘটে তা সেখানকার মনঃপ্রকৃতির অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে নানা বিরোধের মধ্য দিয়ে সত্য হয়ে উঠচে। আমাদের দেশেও সেইরকম ঘটবে। কিন্তু ঘটবে অনুকরণ করে নয়, নিজের নিয়মে। যা চলে এসেছে তাই চিরকাল চলবে না এইমাত্র জানি, কেননা প্রতিদিন পথ বদলাচ্চে, দিক পরিবর্তন হচ্চে কারো সাধ্য নেই কালকে প্রতিরোধ করতে পারে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেও বৈদিককাল থেকে আজ পর্যন্ত সমাজের প্রভূত পরিবর্তন হয়েছে; আজও নূতন পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। অনেক রকম পরীক্ষা হবে, কোনোটা টিঁকবে, কোনোটা টিঁকবে না। তারি ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে সমাজের সৃষ্টি ক্রিয়া চলবে।

বিপ্রলব্ধা

মৈত্রেয়ী দেবী

গিরি বিলম্বি জলদের গায়
ভাসে সুন্দর ছায়া
জানিনা সে কোন্ স্বপ্নলোকের
কল্প রচিত মায়া,
জলসিঞ্চিত মন্থর বায়ে
নব উদ্ভূত বাণী
আকাশে বাতাসে টানে অবিরাম
অদৃশ্য জালখানি
পাহাড় আড়ালে গুহায় আমার
নিদ্রিত আছে প্রাণ
ঘন কুয়াশায় মিশে মিশে যায়
ছোট ছোট তার গান—
নিয়ে এতটুকু ছন্দের দান
ক্ষীণ সুর ঝঙ্কার
প্রত্যহ কেন বাহিরে তাহার
নির্লাজ অভিসার
শতপ্রতিভার আলোক দীপ্ত
গীতধ্বনি বাজে
যেথা হতে মোর বিপ্রলব্ধা
বার বার ফিরিয়াছে।

২

যে স্বপ্ন গেছে প্রত্যূষে মুছে
স্মরণ চিহ্ন তার
দুঃসহ হোলো জীবনে আমার
হোলো সীমাহীন ভার।

কবে একদিন প্রভাত আলোক
কপালে পরাল টীকা
জ্বলেছিল মোর অন্তর তলে
উর্দ্ধমুখিন্ শিখা।
আজ সে প্রদীপ আঁচল আড়ালে
বাঁচায়ে বাতাস হ'তে
রুদ্ধ দুয়ার দেহলীর পরে
রাখিয়াছি কোন মতে,
উদ্ভাস-জ্যোতি চিত্তের মাঝে
সে নহে শুভ্র তারা
প্রত্যহ তার আলোকে আমার
গৃহ কাজ হয় সারা।
তবু প্রতিদিন কাঁদে কেন প্রাণ
একি আশাহীন আশা
মৃত্যু সাগরে ঝাঁপ দিতে চায়
অশ্রুদ্বেল ভাষা।
সমব্যথীহীন বেদনা আমার
লাগিবে না কোনও কাজে
নিত্য বিমুখ সংসার তারে
ফিরাবে আমার মাঝে,
দিব না কখনো ভাগ্যের দোষ
জানাব না অভিমান
অন্তরে জ্বালি তীব্র অনল
জ্বালাব আমার প্রাণ।
অশ্রুসজল পতিত ছন্দে
যে বেদনা গেঁথে আনি
সে নহে কেবল ব্যর্থ মনের
অন্তবিহীন গ্লানি—
সে মম মুক্তি যে মুক্তি লাগি
তপস্বী ফিরিয়াছে

সে মম মুক্তি যে মুক্তি.বীর

মৃত্যুতে লভিয়াছে।

যে দীপ জ্বলিছে নিশ্চিত কোণে

তাহারে লাগে না ভালো

বারে বারে তাই দ্বার খুলে চাই

আকাশে ফেলিতে আলো,

উত্তাল বায়ে নিভে যায় যদি

নিভে যাক্ মোর প্রাণ

নিমেষের তরে সার্থক হোক্

চরম আত্ম দান

ধনবিজ্ঞানের বাঙালী স্বরাজ

অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার

ধন-বিজ্ঞানের তত্ত্বাংশ ভারতে কেন আলোচিত হইতেছে না, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে তত্ত্বাংশের আলোচনা সুরু হইতে পারে,—এই সকল বিষয়ে তর্ক প্রশ্ন, বাদানুবাদ, শল্লাপরামর্শ চলা উচিত। দুঃখের কথা, তর্ক প্রশ্ন এখনো চলিতেছে না,—বলিতে হইবে। এমন কি অভাব-বোধই সৃষ্ট হয় নাই মনে হইতেছে। অভাবের দিকে আমাদের একপ্রকার ভ্রূক্ষেপই নাই বলা যাইতে পারে।

এক কথায় আমি আমার পাঁতি দিয়া রাখিতেছি। পঁচিশ-আঠাশ বৎসর বয়স্ক যুবাদের পক্ষে কয়েক বৎসর ধরিয়া শহরে ও পল্লীতে বস্তুনিষ্ঠ ও সংখ্যানিষ্ঠ গবেষণার কাজে লাগিয়া থাকা আবশ্যক। যন্ত্রপাতি, ব্যাঙ্ক-বীমা-বহির্ব্বাণিজ্য ও কৃষি বিষয়ক কর্ম্মকেন্দ্রে মাস ছয়েক হাতে কলমে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করাও চাই। তাহার পর বৎসর চার-পাঁচেকের জন্য ইয়োরামেরিকার বিভিন্ন দেশে গিয়া কোনো কোনো মাতব্বর অর্থশাস্ত্রীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। সেই সকল অর্থশাস্ত্রীদের টোলে মূল্য, মজুরী, চক্র, মুদ্রা, কর, সুদ, মুনাফা ইত্যাদি সম্বন্ধে যে সকল গবেষণা চলিতেছে সেই সকল গবেষণার ভিতর "দুর্গা বলিয়া ঝুলিয়া পড়া" চাই। সেখানে গিয়া ভারতীয় পল্লীর নৃতত্ত্ব আর ভারত সরকারের শুল্কনীতির ইতিহাস জাহির করিলে চলিবে না। আর একটা কথাও বলার দরকার। অঙ্কশাস্ত্রে খানিকটা দখল থাকা আবশ্যক। তাহার ভিতর সংখ্যা-বিজ্ঞানের আবহাওয়াও চাই। অঙ্ক আর সংখ্যা-বিজ্ঞানকে অর্থশাস্ত্রের সহায়করূপে ব্যবহার করিবার মত ক্ষমতা থাকিলেই হইল। এই দুই বিদ্যায় রথী বা মহারথী না হইলেও ধন-বিজ্ঞানের তত্ত্ববিশ্লেষণের কাজ চলিয়া যাইবে। তবে যোগ-বিয়োগে আঁৎকাইয়া উঠিলে অথবা বঙ্কিম ছবি দেখিবামাত্র চিৎ হইলে ধন-বিজ্ঞানের তত্ত্বে প্রবেশ সহজ হইবে না।

এই পাঁতি মাফিক কাজ চালানো বর্ত্তমান বাংলায় বা ভারতে সম্ভবপর কি? এখনো সম্ভাবনা যারপর নাই কম মনে হইতেছে। আসল মামলা এখন স্বদেশ-সেবার। দেশটা যে ধন-বিজ্ঞান বিদ্যায়, আর বিশেষতঃ ধন-বিজ্ঞানের তত্ত্বাংশে নেহাৎ গরীব এই ধারণাটা প্রথমে দেশের মাথায় বসা আবশ্যক। যতখানি আন্তরিক স্বদেশ-সেবার প্রবৃত্তি থাকিলে ভারতের লোক এই সকল অভাবের কথা ভাবিতে পারে ততখানি আন্তরিক স্বদেশ-সেবা ভারতের কোথাও,—১৯২৫ সনে প্রথমবার দেশে ফিরিয়া আসিবার পর আজ পর্য্যন্ত,—দেখিতে পাইতেছি না। ভারতীয় লিখিয়ে-পড়িয়ে লোকজনের মহলে-মহলে প্রায় সকলেই যেন এক একটা "আঙুল ফুলে কলাগাছ" বিশেষ। যে দেশের লোকেরা নিজের খেয়ালে নিজকে বড় ভাবিয়া গ্যাঁট হইয়া বসিয়া থাকে সেই দেশের উন্নতি বহু সময়-সাপেক্ষ। উচ্চতর আদর্শের চর্চ্চা এই সকল লোকের মেজাজে

উৎপাৎস্বরূপ। নতুন-নতুন অভাবের কথা এই আবহাওয়ায় আলোচিত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কাজেই এই অভাববোধ সৃষ্টি করিবার জন্য আর তাহার পর এই অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিবার জন্য বঙ্গমাতা আর ভারতমাতাকে এখনো অনেক দিন বসিয়া থাকিতে হইবে। দেখা যাউক কতদিন। প্রত্যেক তিন তিন বৎসর, পাঁচ পাঁচ বৎসর অথবা দশ দশ বৎসর পর অবস্থাটা জরীপ করিয়া দেখা যাইতে পারে।

বিদেশী ভাষার আওতা হইতে ধন-বিজ্ঞান বিদ্যাকে উদ্ধার করা বাংলায় ধন-বিজ্ঞানের মুক্তি লাভের উপায়। মুক্তি লাভের দ্বিতীয় উপায় হইতেছে,—যখন তখন আর যেখানে সেখানে ভারতীয় পল্লী এবং ভারত গভর্ণমেন্টের আর্থিক নীতির কাহিনীতে মজিয়া না থাকা। বরং একদম দেশ-নিরপেক্ষ ও কাল-নিরপেক্ষ কার্য্য কারণ সমূহের গবেষণার জন্য বিদেশী টোলে-টোলে পায়চারি করা বাঞ্ছনীয়।

সুদতত্ত্ব, মজুরী-তত্ত্ব, মুনাফা-তত্ত্ব ইত্যাদি তত্ত্বগুলাকে কোন নির্দ্দিষ্ট দেশ বা কোনো নির্দ্দিষ্ট কালের সঙ্গে জড়াইয়া না রাখিয়া আলোচনা চালাইতে অভ্যাস করা আবশ্যক। দেশ হইতে আর কাল হইতে মুক্ত হইলে ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যা স্বরাজ অর্জ্জন করিতে পারিবে। ধন-বিজ্ঞানের এই বিচিত্র মুক্তিলাভ সম্বন্ধে ভারতে আমরা আজও সজাগ হইয়াছি কিনা সন্দেহ। তাহার আবশ্যকতা আমি অনেক দিন হইতেই বোধ করিতেছি। গবেষণার সময়ে অথবা গবেষণার বিষয় সম্বন্ধে অন্ততঃ পক্ষে ভারতকে ভুলিয়া থাকিতে অভ্যাস করিলেও স্বরাজশীল ধন-বিজ্ঞানের মূর্ত্তি কিছু কিছু নজরে আসিতে পারে। ক্রমশঃ সব কয়টা দেশ ভুলিয়া গবেষণা চালাইবার মতন যোগ্যতা জন্মিবে। ১৯২৬ সনে মাদ্রাজে প্রকাশিত "ইকনমিক্ ডেভেলপ্‌মেন্ট" গ্রন্থে এই ভারত নিরপেক্ষ গবেষণা প্রণালীর উপর বিশেষ জোর দিয়াছি।

ধন-বিজ্ঞানের মুক্তিলাভের জন্য অন্যান্য দু'একটা পথ বাৎলানো যাইতে পারে। "আর্থিক উন্নতি" প্রতিষ্ঠার সময় হইতেই তাহা বাৎলানো হইতেছেও।

টাকা পয়সা রোজগার করা একপ্রকার ব্যবসা আর ধন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গবেষণা চালানো, সাহিত্য সৃষ্টি করা, তত্ত্বের অনুসন্ধান করা আলাদা ব্যবসা। কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি চালাইয়া ধনদৌলত সৃষ্টি করা এক জিনিষ আর কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ইত্যাদি ধনদৌলত সৃষ্টির উপায় সম্বন্ধে হদিশ দেখানো বা মোল্লাগিরি করা এক জিনিষ। সুতরাং ধনদৌলত স্রষ্টার নিকট যাহা আশা করা যায় ধনদৌলত শাস্ত্রীর নিকট তাহা আশা করা উচিত নয়। বণিক শিল্পীরা ধনদৌলত সৃষ্টি করিতে অভ্যস্ত। কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে ধন বিজ্ঞান পরিষদের যোগাযোগ নেহাৎ উড়ু-উড়ু মাত্র। তাঁহারা কেজো লোক। আমরা এই সকল কেজো লোকের অভিজ্ঞতাসমূহকে আমাদের গবেষণার বস্তুমাত্র বিবেচনা করি।

ব্যস্, এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধ। কিন্তু কেজো লোকের জীবন আমাদের আলোচ্য বিষয় বলিয়া তাঁহাদের মতামতগুলা আমরা স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য এরূপ বুঝিলে ভুল করা হইবে। চাষী,

শিল্পী, বণিক, ব্যাঙ্কার, বীমাদার, মজুর, কুলী, জমিদার, পুঁজিদার ইত্যাদি প্রত্যেকেই নিজ নিজ উন্নতি অবনতি সম্বন্ধে লাভ লোকসান সম্বন্ধে এবং সুখ দুঃখের কারণ সম্বন্ধে নিজ নিজ মেজাজ-মাফিক নিজ নিজ স্বার্থ মাফিক মত প্রচার করিবে ইহা ত স্বাভাবিক। ধন বিজ্ঞানের সেবক হিসাবে আমরা তাঁহাদের আলোচনাগুলা, মতামতগুলা শুনিব বটে। যদি এই সমুদয়ের কোনো কোনোটা আমাদের বিচারে গ্রহণীয় হয় তাহা হইলে আমরা সেইগুলা গ্রহণ করিব। কিন্তু অন্যান্য মতামত সম্বন্ধে তাঁহাদিগের সহিত আমরা একমত হইতে পারিব না। অর্থাৎ ধন-বিজ্ঞান বিদ্যার একটা স্বাধীনতা আছে। কোন ব্যক্তি ব্যাঙ্ক চালাইতে ওস্তাদ বলিয়া অথবা আর একজন বহির্বাণিজ্যে লক্ষপতি হইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা ব্যাঙ্কের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অথবা আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়া যাইবেন ধন-বিজ্ঞানের সেবকেরা তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে হজম করিতে বাধ্য নয়। সবই বিচার, যুক্তি, তর্ক, হাতাহাতি, পাঞ্জা-কষাকষির মামলা। ধন-বিজ্ঞান সেবীরা স্বরাজশীল স্বাধীনতা নিষ্ঠ চিন্তার কারবার করিয়া থাকে।

বাংলা দেশে আর বাংলার বহির্ভূত ভারতে ধন-বিজ্ঞানের স্বরাজ সম্বন্ধে লোকজনের মাথাটা আজও পরিষ্কার নয়। পয়সাওয়ালা বেপারীরা, বীমার দালালেরা, ফ্যাক্টরীর মালিকেরা, অথবা মজুর নায়কেরা, কিম্বা জমিদারেরা অথবা চাষীরা যে সকল মত প্রচার করিতে অভ্যস্ত সেই সকল মতে সায় দিবার দিকে যদি কোন ধন-বিজ্ঞান সেবীর মেজাজ না খেলে তবে তাহাকে নেহাৎ গরু, আহাম্মুক অথবা পণ্ডিত-মুখ্খু বিবেচনা করা দস্তুর দেখা যায়। এই দস্তুর হইতে ধন-বিজ্ঞানকে উদ্ধার করা বঙ্গীয় ধন-বিজ্ঞান পরিষৎ নিজের অন্যতম ধান্ধা বিবেচনা করিয়া থাকে। বাংলায় ধন-বিজ্ঞানের মুক্তিলাভের জন্য ধন-বিজ্ঞানসেবীদিগকে সর্ব্বদা এই কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক ওস্তাদ মণ্ডলের আওতা হইতে আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। তাঁহাদের সঙ্গে অসহযোগ চাই না। চাই মাখামাখি পুরাদস্তুর। তাহা না হইলে ধন-বিজ্ঞানের গবেষণা বস্তুনিষ্ঠ হইবে না। তবে তাঁহাদের মতগুলা বেদবাক্যস্বরূপ স্বীকার করিয়া লওয়া চলিবে না। তাঁহাদের সঙ্গে দহরম-মহরম চালাইবার সময় ধন-বিজ্ঞানসেবীদিগকে নিজ নিজ স্বাধীনতা বাঁচাইয়া চলিতে হইবে। অনেক সময় তাঁহাদের সঙ্গে একমত হওয়া চলিবে কিনা সন্দেহ। এ কথা প্রথম হইতে দুই পক্ষেরই জানিয়া রাখা উচিত।

এই গেল মুক্তিলাভের তৃতীয় উপায়। চতুর্থ উপায়ও বাৎলাইতেছি। সে হইতেছে কথায় কথায় রাষ্ট্র, রাষ্ট্রিকতা, রাষ্ট্রনৈতিক মতামত, রাষ্ট্রিক স্বার্থ ইত্যাদির দোহাই না পাড়া। আর্থিক জীবনের সঙ্গে রাষ্ট্রের, শাসন ব্যবস্থার, রাষ্ট্রিক অর্থনীতির, রাজস্ব ব্যবস্থার, রাষ্ট্রনৈতিক দলাদলির যোগাযোগ নিবিড় সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমুদয়ের কথা না তুলিয়াও,—আর এই সমুদয়ের প্রভাবে অতিমাত্রায় বিচলিত না হইয়াও কৃষিনীতি, শিল্পনীতি, শুল্কনীতি, মুদ্রানীতি ইত্যাদি গণ্ডা-গণ্ডা আর্থিকনীতির বিশ্লেষণ চালানো যাইতে পারে। দেশ-বিদেশের অর্থশাস্ত্রীরা প্রায় প্রত্যেকেই রাষ্ট্রনৈতিক জীব হিসাবে কোনো-না-কোনো দলের লোক। কিন্তু ধন-বিজ্ঞানের

গবেষণা চালাইবার সময় তাহারা আদানুন খাইয়া হন্ত-দন্তভাবে কোনো একটা মতের স্বপক্ষে বা বিপক্ষে উকিলি সুরু করিতে ঝুঁকে না। রাষ্ট্রনীতির কবল হইতে ধন বিজ্ঞানকে বাঁচানো ধন বিজ্ঞানের স্বরাজ বা মুক্তি লাভের উপায়। এই লক্ষ্যের বা আদর্শের কথা ১৯২৬ সনের ২৬ জানুয়ারী অমৃতবাজার পত্রিকার মারফৎ দেশবাসীকে জানাইয়া দিয়াছি। "গ্রীটিংস্ টু ইয়ং ইণ্ডিয়া" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য (১৯২৭)। ধনবিজ্ঞানের সেই স্বরাজ বিষয়ক আদর্শ আজও আবার খোলাখুলি বলিয়া রাখিলাম।

কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ওস্তাদগণের সঙ্গে লেনদেনের সময় যেমন চাই ধনবিজ্ঞানসেবীদের স্বাধীনতা, তেমন গবর্মেণ্ট, গবর্মেণ্ট ঘেঁশা লোকজন, আর গবর্মেণ্ট-বিরোধী দল বা ব্যক্তিদের সঙ্গে আনাগোনার সময়ও চাই ঠিক সেইরূপ স্বাধীনতা। এক তরফা রায় দিবার খেয়াল ধনবিজ্ঞান সেবীদের মগজ হইতে ঝাড়িয়া ফেলা কর্ত্তব্য। অর্থ-শাস্ত্রের আখড়ায় গবর্মেণ্ট-বিরোধী মেজাজ যেমন বর্জ্জনীয়, গবর্মেণ্ট-পক্ষীয় মেজাজ ও সেইরূপই বর্জ্জনীয়। চাই আলোচনা, তর্ক-প্রশ্ন, বিচার, যুক্তিনিষ্ঠা, স্বাধীন চিন্তার খেলা। এই আবহাওয়ায় ধনবিজ্ঞান বিদ্যা নয়া মূর্ত্তিতে তাহার স্বরাজ দেখাইতে সমর্থ হইবে।

আমাদের দেশে গবর্মেণ্ট-বিরোধী রাষ্ট্রিক কংগ্রেস যে ধরণের অর্থনৈতিক কর্ম্মকৌশল পছন্দ করিতে অভ্যস্ত ভারতীয় বণিক সঙ্ঘের বণিক ব্যাঙ্কার পুঁজিপতিরা প্রায় অবিকল সেই অর্থনীতির প্রচারক। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই চোখ-কান বুঁজিয়া কংগ্রেসের দেখাদেখি স্বদেশ বনিক-সঙ্ঘগুলা, আর স্বদেশী বণিক-সঙ্ঘের দেখাদেখি কংগ্রেস, গবর্মেণ্ট প্রবর্ত্তিত বা গবর্মেণ্ট সমর্থিত অর্থনীতির বিরোধী। ধনবিজ্ঞানের আখড়ায় বা টোলে এইরূপ চোখকানবুঁজা গর্বমেণ্ট-বিরোধী নীতির সমর্থন যুক্তি-সঙ্গত বিবেচিত হইবে না। ধনবিজ্ঞানের মুক্তিলাভ যাঁহারা আকাঙ্খা করেন তাঁহাদের পক্ষে এই কথা তলাইয়া মজাইয়া বুঝিয়া দেখা দরকার। রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার জন্য, কম-সে-কম রাষ্ট্রিক আন্দোলন ও উত্তেজনা সৃষ্টি করিবার জন্য যখন তখন যে কোনো গবর্মেণ্ট-প্রবর্ত্তিত আর্থিক প্রচেষ্টার বিরোধী হওয়া বাঞ্ছনীয় হইতে পারে। কাজেই কংগ্রেস ও চেম্বার অব কমার্সের পক্ষে দেশের ভিতর এই ধরণের বিরোধ সৃষ্টি করা খুবই সঙ্গত কাজ। লোক ক্ষেপাই-বার জন্য এই সব আন্দোলনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু ধনবিজ্ঞানের পরিষদে অর্থনৈতিক কর্ম্ম-কৌশল গুলাকে সাধারণতঃ জনগণের আর্থিক মঙ্গলামঙ্গলের তরফ হইতেই যাচাই করিয়া দেখিতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই ধনবিজ্ঞান সেবীদিগকে কংগ্রেস ও বণিক-সঙ্ঘের মতে সায় দেওয়া সম্ভবপর না হইতেও পারে। ধনবিজ্ঞানের স্বরাজ বা মুক্তিলাভ বলিলে এই বিচিত্র অবস্থাও বুঝিতে হইবে।

মনে হইবে যেন বাঙালী ধনবিজ্ঞান সেবীদের চরম লক্ষ্য ও আদর্শ সম্বন্ধে লম্বা লম্বা বোল-চাল ঝাড়িতেছি। বিলাত, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, ইতালি ইত্যাদি বাঘা বাঘা দেশের ধনবিজ্ঞান পরিষদের আবহাওয়ায় চলা-ফেরা করিতে করিতে বুঝি মেজাজ বিগড়াইয়া গিয়াছে। ব্যাপার তত গুরুতর নয়।

গোটা ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা—আর বিশেষতঃ বাংলা দেশের বর্ত্তমান অবস্থা,—ধনবিজ্ঞান বিদ্যার চর্চ্চা কত হীন—তাহা আমার সর্ব্বদা জানা আছে। এ বিষয়ে চোখ বুঁজিয়া কথাবার্ত্তা বলা অথবা আকাশকুসুম কল্পনা করা এই হাড়-মাংসের রেওয়াজ নয়।

আজ কালকার ভারতে আমরা একালের ধনদৌলত ও অর্থশাস্ত্র সম্বন্ধে নানা প্রকার আধুনিকতম বই, প্রবন্ধ ও পুস্তিকাদি পড়িয়া থাকি বটে। কিন্তু ভারতীয় ধন-বিজ্ঞান গবেষনার ফিরিস্তি লইবার সময় ইস্কুল—কলেজে বই-পড়ার আর পরীক্ষায় পাশ করার হিসাব লইলে চলিবে না। এমন কি পরীক্ষায় পাশের জন্য যে "থীসিস্"-জাতীয় বই লিখিতে হয় তাহাও অন্তর্গত করা ঠিক নয়। অর্থনৈতিক লেখালেখির ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের দৌড় বিংশ শতাব্দীর দুনিয়ার মাপ কাঠিতে অতি সামান্য! এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মিল্ মার্ক্সের যুগে দুনিয়ার ধনবিজ্ঞান চিন্তা যে দরের ছিল বর্ত্তমানে ভারতীয় ধনবিজ্ঞান চিন্তার দর ততখানি পর্য্যন্ত উঠিতে পারে নাই। রমেশচন্দ্র ও রানাডে হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় অর্থশাস্ত্রীরা যতখানি লেখালেখি করিয়াছে অর্থাৎ যতখানি ধনবিজ্ঞান সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে—বিশেষতঃ ইস্কুল—কলেজের পরীক্ষা নিরপেক্ষ হইয়া যতটা ধনবিজ্ঞান গবেষণায় কালি-কলমের সদ্ব্যবহার করিয়াছে,—তাহার কিম্মৎ বুঝিতে হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিলাতী—ফরাসী—জার্ম্মান—ইতালিয়ান চিন্তামণ্ডলে প্রবেশ করিতে হইবে। অতি রঞ্জিত ভাবে হিসাব করিতেছি কিনা সন্দেহ।

আমার বিবেচনায় ভারতীয় ধনবিজ্ঞান চর্চ্চা বিলাতী আডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) ও রিকাডোর (১৭৭১-১৮২৯) মাঝামাঝি যুগ ছাড়াইয়া আসিতে পারে নাই। রিকার্ডো বলিলে বুঝিতে হইবে এমন একটা চিন্তাবীর যে ধন-বিজ্ঞানটাকে বিশ্লেষণমূলক তত্ত্ব রাশিতে ভরিয়া একটা বিলকুল নয়া বিদ্যার জন্ম দিয়াছে। আর তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী আডাম স্মিথ দেশী-বিদেশী সম্পদের তথ্য,—দুনিয়ার ধনদৌলত বা স্বদেশী সম্পদবৃদ্ধির কর্ম্মকৌশল,—ইত্যাদি নানা তথ্যের সঙ্কলনকর্ত্তা বা সংগ্রাহক। ধন-বিজ্ঞানের "তত্ত্বাংশ" সম্বন্ধে আডাম স্মিথকে বড় বেশী ইজ্জদ দেওয়া চলিবে না। আডাম স্মিথ প্রধানতঃ কর্ম্ম-কাণ্ডের দার্শনিক, কর্ম্ম-কৌশলের পণ্ডিত। রিকার্ডোর লেখালেখিতেই ধন-বিজ্ঞান-বিদ্যা বিজ্ঞানের মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। ভারতে আমরা রিকার্ডোর পূর্ববর্ত্তী কোন একটা অবস্থায় রহিয়াছি। সেই জন্য মোটের উপর বলিতেছি যে, বিজ্ঞানের বাটখারায় ফেলিলে ১৯৩১ সনের যুবক-ভারত ঠিক যেন আডাম স্মিথের যুগে রহিয়াছে। নিক্তির ওজনে কড়ায়-ক্রান্তিতে এ সব জিনিষের সীমানা নির্দ্দিষ্ট করা সম্ভব নয়। সবই ঠারে-ঠারে বুঝিতে হইবে।

বাঙালী আর অন্যান্য অর্থশাস্ত্রীদের জন্য ধন-বিজ্ঞানের মুক্তিলাভ সম্বন্ধে যতই আশা, উৎসাহ, ভাবুকতা পয়দা করিতে চাই না কেন, আমাদের বর্ত্তমান শৈশবাবস্থা সম্বন্ধে ধারণা আমার ধোঁআটে নয়। আমরা কোথায় আছি এই কথাটা নিরেট ভাবে জানা থাকিলে ধাপে ধাপে উন্নতি করা অথবা উন্নতির পথ ঠাওরানো সম্ভবপর হইবে।

ভারতীয় ধন-বিজ্ঞান-গবেষণার বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক মূল্য সম্বন্ধে দারিদ্র্য ও দৈন্যের কথা বলিলাম। এমন কি যদি লেখালেখির সংখ্যা বা পরিমাণ মাত্র হিসাব করিয়া দেখি তাহাতেও লজ্জা নিবারণের কোন উপায় ঢুঁড়িয়া পাই না। প্রবন্ধ, পুস্তিকা আর গ্রন্থ প্রকাশ সম্বন্ধে ভারতীয় এবং বিশেষতঃ বাঙালী ধন-বিজ্ঞানসেবীরা শামুকের রীতিতে অগ্রসর হইতেছে। ১৯০৫ সনের গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লব হইতে আজ পর্য্যন্ত,—এমন কি ১৯২৫ সনের পরবর্ত্তী একয় বৎসরের, লেখা-লেখি জরীপ করিলে দেখা যায় যে, ফি বৎসর এমন কি একখানা করিয়া বইও বাঙালীরা বাংলায় অথবা ইংরাজীতে বাহির করিতে পারে নাই। পরীক্ষায় পাশ করিবার জন্য যে সব "থীসিস্"-জাতীয় রচনা লিখিতে হয় সেই সব বাদ দিলে অবস্থা আরও সঙ্গীন দাঁড়াইবে।

পরীক্ষায় পাশের জন্য যে সকল বই লেখা হয় তাহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিবার গুরুতর কারণ আছে। প্রথমতঃ, এই সবের ভিতর লেখকের মানসিক স্বাধীনতা খুব কম দেখা যায়। কোন্ কোন্ মত পরীক্ষকগণ কর্ত্তৃক গৃহীত হইবার সম্ভাবনা সেইদিকে নজর রাখিয়া লেখকেরা তথ্য সংগ্রহ ও তত্ত্ব পুষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। এক কথায়,—জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে পরীক্ষক-দের মার্জ্জি মাফিক বই লেখা হয়। ইহার চেয়েও গুরুতর আপত্তি আছে। পরীক্ষার জন্য বাধ্য হইয়া বই লেখালেখির ভিতর কোনো লেখকের চরিত্রে গবেষণার আকাঙ্খা বা স্বভাব আছে কিনা বুঝা যায় না। পরীক্ষায় ডিক্রী পাইবার পর লেখক আদৌ লেখাপড়ার ঝোঁক রক্ষা করিয়া চলিবে কিনা তাহার স্থিরতা নাই। এই কারণে পরীক্ষায় পাশ ফেলের পর লেখকেরা যে সকল রচনা প্রকাশ করে তাহার হিসাব লওয়াই যুক্তি সঙ্গত।

সাহিত্য ও বাস্তবতা

বিজন ভট্টাচার্য্য

মানুষের চিন্তা ও মনোভাব সাহিত্যেই মূর্ত্ত হ'য়ে ওঠে বিশেষভাবে। অন্য সব কিছুতেই মানুষকে দেখা যায় আবছা আবছা। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আজ পর্য্যন্ত মানুষের খোঁজে মানুষ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল তন্ন তন্ন ক'রে হাতড়ে বেড়াচ্ছে। ধরা ছোঁয়ার বাইরে মানুষ প্রাক্তনের রহস্যময়-লোকে আমাদের দৃষ্টির সীমানার বাইরে হয় ত ক'রেছে নিঃশব্দ পদচারণ। আভাস আমরা পেয়েছি তার কিন্তু পায়নি সন্ধান। উৎকীর্ণ পাষাণ ফলকে, মন্দিরে মিনারে স্তম্ভে স্তম্ভে তাদের বুঝেছি আমরা ; চারণের মুখে উৎসারিত হ'য়েছে তাদের জয়গাথা। স্তব্ধ হ'য়ে শুনেছি আমরা সেই গান, নিভৃতে জানিয়েছি প্রাক্তন মানুষকে আমাদের সমবেত প্রশস্তি আর মনে মনে ক'রেছি আমরা সংকল্প কঠিন—আমাদের যশঃসূর্য্য প্রাচীনের গৌরবকে ক'রবে হতম্লান—পাংশু—বিবর্ণ। আমাদের প্রেরণা ও চিন্তার ঘূর্ণিস্রোতে প্রাচীনের সুচিন্তিত তথ্যের পাতা কুটোর মত দিশাহারা হবে ; তারপর ঢেউএ ঢেউএ কতদূর কোথায় তা হারিয়ে যাবে কেউ জানবে না।

আমাদের সে সংকল্প সাধনা ব্যর্থ হয়নি। প্রাক্তনের উপর আমরা সগৌরবে আমাদের বিজয় পতাকা দুই হাতে তুলে ধ'রেছি আর লক্ষ লক্ষ নরনারী দূর থেকে জানিয়েছে তাদের সশ্রদ্ধ অভিবাদন। আমরা হয়েছি জয়ী। প্রাচীন মানুষের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভাবধারা ও প্রাচীন ঐতিহ্যও অনেকটা ধুয়ে মুছে গিয়েছে ; যেটুকু আছে তাও জরাজীর্ণ স্থবিরের মত দিন গুণছে।

চিন্তারাজ্যে এই যে বিপ্লব যুগে যুগে মানুষের গতিভঙ্গী নিয়ন্ত্রিত ক'রে আসছে তা আবার জড়জগতে বিপ্লব প্রসূত চিন্তাধারারই প্রতিফলন। জড়জগতে বিপ্লবের প্রখরতা ও তৎপ্রসূত বিবর্ত্তনের বিশালতাই মানুষের চিন্তারাজ্যে পরিবর্ত্তনের ব্যাপকতা নির্দ্ধারণ ক'রেছে। কিন্তু এই চিন্তাধারার উপর প্রাচীন ভাবধারার যে এতটুকু প্রভাব নেই তা নয়। আধুনিক মানুষ তার অভিজ্ঞতার ঝালতি দিয়ে প্রাচীন ভাবধারাকে চোলাই ক'রে নিয়েছে মাত্র। যতটুকু প্রয়োজন তার সবটুকু নিয়েছে আর বাকীটুকু ক'রেছে বর্জ্জন। এই অভিজ্ঞতাটুকু সম্বল ক'রেই প্রাচীন ভাবধারার বিরুদ্ধে বর্ত্তমান সংগ্রাম ঘোষণা ক'রেছে এবং ভবিষ্যতেও ক'রবে। জড়জগতে আমরা প্রতিনিয়ত যে ক্ষুদ্র বৃহৎ সংগ্রাম প্রত্যক্ষ করি সেগুলি প্রধানতঃ কায়িক। শারীরিক সর্ব্বশক্তিমান ও কৌশলীই আপেক্ষিক নিকৃষ্টতর শক্তিকে পরাভূত ক'রে স্বকীয় শক্তি প্রতিষ্ঠা ক'রে থাকেন। জড়জগতে সমস্ত হিংসাত্মক রেষারেষির মীমাংসা হ'য়ে থাকে পাঞ্জায় পাঞ্জায়। মনোজগতে যে বিপ্লব সুরু হয় তা উপলব্ধি ক'রে থাকি আমরা আমাদের চিন্তাধারার অভিনবত্বের ভিতর দিয়ে।

প্রাচীন ভাবধারা পদে পদে আমাদেরকে তার নিজ গণ্ডীর মত বেড়ে ফেলতে চেষ্টা ক'রছে, অফুরন্ত তার প্রয়াস কিন্তু প্রাক্তনকে বার বার বিপর্য্যস্ত হ'তে হ'য়েছে নূতনের কাছে—চুক্তি নেই, সন্ধি নেই,—বিনা সর্ত্তে। কিন্তু নূতন ভাবধারার এই যে বিজয় গৌরব তা বার্সিলোনায় বা সাংহাইএর বুকের উপর নিশান উড়িয়ে নয়; তার অনুভব ক'রেছি আমরা অখণ্ড জাতীয়তাবোধে বহুর মধ্যে একজন হ'য়ে। স্বধর্ম্ম আজ আমরা বিসর্জ্জন দিয়েছি অখণ্ড মানবিকতায় আর আমাদেরই সংস্কারের শুনানী হচ্চে আজ আমাদেরই বুদ্ধি ও বিচারের কাঠগড়ায়। প্রাচীন ভাবধারার বিরুদ্ধে মানুষের এই বিক্ষোভ মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি ক'রেছে আর সেই বিক্ষোভই রূপায়িত হ'য়েছে মানুষের সাহিত্যে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন চিন্তাশীলগণ মাত্রই তার কিছুটা উপলব্ধি ক'রতে পারেন এবং সাধ্যমত সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। কারণ বিবর্ত্তনবাদ স্বীকার ক'রে নিয়ে ভবিষ্যৎ জড়জগতের গড়ন ও ধাঁচ কবি সাহিত্যিক ও লেখকগণের নির্দ্দেশ মতই যে হ'য়ে উঠবে তা কেউই স্বীকার ক'রতে চাইবেন না।

অবশ্য জড়জগতের স্থিতি ও মঙ্গলের জন্য তাঁদের ইঙ্গিতের যে বিশেষ একটা প্রয়োজন আছে তা বলাই বাহুল্য। বস্তুতঃ আমাদের এই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতার মূলসূত্রগুলি তাঁদেরই চিন্তাপ্রসূত। কিন্তু এই চিন্তাপ্রসূত ব'লেই তাঁদেরকে আমরা কারণ ও ফলাফলের সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব দিতে নারাজ। তাই অনেক সময় তাঁদের মধ্যে কেহ যখন স্বীয় ক্ষমতায় অবাঞ্ছিত দেবত্ব আরোপ ক'রে নিজস্ব সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত প্রতিপন্ন ক'রতে বদ্ধপরিকর হন এবং তথা সংস্কৃতিসম্পন্ন মানব সমাজের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে আপন আদর্শ ও কর্ত্তব্য বিনিময়ে ব্যবহারজীবীর মত মুখর হ'য়ে ওঠেন তখনই তাঁদের ইঙ্গিত ও দৃষ্টির স্বচ্ছতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার বিশেষ কারণ ঘ'টে ওঠে। হতে পারে এটা তাঁদের অজ্ঞাত বা অনিচ্ছাকৃত; হয়ত ক্ষমাও তাঁদের করা যেতে পারে এজন্য; কিন্তু নীতি বিগর্হিত নিশ্চয়ই। বিশেষতঃ সিদ্ধান্তগুলি যখন সত্যই চিন্তাপ্রসূত তখন এই চিন্তাবলীর উপজীব্য নিশ্চয়ই কিছু ছিল; কেননা নিরালম্ব চিন্তার সিদ্ধান্ত অচিন্তিত। যে সমস্ত বিষয় উপজীব্য ক'রে তাঁদের ভাবধারা সিদ্ধান্তে এসে পৌছায় তার অকাট্যতা আবার তাঁদের দৃষ্টিশক্তির সুস্থতার উপর নির্ভর করে। মানুষ মাত্রেই ভুল করে—এ কথা যদি সত্য হয় তবে তাঁদের সিদ্ধান্তের অমোঘতায় আস্থা স্থাপন করা অযৌক্তিক হবে। অতএব কোন লেখকের পক্ষে,—সাহিত্যিকই হোন আর কবিই হোন, আপন সিদ্ধান্তের অকাট্যতা প্রতিষ্ঠা ক'রতে যাওয়া নিতান্ত ভুল হবে। সত্যিকারের স্রষ্টা যাঁরা, দর্শী যাঁরা তাঁদের এ সব বালাই নেই। আপন সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রমাণ ক'রতে তাঁদের নিজের কোন মাথা ব্যথা নেই। আত্মপ্রত্যয়ই তাঁদের কাছে সব চাইতে বড় জিনিষ এবং খুব কম লেখকেরই তা আছে। স্রষ্টা যিনি, কোন কিছু প্রতিপন্ন মাত্রেই যদি তাঁর সিদ্ধান্ত সমগ্র মানুষ অভ্রান্ত সত্য বলে স্বীকার করে নেয় তা হ'লে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সমগ্র মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পার্থক্য থাকে না এবং সে ক্ষেত্রে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্বই বা কতটুকু তাও বিচার্য্য। অবশ্য সব ক্ষেত্রে তা খাটে না; লেখকের বিষয়বস্তুর উপর

তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। তবে লেখক আমাদের এই মাটির পৃথিবীতেই বাস করেন সুতরাং লেখকের বিষয়বস্তুতে মাটির সোঁদা গন্ধ এবং তাঁর প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা রূপায়িত হ'য়ে উঠবে নিশ্চয়ই।

ভাবপ্রবণতা, ব্যঞ্জনা, কল্পনা—এ সব সাহিত্যে স্থান পাবে না? পাবে বৈ কি, নিশ্চয়ই পাবে। সাহিত্যের মর্য্যাদা ও সৌন্দর্য্য যথেষ্টই ক্ষুণ্ণ হবে তা না থাকলে। সাহিত্য ত আর ফটোগ্রাফি নয়! কিন্তু তাই নয় বলেই সাহিত্য যে নিরালম্ব হ'য়ে শূন্য মার্গে ঝুলতে থাকবে আর কাল্পনিক রসসমুদ্রে দাঁড় ফেলে আপন খেয়ালেই গা ভাসিয়ে দেবে; জড়জগতের সঙ্গে তার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে তাও সমপরিমাণেই দোষাবহ। আবার সাহিত্য যদি ফটোগ্রাফিতে পর্য্যবসিত হয় তা হ'লে পাঠকবর্গের মন যুগিয়ে চ'লতে পারবে না—উচিতও নয়। পাতার পর পাতা প'ড়ে যাব অথচ হাসব না,—বেশ লাগছে—এমনটী মনে হবে না, চমৎকারিত্বের নেশা ধ'রবে না, তাই বা কি ক'রে সম্ভব হবে সাহিত্যে? তা হ'লে এ-ও না ও-ও না। বাধ্য হ'য়ে ক'রতে হবে একটা মীমাংসা এ দুইএর মধ্যে। অবশ্য গোঁজামিল দিয়ে নয়, যথাসম্ভব সুসামঞ্জস্য স্থাপন ক'রে। সাহিত্যে এই কল্পনা ও যুক্তির মেশামিশির উপরই সত্যিকারের সাহিত্যের মর্য্যাদা নির্ভর করে। যে লেখক তাঁর বিষয়বস্তুকে নিপুণভাবে কল্পনা ও যুক্তির ভিতর দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তিনি সাহিত্য জগতে বিশেষ স্থান পেয়েছেন; জয়ন্তী তাঁদের মানুষেই ঘটা ক'রে ক'রেছে। তা হ'লে বাস্তব ও অবাস্তব সাহিত্যে এ দুটোই অপরিহার্য্য। অবশ্য বাস্তবকে মহীয়ান ক'রে তুলবার জন্য যতটুকু অবাস্তবের প্রয়োজন ঠিক ততটুকু। জড়জগতের অস্তিত্ব অবিসংবাদী। অস্তিত্ব না থাকলে সমস্যাগুলিও নিশ্চয়ই থাকতো না। অতএব জড়জগতের অস্তিত্ব সতঃসিদ্ধ ট্রুইজম বলেই আমরা ধ'রে নিব। এই জড়জগৎ আবার পরিবর্ত্তনশীল। এই পরিবর্ত্তনের গতি মানুষের জীবনধারা ও সমস্যাগুলিরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে। বহির্জগতের এই পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনুসন্ধিৎসু আমাদের মন বিশ্লেষণ শুরু করে; বহির্জগতের সঙ্গে আমাদের অন্তর্জগতের সম্বন্ধ খুঁটিয়ে দেখে। এই বিশ্লেষণী শক্তিই ভাষা। পররাষ্ট্র সচিবের মত ভিতর বাহিরে সুসামঞ্জস্য স্থাপন করবার জন্য একে প্রায় সব সময়ই তৎপর দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই অব্যর্থ পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের ঝ'ড়ো হাওয়ায় সব কিছু আলোড়িত হ'লেও প্রাচীন মাত্রেরই বিলুপ্তি ঘটিয়ে বর্ত্তমান স্বাধিকার ঘোষণা ক'রতে পারে না। শ্রেণী বিশেষে এই পরিবর্ত্তনের ঘূর্ণি তীব্র হয়ে ওঠে এবং শ্রেণী বিশেষেই এই পরিবর্ত্তন প্রকট হ'য়ে ওঠে। এই পরিবর্ত্তনের ফলে যে শ্রেণীর উদ্ভব হ'লো তা সম্পূর্ণ অভিনব। বিভিন্ন শক্তিসমূহের সংঘর্ষের ফলেই এই শ্রেণীর জন্ম। এই শ্রেণীগত ভাবধারার অভিনবত্বে অনেকে মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। আবার কেউ কেউ এর অস্বাভাবিক দীপ্তিতে গেলেন ঝ'লসে। ভীরু তারা আশ্রয় নিল প্রাচীনের পক্ষপুটচ্ছায়ে। কিন্তু যে ভাবধারা প্রাচীনের সুরক্ষিত দুর্গ ভেদ করে বিজয় গর্ব্বে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে সর্ব্বজনসমক্ষে আপন অকাট্যতা প্রতিপন্ন ক'রলে তার ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করবার মত সাহস অনেকেরই হ'লো না।

নব উদ্যমে নূতন ঘোষণা ক'রলো তার নির্দ্দেশ বাণী পৃথিবীর এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ; আর মানুষ অবনত মস্তকে নূতনের এই বিরাট অভ্যুত্থানকে অভিবাদন জানা'ল। বহির্জগত ও অন্তর্জগতের সংঘর্ষে এসে এই যৌগিক ভাবধারা অলক্ষিতে মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন প্রভাবান্বিত ক'রে তুলল। দৈনন্দিন জীবন ধারার মধ্যে মানুষ এক নূতন অনুপ্রেরণা উপলব্ধি ক'রতে লাগল। যে বিশিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি অনুসরণ করে একদিন মানুষ যে অভীষ্ট ফল লাভ ক'রে এসেছে সে আজ দেখলো যে ঠিক সেই কর্ম্মধারা যথাযথভাবে অনুসরণ করেও সে তার অভীষ্ট ফল লাভ ক'রতে পারছে না। এই যে ব্যর্থতা এতে মানব সমাজে দুটো প্রতিক্রিয়া দেখা দিচ্ছে। একটা হচ্ছে এগিয়ে চলার আর একটা হচ্ছে পিছু হটার। কিন্তু এগিয়ে চলাটাই হচ্ছে বিজ্ঞানসম্মত ; কেননা সামাজিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে একদিন যে জীবন গ'ড়ে উঠেছিল আজ সেই মূলসূত্রগুলিই গেছে বদলে। তাই পিছু হ'টে পুরাতন ব্যবস্থাগুলির উপর আবার জীবন পত্তন ক'রলে হবে অবিজ্ঞানীর কাজ ; কারণ যে কোন মুহূর্ত্তে সেই জরাজীর্ণ ভিত্তি বালুচরের মত ধ্বংসে গিয়ে মানুষকে বিপন্ন ক'রে তুলতে পারে। পবিবর্দ্ধনের পথে চলমান শক্তি-নিচয়ের স্বাভাবিক গতি উপেক্ষা ক'রে আমার বিচ্যুতি হবে পাপ, আর সেই পাপে স্খলিত জ্যোতিষ্কের মত আমাকে ঘুরপাক খেয়ে ম'রতে হবেই। মানুষ হিসাবে সাধারণ মানুষের দায়িত্ব আজ এতখানিই। কারণ জীবন মরণ সমস্যা যেখানে সেখানে সাধারণ মানুষ পর্য্যন্ত উদাসীন থাকতে পারে না। আর শিল্পী যাঁরা, স্রষ্টা যাঁরা—যাঁরা যুগ যুগ ধ'রে নব নব ভাবধারাকে কালের উদুখলে ফেলে রূপাবর্ত্তন ক'রেছেন মানুষের মঙ্গলের জন্য ; এ ক্ষেত্রে তাঁকে শুধু সাধারণ মানুষের দায়িত্বের দিক দিয়ে জবাবদিহি ক'রলেই যথেষ্ট হবে না। কারণ বিবর্ত্তনের ফলে যেটুকু হবেই তা বাদে জাগতিক কারণ ও ফলাফলের জন্য তিনিই সবটুকু দায়ী।

আজ জড়বাদের বদ্ধ জলায় বান ডেকেছে। অতএব পরিবর্ত্তনের ঘূর্ণাবর্ত্তে সাহিত্যে আদর্শ-বাদের সীমান্ত ভেঙ্গে গিয়ে সমগ্র জীবনকে ভিত্তি করেই শিল্পীকে সৃষ্টি করতে হবে। জীবনকে কেন্দ্র ক'রেই রূপকারকে রংএ রংএ ফুটিয়ে তুলতে হবে তার মানসীকে—কবিতার কাব্যকে—সাহিত্যিক তার সাহিত্যকে।

আন্তর্জ্জাতিক লেখক সম্মেলনে আঁদ্রে জিদ্ বলেছিলেন

"As a man of letters, I am here speaking only of culture and literature ; but it is precisely in the domain of literature that this triumph of the general in the particular and of the human in the individual is most clearly seen. What can be more specially Spanish than Cervantes, more English than Shakespeare, more Russian than Gogol, more French than Rabelais or Voltaire ? And at the same time what can be more prfoundly human ? অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে যে বৈপ্লবিক ভাবধারা ষষ্ঠদশ লুইএর সাম্রাজ্যকে বানচাল

ক'রে ন্যাশন্যাল এসেমব্লী গঠন ক'রেছিল সেই ভাবধারা মনটেস্কোর মধ্যে নয়, ধীমান ভল্টের'এর মধ্যেও নয়, তা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠেছিল মনীষী ঝাঁ ঝাঁক রুশোর মধ্যে। রুশোকে আমরা দেখতে পাই তাঁর Contract Social'এর মধ্যে আর তাঁর Confessions'এর মধ্যে তিনি এক যুগান্তকারী অমর সাহিত্য সৃষ্টি ক'রে গিয়েছেন। Mr. Murrey বলেন যে ১৮৪৮ সালের কম্যুনিষ্ট ইস্তাহার বুঝতে হ'লে পূর্ব্বাহ্নে রুশোর Contract Social'এর সঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে পরিচিত হ'তে হবে। এই Contract Social'এর মধ্যেই গণতন্ত্রের বীজ উপ্ত ছিল প্রচ্ছন্নভাবে। তদানীন্তন শ্রম শিল্প ব্যবস্থার মধ্যে রুশো বিপদের আশঙ্কা ক'রেছিলেন। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তিনি মনুষ্যকে সাবধানও ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি ব'লেছিলেন অনিবার্য্য ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেতে হ'লে আমাদের সমগ্র সমাজের মধ্যে একটা চেতনা জাগিয়ে তুলতে হবে। রুশো ছিলেন ঠিক বুনো ফুলের মত সহজ—সতেজ—নির্ভীক। তার অস্বাভাবিক বন্যতা সমস্ত কৃত্রিম সমাজ ব্যবস্থাকে মানুষের চোখের সামনে তুলে ধ'রলো। মানুষ ক'রলো বিদ্রোহ—ব্যাস্তিল প'ড়লো ভেঙ্গে। Dr. Indge ব'লেছেন "the influence of this sentimental rhetorician has perhaps been more pernicious than that of any man who has ever lived. Without Rousseau there might have been no Karl Marx and no Bolshevism." মার্কস'এর নীতি অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে রুশোর Contract Social'এর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। ইংলণ্ডের Industrial Revolution এর উপর ভিত্তি ক'রেই মার্কস'এর নীতি গড়ে উঠেছিল। তথাপি অর্থ-নৈতিক অসাম্য যখন রুসোর মতে ভূমি সর্ব্বসাধারণের না হ'য়ে অযৌক্তিকভাবে জমি দখল ক'রবার সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হয় তখন রুসোর Contract Social'এর সঙ্গে মার্কস'এর নীতির যে একটা প্রচ্ছন্ন যোগসূত্র নেই তা বলা যায় না।

আধুনিক যুগের মনীষীদের মধ্যে মিঃ এইচ, জি, ওয়েলস ও বার্ণার্ড শ শক্তিমান লেখক ব'লে বিশেষ সুপরিচিত। কিন্তু বস্তুবাদের উপর ভিত্তি ক'রে তাঁরাও তাঁদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করেন নি। মিঃ ওয়েলস্ বলেছেন "It is our function to keep in view and to commend the movement of ideas, which are not the effect but the cause of Public events." মিঃ ওয়েলস'এর এই উক্তি থেকেই আমরা দেখতে পাই যে ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যাকে তিনি বিশেষ ভেবে চিন্তেই অগ্রাহ্য ক'রেছেন। অবশ্য মিঃ ওয়েলস'এর তীক্ষ্ণ প্রতিভা তাঁর এই যুক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ক'রেছে। ধনতন্ত্রবাদী অর্থনীতিবিদগণ শ্রমিক, বণিক, চাষী ও ধনিক শ্রেণীকে এক বৃহৎ মানব গোষ্ঠীর মধ্যে ফেলে ব'লেছেন 'that they react similarly to similar stimuli.' তাঁদের এই মিথ্যা underlying psychological assumptions'এর বিরুদ্ধে ওয়েলস'এর প্রতিভা বিদ্রোহ ক'রেছে। তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও ব'লতে বাধ্য হ'য়েছেন যে একমাত্র মার্কসবাদীরাই এর সদুত্তর দিয়েছে। তিনি বলেছেন "the Marxist indeed makes some pretention to psychology with his phrases about a

'class concious prolatariat' and a 'bourgeois mentality' and the like." মিঃ ওয়েলস'এর মজ্জাগত ধনিক প্রবৃত্তি তাঁর তীক্ষ্ণ মেধার কাছে পরাজয় স্বীকার ক'রেছে। মিঃ ওয়েলস এইরূপ আরও স্বীকারোক্তি ক'রেছেন। ধনতন্ত্রবাদী ওয়েলস'এর কাছ থেকে এইটুকু স্বীকারোক্তিই যথেষ্ট নয় কি? বিগত পঞ্চাশ বৎসর ধ'রে লেখকদের উপর ধনতন্ত্রবাদ যে প্রভাব বিস্তার ক'রে আসছে তার অস্বাভাবিক পরিণতি হ'য়েছে বার্ণার্ড শ'এর মধ্যে। বর্ত্তমান জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল মনীষীবৃন্দের মধ্যে বার্ণার্ড শ অন্যতম। স্থবির ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর বিচার বুদ্ধি ও বিদ্রোহ করেছে Heart-break House এর মধ্যে। তিনি তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করে ব্যক্ত ক'রেছেন। তথাপি জীবনের বাকী কটা দিন ধনতন্ত্রবাদের আমলেই সোয়াস্তিতে কাটিয়ে দেওয়া যাবে জেনেই তিনি হয়েছেন একজন ফেবিয়েন। আদর্শবাদী হলেও জড়বাদকে এঁরা স্বীকার করে নিয়েছেন।

কাব্য ও সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ ক'রবার দিক থেকে সত্য শিব ও সুন্দরের মাপকাঠি ব'দলে গিয়ে নতুন কোন মানদণ্ড আজ গ্রহণ করা হয় নি। তবে গুণাগুণের দিক থেকে তারা আপনা আপনিই ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ ক'রেছে মাত্র। যে মানুষ একদিন আদর্শবাদকেই জীবনের চরম সত্য ব'লে মেনে নিয়েছিল আজ সেই মানুষই চায় তার জীবনের একটা বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা। তাই নিছক আদর্শবাদের পটভূমিকায় আজ কোন সাহিত্য সৃষ্টি ক'রলে তা প্রাণহীন অস্পষ্ট মনে হবে। অতএব বস্তুবাদের উপর ভিত্তি ক'রেই আজ সাহিত্য সৃষ্টি কর'তে হবে—আদর্শবাদের উপর নয় এবং এইটেই আজ সব চাইতে বড় সত্য। আজ যে সাহিত্য সৃষ্টি ক'রতে হবে তার মধ্যে চাই simplicity. সাহিত্যে এই simplicity খুব সহজ লভ্য নয়। মানুষের সমগ্র জীবনকে শিরায় শিরায় উপলব্ধি ক'রতে পারলেই সাহিত্যে এই simplicity ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হতে পারে। সমসাময়িক সাহিত্যকে অতিক্রম ক'রে পুস্কিনের সাহিত্য একদিন মানব-সমাজে যে সমাদর লাভ ক'রেছিল তার কারণ হচ্ছে যে তাঁর অসাধারণ বাগ্মিতা সত্ত্বেও তিনি মানুষের জীবনকে অতি সহজ সরল ও সুন্দর ভাবে তাঁর সাহিত্যে রূপায়িত ক'রেছিলেন। এই simplicityর ভিতর দিয়েই সাহিত্যে আজ মানুষের সমগ্র জীবনকে ফুটিয়ে তুলতে হবে,—তাকে পরিপূর্ণভাবে সুমহান ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে।

আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে যারা formalism প্রচার ক'রে থাকেন তাঁরা তাঁদের বিষয়-বস্তুকে উপেক্ষা ক'রে একটা involved formএ সাহিত্য রচনা ক'রে থাকেন। এটা শুধু তাঁদের দিক থেকেই আত্মঘাতী নয়; মানুষের মঙ্গলের জন্য অন্যান্য শিল্পীদের সহজ সত্য অভিব্যক্তির ক্রমবিকাশের পথেও তাঁরা ভীষণ অন্তরায়। "Formalism is anti-popular, anti-democratic. It is hostile to truth." সাহিত্যে technique আর form'এর দিক থেকে Joice'এর সাহিত্য অতুলনীয়। কথার ভিতর দিয়ে Joice যে ঝঙ্কার ও দোলা সৃষ্টি ক'রেছেন তাতে তাঁর সাহিত্য হ'য়েছে অনবদ্য। এতে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া

গিয়েছে। কিন্তু তাঁর সমস্ত সাহিত্য সৃষ্টি একটা crude naturalism'এ পর্য্যবসিত হ'য়েছে।

সাহিত্য যদি জীবনের প্রতিচ্ছবিই হয় তবে গণসাহিত্যই প্রকৃত সাহিত্য। কারণ সাধারণ মানুষের জীবনের রস রূপ গন্ধই হচ্চে এর উপজীব্য। গণসাহিত্যের বিরুদ্ধ অনেকে অভিযোগ ক'রে ব'লে থাকেন যে শালীনতা ও রসসৃষ্টির দিক দিয়ে এতে অনেক খুঁত থেকে যাবে। কিন্তু টলষ্টয় তাঁদের এই সন্দেহ ভেঙ্গে দিয়েছেন। শেষ বয়সে যখন গণসাহিত্য ভিন্ন তিনি অন্য কোন সাহিত্য সৃষ্টি ক'রবেন না ব'লে সংকল্প ক'রলেন তখন যে সাহিত্য তিনি সৃষ্টি ক'রলেন তা তাঁর পূর্ব্বের "What Men Live by" "Divine and Human" "The False Coupon"-কেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তবে তাঁর সমসাময়িক লেখকগণ হয়ত তাঁর সে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি ক'রতে পারেন নি। রসসৃষ্টির দিক দিয়ে বেটোফেনকেও ত তাঁর সমসাময়িক রসজ্ঞরা বুঝতে পারেন নি। টলষ্টয় ও বেটোফেনের মধ্যে এই যে অবোধ্যতা এটা হচ্ছে ভিন্ন প্রকৃতির। Formalistরা তাই ব'লে ব'লতে পারেন না যে তাঁদের সাহিত্যও ঐ কারণেই অবোধ্য। এমন একদিন ছিল যে দিন পাশ্চাত্যের সাহিত্য ছিল রূপে গুণে অতুলনীয়, সমাদরের তার অন্ত ছিল না। কিন্তু যে ভাবধারাকে কেন্দ্র ক'রে পাশ্চাত্যে এই বিরাট সাহিত্যের অভ্যুত্থান সম্ভব হ'য়েছিল তা আজ নিঃশেষ হ'য়ে গেছে। ফাসিস্ত আদর্শবাদী স্পেঙ্গলারও একথা স্বীকার ক'রে গিয়েছেন।

কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে Paul Valery বলেছেন,

"Thought must be hidden in verse like the nutritive virtue in a fruit. A fruit is a nourishment, but it only appears to be a delight. We perceive only a pleasure, but we receive a substance. An enchantment veils the imperceptible nourishment that it contains."

কিন্তু পাশ্চাত্যের সাহিত্যিকরা আজ যে সাহিত্য সৃষ্টি ক'রছেন তাতে শুধু নৈরাশ্যবাদ আর মৃত্যুভয়ই প্রকট হ'য়ে উঠেছে। মধ্যযুগের সাহিত্যিকরা ভগবান বিশ্বাস ক'রতেন। ইহলোকে না হোক পরলোকে তাঁরা সান্ত্বনা খুঁজে পেতেন (?) কিন্তু পাশ্চাত্যের সাহিত্যিকরা আজ নিরীশ্বরবাদ বিশ্বাস করেন অথচ বস্তুবাদেও তাঁদের আস্থা নেই। ফলে এই ত্রিশঙ্কু অবস্থায় একমাত্র মৃত্যুভয় আর আসন্ন সর্ব্বনাশের হাহাকারই তাঁদের সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে একটানা মরা কান্নার মত ধ্বনিত হচ্ছে। কবি এলিয়টের Waste Land'এর মধ্যে ঐ একই আর্ত্তনাদের রোল উঠেছে:—

> He who was living is now dead
> We who are living are now dying
> With a little patience.

Falling towers
Jerusalem Athens Alexandria
Vienna London
Unreal

London bridge is falling down falling down falling down.

পুরাতন জরাজীর্ণ স্থবির সমাজব্যবস্থাকে কবি এলিয়ট এই Waste land'এর মধ্যে সমাধিস্থ ক'রেছেন। Joice এক জায়গায় বলেছেন "cheese is the corpse of milk." অবশ্য কথাটা সত্য। কিন্তু সাহিত্যে এরকম সত্যের আজ কোন প্রয়োজন নেই। সাহিত্যে আজ naturalism অথবা formal conceit কোনটিরই সার্থকতা নেই। সাহিত্যে আজ artistic dialectical সত্যকেই ফুটিয়ে তুলতে হবে। তা হ'লেই বুঝতে পারা যাবে "milk can never be a corpse." আর তখনই চোখের সামনে দেখ'ব মোটা মোটা শিশুরা কেমন নেচে কুঁদে বেড়াচ্ছে।
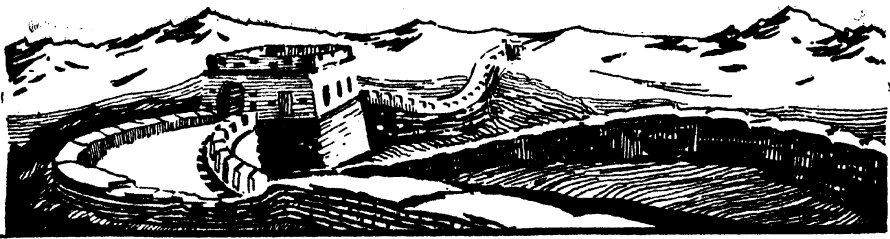
একদিন সকাল বেলায়

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য

মেয়েরা যাদু জানে !—

অন্ততঃ টাকাটা আধুলিটা ডবল করিবার মন্ত্র তাহাদের নিশ্চয়ই জানা আছে। নহিলে, মাসের শেষে অনিমার কাছ থেকে দশ-দশটি টাকা কখনো বাহির হয় !

কি কুক্ষণে অনিমার মুখ থেকে সেদিন গুপ্তধনের কথাটা বেফাঁস হইয়া পড়িয়াছিল। আর যায় কোথায় ! সুধীন স্ত্রীকে শক্ত করিয়া ধরিয়া বসিল : টাকা দশটি তাহার চাই-ই চাই।

চাহিলেই কি আর মিলে ! অনিমা যথাসাধ্য গম্ভীরভাবে ঠোঁট উল্টাইয়া জানায়, "টাকা ! কোথায় পাব ?"

সুধীনও হাসে—অবিশ্বাসের হাসি, "আর শাক দিয়ে মাছ ঢাকলে চলবে না।"

"ভাল রে ভাল !—আমার কাছে একটা টাকার গাছ আছে যেন।"

সুধীন নাছোড়বান্দা। ভরসা দেয়, "ভয় নেই ! আমি তোমার টাকা দশটা নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছি নে।—মাসে মাসে দু' টাকা করে শোধ করব। সুদও দেব গো—টাকায় দু' পয়সা।"

"তোমার মাইনের টাকা গুলো বুঝি আমার ক্যাশবাক্সে ঢুকে বাচ্চা বিয়োয়," অনিমা হাসিতে থাকে, "আচ্ছা বুদ্ধি যা হক্। সেদিন ঠাট্টা করে মিছামিছি বলেছি, আর অমনি তুমি সে-কথাটা বিশ্বাস করে নিলে। আজ থেকে খাবার সময় বেশি করে একটু নুন চেয়ে নিয়ো দিকিনি।"

অনিমা সহাস্যে গৃহকাজের অছিলায় উঠিয়া দাঁড়ায়। সুধীন জোর করিয়া তাকে চৌকির উপর বসাইয়া দিল, "দাও লক্ষ্মীটি !"

"এ তো আচ্ছা বিপদ ! টাকা পাব কোথায় ?—মাসে তো চল্লিশটি টাকা গুণে এনে দাও। দশ টাকা ঘর ভাড়া দিয়ে, সকল দিক বজায় রেখে, আমার মত টায়টোয় সংসার চালিয়ে আবার কিনা টাকাও জমাবে ! -এমন কোন্ মেয়ে আছে, শুনি ?"

কথাটা নেহাৎ বাড়ানো নয়। তবু সুধীন হাসিয়া কহিল, "আছে তোমার কাছে।"

"তা হ'লে আছে।" অনিমা মুখেচোখে এক ঝলক দুষ্টু হাসি চাপিয়া কহিল, "টাকা আর থাকবে না ! তুমি রোজ খেয়ে দেয়ে আপিস যাও, আর ইদিকে আমি দুপুরবেলা ঘরে বসে-বসে রোজগার করি—কী বলো ?"

এই সস্তা রসিকতার জবাব দিল সুধীনের সুপুষ্ট দুটি বাহু। নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে বন্দী অনিমা স্বামীর মতলব টের পাইয়া দু'হাতের মুঠির মধ্যে আঁচলে-বাঁধা চাবির গোছা শক্ত

করিয়া লুকাইয়া রাখিল। সুধীনও কি কম পাত্র! অবলার প্রতি বলপ্রয়োগ শাস্ত্রসঙ্গত নহে। অতএব স্ত্রীর বুকের পাশে ঘাড়ের নিচে সুড়সুড়ি দিয়া তাকে কাবু করিতে সে কসুর করিল না। কিন্তু টাকার মায়া বড় মায়া। অনিমা হাসিয়া কুটি-কুটি, তবু হাতের মুঠি খোলে না। দেখিতে দেখিতে স্বামী-স্ত্রীতে সুরু হইল এক রীতিমত দ্বন্দ্বযুদ্ধ। মিনিট দুই হাসাহাসি আর হাতাহাতির পর অনিমার আঁচল থেকে চাবির ছড়া ঝনাৎ করিয়া খসিয়া পড়িল মেঝের উপর। সুধীন খপ্ করিয়া চাবির গোছা তুলিয়া লইতেই আলুথালু অনিমাও বাঘিনীর মত ঝাঁপাইয়া পড়িল স্বামীর উপর।

সে এক এলাহী কাণ্ড! শত হইলেও মেয়েমানুষ ত বটেই। একা সে কত আর আঁটিয়া উঠিবে। অগত্যা পরাজিত অনিমারাণী বিছানার এক কোণে আসিয়া থপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। তারপর খানিক হাসিয়া খানিক হাঁফাইয়া এলোখোঁপা ঠিক করিয়া লইতে লইতে কহিল, "বেশ তো! ক্যাশবাক্স খুলে একবার হ্যাখই না। ট্রাঙ্কের চাবিও ওরই মধ্যে—সরু লম্বা চাবিটা দেরাজের। খুলে হ্যাখো—নোটের তাড়া পাবে'খন।"

অনিমা নিশ্চিন্তে চৌকির এক কোণে বসিয়া আছে। ওদিকে সুধীন জোর খানাতল্লাস সুরু করিয়া দিল। কিন্তু টাকার মুখ দেখা দূরে থাকুক, একটা কাণা কড়িও যে নাই! সুধীন ক্যাশ-বাক্সের ডালাটা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া ঝাঁকিয়া দেখিল; বড় ট্রাঙ্কটার জামাকাপড় শাড়ি-ব্লাউজ সব লণ্ডভণ্ড করিয়া লইল; দু'জোড়া দেরাজও বাদ পড়িল না; কাঠের তোরঙ্গটার যত-রাজ্যের ছেঁড়া জামাকাপড়ের মধ্যেও দুর্দ্দান্ত অনুসন্ধান চলিল; অবশেষে বিছানা থেকে বালিশগুলি সরাইয়া তোষকের তলে, চাটাইএর নিচে সর্ব্বত্র দেখিল; অবশেষে কিনা তক্তপোষের নিচে ভাঁড়ার সংক্রান্ত হাঁড়িকুড়ি বাসনকোসনের অন্ধকার গর্ভেও—সম্ভব অসম্ভব সর্ব্বত্র সুধীন দৌরাত্ম্য চালাইল। হা হতোঽস্মি! একটা ঘষা পয়সাও যে মিলিল না!

অনিমা এতক্ষণ মুচকি হাসিতেছিল। এবার কাটার উপর নুনের ছিটা দিল, "কি গো দারোগা সাহেব, লুকোনো রত্ন মিলল?"

সুধীন শুধু নীরবে হাসিতে থাকে।...আজ সন্ধ্যার মধ্যে অন্ততঃ গোটা পাঁচেক টাকা চাই-ই তার।—যেখান থেকেই হউক্। কিন্তু 'যেখানটাই' যে বড় অস্পষ্ট। যে-যে স্থলে চাহিয়া কিছু মিলিত ও মিলিয়াছে—সে-সব জায়গার চাওয়ার পথ এখন বন্ধ। আগেকার দেনা শোধ না দিয়া আবার হাত পাতিবে কোন মুখে!

স্বামীকে নীরব দেখিয়া অনিমা রাগ দেখাইয়া কহিল, "ডান হাতের কব্জিটা আমার কি করে মুচড়ে দিয়েছে হ্যাখো না!—মেছোবাজারের গুণ্ডা!"

সহসা সুধীনের মনে পড়িয়া গেল, অনিমার গুপ্তধন শোবার ঘরে নয়, নিশ্চয় রান্নাঘরে। মাসের শেষে মণিব্যাগ আর ক্যাশবাক্স দুই-ই যখন শূন্য, বাজারে যাইবার পয়সা নাই, এর-ওর-তার কাছ থেকে টাকাটা-সিকেটা হাওলাত চাহিয়া আনিতেও দু চার ঘণ্টা দেরি হইবার কথা—এমন

সময় অকস্মাৎ অন্নপূর্ণা অণিমারাণী রান্নাঘরের কোন্ গোপন স্থান হইতে পয়সা আনিয়া সেদিনের কাজ চালাইয়া দেয়। অণিমার 'ফিক্স্ড ডিপোজিট' নিশ্চয়ই ঐ হেঁশেল-ব্যাঙ্কে।

"এবার বুঝেছি। টাকা রেখেছে রান্নাঘরে", বলিয়া সুধীন চট করিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। অণিমা ছিল দুয়ারের দিকটায়, সেও তড়াক করিয়া উঠিয়া আসে মুহূর্ত্তে চৌকাঠের ওপারে। পিছু পিছু নাছোড়বান্দা স্বামী।

ঘরের মধ্যে স্বাধীন পুরুষ জাতেরও পরাধীনতা বড় কম নয়। মাঝপথে বাধা পাইয়া সুধীনকে খানিকক্ষণের জন্য রণে ভঙ্গ দিতে হয়। পাশের ঘরের বৌটি—বীরেশ্বর বাবুর স্ত্রী অর্থাৎ শ্রীমতী প্রভাবতী—স্নানান্তে চাতালে দাঁড়াইয়া ভিজা-গামছায় এলোচুল নিঙারিয়া লইতেছে, সুধীনকে দেখিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সামলাইয়া লইয়া সরিয়া গেল চৌবাচ্চার দিকে।

সুধীন ফিরিয়া যায়। খানিক বাদেই অকারণে কাশিয়া নোটিশ দিতে দিতে রান্নাঘরের দুয়ারে গিয়া পৌঁছিল। অণিমা ইতিমধ্যে দু' কপাটে দু'হাত রাখিয়া প্রবেশ পথ আটক করিয়া রাখিয়াছে। চোখে-মুখে চাপা হাসি, তবু গম্ভীর কণ্ঠের ভান করিয়া কহিল, "আমার রান্নাঘরে ঢুকো না বলছি।"

"আমার অপরাধ?"

এবার অনিমা আদেশ ছাড়িয়া অনুনয়ের আশ্রয় লইল, "তোমার দুটি পায়ে পড়ি। বাসি-কাপড়ে আমার হেঁশেলে যেয়ো না।—তা হ'লে কিন্তু সারাদিনে আজ আমি এক-গাছা কুটো ছিঁড়েও মুখে দেব না, বলে রাখছি।"

"বয়ে গেল। তুমি না খেলে রাত্রে আমার ঘুম হবে না কিনা।"

"সত্যি বলছি, আমার কাছে একটা পয়সাও নেই।"

"তবে হাস্‌ছ যে?"

"কৈ আবার হাসলাম?"

অণিমার লুকানো হাসিতে সুধীনের অনুমান আরো দৃঢ় হয়।

"পথ ছাড়ো।"

"না!"

"না?"

"হ্যাঁ!"

"তবে, এই ছাখো" বলিয়া সুধীন অবলার সবল প্রতিরোধ অনায়াসে ভাঙ্গিয়া দিয়া রান্নাঘরে ঢুকিল।

"উঁঃ!"—অণিমা একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া চৌকাঠের কাছে দাঁড়াইয়া হাসিতে লাগিল। প্রভাবতী তাহাদের দোর-গোড়া হইতে সহাস্য চোখের ইসারায় এই আকস্মিক অধ্যায়ের কারণ সুধাইল। দস্তুরমত বেতার বার্ত্তা। অণিমাও ইঙ্গিতে কি যেন বুঝাইয়া এবার

গলা চড়াইয়া দিল, "প্রভাদি আজ শিকল ছিঁড়ে পাগল ছাড়া পেয়েছে। ছাখ গে আমার ঘরে, বাক্স বিছানা বাসনকোসন সব তচনচ।"

অণিমার 'পাগল' ততক্ষণে রান্নাঘরটা যেন ওলটপালট করিয়া লইয়াছে। হলুদের কৌটা গলা অবধি ভরা; কালজিরের শিশিটা আধপেটা; ধনে ও লঙ্কার ভাণ্ড প্রায় নিঃশেষ; গোলমরিচের বোতলে মাত্র একটি' পয়সা; সরিষার পাত্রটা তো ঢ-ঢ-ঢং!

অণিমা এবার হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। সুধীন এখন এক পা দু পা করিয়া ঘরে ফিরিয়া যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করিল। সময় থাকিতে মানে-মানে সরিয়া না পড়িলে, বিশ্বাস কি তাহার সম্মুখেই দুই ঘরের গৃহিনীর মধ্যে এখনি পুরুষ জাতির পরাজয়ের সরস আলোচনা সুরু হইয়া যাইবে।

সুধীন চলিয়া গেল।

প্রভাবতী এতক্ষণে খাটো গলা চড়াইয়া দেয়, "বেচারাকে অমন করে নাচাচ্ছিস কেন অনু,—দে না বার করে।"

"কী যে বলো প্রভাদি! এক্ষুনি যতরাজ্যের বাজে জিনিষ কিনে এনে টাকাগুলো আমার জলে দেবে।"

যত রাজ্যের বাজে জিনিষ শুধু একটিই। এবং তাহা অণিমা জানে, প্রভাবতীও জানে, উপরের বাড়ীওলার গৃহিনীও শুনিয়াছেন, পাশের বাসার জানালার কাছের ছোট্ট পরিবারটির সমবয়সী বৌটির কানেও হয় তো পৌঁছিয়াছে। ব্যাপার আর কিছুই নয়। গেল রবিবার স্বামী-স্ত্রী সন্ধ্যাবেলা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল—ইষ্ট বেঙ্গল সোসাইটির কাঁচের শো-কেশে একখানি ধুপছায়া রঙের শাড়ি সুধীনের চোখে বড় লাগিয়াছে—জানাইয়াছে সামনের মাসে মাহিনা পাইয়া শাড়িখানি কিনিবে—অণিমাকে নাকি খাসা মানাইবে।

প্রভাবতী কহিল, "বেশ তো কত আর দাম!"

"তুমি খেপেছ প্রভাদি। সাড়ে সাত টাকা! আমার এত কষ্টের জমানো টাকা বুঝি এমন করে নষ্ট হতে দেব।"

"ঢং রেখে দে। সখ করে কিনে দিতে চাইছেন, তাতে অত পেটে ভোগ মুখে লাজ কেন লা?"

কথাটা অকাট্য। সুতরাং অণিমাকে শাক দিয়া মাছ ঢাকিতে হয়, "তুমি তো জান দিদি, আমি কী কষ্টে টাকা দশটা করেছি—রোজ রোজ বাজারের পয়সা ফেরৎ এলে তার থেকে একটি করে—"

"যা-যা, আর আদিক্যেতা দেখাস্ নে। সময় থাকতে সাধ মিটিয়ে নে। দুদিন বাদে—তখন সাধ্যে কুলোলেও হয়ে ওঠে না রে—দেখছিস তো আমায়।"

প্রভাবতীর উপর মা-ষষ্ঠীর বড় কৃপা দৃষ্টি। ত্রিশ না যাইতেই আধ-ডজন। সম্প্রতি অণিমার উপরও নোটিশ পড়িয়াছে। তাই এই সখেদ উপদেশ!

"টাকা দশটা বার করে দে-গে। উনি বেঁচে থাকলে অমন কত দশ টাকা পাবি, কিন্তু—বয়েস বুঝি বসে থাকে!"

প্রভাবতী রান্নার আয়োজনে চলিয়া গেল। অণিমাও আস্তে আস্তে নিজের ঘরে ফিরিয়া আসে।

এদিকে সুধীন আরেকবার বাক্স বিছানা পরীক্ষা করিয়াছে। সারা ঘর মাথায় তুলিয়া জুটিল শুধু একটি টাকা—অণিমার লক্ষ্মীর আসনের কৌটার মধ্যে সেই সিঁদুর-মাখানো টাকাটি। ও-টাকা লইবেন এত বড় সাহস স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীরও নাই।

অবশেষে সুধীনের সুবুদ্ধির উদয় হয়। সত্যই তো! অণিমা টাকা পাইবে কোথায়? সওদাগরী আপিসের চল্লিশ টাকা মাহিনার কেরানী সে। বার টাকা বাড়ী ভাড়া বরাবর যথাসময়ই দেয়। জামা-কাপড়, শাড়ি-শায়া, জুতা-ছাতা, লেপ-মশারি, ধোবা-নাপিত—সর্ব্বপ্রকার অপরিহার্য্য পাটও যথাসাধ্য বজায় রাখে। অণিমার হাতে টাকা গুলি নিশ্চয়ই আর ডিম পাড়ে না!....কিন্তু টাকা যে আজ চাই-ই চাই। বিবাহের এক বছর পূর্ণ হইল আজ। বৈশাখের এমনি একটি দিন! আর না হউক, অন্ততঃ এই প্রথম বিবাহ দিবসটি! তারপর, সুধীন বেশ জানে, তারপর ঐ বিশেষ দিনটিকে মনে করিয়া রাখিবার মত রঙীন বাষ্পবিলাস আর থাকে না—থাকা উচিতও নয় যেন। নয় বলিয়াই তো আজ পাঁচটা টাকার এত বেশী প্রয়োজন!.........

পরশু দিন মাহিনার তারিখ। দশটা টাকার যেমন করিয়া হউক ব্যবস্থা করিবে। না খাইয়া কে কবে মরিয়াছে। সংসার তো চলে-না চলে-না করিয়াও চলিয়া যায়। এক মাসে দশটা টাকা বাজে খরচ হইলে ব্রহ্মাণ্ড আর রসাতলে যাইবে না। কিন্তু টাকা?

"ওগো পুলিশ-সাহেব! আরো খানাতল্লাস বাকি আছে নাকি?"

সুধীন মৃদু হাসিয়া স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইল।

"কিছু মিলল?"

"থাকলে তো মিলবে।"

"বটে!"

সুধীন নিস্পৃহভাবেই নীরব রহিল। অণিমা মিনতি মিশাইয়া কহিতে লাগিল, "আগে কথা দাও বাজে খরচ করবে না, তা হ'লে এক্ষুনি টাকা বার করে দেব।"

সুধীন মুখ তুলিয়া চাহিল। পুরাপুরি বিশ্বাস করিতে পারে না—যে মাছ-খেলা খেলাইল এতক্ষণ!

অণিমা আবার করে অনুরোধ, "আমার এত কষ্টের টাকা কিন্তু নষ্ট করো না লক্ষ্মীটি। তোমার একটা ভালো জামা করবে আর একটা ফাউণ্টেন্ পেন।"

এবারে সুধীন উল্লাসে উঠিয়া দাঁড়ায়।

"তুমি যা বলবে সব শুনব।"

"ঠিক তো ?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ—এবার বল তো তোমার যখের ধন রেখেছ কোথায় ?"

"খুঁজে তো দেখলে।"

"এ-ঘরে ?"

"উঁহুঁ ?"

"রান্নাঘরে ?"

"না !"

"বীরেশ্বর বাবুর বৌএর কাছে ?"

"পারলে না বলতে।"

"আঃ ! বলই না কোথায় রেখেছ ?"

"চোরকে ভাঙা বেড়া দেখাব বুঝি ?" বলিয়া অনিমা হাসিতে হাসিতে ঘরের বাহির হইয়া গেল। সুধীন নিশ্চিন্ত হইল। টাকা তবে আছে !

খানিক বাদেই অনিমা কাজের-ছুতায় আবার আসিল ঘরে। সুধীন তাহাকে কাছে টানিয়া কহিল, "অনু, একটা চমৎকার প্ল্যান্ মাথায় এসেছে। চমৎকার !"

"আঃ দোর খোলা রয়েছে দেখতে পাওনা ?", বলিয়া উঠিয়া গিয়া দুয়ার ভেজাইয়া দিল। পাশাপাশি দুটি সংসার। রাতদিন সহস্র কাজে এ-দিক ও-দিক করে উভয় পক্ষ। স্বামী-স্ত্রীর পূর্ণ স্বরাজ শুধু বদ্ধ ঘরে।

দুয়ারের কাছ থেকে ফিরিয়া আসিতেই অনিমার চোখ পড়ে জানালা বরাবর। পাশের বাড়ীর দোতলা থেকে ওদের কলেজী ছেলেটা খোলা জানালার একধারে অর্দ্ধগোপন রহিয়া এদিকে চাহিয়া আছে চোরের মত। অনিমা জানালার গুটানো পরদাটা টানিয়া দিয়া আসিয়া কহিল, "কী তোমার প্ল্যান ?"

"টাকা দশটার সদগতির একটা চমৎকার আইডিয়া মাথায় এসেছে।"

"যথা ?"

"তোমার শাড়ি কিনতে যাবে সাড়ে ছ' টাকা। দশ টাকার বাকি থাকে তবে কত ? সাড়ে তিন টাকা। —আচ্ছা ! আজ আমরা সিনেমায় যাব—সন্ধ্যার শো-তে না হয় সাড়ে ন'টায়। দুখানা টিকিটে ন' আনা আর ন' আনা আঠারো আনা, আর যাতায়াতের বাস ভাড়ার চার আনা, ইন্টারভেলের সময় আইসক্রীম্ কি লেমোনেডে ধরো চার আনা, কি ছ' আনা। বাকি রইল আনা চোদ্দ।"

অনিমা প্রতিবাদ জানায়, "তা হ'লে টাকা দেব না।"

সুধীন হাসিয়া কহিল, "আগে সবটা শোনই না। বাকি চোদ্দ আনার মালা কিনে আনব। আজ হবে আমাদের নতুন করে আর একবার ফুলসজ্জা !"

"সখ দেখে হেসে বাঁচি নে।"

"কী অন্যায় সখটা হল, শুনি ?"

"অতগুলো ফুলের মালা দিয়ে কী হবে ?"

"বা-রে ! তুমি মালা পরবে।—তু'হাতে তু'গাছা, এক গাছা গলায়, আর একটি খোঁপায়। কিছু ফুল আবার বিছানার উপর ছিঁড়ে ছড়িয়ে দেব। আর—"

বাধা দিয়া অণিমা কহিল, "আজ বুঝি নেশা করেছ !"

সুধীন মুচকি হাসিয়া তেমনি অভিনয়ের ভঙ্গিতে বলিয়া চলিল, "সারা অঙ্গে ফুল, চোখে পরবে কাজল—কপাল জুড়ে লাল-চন্দনের ফোঁটা, মাঝে মাঝে তু' একটি সাদা চন্দনেরও—নীল আকাশের তারাগুলোর মতো। আর শুনছ তো? আজ আর ইলেক্‌ট্রিক আলো নয়—আপিস থেকে আসবার সময় একখানা মোমবাতি কিনে নিয়ে আসব। কাজল আর ফুলের সঙ্গে ঘিয়ের প্রদীপ হলেই মানাতো ভালো। যাক, মধুর অভাবে গুড়ের ব্যবস্থা শাস্ত্রে লেখা আছে।"

"খেপেছ নাকি ?"

"কেন ?"

"তুমিই না হয় বদ্ধ পাগল। আমি তো আর মাথা খেয়ে বসি নি। বাড়ীশুদ্ধ লোকের কাছে আমি বুঝি একটা অসভ্যের মতো চোখে কাজল লাগিয়ে খোঁপায় মালা জড়িয়ে ধেই ধেই করে ঘুরে বেড়াব !"

"তাতে অপরাধ ?"

"অপরাধ আবার কী ! তোমাদের পুরুষের মতো আমরা তো আর বেহায়া নই।"

এতক্ষণ সুধীন স্ত্রীর সহিত রসান দিয়া একটু কাব্যিয়ানা করিতেছিল শুধু। কিন্তু অণিমার এই ওজর আপত্তিতে তাহার অভিনয় ক্রমে জেদে আসিয়া দাঁড়ায়। স্ত্রীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া একটু যেন গম্ভীর কণ্ঠেই প্রশ্ন করিল, "গলায় সোনার চেন পরতে মেয়েদের লজ্জা করে না ?"

"না"

"লাল রঙের ফিতেয় বেণী বাঁধতে আপত্তি কর তোমরা ?"

"উঁহুঁ"—অণিমা হাসি গোপন করিবার জন্য আঁচল দিয়া নাক অবধি মুখ ঢাকিল, কিন্তু ডাগর চোখ জোড়াকে ফাঁকি দিবে কেমন করিয়া। সুধীন তেমনি গম্ভীরভাবে বলিয়া চলিল, "হেসো না অনু। জবাব দাও : এলো খোঁপায় সস্তা সেলুলয়েডের কাঁটা গুজতে পারো ?"

"খুব পারি।"

"এক হপ্তার নোটিশে চার হাত লম্বা গোটা তুই মাফ্‌লার বুনে উঠতেও পারো।"

"পারিই তো।"

"পারো না কেবল আঁচল ভরে ফুল নিয়ে বসে মালা গাঁথতে।"

"ঢের কাব্যি করলে, এবার থামো দিকি নি।"

"কাব্য নয় অনু! আমরা সহজ হতে ভুলে গেছি।"

অণিমা স্বামীর ও-সব ধোঁয়াটে কথার মানে বোঝে না—বুঝিতে চায়ও না। হাসিয়া কহিল "আজ বুঝি আপিস যেতে হবে না! কটা বাজে খেয়াল আছে? ওরা সব ফিরে এল।"

সুধীন টেবিলের উপর ঘড়ির দিকে তাকাইয়া কহিল, "এখনো নাইতে যাবার আধঘণ্টা দেরি?

"রোজ রোজ খেয়েই অমনি ছোট, আজ না হয় একটু বিশ্রাম করেই যাবে।"

"ভাল কথা! টাকা? আগে টাকা বার করে রাখ।"—সুধীন আসল কথা ভোলে নাই।

অণিমা জবাব দিল মুচকি হাসিয়া, "রাখব 'খন। তুমি এবার নাইতে যাওতো।"

"এত সকালে কেন?"

"একদিন না হয় সকাল করেই চান সেরে নিলে।"

সুধীন এবার হো হো করিয়া হাসিয়া ওঠে, "হুঁ, তাই স্নানের জন্য এত তাড়া! তোমার গুপ্তধন তা হলে এ-ঘরেই।"

অণিমা চুপ করিয়া হাসিতে থাকে।

"আমি নাইতে যাব, সেই ফাঁকে বার করে রাখবে, এইতো মতলব?"

"হ্যাঁ।"

"তা হ'লে রইল পড়ে স্নান, খাওয়া দাওয়া, আপিস যাওয়া। ঘর ছেড়ে এক পা যাচ্ছি নে। তোমার রাজকোষ দেখতেই হবে।"

"বেশ, তাই হ'ক, থাক বসে না খেয়ে দেয়ে—সারা দিন রাত। আমিও টাকা দিচ্ছি নে।"

খানিকক্ষণ মুখোমুখি বসিয়া রহিল উভয় পক্ষ। মাঝে মাঝে শুধু হাসির সঙ্গে হাসি বিনিময়। সুধীন এবার সহজ উপায়ের আশ্রয় লইল—জেদ ছাড়িয়া আবদার। কহিল, "দাও লক্ষ্মীটি। সারা সকাল এমন করে ঘোরালে—এবারটি শুধু দেখব। এর পর থেকে আর কোন দিন জানতে চাইব না।"

"ঠিক তো?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ।"

"তবে ওঠ দিকি নি একবার।"

সুধীন পাশ-বালিসে কনুই পাতিয়া কাত হইয়া শুইয়াছিল। উঠিয়া বসিল। ব্যাপার কি! অণিমা স্বামীকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, "ওঠো না।"

"আবার কোথায় উঠব?"

"বলছি ওঠো"—অনিমার কণ্ঠে এবার আদেশের সুর।

অগত্যা সুধীনকে বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে হয়। অনিমা টেবিলের উপর থেকে একখানা কাঁচি লইয়া আসিল।

সুধীনের ত চক্ষুস্থির।

অনিমা পাশ-বালিসটা টানিয়া নিল কোলের উপর। দেখিতে দেখিতে অড় খুলিয়া ফেলিল। তারপত্র তুলিয়া নিল কাঁচিখানা। বেচারা বালিসের উপর চলিল নির্দ্দয় অস্ত্রোপচার। সুধীন তো অবাক। অনিমা রাশি রাশি তুলা ছড়াইল মেঝের উপর। অবশেষে শ্রীমতী একখানি হাত ঢুকাইল বালিসটার হাঁ-করা পেটের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল একখানা পুরান চিঠি। লেপাফা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনিমা মুখে চোখে গর্ব্বের হাসি ফুটাইয়া কহিল, "এই নাও।"

সত্য-সত্যই ভাজ-করা দু'খানি পাঁচ টাকার নোট!

সুধীনের কিন্তু মুখে আর কথা নাই। একদৃষ্টে চাহিয়া আছে—টাকার দিকে নয়, হাস্যময়ী অনিমার দিকে। চাহিয়া আছে—কেমন একটু কঠিন গাম্ভীর্য্যে!

বীরেশ্বরবাবুর ঘরে কোলাহল সুরু হইয়াছে। ছেলেমেয়ের দল মর্ণিং ইস্কুল সারিয়া বাসায় ফিরিয়াছে। বেলা তবে কম নয় এখন! তবু সুধীনের হুঁস নাই।

অনিমা অবাক! খানিক আগের সহাস্য লোকটীর এ কি আকস্মিক ভাবান্তর!—অথবা ইহা, অনিমা মনে মনে হাসিল, রহস্যপ্রিয় স্বামীর কৌতুকপ্রিয়তারই আর এক রূপান্তর।

"বোবার মত চেয়ে আছ যে বড়।—টাকা নাও।"

সুধীন সাড়া দিল না। এক এক করিয়া মনে পড়ে কত কথা, কত কাহিনী। অনিমার কঠিন অসুখ, সুধীনের দারুণ শীতে গরম জামার অভাব, কত সাধ আকাঙ্ক্ষার জল্পনা কল্পনা, কত না-বলা আপশোস্ আর লুকান দীর্ঘশ্বাস! আর তলে তলে অনিমা সকল দাবী অস্বীকার করিয়া নিজেকে ও স্বামীকে কষ্ট দিয়া কিনা দিনের পর দিন বহু কষ্টে টাকা দশটী জমাইয়াছে! কেন?

বীরেশ্বরবাবুর কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়িয়াছে। বড় ছেলেটাকে কি অপরাধের জন্য বেশ খানিকটা শাসাইতেছেন। শাসাক্। সুধীন ভাবিতেছে শুধুঃ এ কি অদ্ভুত! সহজ সদ্য-সুখের ভরা বুকে ভবিষ্যতের মান রক্ষার কি কঠিন সাধনা! অনিমা নিষ্ঠুর, অনিমা অস্বাভাবিক!

"অনু, মনটাকে ছোটো করে এমনিভাবে বুঝি টাকা জমাতে হয়!"

"বটে!" অনিমা সকৌতুকে বলিয়া উঠিল, "তাই না খানিক আগে বাসায় এই দিন দুপুরেই ডাকাত পড়েছিল।"

অনিমা থামিয়া গেল। স্বামীর এ ত কৌতুক নয়। এ আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ সে খুঁজিয়া পায় না। ওঁর মাথায় যেন ছিট আছে—তাই ক্ষণেক মেঘ আর ক্ষণেক রৌদ্র। এমন খেয়ালী মানুষ লইয়াও তাকে ঘর করিতে হয়!

"ঢের লেক্‌চার হয়েছে। এবার নাও দিকি নি নোট ছ'খানা।"

"না অনু! টাকা দশটা রেখে দাও।" বলিয়া সুধীন আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল কলতলায়।

কলের নীচে বসিয়া মোটা জলের ধারায় সুধীনের মাথাটা যেন ঠাণ্ডা হইল এতক্ষণে। অণিমাই স্বাভাবিক। তার স্বামীই বেখাপ, বেমানান, বেপরোয়া! একেবারে অস্বাভাবিক!

খাইতে বসিয়াছে। অণিমা পাখা হাতে পাতের কাছে গিয়া বসিয়া পড়িল। কথা নাই। বুক ভরা দুরন্ত অভিমান। খানিক আগের অমন একখানি উচ্ছল রামধনু, আর এখন এই দুরূহ মেঘের ভার—এ-দুয়ের মিল কোথায়? শাড়ি-ব্লাউজ চুলায় যাক্, সিনেমায় না গেলে মানুষ মরে না, মোমবাতি আর চন্দন না হয় পাগলের প্রলাপ—কিন্তু, একগাছি বেলফুলের মালা কি দোষ করিল!—অন্ততঃ আজ, বেশী না হক্, আজকের এই রাত্রিটীর জন্য তা-ও কি মানা?

"অনু!"

অণিমা নীরবে মুখ তুলিল।

"আমার পোষ্ট্ আপিসের পাশ-বইখানা না তোমার বাক্সে?"

"হুঁ।"

"আজই বার করে রেখো—ভুলো না যেন। পনের টাকা জমা রেখেছিলাম সেই দু'বছর আগে—সবই তো তুলে নিয়েছি। এখনো আনা বারো আছে।"

অণিমা নির্ব্বাক, নির্ব্বিকার।

"বারো আনা তো রয়েছেই। কাল তোমার দশটা টাকা জমা দিলে হবে দশ টাকা বারো আনা। কী বলো?"

মা ও ছেলে

শ্রীঅশোকা রায়ের সৌজন্যে]

[শিল্পী—গগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর

D. H. R.

বুদ্ধদেব বসু

ও কি ঝড় ? ও কি ঝরনা ? ও কি তীব্র তিব্বতি হাওয়া ?
ও কিসের শব্দ ?
পাহাড়ের আড়াল ছিঁড়ে, মেঘেদের ভিতর দিয়ে সুরঙ্গ খুঁড়ে
উপত্যকা থেকে আকাশের
উঁচু-নিচু চূড়ায়-চূড়ায় প্রতিধ্বনিত।
যেন হাজার বিজয়ী সেনানীর উল্লাস-কলরোল,
যেন মত্ত উতরোল
ঝড়।

ও কিছু নয়। রেলগাড়ি আসছে সমতল থেকে,
সিলিগুড়ি থেকে কলকাতার যাত্রীদের নিয়ে।

গাড়ি তো ঐটুকু, তার আওয়াজ কী প্রচণ্ড !
সং !

ধোঁয়া, আওয়াজ, ঘন-ঘন গম্ভীর শিঙাধ্বনি,
হাঁসফাঁস, ফোঁসফোঁস, অতিরিক্ত আত্মনির্ঘোষ।
এদিকে বসতে গেলে হাঁটুতে হাঁটু ঠেকে,
চার মাইল যেতে আধ ঘণ্টা,
আস্ত সং !

আমরা আছি উঁচুতে, ঐ নিচে কার্ট রোডের ছুটো কাৎরানি।
তারি এক ধার দিয়ে মুচড়িয়ে দুমড়িয়ে গেছে রেল-লাইন,
যেন হিস্টিরিয়ার উৎকট অঙ্গভঙ্গি।
ফোঁপাতে ফোঁপাতে, হাঁপাতে হাঁপাতে
আঁকড়ে ঠেলে উঠছে ছোট্ট এঞ্জিন
ঠিক চারখানা গাড়ি নিয়ে।

যেন হাজার শুঁড়ওলা অক্টোপাস
বিরাট পাহাড়-তিমিকে অগুনতি প্যাঁচে জড়িয়েছে ;
ধুঁকছে রেলগাড়ি, তবু উঠছে,
রাগে ফুঁসছে, উর্ধশ্বাসে, রুদ্ধস্বর আর্তনাদে।
—হঠাৎ অকারণে গেলো থেমে।
আর কি ও উঠতে পারবে ?
কত উঁচু ঐ পাহাড়ের চূড়া !

পিছনে হঠলো এঞ্জিন।
ওর কি হার হলো ? পাহাড়ের ধাক্কায় গড়িয়ে পড়লো কি ?
এবার নামো নিচে।
তা তো নয়, তা তো নয়, উঠে এলুম দেখি
নিচে পুরোনো পথ ফেলে।
কম্বুরেখায় উর্ধগতি,
ডায়ালেকটিক দর্শন !

দ্যাখো, দ্যাখো, ঐ উঠছে রেলগাড়ি,
কুয়াশার বুক চিরে, মেঘেদের ভেদ করে,
হাজার প্যাঁচে-প্যাঁচে পাহাড়কে জড়িয়ে।
ও কি সং ? না কি দুর্দান্ত দুঃসাহসী আভিযানিক,
ধুঁকবে, হঠবে, তবু উঠবে শেষ পর্যন্ত।
কী প্রচণ্ড বলশালী ছোট্ট এঞ্জিন—
দেখে হাসি পায় ?

পাহাড়ি পথের প্যাঁচে
কুয়াশায় মিলিয়ে গেছে রেলগাড়ি।
এখনো শুনছো কি
মেঘেদের সুরঙ্গ-পথে গুমগুম গর্জন ?
যেন হাজার ঝরনার কলরোল,
যেন অন্ধ উতরোল
ঝড়।

লেখাপড়ার কথা

অধ্যাপক তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ

লেখাপড়ার সম্বন্ধে ভাবতে আরম্ভ করলে এত কথা মনে আসে যে ভেবেই ঠিক করা যায় না—কোন্ কথাটা আগের আর কোন্ কথাটা পরের। তবে আগে পরের অথবা গুরুত্ব লঘুত্বের বিচার ছেড়ে দিয়ে শুধু লেখাপড়া ব্যাপারটা নিয়ে ভাবাও চলে। কেমনভাবে লেখাপড়া হওয়া উচিত সে বিচারের মধ্যে না গিয়ে কি-রকমভাবে লেখাপড়া এখন চলছে শুধু সেইটুকু নিরপেক্ষ-ভাবে কেবলমাত্র দর্শকের দৃষ্টি দিয়ে দেখা চলতে পারে।

আমরা লেখাপড়া বল্‌তে কি বুঝি? সাধারণতঃ ৬।৭ বছর থেকে ১৫।১৬ বছর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েরা কোনো বিদ্যালয়ে গিয়ে যে-সব ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে মোটামুটি তাকেই আমরা লেখাপড়া বলে থাকি। এই নয় দশ বৎসর পরেও অবশ্য লেখাপড়ার কাজ চলে থাকে, কিন্তু সে পরবর্ত্তী পর্ব্বের কথা আজ আমরা ভাবছি না।

ইস্কুলের লেখাপড়ার বিবরণটা সংক্ষেপে এই রকম :—

সমাজে কতকগুলি পূর্ণ বয়স্ক লোকের কতকগুলি সন্তান আছে। তাদের পিতামাতারা ছেলেবেলায় অনেকেই লেখাপড়া করেছিলেন; বড়ো হ'য়ে তাঁরা নানারকম কাজের ভিতর দিয়ে নিজেদের জীবনযাত্রার পথে এগিয়ে চলেছেন। তাঁরা চান যে তাঁদের সন্তানেরাও লেখাপড়া করে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে—'এমন ইচ্ছা করবার কারণ কি?' উত্তর পাওয়া যাবে নানা রকমের। সব রকম উত্তরের কথা ভাবা চল্‌বে না। তবে অধিকাংশ পিতামাতার মনের কথাটা বোধ হয় এই রকমের হবে—"বাপদাদারা লেখাপড়া করে গেছেন, ছেলেমেয়েদেরও করতে হয়; আর তা ছাড়া না করলে বেঁচে থাকা চলবে কেমন করে?" এ রকম কথাটার প্রথম অংশটা বেশ বোঝা যায়—বংশগত অভ্যাস বা সংস্কার তার দাবি ছাড়ে না। দ্বিতীয় অংশটা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে, বিশেষতঃ আমাদের দেশে;—লেখাপড়া করে বেঁচে থাকার সুবিধে হচ্চে না, এই কথাই হয়ত অনেকে বলবেন। কিন্তু কথাটা সত্য কি মিথ্যা সে আলোচনা যখন না করাই ঠিক করে নিয়েছি, তখন শুধু ঐটুকু শুনেই এগিয়ে যাওয়া যাক্।

পিতামাতার এই রকম ভাবনার তাড়নায় কতকগুলি শিশু কোনো এক বিদ্যামন্দিরে ভর্ত্তি হ'ল। [এখানে বিশেষ করে আমরা সেই সব বিদ্যামন্দিরের কথাই ভাবছি যেখানে দিনের মধ্যে ৪।৫ ঘণ্টা কাল ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার জন্যে থেকে রোজই আবার বাড়ী ফিরে আসে।] ৯।১০ বৎসরের মতো পিতামাতা সন্তানের কাজ জুটিয়ে খানিকটা নিশ্চিন্ত হ'লেন। লেখাপড়া এবারে সুরু হ'ল। জন্ম থেকে ৬।৭ বৎসর পর্য্যন্ত সব শিশুই কাজ ক'রে এসেছে। যাঁরা বড়ো তাঁরা 'এটা করো', 'ওটা কোরো না'; 'এটা ভালো', 'ওটা ভালো না'—এ-রকম কথা অনেক ব'লে

ব'লে শিশুদের কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত করে দিয়েছেন। সে-ধারার সঙ্গে তারা বিদ্যালয়ের কর্ম্মের ধারা একরকম অনায়াসেই সুসঙ্গত করে নেয়। অনায়াসে বলছি এই জন্যে যে বিধি-নিষেধের পর্ব্ব আগে থেকেই সুখ দুঃখের চক্রকে তাদের জীবনের পথে সুপরিচিত করে রেখেছে। এক রকমের ভাবুক আছেন, তাঁরা হয়ত বলবেন যে শিশুরা বিদ্রোহ করে না কেন? 'অ' নামে খ্যাত ঋজু ও বক্র রেখার এক অপরূপ সমাবেশ শিশুদের এত প্রিয় হ'য়ে ওঠে কোন্ মায়ার টানে? 'অ', 'আ', ১, ২, লিখে, পড়ে; ইতিহাস, ভূগোল আরও কত-কি শুনে, পড়ে মুখস্থ ক'রে ও আবৃত্তি ক'রে এরা কি আনন্দ পায়? যাঁরা এ-রকম ক'রে ভাবেন তাঁদের দলে আমরা এখন ভিড়তে পারছি না। আমরা এখন শুধু দর্শক। এটা আমরা দেখতে পাই যে পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ম্মচক্রের আবর্ত্তনে শিশুরা ও বালক বালিকারা সুশীল বা দুঃশীল যেমনভাবেই হোক বৎসরের পর বৎসর অতিক্রম ক'রে চলে। এই কাল-উদ্‌যাপন ক্রিয়াটা একটা ঘটনা, এটা আমরা দেখতে পাই; সুখ দুঃখের অনুভূতি—ওটা অদৃষ্ট।

বিদ্যালয়ে এসে লেখাপড়া ব্যাপারে শিশু নূতন পরিচয় লাভ করে কয়েকজন শিক্ষক নামধেয় পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে। শিশুরা এসেছে পিতামাতাদের প্রয়োজনবোধে, আর শিক্ষক মহাশয়রা এসেছেন সকল জীবের পরমবৃত্তি জীবিকা নির্ব্বাহের তাগিদে। এই দুই প্রকারের প্রয়োজনের সঙ্গমস্থল বর্ত্তমান যুগের বিদ্যালয়। একদিকে বালক বালিকাদের পঙক্তি, আর একদিকে শিক্ষক মহাশয়দের পঙক্তি। এক পক্ষ অপরিণত, একান্ত নির্ভরশীল ও নিরুপায়; অপর পক্ষ বয়সে পরিণত, কিন্তু অন্যথা একই প্রকার নির্ভরশীল ও নিরুপায়। শিক্ষক পক্ষে এই উক্তির বোধ হয় একটু ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। পরিণত বয়স্ক অথচ নির্ভরশীল কিসে? নির্ভরশীল, কারণ কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছানুবর্ত্তী; যথাযথ অনুবর্ত্তন করতে না জানলে জীবিকা নির্ব্বাহের বিঘ্ন, সুতরাং নিরুপায়। এখন স্বভাবতই কথা ওঠে কর্ত্তৃপক্ষের ইচ্ছানুবর্ত্তী কিসে? এবং কর্ত্তৃপক্ষই বা কারা? এখানে কর্ত্তৃপক্ষ বল্‌তে কোনো বিশেষ বিদ্যালয়ের পরিচালকমণ্ডলী বল্‌তে যা বোঝায় শুধু তাই নয়। অবশ্য পরিচালকমণ্ডলী প্রত্যক্ষভাবে কর্ত্তৃপক্ষ, এতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। তবে এই নিকট কর্ত্তৃপক্ষ এক কর্ত্তৃতন্ত্রের অবয়বমাত্র; এই বৃহত্তর কর্ত্তৃপক্ষ যেখানে অধিষ্ঠিত সেখানে কর্ম্মক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁদের প্রত্যক্ষ কোনো যোগ নেই। অথচ এই কর্ত্তৃতন্ত্রের নির্দ্দেশমত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের বিদ্যালয়ের কর্ম্মপন্থা ও অভীষ্ট আদর্শ নির্ণয় করেন। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যাঁদের যোগ সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ তাঁরা কেবল নির্দ্দেশের অনুবর্ত্তন ক'রেই কর্ত্তব্য পালন করতে বাধ্য। এটা সঙ্গত, কি অসঙ্গত সে বিচার এখন করবার নয়। শিক্ষকরা নির্ভরশীল ও নিরুপায় কিসে সেই কথাটাই আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয় ছিল। অবস্থাটা যে রকমের তাতে কোনো বিদ্যালয়ের কর্ম্ম-ধারাই একান্তভাবে সেই বিদ্যালয়ের কর্ম্মীদের ভাবপুষ্ট নয়, অর্থাৎ কর্ম্মীদের ভাবধারার সঙ্গে তাঁদের কর্ম্মগত জীবনের ঐকান্তিক যোগ ঘটে না।

যে পরিবেশের মধ্যে, সমগ্র মানব জীবনের জীবনপ্রবাহের অনিবার্য্য ধারাসঙ্গত যে নিয়ন্ত্রণের

চাপে লেখাপড়া ব্যাপারটা চল্‌ছে, বিশেষ ক'রে আমাদের দেশে, তার অত্যন্ত আংশিক রকমের একটু বিবরণ দেওয়া হ'য়েছে। কিন্তু এই বিবরণ দিতে গিয়ে দেখা গেছে যে পদে পদে বিবৃতির গায়ে বিচারের ছোঁয়াচ লেগে যায়। যে কথাটাকে একটা ঘটনার উল্লেখমাত্র বলা হচ্চে কারও কাছে সেই কথাটাই আবার অত্যন্ত ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণতাদুষ্ট মত মাত্র ব'লে পরিগণিত হ'তে পারে। এরকম বিপত্তি থেকে একান্ত মুক্তি লাভ করা অসাধ্য হ'লেও, পাছে এই আলোচনার ভাবী অধ্যায়-গুলি অস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে এই আশঙ্কায় যে কথাগুলি বলা হয়েছে তা আর একবার সুনির্দ্দিষ্ট করে দেখে নেওয়া ভালো।

(১) শিশুরা যখন লেখাপড়ায় প্রবৃত্ত হয় তখন তাদের পিতামাতারা লেখাপড়া শেখানোর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা কিছু রাখেন না। অভ্যাসবশত: বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দিয়ে কর্ত্তব্য পালন করেন। অপর পক্ষে যারা লেখাপড়া শিখবে সেই শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হবার কয়েক বৎসর আগে থেকেই তাদের প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও অপ্রিয় কর্ম্মে অভ্যস্ত হয়ে এসেছে ব'লে যে-রকম কাজে তাদের নিযুক্ত কয়া হয় তাতে আনন্দ বোধ না করলেও শুধু অভ্যাসের বেগে বিদ্যালয়ে প্রবর্ত্তিত কর্ম্মচক্রে আবর্ত্তিত হ'তে থাকে। তাদের চিত্তবৃত্তি জন্ম থেকে পাঁচ ছয় বৎসরকালব্যাপী পর্ব্বের মধ্যে এমনভাবে জড়তা ও অসাড়তার দুষ্টপ্রভাবে অবসাদগ্রস্ত হয়ে থাকে যে বিরোধ বা বিদ্রোহ করবার মতো শক্তি বা প্রবৃত্তি তাদের থাকে না।

(২) বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেখানোর ভার যাঁদের উপর পড়ে তাঁদের কর্ত্তব্যবোধ তাঁদের আচরিত কর্ম্মপদ্ধতিকে উজ্জীবিত করে না। বিদ্যালয়ের কর্ম্মপদ্ধতি সম্প্রাণিত হয় এমন কোনো শক্তিকেন্দ্র থেকে যার কাছে শিক্ষার্থীদের মনোজগতের ক্রিয়াকলাপ জ্ঞানের সম্পূর্ণ অগোচর না হ'লেও অন্তত দুরধিগম্য। যাঁরা বিদ্যালয়ে আচরণীয় কর্ম্মপ্রণালী নিয়ন্ত্রিত করেন তাঁরা যদি বিদ্যালয় বহির্ভূত বৃহত্তর ব্যাপারগুলিকে কালপটের যে অংশে তাঁরা অবস্থিত সেই অংশের উপযোগী দৃষ্টির সাহায্যে অনুধাবন ক'রে, ভাবজীর্ণ ক'রে উত্তরকালের কর্ম্মীদের (বর্ত্তমান শিক্ষার্থীদের) চরিত্রগঠনের উপায় চিন্তা করেন, তাহ'লে সে চিন্তাধারা উদ্ভাবিত কর্ম্মধারা অসত্য-অথবা আংশিকসত্যদৃষ্টি-দুষ্ট হবে এ রকম সিদ্ধান্ত করা খুবই স্বাভাবিক। এ কথা বলা শুধু তথ্য দেওয়া কি না, এ সন্দেহ হ'লেও, একে সুস্পষ্ট কটাক্ষ ব'লে মেনে নেওয়া যায় না। নানা তথ্যের মধ্যে এও একটা তথ্য মাত্র। এখন তাহ'লে দেখা যাচ্ছে যে কর্ম্মপন্থা নির্ণয়ের প্রয়োজন নেই ব'লে শিক্ষকের মননবৃত্তি অনুশীলন অভাবে জড়ত্বপ্রাপ্ত হয়। নির্ণীত পথের উপর নিয়মিত সংরক্ষণে চিত্তবৃত্তির কর্ম্মপ্রবৃত্তির কোনই অবকাশ থাকে না।

শিক্ষার্থী, শিক্ষক, পিতামাতা ও বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ--এঁদের কথা এইটুকুমাত্র বলে এবারকার মতো আলোচনা স্থগিত রাখা গেল। এ কথাটা মনে রাখতে হবে যে এ আলোচনা সুদীর্ঘ না হ'লে নানাজনের মনে নানাপ্রকারের সন্দেহ জন্মিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই করা হয় না। আশা করা যাক্ পথ সুদূর প্রসারী হ'লেও অগ্রসর হবার ধৈর্য্য আমাদের থাকবে।

গ্রহলোক সৃষ্টি

অধ্যাপক প্রমথনাথ সেনগুপ্ত

অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মি যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়, অন্ধকার ছেয়ে তখন প্রকাশ পায় নক্ষত্রলোক; বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট রূপ তখনই আমাদের চোখে ধরা পড়ে। জানা গেছে কোটি কোটি দলবাঁধা নক্ষত্র নিয়েই এই বিশ্বজগৎ; আর আমাদের সূর্য্য এই নক্ষত্রগুলির স্বগোত্রীয় অর্থাৎ এও একটি নক্ষত্র। দেখে মনে হতে পারে যে প্রত্যেক নক্ষত্রই স্থির হয়ে আছে, কিন্তু এদের ছড়িয়ে দেওয়া আলোর বর্ণলিপি (Spectrum) পরীক্ষায় প্রমাণ হয়েছে যে কোনো নক্ষত্রই আকাশে স্থির হয়ে নেই, ক্রমাগত ছুটে চলেছে। এদের দূরত্বের ব্যবধান কোটি কোটি মাইল, তাই পরস্পর কাছে আসা বা গায়ে পড়ার সম্ভাবনা খুবই বিরল। Sir James Jeans অনুমান করেন যে প্রায় দুশো কোটি বছর আগে এরূপ অপঘাতই হয়তো একদিন ঘটেছিল; একটী প্রকাণ্ড নক্ষত্র ভেসে এসেছিল আমাদের সূর্য্যের খুবই কাছে। চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্রের জলে যেমন জোয়ারের ঢেউ লাগে ঐ বিপুলায়তন নক্ষত্রের প্রবল টানে আমাদের সূর্য্যের মধ্যেও জেগে উঠেছিল জ্বলন্ত বাষ্পের জোয়ারের এক বিরাট ঢেউ। আপন গতিবেগে ঐ নক্ষত্র সূর্য্যের যতই কাছে এগিয়ে আসছিল, তার আকর্ষণও ততই প্রবলতর হয়ে সূর্য্যপৃষ্ঠ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল প্রকাণ্ড একটা অগ্নিবাষ্পের টানাসূত্র (filament)। এই বাষ্পপিণ্ডের মধ্যভাগ তার দুই প্রান্ত থেকে অনেক বেশি মোটা ছিল, তুলনা করলে বলা যেতে পারে অনেকটা পটোলের মতো। ঐ আগন্তুক জ্যোতিষ্ক যখন দূরে সরে গেল তখন জ্বলন্তবাষ্পের এই টানাসূত্র সূর্য্যপৃষ্ঠে আর ফিরে যেতে পারলোনা, সূর্য্যের আবর্ত্তনের বেগ গ্রহণ করে তাকে প্রদক্ষিণ করতে লাগলো। তেজ ছড়িয়ে দিয়ে ঘন হওয়ার সময় এই বাষ্পপিণ্ড ভেঙ্গে ক্ষুদ্রতর অংশে বিভক্ত হোলো। এই ভাঙ্গা অংশগুলি তাদের প্রক্ষিপ্ত হওয়ার বেগ ও সূর্য্যের প্রবল টান এই দুই সম্মিলিত শক্তির সামঞ্জস্য করে নিয়ে তখন থেকে ঘুরতে সুরু করলো সূর্য্যের চারদিকে। ছোটোবড়ো এক একটি টুকরোই এক একটি গ্রহ; এরা ক্রমশঃ আপন তেজ ছড়িয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বর্ত্তমান গ্রহের আকার পেয়েছে। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, য়ুরেনস্, নেপচুন ও প্লুটো এই নয়টি গ্রহের সন্ধান আজ পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে। এই গ্রহের দল, সূর্য্য ও অপঘাতের ধাক্কায় বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ডকে নিয়েই আমাদের সৌরজগৎ

আকাশে নক্ষত্রের দূরত্ব, সংখ্যা ও গতি স্থির করে দেখা গেছে যে প্রায় ৫।৬ হাজার কোটি বছরে একবার মাত্র এরূপ ঘটনা ঘটতে পারে। Jeansর এই মত মেনে নিলে আজ বলতে হবে নক্ষত্র থেকে গ্রহসৃষ্টি প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কেউ কেউ মনে করেন, যে-মহাশূন্যে (Space) নক্ষত্র ও নীহারিকার দল রয়েছে তার আয়তন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, নক্ষত্রের পরস্পর

দূরত্বও তাই বাড়ছে ; কাজেই তারায় তারায় ধাক্কা ল্যাগার ব্যাপারটা এখন অসম্ভব বলে ঠেকলেও দুশোকোটি বছর আগে যখন এই ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে তখন বিশ্বের আয়তন ছিল এখনকার চেয়ে ঢের ছোটো। নক্ষত্রের দল ছিল কাছাকাছি, তাই এরূপ অপঘাত তখন খুব বেশি দুঃসম্ভব ছিল একথা বলা চলেনা। বুদ্‌বুদের মতো আকাশটা বেড়েই চলেছে, তাই নক্ষত্রের পরস্পর দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে, এ মত মেনে না নিয়ে বিজ্ঞানী আইনস্‌টাইন বলেন যে বস্তুপুঞ্জের মধ্যে যেমন মহাকর্ষণের টান রয়েছে তেমনি একটা মহাবিকর্ষণের (Cosmic Repulsion) ঠেলাও তাদের ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন করতে চায়। পদার্থগুলি কাছাকাছি থাকলে মহাকর্ষণের টানটাই হয় প্রবল আবার দূরত্ব বেড়ে গেলে এই মহাবিকর্ষণই বস্তুপিণ্ডগুলিকে ঠেলা দিয়ে নিরন্তর দূরে সরাতে থাকে। সীমাহীন শূন্যে মহাবিকর্ষণের ঠেলাটাই প্রবলতর হয়ে নক্ষত্রপুঞ্জের ভিতর দূরত্ব ক্রমাগত বাড়িয়ে দিচ্ছে। কাজেই আজ আকাশে বিভিন্ন জ্যোতিষ্কের যেখানে অবস্থিতি, অতীত যুগে যখন গ্রহজগৎ সৃষ্টি হয়েছিল তখন তাদের আপেক্ষিক দূরত্ব ছিল এখনকার চেয়ে ঢের কম, তাই অপঘাতে নক্ষত্রের প্রলয় ঘটার সম্ভাবনা খুব বিরল ছিল এমন কথা জোর করে বলা যায় না।

Jeansর মত যাঁরা মেনে নিতে পারেন নি তাঁদের মধ্যে অনেকের ধারণা যে প্রত্যেক নক্ষত্রকে কোনো একটা বিশেষ অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হয় যখন একটা প্রলয়শক্তির দুর্দ্দমনীয় অসহ্য বেগ তাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নিবাষ্পের মেঘ প্রক্ষিপ্ত হয় তার চারদিকে। এই মেঘ আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে গ্রহ উপগ্রহের সৃষ্টি করে। এটা শুধু কল্পনার কথা নয় ; কোনো কোনো নক্ষত্র থেকে হঠাৎ এরকম জ্বলন্ত বাষ্পপুঞ্জ নিক্ষিপ্ত হতে চোখে দেখা গেছে। এই মত স্বীকার করলে বলতে হবে যে কোটি কোটি নক্ষত্রের এরকম অবস্থাবিপর্য্যয় ঘটেছে বলে কোটি কোটি সৌরজগৎ রয়েছে এই বিশ্বে। পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্রে এই গ্রহমণ্ডলী দেখতে হোলে যতো বড়ো দুরবীনের দরকার তা আজও তৈরী হয় নি ; এই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হবে তখনই যখন এরকম শক্তিশালী দুরবীন বা গ্রহমণ্ডলীর অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য কোনো নূতন যন্ত্রের উদ্ভব হবে।

এ ছাড়া আরো একটা মত ও শোনা যায়। সেই মত অনুসারে এই বিশ্বের সৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে এক অন্তর্বিপ্লবের ভিতর দিয়ে। কোনো প্রলয়শক্তির উদ্দামতায় ছোটো বড়ো অসংখ্য বস্তুপুঞ্জ প্রচণ্ড বেগে চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়েছে। তাই দেখা যায়, নক্ষত্র নীহারিকা সবই ছুটে চলেছে এক অবিরাম গতিতে। এই মত মেনে নিলে বলতে হয় যে সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও নীহারিকার একই সময়ে একই বিরাট বস্তুপিণ্ড থেকে সৃষ্টি হয়েছে ; আমাদের গ্রহমণ্ডলীর সৃষ্টি সূর্য্য থেকে নয়। সূর্য্যকে এদের জন্মদাতা না বলে জাতভাই বলা যেতে পারে।

Cambridgeর তরুণ বিজ্ঞানী Lyttleton গ্রহমণ্ডলীর সৃষ্টি সম্বন্ধে একটি নূতন মত প্রচার করেছেন। আকাশে এমন অনেক নক্ষত্র আছে যাদের চোখে দেখে একটিমাত্র আলোর বিন্দু বলে মনে হয়, কিন্তু বিজ্ঞানীর যন্ত্রচক্ষুর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাদের জুড়ির সন্ধান পাওয়া যায়।

একটি বিন্দুকে কেন্দ্র করে এরা পরস্পরকে প্রদক্ষিণ করে। এই পণ্ডিত অনুমান করেন যে অতীত যুগে আমাদের সূর্য্যও একটি যুগল-নক্ষত্র (Binary System) ছিল। সৌরমণ্ডলীতে নেপচুন গ্রহের যেখানে অবস্থিতি তারই কাছাকাছি কোথাও ছিল সূর্য্যের এই জুড়িটি। ঘুরতে ঘুরতে আর একটা ভবঘুরে জ্যোতিষ্ক এসে সূর্য্যের এই অনুচরের গায়ে পড়ে তাকে অনেক দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে চলে গেল ; এদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময় পরস্পর আকর্ষণের বলে জ্বলন্ত-বাষ্পের মস্ত বড়ো একটা টানাসূত্র বের হয়ে এলো। এই সূত্রের মধ্যে এদের উভয়ের উপাদান পদার্থ মিশে ছিল। সূর্য্যের আকর্ষণের গণ্ডীতে অবরুদ্ধ এই অগ্নিবাষ্পের অংশ থেকেই জন্ম নিয়েছে আমাদের গ্রহমণ্ডলী। এই অভিনব মতবাদের বিশেষত্ব এই যে এর সাহায্যে গ্রহমণ্ডলীর মেরুদণ্ডে ঘোরার বেগ ও আরো অনেক জটিল তথ্য অন্যান্য মতবাদের চেয়ে নাকি নির্ভুল ভাবে হিসাব করা যায়। কিন্তু সম্প্রতি Luyttons ও Hill এই মতের বিরুদ্ধে এমন সব প্রশ্ন তুলেছেন Lyttleton এখনও যার কোনো সদুত্তর দিতে পারেন নি, তাই এই মত সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করছেন।

গ্রহসৃষ্টির যে-সব মত এখানে আলোচনা করা হোলো তাদের মধ্যে Jeansর মতই সবচেয়ে প্রচলিত। সূর্য্যের নিকটতম ও দূরতম গ্রহ বুধ ও প্লুটো সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু মধ্যদেশে অবস্থিত বৃহস্পতি ও শনিগ্রহ আকারে অন্যান্য গ্রহের চেয়ে ঢের বড়ো ; আবার এই বৃহদায়তন গ্রহগুলির উপগ্রহের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। গ্রহজগতের এই আশ্চর্য্য তথ্যগুলির কোনো সহজ ও সন্তোষজনক মীমাংসা Jeansর পূর্ব্বে কোনো বিজ্ঞানীই করতে পারেন নি। Jeansর মতে টানা-সূত্রের মাঝখানটা অপেক্ষাকৃত মোটা থাকায় আয়তনে বড়ো গ্রহগুলি সৃষ্টি হয়েছে মধ্যদেশে, ক্ষুদ্রতর গ্রহের দল রয়েছে তার দুপাশে। আর এই বড়ো গ্রহগুলি খুব আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়েছে বলে ঘোরার বেগে অনেক বেশি সংখ্যক উপগ্রহ এদের উপর থেকে ছিটকে পড়েছে।

সূর্য্য থেকেই যে গ্রহমণ্ডলীর সৃষ্টি এ সম্বন্ধে প্রায় সব বিজ্ঞানীই একমত ; কারণ যে বিভিন্ন বস্তুপুঞ্জের সমাবেশে পৃথিবীর কলেবর গড়ে উঠেছে তার সঙ্গে সূর্য্যের উপাদান সামগ্রীর একটার আশ্চর্য্য রকমের মিল দেখা যায়। সূর্য্য রয়েছে পৃথিবী থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে, কী করে তার পদার্থপুঞ্জের সন্ধান পাওয়া গেল সে কথাটাই একটু বুঝিয়ে বলা যাক। পৃথিবী রচনার কয়েকটা মসলা আছে খাঁটি আর কয়েকটা আছে মিশোল ; এই খাঁটি পদার্থগুলিকে বলা হয় মৌলিক পদার্থ। এদের ন্যূনতম সংখ্যা নির্দ্ধারিত হয়েছে বিরানব্বইটিতে, এদের মৌলিক বলা হয় কারণ এদের সূক্ষ্মতম অংশেও এদের ধর্ম্ম সম্পূর্ণ বর্ত্তমান থাকে। উত্তাপ পেলে প্রত্যেক পদার্থই আলো ছড়িয়ে দেয়। পরীক্ষা করা দেখা গেছে যে বিভিন্ন মৌলিক জিনিষ থেকে যে-সব আলো বেরোয় তাদের প্রত্যেকের লক্ষণ আলাদা, একটার সঙ্গে অরে একটার কোনো মিল নেই। ছড়িয়ে দেওয়া আলোর বর্ণলিপির এই বৈষম্যের উপরই জ্বলন্ত বাষ্পপুঞ্জের মধ্যে তার উপাদান পদার্থ খোঁজ করার প্রণালী সুপ্রতিষ্ঠিত। সূর্য্যে যে উত্তাপ আছে তাতে সেখানকার

সকল পদার্থই বাষ্প আকারে দীপ্তিমান হয়ে আছে ; আলো পরখ করার যন্ত্র (Spectroscope) দিয়ে সূর্য্যের আলো পরীক্ষা করে মাত্র ৩৬ কোটি মৌলিক জিনিষের সন্ধান প্রথম সূর্য্যে পাওয়া যায়। বাঙলার কৃতী বিজ্ঞানী অধ্যাপক 'মেঘনাদ সাহা'র নির্দ্ধারিত নূতন পথ ধরে কাজ করে আজ পৃথিবীর ৯২ কোটী মৌলিক জিনিষের মাত্র কয়েকটি ছাড়া বাকি সবই সূর্য্যের মধ্যে পাওয়া গেছে। যাদের সন্ধান আজও মেলেনি বিজ্ঞানীরা বলেন তাদের ছড়িয়ে দেওয়া আলো পৃথিবীতে পৌঁছুবার আগেই বায়ুমণ্ডল সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নেয়। সূর্য্য ও পৃথিবীর বস্তুসামগ্রীর ভিতর এতটা মিল দেখে অনেকেরই দৃঢ় বিশ্বাস যে পৃথিবী সূর্য্যেরই একটি বিচ্ছিন্ন অংশ।

গ্রহসৃষ্টির যেসব মত আলোচনা করা হোলো তাদের ভালোমন্দের ব্যাপক বিচার বা তর্ক এখানে করা নিষ্প্রয়োজন। শুধু একটা কথা মনে রাখা দরকার যে এসব মতের কোনোটিকেই একেবারে নির্ভুল বলে মেনে নেবার সময় হয়নি, কারণ বিজ্ঞানের দ্রুত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নূতন অনেক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, তাই মতও ক্রমাগত বদলাচ্ছে। কোন্ অতীতে কোন্ নক্ষত্র অপঘাতের এলাকায় গিয়ে ধরা দিয়েছিল তার কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই, কিন্তু পৃথিবীর ক্রমবিকাশের ধারা স্থির করতে গিয়ে যে-সব প্রমাণ বিজ্ঞান সম্মত বলে মেনে নেওয়া হয়েছে তার থেকে এটুকু জানতে পাই যে কোনো একটা আকস্মিক দুর্ঘটনায় বিক্ষিপ্ত দীপ্তিমান বাষ্পপুঞ্জ থেকেই আরম্ভ হয়েছে গ্রহজগৎ। বিশ্বসৃষ্টির ইতিহাসে এ ধরণের অপঘাত হয়তো খুব সাধারণ, কিন্তু এই সামান্য ঘটনাকে আশ্রয় করে যে গ্রহলোকের সৃষ্টি হয়েছে তা সবচেয়ে স্মরণীয় হয়ে আছে মানুষের ইতিহাসে ; জীবনযাত্রার প্রতিমুহূর্ত্তই মানুষকে মনে করিয়ে দেয় সেই অতীত দুর্ঘটনার কথা যার থেকে সম্ভব হয়েছে পরমবিস্ময়কর প্রাণ ও মনের প্রকাশ।

মানচিত্র

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তোমার নিস্তরঙ্গ সমুদ্র আমার ভেতর ঢেউ তোলে ;
আইভরি-ভারি সমুদ্র
অতলান্তিকের অখ্যাত দ্বীপের মত আমার ওপর
কেশর ফাঁপিয়ে ছুটে আসে।

কাকের কর্কশ ডাক বিদ্যুতের তারে
এখানে।

হে মানচিত্র!
তোমার ক্ষুদ্র সমতল দেহে
হাত বুলুই। ওখানে আল্প্স্, ওখানে স্যুইৎজারল্যাণ্ড্।
ওখানে লোকে স্লেজে চড়ে
দুরন্ত সুন্দর সি-ই-ই-ই-ঙ্ :
বরফ কেটে জীবনে উত্তাপ আসে।

এক চুমুক চা গিলি।

কত বিস্ময়!
মাইক্রোস্‌কোপের দৃষ্টি আমি পাই।
একখানি ছোটো পাতায়
কত বিস্ময়!
মরুভূমিতে এখন কি ঝড় ?
আভালাঁশ ছুটছে কি ওইখানে ?
হয়তো হ্যাঁ, হয়তো না,
কে জানে!

উনুনের, চিম্‌নির ধোঁয়ায়
সন্ধ্যায়
বিষণ্ণ সহর।

তোমার রঙীন্ ছবি নেশা আনে তবু
হে মানচিত্র।

সমুদ্র তো গান গায়
সমুদ্র তো ডেকে যায়
আমার দেহের রক্তে
স্বপ্ন সীমানায়।

যাযাবর উট মরুভূমি চিরে চলে
কোথাকার পাখী উড়ে যায় দলে দলে।
অতলান্তিক সোনা হয়ে ওঠে
জলতরঙ্গ বাজে
মর্ম্মর ধ্বনি, তারাদের গান
সন্ধ্যার ভাঁজে ভাঁজে।

অন্ধের মত পথ খুঁজে শুধু ঘোরা।
সমতল ছবি, ছোটো রাঙা ছবি
আমার চেতনা ভরা।

গিরিশঙ্কটে পথ এসে থেমে গেছে :
ফুট্‌পাথে বিঁড়ি, ছেঁড়া ঠোঙা, লাল দাগ।

কাকের কর্কশ ডাক বিদ্যুতের তারে।
এক চুমুক চা গিলি।
উনুনের, চিম্‌নির ধোঁয়ায়
সন্ধ্যায়
বিষণ্ণ সহর।

ঝাপ্‌সা.. ...

সোভিয়েট রুশিয়াতে নাগরিক অধিকার

(সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা)

তাতিয়ানা সাহা

বিশ্বব্যাপী এই বিচিত্র সঙ্কটের দিনে জাগতিক সকল দেশগুলির মধ্যে একমাত্র সোভিয়েট রুশিয়াতেই বেকারসমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হয়েছে। ১৮১৯ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিদ্রোহে ইউ-এস্-এস্-আরকে* এত বিপর্যস্ত হতে হয়েছিল যে প্রথম কয়েক বৎসর ইহা সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পথের বিঘ্নসমূহ সম্পূর্ণ অতিক্রম করতে পারে নি। দেশব্যাপী ব্যাপক দুর্ভিক্ষের পরেই ১৯২০ ও ১৯২১ সালে সাম্যবাদীদলের পক্ষে সাম্যবাদের মৌল ধারাকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ল। ভ্লাডিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন তখনও জীবিত। তাঁর ন্যায় শ্রেষ্ঠ উদারমনা রাজনৈতিক নেতার নির্দেশক্রমেই সাম্যবাদীদল 'নব অর্থনীতিমূলক পন্থা' (সংক্ষেপে NEP) গ্রহণ করে, যার ফলে পুনরায় ব্যক্তিগত মূলধন ও ব্যবসায় দেশে প্রাধান্যলাভ করে। এইরূপে সাম্যবাদের মূলনীতিগুলো সাময়িকভাবে ব্যাহত হলেও সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত রুশিয়ার পুনরুত্থানের নিমিত্ত এই পন্থা ছিল অপরিহার্য। ১৯২২ সালে শীতকালে লেনিনের মৃত্যু হয়। এর কয়েক মাস পরেই দলের পক্ষ থেকে নবঅর্থনীতিমূলক পন্থার পরিবর্তন করা হয়, কারণ এ বিশ্বাস তখন দৃঢ় হয়েছিল যে ব্যক্তিগত মালিকানা কিংবা মূলধনের উপর নির্ভর না করে কেবলমাত্র প্রোলিটারিয়ানদের—অর্থাৎ শ্রমিক, কৃষক ও এদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বুদ্ধি-জীবি—সহায়তাতেই রুশিয়া সরাসরি সাম্যবাদ অনুসরণ করবার শক্তি অর্জন করেছে।

১৯২৩ সাল থেকেই রুশিয়া সোভিয়েট নীতি অনুযায়ী তার সমস্ত অধিবাসীদের জীবন যাত্রাকে অধিকতর স্বচ্ছল করবার জন্যে নিরন্তর চেষ্টা করেছে, এবং রুষেরা গর্বের সঙ্গে এখন বলতে পারে যে তাদের দেশে বেকার কেউ নেই। স্ট্যালিন প্রবর্তিত নতুন শাসনবিধি প্রথম প্রস্তাবিত হয় ১৯৩৫ সনে এবং সকল রুষীয় সাময়িক পত্রিকাতে সম্যক আলোচনা অন্তে পরবর্তী বৎসরে ইহা গৃহীত হয়। এর বলে রুষ নাগরিকবৃন্দ নরনারী নির্বিশেষে লাভ করেছে শ্রমের অধিকার, বিশ্রামের অধিকার আর শিক্ষালাভের অধিকার। দেশের সুখ ও সংস্কৃতির পক্ষে অত্যাবশ্যক এই সমস্যাত্রয়ের সমাধান করা ছিল অতি কঠিন। এর জন্যে প্রয়োজন হয়েছিল বিপুল চেষ্টা যত্ন ও শ্রমস্বীকারের এবং একথা সাহসের সঙ্গেই বলা যায় যে এটা সম্ভবিত হয়েছে কেবল সেই দেশে যেখানে সমস্ত মূলধন ও সম্পত্তি রাষ্ট্রাধিকারগত। শিল্পোন্নতি, শিক্ষাবিস্তার এবং সমাজগঠনে রুশিয়া তিনটী পঞ্চবার্ষিক কার্যসূচীতে (Five Year Plan) অপূর্ব সাফল্যলাভ করেছে, দেশ সম্পূর্ণ বেকারমুক্ত এবং গ্রাম্য জীবন সোভিয়েট আদর্শানুযায়ী পুনর্গঠিত হয়েছে। তাই স্ট্যালিন বলেছেন যে, রুশিয়া এখন সাম্যবাদ থেকে সমাজতন্ত্রবাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

---

* USSR—Union of Soviet Socialist Republics—সোভিয়েট সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্র সম্মিলনী।

সোভিয়েট শাসনে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ সম্পূর্ণ না হলেও অন্ততঃ আংশিকভাবে বাস্তবে পরিণত হয়েছে। মৈত্রী প্রসঙ্গে বলা যায় যে রুষেরা জাতীয়তা, সামাজিক ও বংশগত মর্যাদা এবং বয়স ইত্যাদি বিচার না করে সকলকেই ভ্রাতৃত্বসূচক কমরেড বলে সম্বোধন করে। এদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান কিংবা কোনপ্রকার দ্বেষবুদ্ধি নেই। ব্রিটিশেরা পরস্পরকে সম্বোধন করে মিস্‌টার মিসেস বলে, ফরাসীরা বলে মাসিয়া মাদাম, জার্মানরা বলে হের ফ্রাউ কিন্তু রুষেরা শুধু বলে কমরেড, বন্ধু। রুষীয় শহর কিংবা গ্রামের পথে চলতে কোন পথিককে সম্বোধন করবার প্রয়োজন হলে তাকে বলতে হবে কমরেড, বিপণিতে বিক্রেতাকেও সম্বোধন করতে হবে কমরেড বলে। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর নিকট আবেদন পত্রে প্রথমেই লেখা হয় কমরেড এবং নামসহির পূর্বেও কমরেডসুলভ প্রীতিসম্ভাষণ জ্ঞাপন করতে হয়। এমন কি রুষবাহিনী (লালফৌজ) যারা অদম্য সাহস, আত্মত্যাগ ও কঠোর নিয়মানুবর্তিতার জন্যে খ্যাত তাদের ভিতরেও সেনানী ও সাধারণ সেনার মধ্যে অপূর্ব ভ্রাতৃসম্বন্ধ দেখা যায় এবং তারা একে অপরকে সম্বোধন করে কমরেড যোদ্ধা, কমরেড নায়ক ইত্যাদি বলে। সকল রুষ নাগরিক অবিসংবাদিত-রূপে সমান রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে থাকে। নতুন শাসনতন্ত্রের ত্রিবার্ষিক নির্বাচনে একজন নগণ্য কর্মকার এবং সমরবিভাগের উচ্চপদভোগী ব্যক্তির ভোটে কোন পার্থক্য নেই, বিবিধ কর্তব্যপালনে ও অধিকার প্রাপ্তিতে রুষ নারীও পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার লাভ করেছে।

সাম্যের নিদর্শন রুশিয়াতে এই লক্ষ্য করা যায় যে অন্য দেশের মত ধনী ও দরিদ্রে এত দীর্ঘ ব্যবধান এখানে নেই—ধনী ও দরিদ্র এই শব্দ দুটীও কেবলমাত্র বিশেষ অর্থেই এদেশীয়দের সম্বন্ধে প্রয়োগ করা চলে। ব্যক্তিগত মালিকানায় ব্যবসায়ের প্রচলন কিংবা বেকারগ্রস্ত কেউ এদেশে নেই বলে আঠার বৎসর বয়স—যেটা বিবাহযোগ্য বয়স বলেও বিবেচিত হয়—থেকেই স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সোভিয়েট সরকারের কর্মচারী বলে গণ্য হয়। অন্যূন বার বৎসর কাজ করলেই পুরুষেরা ৬০ বৎসর এবং স্ত্রীলোকেরা ৫৫ বৎসর বয়সে অবসর গ্রহণের পরে সরকারী বৃত্তি পেয়ে থাকে। ধনী ও দরিদ্রের পার্থক্য এইটুকু যেমন বিশেষজ্ঞগণ সাধারণ শ্রমিকের চাইতে অধিক বেতন ভোগ করেন; তথাপি কারো মাসিক আয় কোনক্রমেই ২০০০ রুবলের (৪০০০ টাকা) উর্ধ কিংবা ১৫০ রুবলের (৩০০ টাকা) নিম্নসংখ্যা হতে পারে না। প্রত্যেক কর্মীই ট্রেড ইউনিয়নের সভ্য। এই ট্রেড ইউনিয়ন ও সরকারী শ্রমিক নিয়োগ প্রতিষ্ঠান—যাকে কলডোগোভর (Koldogovor) বলা হয়—সম্মিলিতভাবে বেতনের হার, শ্রমের সময় ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদি নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজতন্ত্রবাদের উচ্চতম অবস্থায় অবশ্যই আয়ের কোন তারতম্য থাকবে না—প্রত্যেকের জীবনযাত্রার প্রণালী হবে একই আদর্শের। বুখারিন যেমন বলেছেন, সরকার প্রত্যেক নাগরিককেই তুল্যমূল্য জ্ঞান করবে। ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক ও চিকিৎসকগণ কারখানা ও পরীক্ষাগারে তাঁদের কাজ সুচারুভাবেই নির্বাহ করতে পারেন যদি অভাব ও বুভুক্ষার তাড়না না থাকে। কিন্তু শ্রমিক ব্যতীত শহরের খাদ্য সরবরাহ কে করবে? তারাই রৌদ্রে তাপিত হয়ে

ধারাপাতে সিক্ত হয়ে রুক্ষ মলিন হস্তে ভূমিকর্ষণ করে পূর্বোক্ত বিশেষজ্ঞদের গবেষণামূলক কার্য সম্ভবপর করে তুলছে। ইঞ্জিনিয়ার ও মেকানিকগণ টারবাইন, মোটর গাড়ী ক্রেন প্রভৃতি প্রস্তুত করছেন বটে কিন্তু তাঁদের প্রয়োজনীয় ধাতু ইস্পাত, লোহা সহজলভ্য করছে তারাই যারা কয়লার ধূলিতে সমাচ্ছন্ন হয়ে ভূগর্ভস্থ খনিতে পড়ে আছে। সেই মসীলিপ্ত শ্রমিকরা যদি একবার শ্রম-বিমুখ হয় তবে এই বিজ্ঞ ব্যক্তিদের থাকবে না কোন মূল্য, কোন অস্তিত্ব। এ সব শ্রমিকদের কি আমরা কখনই ঘৃণা ও অবহেলা করতে পারি? তারা দরিদ্র, অমার্জিত ও অপরিচ্ছন্ন হলেও তাদের শ্রদ্ধা করা, তাদের যথোপযুক্ত মূল্য দেওয়া আমাদের কর্তব্য। তাদের সহায়তা ব্যতিরেকে আমাদের সুপরিচ্ছন্ন কার্য সম্পাদন যে একেবারেই চলতে পারে না। তারা আমাদেরই সমগোত্রীয়। রুশিয়ার দৃষ্টান্তে এ বিষয়টা সুস্পষ্ট হয়েছে যে এই সব দুঃস্থ শ্রমিকের সহিত যদি বিশেষ পারদর্শী বিশেষজ্ঞদের যথার্থ মিলন হয় তবে তাদের সম্মিলিত শক্তিকে কেউ আর প্রতিহত করতে পারবে না এবং তাদের অসাধ্যও কিছু থাকবে না। রুশিয়া বর্তমানে সমীকরণের পথেই চলেছে, তথাপি এও সত্য যে সমাজতন্ত্রবাদের সর্বশেষ পরিণতির আদর্শ এখনও বহু দূরবর্তী। কিন্তু এই পরিণতিতে মানুষের জীবন কি সুখ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে? রুশিয়াতে এখন যা চলছে তাকে একটা বিরাট রাষ্ট্রনীতিগত পরীক্ষামূলক ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না; এর ফলাফল এখনও অনিশ্চিত এবং অজ্ঞাত। এর মঙ্গলময় দিকটা বিশেষভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তবু বিপরীত দিকটাকেও অস্বীকার করা যায় না। মানবতার প্রতি সামান্যমাত্র দরদও যাঁরা বোধ করেন সমাজতন্ত্রবাদের মূলনীতি এবং সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার আদর্শ তাঁদের কাছে অবশ্যতঃই গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হবে। পরন্তু, সমস্ত সত্য ধর্মের মর্মও এই সমুদয় নীতি। কিন্তু জীবন ও আদর্শকে একই পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। কোন আদর্শ গ্রহণ করা হবে এবং কিভাবেই বা তাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলা হবে এ নিয়ে বহু মতান্তর আছে। এসবের মধ্যে থেকে যথার্থ পথটা বেছে নেওয়াও খুব সহজসাধ্য নয়, তবে সোভিয়েট সরকার সম্বন্ধে বলা যায় যে বর্তমান কালোপযোগী পন্থাই তারা সাধ্যমত অনুসরণ করছে।

রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে রুশিয়ার অসাধারণ সাফল্যে সমগ্র বিশ্বের অনেক শিক্ষনীয় বিষয় নিহিত আছে। এর দৃষ্টান্তে বিশ্বের সর্বহারার দল সম্বিৎ খুঁজে পেয়েছে, তাদের শক্তি ও অধিকার সম্বন্ধে তারা সচেতন হয়ে উঠেছে; এবং সমস্ত মূলধন ও সম্পত্তি রাষ্ট্রাধিকারগত হলে রাষ্ট্র যে কত ক্ষমতাশালী হতে পারে সে সম্বন্ধেও লোকের ধারণা স্পষ্ট হয়েছে।

মৈত্রী ও সাম্যের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে, অবশিষ্ট হল স্বাধীনতা প্রসঙ্গ। সকল রুষ নাগরিক এই অর্থে পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করে থাকে যে তারা কেবল মাত্র রুষ সরকারের অধীন। ব্যক্তিগত প্রভু ও ভৃত্যের প্রচলন যে সমাজব্যবস্থাতে ছিল তার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে অধীনস্থদের উপর সর্বপ্রকার যথেচ্ছারেরও অবসান হয়েছে। এখন সকলের মর্যাদা সমান, প্রত্যেকেরই সমান রাজনৈতিক অধিকার। রুষীয় কৃষকরা চাষের জমির জন্যে সরাসরি সরকারকে খাজনা দেয়—

তাদের শোষণ করবার জন্যে মধ্য পথে কোন জমিদার নেই। বিপ্লবের পূর্বে ব্যক্তিগত মালিকানায় যে সকল মহাজনী ব্যবসায় প্রচলিত ছিল তাদের দৌরাত্ম্যে প্রায়শঃই কৃষকরা দারিদ্র্যের চরম সীমায় গিয়ে উপনীত হত। সোভিয়েট আইনে এগুলো সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হয়েছে। সমগ্র দেশে এখন কেবল সরকারী ব্যাঙ্কের দ্বারাই সর্বপ্রকার লেনদেনের কাজ চলছে। কোন কৃষক কিংবা শ্রমিক অত্যধিক আর্থিক অনটনে পড়লে ঋণের জন্যে তাকে সরকারী দপ্তরে আবেদন করতে হয় এবং প্রতি মাসে আংশিকভাবে প্রত্যর্পণের সর্তে প্রয়োজনীয় অর্থ তাকে দেওয়া হয়। এজন্যে কোন অতিরিক্ত ভার বহন করতে হয় না এবং পাঁচ-দশ কিংবা পনেরো বৎসরেও এই ঋণ পরিশোধ করা চলে। এই ব্যবস্থাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই যেহেতু সমস্ত মূলধন সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় এবং অনুরূপ অবস্থাতে সবদেশেই এটা সম্ভবপর হতে পারে। সম্প্রতি রুষীয় গ্রামগুলো সবই ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সঙ্ঘের (commune) অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—এদের অন্য নাম হল খোলখোজ (Kholkhoze)

রুশিয়া অতি বিশাল দেশ, পৃথিবীর ষষ্ঠাংশ এর অন্তর্গত। বিভিন্ন জাতির লোক এর অধিবাসী এবং এর নাগরিকদের ভাষা অতি বিচিত্র। পূর্বে, জারদের আমলে, যখন সমগ্র রুশিয়াব্যাপী এক অবিচ্ছেদ্য সাম্রাজ্য বিরাজিত ছিল তখন শুধু রুষভাষাকেই সরকারী ভাষা বলে গণ্য করা হত, অন্যান্য ভাষাগুলোর কোন স্থানই ছিল না। যারা রুষ নয়—যেমন ইউক্রেনীয়, ককেশীয় প্রভৃতি—তাদেরও দেশের যে কোন অংশে শিক্ষালাভ করতে হলে রুষভাষাতেই অধ্যয়ন করতে হত। এইরূপে রুষেতর জাতিদের, যাদের অধিকাংশই ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ, সর্বতোভাবে অত্যাচারিত হয়ে অবশেষে আপন আপন জাতীয় ভাষা পর্যন্ত বিস্মৃত হতে হত। তাদের ভাষায় কোন গ্রন্থ ছিল না, সাহিত্য ছিল না, এমন কি অভিনয়ের জন্যে কোন নাটক পর্যন্ত ছিল না। এই রকম অবস্থায় তাদের পক্ষে শিক্ষাসংস্কৃতি, বিজ্ঞান এবং চারুকলার ক্ষেত্রে উন্নতি করা সুদূরপরাহত হয়ে পড়ল। আর তাদের প্রতি ব্যবহারও করা হত এমনভাবে যেন তারা ছিল কতকগুলো বর্বর জাতির সমষ্টি। অধুনা পূর্বতন অবিচ্ছেদ্য রুষসাম্রাজ্য সোভিয়েট সম্মিলনীতে পরিণত হয়েছে, আর যে সকল জাতি ইতিপূর্বে চরম দুর্দশাগ্রস্থ হয়েছিল তারা প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রতামূলক গণতন্ত্র (autonomous republics) স্থাপন করেছে এবং সোভিয়েট সরকারও তাদেরকে শিক্ষাদীক্ষার বিভিন্ন বিভাগে রুষদের সমান, সুবিধা সব দিয়েছে। তাদের ভাষা তারা ফিরে পেয়েছে, আর পেয়েছে জাতীয় স্বাধীনতা, এবং বিশ বৎসরের মধ্যেই তারা মানসিক বিকাশের পথে অনেকখানি অগ্রসর হতে সমর্থ হয়েছে। আরমেনিয়া, আজারবাইজান, তাদ্‌জিকিস্থান, তুর্কীস্তান, হোয়াইট রুশিয়া, ইউক্রেন, পার্বত্য উরাল প্রভৃতি সমস্ত গণতন্ত্রগুলোই সাম্যবাদী দলের—যার সম্পাদক কমরেড স্ট্যালিন—নেতৃত্বাধীনে ভ্রাতৃত্বসূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। মস্কো, ইয়ারোস্লাভ্‌ল, রিয়াসান, লেনিনগ্রাড্‌, ওরেল এবং ভোরোনেজ প্রদেশ সমন্বিত রুশিয়াকেই শাসনকেন্দ্র বলে গণ্য করা হয়। ত্রিবার্ষিক নির্বাচনের সময় সকল গণতন্ত্র থেকে মস্কোতে প্রতিনিধি

প্রেরণ করা হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি গণতন্ত্রেরই আবার স্বাধীন সত্তা আছে বলে মস্কোতে তাদের স্থায়ী প্রতিনিধি-নিবাসও আছে। এ সব বৃত্তান্ত থেকে রুষজীবনের "সামাজিক স্বাধীনতার" পরিচয় পাওয়া যায়। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে রুশিয়া এখনও পূর্ণ সমাজতন্ত্রবাদী হয়ে উঠতে পারেনি, এখনও তথায় প্রোলিটারিয়েট আধিপত্য বিদ্যমান। অদূর ভবিষ্যতে রুষীয় সমাজে সম্পূর্ণরূপে শ্রেণী বর্জিত হবার সম্ভাবনা থাকলেও বর্তমানে ইহা দুইটি স্পষ্টতঃ বিভক্ত শ্রেণীর সমবায় মাত্র—একটি প্রোলিটারিয়েট (যাদের কখনো কখনো সর্বহারার দল বলা হয়ে থাকে), এবং অপরটি তথাকথিত বুদ্ধিজীবির দল। যে পর্যন্ত না এই দুই শ্রেণীর মধ্যেকার সকল ব্যবধান তিরোহিত হবে এদের পারস্পরিক স্বার্থের পূর্ণ সমীকরণ হবে ততক্ষণ সোভিয়েট সরকারের পক্ষে নাগরিকদের সম্যক রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদান করা একেবারেই অসম্ভব, কেননা, সরকারের সামান্য অসতর্কতার সুযোগ গ্রহণ করে অন্তর্শত্রুরা কৃষক ও শ্রমিকের সুকঠোর সাধনায় অক্টোবরের বিপ্লবে যে রাজনৈতিক সাফল্যলাভ হয়েছে তা পণ্ড করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত হবে (এই প্রসঙ্গে এডভান্সের ১৯৩৮ সনের ৮ই ডিসেম্বর তারিখের সংখ্যায় প্রকাশিত আমার "বাস্তববাদী সভ্যতার সমর্থনে" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। সোভিয়েট রুশিয়াতে বক্তৃতা ও সংবাদপত্রের সাহায্যে মতামত প্রচারের স্বাধীনতা নেই, এগুলো সবই সরকার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। সাম্যবাদীদলের প্রচারকার্যের প্রধান সহায় হল এই সব সংবাদপত্র।

বিরাট রুশবিপ্লবের সমস্ত ফলাফল বিচার করা দুরূহ হলেও এ উক্তি নিঃসংশয়ে করা যায় যে এই বিপ্লব জগতের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা করেছে। বিংশ বর্ষাধিক পূর্বেও যে-দেশ ছিল অতি অনগ্রসর অতি অল্পকালের ব্যবধানে তার এই ব্যাপক উন্নতিতে সমগ্র বিশ্ব আগ্রহভরে তার দিকে তাকিয়ে আছে। প্রসঙ্গতঃ এ প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয় যে, অচির ভবিষ্যতে কি পুঁজিবাদ তার পরিণাম স্বরূপ ধ্বংস লাভ করবে এবং অন্যান্য সব দেশ রুশিয়ার সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার আদর্শ স্থাপনে সহায়তাকল্পে অগ্রসর হবে, অথবা পুঁজিবাদী সমাজের কোন অভিনব রূপান্তর হয়ে নবলব্ধ শক্তিবলে ইহা সমাজতন্ত্রবাদকে লুপ্ত করবে?

লেখিকা একজন রুষ মহিলা। বিপ্লবোত্তর রুষিয়ার প্রত্যক্ষ পরিচয় নিয়ে তিনি এদেশে তাঁহার স্বামী সোভিয়েট রুষিয়ার ভূতপূর্ব্ব এঞ্জিনিয়ার মিঃ এ, কে, সাহার সহিত এসেছেন। বর্তমান প্রবন্ধ মূল ইংরেজীর অনুবাদ।—জঃ সঃ

শাঙ্কর মায়াবাদ ও ভারতের দুর্গতি *

অনিলচন্দ্র রায়

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা সকলেই অবহিত হইয়া উঠিয়াছি। বিবিধ জাতির ও ধর্ম্মের লীলাস্থল এই বিচিত্র দেশ, এখানে কোন্ ভাবী সমাজ মুঞ্জরিত হইয়া উঠিবে? এই প্রাচীন মহাদেশে যে নতুন জাতি ভূমিষ্ঠ হইবে, তাহার রূপ-পরিকল্পনায় আমাদের হৃদয় ও মনীষা উচ্চকিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছিলাম। ১৮শতক আমাদের জাতীয় জীবনে তমসাচ্ছন্ন বর্ষার দিন গিয়াছে। কিন্তু ১৯শতকে একটা বসন্তোচ্ছ্বাস আসিয়া ফেনিল প্রাচুর্য্যে আমাদের কানায় কানায় ভরিয়া তুলিয়াছে। ডালে ডালে আজো সেই সবুজ প্রাণরসের প্রবল সঞ্চারণ চলিয়াছে।

রামমোহন, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ হইতে যে ইসারা আসিয়াছে, তাহার পরিণতি ঘটিয়াছে অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীতে। কিন্তু পূর্ণ পরিণতি নয়; কোন রূপকারই আগামী কালের পরিপূর্ণ রূপটীকে মূর্ত্তি দিতে পারেন নাই। আজো আকাশে রহিয়াছে অস্পষ্ট কুহেলিকার আনাগোনা; অনাগত দিনের ভাবমূর্ত্তি আজো জমাট বাঁধিয়া দেখা দেয় নাই। পশ্চিম হইতে ডাক আসিয়াছে। সে ডাকে যে বাণী মন্দ্রিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাকেও বাদ দেওয়া চলিবে না। পূব, পশ্চিম, অতীত, বর্ত্তমান,—ভাবী সমাজের উপর কাহার কতটুকু দাবি তাহা লইয়া কিন্তু বাদানুবাদের বিরাম নাই। নানা মুনি নানা মতের কোলাহল তুলিয়াছেন।

ভারতবর্ষের একটা ঐতিহ্য আছে, একথা অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু এ ঐতিহ্য শুদ্ধ রাগ নয়, মিশ্র ঐক্যতান, melody নয় symphony. তর্ক উঠিয়াছে এই ঐক্যতানের বাদীসুর, বিবাদীসুর লইয়া। কেহ বলিতেছেন, ভারতীয় কৃষ্টি হইল জাতীয়, বিজাতীয় বহু সুরের সমন্বয় কিন্তু তার মূল স্বর হইল আধ্যাত্মিকতা। অপর পক্ষ বলিতেছেন, মোটেই নয়; আধ্যাত্মিকতা কেবল ভারতীয় কৃষ্টির নয়, পৃথিবীর সমস্ত কৃষ্টিরই বাদী সুর ছিলো, ধনিকতন্ত্রের যুগ পর্য্যন্ত। কিন্তু নতুন যুগে পৃথিবীতে নবতম ঐকাতান গড়িয়া উঠিতেছে, তাহাতে আধ্যাত্মিকতা হইবে বিবাদী সুর। ভারতবর্ষও বাদ যাইবে না, এখানেও পুরানো বাদী স্বরকে "বর্জ্জিত" করিতে হইবে।

ভারতীয় মনীষা যে আধ্যাত্মিকতাকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে তাহা বিবেকানন্দ প্রমুখ অনেকেই বলিয়াছেন। ভারতীয় প্রতিভার ইহাই বাদী সুর। কিন্তু এই বাদী সুরের স্বরূপ লইয়াও বিবাদ কম নয়। নানা দর্শন, নানা সম্প্রদায়, নানা তত্ত্বের সমবায়ে ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্য বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। এই যে আধ্যাত্মিকতার সুর ইহাও অবিমিশ্র, একক নয়; ইহাও যৌগিক। বহু সুরের সংযোগে ইহার বিচিত্র স্বরূপ যুগে যুগে গড়িয়া উঠিয়াছে। কত দর্শন,

* শ্রীঅনিলবরণ রায়ের প্রবন্ধের প্রতিবাদ।

কত শত ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ইহাকে বিবিধ অবদানে পোষণ করিয়াছে, তাহার ঠিক নাই। এই জটীল সমবায়ে কোন্ সুরটুকু ভারতের শাশ্বত সুর, তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। কিন্তু নির্দ্ধারণের চেষ্টার বিরাম নাই। এবং এ চেষ্টায় মতানৈক্যও বহুল আকার ধারণ করিয়াছে।

ভারতীয় প্রতিভা বেদ, উপনিষদে যেমন আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তেমনি করিয়াছে ষড়দর্শনে, তেমনি করিয়াছে বৈষ্ণব-দর্শনে। গত চার হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষ জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে একান্ত প্রশ্নশীল মনোভাব লইয়া বিচার করিয়াছে, পরীক্ষা করিয়াছে; অসন্দিগ্ধ আন্তরিকতার সহিত সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে। চিন্তায় যাহা পাইয়াছে, ব্যবহারে তাহাকে প্রতিফলিত করিয়া তুলিয়াছে; দর্শন যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছে, জীবনে তাহাকে অবলম্বন করিয়াছে। দর্শনের সঙ্গে জীবনের, তত্ত্বের সঙ্গে ব্যবহারের এখানে নিবিড় যোগ স্থাপিত হইয়াছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই দুঃসাধ্য প্রয়াসের তুলনা নাই।

জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত কি?

দেখিতে পাই, দুইটি স্বতন্ত্র ধারা আদি যুগ হইতে বাহির হইয়া আসিয়া আজ পর্য্যন্ত বহিয়া চলিয়াছে। একটী বলিতেছে, একই সৎ, বহু মিথ্যা; অপরটী বলিতেছে, একও সত্য, বহুও সত্য। কাহারও মতে, "একং সৎ", আবার কাহারও মতে, "একস্য ভাত্যসংখ্যত্বং। উপনিষদে দুইটী ধারাই পাওয়া যায়। একদিকে বৃহদারণ্যকের অদ্বৈত ব্রহ্মবাদ, অন্যদিকে ছান্দোগ্যের বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ। একদিকে অদ্বৈত বেদান্ত, অন্যদিকে সাংখ্য ও ন্যায়-বৈশেষিক। অদ্বৈত বেদান্ত জড়জগৎকে বলিতেছেন মিথ্যা; সাংখ্য বলিতেছেন, জড়জগৎ সত্য। এই দুই বিরোধী মতবাদের সঙ্ঘাত আমাদের দেশে চলিয়াছে আদিম কাল হইতে। কিন্তু বিংশ শতকের বিজ্ঞান এবং দর্শনও আজ এই বিতর্কেই ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছে। বাস্তববাদ (Realism) আর বিজ্ঞান-বাদের (Idealism) তর্ক আজও চলিয়াছে য়ুরোপ-আমেরিকা চিন্তাজগতে। নতুন পদার্থ-বিজ্ঞানের তর্কও আজ এখানেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে; সকল সমস্যা আসিয়া ঠেকিয়াছে এই জড় ও চৈতন্যের সম্পর্কে, সৎ এবং অসতের সত্যিকার অর্থ-জিজ্ঞাসায়।

সাংখ্য বলে, জগৎ সত্য। ন্যায়-বৈশেষিকও তাই বলে। বৈষ্ণব-দর্শনগুলি সাংখ্য দর্শনের উপরই ভিত্তি স্থাপন করিয়াছে, কাজেই জগৎ তাহাদের কাছেও সত্য। শঙ্করাচার্য্য এবং রামানুজ পরবর্ত্তী কালের এই দুই মতের দুইজন প্রতিভাশালী প্রতিনিধি। শঙ্করের মতে জগৎ মিথ্যা; রামানুজ-মতে জগৎ সত্য। বর্ত্তমান যুগে শ্রীঅরবিন্দ রামানুজকে অনুসরণ করিয়া শঙ্করের বিরোধী মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। অরবিন্দ-দর্শনের প্রধান আক্রমণ প্রসারিত হইয়াছে শঙ্করের মায়াবাদের দিকে। অরবিন্দ সম্প্রদায় বলেন, ভারতবর্ষে সকল দুর্গতির মূলে শঙ্করাচার্য্য। শাঙ্কর মায়াবাদ ভারতবাসীকে ইহবিমুখ করিয়াছে, ভোগ-বিরাগী করিয়াছে। তাঁহাদের মতে, ভবিষ্যৎ ভারতের চিন্তাক্ষেত্রে শঙ্করের স্থান নাই। শঙ্করের মায়াবাদ ভারতের মজ্জাগত ব্যাধি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই ব্যাধিমুক্তি না হইলে ভারতের আধ্যাত্মিক ভবিষ্যৎ নিষ্ফল হইয়া যাইবে।

অধিকন্তু, শঙ্করাচার্য্য ভারতের যত অকল্যাণ করিয়াছেন এত আর কেহ করেন নাই। আমাদের এই দুর্ভাগ্য জাতি যে আত্মশক্তিকে আশ্রয় করিয়া জাগতিক ঐশ্বর্য্যকে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় নাই, তাহার কারণ শঙ্করের মায়াবাদ ও সন্ন্যাস-বাদ। কাজেই শঙ্করকে ভারতের প্রকাশ্য শত্রু বলিলে দোষের হয় না ; শঙ্কর তাই, এই মতে, ভারতবর্ষের Public Enemy No. I. তাছাড়া শাঙ্কর মতবাদ ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতিনিধি নয়, কারণ তাঁহার ব্যাখ্যান যুক্তি ও অনুভূতি এই দুই দিক হইতেই ভিত্তিহীন বলিয়া স্বীকার্য্য। কাজেই ভারতের দার্শনিক ঐতিহ্য হইতে শঙ্করকে বাদ দিতে হইবে।

অরবিন্দ-সম্প্রদায়ের এই আক্রমণ দুই দিক হইতেই শাঙ্কর-দর্শনকে আঘাত করিতেছে। প্রথমতঃ পারমার্থিক ভাবে মায়াবাদ ভুল, দ্বিতীয়তঃ ব্যবহারিক ভাবেও ইহা অনিষ্টকারক হইয়াছে। ইহা যুক্তিসিদ্ধ যেমন নয়, তেমনই হিতকারকও নয়। ভারবর্ষের ভবিষ্যৎ লইয়া যাঁহারা মস্তিষ্কচালনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এখন বিচার করিয়া দেখিতে হইবে এই অভিযোগের মূলে সত্য আছে কিনা।

এখানে কতকগুলি গুরুতর প্রশ্ন উঠিয়া থাকে।

প্রথমতঃ, ভারতীয় কৃষ্টির দুর্দ্দশা ও অবনতির জন্য শাঙ্কর মায়াবাদ বা সন্ন্যাসবাদ দায়ী, এই অভিযোগের মূলে সত্য নাই। কৃষ্টি বা সভ্যতা বস্তুটী অতি বিচিত্র, ইহার জন্ম ও মৃত্যুর রহস্য অতি গভীর। সমাজতাত্ত্বিকেরা বহুদিন যাবৎ ইহার রহস্য ভেদ করিতে যাইয়াও কৃতকার্য্য হন নাই। পৃথিবীতে গত দশহাজার বৎসরের মধ্যে একুশটী সভ্যতার জন্ম হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২।৩টী ব্যতীত অন্য সবগুলিই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা এবং চীন সভ্যতা আজো টিকিয়া আছে বটে কিন্তু তাহাদের প্রাণশক্তি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে। মিশরীয়, গ্রীক, রোমীয়, আসীরীয়, মায়া, ইত্যাদি সভ্যতাগুলি মৃত্যুপথে পতিত হইল কেন? সভ্যতার আয়ু বেশী দিন থাকে না কেন? এ প্রশ্নের জবাবে পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে সভ্যতার জীবনেরও একটা বৃদ্ধি, বিকাশ, ক্ষয় ও মৃত্যু আছে। মানুষের জীবনের যেমন একটা প্রাকৃতিক সীমা ও পরিশেষ আছে তেমনি সমাজজীবনের ও সভ্যতারও। বিখ্যাত Flinders Petrieর মতে সভ্যতার গতি একটানা নয়। ("Civilisation is an intermittent phenomenon"—Petrie.) সভ্যতার উত্থান পতনের একটা অব্যর্থ ছন্দ আছে, সেই ছন্দ অনুসারে ১৮০০ বৎসরের বেশী কোনো সভ্যতারই আয়ু থাকিতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মে সমাজের প্রাণশক্তি ক্ষয় হইয়া আসে। নূতন কোন জাতির সহিত রক্ত মিশ্রণ ঘটিলে নতুন প্রাণশক্তি সঞ্চারিত হয় ক্ষীয়মান সমাজের দেহে। ফলে আরো কিছু দিনের আয়ু বাড়িয়া যায়। বহুদিন সংগ্রামহীন শান্তির জীবনযাপনের ফলেও জাতি নির্বীর্য ও প্রাণহীন হইয়া যায়। Gobineau'র মত বংশবাদীরা (Racialist) বলেন, সভ্যতার মূলে আছে বংশের কৃতিত্ব। পৃথিবীর সব সভ্যতা নর্ডিক জাতি (Nordic) সৃষ্টি করিয়াছে। Dr Jung বলেন, প্রত্যেক সমাজের একটী অবচেতন ভাবমূর্ত্তি

আছে (archetype) যার বিশিষ্টতা অনুযায়ী বিশিষ্ট সভ্যতাকে সেই জাতি সৃজন করে। Buckleএর মত ভূগোলবাদীগণ ভৌগলিক পারিপার্শ্বিককেই সভ্যতার পরিবর্ত্তনের কারণ বলিয়া মনে করেন। H. Spencerএর মতে, মনুষ্যসমাজে বুদ্ধিশক্তি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানোৎপাদন-শক্তি (fertility) কমিয়া যায়। কাজেই সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে লোক সংখ্যা কমিয়া যায় এবং সভ্যতাও ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। Elliot Smith-প্রমুখ বিকীরণ-বাদীরা (diffusionist) মনে করেন যে কৃষ্টিমিশ্রনের দ্বারাই সভ্যতা উন্নতির পথে যায়। Spenglerএর মতে প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের জন্মমৃত্যুর মতন প্রত্যেকটী সভ্যতারও জন্ম, মৃত্যু, বৃদ্ধিক্ষয় আছে। এখন ভারতবর্ষের সমাজ-প্রাণ কেন নিস্তেজ হইয়া মুমূর্ষু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার কারণ জটীল। কোন একটী কারণের জন্য জাতীয় ও সামাজিক অবনতি ঘটে নাই। ভারতের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ তাহার ঐতিহাসিক অগণিত কারণ। আর্থিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক, বংশগত,—সব রকম কারণের সমবায়ে তবে একটা জাতির উত্থান-পতন ঘটে। কাজেই কেবল শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাসবাদের উপর দোষ দিলেই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-রীতি অনুসৃত হয় না।

যুরোপে গ্রীকো-রোমীয় সভ্যতার ইতিহাস নানা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়া বিবর্ত্তিত হইয়াছে। কখনও চূড়ান্ত ভোগবাদ, কখনো একান্ত ত্যাগবাদ সমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। কখনো সমাজের প্রাণপুরুষ মুমূর্ষু হইয়াছে, কখনো আবার নতুন শক্তিতে জাগ্রত হইয়া আত্মবিস্তার করিয়াছে। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতকে য়ুরোপে আধ্যাত্মিকতা ও বিশ্বাসের যুগ ছিল। ইহার পরেই প্রশ্ন ও ঐহিকতার যুগ আগত হয়। পরে খৃঃ ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকের পরে আবার আধ্যাত্মিকতার প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে। যাহাকে Dark Age বলা হয় তাহা কাহারও কাহারও মতে সত্যি সত্যিই "বিশ্বাসের যুগ"। তারপরে ১৫ শতক হইতে আবার নববিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জড়বাদ ও ঐহিকতার যুগ আগত হইয়াছে। আমাদের দেশেও ৫ম, ৪র্থ (খৃঃ পূ) শতকে মৌর্য্যযুগে, ৪র্থ ও পঞ্চম শতকে (খৃঃ অব্দ) গুপ্তযুগে, ১৬ ও ১৭ শতকে মুসলমান যুগে এবং ১৯ শতকে ইংরেজী আমলে, বড় বড় জাগরণ ঘটিয়াছে। আবার প্রায়শই মাৎস্যন্যায় এবং দুর্গতির অন্ধকারে সমাজ ডুবিয়া গিয়াছে।

সভ্যতার গতি ও ক্ষয়ের কাহিনী আজও সমাজতত্ত্ব বাহির করিতে পারে নাই। একজন বিখ্যাত আধুনিক সমাজতাত্ত্বিক সেই কারণে সমাজ ও কৃষ্টির বিবর্ত্তনে একটা অন্তর্নিহিত বাধার উল্লেখ করিয়াছেন ("Principle of Limit and self-regulation of sociocultural process")। কোনো একটী কারণে সমাজের প্রগতি বা দুর্গতি ঘটে না। বহু কারণে ঘটে। কোন যুগে কোনো একটী কারণ প্রবল হইয়া উঠিয়া পরবর্ত্তী যুগে অপর কারণগুলি প্রবলতর হইয়া সমতা রক্ষা করিবে। সমাজের গতি ও দুর্গতির কোন একটী কারণ নির্দ্দেশ করা অবৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির পরিচায়ক। শঙ্কর-প্রতিপক্ষ যদি কেবল সন্ন্যাস-বাদের উপরই ভারতের কৃষ্টি-দুর্গতির দায়িত্ব চাপান তবে অযৌক্তিক হইবে।

প্রকৃতপক্ষে কি একথা ঠিক? সন্নাসবাদই কি জাতির দৈহিক ও মানসিক ওজস্বিতাকে বিনষ্ট করিয়াছে? তাহা হইলে তো বৌদ্ধযুগেই ভারতের দৈহিক ও ঐহিক ঐশ্বর্য্যের মৃত্যু ঘটিত! বৌদ্ধদর্শন জগৎ সম্বন্ধে কী ধারণা ছড়াইয়াছিল সমস্ত এশিয়াতে? বৌদ্ধদর্শণের নাগার্জ্জুনীয় বিজ্ঞানবাদ, শূন্যবাদ ইত্যাদি এবং ক্ষণিকবাদ জীবনের সকল ঘটনা ও বস্তুকে নশ্বর, ক্ষণিক ও অবাস্তব বলিয়া বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিল। অবিদ্যার পাশ হইতে মুক্তি পাইতে হইলে বাসনাকে বর্জ্জন করিতে হইবে এবং নির্ব্বাণ পরিনির্ব্বাণই মানুষ জীবনের শেষ লক্ষ্য। ইহবিমুখ মনোভাব এই দার্শনিক মতবাদ হইতে জন্ম লইবে ইহা স্বাভাবিক। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দী হইতে তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় তিনশত বৎসর বৌদ্ধযুগ অবিশ্রান্ত এই নির্ব্বাণ-মূলক সন্ন্যাসবাদ প্রচার করিয়াছে। কিন্তু এই সন্ন্যাস-কলঙ্কিত যুগেই দেখি ঐহিক জীবনে পরিপূর্ণ ঐশ্বর্য্য ষোল-কলায় বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। বৌদ্ধযুগে সমস্ত উত্তর ভারতের ভোগবিলাস এবং উপকরণের প্রাচুর্য্য আজো আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া তোলে। রাষ্ট্রে অপরিমিত শক্তিমত্তা, রাজনীতিতে দৃঢ় বাস্তববাদ ও কূট কৌশল, সমাজে অমোঘ সংহতি, এই ছিলো সেই যুগের বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য। অশোকের রাজত্ব এই যুগের মধ্যমণি। মুসলমান রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমস্ত হিন্দুযুগ ভরিয়া ভারতবর্ষের চিন্তা, কৃষ্টি ও শিল্পকে এই বৌদ্ধযুগ প্রভাবিত করিয়াছে। সমস্ত ভারতের দিকে দিকে অগণিত স্তূপ, বিহার, চৈত্য, ছাইয়া গিয়াছিল; সারনাথে, মথুরায়, গান্ধারে, সাঁচিতে বুদ্ধগয়ায়, পাটলিপুত্রে, তক্ষশীলায়—বৌদ্ধ প্রতিভার অমলিন ছাপ সর্ব্বত্র গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধযুগ ভবিষ্যত জীবনকে বহুদূর পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রাখিয়াছিল। সমস্ত ভারত সমাজের সমষ্টি-আত্মা জাগিয়া উঠিয়া সেদিন সৃজনশীল বহুমুখিতায় আত্মবিস্তার করিয়াছিল। সমস্ত এশিয়ায়, স্থলে, জলে, সর্ব্বত্র সেদিন দুর্দ্ধর্ষ কর্ম্মনিষ্ঠা ও দুঃসাধ্য তপস্যা বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছে বৌদ্ধ প্রতিভার। ভারতের প্রথম গণজাগরণ ও গণবিদ্রোহের যুগ এই বৌদ্ধ যুগ। তক্ষশীলা, কাশী, নালন্দা সেদিন লক্ষ লক্ষ শিক্ষাব্রতীর মধ্যে দর্শণ, শিল্প, স্থাপত্য, ইত্যাদির বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ছড়াইতেছিল। ঐহিক ঐশ্বর্য্য সেযুগে অপরিমিত একথা মেগাস্থিনিসের সাক্ষ্য ও অপরাপর সাক্ষ্য হইতেই পাওয়া যায়।

ইহার পরের যুগে—গুপ্তযুগে—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের জাগরণ হইল। কিন্তু শিল্পে, সাধনায়, কৃষ্টিতে এই যুগও বৌদ্ধ প্রতিভার দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। এই যুগের রেনেসাঁস ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জ্বল জাগরণ। বৌদ্ধ প্রভাব সত্ত্বেও (খৃষ্টাব্দ ৩২০—৫০০ খৃষ্টাব্দ) প্রায় দুই তিন শত বৎসর যাবৎ ভারতের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল ঐহিক জীবনের ক্ষেত্রে। বৌদ্ধধর্ম্ম ও কৃষ্টি ভারতের আত্মাকে গভীরভাবে আন্দোলিত করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্ম দুঃখবাদী (Pessimistic) এবং সন্ন্যাসবাদী। কিন্তু তাহাতে কি হয়? সন্ন্যাসবাদ সত্ত্বেও সমাজজীবন সেদিন ইহলোকের সমৃদ্ধিকেও আয়ত্ত্ব করিয়াছিল। অথচ শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাসবাদ আজ নাকি সমস্ত জাতীয় কর্ম্ম-প্রতিভাকে বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এ অভিযোগের কোন ভিত্তি আছে কি?

অষ্টম শতকে শঙ্করের আবির্ভাব ঘটিল। শঙ্করের সমসাময়িক কালে মীমাংসাধর্ম্ম প্রবল ছিল, স্থায়-বৈশেষিক প্রচলিত ছিল। সাংখ্য দর্শনের প্রচলন ছিল। শঙ্করের পরবর্ত্তি কালে রামানুজ আচার্য্যের অভ্যুদয় হয় এবং বল্লভাচার্য্য, মাধবাচার্য্য ও নিম্বাচার্য্য প্রভৃতির বৈষ্ণব মতানুযায়ী দর্শণও প্রবল হয়। আমরা শুনিতে পাই রামানুজাচার্য্য মায়াবাদকে খণ্ডন করিয়া জগতের বাস্তবতাকে প্রতিষ্ঠা করেন। আধুনিক যুগেও বহু ব্যক্তি শঙ্কর শাস্ত্রের কদর্থ ও কষ্টার্থ করিয়া লোককে ভ্রান্ত করিয়াছেন এমন বলিয়া থাকেন। ভক্তিবাদীরা শঙ্কর সম্বন্ধে এ দোষারোপ করিয়া থাকেন।

"কলিকালে বেদের সদর্থ আচ্ছাদন
করি ব্যাখ্যা করে মায়াবাদার্থ স্থাপন।
শ্রুতির কুব্যাখ্যা-মেঘে আচ্ছাদন ছিল
রামানুজ স্বামি-বাতে মেঘ উড়াইল।"

(ভক্তমাল)

বিজ্ঞানভিক্ষুও একদা বলিয়াছিলেন যে শাঙ্করদর্শন ষড়দর্শনের মধ্যে পড়ে না—ইহা ব্রহ্মসূত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা—ব্যাসদেবের মতবিরুদ্ধ এবং প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধমতবাদ। "নেদং ব্যাস-দর্শনং অপি তু সপ্তমং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধদর্শনমেব ইতি।" কিন্তু শ্রুতির এই কদর্থ এবং এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদই ভারতবর্ষের জনগণকে আশ্চর্য্য প্রভাব করিল। শঙ্করবাদের পরে ২০শ শতকে শ্রীঅরবিন্দ পর্য্যন্ত বহু মনীষী মায়াবাদের বিরোধিতা করিয়াছেন এবং বাস্তববাদী মতবাদ প্রচার করিয়াছেন। গত ১২ শত বৎসর মায়াবাদের বিরোধিতা কম হয় নাই। মায়াবাদের পাশাপাশি রহিয়াছে সাংখ্য বাস্তববাদ এবং বৈষ্ণবী বাস্তববাদ। তবু বাস্তববাদ দেশের কর্ম্মশক্তিকে এবং ইহমুখীনতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে পারিল না! সন্ন্যাসবাদ দেশের মনুষ্যত্বকে গ্রাস করিয়া বসিল! কিন্তু পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে ভারতে সন্ন্যাসবাদের প্রবলতম যুগেও ঐহিকতা এবং স্থূল ঐশ্বর্য্যের সাধনা কম হয় নাই;—বৌদ্ধযুগের সন্ন্যাসবাদ সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজ ঐহিক কৃষ্টিকে (material culture) বর্দ্ধিত ও বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল। পরবর্ত্তি যুগে—অর্থাৎ গুপ্তযুগের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ কেবলই ইহবিমুখতাকেই বরণ করিয়াছে, পূজা করিয়াছে,—একথা ঠিক নয়। ৪৭০ সন হইতে ৬০৬ সনে হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত —একশ বৎসরের অধিক কাল ভারতে হুন আক্রমণের যুগ। ইহার পরে ৬৪৮ সনে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর হইতে মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রকৃতপ্রস্তাবে ৫ম হইতে ১২ শতক পর্য্যন্ত উত্তরে এবং দক্ষিণে সর্ব্বত্র অব্যবস্থার যুগ। খণ্ড রাজ্যগুলি তখন স্বাতন্ত্র্যের জন্যে পরস্পর হানাহানি করিতেছে। এই যুগে ক্ষাত্রশক্তি স্বার্থবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া বিচ্ছিন্ন সংকীর্ণতায় পরস্পরকে আঘাত করিতেছে এবং ভারতের আত্ম-শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলিতেছে। এই যুগে ভারতবর্ষ অক্ষম হইয়াছিল রাজনৈতিক অব্যবস্থা ও ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির দৌলতে। সন্ন্যাসবাদ বা ত্যাগমন্ত্রের মোহে নয়।

আসল কথা কোন যুগেই জনসাধারণ mass scaleএ বিপুল সমষ্টির আকারে সন্ন্যাসী হইয়া উঠে নাই। এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে দার্শনিক মতবাদ জনসাধারণকে গভীরভাবে আলোড়িত করে না কোনো যুগেই। কোন Intellectualist বা উচ্চ শ্রেণীর প্রতিভাশালী মহাত্মার বিশিষ্ট দার্শনিক প্রাদুর্ভাব দেখিয়া যদি আমরা মনে করি সেই যুগে সর্ব্বসাধারণও সেই প্রতিভার মোহে পড়িয়া বৈরাগী হইয়া উঠিয়াছে, তবে গুরুতর ঐতিহাসিক ভুল হইবে। প্রবল দার্শনিক মতবাদের প্রভাব জনসাধারণের মনকে সাধারণভাবে নাড়া দিতে পারে, কিন্তু কার্য্যকরীভাবে দুঃসাহসিক অধ্যাত্মসাধনায় নিয়োজিত করিতে পারে না। বৌদ্ধ যুগেও দর্শনের প্রভাব উপরের স্তরে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সেই স্তরেও সামান্য সংখ্যককে মাত্র কার্য্যকরীভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। বিহারে, সঙ্ঘারামে ভিক্ষুদের ভীড় লাগিলেও, দেশের বিরাট জনসমাজ নিশ্চিন্তে ব্যবসাবাণিজ্য, সংসারধর্ম্ম পালন করিয়াই চলিয়াছে। জনসাধারণের ধর্ম্ম দার্শনিক ধর্ম্ম নয়; কোথাও, কোন যুগেও তাদের চিত্তে আসন পাতিয়া থাকে লৌকিক ধর্ম্ম। বৌদ্ধধর্ম্ম সেখানে হয় লোকাচার, দেবদেবী পূজা, আর তান্ত্রিকতা। তেমনি বৈষ্ণব জাগরণেও জনগণ মোটামুটিভাবে স্পৃষ্ট হইলেও গভীরভাবে হয় নাই। লোকসংখ্যার গণনা হিসাব করিলে দেখা যাইবে প্রেমভক্তি ধর্ম্মও উচ্চ স্তরের সংখ্যান্যূনের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ ছিল; অপর অংশ লৌকিকভাবে মাত্র বৈষ্ণবীয় মনোভাব গ্রহণ করিয়া দিব্যি নিশ্চিন্তে বেচাকেনা, হাট বাজার করিয়া দিন কাটাইয়াছে। সন্ন্যাস ধর্ম্ম প্রচারিত হইলেই দেশের সর্ব্বসাধারণ প্রভাবিত হইয়া সংসারকর্ম্মের প্রতি উদাসীন হইবে, ইহা অসম্ভব। সংসারকে আমাদের মত প্রাকৃত লোকেরা চিরকালই বেশ ভাল চক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনে হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমান কোন যুগেই আমরা ভোগবিমুখ বা সংসারবিরক্ত ছিলাম না। তবে সঙ্ঘবদ্ধভাবে বিপুল সমৃদ্ধি অর্জ্জন ও শক্তি সংরক্ষণের কৌশল বা পারিপার্শ্বিক আমাদের করায়ত্ত ছিল না। ভারতের ঐশ্বর্য্য এবং ভোগ-বীর্য্য মুসলমান আমলের শেষ দিকেও য়ুরোপীয়দের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছে। ষোড়শ, সপ্তদশ শতকে বাংলা ও ভারতের ঐশ্বর্য্য কম ছিল না, মানুষও কম বিলাসী ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার সুবিধা লইয়া অর্থনৈতিক সর্ব্বনাশ যে পথে সমাজে প্রবেশ করিয়াছিল সে ইতিহাস আজ পুরাণ হইয়া গিয়াছে।

আরো উল্লেখযোগ্য যে সন্ন্যাস কেবল মায়াবাদেরই অনুজ্ঞা নয়। সাংখ্য, যোগ, বৈষ্ণব ইত্যাদি বাস্তবাদী মতবাদও সন্ন্যাসকে ধর্ম্মসাধনের পূর্ণতম উপায় বলিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন। সাংখ্যবাদীর জগৎ মিথ্যা নয় কিন্তু সাংখ্যবাদীর সাধনাও সেই নির্লিপ্ত পুরুষভাবের সাধনা। অরবিন্দের ভাষায় "in the Sankhya method, the working of the gunas falls to rest by the return of the soul to its true and eternal status as the inactive Purusha and Cosmic action ends." তেমনি চৈতন্যদেব বলেন: "দেখ কালি শিখাসূত্র সব মুণ্ডাইয়া। ভিক্ষা করি বেড়াইনু সন্ন্যাস করিয়া॥.. না রহিব গদাধর আমি গৃহবাসে। যে-তে দিগে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে" (চৈতন্য ভাগবত)। বৈষ্ণব আচার্য্যগণও সন্ন্যাস অবলম্বন

করিয়াছেন। কিন্তু তাই বলিয়া জনসাধারণ সন্ন্যাসী হইয়া ভোগবিরাগী হইয়া উঠে নাই। কাব্যে, সঙ্গীতে, তর্কসভায় বৈরাগ্য আছে কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে নয়। ব্যক্তিগত জীবনে "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" এ নীতি বরাবরই আছে। দার্শনিক সত্যের সন্ধানী। সংস্কারমুক্ত, নির্ভীকচিত্তে সত্যকে সে অনুসরণ করিবে। প্র্যাগ্‌মেটিক মনোভাব দ্বারা দার্শনিকের কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত হওয়া সঙ্গত নয়। জগৎ যদি সত্যি সত্যি মায়াই হইয়া থাকে তবে না হইল দেশের, জাতির উন্নতি; না হইল সংসারধর্ম্ম। সত্য-সন্ধানীর ইহাই মনোবৃত্তি। সংসারধর্ম্মকে ষোল আনা ভোগ করিবার উদ্দেশ্য আগেই স্থির করিয়া লইয়া তারপরে যে মতবাদ সংসারধর্ম্মকে রক্ষা করে তাহাকে ধারণ করিব, ইহা দার্শনিকের নীতি নয়। সত্যকে দার্শনিক অনুসরণ করিবেন, তাতে সংসারধর্ম্মেই উপস্থিত হউন আর বৈরাগ্যধর্ম্মেই উপস্থিত হউন। আসল কথা হইল এই যে মায়াবাদ যুক্তিতে এবং পরমার্থতঃ সত্য (objectively) কিনা; আর যাহা সত্য তাহা গোপনে মুষ্টিমেয়ের মধ্যে উপদেশ দিতে হইবে, ইহা সত্যের রীতি নয়। সত্য প্রকাশিত হইবে, যাহারা যোগ্য তাহারা ইহাকে কার্য্যকরী করিতে পারিবে। অপরে ইহাকে আশ্রয় করিলে নিস্ফল শ্রমমাত্র হইবে। কেবল শাঙ্করবাদ কেন, গীতার তত্ত্ব, সাংখ্যাতত্ত্ব, বৈষ্ণবী দর্শনের গুহ্য প্রেম, শ্রীঅরবিন্দের আত্মসমর্পণ-যোগ, এ সবই প্রচার করা হইয়াছে সত্য বলিয়া। "পাছে লোকে ভুল করে" বলিয়া এবং অপব্যাখ্যা হইবে বলিয়া নিষ্কাম কর্ম্মযোগের কথা লুকাইয়া রাখিতে হইবে, ইহা অসঙ্গত। জগতে সকল সত্য ও সকল তত্ত্বই অপব্যবহৃত হইয়াছে। তাই বলিয়া পৃথিবীতে সত্য প্রকাশ্যভাবে প্রচারিত হইবে না, ইহা অযৌক্তিক। বৈরাগ্যের পথকে শ্রীঅরবিন্দও একতন পথ বলিয়া স্বীকার করেন: "If that can only be attained by renouncing works and life and all duties and the call is strong within us, then into the bonfire they must go and there is no help for it" (Essays on Gita).

তাছাড়া শঙ্কর জগৎকে উড়াইয়া দেন নাই, একথা সর্ববস্বীকৃত। যদি কেউ অন্য মত পোষণ করেন, তবে যুক্তি দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। 'ইহা যুক্তি বিচারের জিনিষ নহে' বলিয়া পরক্ষণেই যুক্তি দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থন করা সঙ্গত নয়। কাগজ কলমে বই ও প্রবন্ধ লেখাই যুক্তির কাছে আবেদন করা। শঙ্কর যে জগতের 'আপেক্ষিক অসত্যতা' ঘোষণা করিয়াছেন তাহা শ্রীঅরবিন্দই বলিয়াছেন: "comparatively unreal in face of the absolutely Real," "exaggerated expression of this relative unreality" ইত্যাদি ভাষায়। রামকৃষ্ণদেবও "চিনি খাবার" কথা যেমন বলিয়াছেন "চিনি হওয়ার" কথাও তেমনি বলিয়াছেন। তাঁহার অনুভূতি মায়াবাদের বিরোধী ইহা অস্বীকার্য্য। তাঁহার অনুভূতি সকল পথেরই সমর্থক। বিবেকানন্দও বলিয়াছেন..."ইহার কেবল আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে।...অচল, অনন্ত সত্তা ইহার নাই।" (জ্ঞানযোগ)।

মায়াবাদ যুক্তিযুক্ত কি না, তাহা এ প্রবন্ধে আলোচ্য নহে। ন্যায় ও বৈষ্ণব আচার্য্যদের

বহুল তর্কের মধ্য দিয়া এ বিষয়ে প্রচুর আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু পুনরায় আলোচনায় দোষ নাই। তবে এ প্রবন্ধের মুখ্য প্রমান্য হইল এই যে দার্শনিক মতবাদ সন্ন্যাস সমর্থন করিলেই মানুষ অকর্ম্মাসক্ত হইয়া পড়িবে তাহা নয়। যে য়ুরোপ আজ জড়কর্ম্মা ও শ্রেষ্ঠ ইহতান্ত্রিক, তাহার খৃষ্টধর্ম্ম তীব্র ত্যাগধর্ম্মা এবং ইহবিমুখী। St. Paul, St. Augustine ইত্যাদির জগৎ-বিতৃষ্ণা য়ুরোপকে সন্ন্যাসধর্ম্মী করিতে পারে নাই।

মানব সভ্যতা এক বিচিত্র ও জটিল পদার্থ। নানা জ্ঞাত ও অজ্ঞাত কারণের সমবায়ে এই পদার্থটীর উত্থান পতন নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার বেলায়ও তাই। ইহার জটীল জীবনের কুটীল গতিকে কেবল শঙ্কর মায়াবাদের ও সন্ন্যাসের যাদু দণ্ড দিয়া পরিমাপ করিলে চলিবে না। জাতির বিচিত্র ঐতিহ্যকে সার্থকতার পথে নিতে কেবল পছন্দমতন দার্শনিক মতবাদ উপস্থিত করিলেই হইবে না। অনুস্যূত প্রাণ শক্তির সহিত তাহার যোগ থাকা চাই। অরবিন্দের ভাষায় বলা যায় "no victorious science, or liberating philosophy,...can really bring about the great desire implanted in the race...." ভারতবর্ষের দুর্দ্দশা ও দুর্গতির সকল দায়িত্ব কেবল শঙ্করাচার্য্যের উপর দিলেই সভ্যতার রহস্য-উন্মোচন হয় না। যাঁহাদের কিছু বলিবার আছে তাঁহারা যুক্তিসহ বলিলে সাধারণের উপকার হইবে। নতুবা "শাস্ত্রেষু কথিতা হ্যেতে লোক-ব্যামোহ-কারকাঃ॥"

আঁধার

বীণাপাণি রায়

দরজা খুলে হাতলে হাত রেখেই সে থেমে দাঁড়ালো। সন্দিগ্ধচিত্তে নীচের ওষ্ঠদেশ কামড়াচ্ছিল, ঘরে ঢুকে কি দেখবে ; স্বামী স্ত্রীর ভিতর কি কথা কাটাকাটি হবে এ আশঙ্কার সাথে আবার অনিচ্ছা বা অতর্কিত আশার ক্ষীণরেখা ও মনের কোণে জেগে উঠছিল। অভ্যস্ত, কোমল হাসি, চুম্বন, মধুর সাহচর্য, উচ্ছল হৃদয়াবেগ সবগুলির প্রত্যাশায় নিজের মন বাঁধল, দরজা খুলে স্বামীর সম্মুখীন হতে। ঢুকে দেখল ঘর জুড়ে অন্ধকার। গ্যাসের বাতি তখনও জ্বালান হয়নি। চুলায় পড়ন্ত আগুন। স্বামী ইজি চেয়ারে শু'য়ে আছে। মুখের উপর একটা অনড় অবসাদ ম্যাচের ক্ষীণালোকেও দেখা গেল। আমার কপাল! তাও আবার ঘুমিয়ে আছে। এ ভাবতেই তিক্ততা ও বিতৃষ্ণায় তার মন প্রাণ ভরে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে ত্ব'য়ের মধ্যে এসে দাঁড়ালো একটা তুস্তর ব্যবধান।

গ্যাসের বাতি জ্বালিয়ে তার দিকে তাকালো। এলোমেলো চুলে ছায়াচ্ছন্ন অস্ফুট, অব্যক্ত বেদনা তার মনে কোন অনুকম্পা জাগাল না, বরং একটা তুর্মর অন্তর্দাহ ও ক্ষুণ্ণ আত্মাভিমান প্রদীপ্ত করে দিলো। তার চোখে পড়লো স্বামী যেন কি একটা অস্বস্তিবোধে নড়চে। ঠোঁটের ফাঁকে ত্ব' একবার জিব আনচে ; কখনও বা হাই তুলে মুখের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে।

ক্ষোভে, তুঃখে স্ত্রী অন্য দিকে তাকালো। একটু পরেই বিরক্তিস্বরে বলল, অনেক হয়েচে, আর না। কিছু করতে হলে এখন তারই উচিত।

চুলোর আঁচ প্রায় চলে গেচে। সে ভাবল, ইচ্ছে করেই স্বামী তা হতে দিয়েচে। কেন? এক মুঠো কয়লা দেওয়ার মত কী তার সামর্থ ছিল না। একটি শিকের সাহায্যে ছাঁই ঝেড়ে নিকটের ভাণ্ড হতে আবার কয়লা দিতে হলো, কারণ খুকীর চানের গরম জল তখনও হয়নি। সারাদিন খুকী বেশ শান্ত ছিল। ভিজে গামছা লাগাতেই সে খিটখিটে হয়ে উঠল। রেগে গিয়ে মা তাকে চুপ করাতে বৃথা চেষ্টা করলো। না পেরে আড় চোখে স্বামীর দিকে তাকালো কিন্তু তখনও তার মানসিক উত্তেজনার তীব্রতা কমে নি। ও ব্যাপারের পর স্বামীর দৃষ্টিতে সে মৌন, ব্যথাক্লিষ্ট, অনুতপ্ত যাতনার চিহ্ন দেখবে ভাবছিলো। সে স্বামীর শির সঞ্চালন বা মুখভঙ্গীতে দেখতে চেয়েছিলো তার পুঞ্জীভূত বেদনাতুর বিতৃষ্ণার অভিব্যক্তি ও প্রকাশপথ। শেষ পর্য্যন্ত তা হলো।

সে নড়ে চড়ে, পাশ ফিরে মেয়ে ও স্ত্রীর দিকে তাকালো। তার দৃষ্টি বেদনাব্যঞ্জক ও অভিযোগবিহীন। তৃপ্ত আত্মদর্পে সে স্বামীর দিকে ফিরে বললো, কী চাও?

স্বামী শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো।

সে আবার বলে উঠলো, এমন কোরে তাকিয়ে আছ কেন ?

কেমন কোরে ? তা বলো।

কেমন কোরে ? আমি আর খুকী না থাকলে তুমি যেভাবে...বল্‌তে বল্‌তে থেমে গেলো। একটু নিঃশ্বাস ফেলে আবার সুরু করলো, তুমি মনে করোনা তোমার এ ভাব আমার চোখে আর পড়ে নি। তুমি সব সময়ই অদ্ভুতভাবে ওদিকে তাকিয়ে থাকো। এ আমার কাছে একবারে অসহ্য।

থেমেই মেয়েকে আবার ভিজে গামছা দিয়ে রগড়াতে সুরু করলো। তার হৃদ-স্পন্দন অধিক দ্রুত ও সুস্পষ্ট হলো। সে আর উচ্ছ্বাস সম্বরণ করতে পারলো না। বহুদিনের নিরুদ্ধ হৃদয়াবেগ আজ তাকে পেয়ে বসলো।

শোনো, তোমাকে আজ ভালভাবে বলচি। মুখ ভার কোরে পেঁচার মত সারাদিন এমন নিঃশব্দে বসে থাকা আমি আর দেখতে পারচিনে। তুমি যদি চাকুরীর চিন্তায় এমন কোরতে তবু বুঝতুম, কিন্তু তা নয়, আমি বেশ জানি। তুমি ভাবচো আমি বোকা, তা, না। তবে জেনে রেখো, আমি এমন বোকা নই যে তুমি আমাকে এ বাড়ীর কেউ না ভাববে আর আমি তা মেনে চলবো। তার একটা সুরাহা না কোরে...

স্বামী বাধা দিয়ে বললো, পেগী, একটু থামো, অবুঝের মতো কী করচো, তোমার হয়েচে কী !

আমি অবুঝ, ভালই বলচো। আমার বোঝার উপর শাকের আঁটী চাপিয়ে কথাগুলি বেশ শুনাচ্চো। আজ একমাস যাবত আমি কী ভাবচি শোন। তুমি যতক্ষণ বাড়ী থাকো, আমার দিকে চোখ তুলে তাকানও দরকার মনে করনা। কথা বলতে গেলে হয় চুপ করে থাকো না হয় রাগে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমাকে একা ফেলে তুমি চলে যাও। তুমি কী মনে করো এরূপ বদ্ধগৃহে সপ্তাহে ২১ শিলিং পেয়ে প্রায় বিনা জামাকাপড়ে আমি থাকতে ভালবাসি ? শোন, এভাবে থাকা আমি চাই নে, বরং ঘৃণা করি। এ অবস্থায়ও আমি সব কিছুতে একটা পারিপাট্যের ভাব আনতে চেষ্টা করেছি ; কিন্তু এজন্য ত একটী ভাল কথাও কোন দিন শুনি নেই ,বলে সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

অনেক সময় ভেবেচি, তোমার সাথে আমার বিয়ে না হলেই ভাল হতো। তুমি আজকাল কেমন হয়ে গেচো। তুমি ও তোমার সুবিখ্যাত পুস্তকের দৌলতে আমাদের ভাগ্য ফিরবে, না ? চাহিদা নেই এমন বইয়ের জন্য পণ্ডশ্রম না করে যদি চাকুরীর খোঁজে কিছুটা সময় দিতে তবে এর ভিতর একটা কিছু বিহিত হতো, তোমার স্ত্রী কন্যা বেঁচে যেতো।

সে তার স্ত্রীর দিকে তাকালো। ক্ষণকাল চোখাচোখি অবস্থায় কাটিয়ে সে আবার নিঃশব্দে চুল্লীর দিকে মুখ ফিরালো।

স্ত্রী বিড়বিড় করে কী বল্‌তে লাগলো। উত্তেজনায় রাত্রিতে তার ঘুম হলো না। পাণ্ডুর প্রভাত। আবার জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি কাজের পালা। এ শেষ না হতেই বিছানায় হঠাৎ স্বামীর

নড়ে চড়ে ওঠার শব্দ পেলো। সে পিছনে তাকালো না। তার স্বামী তবে কী কথা বলার জন্য আসচে? সে উৎকর্ণ হয়ে প্রতীক্ষা কোরচে। ভাব করতে হলে স্বামীরই প্রথম আসা উচিত কারণ দোষ তারই। কিছুতেই সে প্রথম কথা বলবে না। অবশ্য সে কিছু রূঢ় কথা বলেচে, কিন্তু সত্য সত্যই কি সে তেমন মনে করে কিছু বলেছে? এজন্য শুধু দুঃখ প্রকাশই যথেষ্ট। কিন্তু কথা তারই প্রথম বলতে হবে। সে যদি তা না করে?

কেমন আছ বলে সে ঘরে ঢুকলো।

আনন্দে তার মন নেচে উঠলো। প্রতি সম্ভাষণ জানিয়ে স্বামী আরো কিছু বলবে ভেবে প্রতীক্ষা করলো।

স্বামী তার দিকে চেয়ে ভাবলো, তার কাছে গিয়ে একটু আদর করে ডাকলে হয় না? একটী দীর্ঘশ্বাসেই সব শেষ হলো।

সে তার চলার শব্দ পেল, কিন্তু তার দিকে নয়। আড়চোখে দেখলো স্বামী তোয়ালে ও শেইভিং সেট্ নিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকচে। মুহূর্তে তার চোখ জলে ভরে উঠলো।

তা বেশ, এ ভাবে চললে আমিও দেখে নেবো, তুমি কার সাথে পাল্লা দিচ্চো।

আজ এম্প্লয়মেণ্ট একচেঞ্জএ যাওয়ার কথা। ১২টার কিছু আগে গেলেই হয়, কিন্তু সে ১১ টারমধ্যে বেরিয়ে গেলো। দুপুরের পর খেতে বাড়ী এলো। বিকালে কোথাও গেলো না। বই হাতে নির্বাক, নিশ্চলের মত বসে রইলো।

পেগী তাকে একবার উপেক্ষা করে ঘরের মধ্যে আপন মনে গান গেয়ে কাজ করতে লাগলো। স্বামীকে বুঝতে দিল সেও ইচ্ছে করলে পুতুলের মত নির্বাক হয়ে থাকতে পারে। তার ই বা এত গরজ পড়েছে কিসের?

সাড়ে পাঁচটায় দুজনে চা খেলো। ঘণ্টা দেড়েক পরই আবার স্বামী বাইরে চলে গেলো।

রাস্তায় বাতি জ্বলে উঠেচে। সে পথে থাকতেই সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো। দোকান-পাট আলোমণ্ডলে প্রদীপ্ত। এক গাদা লোক নিয়ে কর্কর শব্দে ট্রামগাড়ী চলচে। আলোকোজ্জ্বল অভ্যন্তর হতে উৎসুক-দৃষ্টি বাইরে জনতার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্চে। এক অদ্ভুত জনতার সমাবেশ। সুচর্চিত, সুগন্ধিত প্রগল্‌ভা তরুণীগণ যাচ্ছে। লম্বা হেট্ মাথায়, ফ্যাশন দুরস্ত খেলো পোষাকে যুবকের দল ঘুরচে। দৃষ্টি নিঃসঙ্কোচ ও দ্বিধাহীন, ওষ্ঠ অভ্যস্ত সিগারেটের ভারে বিলম্বিত। অশোভন পোষাকপরিহিত-স্ফীতোদর ইহুদী কৃশপদা, কুঞ্চিত ও পিঙ্গলকেশা স্বজাতীয়া তরুণীদের সাথে নিয়ে চলচে। পুলিশম্যান, ফুলওয়ালা, মলিন পোষ্টার আটা পত্রিকাবিক্রেতা, আরো কত হরেক রকমের লোক ঠেলাঠেলি করে রাস্তায় চলচে, হাসচে, কথা বলচে আবার গম্ভীর হচ্চে। মনের গহণলোক হতে আবার প্রত্যেকে প্রত্যেককে দেখচে। একে অন্যের সম্বন্ধে গোপন কথা ভাবচে। পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান কত গভীর ও চিরন্তন, কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এ দুস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও সবাই সবার উপর একান্ত নির্ভরশীল। ব্যক্তিজীবনে নিদারুণ নিঃসঙ্গতাবোধ, এ

নির্মম সত্য অস্বীকার করতে আবার সবাই এক। তার কাছে আজ সবই শূন্য ও সুদূর। সে বেশ বুঝতে ছিল জনারণ্যের মাঝে তার এ ঐকাকীবোধ নিঃসঙ্গতা নয় নিরাসক্তি।...সে চলছে।

লোকজন, কথাবার্তা, আলোকোজ্বল বাতায়ন ও নানা অলিগলির পাশ দিয়ে সে 'করিয়ার' অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালো। বোর্ডে সর্বসাধারণের জন্য একটি খবরের কাগজ লাগানো আছে। একটু ঝুঁকে সে ক্ষীণালোকে কর্মখালি স্তম্ভে চোখ বুলাতে লাগলো। একাউনটেন্ট, একটু উঁচু ধরণের কাজকর্মের জন্য এজেন্ট; ছোট ছেলে ইত্যাদি চাই। সর্বশেষে আছে ষ্টকব্রকার অফিসের জন্য একজন কেরাণী দরকার। পদপ্রার্থীর বুককিপিং, চালান ও বাজারের কেনা বেচা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বিস্তারিত লিখে আবেদন করুন।

তার পকেট হতে একটা এন্‌ভেলপ টেনে এ খবরটি নোট করে নিল। বেকার অবস্থায় উপযুক্তা ও অভিজ্ঞতানুযায়ী এমন কাজ আর সে বিজ্ঞাপনে দেখে নি। এ সত্ত্বেও তার মনে কোন আনন্দ বা আশার সঞ্চার হলো না। সংসার, জীবন সবকিছুর মধ্যে তার এসেছে একটা বিরাট বৈরাগ্য।

আত্মহীন অনাসক্তি দিয়ে সে যতই ভাবচে ততই আশ্চর্য হচ্চে। হাতের কালো চুল, মুঠোর মধ্যে পেন্সিল এবং তার লেখা সব কিছুই তার নিকট বিস্ময়জনক; আর যা কিছু লিখচে তাও অর্থহীন এবং অসংলগ্ন।

এভাবে আর চলচে না, না কিছুতেই না, বলে সে চোখ বুজে মাথা নাড়তে লাগলো।

আবার বাড়ীর পথে। সারা রাস্তা সে বিশ্লিষ্টভাবে নিজেকে যতই দেখচে ততই ভাবচে; বিস্মিত হচ্চে।

আমি চলচি, সিঁড়ি দিয়ে উঠচি, দরজা খুলচি, তালায় চাবি দিচ্চি, আবার কোট, হেট রাখছি, হাঁ, তাইত। দরজা খুলে সে ঘরে ঢুকলো। গ্যাসের বাতি জ্বলচে; উত্তপ্ত চুল্লীর পাশে বসে পেগী সাপ্তাহিক কাগজ পড়চে; তার কোলের উপর খুকী লোলা কাঠি চুষচে।

সে ঘরে ঢুকলো, একটু তাকিয়ে পেগী আবার নিঃশব্দে গল্প পড়ায় মন দিলো।

হা, এ' ই আমার স্ত্রী কন্যা।...তারপর একটি দীর্ঘশ্বাস। সে নিজেই বললো, খবরের কাগজে একটি কর্ম্মখালি দেখলুম।

তাই নাকি বলে পেগী একটু নিরুৎসাহের ভান করলো।

হা ষ্টকব্রকার আফিসে একজন কেরাণী।

তাকিয়ে তাড়াতাড়ি সে কি বলবে মনে হলো, কিন্তু পরক্ষণেই ইচ্ছে দমন করে 'হুঁ' বলে আবার পড়ায় মন দিলো।

এ বছর বহুবার যা লিখে আসচে তাই আবার নূতন করে লিখতে সে কালিকলম নিয়ে

বসলো। অনেকদিন বেকার থেকে বহু লোক কাতর মিনতি করে যা তা লেখে। 'ভগবান প্রসন্ন হবে, আমাকে একবার সুযোগ দিয়ে দেখুন, একমাস বিনা বেতনে খাটবো, কাজ না দিলে আত্মহত্যা করবো, ইত্যাদি।

কিন্তু সে শান্ত ও স্পষ্টভাবে যন্ত্রবৎ অনেকদিনের অভ্যস্ত কথা লিখে গেলো। দরখাস্ত দিয়ে বাধিত হয়েচে। নির্বাচনের জন্য দর্শনপ্রার্থী ইত্যাদি।

কিন্তু এ সত্বেও স্ত্রী কন্যা, রক্তমাংসের দেহ, লেখারত হাত সব কিছুতে সে নিস্পৃহ ও সুদূর। এর পূর্বে অনেক সময় তার জড় ও জীবজগতের বাস্তবতা হতে আত্ম-বিচ্ছেদ ও আত্মাপসরণ হয়েচে; অদ্ভুত ও অজ্ঞেয়ের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে; কিন্তু এবারকার মত তার এমন নির্বিকল্প বৈরাগ্য আর কখনও দেখা যায় নি। কাজকর্ম, চাকুরীরর জন্য দরখাস্ত লেখা ইত্যাদি তার নিকট একান্ত অর্থহীন বলে মনে হলো।

দরখাস্তটী এনভেলেপে পুরে সে উঠলো। একবার স্ত্রীর দিকে তাকালো। সে বুঝলো স্বামী তার দিকে তাকিয়েছে, তার দৃষ্টির পরশও অনুভব করলো কিন্তু ফিরে তাকালো না। প্রতীক্ষায় বক্ষ স্পন্দন দ্রুত হতে লাগলো। স্বামী কোঠার বাইরে গেলো। গেট খোলা ও বন্ধ হওয়ার শব্দ হলো। স্ত্রী শূন্য, ব্যথিত দৃষ্টিতে চুলোর দিকে তাকিয়ে পড়তে লাগলো।

সে আবার 'করিয়ার' অফিসের প্রবেশপথে আসলো। বাক্‌সে দরখাস্ত ফেললো। রাস্তার ওপাশে ছায়া ঘন অন্ধকারে একজন বেহালার 'লণ্ডনভেরী' সুর বাজাচ্ছিল। এদিক ওদিক চেয়ে সে একটী পার্কে ঢুকলো। রাত্রি শীতল ও অনার্দ্র। অলিগলিতে অন্ধকার আরো গভীর। সেই ঘনান্ধকার হতে পীড়ন-পুলকিতা তরুণীর হাস্যোচ্ছাস শুনা যাচ্ছিল! দু'টি তরুণী তার পাশ কাটিয়ে চলে গেলো। চোখে বিদ্যুৎ-প্রভ ইঙ্গিত। সে তাদের এড়িয়ে যাচ্চে দেখে বিদ্রূপের হাসিতে তাকে বিদ্ধ করলো। সেই হাস্যোচ্ছাস, লেলিহান দৃষ্টি, তপ্ত-আবেগোচ্ছল দেহ-বিলায়ন—এগুলির উদ্দেশ্য কী? এ ভিন্ন মানব জীবনের সদসৎ বৃত্তিগুলি—বন্ধুত্ব, বিদ্বেষ, সংগ্রাম ও লালসা, বিস্তার ও বিনাশ, সুন্দর অসুন্দর—এ সবই বা কেন? এদের পিছনে নিশ্চয়ই কোন সত্তা বা উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্যের পর উদ্দেশ্য, আত্মার পর পরমাত্মা, তারপর সেই অনাদি অনন্ত আঁধার। সেই নৈশচারিতার মধ্যে সে দেখলো তার দ্বৈত-অহম্—দ্রষ্টা ও দৃষ্ট, ডনাল্ড য়ুয়িস্হার্ট আর ক্রাইষ্ট্। এক মহা বিস্ময়! ভাবতে গেলেও পাগল হতে হয়। এই কি সে 'অহম্'!

সাড়ে দশটা বেজে গেচে। সে ঘরের দরজা খুললো। গ্যাসের বাতি কমিয়ে রাখা হয়েচে। পেগী ও খুকী বিছানায় ঘুমিয়ে আছে। টেবিলে কিছু ককোর গুড়ো, দুধ, চিনি এবং প্লেটে এক টুকরো রুটী, কিছু মাখন আছে। চুল্লীর আগুন প্রায় নিভে গেচে। কেট্‌লী হতে তখনও কুণ্ডলের মত বাষ্পোদ্‌গম্ হচ্চে। সে কাপে জল ঢাললো। বসে রুটি ও ককো খেতে লাগলো। সে আর গ্যাস-বাতি উজ্বল করে দেয়নি। ঘর নিষ্প্রভ ও নিরানন্দ। রুটি চিবাতে চিবাতে সে

নিদ্রিতা স্ত্রীর মাথার পশ্চাৎভাগ, চাদরে ঢাকা উন্নত কটিদেশ দেখছিলো। শয্যার পাশেই একটী চেয়ারে ইতস্তত স্তূপ দেওয়া স্কার্ট, ব্লাউস্, আণ্ডারওয়ের ও একটী ঝুলায়মান মোজা। তার যেন মনে হলো ওদিকে সে তাকিয়ে আছে। অব্যক্ত, বেদনা-বিদ্ধ তার দৃষ্টি।

আহারান্তে পোষাক ছেড়ে পাজামা পরলো। এক কোণে তার জন্য তক্তপোষ ও কম্বল পাতা ভিন্ন বিছানা ছিল। আলো নিভিয়ে, শুয়ে সে চোখ বুজে রইলো, কিন্তু ঘুম আসলো না। তার মন সুদূর আঁধারে কী খুঁজে বেড়াচ্চে। সেই ঘনঘোর অন্ধকার হতে নিজকে বিচ্ছিন্ন করে সুখদায়ক কিছু ভাবতে বা করতে চে'লো কিন্তু সবই শূন্য, অসার ও নিস্পৃহ। সে চোখ খুললো; চুল্লিতে তখনও দাহশিখা ছিলো। চারিদিকের ভীতি-বিহ্বলতা হতে বিমুক্ত হওয়ার জন্য সে একান্ত একাগ্রতার সহিত প্রাণপণে ক্ষীণ আলোশিখার দিকে তাকালো। কিন্তু সে আলো রেখা বিলীন হয়ে গেলো সেই মহাগর্ভে যেখানে গৃহ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবলুপ্ত করে, মহা নির্জন অহম্-পুরুষকে ঘিরে পূর্ণভাবে বিরাজ করচে এক ঘনঘোর বিরাট আঁধার—কালাতীত, অসীম, অজ্ঞেয় আঁধার। সেই অনন্ত আঁধার তার উপর টেনে দিলো এক তরঙ্গচঞ্চল নিষ্করুণ বারিরাশির একটানা অপসারণ। গুটি সুটি হয়ে সে বিছানায় কাঁপতে লাগলো। দৃষ্টি উদাস, চিন্তা বিবশ।

অতি কষ্টে সে উচ্চারণ করলো, হা ভগবান, আমি কোথায়, আমার মধ্যে? কিন্তু এতেও তার কোন শান্তি হলো না।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে কম্পিতপদে স্ত্রীকে গিয়ে ডাকলো, পেগী, পেগী। শয্যার পাশে নতজানু হয়ে তাকে ধরে ক্ষীণ কণ্ঠে বললো, আমার ভয় করচে, পেগী আমার সাথে কথা বলো, আমা'কে রক্ষা করো।

স্ত্রী ঘুমের চোখে তাকালো। আঃ! এ সব কী করছো ছেলেমানসি। খুকী উঠে যাবে যে। সে রুদ্ধকণ্ঠে বললো, আমার ভীষণ ভয় করচে। আমি এ কী দেখচি?

অন্ধকারে স্বামীর আতঙ্কবিহ্বল মূর্তির দিকে একটু তাকিয়ে সে কর্কশ ও চকিতস্বরে বললো, আমার মাথা, তোমার হয়েচে কী?

পেগী, ভীষণ আঁধার, ভীষণ আঁধার আমায় ঘিরে ফেলচে।

খুকীর ক্ষীণ ও, আ শব্দ ক্রমে কান্নার পর্দায় উঠলো।

রুষ্টভাবে স্ত্রী বললো, ঠিক যা বলেচি, তাই করেচ। এখন খুসী হয়েচ ত?

ভয়ে তার বুক ধড়ফড় করছিল; কারণ আজ কিছুদিন হলো স্বামীর ব্যবহার তার নিকট অত্যন্ত অদ্ভুত মনে হচ্ছিলো। তোমার কী হয়েচে, খুলে বলো না।

কোন জবাব এলো না। নিজের বুকের উপর মুখ রেখে নিঃশব্দে, নতশির ও নতজানু হয়ে শয্যার পাশে সে বসে রইলো। নিঃশ্বাসের স্পন্দন বেগ ক্রমেই দ্রুত হচ্ছিল।

স্ত্রী তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, তোমার কী হয়েচে খুলে বলো না?

সে উঠে দাঁড়ালো। ক্ষীণালোকে স্ত্রী তাকে দেখলো।

তাই ত, আমার অন্যায় হয়েচে, পেগী। আমি বেশ ভাল আছি। তার কথাগুলি অত্যন্ত ক্ষীণ ও অস্ফুট।

সে চলে গেলো। টেবিলে ধাক্কা লেগে শব্দ হলো। তার পর সব চুপ।

সে বুঝলো স্বামী বিছানায় শু'য়ে পড়েছে। গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করায় খুকী শান্ত হলো। পেগীও অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ভাবলো, তাকে বোধ হয় বোবায় ধরেছিলো। শয্যার পাশে নতজানু হয়ে স্বামীর করুণ মিনতিপূর্ণ কথা মনে করে ভাবলো, ও একবারেই ছেলেমানুষ। দুর্বোধ্য, দুঃখতপ্ত বয়স্কভাব হতে আবার শিশুর নির্ভরশীলতায় স্বামীকে পেয়ে সে একটু আত্মতৃপ্তি লাভ করলো। মনোমালিন্য দূর করার প্রথম প্রয়াস স্বামীর তরফ হতে হয়েচে এবং তার কোন অন্যায় হয়নি মনে আসতেই স্বামীর জন্য তার একটা প্রবল অনুকম্পা বোধ জেগে উঠলো। অবিলম্বে তার নিকট যেয়ে, তাকে জড়িয়ে ধরে, চুম্বন ও তপ্ত দেহপরশে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য তার মন চঞ্চল হয়ে উঠলো।

সে চুপি চুপি ডাকলো, ডন, তুমি কি জেগে আছ? ডন?

কোন জবাব পেলো না। সে যেখানে আছে তা চির-অবগুণ্ঠনে ঢাকা।

আঃ, ও দেখচি ঘুমুচ্চে।

স্ত্রী আবার শু'য়ে পড়লো। একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে গরম কম্বলটী নিজের গায়ে টেনে দিলো।

রবার্ট নিকলসনের 'Darkness' হতে।

জাপানে নারী জাগরণ

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

গত অর্দ্ধ শতাব্দী কালের মধ্যে জাপান যান্ত্রিক সভ্যতায় অপ্রত্যাশিতরূপে অগ্রসর হইলেও তাহার নারী সমাজ এতদিন পশ্চাতে পড়িয়াই ছিল। সমাজ জীবনে তাহাদের কোন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না এবং রাষ্ট্রীয় অধিকার হইতেও তাহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে দূরে সরাইয়া রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে চীনে দীর্ঘকাল যাবৎ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে লিপ্ত থাকায় জাপানের আভ্যন্তরীণ জীবনে যে সকল অনিবার্য্য পরিবর্ত্তন আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, জাপানী নারী সমাজ তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে পশ্চাদপদ হইতেছে না। সমাজ জীবনে এতদিন তাহারা যে কঠোর বন্ধনের মধ্যে ছিল, আজ তাহা ছিন্ন করিবার জন্য তাহারা বদ্ধপরিকর। এই নারী জাগরণের ফলে জাপানের সমাজ জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা দেখা দিয়াছে। এই বিপ্লবকে ঠেকাইবার সাধ্য জাপানে আজ কাহারও নাই। কেন নাই, বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

লিফ্‌ট চালাইবার কাজে জাপানী মেয়ে

বিশাল চীনকে গ্রাস করিতে উদ্যত হওয়ায় জাপানকে বিরাট সৈন্যবাহিনী চীনে পাঠাইতে হইয়াছে, তাহার ফলে জাপানে পুরুষের সংখ্যা অসম্ভব রকম হ্রাস পাইয়াছে। যুদ্ধ কতকাল চলিবে তাহার কোন ইয়ত্তা নাই। জাপান সর্ব্বশক্তি পণ করিয়া এই যুদ্ধে নামিয়াছে, কাজেই মাঝপথে সে যুদ্ধ ছাড়িয়া দিতে পারে না : তাহা করিতে গেলে শক্তি অপচয়ের দরুণ জাপানে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, তাহাকে ঠেকাইবার সাধ্য জাপানের বর্ত্তমান শাসকদের থাকিবে না। কাজেই জাপান শেষ চেষ্টা না করিয়া বর্ত্তমান যুদ্ধ হইতে বিরত হইবে বলিয়া মনে হয় না। এই অবস্থায় দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইতে হইলে জাপানকে নিত্য নূতন সৈন্যদল সৃষ্টি করিতে হইবে। যুদ্ধে যে লোকক্ষয় হয় তাহা পূরণ এবং রণক্লান্ত সৈন্যদিগকে বিশ্রামের সুযোগ দানের জন্য নিত্য নূতন সৈন্যদল প্রয়োজন হয়। এই প্রয়োজন মিটাইবার জন্য আর কিছুদিন পর জাপানে সাবালক ও কর্ম্মক্ষম পুরুষের সংখ্যা অতি সামান্যই থাকিবে।
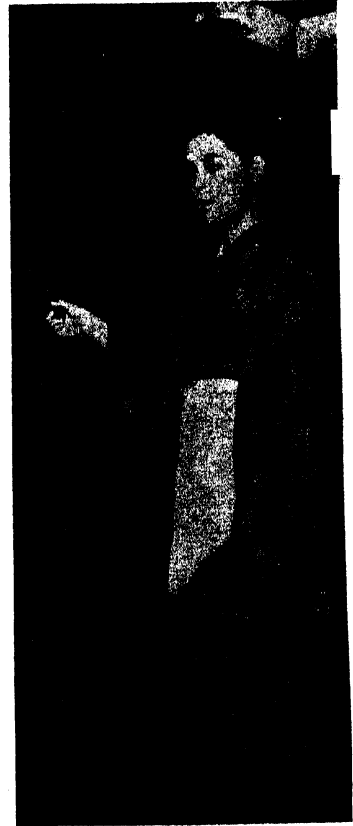
পুরুষ যদি এইভাবে যুদ্ধে যায় তবে তাহার কাজ চালাইবে কে? একজনকে নিশ্চয়ই চালাইতে হইবে। তাই আজ পুরুষের কাজ চালাইবার জন্য জাপানে প্রয়োজন হইয়াছে নারীর। জাপানী মেয়েরা আজ হোটেলে পরিচারকের কাজ করিতেছে, 'লিফ্‌ট'এ লোক উঠাইতেছে নামাইতেছে, বাসে কণ্ডাক্টরী করিতেছে, দোকানে জিনিষ বেচিতেছে, অফিসে কেরানীর কাজ করিতেছে। অর্থোপার্জ্জনের জন্য কাজ করিতে জাপানী মেয়েদের আজ আর কোন লজ্জা নাই। কিছুকাল পূর্ব্বেও জাপানের এই অবস্থা ছিল না। কাজ করাতো দূরের কথা, সম্ভ্রান্ত ঘরের জাপানী মহিলারা কদাচিৎ রাস্তায় বাহির হইতেন। অন্তঃপুরেই ছিল তাদের স্থান। কিন্তু চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে সেই অবস্থা একদম বদলাইয়া গিয়াছে।
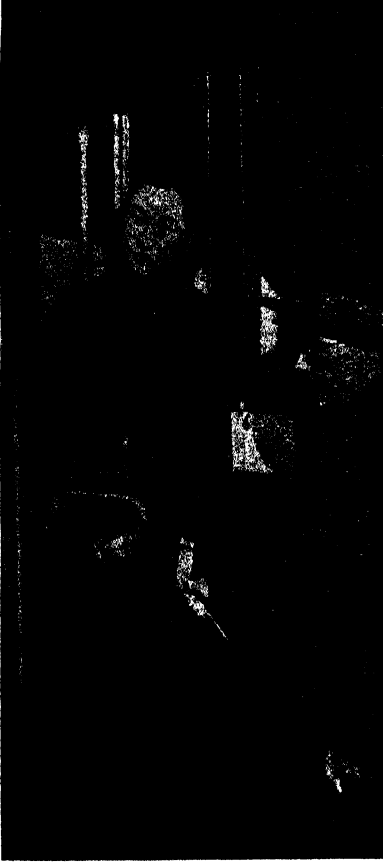
বাস কণ্ডাক্টারের কাজে জাপানী মেয়ে

বর্ত্তমান অবস্থার সহিত তুলনা করিতে হইলে জাপানী নারীদের পূর্ব্বেকার অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। খুব বেশী দিনের কথা নয়—যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্তও টোকিও এবং বড় বড় সহরগুলিতে জাপানী নারীরা কোন চাকরী পাইত না। অফিসে চাকরি করা ছিল মর্য্যাদা হানিকর। গৃহস্থালীর কাজেই তাহাদের দিন অতিবাহিত করিতে হইত। শৈশব ও কৈশোরে তাহারা পিতার অধীন, যৌবনে স্বামী ও শ্বশুর বাড়ীর লোকের অধীন এবং বার্দ্ধক্যে সন্তানের অধীন। স্বাধীন জীবন তাহাদের কোন সময়েই ছিল না। ভারতবর্ষের মতই জাপানেও বিবাহ ব্যাপারে মেয়েদের মতামত প্রকাশের কোন অধিকার ছিল না। পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন যাহার সহিত বিবাহ দিতেন, তাহাকেই স্বামীত্বে বরণ করিয়া মেয়েকে সুখী হইতে হইতে। বিবাহ ব্যাপারটাকে তাহাদের নিয়তির বিধান বলিয়াই স্বীকার করিয়া লইতে হইত, অভিভাবকের উপর তাহাদের কোন কথা বলিবার উপায় ছিল না। স্বামীর সহিত বনিবনাও হউক বা না হউক স্বামীর ঘর তাহাকে করিতেই হইত। স্বামী অপেক্ষা স্বামীর ঘরকন্নার সঙ্গেই ছিল তাহার অধিকতর পরিচয়।

বিবাহের পরই নববধূকে শ্বশুরবাড়ী আসিয়া গৃহদেবতার নিকট নতজানু হইয়া পূর্ব্বপুরুষদের আত্মার উদ্দেশ্যে বলিতে হইত যে, সে আসিয়া তাহাদেরই পরিবারের একজন হইয়াছে; কায়মনোবাক্যে সে তাহার কর্ত্তব্য পালন করিবে। শ্বশুড়বাড়ীতে নববধূর নিজস্ব কোন সত্ত্বা ছিল না। সংসারের কর্ত্তব্য পালনই ছিল তাহার মুখ্য, পত্নীর কর্ত্তব্য পালন ছিল গৌণ। স্বামী মনোমত না হইলে কিছু বলিবার উপায় ছিল না। স্বামী যদি স্ত্রীকে ভাল না বাসিত, সেক্ষেত্রেও স্ত্রীর নির্ব্বিবাদে স্বামীর ঘর করিয়া যাওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। অদৃষ্টের বিড়ম্বনা বলিয়াই নীরবে তাহাকে সকল সহ্য করিয়া যাইতে হইত। আবার এমন যদি হইত, স্ত্রীকে স্বামীর পছন্দ হইল না, সেক্ষেত্রেও স্ত্রীকে ত্যাগ করা চলিত না। তাহাকেই ঘরের কর্ত্রী করিয়া রাখা হইত; কিন্তু তাই বলিয়া অন্য নারীর সহিত প্রণয়াসক্ত হইতে স্বামীর কোনরূপ আটকাইত না।

হোটেলে আগন্তুকের মাল তুলিবার কাজে জাপানী মেয়ে

তারপর জাপানী মেয়েদের জন্য বাধ্যতামূলক শিক্ষারও কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাহা একান্তই নিষ্প্রয়োজন বলিয়া মনে হইত। সেলাই, সূতা কাটা, রান্নাবান্নার কাজ—এইসব জানিলেই মেয়েদের যথেষ্ট। লেখাপড়া শিখিয়া মেয়েদের কি হইবে?—এই ছিল জাপানের ধারণা। সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েরা ফুল দিয়া ঘর সাজাইত, চা তৈরী করিত, কদাচিৎ কেহ দুই একটি কবিতাও লিখিত। এই গণ্ডীর বাহিরে কাহারও যাইবার সাধ্য ছিল না।

দশ পনর বৎসর পূর্ব্বেও জাপানী মেয়েরা স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা মুখে পর্য্যন্ত আনিতে পারিত না। তাহাদের আবার স্বাধীনতা কি? ঘরকন্নাইতো তাহাদের জীবনের প্রধান কাজ। উহার বাহিরে আবার তাহাদের কিসের প্রয়োজন? জাপানী মেয়েদের মধ্যেও এই ধারণাই বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল; স্বামীর সংসারের বাহিরে তাহাদের কিছু করণীয় আছে ইহা তাহারা কল্পনায়ও আনিতে পারিত না। কুড়ি বৎসর বয়সেও কোন মেয়ের বিবাহ দিতে না পারিলে বাপমায়ের তালু ফাটিয়া আগুন বাহির হইত। স্ত্রীশিক্ষা নারী জীবনের প্রতিকূল বলিয়াই জাপানের এতকাল ধারণা ছিল। শিক্ষিতা মেয়েকে বিবাহ করিতে জাপানী ছেলেরা রীতিমত ইতস্তত করিত।
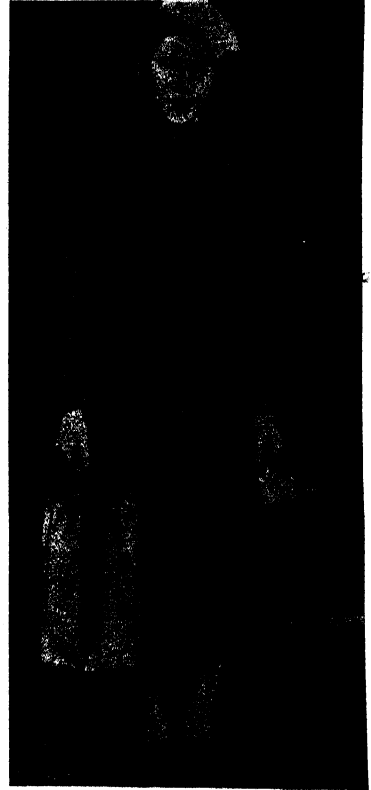
নারীত্বের এতবড় অবমাননা জাপানী মেয়েরা আর বেশীদিন সহ্য করিতে পারিল না। চারিদিকের কঠোর বন্ধন তাহারা ছিন্ন করিতে চাহিল। ব্যারনেস ইশিমোটো, কাউণ্টেস ইসুগারু এবং মার্কিওনেস শো-এর মত বিশিষ্টা নেত্রী তাহাদের মধ্যে দেখা দিলেন। তাঁহারা জাপানের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ১৯১৯ সালে আন্তর্জ্জাতিক শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে জাপানে একটি মহিলা সমিতি গঠিত হইল। চা-পার্টি এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানে সমবেত হইয়া মেয়েরা স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন।

১৯২০ সালে ব্যারনেস ইশিমোটো মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন এবং সেখানে তিনি নিউ ইয়র্ক সহরে থাকিয়া ষ্টেনোগ্রাফি শিখিলেন। জাপানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া খৃষ্টান মহিলা সমিতির তরফে তিনি কিছুকাল কাজ করিলেন এবং পরে টোকিও সহরে একটি লেস্‌ফিতার দোকান খুলিলেন। ইহাতে সমগ্র টোকিও সহরে একটা চাঞ্চল্য পড়িয়া গেল। ভদ্র ঘরের একজন মহিলা দোকান খুলিয়াছেন—একি সর্ব্বনাশ! জাপানীদের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। কিন্তু ব্যারনেস ইশিমোটোর উদ্দেশ্য সফল হইল; ক্রমশঃ অভিজাত সম্প্রদায়ের মেয়েরা আসিয়া দোকান খুলিতে লাগিলেন।
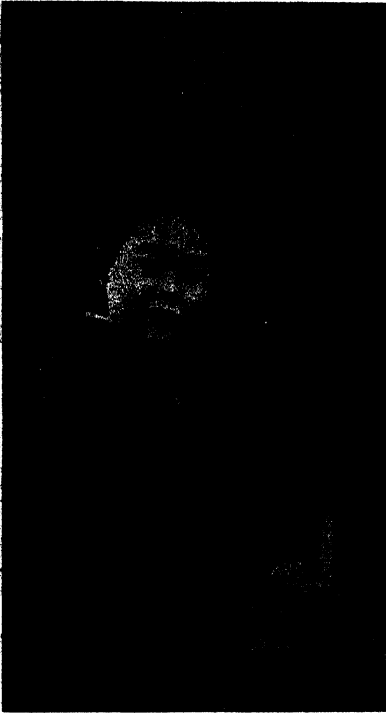
গ্যাস সরবরাহের কাজে জাপানী মেয়ে

এই সময় হইতেই জাপানে স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হইলেও এতদিন আন্দোলন সফল করিয়া তুলিবার মত কোন সুযোগ তাহাদের আসে নাই। বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধের ফলে জাপানের নারী সমাজ আজ সেই সুযোগ লাভ করিয়াছে। জাপানের পুরুষসমাজ আজ ঠেকিয়া বুঝিতে শিখিয়াছে যে, জাতীয় জীবনে মেয়েদের প্রয়োজন কতখানি বেশী। স্বেচ্ছায় তাহারা এতদিন যাহা দিতে চাহে নাই, দায়ে পড়িয়া আজ তাহাদিগকে তাহা স্বীকার করিয়া লইতে হইতেছে।

চীনে জাপ-অভিযানের সুরু হইতেই জাপান হইতে দলে দলে পুরুষ যুদ্ধে যাইতে লাগিল। চাকরি খালি হইল, তাহাদের শূন্য স্থান পূরণ করিবার কেহ নাই। এই সময় জাপানী মেয়েরা অগ্রসর হইল; পুরুষের কাজ আসিয়া তাহারা গ্রহণ করিল। এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে তাহারা

সমর্থন করে বলিয়া যে আগাইয়া আসিল এমন নয়। যুদ্ধকে তাহারা সমর্থন করে না; কিন্তু বন্ধন মুক্তির জন্য জাপানের নারী সমাজ যে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল, এইবার দেখিল সেই সুযোগ তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত। তাই এই সুবর্ণ সুযোগ তাহারা ছাড়িয়া দিতে পারিল না; মুক্তির আহ্বানে তাহারা অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। নাগরিক জীবনে নিত্য নৈমিত্তিক কাজ চালাইবার পক্ষে জাপানী মেয়েরা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল।

চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর জাপানে চাকরিক্ষেত্রে নারীর সংখ্যা অতি দ্রুতগতিতে বাড়িয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি হিসাবে দেখা গিয়াছে যে, জাপানের মোট ৩ কোটী ৪৫ লক্ষ নারীর মধ্যে বর্ত্তমানে ৩০ লক্ষাধিক নারী বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকিয়া জীবিকার্জ্জন করিতেছে। মাছের ব্যবসায়ে ৪০ হাজার, খনির কাজে ১ লক্ষ, কলকারখানায় ১৫ লক্ষ ৮০ হাজার, ব্যবসা বাণিজ্যে ১০ লক্ষ, যানবাহন বিভাগে ৬০ হাজার, সরকারী চাকরি এবং স্বাধীন জীবিকার্জ্জনে ৩ লক্ষ এবং অন্যান্য কাজে ১ লক্ষ ৯০ হাজার নারী নিযুক্ত রহিয়াছে। আজ এই অবস্থা; কিন্তু ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও জাপানী মেয়েরা কারখানায় কাজ করিতে যাইতে লজ্জায় মরিয়া যাইত। পাছে কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে কারখানায় যাইবার সময় জলখাবারের কৌটাটী তাহারা অতি গোপনে বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকিয়া লইয়া যাইত। রাস্তায় দেখিয়া কাহারও বুঝিবার উপায় ছিল না যে, তাহারা কারখানায় কাজ করিতে যাইতেছে।

ঝাড়ুদারের কাজে জাপানী মেয়ে

জাপানের সামাজিক জীবনে এই পরিবর্ত্তন আসায় সেখানকার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারগুলির খুবই সুবিধা হইয়াছে। যাহার একাধিক কন্যা আছে, তাহার ত কোন কথাই নাই। সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আজ আর তাহাকে বেশী ভাবিতে হয় না। অর্থোপার্জ্জনের দিকে জাপানী মেয়েদের একটা প্রবল ঝোঁক দেখা দিয়াছে। পিতামাতাকে সাহায্য করিয়াও জাপানী কুমারীরা এখন বিবাহের জন্য বেশ দু'পয়সা সঞ্চয় করিতে সক্ষম হয়।

মেয়েদের সম্বন্ধে জাপানের দৃষ্টিভঙ্গী আজ অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাদের এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে এখন আর কেহ ঘৃণার চক্ষে দেখে না। জাপানী ছেলেরা বরঞ্চ আজকাল স্বাবলম্বী মেয়েকেই অধিক পছন্দ করে। কোন অফিসে আজ যে মেয়ে সেক্রেটারী, মাসে একশত ইয়েন (জাপানী মুদ্রা) রোজগার করে অথবা কোন দোকানে "সেলস্ গার্ল" থাকিয়া যে

মেয়ে আজ মাসিক ৩০ ইয়েন বেতন পায়, সে মেয়েরই এখন জাপানে আদর বেশী। সমাজে সে দস্তুরমত সম্মান পায়।

বেশী সময় খাটিয়া কম বেতন পাইলেও জাপানী মেয়েরা আজ অসন্তুষ্ট নয়। ইহার মধ্য দিয়া তাহারা যে মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে, তাহার মূল্য তাহাদের নিকট ঢের বেশী। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পাইয়া জাপানী মেয়েরা সত্যই যেন নবজীবন লাভ করিয়াছে।

জাপানের স্ত্রী-স্বাধীনতা আন্দোলন আজও চরমলক্ষ্যে উপনীত হইতে পারে নাই। রাজনৈতিক ব্যাপারে এখনও তাহাদের মতামত প্রকাশের কোন অধিকার নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার আজও তাহাদের জন্য উন্মুক্ত হয় নাই এবং রাত্রিতে এখনও তাহারা অবাধে একাকী বাহির হইতে পারেনা। সুযোগ পাইলেই জাপানী পুরুষেরা মেয়েদের উপর আধিপত্য খাটাইতে কিছুমাত্র কসুর করে না।

তারপর ভোটাধিকার লাভের জন্য জাপানী নারী মহলে যে ক্রমবর্দ্ধমান আন্দোলন চলিয়াছে, জাপানের রাষ্ট্রনায়কগণ তাহাও খুব প্রীতির চক্ষে দেখেন না! তাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন, অদূর ভবিষ্যতেই নারীমহল হইতে এই দাবী আসিবে যে, রাজনৈতিক ব্যাপারে তাহাদের মতামতও শুনিতে হইবে। এখন তাহাদের ভোটাধিকার পাইতে যে কিছুদিন সময় লাগে এইমাত্র। একবার সেই অধিকার পাইলেই তাহারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে যোগ দিতে এবং এমনও হইতে পারে যে, তাহারা জাপানের বর্ত্তমান সামরিক শাসন ব্যবস্থার পঞ্চত্ব ঘটাইবে। তাই অর্থনৈতিক প্রয়োজনে সামাজিক শৃঙ্খল অতি সহজে খসিয়া পড়িলেও রাজনৈতিক অধিকার লাভ করিতে জাপানী নারীদের বেশ কিছুটা বেগ পাইতেই হইবে। কিন্তু স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা যখন জাগে, তখন তাহাকে রোধ করা কঠিন। মুক্তির আস্বাদ যখন জাপানী নারীরা খানিকটা পাইয়াছে, তখন তাহাদের চরম লক্ষ্য রাজনৈতিক অধিকার লাভ না করিয়াও তাহারা কিছুতেই নিরস্ত হইবে না।

চীন-জাপান যুদ্ধের ভবিষ্যৎ আজ জাপানের নারীদের উপর অনেকখানি নির্ভর করিতেছে। তাহারা রাজনৈতিক অধিকার পাইলে কি হয় বলা যায় না। হয়ত এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ হইয়াও যাইতে পারে, কারণ জাপানের নারীসমাজ যুদ্ধের ঘোর বিরোধী।

প্রলয় ঈশান

বিভূতিভূষণ গঙ্গোপাধ্যায়

নিখিল হিয়ার মহুয়া দলিয়া চপল-চরণ-ঘায়
কে তুমি ভরিছ মাটির পাত্র বেদনার মদিরায় ?
তা'রি সে অধীর রক্তিম-রাগে
ঈশান-নয়নে বিদ্যুৎ জাগে,
সুখ-বুদ্বুদ স্বপনের মত ফুটে, আর টুটে যায় ;
নাচ মহাকাল !—প্রলয়-মাতাল—প্রতি যুগ-সন্ধ্যায় ।

নাচ ভৈরব, 'ডিমি ডিমি' তব ডমরুর তালে তালে,
দাও ঢেকে দাও আলোর আলেয়া আলুথালু জটাজালে,—
চিনি চিনি—ওগো প্রলয়-ঈশান !
অগ্নি-শিখায় উড়াও নিশান,
ঝঞ্ঝা-বীণায় তব আগমনী থামিল না কোন কালে ;
অগ্নি-যাগের জ্বলে ললাটিকা তোমারি দীপ্ত ভালে !

শ্মশানে-মশানে নগ্ন-নৃত্যে নাচ যে ভয়ঙ্কর !
বক্ষে তোমার নাচে মহাকালী—তুমি প্রলয়ঙ্কর !
চক্ষে তোমার জ্বলে কালানল,
ত্রিশূলে তোমার নিখিল উজল,
কণ্ঠে তোমার দীপক রাগিণী—'সংহর সংহর' !
যুগের যন্ত্রে জাগিছে মন্ত্র—'হর হর শঙ্কর' !

হে চির-চপল ! মিছে করি মানা, মিছে করি মোরা ভয় ;
আপন খুসির খেয়ালে বিশ্ব সৃজিয়া করিছ লয়—
তুমি চিরদিন এমনি অধীর,
এমনি উদাস, মিনতি-বধির,
আপনার হাতে রচি খেলাঘর আপনি করিছ ক্ষয়,
কণ্ঠে তোমার দোলে হাড়-মালা, বিভূতি অঙ্গময় !

তুমি নিয়ে আস তিমির-রাত্রি, দুঃখের দুর্দ্দিন,
কণ্টকে ঘেরা সংসার-পথে বিঘ্ন অর্থহীন,
আন মহামারী জল-প্লাবন,
হে চির-নিঠুর !—হে চির-পাবন !
হে চির-পাগল ! ভাঙিলে আগল, বন্ধন হোল ক্ষীণ—
প্রলয়-আলোর ভাষায় ভরিলে অন্ধকারের বীণ !

শ্যামলা কোমলা মাটির পৃথ্বী চরণে করুণা মাগে,—
'হে চপল ! তব থামাও চরণ, বক্ষে বেদন লাগে ;
চেয়ে দেখ, এই স্বপন-বুলানো
সবুজের বুকে কুসুম দুলানো,
এই হাসি-গান সকল ভুলানো, যত সাধ মনে জাগে,
ম্লান হ'য়ে আসে মরণ-আলোর তপ্ত-দীপ্ত রাগে।'

দিগ্-বালিকার উষ্ণ অশ্রু রক্ত-আলোয় আঁকা,
মরণ শ্যামের হোরিতে সকলি বেদনার ফাগে মাখা ;
কেঁপে ওঠে ধরা, জ্বলে দাবানল,
আগ্নেয়গিরি অগ্নি-পাগল,
'গুরু গুরু' ডাকে বজ্র-বহ্নি জলদ-বক্ষে ঢাকা ;
নিবিড়-তিমির-সিন্ধু গ্রাসিছে সৃষ্টি-ইন্দু রাকা !

তুমি চিরদিন বিরাম-বিহীন নাচিছ তন্দ্রহারা,
নিত্য ঝরে যে জটায় তোমার মুক্তি-গঙ্গা-ধারা ;
নিত্য তোমার চরণ-ভঙ্গে
নূতন জীবন জাগিছে রঙ্গে,
তোমার ডমরু, তোমার ত্রিশূল—সত্য, মূর্ত্ত তা'রা ;
আমরা বুঝিনা, সহিতে পারি না, তাই ভয়ে হই সারা !

পল্লী সংগঠনের আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ

কালীমোহন ঘোষ

গত স্বদেশী আন্দোলনের সময় সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের অসাধারণ বাগ্মীতায় বাঙ্গালীর প্রাণে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হইল। ইহার পূর্ব্বেই বঙ্কিমের "বন্দেমাতরম্," রঙ্গলালের "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়," হেমচন্দ্রের "বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্‌ এই রবে," নবীন-চন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" ইত্যাদি সাহিত্য ও কাব্যের ভিতর দিয়া বাঙ্গালীর মনে দেশপ্রেমের বীজ রোপিত হইয়াছিল।

রাজকাহিণী ও শিখের বলিদান তাহাদের চিত্তকে ত্যাগের মহিমায় অনুপ্রাণিত করিল। অতএব সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের বাগ্মীতা বাংলার তরুণ হৃদয়ে সহজেই সাড়া পাইল। রবীন্দ্র-নাথের "সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি," "একলা চলো রে," "তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না" ইত্যাদি সঙ্গীত ভাবপ্রবণ এই বাঙ্গালীর চিত্তের অনুভূতিকে আরও গভীরতর করিয়া তুলিল। এই ভাবোন্মত্ততার যুগে কোনও নেতা তখনকার ত্যাগশীল যুবকদের সম্মুখে কোনও সুচিন্তিত কর্ম্ম-পদ্ধতি উপস্থিত করেন নাই। কারণ সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্রের প্রেরণার মূল ছিল পাশ্চাত্য দেশের বার্ক ও ম্যাটসিনির চিন্তা ধারা। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথ "স্বদেশী-সমাজ" নামক বিখ্যাত প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি শিক্ষিত সমাজকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে পল্লীর অঙ্গনেই জাতির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

তখনকার রাজনীতির উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গ দ্বারা আমাদের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে তাহার প্রতি ইংরেজ শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বয়কট আন্দোলন সেই উদ্দেশ্যেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন লিখিয়াছেন "বিলাতের হৃদয় হরণের জন্য ছল বল কৌশলের সাজ সরঞ্জাম কিছুই বাকী রাখি নাই—কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষাও মহামূল্য এবং তাহার জন্য যে বহুতর সাধনার আবশ্যক একথা আমরা মনেও করি নাই।" পল্লী সমাজের ভিত্তির উপরেই জাতি-সৌধ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। জাতীয় মহাসমিতিকে কি উপায়ে জনসাধারণের প্রাণের জিনিষ করা যায় এ বিষয়েও তিনি উক্ত প্রবন্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—"প্রাদেশিক-রাষ্ট্রিয়-সমিতিকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্য্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কি করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতী ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরণের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে যাত্রা, গান, আমোদ আহ্লাদে দেশের লোক দূর দূরান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষি দ্রব্যের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভাল কথক, কীর্ত্তনগায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক লণ্ঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতত্ত্বের উপদেশ সুস্পষ্ট করিয়া

বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা কিছু বলিবার কথা আছে, যাহা কিছু সুখ দুঃখের পরামর্শ আছে—তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্র মিলিয়া সহজ বাংলায় আলোচনা করা হইত।" কিন্তু তখন তাঁহার অরণ্যে রোদন করাই সার হইয়াছিল। পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত স্বদেশী নেতাবর্গ ধ্বংসোন্মুখ পল্লীর অন্তরালে ফল্গুধারার ন্যায় যে প্রচ্ছন্ন শক্তি চির প্রবাহিত রহিয়াছে তাহার সন্ধান জানিতেন না।

যাহা হউক এই স্বদেশী আন্দোলনের সফলতার পশ্চাতে অনেকখানি ছিল পূজনীয় কৃষ্ণকুমার মিত্রের নীরব সাধনা। তাঁহারই নেতৃত্বে "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" মাথায় করিয়া আমরা দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতাম। এই বলিষ্ঠদেহ তেজস্বী নেতার মনে যশ ও খ্যাতির কোনও আকাঙ্খা ছিল না। বাংলার প্রথম স্বদেশী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র ছিল তাঁহারই গৃহে। স্বর্গীয় রমাকান্ত রায় ছিলেন যুবকদলের নেতা। কৃষ্ণ বাবু একদিন ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ স্বদেশী দ্রব্য উৎপন্নের ব্যবস্থা না করিতে পারিলে বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলন অসম্ভব। অতএব তুমি কলিকাতায় না থাকিয়া মফঃস্বলে ঘুরিয়া তাঁতী জোলাদের মধ্যে আবার তাঁত প্রবর্ত্তনের চেষ্টা কর"। আমি তাঁহার আদেশে বিশেষ আনন্দিত হইলাম। কারণ বৃহৎ নগরীর আবহাওয়া কখনও আমার মনের সঙ্গে খাপ খায় নাই। বাংলার নানা জিলা ঘুরিয়া আমি নোয়াখালী ও কুমিল্লায় আমার প্রধান কর্ম্মক্ষেত্র করিলাম। নোয়াখালীর যোগী বা নাথ সম্প্রদায়ের পৈতৃক ব্যবসা তাঁত, কিন্তু সেই ব্যবসা তখন লুপ্ত প্রায়। ইহাদের সংখ্যা ৫৫ হাজারের উপর। যোগীদিগের অধিকাংশেরই জায়গা জমি নাই। অর্দ্ধাশনে দিনাতিপাত করায় ইহাদের দেহ দুর্ব্বল। দিনমজুরীতেও মুসলমান মজুরদের মত কঠোর পরিশ্রম করিতে পারে না। ইহারা ধর্ম্মপ্রাণ ও বৈষ্ণব। ইহাদের মুখে কীর্ত্তন, ময়নামতী ও শূন্য পুরাণের গান শুনিয়া বুঝিলাম যে ইহাদের হৃদয় সরল ও সূক্ষ্মানুভূতি সম্পন্ন। বাংলা দেশ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিলুপ্ত হওয়ার পর সনাতনী সমাজ গঠনের যুগে পৈতৃক ধর্ম্মাসক্ত এই উন্নত জাতিকে সমাজপতিগণ অপাংক্তেয় করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু বহু শতাব্দীর সাধনার সম্পদকে একেবারে বিনষ্ট করিতে পারেন নাই। সহুরে শিক্ষিতাভিমানী আমি কলিকাতার রাজনৈতিক ভাবপ্রবণতা লইয়া যখন গ্রামে আসিলাম, তখন আমার মনে এই সকল নিরক্ষর নিরন্ন অজ্ঞ জনসাধারণের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা ছিল। এই সকল নির্ব্বোধ জনগণকে কোনও রকমে মাতাইয়া তুলিয়া যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করা যায় ইহাই ছিল বিশ্বাস। কিন্তু ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া অনুভব করিলাম যে ইহারা একটী প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী। ইহাদের বোধশক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। আমি যতই ইহাদিগের সহিত মিশিতে লাগিলাম, ততই ইহাদের বিবিধ সদগুণে মুগ্ধ হইয়া শ্রদ্ধাবান হইতে লাগিলাম। আমার দম্ভ দূর হইল। নিত্য নূতন জ্ঞানলাভ করিতে লাগিলাম। অনুভব করিলাম যে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা দ্বারাই পরস্পরের হৃদয় জয় করা যায়। পতিতোদ্ধারকারী পাদ্রীগিরির দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে। পল্লীসভ্যতার অন্তর্নিহিত শক্তির সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি আরও পরিস্ফুট হইল শিলাইদহে।

শিলাইদহে কবি তখন অবস্থান করিতেছিলেন পদ্মার উপর। একদিন তিনি আমায় কুষ্টিয়ার নিকট লালনশা ফকিরের আখড়ায় গিয়া কয়েকটী সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া আনিতে বলিলেন। আখড়ায় ছিল সেদিন উৎসব। ফকিরের বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান শিষ্য ও শিষ্যা খঞ্জনী বাজাইয়া নৃত্যের সহিত বাউলদের মত গান করিতেছিল। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের সংকীর্ণতার উর্দ্ধে উঠিয়া মানুষকে মানুষ হিসাবে সহজ সরল ভাবে অনুভব করাতেই এই সঙ্গীতের বিশেষত্ব। শিক্ষিত সমাজের অগোচরে জনসাধারণের মধ্যে বিনা আড়ম্বরে এই সাধক তাঁহার জীবনের সাধনার দ্বারা মিলনের যে সেতু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলাম। তাঁহার কয়েকজন শিষ্যকে রবীন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য শিলাইদহ আসিতে অনুরোধ করিয়া আসিলাম।

পরদিন অপরাহ্ণে নৌকার উপর কবি গভীর আনন্দের সহিত ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাহাদের সহিত আলোচনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চলিয়া যাওয়ার পর আমাকে বলিলেন ইহারা লেখাপড়া জানে না। কিন্তু সকলেই জ্ঞানী, বড় বড় কথা এমন সহজভাবে বুঝিতে পারে যে এদের সঙ্গে আলোচনা করিয়া যে আনন্দ পাইয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধীধারীদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াও তাহা ক্বচিৎ পাওয়া যায়। এই শিলাইদহেই তিনি বৈষ্ণবী নামক ছোট গল্প লিখেন। একটী বাস্তব ঘটনা এই গল্পের উপাদান।

আমাদের পল্লীর জনসাধারণের মধ্যে যে সংস্কৃতি (culture) ইংরাজী শিক্ষিত ভদ্র সমাজের অবজ্ঞা ও উপেক্ষার আঘাত সত্ত্বেও নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছে তাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর সহানুভূতি রহিয়াছে বলিয়াই এই সকল অশিক্ষিত সাধক তাঁহার সন্নিকটে আসিয়া আত্মীয়তার অনুভূতি লাভ করিত। এবং সেইজন্য প্রাণের অর্গল উন্মুক্ত করিয়া দিয়া নিজদিগকে ব্যক্ত করিতে কুণ্ঠা বোধ করিত না।

আমরা যখন পল্লীসেবার কার্য্যে গ্রামে যাই তখন কি মনোভাব লইয়া উপস্থিত হইব তাহার উপরই ভবিষ্যৎ ফলাফল অনেকটা নির্ভর করে বলিয়াই আমি পূর্ব্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিলাম।

পল্লী সেবকের পক্ষে প্রধানতঃ দরকার যাহাদিগকে লইয়া সমাজ গঠন করিবে তাহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি। যতই নগণ্য অজ্ঞ হউক না কেন প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমন কিছু সদগুণ থাকিতে পারে, যাহার পরিচয় পাইলে আমরা তাহাকে শ্রদ্ধা করিতে পারি। যেমন বাহিরের এক-জন শিক্ষিত লোক অর্দ্ধ নগ্ন সাঁওতালকে দেখিলে প্রথমেই ধরিয়া লয় যে সে বুনো, বর্ব্বর। তার প্রতি করুণা হয়, কিন্তু শ্রদ্ধা হয় না। কিন্তু আপনারা দেখিয়াছেন যে সাঁওতাল দম্পতী সারা-দিনের কঠোর পরিশ্রমের পর যখন হাত ধরাধরি করিয়া বাঁশির সুরে আনন্দের লহরী তুলিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করে, তখন সেদিকে তাকাইয়া আমাদের মনে হয় "যে দিনাবসানে কর্ম্মক্লিষ্ট দেহের সকল ক্লান্তি বিস্মৃত হইয়া এমন সরলভাবে অনাবিল আনন্দ উপভোগ করিবার শক্তি যদি আমাদের মধ্যে থাকিত।" খাঁটী সাঁওতাল মিথ্যা কথা বলিতে অভ্যস্ত নয়। সামাজিক সালিশীতে তার বিচার হয় বলিয়া উকিলের দালালের নিকট চতুরতার সহিত মিথ্যা বলিবার শিক্ষায় এখনও

অনভ্যস্ত। কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যেও তাহার আত্ম-সম্মান-বোধ খুব জাগ্রত। সেই আত্ম-সম্মান বাঁচাইবার জন্য সে হিন্দু মুসলমানদের সহিত এক গ্রামে বাস করে না। সে মধুরভাষী। তাহার আত্ম-সম্মানে বার বার আঘাত করিলে সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে—তথাপি অবমাননার নিকট মস্তক নত করিবে না। পুর্ণিমার রাত্রিতে যখন সাঁওতাল নারীগণ আত্ম-বিহ্বল হইয়া নৃত্যে মাতিয়া উঠে, তখনও তাহাদের মধ্যে সংযমের বন্ধন মাত্রও শিথিল হয় না। মদ্য পানে বিভোর হইয়া পুরুষগণ মাদলের তালে তালে উদ্দমে নৃত্য করিতে থাকে তখনও তাহাদের কথাবার্ত্তা বা অঙ্গ-ভঙ্গীর দ্বারা নারীর মর্য্যাদাকে বিন্দুমাত্রও আঘাত করে না। ভূত প্রেতে বিশ্বাসী অজ্ঞ সাঁওতালগণের মধ্যেও এমন অনেক সদগুণ দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদের মধ্যে তাহার অভাবে অনুভব করিয়া আমরা তাহাদিগকে শ্রদ্ধা করিতে পারি। তাহাদের অজ্ঞতার জন্য সকল সম্প্রদায়ের লোকই ইহাদিগকে প্রতারণা করে। যদি সেই প্রতারণা হইতে রক্ষা করিবার জন্য আমরা তাহা-দিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা করি—তাহাদের প্রাণ সায় দিবে না—যদি না তাহারা অনুভব করে যে তাহাদের জাতির বিশেষত্ব যেখানে সেই সকল সদগুণের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাবান।

রবীন্দ্রনাথ শুধু কবি নহেন। তিনি জাতির ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা, তাই তিনি বার বার দেশ সেবক কর্ম্মীদলকে আহ্বান করিলেন—পল্লীসমাজ গঠনের জন্য। গত ১৩১৪ সালে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের মিলনের সংগঠন কার্য্যের জন্য বাঙ্গালী জাতির বরেণ্য নেতৃবৃন্দ পাবনায় সম্মিলিত হন। দলাদলির বাহিরে থাকিয়া দেশের কল্যাণ চিন্তায় নিরত ছিলেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথকেই মিলন যজ্ঞের ঋত্বিক হইতে হইয়াছিল।

তখন বাংলার ঘোরতর দুঃসময়। বঙ্গ বিভাগের বেদনায় বাঙ্গালী ক্ষুব্ধ হইয়া বিলাতীবর্জ্জন করিয়াছে। তাহার ফলে ক্রুদ্ধ হইয়া শাসক জাতি প্রবর্ত্তন করিয়াছে পুলিশ রাজকতা। জেল, নির্ব্বাসন ও বেত্রদণ্ড দ্বারা বিলাতী বর্জ্জন ত্যাগ করাইতে তাঁহারা দৃঢ় সংকল্প হইলেন। আঘাত ও প্রতিঘাতের তাড়নায় দেশে অশান্তির প্রকোপ বাড়িয়াই উঠিল। একদল যুবক অসহিষ্ণু হইয়া বিপ্লব বাদ প্রচার করিতে লাগিল।

পাবনা সম্মিলনীতে রবীন্দ্রনাথ যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা বাংলার রাষ্ট্রীয় সাহিত্যে অমর হইয়া থাকিবে। বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালী জাতির অন্তরের বেদনা গভীরভাবে জলন্ত ভাষায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাঁহার বক্তৃতায়। কিন্তু কবির দূরদৃষ্টি সেই বিক্ষোভের মধ্যেও বিভ্রান্ত হয় নাই। সেদিনও তিনি সকল দলের সম্মিলিত চেষ্টায় পল্লী সমাজে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য একটী গঠনমূলক কর্ম্ম পদ্ধতি অবলম্বন করিতে আহ্বান করিলেন। তিনি বলিলেন—"প্রত্যেক প্রদেশে একটী করিয়া প্রাদেশিক প্রতিনিধি সভা স্থাপিত হইবে। এই সভা যথাসম্ভব গ্রামে গ্রামে আপনার শাখা বিস্তার করিয়া সমস্ত জেলাকে আচ্ছন্ন করিবে—প্রথমে সমস্ত প্রদেশের সর্ব্বাংশের সকল প্রকার তথ্য সম্পূর্ণরূপে সংগ্রহ করিবে—কারণ কর্ম্মের ভূমিকাই জ্ঞান। যেখাতে কাজ করিতে হইবে সর্ব্বাগ্রে তাহার সমস্ত অবস্থা জানা চাই। দেশের গ্রামগুলিকে নিজের সর্ব্বপ্রকার প্রয়োজন

সাধনক্ষম করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। কতকগুলি পল্লী লইয়া এক একটী মণ্ডলী স্থাপিত হইবে। সেই মণ্ডলীর প্রধানগণ যদি গ্রামের সমস্ত কর্ম্মের এবং অভাব মোচনের ব্যবস্থা করিয়া মণ্ডলীকে নিজের মধ্যে পর্য্যাপ্ত করিয়া তুলিতে পারে তবেই স্বায়ত্ব শাসনের চর্চ্চা দেশের সর্ব্বত্র সত্য হইয়া উঠিবে।

নিজের পাঠশালা, শিক্ষালয়, ধর্ম্মগোলা, সমবেত পণ্যভাণ্ডার ও ব্যাঙ্ক স্থাপনের জন্য ইহাদিগকে শিক্ষা, সাহায্য ও উৎসাহ দান করিতে হইবে। প্রত্যেক মণ্ডলীর একটী করিয়া সাধারণ মণ্ডপ থাকিবে। সেখানে কর্ম্মে ও আমোদে সকলে একত্র হইবার স্থান পাইবে এবং সেইখানে ভারপ্রাপ্ত প্রধানেরা মিলিয়া সালিশের দ্বারা বিবাদ ও মামলা মিটাইয়া দিবে।"

যে দেশে শতকরা চুরানব্বই জন লোক গ্রামে বাস করে সেই দেশের সমস্যা পল্লীসমস্যা। সেখানেই শক্তির উৎস দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া উঠিতেছে। ক্ষুদ্র পল্লী প্রাণহীন অন্নহীন, আত্মকলহে শতধা বিচ্ছিন্ন। ভারতের ধন-সম্পদের উৎপত্তি যেখানে সেখানে বাঁধ দিতে না পারিলে ভারতের ধনরাশির অবাধ প্রবাহ অপর দেশের ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি করিয়া সেই অনুপাতে নিজেদের দারিদ্র্য বাড়াইয়া তুলিবে—ইহা অনুভব করিয়া রবীন্দ্রনাথ পাবনায় বলিয়াছেন—"অদ্যকার দিনে যাহার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্র মিলাইয়া বাঁধ বাঁধিবার সময় আসিয়াছে। এ না হইলে ঢালু পথে আমাদের ছোট ছোট সামর্থ্য ও সম্বলের ধারা বাহির হইয়া গিয়া অন্যের জলাশয় পূর্ণ করিবে। অন্ন থাকিতেও আমরা অন্ন পাইব না, এবং আমরা কি কারণে কেমন করিয়া যে মরিতেছি তাহা জানিতেও পারিব না। আজ যাহাদিগকে বাঁচাইতে চাই, তাহাদিগকে মিলাইতে হইবে।"

তরুণ তেজোদ্দীপ্ত যুবক সম্প্রদায়ের ত্যাগোজ্জ্বল দেশ সেবার জয় ঘোষণা করিয়া তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন—"তোমরা যে পার এবং যেখানে পার এক একটী গ্রামের ভার গ্রহণ করিয়া সেখানে গিয়া আশ্রয় লও। গ্রামগুলিকে ব্যবস্থাবদ্ধ কর। শিক্ষা দাও, কৃষি-শিল্প ও গ্রামের ব্যবহার-সামগ্রী সম্বন্ধে নূতন চেষ্টা প্রবর্ত্তিত কর। গ্রামবাসীদের বাসস্থান যাহাতে পরিচ্ছন্ন, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর হয়, তাহাদের মধ্যে সেই উৎসাহ সঞ্চার কর এবং যাহাতে তাহারা নিজেরা সমবেত হইয়া গ্রামের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে, সেইরূপ বিধি উদ্ভাবিত কর। এই কর্ম্মে খ্যাতির আশা করিও না। এমন কি গ্রামবাসীদের নিকট হইতে কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে কোনও উত্তেজনা নাই, কোনও বিরোধ নাই, কোনও ঘোষণা নাই, কেবল ধৈর্য্য এবং প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এইটুকু মাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যাহারা দুঃখী তাহাদের দুঃখের ভাগ লইয়া সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করিতে সমস্ত জীবন সমর্পন করিব।"

রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণে উভয় দলের নেতৃবৃন্দের হৃদয় বিচলিত হইল। তখনকার মত সকলেই দলাদলি বিস্মৃত হইয়া এই সংগঠনমুলক কার্য্যপদ্ধতি অবলম্বন করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু তাহা আর কার্য্যে পরিণত হইল না।

অলস মুহূর্তে

নিখিল সেন

মন্থর পা ফেলিয়া বিজনবাবু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের অসহ্য নিঃসঙ্গতা তাঁহার টুটি বুঝি টিপিয়া ধরিয়াছে! করিডরে কিছুক্ষণ তিনি পায়চাড়ী করিলেন অস্থির পদে। তারপর কনুই দুটি রাখিয়া রেলিঙয়ের উপর ঝুঁকিয়া দাঁড়াইলেন এক সময়। হার্টের সেই প্যাল্‌পিটেশন্‌ তাহার আবার সুরু হইয়াছে। বুকের ভিতর কে যেন হাতুড়ী পিটিতেছে সশব্দে। বেতের চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া বিজনবাবু শেষে বসিয়া পড়িলেন।

দূরের ক্যাথলিক গির্জায় অনেকগুলি ঘণ্টা বাজিয়া গেল। রাত্রি খুব কম হয় নাই। শিংয়ের মত বাঁকা আধ-ফালি চাঁদ উঠিয়াছে আকাশের বুকে। সামনের সরু ইউক্যালিপটাস্‌ গাছটি ছোট একটি ছায়া ফেলিয়াছে উঠানে। দূরে—যতদূর দৃষ্টি যায়—অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে হাজারীবাগ অঞ্চলের ধূম্রাভ পাহাড় শ্রেণী। দিকচক্রবালের রেখা ছাড়াইয়া তাহারা বুঝি কোথায় মিশিয়া গিয়াছে। সশরীরী মূর্তি নিয়া যেন দাঁড়াইয়া আছে সৃষ্টির আদিম পৃথিবী: সব স্বপ্ন—নিবিড় এক রহস্য!

অলস চোখে বিজনবাবু তাকাইয়া রহিলেন সেদিকে।

নিজেকেও নিজের নিকট তাঁহার বড় রহস্যময় ঠেকে! বড় অসহায় মনে হয়। মনে হয়: তিনিও যেন সামনের ওই ইউক্যালিপটাসটির মত একক—দূরের ওই বিরাট দেবদারু গাছটার মত তিনিও যেন বড় নিঃসঙ্গ।.........তিনি বুঝিয়া উঠিতে পারেন না: কেন এমন হয়।...অতন্দ্র রাত্রি তাঁহার গড়াইয়া যায় চোখের উপর।

মুখর স্যানিটোরিয়ম। নিত্য নূতন আনা-গোনা করিতেছে নানা যাত্রীর দল। ভগ্ন-স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য অনেকে আসিয়া ভিড় করিয়াছে এখানে। বিদেশের দূরত্বকে বুঝি কমাইতে চায় তাঁহারা। পরস্পর পরস্পরের তাই সঙ্গ খুঁজে। আত্মীয়তার মধুর এক আবেষ্টনীর মধ্যে দিন তাহাদের কাটিয়া যায়।

গায়ে-পড়া এই আত্মীয়তায় বিজনবাবু যেন হাঁপাইয়া পড়েন। কোথায় কি-যেন-একটার অভাব রহিয়া গিয়াছে; বড় খুঁৎ-খুঁৎ করিতে থাকে তাঁহার মন......

মুখর স্যানিসিটোরিয়াম। নীচে ড্রয়িং রুম হইতে উচ্ছ্বসিত হাসি ভাসিয়া আসিতেছে। উৎসাহী বোর্ডারস্‌রা ব্রীজে মাতিয়াছে।

বিজনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তিনিও তো তাহাদের সঙ্গে হাসির আনন্দে যোগ দিতে পারেন। হাসির টুকরাগুলি নিজেও তো উপভোগ করিতে পারেন। বুক তাঁহার অনেকটা তখন হালকা হইয়া যাইবে। কিন্তু না, তাহা হয় না। ব্রীজে তিনি মোটেই অভ্যস্থ নন। আর—হয়তো সেখানকার ভিড়ের মধ্যে গিয়া তিনি নিজেই হাঁপাইয়া উঠিবেন। না, তাহা হয় না।...

পাশে রেলিঙয়ের উপর মানুষের একটি ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল। ছায়াটি একটু নড়িয়া উঠিতেই বিজনবাবুর নজর গিয়া পড়িল তাহার উপর। মুখ ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

—কে ?

কাশির মৃদু একটু শব্দ হইল। তারপর উত্তর আসিল ঃ

—জোসেফ আলি, হুজুর।

—ক্যায়া মাঙতা ?

—সাহেবকা খানা......জোসেফ আলি বুঝি রীতিমত ঘামিয়া উঠিল।

—নেহি, নেহি; তুম যাও। বিরক্তিতে বিজনবাবু দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া উঠিলেন। এ নিয়া বুঝি তাহাকে দু-দুবার বলা হইয়াছে। তবুও আবার কেন তাহাকে বিরক্ত করিতে আসা ? তিনি একরূপ চেঁচাইয়া উঠিলেন ঃ যাও, যাও। তোমাকে আগে বলা হয়নি ? আবার বিরক্ত করতে এলে কেনো ?

জোসেফ কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া রহিল নীরবে। তারপর ধীরে ধীরে সে চলিয়া গেল।

সমবেদনায় বিজনবাবুর মন হঠাৎ গলিয়া পড়িল। সত্যি, জোসেফের উপর তাঁহার এতখানি বিরক্তি প্রকাশ করা উচিত হয় নাই। অনুতাপে মন তাঁহার টন-টন করিয়া উঠিল। বেচারী জোসেফ! স্যানিটোরিয়ামের গরীব এক বয়। বকশিসের কিছু প্রত্যাশায় হয়তো বোর্ডারস্‌দের সুখ সুবিধার দিকে বিশেষ একটু নজর রাখে। তা ছাড়া, আবার কি ? কিন্তু সে যেন আর সকলের হইতে ভিন্ন। এখানকার এই কয়েক মাসে সে বুঝি বড় আপনার করিয়া নিয়াছে বিজনবাবুকে। একদিন তো সে তাহার দুঃখের কাহিনী শুনাইতে বসিয়াছিল বিজনবাবুকে—মোট তাহার বারো টাকা তলব। বাড়িতে বৃদ্ধা মা আর জোসেফের তিন বছরের এক মেয়ে। মেয়েটীকে ফেলে বউ তার কোথায় উধাও হইয়াছে।

শুনিবার বিজনবাবুর মোটেই ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু একটা লোক যখন আগ্রহ করিয়া বলিয়া যাইতে ইচ্ছুক, শুনিবার ভান না করিয়া সেখানে আর উপায় কি ? টেবিল হইতে মোটা একখানা বই টানিয়া নিয়া তিনি তাহা খুলিয়া বসিয়াছিলেন। জোসেফ তার কথা শেষ করিয়া কিন্তু খামাকা প্রশ্ন করিয়া বসিল ঃ

—সা'ব আপকা কোই লেড়কা-লেড়কী নেহি ?

বিজন বাবু নিজেকে অপমানিত বোধ করিলেন। জোসেফের ইহা বড় বাড়াবাড়ি। আছে কি নাই, তাহার জানিবার কি দরকার ? হোটেলের এই বয়গুলির অন্ততঃ এটুকু ভদ্রতা শিখিয়া রাখা উচিত। তিনি জোসেফকে ধমকাইতে গিয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া কেন আবার থামিয়া গেলেন। বেচারি জোসেফ! কথাটা আগাগোড়া ভাবিয়া তাঁহার নিজেরও খুব হাসি পাইল। মেমসাব'ই নেই যখন, লেড়কা-লেড়কী তাঁহার আবার কি ?...

কি একটা অছিলায় তিনি জোসেফকে তখন পাঠাইয়া দিয়াছিলেন নীচে।

—কি রে, আবার ফিরে এলি যে ?

জোসেফ আবার কখন আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল পিছনে। জবাব দিল ঃ

—বহুৎ রাত হো গিয়া সা'ব। ছোট ছোট তার চোখ দুটিতে কাতর মিনতি। বিজনবাবুর খেয়াল হইল ঃ বাহিরে ঠাণ্ডায় অতক্ষণ থাকা তাঁহার মোটেই উচিত হয় নাই। ডাক্তার তাঁহাকে মানা করিয়াছেন বারবার। জোসেফ তাঁহাকে ইহা স্মরণ করাইয়া দিতে আবার তাই ফিরিয়াছে।

—তুই যারে জোসেফ, আমি যাচ্চি। সস্নেহ দৃষ্টিতে তিনি কিছুক্ষণ অপসৃয়মান জোসেফের সামনে-ঝুঁকিয়া-পড়া দেহখানার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

পিছনে আবার হেলান দিয়া দাঁড়াইলেন বিজনবাবু। থাকিয়া থাকিয়া দমকা একটা হাওয়া দিতেছিল। বিজনবাবুর লম্বা চুল এলোমেলো হইয়া তাহাতে মুখে আসিয়া পড়িতে লাগিল চুলগুলি তিনি গুজিয়া দিলেন কানের উপর।..... হোটেলের সামান্য এক বিদেশী 'ওয়েটর'। সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিতান্ত আপনার করিয়া নিয়াছে। তবুও কোনো, অলস এক মুহূর্ত্তে তিনি নিজেকে সকলের নিকট হইতে বহু দূরে—বড় একা—বড় নিঃসঙ্গ মনে করেন।

বারবার তিনি শুধাইতে লাগিলেন নিজেকে।

—কে, বিজনবাবু বুঝি ? আজ কেমন মনে করচেন মশাই ?

বিজনবাবু একটু অন্যমনস্ক ছিলেন। প্রশ্ন যিনি করিয়াছেন, পাশের ঘরেরই তাহার এক বোর্ডার। চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন ঃ

—হ্যাঁ। হার্টের সেই প্যাল্‌পিটেশনটা বোধ হয় আবার সুরু হয়েচে।

শারীরিক অপটুতার জন্য লোকের সহানুভূতি চাহিতে তাঁহার বড় লজ্জা বোধ করে।

মিষ্টার সরকার বিজনবাবুর পরিত্যক্ত চেয়ার খানার মধ্যে ডুবিয়া বসিলেন।

—ইয়ু সুড্‌ টেক্‌ সাম ফিজিক্যাল এক্‌সারসাইজ অল্‌সো। সারাদিন মশাই চুপটি মেরে বসে থাকেন বই নিয়ে, তাই তো আপনার অতোসব কম্‌প্লেনন্ট। রোজ খুব করে বেড়িয়ে দেখুন না, সব ঠিক হয়ে যাবে আপনার।

বিজনবাবু টানা একটু হাসিলেন। তিনি জানেন তাঁহার এই রোগ সারিবার নয়। কিন্ত এই প্রসঙ্গটাকে চাপা না দিলে আর চলে না। এমনি তার বহু উপদেশে কানদুটি তাঁহার পচিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। তাই কহিলেন—কোথাও গিয়েছিলেন বুঝি ? সিনেমায় ?

—না। বড়দারা আজ চলে গেলেন কিনা ; তাঁদের সি-অফ্‌ করে এলাম।

—বিজনবাবুর ভুরু জোড়া কপালে উঠিয়া আসিল

—কৈ, আপনার দাদা এসেছিলেন ?

না মশাই, না ; আমাদের য়্যুনির্ভাসেল বড়দা—সাত নম্বরের বাঁড়ুজ্যেমশাই।

—কিন্তু তাঁর তো আজ ফিরবার কথা নয়।

—না ; অন্ততঃ তিন ঘণ্টা আগেও ছিলো না। ফিরে দেখি, তল্পি-তল্পা তিনি সব বাঁধচেন। জিজ্ঞেস করতে তিনি কোন জবাব দিলেন না। মুখ তাঁর বেজায় গম্ভীর ; আমারও খুব দুঃখ হলো।

মিষ্টার সরকার ছোট একটা নিশ্বাস চাপিতে চেষ্টা করিলেন। একটু থামিয়া আবার কহিলেন ঃ

—আর যাই হোক, ভারি জলি-ওল্ড চ্যাপ! হাসিয়ে ভদ্রলোক সকলের পেটে খিল ধরিয়ে দেন।

পকেট হইতে মিষ্টার সরকার পেপার আর তামাকের 'পাউচ' বাহির করিলেন এবং দুহাতে একটা সিগারেট রোল করিয়া ধরাইয়া লইলেন।

—হ্যাভ্ ওয়ান।

বিজনবাবুর দিকে তিনি পেপার আর পাউচ আগাইয়া দিলেন। কিন্তু পর মুহূর্তে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া হাতখানি তিনি আবার টানিয়া লইলেন।

—স্যরি, আপনার তো আবার এসব অভ্যেস নেই।

কথার বাঁক তিনি নিজেই ফিরাইয়া লইলেন। সিগারেটটা ঠোঁটের একপাশে নিয়া গিয় কহিলেন ঃ

—মিষ্টার আর মিসেস্ চ্যাটার্জিদের সাথে আজ আলাপ হলো। বেশ লোক। আপনার খুব নাম করছিলেন।

—কে ?......বিজনবাবু চোখ দুটি মিষ্টার সরকারের দিকে তুলিয়া করিলেন।

—কালকে তাঁরা এসেচেন। এখানে আপনি আছেন শুনে তাঁরা সব খুশী হয়েচেন।

—কিন্তু......হাত নাড়িয়া বিজনবাবু সিগারেটের একরাশ ধোঁয়া সরাইয়া দিলেম নাক হইতে।—কিন্তু, তাঁরা আমাকে জানলেন কি করে ?

মিষ্টার সরকার বিপুল হাসিয়া উঠিলেন—আপনাকে মশাই, কে না চেনে ? আপনার লেখা কে না পড়েচে ? এই ধরুন, আমি যখন পড়তাম আপনার লেখা ; তখন কি আর ভেবেচি আপনার সাথে আমার পরিচয় হবার সৌভাগ্য ঘটবে এই স্যানিটোরিয়ামে এসে ?

কচি একটা পামের ডগা তাক করিয়া তিনি ছুঁড়িয়া দিলেন সিগারেটের বাকী অংশটা।

—মিসেস্ চ্যাটার্জি নিজেও খুব কালচার্ড্ কিনা। আপনার সব কটা বইয়ের নাম করছিলেন।...

করিডরের উপর দিয়া মিষ্টার সরকারের জুতার শব্দ মিলাইয়া গেল ধীরে ধীরে। খুব আলাপি ভদ্রলোক ; বিপত্নীক অনেক দিন হইতে। ভবঘুরের মত এখন শুধু ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন দেশ-বিদেশে।...

কিন্তু বড় কষ্ট হয় বৃদ্ধ বাঁড়ুজ্যেমশাইয়ের জন্যে। 'স্টার্টলিং এক প্যারাডক্স' যেন তাহার জীবন! স্ত্রী তাঁহার উন্মাদ। বিবাহের পর হইতে রোগ হঠাৎ দেখা দিয়েছে। লুনেটিক য়্যাসাইলিয়ামে স্ত্রীর সাথে দেখা করিতে এখানে তিনি আসিয়াছিলেন। বাহিরের হাসি-খুশীর ভাব তাঁহার সব কৃত্রিম; ইহা তিনি নিজেও বেশ জানেন। ভিতরের জমাট ব্যাথাকে, একক নিঃসঙ্গ জীবনকে ভুলাইয়া রাখিবার মেকি আবরণ ছাড়া আর কিছু নয়।...

বাঁ হাতের তালুর মধ্যে চিবুক রাখিয়া বিজনবাবু তাকাইয়া রহিলেন দূরে। চোখ তাঁহার অপলক; দৃষ্টি তাঁহার শূন্য। নীচে ড্রয়িং রুমে হাসি-তামাসা সব থামিয়া গিয়াছে বোর্ডারসরা সকলে বিদায় লইয়াছেন। জমাট রাত্রিও ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। কোথাও কোন শব্দ নাই। ঘুমের ঘোরে শুধু মিষ্টার আর মিসেস্ চ্যাটার্জ্জির মেয়েটি কাঁদিয়া উঠিতেছে মাঝে মাঝে। কালব্যাধির ছোঁয়াচে গণ্ডী হইতে দূরে রাখিতে হইয়াছে আয়ার নিকট শিশুটিকে।

•

ঠাণ্ডা মৃত্যু এখানেও হায়, হানা দিয়াছে! মিসেস্ চ্যাটার্জ্জি আগাইয়া যাইতেছেন ধ্বংসের পথে দিনে দিনে। ক্ষয়রোগ পলে-পলে শুকাইয়া নিতেছে তাঁহার নিকট হইতে জীবনের দানা।... মিষ্টার সরকারের 'হ্যাপি কাপল' বটে তাঁহারা দুজনে! কথা দুটি বিজনবাবুর কানে ক্রুর ব্যাঙ্গ করিয়া উঠিল। আপন মনে হাতের নখগুলি পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।...'হ্যাপি' বটে! আচ্ছা আচ্ছা, কেন এমন হয়? তিনি শুধাইলেন নিজেকে—আচ্ছা, কেন এমন হয়? পাশাপাশি দুজনে কাছে থাকিয়াও যেন রহিয়াছে দুজনেই বহুদূরে। কেহ কা'রও নয়। কত বিচিত্র মানুষের জীবন ধারা। বুঝি এ চিরন্তন মানুষ! বড় অসহায়, বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ তাহাদের জীবন: সৃষ্টির প্রথম যুগ হইতে এমনি ধারাই চলিয়া আসিতেছে। মানুষ খুঁজিয়া আসিতেছে স্বজনে। পৃথিবীর নিবিড় ছায়াচ্ছন্ন অরণ্যে বুক তাহার সতত কাঁপিয়া উঠিয়াছে দুরু দুরু করিয়া ভয়ে। চারিদিকের নিরালা নিঃসঙ্গতায় সে হাঁপাইয়া উঠিয়াছে রীতিমত। আকুল দুটি বাহু বাড়াইয়া কাহাকে যেন খুঁজিয়াছে সে। পাইয়াও হায়, কাহাকে যেন সে পায় নাই! নিজের পঙ্গুতার বেদনায় মানুষ তখন গুঁমরিয়া উঠিয়াছে আহত এক বন্য শূকরের মত। আরও ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে নিজের নিঃসঙ্গতাকে তাহার এই ক্রন্দন।

বিজনবাবু দ্রুত পায়চাড়ী করিতে লাগিলেন করিডরে। রাত্রিনিবিড় হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে পুঞ্জীভূত স্তব্ধতা। নীচে যে কয়েকটি কুকুর মাংসের হাড়ের জন্য কামড়-কামড়ি করিতেছিল, তাহাও কখন থামিয়া গিয়াছে।

পায়চাড়ী করিতে করিতে তাঁহার এক সময় মনে হইল—মানুষ হায়, কত একা, কত দীন, কত পঙ্গু!...নীলি আসিয়া তাঁহাকে যদি এখন সঙ্গ দিত। বিস্মৃতির মুক্ত পথ দিয়া সে আজ কোথায় হারাইয়া গিয়াছে।

নীলি?...নীলি তাঁহার সতীর্থ এক বন্ধু। কি করিয়া যে প্রথম পরিচয় হইয়াছিল তাহার

সঙ্গে, এখন সে আর মনে নাই। যৌবনের রঙিন সে চশমাও এখন কোথায় আবার হারাইয়া গিয়াছে। মোটামুটি আলাপের সূত্রটি বোধ হয় এই—

সেদিন টি-এস-বি কেন ক্লাশ নেন নাই। তারপরের ঘণ্টাটিও ছিল অফ্। পিছনের অশোক গাছটির গুঁড়িতে হেলান দিয়া বিজনবাবু বসিয়াছিলেন একটু নিরিবিলিতে। বাহিরের তুমুল হট্টগোলের মধ্য হইতে এই একটু নিরিবিলি থাকাই তিনি চিরকাল ভালবাসিয়া আসিয়াছেন। ফাল্গুন মাসের হলদে তুপুর। মিঠে-কড়া রোদ ছড়াইয়া পড়িয়াছে ঘাসে-ভরা সারা সবুজ মাঠের উপর।

লাইব্রেরী হইতে সদ্য-ইস্যু-করা তাঁহার প্রিয়-কবির একখানি বই পড়িবার জন্যে তিনি বোধ হয় কোলে খুলিয়া বসিয়াছিলেন। কি-মনে করিয়া বইখানা তিনি আবার মুড়িয়া রাখিলেন। স্তব্ধ প্রকৃতির মণি-কুঠিরে আসিয়া বই খুলিয়া বসিতে তাঁহার যেন কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতেছিল।

পিছনে চাপা উচ্ছ্বসিত হাসির একটা হিল্লোল উঠিল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন : ক্লাশের কয়েকটী মেয়ে পুষ্পিত অশোকের নীচু একটা ডাল নোয়াইবার চেষ্টা করিতেছে বৃথা। নাগাল না পাইয়া তাই হাসিয়া উঠিয়াছে সকলে।

বিজনবাবু কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করিলেন। কলেজে তুবছর শেষ হইতে চলিলেও তিনি এখনও ঠিক অভ্যস্ত হইয়া উঠেন নাই মেয়েদের সঙ্গে সহজ মেলামেশা করিতে। তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

মেয়েদের হাসি থামিয়া গেল। নীলিমা আগাইয়া আসিয়া কহিল—

—দয়া করে ডালটা একটু নুইয়ে দেবেন?

বিজনবাবু কি-যে করিবেন কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কান তুটি তাঁহার আরক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহাকেই বা এই অনুরোধ করা কেন? তিনি কয়েকবার শুধাইলেন নিজেকে। কিন্তু এমন নিশ্চুপ দাঁড়াইয়া থাকা বড় বিশ্রী দেখাইতেছে। নিজের চোখেও তাঁহার বড় অশোভন ঠেকিতেছে। পর মুহূর্তে তিনি নিজের মন ঠিক করিয়া লইলেন। কোন কথা না বলিয়া, কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, ডালটাকে সহসা এক লাফে ভাঙিয়া নীলিমার দিকে ছুঁড়িয়া দিয়াই তিনি চলিয়া যাইতেছিলেন। নীলিমা ডাকিয়া তাঁহাকে ফিরাইল।

—বাড়ি যাচ্ছেন বুঝি, এন, সির ক্লাশ করবেন না?

চলিয়া যাওয়াই হয়ত তাঁহার উচিত ছিল। কিন্তু তিনি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। নীলিমার চোখে চোখ রাখিয়া জবাব দিলেন—না।...

প্রথম আলাপ তাঁহাদের এভাবেই জমিয়াছিল। প্রথম পরিচয়ের জড়তা কাটিয়া গেল একদিন।

বিজনবাবু সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিলেন—

—আচ্ছা, ক্লাশে অমন আমার দিকে তাকাতেন কেনো বলুন তো? ছি-ছি; এন, সি এটা অনেকদিন মার্ক করেচেন, জানেন?

নীলিমা দোলা দিয়া তখন হাসিয়া উঠিয়াছিল।

—কেনো বলুন তো?

—বাঃ, আমি কি জানি?...বিজনবাবু নীলিমার লম্বা, সুন্দর মুখখানার দিকে তাকাইয়া রহিলেন মুগ্ধ অপলক দৃষ্টিতে।—বাঃ, আমি জানবো কি করে?

—কেনো তাকাতাম বলবো?...বিজনবাবুর চোখ হইতে নীলিমা তাহার কাল চোখদুটি তুলিয়া লইবার কোন চেষ্টাই করিল না।—ইয়ে...কবি কিনা আপনি।

—কবি আমি!...কৃত্রিম বিস্ময়ে তিনি বুঝি ফাটিয়া পড়িলেন।—আশ্চয্যি করলেন দেখচি—জানেন, মিল রেখে দুলাইন পদ্য আমি কোনদিন লিখিনি?

—কবিতা আপনি লিখুন আর নাই লিখুন...নীলিমা গম্ভীর হইয়া জবাব দিয়াছে—কবিই আপনি। স্বপ্নালু ওই চোখদুটি তার প্রমাণ।

বিজনবাবুর আজ মনে পড়িল সেদিন হইতে নীলিকে নূতন কিছু প্রত্যহ লিখিয়া শুনাইবার তাঁহার ছিল কি অন্ধ এক ব্যাকুলতা! সেদিনই বুঝি তাঁহার কবি-জীবনের প্রথম উন্মেষ হইয়াছিল।

ছাত্রজীবনের সেদুটি বছর বিজনবাবুর নিকট ছিল মধুর এক স্বপ্ন। জলাঙ্গীর পাড় দিয়া কাঁচা-মেঠো রাস্তা ধরিয়া নীলি তাহাদের অষ্টিনহাঁকাইত নিজে রেলওয়ে পুলের দিকে। সন্ধ্যার উথল হাওয়া তাহার এলো খোপা ভাঙিয়া বিস্রস্ত চুলরাশিকে ছড়াইয়া দিত বিজনবাবুর মুখের উপর।...পুলের কাছে জলাঙ্গীর বুকে মস্ত এক বালির চর পড়িয়াছিল। তাঁহারা দুজন সেখানে প্রায়ই যাইতেন বেড়াইতে। বাহিরের সীমাহীন খোলা আবহাওয়ায় আসিয়া তাঁহারা দুজন বনিয়া যাইতেন তখন নেহাৎ ছেলে মানুষ।...

পূজার ছুটিতে সেবার ডাক্তার হর্ষবাবুরা দেশে যাইতেছিলেন। নীলি এক বিকালে আসিয়া কহিল:

—পরশু আমরা দেশে যাচ্চি।

বিজনবাবু লিখিতেছিলেন। কলম উঠাইয়া কহিলেন—

—বাঃ, অতো সকাল সকাল? এখনো তো ঢের দেরী পূজোর।

—বেশ, তা হোলে তুমি থাকো বসে। ভিড়ের ঠেলা তখন টের পাবে।

টেবিলের উপর হইতে এক গাদা বই ঠেলিয়া নীলি বসিল পা ঝুলাইয়া।—না, চলো। আমাদের সাথে যেতে হবে তোমাকে। একই তো পথ বাপু, আধা-আধি রাস্তা দুজনে বেশ যাওয়া যাবে গল্প করে।

নীলির কাল চোখদু'টিতে অটল সঙ্কল্প।

রাত্রির পদ্মা। পাশাপাশি দুখানা ডেক চেয়ারে তাঁহারা বসিয়াছিলেন। এক দিকে শুধু

গাছ-পালায় ঢাকা পদ্মার মসীময় তট-রেখা দেখা যাইতেছে রাত্রির তরল অন্ধকারে। অপর দিকে যতদূর দৃষ্টি যায়—শুধু জলে থৈ-থৈ করিতেছে। দুরন্ত পদ্মা; এখন বুঝি ঘুমাইয়া পড়িয়াছে নীরব হইয়া জোয়ারের মুখে ঘুম-পাড়ানি গানের মোহে শান্ত শিশুটির মত। স্টীমারের অশ্রান্ত গুম-গুম শব্দ শুধু বারবার তাহার তন্দ্রার ব্যাঘাত ঘটাইতেছে।

নীলি বিজনবাবুর একখানি হাত কোলের উপর টানিয়া নিয়াছিল। আঙুলে মৃদু একটু চাপ দিয়া হাসিয়া কহিল :

—বাঃ, কথা কও, অমন চুপচাপ আমার ভালো লাগেনা একটুও।

—কি কথা ?

—কথা খুঁজে পাচ্চো না, কবি! কথার পর কথা সাজিয়ে যাওয়াই তো হলো তোমাদের কাজ।

তীব্র হুইসিল দিয়া এমন সময় বিপরীত দিক হইতে অপর একখানি জাহাজ পাশ কাটিয়া অতিক্রম করিয়া গেল। অগণিত আলো আর যাত্রীর কোলাহল মুখর করিয়া তুলিল কিছুক্ষণের জন্য চারিদিক। অন্ধকারে আবার সব মিলাইয়া গেল ধীরে ধীরে।

হালকা চোখে নীলি তাকাইয়া রহিল সেদিকে অনেকক্ষণ। এক সময় বলিয়া উঠিল : রাত্রির অন্ধকার চিরে দুদিক থেকে এলো দুখানা জাহাজ। কয়েকটী মুহূর্ত্ত শুধু ছিলো পাশা-পাশি। তারপর, আবার কোথায় মিলিয়ে গেলো অন্ধকারে।...আমরাও হায়, হারিয়ে যাবো এমনি করে—আমি আর তুমিও! বড় একা—ওগো বড় নিঃসঙ্গ মানুষের জীবন!

নীলির কথাগুলি বিজনবাবুর মনেও যে ধাক্কা দেয় নাই, এমন নয়। তিনিও কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া রহিলেন। শুষ্ক একটু হাসিয়া কথার ওজনটাকে হালকা করিবার একটু চেষ্টা করিয়া তিনি পরে কহিলেন :

—বাঃ, তুমিও তো দেখচি নীলি, আজকাল বেশ কবি হয়ে উঠছো।

নীলি কিন্তু বিজনবাবুর বিদ্রূপটাকে মোটেই নিজের গায়ে মাখাইল না। হাঁসের মত সে তাহা গড়াইয়া দিল পিঠের উপর। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া থাকিয়া আপন মনে সে এবার আবৃত্তি করিয়া চলিল :

Alone, alone, all, all alone,
Alone on a wide wide sea!
And never a saint took pity on
My soul in agony.

অন্তরের প্রত্যেকটী তন্ত্রী বিজনবাবুর নীলিমার এমন শতস্মৃতিতে ভরপুর।...

দ্রুত পদে বিজনবাবু এক সময় আপনার ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। স্যুটকেশ হইতে সযত্নে

রাখা নীলির একখানি চিঠি তিনি বাহির করিলেন। নীল রঙের চিঠি—অনেক দিনকার। ভাঁজে ভাঁজে তাহা ছিড়িয়া গিয়াছে অনেক জায়গায়।

...এই তো সেদিন তোমাকে ছেড়ে এখানে এসেচি। কিন্তু আমার মনে হয়; সে যেন অনেক দিন—বহু যুগ কেটে গেছে। বাড়িতে আমাদের এতো লোক—এতো কোলাহল—এতো কলরব; তবুও নিজেকে আমার বড় একলা ঠেকে। মনে হয়; কাকে যেন আমি ফেলে এসেচি; কাকে যেন আমি খুঁজি বড় আকুল হ'য়ে, কাতর হয়ে। বড় একা—ওগো বড় অসহায় আমার মনে হয় তখন। ছম-ছম করে উঠে সর্ব্বাঙ্গ আমার ভয়ে। ব'লতে পার কেনো এমন হয়? আমি তো কিছুই বুঝতে পারি না।...মানুষের কি এটা চিরন্তন রহস্য—তার অনন্ত জিজ্ঞাসা! তুমি বলতে পারো?...

চিঠিখানা বিজনবাবু মুঠোর মধ্যে প্রাণপণে আঁকড়াইয়া ধরিলেন। আঙ্গুলগুলি তাঁহার কড়-কড় করিয়া উঠিল। চিঠির পুরোন কাগজ সশব্দে অসহায় ভাবে গোঙাইয়া উঠিল তাঁহার কঠোর মুঠির মধ্যে। তন্দ্রাহীন রাত্রির একান্ত নিঃসঙ্গতাকে ঘুচাইতে তাঁহার একমাত্র সম্বল বুঝি এই পত্রখানি।

অস্থির পদে তিনি আবার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নিবিড় রাত্রি নিঝুম ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। মৃত চাঁদ কখন ডুবিয়া গিয়াছে। আকাশে এদিক ওদিক ছড়ান কয়েকটি তারা শুধু মিটমিট করিতেছে। তাহারাও বুঝি বিজনবাবুর মত এমন নিঃসঙ্গ অসহায়!

সহসা ডানা ঝাপটাইয়া নিশাচর দু-একটী বাদুড় মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। বিজন-বাবু সেদিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। চারিদিকের জমাট নির্জ্জনতাকে আরও যেন ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে তাহাদের ডানার এই ঝটপটানি। ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার কাঁটা দিয়া উঠিল শিরশির করিয়া। দুহাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া তিনি সহসা ফুঁপাইয়া উঠিলেন অসহায় এক শিশুর মত।

দ্বন্দ্ব

(নাটক)

—পূর্ব্বানুবৃত্তি—

প্রভাত দেব সরকার

দ্বিতীয় (খ) দৃশ্য*

দরদালান

[দালানটি পূব-খোলা (আর এই খোলা দিকটা দর্শকের সাম্‌নে) উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত—পাশাপাশি তিন্‌টে ঘরকে লম্ব করে'। দক্ষিণ দিক দিয়ে নীচে নামবার সিঁড়ি। তিন্‌টে খিলেনের মাঝে মাঝে কোমর পর্য্যন্ত সবুজ রঙ-এর রেলিং দেওয়া। খিলেনের ওপর মোটা ক্যাম্বিশের সবুজ রঙ-এর পর্দ্দাগুলো গোটান থাকায় কোন ঘরের খাটের বাজু, কোন ঘরের ছত্রীর ওপর গোটান নেটের মশারী, কোন ঘরের দু' একটা অস্পষ্ট ছবি দেখা যাচ্ছে।

মাঝের দুটো রেলিং-এ একখানা ডুরে ও একখানা লাল-চওড়া-পাড় সাড়ি মেলে দেওয়া হ'য়েচে। দক্ষিণ দিকের শেষ প্রান্তে (দর্শকের বাঁ দিকে) রেলিং-এর ওপর মেনকাকে একখানা ভিজে রঙিন সাড়ি মেলে দিতে দেখা যাচ্চে।

মেনকা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, তন্বী, রজনীগন্ধার বৃন্তের মত ঋজু দীর্ঘ দেহটি। ভিজে চুলগুলো পরিপাটি করে' পিঠের ওপর ফেলা, ক্ষুদ্র কপালের মাঝখানটিতে সরু সিঁথিতে ছোট্ট একটি সিন্দূর রেখা—টিকল নাসার ঠিক ওপরে দুটী ভ্রূরেখার মাঝে একটি সিন্দূর টিপ। চিবুকের ওপর ঈষৎ খাজ—তারই কোলে পাশাপাশি দু'টি তিল। কানে তিনটি চেনওয়ালা কৃত্রিম হেম-পদ্মের দুল, দু'টী হাতে সরু সরু গাছ দশেক চুড়ি—গলায় পেনড্যাণ্ট সমেত একগাছি সরু হার। সব থেকে লক্ষ্য করবার হ'চ্চে তার দুটো চোখ—টানা-টানা, ভাসা। বয়েস চব্বিশ-পচিঁশের মধ্যে।

প্রথমেই এগুলো দৃশ্যমান হ'বে, তারপর দক্ষিণ দিক থেকে (দর্শকের বাঁ দিক) আগে গোবিন্দ, পিছে সুচারুকে ছুটে আসতে দেখা যাবে।

সুচারুর বেশের সামান্য পরিবর্ত্তন হ'য়েচে ঃ সাড়ির আঁচল মেজেয় লুটোচ্ছে, হাতে-পাকান কবরীটি ভেঙে গিয়ে পিঠের ওপর ছড়িয়ে পড়েচে—চোখ দু'টি সজল, মুখের ভাবটী অত্যন্ত অসহায়।]

মেনকা

এই, তোরা দুটোয় এতো ছুটোছুটি কোরচিস্ কেন? বাড়িতে যেন ডাকাত পড়েচে!

গোবিন্দ

তারও বাড়া!--ছোড়্‌দি কোন দিন না লোপাট হয়, যে-বুদ্ধি হ'চ্চে মেয়ের দিন দিন!

---

* এটাকে একটা বিশেষ দৃশ্য না-বলার যুক্তি এই যে, এখানে স্থানের কিছু পরিবর্ত্তন করা হ'লেও কালের বা পাত্রের বিশেষ পরিবর্ত্তন করা হয়নি—মাত্র পূর্ব্ব দৃশ্যের জের টেনে যাওয়া হয়েছে কেননা পূর্ব্ব দৃশ্যের সময়ের গতিটা এ দৃশ্য পর্য্যন্ত অনুসরণ করচে। সুতরাং বিনা বিরতিতেই দৃশ্যটা দৃশ্যমান হবে।

মেনকা

এত লোক থাক্‌তে তোর ছোড়্‌দির ওপর ডাকাতের নজরটা কেন পড়বে শুনি ?

সুচারু (বিস্রস্ত চুলগুলো হাতে পাকাতে পাকাতে কান্নার সুরে)

তোর বড় কথা হ'য়েচে ! যাকে যা নয় তাই বলিস্—ছোড়্‌দি লোপাট মানে কিরে ছোঁড়া ?

মেনকা

সত্যিই তো, অসভ্যের মত তোর ও সব কী কথা রে !

গোবিন্দ

আমার দোষটা কী ? উনিই এতক্ষণ যা ক'রলেন ! কেবল—

সুচারু (কান্নার সুরে)

কী ক'রলুম, তাই বল্ না।

গোবিন্দ

বাঃ, বেশ্ আব্‌দার যে ! কী ক'রলেন জানেন না—আবার কেঁদে জিত্‌তে চান !

মেনকা (ধমক দিয়ে)

বড় বোনকে তুই যা তা ব'লচিস্ যে বড় ! বড় বিদ্যে হচ্চে যে, দুদিন কলেজে গিয়ে পেকে গেচো দেখ্‌চি !

গোবিন্দ

আমার কী দোষ শুনি ? ঘুস্‌টে ঘুস্‌টে উনিই তো আরম্ভ ক'রলেন : সোমেশ্বরবাবু বড় উকিল না, বাবা বড় উকিল ? আমাকে শুধু শুধু disturb করবার মানে কী ?

সুচারু (কাঁদ কাঁদ হ'য়ে)

ষারে মিথ্যুক, আমি কখন ওকথা বল্‌লুম ? শুধু শুধু আমার নামে—

মেনকা

দাঁড়াও ছোঁড়া, যাচ্চি বাবার কাছে, আর কাজ খুঁজে পেলেন না. বোনেদের পেছন লেগেচো ! পড়াশুনা সব গোল্লায় গেল, না ?

গোবিন্দ

কিন্তু বড়দি, তুমি তো আর ওর মত Botany আর বাঙ্‌লা নিয়ে পাশ করো নি—দস্তুরমত B. A.তে তোমার Politics ছিল, ঠিক বিচার করে' বল কে বড়, কে ছোট। নিশ্চয়ই সো-মে-শ্ব-র বাবু ব-ড়।

[পলায়ন

সুচারু

সত্যি দিদি আমি কিছু জানি না। গোবিন্দ মিছিমিছি...(রোদন)

মেনকা (কাছে এসে সুচারুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে)

তা না জানিস্। (থেমে) কিন্তু জেনে শুনে এমন কাজ ক'রলি কেন ? জানিস্ তো বাবার মতটা, একালের উকিলদের নামে জ্বলে যান, তার ওপর ঐ সোমেশ্বরববাবু—

সুচারু (আত্মসমর্পণ করে)

তুমি আমায় বাঁচাও—গোবিন্দটা সব জেনে ফেলেচে, আর রক্ষে নেই ! সত্যি আমি কিছু জানি না।

মেনকা (হেসে)

না-জান্লেই ভাল। এমনটা হ'লো কী করে' শুনি—তাঁকেই বা তুই চিন্লি কি করে ? একেবারে এদ্দূর এগিয়ে গেচিস্ !

সুচারু

তোমার কাছে আর লুকোব না দিদি—আমি ওঁকে ভালবাসি। জানা শোনা আমাদের অনেক দিনের, ওঁর বোন আমার সঙ্গে পড়ে।

মেনকা

তা বেশ করে'চিস। তবে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা ! এতদিন জানাস্ নি কেন, বোকা মেয়ে কোথাকার ? (সুচারু নিরুত্তর) পাত্র হিসেবে মন্দ নয়। উনি বলেন, অমন বুদ্ধিমান ছেলে নাকি বাঙলা দেশে কম দেখা যায়। খুব সুখেরই কথা হোত তবে—। (থেমে) আচ্ছা, তোর সম্বন্ধে ওঁর মতটা কী, শুধু তুই চাইলেই তো আর হ'লো না। (সুচারু অধোবদন) ওঃ, বুঝেচি—গড়িয়েচে অনেকদূর। বাবাকে জানালে সোমেশ্বরবাবুর মুণ্ডপাত এখনই। যাই বাবাকে বলি, দেখি তিনি কী বলেন।

সুচারু

তোমার পায়ে পড়ি দিদি, বাবাকে জানিও না—তা হ'লে আর রক্ষে থাক্‌বে না।

মেনকা (হেসে)

দূর-র পাগ্‌লী, আমি অমনি বাবাকে জানাতে গেলুম আর কি !...তবে সোমেশ্বরবাবুকে কিছু শিক্ষা দিতে হচ্চে। বাবার ওপর শত্রুতার ঝাঁজ্ মেটাতে তাঁরই মেয়ের সর্ব্বনাশ ! নাঃ ভদ্রলোককে এবার হাতের মুঠোর মধ্যে পাওয়া গেচে, অল্পে ছাড়া হ'চ্চে না। এমন শিক্ষা দেব যে জীবনে কোন দিন ভুল্‌বেন না।

সুচারু

না, না তাঁকে কিছু জানিও না—তোমার পায়ে পড়ি।

মেনকা (কৃত্রিম কোপে)

তা তুই পায়েই পড়, আর যাই কর,—তাঁকে আমরা অল্পে ছাড়চি না। ভদ্রলোকের ছেলের এ কি কাণ্ড? (সুচারুর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে) তোর কী, বেশ করে'চিস্! এমন শিক্ষা ওঁকে দেব যে জীবনে ভুলতে পারবেন না। এত বড় স্পর্দ্ধা, আমার বোনের মনচুরি!

তৃতীয় দৃশ্য : সোমেশ্বরের শয়ন কক্ষ

[দিন পনের পরে একদিন সকাল বেলা।...ঘরটি মাঝারি সাইজের। দক্ষিণের (দর্শকের ডান দিক) দুটো জানালা ঘেঁসে পূব পশ্চিম করে' একটা সিঙ্গল-বেড খাট পাতা। খাটের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা 'টিপয়' হাতে-বোনা লংক্লথের আচ্ছাদনিতে ঢাকা। খাটের পূবদিকের (অর্থাৎ সোজা সামনে চাইলে দর্শকের দৃষ্টিটা যেখানে প্রতিহত হয়) দেওয়ালটা থেকে দৃষ্টিটাকে সরলরেখায় কিছুটা বামে টেনে আন্‌লে পিতলের রডের ওপর আধখানা-তোলা নীল পর্দ্দাসমেত দরজাটা দৃষ্টিগোচর হয়—দরজার বাইরে ঘরে আসবার চলনের পথটাও দেখতে পাওয়া যায়।...ঘরের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা বইএর আল্‌মারী, তার পরই উত্তরের যে জানালাটা আছে, তাকে ঘেঁসে ছোট্ট একটা আল্‌নার ওপর অনেকগুলো ধোপ-ভাঙা ধুতী পাঞ্জাবী, কোট-প্যাণ্টালুন,—আল্‌নাটার দুটো মাথায় দুটো ফেল্ট-হ্যাট চাপান, যদিও পূবের দরজা দিয়ে বেরিয়ে বাঁ-দিকে একটা আরশী-লাগান হ্যাট-র‍্যাক আছে; ঘরে একটিও ছবি নেই, থাক্‌বার মধ্যে কেবল উত্তর-পশ্চিম কোণের আল্‌মারীটার গা-ঘেঁসে একটা ছবি-ওয়ালা বিবর্ণ ক্যালেণ্ডার।

'টিপয়'-এর ওপর একটা ষ্টীলের ষ্ট্যাণ্ডওয়ালা আরশী, এ্যাশট্রে, খান দুই বই, একটা রাইটিং প্যাড, একটা মুখখোলা ফাউন্টেন পেন, একটা Black and White কোম্পানীর ছুরী, একটা নেকটাই, রিষ্ট ওয়াচ, গলার বোতাম একটা, খান কয়েক দুমড়ান চিঠি, একটা সেফটী রেজার—সবগুলোই ওট্‌কান।

আরশীটাকে সামনে ঘুরিয়ে খাটের ওপর উত্তরমুখো হ'য়ে বসে' সোমেশ্বর ক্ষৌর কার্য্যে ব্যাপৃত। সোমেশ্বরের বয়েস সাতাশ-আঠাশ, গৌরবর্ণ দোহারা চেহারা। প্রশস্ত কপালের ওপর পেছন-ফেরান চুলগুলো অবিন্যস্ত—উদ্ধত তীক্ষ্ণ নাসা,—দুটো ভাসা চোখের ওপর ভ্রূযুগল জোড়া—ঈষৎ লম্বা মুখের দুই গণ্ডদেশ গড়িয়ে উদ্গত শ্মশ্রুর কালো রেখা।

জোরে জোরে ব্রাশ ঘসার দরুণ আয়নার গালে সাবানের ফেনা লেগে গেচে,—তোয়ালেটার কেবল একটা কোণ কোলের ওপর আছে, বাকিটুকু মেজেয় লুটোচ্চে।]

সোমেশ্বর

নাঃ, রোজই এরকম হলে আর কাঁহাতক পারা যায়? যেখানকার জিনিষ সেখানে তো থাক্‌বেই না, তার ওপর আবার সব তচ্‌নচ! কী দরকার তবে ঘরে বাস করে? বনে বাস ক'রলেই তো সব চুকে যায়। সামান্য দাড়ি কামাবার কটা জিনিষ তাও ঠিক থাক্‌বে না!

(থেমে, আড়চোখে নীলিমাকে দেখতে পেয়ে) সংসারে কারুর দ্বারা কোন উপকার পাবার আশা মিথ্যে। তার সাক্ষী আমার ছোট বোনটী, দিব্যি আছেন খাচ্চেন-দাচ্চেন, বেণী দুলিয়ে

কলেজে যাচ্চেন,—কই একবারও কী দেখচেন দাদার অসুবিধেটা কী! (থেমে গম্ভীর হ'য়ে) দাদা ব'লতে সেকালের মেয়েরা অজ্ঞান হতো, আর এখন? দাদা ত দাদা! ভক্তি একটুও নেই, ভালবাসা এক ফোঁটাও না। এদিকে বুলি শিখেছেন, সব সমান—accident of sex is no criteria! বেশ ভাল কথা।

[নীলিমা চেঁচামেচিতে দরজায় এসে দাঁড়িয়েচে। মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে' পর্দ্দাটাকে হাতে পাকিয়ে নিষ্পলক দৃষ্টিতে দাদার মুখের ওপর চেয়ে আছে। বোনের চোখের ওপর চোখ পড়তে সোমেশ্বর একেবারে চুপ করে' ভালমানুষের মত গালের ওপর ব্রাশ ঘস্‌তে লাগলো, যেন কিছুই হয়নি।...

নীলিমা সুচারুর বয়সী—ছিপছিপে গৌর চেহারা, মুখটী পানের ছাঁচে, ঘন পল্লব রেখার নীচে চোখের কোলটী সামান্য বসা। চেষ্টাসাধ্য কাঠিন্যের আবরণের মধ্য দিয়ে মুখের ওপর "ছেলেমানুষী" ভাবটা উঁকি মারচে।]

নীলিমা (গাম্ভীর্য্যটা বজায় রেখে এগিয়ে এসে)

কী বাজে বকচো? চোখ্ মেলে দেখেচো সব ঠিক আছে কিনা! যত দোষ বোনেদের—বাবুর জ্বালায় এক মিনিটও কিছু গুছিয়ে রাখ্‌বার জো নেই, সব তচ্‌নচ্! এদিকে একাল-সেকাল নিয়ে খুব বক্তৃতা!—বোনেরা বেণী দোলায়, কলেজ যায়! বড় গায়ে লাগে নয়? (থেমে) বেশ্, কাল থেকে আমি আর কলেজে যাব না।

সোমেশ্বর (ব্যস্ত হ'য়ে)

আঃ, ওকথা কে বলেচে? না বাপু তোদের একটুতেই রাগ! কলেজ যাবিনে সে কি একটা কথা!—(থেমে) তবে ক'রবি কী শুনি?

নীলিমা

তোমাদের গোলামী করবো—দাদা ব'লতে মুহুর্মুহু অজ্ঞান হব! তা' হ'লে তো তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হ'বে? (থেমে) তোমরা তো তাই চাও!

সোমেশ্বর (ব্যস্ত হ'য়ে)

এই দেখ, কী কথায় কী এল আবার! আমি মশায় বলছিলুম (থেমে) চাকরগুলো ভারি পাজী হ'য়েচে, না, তুই নিজেই তা' গায়ে মেখে নিলি!

নীলিমা (শক্ত হ'য়ে)

তুমি তো জান তোমার এ সব কাজ চাকরে করে না—ভোর বেলায় আমি-ই সব গুছিয়ে রেখে যাই!

সোমেশ্বর

তা কে অস্বীকার ক'রচে? আমি বলছিলুম কী (থেমে) বেটা বাহাদুর এমনি পাজী, হতভাগা-যে আমি ওঠবার আগেই গোছান জিনিষগুলো সব ঘেঁটে রেখে গেচে। 'টিপয়'টার মূর্ত্তিটা দেখ্ একবার চেয়ে। আমি কী জানি না, এ কখনোই তোর কাজ নয়! (গড়গড় করে') আমার বোনের মত বোন কজনের আছে? হাজারে একটা, তাও নয়!

নীলিমা (হেসে)

কিন্তু গালাগাল দেবার বেলায় তো বাধে না ? Accident of sex, সব সমান বলে' একটু আগেও তো গালাগাল দিচ্ছিলে ! এখন আমার বোনের মত বোন আর হয় না—(থেমে) জুঁতো মেরে গরু দান তো তোমায় কেউ ক'রতে বলেনি !

সোমেশ্বর

তুই কেবল উল্টো বুঝিস্। এই তো সব জিনিষই তো দিব্যি গোছান আছে, মিছিমিছি চেঁচামেচি করে' লাভ কী। (থেমে) নীলিমা যার বোন তার কী কোন অসুবিধে হ'তে পারে ? অসম্ভব ! জানিস্ একজন মস্ত বড় লোক একটা মস্ত বড় কথা বলে' গেচেন : Brothers are rightly understood by their sisters.

নীলিমা

থাক্ আর উঠতে হ'বে না। চোখের আড়াল হ'লে যা ক'রবে তা তো আমার জানা আছে !

সোমেশ্বর (ব্যস্ত হ'য়ে)

ফের সেই কথা ! I wholly deny the charge. ব্যস এইখানেই খতম্।

নীলিমা (শক্ত হ'য়ে)

মিথ্যে বলা যাদের পেশা, তারা এই বলে এই অস্বীকার ক'রতে পারে। তাদের মুখের কথায় বিশ্বাস কী ?

সোমেশ্বর (অসহায়ভাবে)

সত্যি এ আমি এখন যা ব'লচি সব আমার মনের কথা, একটুও বাড়ান নেই,—লক্ষ্মীটী রাগ ক'রিস্নি, (থেমে) এদিকে আমার দাড়িটা যে ছিঁড়ে যাবার দাখিল !

নীলিমা (হেসে)

কিন্তু যুক্তিটা ঠিক উকিলের মত নয়।...এই তো কামাবার বাটি, খাটের তলায় এলো কি করে' ? নতুন ব্লেডটা বইএর নীচে কে রাখলে ? আয়নাটার মুখে সাবান লাগালো কী করে ?

সোমেশ্বর

সব বেটা বাহাদুরের কাজ—হারামজাদা পাজি কাঁহাকার ! (চেঁচিয়ে) বাহাদুর, বাহাদুর র-র্ !

নীলিমা

থাক্ আর ষাঁড়ের মত চীৎকার ক'রতে হ'বে না—খুব হ'য়েচে ! সর, সব ঠিক করে দিই, (আয়নাটাকে আচল দিয়ে মুছতে মুছতে কিছু পরে) আচ্ছা দাদা আমার হাতে গোছান জিনিষ আর তোমার পছন্দ হয় না, না ? (থেমে) এই ধর যদি একজন বৌদি এ সব ক'রতো, কেমন হ'তো ? বেশ নয় ? বেশ একটী সুন্দর—

সোমেশ্বর

বাঃ, বেশ ফাজ্‌লামি হচ্চে যে! ডাকবো দেখবি মাকে? দাদা ব'লে একটুও গ্রাহ্য নেই!

নীলিমা (আড়চোখে)

তা হ'লে দেখচি, সুচারুকেই তোমার খু-উব পছন্দ। মেয়েটিও ভাল, সাত চড়ে কথা নেই—একেবারে যা-কে ব-লে তো-মা-র এ-ই গ-ঙ্গা—

সোমেশ্বর

বাজে বকিস্‌নি বলচি, ভাল হবে না। কে—সুচারু, তাকে আমি চিনিই না।

নীলিমা

তা চিনবে কেন? (একটু চিন্তিত হবার ভান করে') অবিনাশবাবুর কনিষ্ঠা কন্যা! (কিছুটা নৈর্ব্যক্তিকভাবে) যার সঙ্গে একদা শরৎকালের সন্ধ্যায় শ্রীমতী নীলিমার ঘরে...এবং সেই অবধি যার জন্য দাদা আমার—

সোমেশ্বর

খুব ইয়ারকি হ'চ্চে যে, ডাকবো মাকে?

নীলিমা (কিছুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে)

তা' ডাক। আমিও মাকে ব'লচি দাদা আমার সহপাঠিনী সুচারু নাম্নী একটী সরলার প্রতি—

(মুখটিপে হেসে প্রস্থান)

সোমেশ্বর (তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে)

তু-তুই বলবি ও কথা মাকে? ছি ছি। (দরজার কাছে এগিয়ে) শোন, শোন—কী বলছিলি তোদের কলেজে Social? টিকিট কিনতে হ'বে? বেশ ভাল কথা। আর কী? তোর একটা ভাল কলম চাই? নিশ্চয়ই দেবো আজই। লক্ষ্মীটী শোন, মাকে বলিস্‌নি কিন্তু ও কথা। [ক্রমশঃ

স্বপ্নভঙ্গ
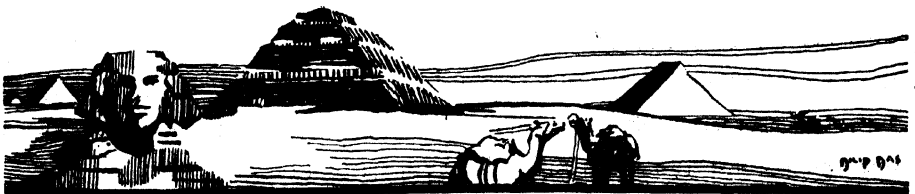
আর্য্যকুমার সেন

প্রসিদ্ধ অভিনেতা বিনোদ সরকার মারা গিয়াছেন।

সমস্ত দেশের লোক আহা আহা করছে, বলছে এমন অভিনেতা আর কোনো দিন হয়নি তারা জানে না, যে হঠাৎ আবেগের মাথায় তারা যা বলছে, তার অনেকখানিই সত্যি। এমন এক-দিন ছিল যে দিন বাংলা দেশের মঞ্চে তিনি ছিলেন একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক; লোকে তাঁকে দানীবাবু শিশিরবাবুর চেয়েও বড় বল্‌ত।

কিন্তু তিনি যে বড় অভিনেতা ছিলেন সে কথা আজ নতুন ক'রে মনে পড়ছে; মাঝের তিন-বছর পড়েনি। বছর তিনেক আগে অভিনয় করতে গিয়ে তাঁর গলায় ঘা হল, সেই থেকে কণ্ঠস্বর নষ্ট হয়ে গেল। কণ্ঠস্বর গেলে অভিনেতার কিছু থাকে না, তিনিও মঞ্চ থেকে অবসর নিলেন, স্বেচ্ছায় নয়, নিতান্ত অনিচ্ছায়। লোকে দিনকতক দুঃখ করল, খবরের কাগজে ছবি বার হ'ল। তারপরে সবাই ভুলে গেল।

নতুন অভিনেতার দল এল, নতুন তাদের অভিনয়ের ভঙ্গী। কিন্তু গলার স্বর অমন করে নষ্ট না হ'লে তাঁর পায়ের ধারে দাঁড়ানোর যোগ্যতা তাদের ছিল না। তবু সবাই তাদের সাদরে গ্রহণ করে নিল। যারা প্রথম প্রথম দিন কয়েক বলেছিল, বিনোদ সরকার এদের চেয়ে অনেক অনেক বড়, ছমাস, একবছর, দুবছর, পরে তাদেরও আর মনে রইল না। তাঁর দীর্ঘ গৌর দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, সুগভীর কণ্ঠস্বর, পাদপ্রদীপের সামনে থেকে ভালো করে সরে যাবারও তর সইল না।

দুদিনের পুরোণো খবরের কাগজ যেমন বাসী, অবসর প্রাপ্ত অভিনেতাও তেমনি।

আমারি ঘরে বসে কয়েকজন বন্ধু মিলে তাঁর কথা আলোচনা করছিলাম। একসঙ্গে তাঁর বহুনাটক দেখেছি, একবার দেখে আশা মেটেনি, তিনবার চারবার করে দেখেছি। তাঁর গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বরে প্রেক্ষাগৃহ গমগম করত, আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। তবু আমরাও ভুলে গিয়েছিলাম। আজ নতুন করে মনে পড়ল খবরের কাগজে তাঁর মৃত্যুসংবাদ দেখে।

হয়ত সুদূর ভবিষ্যতে যখন বাংলার রঙ্গমঞ্চের ইতিহাস নতুন করে লেখা হবে, তখন আবার তাঁর নাম যথোপযুক্ত সম্মান ফিরে পাবে। অল্প দূরের জিনিষ ছোট দেখায়, বেশী দূরের জিনিষ শুধু

দূরত্বের গুণেই মহীয়ান হয়ে ওঠে। হয়ত সে ইতিহাসে বাস্তবের চেয়ে কল্পনাই থাকবে বেশী, শ্রেষ্ঠ ইতিহাসের বইতে যেমন থাকে। কিন্তু সে কল্পনাকে মিথ্যে বলা চলবে না, কারণ একধরণের কল্পনা আছে, যা বাস্তবের চেয়ে সত্যি, কারণ তা বাস্তবের চেয়ে মধুর।

বছর খানেক আগের একটা দিনের ঘটনা। কলেজষ্ট্রিট আর হ্যারিসন্ রোডের মোড়ের মাথায় ফুটপাথের উপর থেকে একটা ইংরেজী সাপ্তাহিক কিনে ক্রস্‌ওয়ার্ডের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। পুরস্কার কোনো দিনই পাইনি, তবু আশা ছিল একদিন পেলেও পেতে পারি। হঠাৎ পেছন থেকে একটা কর্কশ গলার স্বর কাণে এল।

"কি মশাই? ক্রস্‌ওয়ার্ড? উঁহু, ওপথে যেওনা ভাই, ফটিংটিংএর ভয়। ওসব খেয়াল ছেড়ে দিন।"

অবাক এবং বিরক্ত হয়ে ফিরে দেখি একটা লোক, রোগা লম্বা চেহারা। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কটা চুল, গায়ের রং তামাটে। তবুও চিন্‌লাম। এই লোকটাই যে এককালে কল্‌কাতার একজন বিখ্যাত অভিনেতা ছিল, কে বলবে!

বললাম, "কি জানেন, লেগেও যেতে পারে। যদিও থিওরি অব্ প্রোবাবিলিটি—"

আমাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বিনোদ সরকার বল্লে, "উঁহু, আশা করবেন না। আশা পরমত্বঃখং, নিরাশা—কি বলে গিয়ে!"

হঠাৎ কি মনে করে আমার হাত থেকে কাগজটা কেড়ে নিয়ে উল্টে পাল্টে দেখলে। তারপর বল্লে, "তোমার নামটি কি ভাই?"

খেয়ালের বসে মিথ্যে কথা বল্লাম, বল্লাম, "বিনোদবিহারী মজুমদার।"

সত্যিকারের বিনোদবিহারী খানিক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে, "আশ্চর্য্য! আমার নাম জানো?"

"জানি বইকি! আপনার নাম না জানে কে?"

বলার সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ভাব বদ্‌লে গেল। কি যেন বল্‌তে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে বল্লে, "বাঃ, বেশ। তুমিও বিনোদবিহারী, আমিও তাই। আমরা মিতে, কি বল?"

"চমৎকার।"

"চমৎকারই ত'! চল মিতে, এককাপ চা খাওয়া যাক।"

এমন একদিন ছিল, যেদিন বিনোদ সরকারের সঙ্গে এক টেবিলে বসে চা খাওয়া ছিল পমতম সৌভাগ্য, মর্ত্ত্যের মানুষের প্রায় নাগালের বাইরে! বল্লাম, "বেশ ত', চলুন না।"

চায়ের সঙ্গে দুতিনরকম খাবারও আনতে দিয়াছিলাম। বিনোদ সরকার কিছু খেলো না। শুধু চায়ে চুমুক দিতে লাগল।

রেস্তোরাঁর কয়েকজন ছেলে বসে থিয়েটারের গল্প করছিল। অনেক দেশী বিলেতী সেটজের ও সিনেমার অভিনেতাদের নাম শোনা গেল। কিন্তু কেউ বিনোদ সরকারের নাম কর্‌লে না।

বিনোদ সরকার একদৃষ্টে তাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। খানিকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বল্লে, "দেখলে ত' মিতে, তুমি ভুল করেছিলে।"

বুঝলেও বল্লাম, "কি ভুল?"

"আমাকে কারো মনে নেই। এক তোমার মত জনকয়েক সেকেলে ছাড়া, যারা দুতিনবছর আগেও থিয়েটার দেখেছ। আশ্চর্য্য দেখলে, ওরা দুতিনজনের নাম করলে, যারা অনেকদিন আগে মরে গেছে। আমি বেঁচে আছি, আমার নামটাই বাদ গেল!"

অকর্ম্মণ্য হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে যে মরে যাওয়া অনেক লাভজনক, সে কথা ওর খেয়াল নেই। বল্লাম, "গেলই বা বাদ, সমঝ্‌দারের কাছে আপনি চিরদিন বেঁচে থাকবেন।"

সে বিমর্ষমুখে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল।

তার চা অনেকক্ষণ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বল্লাম, "আর এক কাপ দিক?" সে যেন হঠাৎ ঘুম থেকে উঠল; বল্লে' "কি? চা? না থাক।".

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ সে চেয়ার ছেড়ে উঠে বেরিয়ে চলে গেল, আমার দিকে না তাকিয়ে। অত্যন্ত অবাক হলাম, দুঃখিত হলাম তার চেয়েও বেশী।

অবাক হওয়ার অবশ্য বিশেষ কিছু নেই। কারণ ওর যে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, তা ত' প্রথম থেকেই বোঝা যাচ্ছিল। তবুও ও যে এত কথার পর এরকম অপরিচিতের মত উঠে চলে যাবে, এইটেই ভালো লাগছিল না।

চায়ের দোকানের মালিকের মুখ চেনা। একটা জীর্ণ বেশ পাগ্‌লাটে গোছের লোকের সঙ্গে চা খেতে দেখে বোধ হয় আশ্চর্য্য হয়েছিল। বল্লে, "ও ভদ্রলোক কে মশায়? মুখটা যেন চেনা চেনা লাগ্‌ল?"

"বিনোদ সরকারের নাম শুনেছেন?"

"অ্যাক্টর বিনোদ সরকার? সেই নাকি?"

"সেই।"

ম্যানেজার আফ্‌শোষ দেখিয়ে বল্লে, "আহা এত বড় লোকটার এই অবস্থা!"

আমি উত্তর দিলাম না; চলে আসার সময় ম্যানেজার বল্লে, "আগে জানলে একটু আলাপ করা যেত'।"

আগে জানলে আমিও ম্যানেজারকে দেখিয়ে বিনোদ সরকারকে বলতাম, "দেখুন, আরও একজন আপনার নাম জানে।"

চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে ট্রামের জন্যে অপেক্ষা করছি, এমন সময় কে যেন কাঁধের

উপর একখানা হাত রাখ্‌ল। পিছন ফিরে দেখি হিমাংশু ঘোষ। বল্‌লাম খবর কি ?" কোন্ চোর ডাকাতের সন্ধানে বেরিয়েছ ?"

হিমাংশু ঘোষ আমার বহুদূর সম্পর্কের আত্মীয়, কল্‌কাতা পুলিশের সাব-ইন্‌স্পেক্টর।

সে আমার কথার জবাব না দিয়ে বল্লে, "ও লোকটীর সঙ্গে অত খাতির হ'ল কি ক'রে ? খুব ত' একসঙ্গে চা খাচ্ছিলে !"

আমি সবিস্ময়ে বল্লাম, "তা রাস্তা থেকে না দেখে ভিতরে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেই ত' পারতে !"

সে বল্লে, "সেই চেষ্টাতেই ত' ছিলাম, হ'ল কই ;"

আমি বল্লাম, "তুমিও তাহলে বিনোদ সরকারের নাম মনে রেখেছ দেখ্‌ছি !"

সে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লে, "খুব ভাল ক'রেই রেখেছি।"

আমি খুসী হ'লাম। বল্লাম, "জানো হিমাংশু, ওর ধারণা, ওর কথা সবাই ভুলে গেছে। কিন্তু আমি এই কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখ্‌ছি, আমি ছাড়া আরো তুজন লোক ওকে পরিষ্কার মনে রেখেছে।"

হিমাংশু আমাকে একটা সিগারেট দিয়ে বল্লে, "তোমার সঙ্গে কি নিয়ে আলাপ চল্‌ছিল ?

"ওর তুঃখ নিয়ে। মানুষ এত ভোলা মন, যে এই সেদিনও ও যে অমন নাম করা একজন অ্যাক্টর ছিল, তা অধিকাংশ লোকেই ভুলে গেছে।"

হিমাংশু মৃত্ন হেসে বল্লে, "অ্যাক্টর কিন্তু ও এখনো আছে। ফুটলাইটের পিছন দিকে নয়, সমস্ত মানুষের সামনে, তাদের মধ্যেই। তোমার সঙ্গে আলাপ হ'ল কোথায় ?"

বল্লাম। ও সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকালো। তারপর বল্লে, "খানিকটা সময় নষ্ট করতে তোমার আপত্তি আছে ?"

"একটুও না।"

"তাহ'লে আমার সঙ্গে একটু ফাঁকা জায়গায় চল। এখানে বড় বেশী ভিড়।"

ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না। ইউনিভার্সিটী ইন্‌ষ্টিটিউটের কাছে এসে সে বল্লে. "ও এখন কি করে জানো ?"

"কি ক'রে জান্‌বো ? মনে হয় পথে পথে ঘুরে বেড়ায়।"

"প্রিসাইস্‌লি। কিন্তু পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর মধ্যেও একটা মানে আছে। আমাদের সন্দেহ,—অর্থাৎ আমারই সন্দেহ, আর কাউকে কিছু বলিনি—ও চোরাই কোকেন্ ব্যবসার দলে আছে।"

আমার সন্দেহ হ'ল, হিমাংশুরই মাথা খারাপ হয়েছে। বল্লাম, "ছোট নাগপুর অঞ্চলে রাঁচি ব'লে একটা খুব স্বাস্থ্যকর জায়গা আছে জানো ?"

ও রাগ করলে না। বল্লে, "মধ্যে মধ্যে আমারি সন্দেহ হয়, আমিই বোধ হয় ক্ষেপে গেছি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ও ঐ দলে আছে। শুধু প্রমাণের অভাবে—"

চ'টে বল্লাম, "তোমরা পুলিশের লোক, প্রমাণ দিয়ে কি করবে ? প্রয়োজন এবং সন্দেহ হলে তোমরা অক্লেশে ভগবানকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে দিতে পারো ঘটিচুরির দায়ে। যাক্‌গে, তোমার গালগল্প শুনে মাথা ধরে গেল।"

ও হেসে বিদায় নিল।

গঙ্গার ধারে হাওয়া খাচ্ছি। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পকেট থেকে সিগারেট বার করতে গিয়ে দেখি, আরও একটা কি যেন ছোট্ট প্যাকেট রয়েছে, অনেকটা দেশলায়ের বাক্সের মত। আমি নিজে এটা পকেটে রাখিনি, আগে দেখিও নি। অবাক হয়ে প্যাকেটের উপরের কাগজটা খুলে ফেল্‌লুম। ভিতরে সত্যিই একটা দেশলায়ের বাক্স। তার মধ্যে সাদা সাদা গুঁড়ো।

আমার পরম সৌভাগ্য, গঙ্গার ধারে তখন অন্ধকার। গুঁড়োটা যে কি, সেটা বুঝতে একটুও সময় লাগলো না। প্যাকেট্‌টা আবার ভালো ক'রে বেঁধে গঙ্গার মধ্যে ফেলে দিলাম, ছোট্ট একটু তরঙ্গ তুলে সেটা ডুবে গেল।

বিনোদ সরকারের অত তাড়াতাড়ি চায়ের দোকানটার থেকে চলে যাওয়ার মানে এতক্ষণে বুঝতে পার্‌লাম। নিশ্চয় হিমাংশুকে সে দেখ্‌তে পেয়েছিল। তাই অলক্ষ্যে প্যাকেট্‌টা আমারই পকেটে চালান ক'রে স'রে পড়ে, যাতে খানাতল্লাসী করলেও কিছু ধরা না পড়ে।

গঙ্গার ধারে ব'সেই রইলাম, সন্ধ্যা আস্তে আস্তে রাত্রিতে পরিণত হ'ল। আমার মনে হ'ল একটা বাড়ী আমি নিজের হাতে গড়ে আকাশ পর্য্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলাম, কে যেন নিষ্ঠুর আঘাতে এক মুহূর্ত্তে তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিল।

সেই বিনোদ সরকার আজ মৃত। যে কণ্ঠস্বরে অতি সাধারণ নাটকের অতি সাধারণ চরিত্র মহান্ হয়ে উঠ্‌ত, তা তিন বছর আগে নীরব হয়েছে। সত্যিকারের মৃত্যু তাঁর সেইদিনই। আজ তাঁর দ্বিতীয় মৃত্যু।

বন্ধুদের আলোচনা যখন দুই ঘণ্টা ধরে চলে বিনোদ সরকারের প্রভূত গুণাবলীর বর্ণনা প্রায় নিঃশেষ ক'রে ফেলেছে, তখন সহসা উল্টো সুর বাজ্‌লো। একজন বল্লেন, "লোকটা নাকি অসম্ভব মাতাল ছিল!"

বাকীদের মধ্যে দুতিনজন সায় দিলেন। আর একজন বল্লেন, "অতিরিক্ত মদেই ত' গলা নষ্ট হয়ে গেল, নইলে—"

আমি বাধা দিয়ে বল্লাম, "তোমরা কেউ কিছু জানো না। আমি বিনোদ সরকারের সঙ্গে কিছুদিন যাবৎ পরিচিত ছিলাম, আমি জানি, তিনি ছিলেন মানুষ। সাধারণ মানুষের দোষ ত্রুটি তাঁর যে না ছিল তা নয়, কিন্তু গুণ ছিল অনেক বেশী। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দোষ ত্রুটীর কথা ভুলে যাও, তাঁর যে সব গুণে তোমরা মুগ্ধ হয়েছিলে, সেই সব মনে রাখো। শ্মশানের আগুনে তাঁর যা কিছু তুচ্ছ দুর্ব্বলতা সব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, বাকী আছে শুধু একটা বিরাট অভিনেতা, একটা মহান্ চরিত্র, তার বেশী আমাদের জানার কিছু দরকার নেই।"

বন্ধুরা সমস্বরে বল্লেন, "AMEN"!

মুহূর্ত্ত

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

দিনের প্রহর শেষে এইবার সান্ধ্য ক্ষরস্রোতে
বাতাসের বন্যা নামে উতরোল হবে বনতল।
আমার ক্লান্তির 'পরে আকাশের অন্তরীক্ষ হ'তে
ঝরে' যাক্ হিম বায়ু মেঘ ভেঙে শিশিরের জল।
হয়তে অদূরে কোথা মৃত নদী হ'য়েছে মুখর,
কল্পনায় স্বপ্নে আজি সাম্যরাজ্য ঝিকিমিকি জ্বলে।
আসন্ন বিপ্লব শেষে আসিবে কি ভাবি এরপর
নতুন জ্বলন্ত দিন ছায়াবীথি নবধারা জলে?

আশাবাদে ছিন্নভিন্ন বেদনার আমরা সন্তান।
কায়মনে ম্লানদেহে প্রত্যহের গ্লানি পরাজয়।
সকরুণ সান্ধ্যস্রোতে মনে হয় কাহার আহ্বান
দুয়ারে শিকল নাড়ে ভগ্নবুকে দেয় বরাভয়।
উতলা হ'লো কি রাত হিমগন্ধে বায়ু ভরপুর।
প্রশ্ন জাগে মুক্তি কবে কোন্ পথে কোথা কতদূর॥

মূর্খের ধর্ম্ম

'রিলিজ্যান মেড্ ইজি'

অধ্যাপক অনাথ গোপাল সেন

বড় হ'য়ে ভাব্‌তে শেখা অবধি যে প্রশ্ন আমাদের অহরহ বিভ্রান্ত ক'রে এসেছে তা হচ্ছে এই যে,—আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? আমরা কোথা হতে আসি, কেন আসি, জীবন শেষে অর্থাৎ মৃত্যুর পর কোথায় আমরা যাব, এ জীবনে আমাদের কর্ত্তব্য কি? এ সব জটিল প্রশ্নের উত্তর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ঋষি ও দার্শনিক পণ্ডিতগণ নানাভাবে দিয়েছেন এবং এ সব প্রশ্ন সম্বন্ধে ভিন্ন ধর্ম্মের ভিন্ন মতবাদ সব রয়েছে। ভাবপ্রবণ অধ্যাত্মবাদী ভারতবাসীরা ত এ সব তত্ত্ব কথা নিয়ে চিরকালই বিশেষভাবে মাথা ঘামিয়ে আস্‌চেন। আমাদের গ্রামের নিরক্ষর চাষীও এ সব তত্ত্বকথার এক একটী ক্ষুদে পণ্ডিত। এক দিকে পুনর্জ্জন্ম ও কর্ম্মফল ভোগ দ্বারা পুনর্জ্জন্ম হ'তে মুক্তি, অন্য দিকে মৃত্যুর পর কর্ম্মানুযায়ী অনন্ত স্বর্গ বা অনন্ত নরক এবং তারই লোভনীয় ও মনোরম চিত্র কিংবা ভয়াবহ লোমহর্ষক বর্ণনা। কিন্তু এক বিষয়ে সকল ধর্ম্মই এক মত—সমগ্র পৃথিবীর উপর একজন সর্ব্বশক্তিমান উপরওয়ালা আছেন, তিনিই আমাদের ঈশ্বর, খোদাতাল্লা, 'গাড্'। তিনি পাপীকে শাস্তি দেন, পুণ্যবান্‌কে পুরস্কৃত করেন, সৃষ্টিকে তাহার মঙ্গল হস্তে ধারণ ও পরিচালন করেন। তিনি করুণাময় ও সর্ব্বমঙ্গলময় ইত্যাদি। কিন্তু তাঁর সম্বন্ধেও আবার সাকার—নিরাকারের চিরন্তন দ্বন্দ্ব রয়েছে। আমরা অবশ্য কোন শাস্ত্রই ভাল ক'রে পড়িনি; কিন্তু যারা ভাল ক'রে পড়েছেন এবং অনেক ভেবেছেন—তারাও যে ঈশ্বরের সঠিক রূপ ও গুণ এবং ইহকাল ও পরকালের নিশ্চিত পরিচয় বা হদিশ পেয়েছেন, ধর্ম্ম জগতের কোলাহল শুনে তাত মনে হয় না। হদিশ পেলেও হদিশ দিবার নাকি উপায় নেই; কারণ লবণের পুতুল লবণ সমুদ্রে জল মাপতে গিয়ে যেমন ফিরে এসে রিপোর্ট দাখিল কর্‌তে পারেনি, তেমনি ভগবান্‌কে যে মহাপুরুষ পেয়েছেন তিনি ভগবৎ-প্রেমসমুদ্রে তলিয়ে যান—সেখানকার রিপোর্ট আমাদের মত মর্ত্ত্যবাসীদের দেবার মত তার আর অবস্থা থাকে না। সুতরাং আমাদের শাস্ত্রের শেষ কথা হলো—

> কা-তব-কান্তা কস্তে পুত্রঃ সংসারোঽয়ম্ অতীব বিচিত্রঃ।
> কস্য ত্বং বা কুতঃ আয়াতস্তত্ত্বং চিন্ত্যায় তদিদং ভ্রাতঃ॥

"কে বা তোমার স্ত্রী, কে বা তোমার পুত্র, তুমিই বা কার এবং কোথা থেকেই না এলে, বসে বসে বিচিত্র এ সংসারের সে সব তত্ত্ব কথাই চিন্তাকর।" যারা চিন্তা করবার যোগ্য এবং যাদের তত্ত্ব চিন্তার সাধ এখনও মেটেনি তারা সে চিন্তা করুন। সংসার সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্য তারা যদি অর্ণবপোত বা ব্যোমযানের ব্যবস্থা করতে পারেন তাহ'লে তারা তা' কর্ত্তে পারেন—তাদের সঙ্গে আমাদের কোন ঝগড়া নেই।

আমাদের দুঃখ শুধু এই যে তত্ত্ব চিন্তা ক'রে ক'রে পায়ে হাঁটা পথ, অগত্যাপক্ষে গরুর গাড়ী, এর উপরে আমাদের অন্য বাহন আজো পর্য্যন্ত জুটলো না। আর যারা তত্ত্ব কথার মাথায় চাঁটী দিয়ে নিজের উপরই অখণ্ড বিশ্বাস নিয়ে নির্ভাবনায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই সংসারে তারাই আজ স্বর্গপুরী ও পুষ্পক রথের অধিকারী হয়েছে। আমরা ঘরে বসে এই ভেবে বিজ্ঞের মত নিজের আত্মায় সান্ত্বনা প্রলেপ লেপন করছি যে বেটাদের পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেল। কিন্তু অপূর্ণ কামনার আগুন সারা জীবন বুকে বয়ে অপমানে লাঞ্ছনায় দুমুঠা আতপান্ন ও কাঁচা কলা ভক্ষণ করলেই কি আমাদের পরকাল ইন্‌সিওর করা হবে? এখানে সেই সুপরিচিত পৌরাণিক গল্পটী আমাদের মনে পড়ে যাচ্ছে। রাজর্ষি জনকের নাম শুনে আবাল্য ব্রহ্মচারী সংসারবিরাগী বেদব্যাস সুত শুকদেব এসে একদিন মিথিলায় উপস্থিত। রাজর্ষি সম্বন্ধে কত কি ভেবে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে তিনি এসেছিলেন বহুদূর থেকে। কিন্তু উপস্থিত হয়ে চোখের সম্মুখে যে দৃশ্য দেখ্‌লেন তাতে তার বুদ্ধি লোপ পাবার মত অবস্থা হল। রাজর্ষি রাজপ্রাসাদে সুসজ্জিত দুগ্ধ ফেননিভ পালঙ্ক শয্যায় শায়িত, আর চারি পার্শ্বে সুন্দরী রাজপরিচারিকাবর্গ তাহার দেহের বিলাস প্রসাধনে রত। রাজর্ষি শুকদেবের দিকে তাকিয়ে তার মনের বিস্ময়াভিভূত ক্ষোভ ও বেদনা অনুমান কর্ত্তে পারলেন; কিন্তু মুখে তাকে কিছুই বল্লেন না—শুধু একটু হাসলেন। তারপর একদিন মিথিলার রাজপ্রাসাদে অকস্মাৎ অগ্নিদেবতার হল আবির্ভাব। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হো'ল। রাজপুরীর অতুল বিভব ও ঐশ্বর্য্য কিছুই অগ্নির লেলিহান জিহ্বার সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার হাত থে'কে রক্ষা পে'ল না। সবাই যখন চারিদিকে ছুটাছুটি ও কপালে করাঘাত ক'রে "হায় হায় কি হো'ল!" ব'লে চীৎকার ক'রছে, তখন রাজর্ষি জনক এক পাশে নির্ব্বিকারচিত্তে দাঁড়িয়েছিলেন—তার মধ্যে কোনরূপ উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার ভাব তো দেখা যাচ্ছিল না, বরং মুখে যেন ঈষৎ হাসির রেখা পরিস্ফুট মনে হচ্ছিল। ঠিক তখনই শুকদেব কিন্তু ছুটেছেন উর্দ্ধশ্বাসে ঘর থেকে তাঁর ন্যাংটিখানা উদ্ধার ক'রে আনবার জন্য। সেখানা হাতে করে যখন ফিরছেন তখন রাজর্ষির সস্মিত প্রশান্ত মূর্ত্তি তার চোখে পড়্‌লো। এক মুহূর্ত্তে তিনি নিজের অবস্থার সঙ্গে রাজর্ষির অবস্থার তুলনা ক'রে লজ্জায় ম্রিয়মান হ'য়ে পড়্‌লেন। তিনি বুঝতে পারলেন সর্ব্বত্যাগী হলেও মানুষের মনের কোণে সামান্য মোহ ও লোভ কেমন কৌশলে আত্মগোপন ক'রে থাকে; আবার সর্ব্বভোগী হ'য়েও মানুষ কি রকম সম্পূর্ণ মোহমুক্ত বা নিষ্কাম হ'তে পারে।

সুতরাং ও সব হেঁয়ালীপূর্ণ প্যাঁচানো তত্ত্ব চিন্তার পথে আমরা যা'ব না। ও পথের কূল-কিনারা কিছু নেই—আছে কেবল ছেলে ভুলানো ভবিষ্যতের লোভ। আমাদের বা'র ক'রতে হ'বে সহজ ও সোজা পথ এবং তাকে তৈরী করতে হবে ক্ষুর ধার বিচার বুদ্ধি দিয়ে যাতে সকল রকম যুক্তি তর্কের বজ্‌ কঠিন আঘাতে সে ভেঙে না পড়ে—তাকে 'মিষ্টিসিজ্‌ম্' বা মানুষের জ্ঞানের অগম্য কোন তত্ত্ব কথার আড়ালে আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয় নিতে না হয়। অধ্যাপক কালীপদ বসু বীজগণিতকে সহজ করে, ('এ্যাল্‌জাব্রা মেড্‌ ইজি') বহু ক্ষীণ বুদ্ধি শিক্ষার্থীর পথ সুগম ক'রে

দিয়ে গিয়েছেন। আমরাও তেমনি সহজ অথচ বিচারসহ এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার ক'রে 'নানা মুনির নানা মতের গোলক ধাঁধাঁ থে'কে উদ্ধার ক'রে মানুষকে এক সোজা সদর রাস্তায় তু'লে দিতে চাই। তা করতে হো'লে প্রথমেই আমাদের মস্তিষ্কের আঙ্গিনা থেকে এতকালের তত্ত্ব কথার স্তূপীকৃত আবর্জ্জনাকে ঝেঁটিয়ে দূর কর্‌তে হ'বে। নইলে পদে পদে আমাদের মোহাভিভূত হ'বার ও পথ ভুল্‌বার সম্ভাবনা।

তারই লিষ্ট একে একে নিম্নে উল্লেখ ক'র্‌ছি ঃ—(১) কোথা থেকে আমাদের আগমন? এ ভাবনা আমরা ক'রবো না। কারণ এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না সুতরাং তা একেবারে নিষ্প্রয়োজন।

(২) আমি কে? এ প্রশ্ন নিয়েও মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। আমিই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মাই আমি, বেদান্তের এই মহাবাণী নৈয়ায়িক ও দার্শনিকদের জন্য তোলা থাক্। পঞ্চভূতের হাত থে'কে দেহটাকে ও একাদশ ইন্দ্রিয়ের তাড়না থেকে মনটাকে রক্ষা ক'র্‌তেই আমাদের প্রাণান্ত। আমিই ব্রহ্ম শুধু মুখে ব'ল্‌লেই আধি-ব্যাধি-জরা-মৃত্যু-ভয় থেকে রক্ষা পাচ্ছি কোথায়? সুতরাং অত বড় তত্ত্বকথা আমাদের এখনও না হ'লেও চ'ল্‌বে।

(৩) কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ? এই প্রশ্নের উত্তরই বা কেন চিন্তা ক'র্‌বো? আমার কান্তা ও আমার পুত্র আমার কেহ নয়, এই কি তার ইঙ্গিত? এই ইঙ্গিত যেমন অসঙ্গত তেমনি অর্থহীন। আমি যদি তাদের ভাল মন্দ চিন্তা না ক'র্‌বো তবে কি অপরে ক'র্‌বে? আর আমি ক'র্‌বো অপরের কান্তা ও পুত্রের চিন্তা? নিজের স্ত্রীপুত্রের চিন্তা পরিত্যাগ ক'র্‌লেই যে তাদের ভার ভগবান বা অপর কেহ গ্রহণ ক'রবেন এবং আমার ভাগ্যে ঘ'ট্‌বে পরম মোক্ষলাভ, দে'খে শু'নে তা তো মনে হয় না। তবে কাতব কান্তা ইত্যাদি ভে'বে কার কি উপকার হ'বে? সুতরাং ঘর যখন বেঁধেছি, নিজ হাতে সে ঘর কখনো ভাঙ্‌বো না। গৌতম বুদ্ধ, চৈতন্য মহাপ্রভুর ন্যায় মহাপুরুষগণ অজানার সন্ধানে ঘর ছা'ড়তে পারেন। আমাদের মত সাধারণ মানুষের জন্য সে পথ তৈরী হয়নি; সুতরাং মাতাপিতা স্ত্রী পুত্রের সহিত যে সম্বন্ধের বিষয় সাংসারিক হিসাবে আমরা অবগত আছি তার বাইরে অন্য কোন অদৃশ্য সম্বন্ধের বা অ-সম্বন্ধের সন্ধান করতে চেষ্টা আমরা ক'রবো না। এ বিষয়ে আমাদের নীতি হবে "চ্যারিটী সুড্ বিগিন এ্যাট্ হোম্"।

(৪) "পরকাল"এ শব্দটাকে আমাদের অভিধান থেকে একেবারে বাদ দিতে হ'বে। কারণ "পরকালের" মোহ ও আকর্ষণ আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি ক'রে এসেছে। এরই মোহে আমরা ইহকালকে চিরকাল ধ'রে অনেকখানি অবহেলা ক'রে এসেছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষরা পরকালে পৌঁছে কি অমূল্যধন লাভ ক'রছেন তার খবর অবশ্য আমরা পাইনি; কিন্তু ইহকালে যে অনেক অমূল্যধন হারিয়েছিলেন তাদের বংশধর হিসাবে আজো পর্য্যন্ত আমরা তার ফলভাগী হ'য়ে হাড়ে হাড়ে তা' বুঝ্‌তে পার্‌ছি। সুতরাং ইহকাল হতে পরকালকে কখনো আমরা বড় বলে মানবো না। কারণ আমরা—

"যঃ ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য অধ্রুবাণি নিসেবতে।
ধ্রুবাণি তস্য নশ্যন্তি অধ্রুবম্ নষ্টমেবচ ॥"

এই উপদেশের সারগর্ভত্ব সম্পূর্ণ স্বীকার ক'রে যাহা আমার সম্মুখে উপস্থিত, যাহা জীবন্ত বা মূর্ত্ত তাকে সাদর অভ্যর্থনা না ক'রে মায়ামরীচিকাচ্ছন্ন অজ্ঞেয় পরলোকের সুখ সৌভাগ্যের আশায় দু' নৌকায় পা দিয়ে (সংসারী লোকদের পক্ষে নিশ্চয়ই তা না হ'য়ে উপায় নেই) দু'কূল, অন্ততঃ নিশ্চিত কূল, হারাবার মত বুদ্ধিহীনতার পরিচয় আর আমরা দিচ্ছি না। সুতরাং দেহান্তে স্বর্গ না নরক, আর যদি পুনর্জ্জন্ম থাকে, তবে ক্রিমি কীট না মানস সরোবরের পরমহংস কিংবা ক্ষীর সরোবরের রাজহংস হ'য়ে জন্মাবো, সে সম্বন্ধে আমরা আমাদের মনকে স্রেফ্ সাফ্ রাখ্‌বো।

(৫) পরকালের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে—পরলোক, স্বর্গ-নরক, পুনর্জ্জন্ম, পূর্ব্বজন্ম ইত্যাদি। এদের সবাইকে এক সাথে মন থেকে ঝেড়ে ফেল্‌তে হবে, তা' বলাই অনাবশ্যক। নরকের বরবাদে অবিশ্যি কারো আপত্তি নেই; কিন্তু পুণ্যের প্রাপ্যটা মৃত্যুর পরেও বীমাপত্রের 'অ্যান্নুয়িটির' মত স্বর্গবাসের অধিকাররূপে পাওয়া গেলে মন্দ হ'ত না, এমন একটা দুর্ব্বলতা আমাদের আস্‌তে পারে। তারপর, ইহলোক ও ইহকালের পর আর কোন লোকোত্তর স্থান বা কাল নেই যেখানে আমাদের প্রস্থিত প্রিয়জনের সাথে আবার দেখা হ'তে পারে এ কথা মনে হ'লে অন্তরের স্নেহ-প্রীতি-প্রণয়ের সমস্ত 'নার্ভ'গুলি ব্যথায় যেন টন্‌টনিয়ে ওঠে। এ জন্মেই সব শেষ! যা'দিগকে জীবনে এত ভাল বেসেছি, যারা আমাকে এত ভাল বেসেছে, যা'দের নিকট বিদায়ের বেলায় উদ্বেলিত অশ্রুধারা ও রুদ্ধ কণ্ঠের অস্পষ্ট ভাষার মধ্যেও বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি ও পেয়েছি "আবার দেখা হবে, অপেক্ষা করব"—এ সবই কি মিছে? হ্যাঁ, মিছে। মিথ্যা মোহ নিয়ে ভুলে থাকবার সস্তা সখ্ আমাদের ছাড়্‌তে হবে। এ জন্মের প্রাণপ্রিয় পরিজনের সাথে পরকালে পুনরায় দেখা হ'বার আশা পূর্ণ না হ'লে কি করে এ প্রাণ ধারণ করবে—ভেবে যদি তোমার প্রাণান্ত হ'বার মত হয় তা'হলে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দেব, তোমার পূর্ব্বজন্মের প্রিয়জনেরা কোথায় আছে তা'র খবর কখন নিয়েছ কি? (অবশ্য "জন্মজন্মান্তরে তুমি নিশ্চয়ই আমার প্রাণনাথ ছিলে" নাটক-নভেলের এ সব কাব্যিক উচ্ছ্বাস এখানে ধর্ত্তব্য নয়)। তাদের খবর না পেয়ে ও না নিয়ে এ জন্মে নূতন ক'রে সংসার পাত্‌তে ও নূতন প্রেম বন্ধনে বাঁধা পড়্‌তে যদি কোন বাধা না হ'য়ে থাকে, তা'হলে এবারকার নূতন গোষ্ঠিকে না হ'লে পরজন্ম একবারে অচল হ'বে কোন্ মুখে তা দাবি ক'র্‌বে? আমাদের আগের দৃশ্যে যেমন মস্ত একটা শূন্যতার যবনিকা, পরের দৃশ্যেও তাই; এটাই তো "লজিকাল"। বর্ত্তমান দৃশ্যই জমাট অভিনয়ের দৃশ্য—যার কোথাও কিছুমাত্র ফাঁক্ বা শূন্যতা নেই—যা'কে সার্থক ক'র্‌বার ভার ষোল আনা আমাদের ওপর। ভূত-ভবিষ্যতের কথা আমরা চিন্তা করব না—বর্ত্তমানটাই হ'বে আমাদের কাছে নিরেট সত্য ও সর্ব্বস্ব।

তা' হ'লে কি চার্ব্বাকের ন্যায় আমরা সম্পূর্ণ জড়বাদী এবং তা'রই প্রচারিত, "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং

পিবেৎ, যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ" —এই নীতিই কি আমাদের মত অমৃতের সন্তানদের জীবনাদর্শ ? না, সে কথা বল্‌তে চাইনে।

অতদূর যাবার দুঃসাহস আমাদের নেই ; কারণ ঋণ ক'রে ঘি খেলে পৈতৃক প্রাণটাও যেমন কিঞ্চিৎ তাড়াতাড়ি হারাবার আশঙ্কা, তেমনি তার ওপর আবার আইন-আদালতের ফ্যাসাদও আছে। পরকালকে অস্বীকার ক'রলেও, চোখের সামনে সদা বিদ্যমান আইন আদালতের ফাঁদকে অস্বীকার ক'রতে পারি না। কারণ আজ আর শুধু প্রেমের ফাঁদ নয়, আইনের ফাঁদও, চারিদিকে পাতা ভুবনে কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে। সুতরাং চার্ব্বাকের মতের সহিত 'শত হস্তেন বাজীনঃ'। এ সম্পর্কে আমরা বরং সেক্সপিয়ারের Neither a borrower nor a lender be" এই নীতি গ্রহণ ক'রতে রাজী আছি।

তা' তো বু'ঝলুম ; কিন্তু অধ্যাত্মবাদের সব গোড়ার কথাগুলি যে ভাবে আপনি অস্বীকার ক'রছেন তাতে আপনার জীবন-বেদ যে কি তা'ও তো বোঝা যাচ্ছে না ? পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, পরকাল-পুনর্জন্ম এসব নিয়ে মানুষের মাথা ঘামা'বার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই, যেমন একদিকে ব'লছেন, আবার চার্ব্বাকের পথে পা বাড়াতেও সাহস পাচ্ছেন না। তাহলে আপনার মতটা কি শুনি ? ঈশ্বর-টীশ্বর কিছু মানেন ? না, তাও মানেন না ?

এতক্ষণে ভাই to the point প্রশ্ন করেছ —তার উত্তর ও আমি একেবারে to the point দেব। বাংলার কম্যুন্যাল এওয়ার্ড (Communal award) নিয়ে কংগ্রেস এককালে যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তার কথা মনে আছে ? They neither accept nor reject it. ঈশ্বর সম্বন্ধে আমারও হচ্ছে সেই কথা। তিনি আছেন কি নেই, সেটা আমার কাছে অবান্তর, এইজন্য যে তিনি যদি থেকে থাকেন তাহলে তাঁকে দিয়ে আমরা আমাদের যে মতলব সিদ্ধ করতে চাই তা কখনও হবার নয়। তিনি তাঁর নিজ আইনে চলেন—তাতে আমাদের কার সুখ আর কার দুঃখ হল সেদিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। চাল কলার নৈবেদ্য দিয়ে কিংবা পাঁটা উৎসর্গ ও গো-কোরবাণী করে তাঁকে তুষ্ট করে কাজ হাঁসিল করা যায় না ; গ্যালন গ্যালন চোখের জলেও তাঁকে relent করতে দেখলুম না—যখন তিনি কাউকে মারতে সুরু করেন। মোট কথা তাঁকে প্রেমের ঠাকুরই বল, আর দয়ার সাগরই বল, করুণানিধান নামেই ডাক, আর পাষণ্ডদলনীরূপেই চিন্তা কর, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান, সচ্চিদানন্দ যেরূপেই ভজনা কর না কেন, তার 'রায়' বদলাবার নয়। এই 'রায়' অলঙ্ঘ্য, অপরিবর্ত্তনীয় আইন কানুনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভগবান যদি কেহ থেকে থাকেন তবে আমি বলব তাঁর দয়া নেই, মমতা নেই, খঞ্জ-অন্ধ-মূকের প্রার্থনায় তিনি কান দেন না, বালবিধবার বুকের আগুন তাকে স্পর্শ করতে পারে না ; অন্ধের যষ্টি, শেষ অবলম্বন, একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে দীনাহীনা জননীর হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদে বায়ুমণ্ডল ভারী হয়ে উঠলেও তার আসন টলে না। কত লক্ষ লক্ষ মানুষ নিত্য, প্রতি মুহূর্ত্তে শোকে তাপে, ব্যাধির অসহ্য যন্ত্রণায়, জঠরের নিদারুণ জ্বালায় তার চরণে "দয়াময়! দয়া কর, কৃপা কর, রক্ষা কর" বলে চিৎকার করছে ; কিন্তু কৈ, ভাগ্য কি

তাদের বদলায়, দুঃখ কি তাদের ঘোচে? অমোঘ বিধানের কি কিছু পরিবর্ত্তন হয়? জগন্নাথের রথচক্র কি তেমনি অবিচলিতভাবে মানুষের বুকের উপর দিয়ে চলছে না? তোমরা গদ্‌গদ্‌ হয়ে বল—"অহো, করুণাময় ঈশ্বরের কি অপরূপ বিধান! শিশু না জন্মাতে তিনি মা'র বুকে দুধ দিয়ে রেখে দিয়েছেন!" কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, সেই দুধের শিশুকে মায়ের বুক থেকে কেড়ে নিতে কি তোমরা দেখনি? মায়ের বুকের আগুনে সে দুধ পুড়ে কাঠ হতে দেখনি? ধর্ম্মাত্মা সাধু ও পণ্ডিতের ভাগ্যে নিগ্রহ, নিপীড়ন ও লাঞ্ছনা এবং ধূর্ত্ত, শঠ ও লম্পটের কণ্ঠে জয়মাল্য ও কপালে রাজটীকা কি অহরহ দেখ্‌তে পাচ্ছ না? অগণিত নর-নারীর উৎপীড়িত আত্মা বিচারের প্রত্যাশায় তোমাদের বিশ্বনিয়ন্তার দিকে যুগযুগান্তর ধরে হতাশ নয়নে তাকিয়ে আছে, তাকি অনুভব কর্ত্তে পারছ না? তবে কেন তোমাদের ঈশ্বরের কাছে করুণা ভিক্ষা করবো, কেন হাত পাতবো? কিসের আশায়? সান্ত্বনা লাভের আশায়? যে হাত আমাকে আঘাত করবে তারই কাছে চাইবো সান্ত্বনা, এই বলে, "হে করুণাময় পরমেশ্বর! তুমিই দিয়েছিলে, তুমিই নিয়েছ, তোমার ইচ্ছাই জয়যুক্ত হউক, পূর্ণ হউক!" মানুষ হয়ে জন্মে এমন মূঢ়তা ও দুর্ব্বলতা যেন আমার না হয়। কারণ এতে ভাগ্য আমার পরিবর্ত্তিত হবে না নিশ্চয়—লাভ হবে শুধু অপমান।

আমরা ভগবানে বিশ্বাস করি বলে ভান করি, ভগবানকে ডাকি তাকে মিষ্ট কথায় ভুলিয়ে নিজের কিছু মতলব হাসিল করে নেব বলে। তা যদি না হতো তবে তার পিছনেই বা যাব কেন, আর তার যারা চেলা ও ভক্ত তাদেরই পাদোদক সেবন ও পদসেবা করবো কেন? তাদের 'আনন্দ' বর্দ্ধন এবং 'স্বামী'ত্বকে অধিকতর মর্য্যাদা দান করাই কি আমাদের একমাত্র নিছক নিস্বার্থ উদ্দেশ্য?

তবে কি আপনি বলতে চান, ঈশ্বর নেই?

সে কথা তো আমি বলি নি। তিনি থাকতে পারেন—আপনার এবং আমার আত্ম তৃপ্তির জন্য মেনে নিলুম, তিনি আছেন। কিন্তু আমি যা বলতে চাচ্চি তা হচ্ছে এই যে, তাতে আমাদের কি আস্‌ছে যাচ্ছে? কারো খোসামুদি বা স্তব স্তুতিতে ভুলবার মত ভবী ত তিনি নন।

এত বড় একটা বৃহৎ শক্তির দ্বারা অভিভূত হওয়া, তার প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হওয়া কি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়?

না, নিজের অসংখ্য সমস্যাকে উপেক্ষা করে অপরের মহিমা ও শক্তি নিয়ে অহেতুক মাথা ঘামিয়ে আমার লাভ? একে আমি নেহাৎ দুর্ব্বলতার লক্ষণ বলে মনে করি। যারা দুর্ব্বল তারাই নিজে কিছু না করে দিবারাত্র হয় অপরের মহিমা, নয়ত অপরের কুৎসা করে বেড়ায়। এই দুই কাজই অযোগ্য অপদার্থ মানুষের কাজ। তন্মধ্যে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল ও এক রকম ব্যাধিগ্রস্ত লোকের কাজ। মানুষের দুর্ব্বলতার যত রকম worst form of exploitation আছে তার মধ্যে এটা অন্যতম।

তাহ'লে এই দাঁড়াচ্ছে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব আপনি একেবারে অস্বীকার করেন না—তবে তাকে মান্য বা ভক্তি করতে আপনি প্রস্তুত নন। কারণ তাতে আপনার মতে লাভ কিছু নেই। আচ্ছা

তা'হলে ঈশ্বরের অস্তিত্বটাকে একেবারে অস্বীকার করলেই তো পারেন—তাঁর উপর এতটুকু অনুগ্রহ বা দুর্ব্বলতা দেখাবারই বা কি প্রয়োজন ?

প্রয়োজন একটু আছে বৈ কি ?—ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে পারি ; কারণ তার সাক্ষাৎ পরিচয় পাই না। কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌর জগৎ বা বিশ্বসংসারকে ত অস্বীকার করা চলে না। কারণ It is very much alive and kicking. এই সৌরজগতের আইন কানুনকেও অস্বীকার করতে পারি না। তারা যেমনই অমোঘ তেমনি অলঙ্ঘ্য। এখন শুধু প্রশ্ন হচ্ছে, এই সৃষ্টি ও সৃষ্টির অবিরাম গতির পেছনে কোন চৈতন্যময় সত্তা আছে, না, স্বতঃস্ফূর্ত্ত নিয়মের বশীভূত হয়ে অন্ধভাবে একটী মেশিনের মত এটা ঘুরছে ? সৃষ্টির মধ্যে যদি জড় জগত ভিন্ন প্রাণীজগত না থাকতো, তা'হলে এ প্রশ্ন উঠতো না ; কারণ এ প্রশ্ন তুলবার মত কেউ তখন থাকত না। কিন্তু প্রাণীজগতের দিকে তাকিয়ে, বিশেষতঃ মানুষকে দেখে ও মানুষ হয়ে জন্মে আমরা এ কথা অস্বীকার করতে পারি না যে সৃষ্টির মধ্যে একটা চৈতন্যময় সত্তা রয়েছে। কিন্তু তার পেছনেও আমাদের চাইতে বড়, সর্ব্বময় প্রভুরূপে কোন চৈতন্যময় সত্তা আছে কিনা সেইখানেই সন্দেহ। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলেছি, সেই সন্দেহ নিয়ে মাথা ঘামাবার কোন প্রয়োজন নেই। প্রভু আছেন কি নেই, বা কে সেই প্রভু, তাতে কিছু এসে যায় না। আসল কথা হচ্ছে—প্রভু থাকুন বা নাই থাকুন তার আইন-কানুন আছে ; তাকে তো কোন মতেই অস্বীকার করতে পারি না। পদে পদে তারা আমাদের উন্মত্ত Hurdle raceএর বাধা হয়ে রয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন কে প্রণয়ন করেছিলেন তা আমরা জানি না—জানবার প্রয়োজনও নেই। এই আইনের বিশেষ বিধান লঙ্ঘন করলে কোন্ হাকিম তার বিচার করবেন তার নাম জেনেও বিশেষ লাভ নেই। আইন আছে, ভাঙলে বিচার ও শাস্তি হবে—এটাই বড় কথা, সত্য কথা, জেনে রাখবার কথা।

তা হলে আপনি পাপ পূণ্য বা কর্ম্মফল ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন না বলছিলেন কেন ?

আমি তো ঠিক সে কথা বলি নি। আমার কথা হচ্ছে, তোমাদের এতকালের প্রচলিত বাঁধাধরা পাপ পূণ্যে আমি বিশ্বাস করি না। অর্থাৎ তোমাদের পাপপূণ্য আমাদের পাপপূণ্য নয়। Eternal Law of Natureকে বোঝবার বা জানবার চেষ্টা না করে মানুষের তৈরী কতকগুলি Dogmaকে পাপপূণ্য বলে গ্রহণ করলেই তোমাদের পাপের দণ্ড হতে রক্ষা পাবে না, কিম্বা পূণ্যবানের স্বর্গ লাভও ঘটবে না, একথা নিশ্চয় জেনে রেখো।

আর কর্ম্মফলের কথা যা বলছ তার সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে আমি এতক্ষণ যা বল্লুম তার কিছু মাত্র মর্ম্ম যদি তোমাদের বোধগম্য হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদের বোঝা উচিৎ ছিল যে আমার ধর্ম্মের sheet anchor বা মূল কথাই হচ্ছে কর্ম্মফল। আমি কর্ম্মফলেই একমাত্র বিশ্বাস করি ; তা ভিন্ন আর কিছুতেই আমার বিশ্বাস নেই। অন্ততঃ বিশ্বাস করবার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। দুনিয়াতে অসংখ্য রকম দৃশ্য বা অদৃশ্য রহস্য থাকতে পারে। কিন্তু আমার জীবনকে সার্থক করে তুলবার জন্য যে সব কিছুই জানতে হবে, বিশ্বাস কর্ত্তে হবে বা শ্রদ্ধা কর্ত্তে হবে এমন কোন কথা নেই।

এ সম্পর্কে একটা বিষয়ে পূর্ব্ব হতেই তোমাদিগকে সাবধান করে দিতে চাই। তোমাদের কর্ম্মফলে ও আমার কর্ম্মফলে অনেকখানি প্রভেদ রয়েছে। তোমরা কর্ম্মফলের সাথে আরো অনেক কিছু মান—আমি পূর্ব্বেই বলেছি সেগুলি আমি মানি না। অর্থাৎ কর্ম্মফলকে পূর্ব্ব জন্ম থেকে এ জন্মে টেনে আনতে আমি প্রস্তুত নই, কিম্বা এ জন্ম থেকে পর জন্ম পর্য্যন্ত তার জের টানতেও আমি রাজী নই। কারণ আমি পূর্ব্ব বা পরজন্মেই বিশ্বাসী নই। আমার কর্ম্মফল ইহ জগতে, এই জীবনেই ভোগ কর্ত্তে হয়। আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি কাজ ও প্রতিটি মূহূর্ত্ত eternal law of natureএর অধীন এবং as I shall sow, so shall I reap not in the other world, or other life ; but in this very life.

একজন জন্মায় রাজপুত্র হয়ে, আর একজন ভিখারী সুত হয়ে, একজন সবল, সুস্থ, সুপুরুষ, আর একজন অন্ধ, খঞ্জ বা বিকলাঙ্গ। একজন আফ্রিকার জঙ্গলে কাফ্রির কুটিরে ভূমিষ্ঠ হচ্ছে, আর একজনের আবির্ভাব হচ্ছে আমেরিকার ক্রোড়পতির প্রাসাদ সৌধে, সারা দুনিয়াকে সচকিত করে। এর পেছনে কি জন্ম জন্মান্তরের কর্ম্মফল কাজ করছে বলে আপনি মনে করেন না? করি না—মনে করবার কোন বৈজ্ঞানিক বা যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখতে পাচ্ছি না। Anthropology, Biology, physiologyর মধ্যে আমরা সাদাকাল, অন্ধ খঞ্জের জন্ম রহস্যের কারণ খুঁজে পেতে পারি। তাতে জাতকের কোন হাত নেই, হাত রয়েছে তার জনক-জননীর। সুতরাং এখানে কর্ম্মফল জাতকের পূর্ব্ব জন্মের নয়, জনক-জননীর ইহকালের। মানুষের বর্ত্তমান জন্মের ভাগ্য বা দুর্ভাগ্যকে যদি পূর্ব্ব জন্মের অজ্ঞাত ও অদৃশ্য কালের মধ্যে টেনে নিয়ে সেখানকার কর্ম্মকে দায়ী কর্ত্তে হয়,—তাহলে ভারতবর্ষ কেন যুক্তরাজ্য হয় নি, আর যুক্তরাজ্যই বা কেন ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত না হয়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থান অধিকার করে বস্‌ল না, তারও গবেষণা কর্ত্তে হয়। সুন্দরবনে ঘন অরণ্য কেন, আরব দেশের সাহারা ফুলের বাগান না হয়ে মরুভূমি হল কেন, এ সবের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে; কিন্তু আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা কিম্বা পূর্ব্ব জন্মের কর্ম্মফলের ব্যাখ্যা যেমন এ সবে চলে না তেমনি মানুষের জীবনেও তা অচল। মানবের আদি জনকজননী আদম ও ইভের কর্ম্মফলে পৃথিবীতে এত রকমারি মানুষের আবির্ভাব হয়েছে মনে করাটা বেশ সুরসাল বলে মনে হতে পারে, কিন্তু সারবান বলে মনে হয় কি? সংখ্যাতত্ত্বের পণ্ডিতরা বল্‌ছেন আমরাও দেখ্‌ছি, মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে জ্যামিতিক হারে (geometrical progressionএ) বেড়ে চলেছে। অর্থাৎ আদিতে ছিল দুজন নর-নারী, তারপর হল চার, তারপর ষোল। আজ তা' দাঁড়িয়েছে সহস্র কোটীতে। তাহলে দুজনের কর্ম্মফল আজ সহস্র কোটীতে ছড়িয়ে পড়ল কি করে এবং যারা পূর্ব্বে কখনো ছিল না তাদের পূর্ব্ব জন্মই বা এলো কোত্থেকে? এটাত সোজা গণিত-সিদ্ধ কথা। ফ্রয়েড ঠিকই বলেছেন, পূর্ব্বজন্ম, পরজন্ম, ইহকাল পরকাল ইত্যাদি সবই হচ্ছে মানুষের emotionএর অন্তর্গত একটা ভিত্তিহীন বিশ্বাস মাত্র।

আচ্ছা, তা'হলে আপনি কি সম্পূর্ণ জড়বাদী? দেহ ভিন্ন মানুষের মধ্যে যে একটা অবিনশ্বর আত্মা বা পরমাত্মা বাস করছে তা' বিশ্বাস করেন না?

খুব বিশ্বাস করি ; তা না হলে বেঁচে আছি, বিচার করছি কি করে ? যতখানি এই চাক্ষুষ দেহটাকে বিশ্বাস করি তার চেয়ে একবিন্দু কমও আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করি না। কিন্তু আত্মা নশ্বর কি অবিনশ্বর, সেই তর্কে আমি যেতে চাই না। আমি পূর্ব্বেই বলেছি, জড় জগৎ ভিন্ন প্রাণী জগৎও যখন একটা আছে, তখন সৃষ্টির মধ্যে চৈতন্যময় সত্তা একটা রয়েছে। কিন্তু সেই সত্তা জড় ও প্রাণী এই উভয় জগতের উর্দ্ধে নিখিল বিশ্বের বা ত্রিভুবনের সর্ব্বময় কর্ত্তারূপে বিরাজমান কিম্বা তাহা প্রাণী জগতের মধ্যেই নিঃশেষিত তা' কেউ বলতে পারে না। কারণ প্রভুরূপে এই সত্তার পৃথক অস্তিত্ব কেউ প্রমাণ করতে পারে না। অবশ্য কল্পনার লাগাম ঢিলে করে দিয়ে অনেকে অনেক রকম কবিত্বপূর্ণ কথা এ সম্বন্ধে বলেছেন ; কিন্তু সেগুলি নিছক কল্পনা। যেমন আমরা সব মৃন্ময় ঘট, আর মহাসমুদ্র কিম্বা দিবাকর যেন সেই বিরাট সত্তা যার বিন্দু বা কণা মাত্র গ্রহণ করে আমরা চৈতন্যময় হয়ে উঠেছি। ঘট ভেঙ্গে গেলেই সমুদ্রের জল সমুদ্রে, আর জ্যোতিষ্কণা সেই জ্যোতিঃ সায়রে মিশে যাবে। সুতরাং আমাদের চৈতন্য স্বরূপ আত্মার বিনাশ নাই। বেশ, তাই না হয় মেনে নিলুম। আত্মা না হয় অবিনাশীই হল। কিন্তু তাতে ভাঙ্গা ঘটের কি এল গেল ? আর নূতন ঘটেরই বা তাতে কি আসবে যাবে ?

তাহলে আপনি দেহ ও আত্মা (body and soul), জড় ও চৈতন্য (matter and spirit) দুই-ই স্বীকার করেন ; কিন্তু আত্মার অবিনশ্বরত্ব মানতে শুধু রাজী নন ?

একটু গোলমাল হল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যেমন আমি স্বীকারও করি না, অস্বীকারও করি না, তেমনি আত্মার অবিনশ্বরত্ব আমি স্বীকারও করি না, অস্বীকারও করি না। আসল কথা হচ্ছে, সেটা আমার কাছে অবান্তর, immaterial. ঈশ্বর যদি থাকেন তাহলে আত্মার অবিনশ্বরত্ব স্বীকার করা সহজ হয়। কিন্তু এই জিনিষটাকে এতটা গুরুত্ব দেওয়ার কোন কারণ হয় না। যেহেতু আত্মা যদি অবিনাশী, তাহলে বৈজ্ঞানিকদের মতে matter is also indestructible, অর্থাৎ দেহও অবিনাশী—মৃত্যু শুধু তার 'ফরমের' পরিবর্ত্তন সাধিত করে মাত্র। তবে matter বা দেহের প্রতি তোমাদের এত অবজ্ঞা অবহেলা কেন ? আমি matter ও spirit দুটিকেই সমান সম্মান দেই। কারণ এই দুটিকে নিয়েই মানুষ মানুষ। পূর্ব্বে কি ছিল বা পরে কি হবে তা নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় যদি প্রচুর থাকে তবে মাথা ঘামান যেতে পারে, আমি আপত্তি করব না—কিন্তু তার আগে বর্ত্তমান দুর্ল্লভ মানবজীবনটাকে পাকা ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করে নিও, যাতে সোনা ফলাতে পার—এই শুধু আমার প্রার্থনা।

তা' ত বুঝলাম, কিন্তু কোন উপায়ে অর্থাৎ কি করলে জীবনটাকে পাকা ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে আপনার মত একটু শুনতে পারি কি ? নিশ্চয় শুনতে পারেন। তবে এবারে নয়, আগামী বারে।

সমর প্রসঙ্গ

নীরদচন্দ্র চৌধুরী

য়ুরোপীয় শস্ত্র সজ্জার পাদপীঠের সহিত যথাযথ পরিচয় না থাকিলে বর্তমান যুদ্ধে তথাকার সমরপরিবেশের স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব হইবে না। যুদ্ধের এক মাসকাল অতিক্রান্ত হইলেও উপরোক্ত কারণে আমাদের দেশে যুদ্ধের গতি ও পরিণতি সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। সমারোহের মাত্রা ও গুরুত্ব এ যাত্রায় যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও বিগত মহাসমরে অনুসৃত পদ্ধতির সহিত বর্তমানের বহুল পরিমাণে সাদৃশ্য রহিয়াছে। মহাসমরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাতেই একমাত্র বর্তমান যুদ্ধের প্রকৃতি অনুসরণ করা চলে। আলোচ্য প্রবন্ধে অতীতের সহিত বর্তমানের যোগসূত্রের সন্ধান দিয়া অন্যান্য নবলব্ধ তথ্যের সাহায্যে এই যুদ্ধের প্রকৃতির উপর আলোকপাতের প্রয়াস করা হইয়াছে।

যুদ্ধ প্রসঙ্গে কোন কথা বলিতে গেলে প্রথমেই জার্মাণ যুদ্ধনীতির সম্যক্ আলোচনা ও ব্যাখ্যান দরকার। জার্মাণ সমরনীতির প্রধান আদর্শ সর্বমুখীন যুদ্ধ (totalitarian war)। গঠন ও পদ্ধতি অনুসারে সর্বমুখীন যুদ্ধের অর্থ—জাতির লোক, অর্থ, যন্ত্র, সমাজ, মনন ও চরিত্রবল—সর্বশক্তি সমরায়োজনে ও সমরক্ষেত্রে সংহত করা। ইহার একমাত্র লক্ষ্য—জাতির চিন্তা ও কর্মধারাকে যুদ্ধনিষ্ঠ ও যুদ্ধ-তৎপর করিয়া তোলা। এইজন্য জার্মাণ সমর বিশারদগণ সশস্ত্র আক্রমণের অনুপূরক হিসাবে আরও দুইটী পদ্ধতির সমর্থন করেন—একই সময়ে জাতির অর্থ-সম্পদ্ ও নৈতিক চরিত্রের মর্মকেন্দ্রে আঘাত। শিল্পশালাগুলি বিধ্বস্ত করিয়া জাতির উৎপাদন শক্তি পঙ্গু করা অর্থনৈতিক যুদ্ধের (economic war) প্রধান উদ্দেশ্য। প্রচারের সাহায্যে শত্রুপক্ষের অনুকূল জনমত গঠন ও আক্রান্ত জাতির ইচ্ছাশক্তি বিনষ্ট করিয়া নৈতিক শক্তি দুর্বল করার নাম চরিত্রবলের যুদ্ধ (war of morale)। সর্বমুখীন যুদ্ধের চরম উদ্দেশ্য শত্রুপক্ষকে একবারে নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়া—ইহা শুধু শত্রুপক্ষের সমর শক্তির বিরুদ্ধে নয়, সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে। অসম্পূর্ণ বা আংশিক বিজয় ইহার উদ্দেশ্য নয়, পরাজিত জাতির রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব বিলোপই ইহার প্রচেষ্টা। একজন জার্মাণ সামরিক লেখক এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, 'Totalitarian victory means the utter destruction of the vanquished nation, and its complete and final disappearance from the historical arena, The Victor will not negotiate with the vanguished concerning the conditions for peace, because there will be no party capable of negotiations. He will impose whatever conditions he thinks fit. In reality totalitarian warfare is nothing but a gigantic struggle of elimination whose up-shot will be terrible and irrevocable in its finality.'

জার্মাণ যুদ্ধনীতির দ্বিতীয় বিশেষত্ব তড়িৎবেগে স্থির মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া। এই নীতির প্রধান লক্ষ্য হইল যুদ্ধের প্রথমাবস্থায়ই বিপুল শক্তি সংহত করিয়া অতর্কিত আক্রমণ দ্বারা শত্রুপক্ষ বিধ্বস্ত করা। জার্মাণ যুদ্ধনীতি ক্ষিপ্রশক্তি চালনায় জয়লাভ করার পদ্ধতি শুধু সমর্থন করে না আগাগোড়া ইহাই অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে। এই অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য শ্রেষ্ঠ যুদ্ধোপকরণে সুসজ্জিতবাহিনীর দ্রুত ও দুর্নিবার আক্রমণ দ্বারা শত্রুপক্ষের সমাবেশকেন্দ্র বিধ্বস্ত করা এবং শত্রু রাজ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করা।

জার্মাণ সমরনীতির তৃতীয় চিন্তার বিষয় হইল পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে কিভাবে একই সময়ে যুদ্ধ পরিচালনা করা যায়। ভৌগলিক সংস্থান ও রাজনৈতিক সম্বন্ধের ফলে জার্মাণীর উভয় সীমান্ত একই সময় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই দুশ্চিন্তা জার্মাণীকে কখনই অব্যাহতি দেয় নাই। এমন কি হিট্‌লারও সম্ভব হইলে উভয় সীমান্তে যুদ্ধ না চালাইবার পক্ষপাতী।

এইজন্য হিট্‌লার ও তাঁহার সহকর্মীগণ তিন প্রকারে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করিয়াছেন। প্রথমটী হইল রাষ্ট্রনৈতিক। কূট রাজনীতির সাহায্যে জার্মাণীর অভিযানের বিরুদ্ধে অন্যান্য রাষ্ট্র শক্তিগুলিকে সংঘবদ্ধ হইতে বাধা দেওয়া। এই নীতি বর্তমান রুশ-জার্মাণ চুক্তিতে ফলপ্রসূ হইয়াছে। ইহা অন্ততঃ সাময়িকভাবে একই সময়ে পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে প্রথম শ্রেণীর শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ভয় দূর করিয়াছে। কিন্তু ইহার জন্য জার্মাণীকে চরম মূল্য দিতে হইয়াছে, কারণ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রদেশে সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইল। ডানৎসিক দখলের উদ্দেশ্য বাল্টিক ও বাল্টিক সন্নিকটবর্তী প্রদেশগুলিতে একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন। এই চুক্তিতে সে আশাও অন্তর্হিত হইয়াছে।

উভয় সীমান্তে যুদ্ধের বাকী দুই সমস্যা হইল সামরিক। পূর্ব সীমান্তে শক্তি সমাবেশ ও জয়লাভ করা পর্যন্ত পশ্চিমে ফরাসী আক্রমণ প্রতিহত করিতে স্থায়ী দুর্গশ্রেণী নির্মাণ। পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধ সমাধানের পর পশ্চিমে শক্তি সমাবেশ পর্যন্ত শত্রুপক্ষ প্রতিরোধ করার জন্য এই দুর্গ শ্রেণীর যত প্রয়োজন, আত্মরক্ষার জন্য তত নয়। কারণ আত্মরক্ষার চেয়ে আক্রমণ নীতির উপর জার্মাণী বেশী আস্থাশীল। এজন্য সুনির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ যত্ন ও তৎপরতার সহিত পরিকল্পিত যুদ্ধকার্য সমাপন করাই তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এক রণপ্রান্ত বিধ্বস্ত করিয়া অন্য রণাঙ্গনে শক্তি সমাবেশ করাই এই পদ্ধতির বিশেষত্ব।

বিগত মহাসমরের উদাহরণ

পূর্বোল্লিখিত সর্বমুখীন (Totalitarian) এবং ক্ষিপ্রগতি (lightning) যুদ্ধ নাৎসী জার্মাণীর আবিষ্কার নহে। জার্মাণ সমরনায়ক লুডেনডরফ-এর 'সমর স্মৃতিতে' (War Memories) গত মহাযুদ্ধের শেষ দুই বৎসর সর্বমুখীন নীতির আংশিক ব্যবহারের বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। তৎকালীন যুযুধানদের মধ্যে একমাত্র জার্মাণীই লোকবল ও অর্থবল সমর প্রয়োজনে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীভূত করিয়াছিলেন এমন কি ব্রতী সৈন্যদেরও (reservists) সংগ্রামের পুরোভাগে প্রেরণ

করিয়া মিত্রশক্তির ত্রাসের কারণ হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রথম হইতে এই ব্যবস্থা অবলম্বিত না হওয়ায় 'সমর স্মৃতিতে' লুডেনডরফ যে তিক্ত সাবধানবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন বর্তমান জার্মাণী তাহা স্মরণ করিয়া প্রারম্ভেই আকস্মিক সৈন্যসমাবেশ দ্বারা শত্রুপক্ষ হইতে জনবলে গরীয়ান হইতে চেষ্টিত হইয়াছে।

একইকালে পূর্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনে ব্যাপৃত হইবার সম্ভাবনা এড়াইবার জন্য এবং দীর্ঘকাল-স্থায়ী যুদ্ধে অর্থনৈতিক পরাভব নিশ্চিত জানিয়া বিগত মহাযুদ্ধেও জার্মাণী ক্ষিপ্রগতি নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গত যুদ্ধে বেলজিয়ামের স্থলে এ যুদ্ধে পোল্যাণ্ডে তড়িৎনীতি প্রযুক্ত হইয়াছে,—প্রভেদ শুধু স্থানের নীতির নহে। অপর পক্ষে, ব্রিটেনের নৌ-বল জার্মাণীর যুদ্ধোপকরণ আমদানী নিশ্চিতরূপে বন্ধ করিতে পারে এই ধারণাও ক্ষিপ্রগতি নীতির অনুকূলে। জনৈক জার্মাণ নায়ক এ বিষয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্য করিয়াছেন :—

"A strategy of attrition would necessarily have led to a long war and to our exhaustion owing to the unlimited resources of our enemies and to our own isolation. Time was against us."

গত যুদ্ধের প্রারম্ভে অবলম্বিত 'শ্লীফেন প্ল্যানের' মূলসূত্র তিনটী—১। অল্পকালস্থায়ী যুদ্ধের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা, ২। পশ্চিম রণাঙ্গনে অধিকাংশ শত্রু সমাবেশ, ৩। ফরাসী সৈন্য ধ্বংস করার জন্য দক্ষিণ শাখায় সৈন্য সমাবেশ করিয়া বৃত্ত (envelopment) রচনা।

বর্তমান নীতিও শ্লীফেন প্ল্যানকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে—ব্যাখ্যান কিছু রদবদল হইয়াছে মাত্র। উভয় সীমান্তে সমরসঙ্কটের সমাধান করিতেও যুদ্ধোত্তরকালে জার্মাণী চেষ্টার ত্রুটী করে নাই; এ উদ্দেশ্যে রাইখস্‌ভেবের (জার্মাণ সৈন্যবাহিনী) নির্মাতা ফন সিক্‌ট ও কতিপয় শিল্প নায়ক সোভিয়েটের সহিত মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হইবার পক্ষপাতী ছিল।

নাৎসীবাদের প্রসার ও সাম্যবাদ বিদ্বেষ বহুকাল পর্যন্ত এই সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিলেও ঘটনার আবর্তে হিটলার, সোভিয়েট রুশিয়া, ফ্রান্স ও অন্যান্য প্রতিবেশীদের উপর প্রভুত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষা বর্জন করিয়া, কূটবুদ্ধি সৈনিকের অনুসৃত নীতি গ্রহণ করিয়াছেন।

তড়িত-মীমাংসার সমরনীতি (Tactics of Lightning Decision)

গত মহাযুদ্ধে এই নীতি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হওয়ার পরও কেন জার্মাণী ইহাতে আস্থাবান এই প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে। ইহার কারণ জার্মাণরা মনে করে এই দুইটী নীতি সর্বপ্রথম গত যুদ্ধে প্রয়োজিত হয়, কাজেই তাহাদের পূর্ণ সম্ভাব্যতা তখনও পরীক্ষিত হয় নাই। ট্যাঙ্ক ও বিমান এই নীতিদ্বয়ের পরিপূরক হইয়া এই সম্ভাবনাকে পূর্ণতা দিবে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস। য়ুরোপ ও আমেরিকার বিশেষজ্ঞগণও মনে করেন চলিত সমরপদ্ধতির অন্তর্নিহিত অনিবার্য অচলতা দূর করিয়া তাহাতে গতিবেগ ও চালনা কৌশল সঞ্চার করিতে হইলে ট্যাঙ্ক ও বিমানের সাহায্য প্রয়োজন।

১৯১৪—১৮ সালের পরিখা যুদ্ধের পর হইতে সমর বিশেষজ্ঞগণ ক্ষিপ্রযুদ্ধের একটী নূতন

পথ আবিষ্কারের চেষ্টায় ছিলেন। কয়েকজন দূরদর্শী সমরনায়ক প্রকৃত যুদ্ধের কোনরূপ অভিজ্ঞতা ছাড়াই ভাবিয়াছিলেন যে ট্যাঙ্ক, মোটার ও বিমানের সাহায্যে ঝটিকাবাহিনীর ক্ষিপ্র আক্রমণে শত্রুপক্ষের দুর্ভেদ্য দুর্গশ্রেণী ভেদ করা অসম্ভব নয়। জার্মাণ ও রাশিয়ানগণ সর্বপ্রথম এই নীতি অনুসারে সমরায়োজন সুরু করে। এ সম্বন্ধে একজন জার্মাণ বিশেষজ্ঞের চিত্তাকর্ষক বিবরণ উল্লেখ করা গেল —

'One night the doors of aeroplane hangars and army garages will be flung back, motors will be turned up, and squadrons will swing into movement.... The first wave of air and mechanized attack will be followed up by motorised infantry division. They will be carried to the verge of the occupied territory and hold it, thereby freeing the mobile units for another blow. In the meantime the attacker will be raising a mass army. He has the choice of territory and time for his next big blow, and he will then bring up the weapons intended for breaking down all resistance and bursting thro the enemy lines. He will do his best to launch the great blow suddenly so as to take the enemy by surprise, rapidly concentrating his mobile troops and hurling his air force at the enemy. The armoured divisions will no longer stop when the first objectives have been reached ; on the contrary, utilising their speed and their radius of action to the full they will do their utmost to complete the break-thro into the enemy lines of communication. Blow after blow will be launched ceaselessly in order to roll up the enemy front and carry the attack as far as possible into enemy territory. The air force will attack the enemy reserves and prevent their intervention.

আবিসিনিয়া ও স্পেন যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বে ১৯৩৫ সালে উক্ত সমরনীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। এই দুই যুদ্ধে বিশেষতঃ স্পেন সংগ্রামে ক্ষিপ্র আক্রমণনীতি অনেকাংশে সুস্পষ্ট ও সংশোধিত হইয়াছে। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের সমর বিভাগীয় অধিনায়ক হেনরী জে, রিলী গত স্পেন যুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হইতে উক্ত মত সমর্থন করিয়াছেন। তাহার মতে ম্যাজিনো (Maginot) ও সিগ্‌ ফ্রীড (Siegfried) লাইনের মত স্থায়ীভাবে সুরক্ষিত সীমান্ত তড়িৎ-আক্রমণের শক্তি বহির্ভূত। তবে যে সকল স্থান অপেক্ষাকৃত কম বা একেবারেই সুরক্ষিত নয় সেখানে তড়িৎ আক্রমণ কার্যকরী হইতে পারে।

পোলিশ যুদ্ধ

পোলিশ যুদ্ধে যদিও ক্ষিপ্র আক্রমণনীতি অনুসৃত হইয়াছে তবুও পোলদের পরাজয় শুধু উক্ত সমর পদ্ধতির জন্য হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে জার্মাণীর উচ্চতর রণসম্ভার ও সুশিক্ষিত সৈন্যদল পোলিশদের পরাজয়ের প্রধান কারণ। যদিও নৈতিকবল সমরসঙ্কটে চরম নির্ভর, তবুও নিকৃষ্টতর

যুদ্ধোপকরণ এবং নৈতিক বলসম্পন্ন অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সৈন্যদল নিয়ে কখনও দৃঢ় চরিত্র এবং অধিকতর সুসজ্জিতবাহিনীকে বেশীদিন প্রতিরোধ করিতে পারে না। অন্যদিকের সমতা থাকিলে বিজয়লক্ষ্মী বৃহৎবাহিনীর অনুকূলে যায়।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত সামান্য পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ভিন্ন বর্তমান পোলিশ সংগ্রামে, গত যুদ্ধে ওয়ারশ অবরোধ ও রুশ বিতারণে যে যুদ্ধনীতি অনুসৃত হইয়াছিল তাহারই পুনরাবৃত্তি হইতেছে। যুদ্ধারম্ভের কয়েক দিনের মধ্যেই ইহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ইহা নিশ্চিত যে জার্মাণগণ পোলিশ সংগ্রামে তাহাদের পূর্বনীতি অনুসরণ করিবে। এই সম্বন্ধে ডাঃ অটো ষ্ট্রাসের, নিউ ষ্টেটস্‌ম্যান এণ্ড নেশন পত্রিকার ১৯৩৯ সালের ১৫ই জুলাইর সংখ্যায় এক উল্লেখযোগ্য ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন—

'According to certain reports Hitler will make a great effort—in the case of Polish resistance to the 'Settlement' of the Danzig and the Corridor question—to smash Poland completely within three weeks. The German General Staff hope that they will be able to effect this by a concentrated attack by four German armies at once. The first army will march from the Vienna—Mahrisch-Ostrau area to Krakow; the second from the Dresden-Breslau area to Lodz; the third from the Berlin-Frankfurt on the Oder area to Posen; and the fourth, somewhat later, from East Prussia to Warsaw. This should result in a Polish cannae at Warsaw, and, if all goes well, in the complete destruction of Poland.'

লেখক আরো বলিয়াছেন শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তি বিশেষতঃ বিমান বহরের বলে এবং ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের অবিলম্বে সাহায্য করার কোন সম্ভাবনা না থাকায় পোল্যাণ্ড-জার্মাণ সমরে নায়কদের ইচ্ছা আংশিকভাবে সফল হইবে। ('at least some of the hopes of the German General Staff will be fulfilled') পোলিশদের সামরিক দুর্বলতার মূলে তিনটী কারণ রহিয়াছে দেশের দরিদ্রতা যেজন্য আধুনিক রণসম্ভারে সজ্জিত সৈন্যবাহিনী গঠন সম্ভব নয়।

২। শিল্প সম্পদের অভাব

৩। পররাষ্ট্রনীতি সুনিয়ন্ত্রণের অভাব।

উল্লিখিত কারণে পোলিশগণ যান্ত্রিক রণসজ্জা (mechanisation) ও সীমান্ত সুরক্ষিত রাখার কোন বিস্তৃত ব্যবস্থা করে নাই। অন্য দিকে আক্রমণের উপর অতিরিক্ত আস্থাস্থাপন ও শত্রু শক্তি দীর্ঘকাল প্রতিরোধ করার অক্ষমতাই পোল্যাণ্ডের প্রধান দুর্বলতা।

এজন্য পোলিশ সংগ্রামে জার্মাণগণ তড়িৎ-বেগ যুদ্ধনীতি অবলম্বন সমীচীন মনে করিয়াছেন।

গত এপ্রিল মাসে প্রকাশিত 'The military strength of the Powers' পুস্তকে ম্যাক্‌স ভারনার (Max Werner) পোল্যাণ্ডের আক্রমণনীতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে এই জাতীয় আক্রমণ শুধু শক্তিহীনেরই আক্রমণ। তিনি বলিয়াছেন—

'The terrible risks involved in such strategy against an enemy of superior strength are obvious. When enemy motor-mechanized units penetrate without difficulty into those gaps between the Polish centres of resistance like steel arms, split the Polish front and exploit their superiority in mobility and fire-power to carry out flanking blows and encirclement operations, the sudden collapse of the Polish resistance is only a matter of a short time. When Pilsudski developed this strategy of 'Open Spaces,' of Plein air,' as he called it, he had not the faintest idea of what at renderous superiority the German and the Red Armies would one day enjoy thanks to their modern mobile and armoured technique ?

পশ্চিম সীমান্ত

ভবিষ্যৎবাণী না করিয়া ইহা বলা খুব শক্ত নয় যে পশ্চিম সীমান্তে তড়িৎ-বেগ যুদ্ধ পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে না। ম্যাজিনো লাইন একদিকে ও সিগ্‌ফ্রীদ ষ্টেলুঙ্গ অন্যদিকে উক্ত পদ্ধতির প্রয়োগ ও প্রসার ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ করিয়াছে। বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড ও সুইৎজারল্যাণ্ডএর নিরপেক্ষতা উপেক্ষা না করিয়া এই লাইন অতিক্রম করা সম্ভব নয়। পশ্চিম সীমান্তে তড়িৎ-বেগ প্রয়োগ করিতে হইলে শ্লীফেন প্ল্যান (Schlieffen plan) অনুযায়ী করিতে হইবে, অবশ্য শ্রেষ্ঠতর অস্ত্র-সম্ভারে ও শক্তি সমাবেশে একটু অভিনবত্ব থাকিবে। ইহার প্রতিকূলে বেলজিয়ম ও হল্যাণ্ডের প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং মিত্রশক্তির বৃত্তগ্রাস আক্রমণ (Enveloping movement) প্রয়োগ করার তৎপরতা কতখানি তাহা চিন্তনীয়। প্রকৃতপক্ষে মিত্রশক্তি ফ্রান্সের দুর্গ রক্ষিত সীমান্ত ভূমির ডান ও বাম দিক হইতে আকস্মিক আক্রমণ সম্ভব মনে করে। কাজেই তাহা ব্যর্থ করিবার ব্যবস্থা থাকা স্বাভাবিক। জার্মাণ সমরনায়কগণ বৃত্তগ্রাস আক্রমণনীতি এবং ইহার সর্বপ্রকার কার্যকারিতা সম্বন্ধে একান্ত বিশ্বাসবান। ইহা জানিয়াও যদি মিত্রশক্তির যুদ্ধবিশারদগণ প্রতিরোধকল্পে কোন ব্যাপক প্ল্যান্ না করে তবে খুব দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাইবে না।

যদি জার্মাণী প্রথমে হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম, সুইৎজারল্যাণ্ডকে বিভিন্ন বা একই সঙ্গে আক্রমণ না করে, তাহা হইলে পশ্চিম সীমান্তে প্রায় ১৯১৪—'১৮ সালের মত ধীরগতিতে অবরোধকারী যুদ্ধ (Seize warfare) চলিবে সামান্য পরিবর্তিত হইয়া—আত্মরক্ষার অধিকতর আয়োজনে ও সীমান্তরণভূমির খণ্ডায়তনে। ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে এইরূপ সুরক্ষিত স্থানে আশু ফললাভের সম্ভাবনা খুব কম। এইজন্য পশ্চিম সীমান্তে চমকপ্রদ কোন কিছু ঘটিবে না। যাঁহারা বর্তমান যুদ্ধের অবস্থান-নির্ভর মন্থরতা দেখিয়া অসহিষ্ণু হইয়া উঠিয়াছেন তাহাদের অনেকেইর ১৯১৪—'১৮ সালের চার বৎসরব্যাপী সংগ্রামেরও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। এই অভিজ্ঞতাসত্ত্বেও তাহারা যখন সীগফ্রীদ লাইনের আশু বিনাশ আশা করেন ও আশাহত হইয়া অধীর হইয়া পড়েন তখন সত্য সত্যই তাহাদের সীগফ্রীদ লাইনের জ্ঞান সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। তাঁহারা ভুলিয়া যান সুরক্ষিত সীগফ্রীদসীমান্ত বিধ্বস্ত করার অর্থ জার্মাণ জাতির সম্পূর্ণ পরাজয় ও যুদ্ধের

অবসান। পশ্চিম সীমান্ত কিরূপ সুরক্ষিত সেই সম্বন্ধে অনেকেরই ধারণা তেমন সুস্পষ্ট নয়। কাজেই এইরূপ ভ্রান্তি আসা খুব স্বাভাবিক। এই সম্বন্ধে দুই চার কথা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না মনে করি।

প্রথমেই বলিয়া রাখা ভাল যে গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা ও রণচাতুর্য্য দ্বারা বর্তমান সমরনীতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত। দুর্গ সুরক্ষিত সীগফ্রীদ সীমান্তের নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ কৌশল গত যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসর হিণ্ডেনবুর্গ লাইন সংস্থাপনে অনুসৃত বিধিব্যবস্থারই বিস্তৃত অনুকরণ। লুডেনডর্ফের নির্ধারণে কর্ণেল ফ্রিৎস্ ভন্ লসবুর্গ এই সকল পদ্ধতির পরিকল্পনা করেন।

ফরাসীদের ম্যাজিনো লাইনও (Maginot line) গত যুদ্ধের অভিজ্ঞতা প্রসূত। ইতিহাস দৃষ্টে দেখা যায় যে বেলফোর্ট হইতে ভার্দন পর্যন্ত দুর্গসুরক্ষিত অঞ্চলের উপরই সীমান্ত যুদ্ধের ফলাফল অনেকখানি নির্ভর করে। ১৯১৬ সালে মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে জার্মাণ আক্রমণের ফলে ভার্দন সমরক্ষেত্র ও তদঞ্চল দুইবার বিধ্বস্ত হয়। ফ্রান্সের পূর্ব সীমান্ত নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণকৌশল প্রায় নিখুঁত ও দুর্ভেদ্য ছিল। জার্মাণীর সমর-ইতিহাসবিদগণও এই কথা স্বীকার করিয়াছেন গত মহাযুদ্ধে দুর্গসুরক্ষিত অঞ্চলের অপ্রয়োজনীয়তার চেয়ে প্রয়োজনীয়তাই বেশী প্রমাণিত হইয়াছে। সমরনায়ক পেটেইনের মতেও পুরাতন আদর্শকে শুধু বর্তমান যুদ্ধবিদ্যা ও অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া পরিবর্তন করা আবশ্যক।

ভার্দুন রক্ষীদের মত গৃহীত হইয়াছে এবং ফরাসী ম্যাজিনো লাইন (Maginot line) ইট ও ইস্পাতে রূপান্তরিত গত যুদ্ধের পরিখা শ্রেণী বলা যায়।

নৌ-যুদ্ধ (Naval War)

ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তির সমুদ্রে একাধিপত্য। জার্মাণীর নৌবহর যে শুধু বন্দরে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে তাহা নয়। বাণিজ্যপোতগুলিও সমুদ্র হইতে বিতাড়িত হওয়ার ফলে জার্মাণীর বহির্বাণিজ্যে একেবারে নিশ্চল অবস্থা আসিয়াছে। সমুদ্রে আধিপত্য থাকায় মিত্রশক্তি রণাঙ্গনের যে কোন স্থানে সৈন্য প্রেরণ করিতে পারে। জার্মাণীর নৌ বা বিমানবহরও বৃটিশ সৈন্যের ফরাসী উপকূলে অবতরণে বাধা দিতে পারে নাই। বৃটিশ বাণিজ্যপোতগুলির উপর জার্মাণ সাবমেরিনের ইতস্ততঃ আক্রমণ সত্ত্বেও ব্যবসাক্ষেত্রে তেমন কোন বিপর্যয় ঘটে নাই। এই বিজয় অনাড়ম্বর হইলেও পোল্যাণ্ড-অধিকার গৌরবের চেয়ে কম নয়। জার্মাণীর চেয়ে নৌ শক্তিতে অত্যধিক শ্রেষ্ঠ বলিয়াই মিত্র পক্ষের এই জয়লাভ সম্ভব হইয়াছে।

জলপথের বিভিন্নস্থানে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিপদাপদের জন্য ব্যবস্থা রাখিয়াও মিত্রশক্তি উত্তরসাগরে বিশাল নৌ-বহর সমাবেশ করিতে পারে। জার্মেণীর আরব্ধ নির্মাণকার্য শেষ হইলেও নৌবলে মিত্রশক্তির শ্রেষ্ঠতা অক্ষুণ্ন থাকিবে। কারণ বৃটিশ ও ফরাসী নির্মাণ পরিকল্পনার বিশালতা অনেক বেশী। জার্মাণী শুধুমাত্র সাবমেরিনে বৃটিশের সমতা বা শ্রেষ্ঠতা দাবী করিতে পারে। সাবমেরিন প্রতিরোধ সাবমেরিন দ্বারা হয় না এবং জার্মাণীর বহির্বাণিজ্য সমুদ্রপথে খুব কম থাকায়

তাহার উপর সাবমেরিন প্রয়োগক্ষেত্র খুব সংকীর্ণ। কাজেই শুধু সাবমেরিণের উপর নির্ভর করিয়া ইংলণ্ড ও জার্মাণীর মধ্যে তুলনামূলক কোন সিদ্ধান্ত করা ভ্রান্ত হইবে।

যে সমর নীতি এই বিরাট নৌ-শক্তি পরিচালনায় প্রযুক্ত হয় গত মহাযুদ্ধের পর হইতে তাহার সূচনা। ইহার পূর্বে সমুদ্রে অধিকার রক্ষার জন্য দুইটি পদ্ধতি অনুসৃত হইত—

১। শত্রুপক্ষের নৌবল বিধ্বস্ত করা।

২। শত্রুপক্ষের বন্দর ও পোতাশ্রয়গুলি অভেদ্য ভাবে অবরোধ করা।

দুর্বল নৌ-বহর জলযুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া যে কোন সময়ে পোতাশ্রয়ে নিরাপদ হইতে পারে এবং প্রথমোক্ত নীতি অনুযায়ী বিপক্ষ শক্তিকে পোতাশ্রয় পর্যন্ত পশ্চাদ্ধাধন করিয়া শক্রর রণতরী বিনষ্ট করিতে হয়। বর্তমানে দূরঘাতী কামান ও বিস্ফোরকের উন্নতি হওয়ায় এখন পোতাশ্রয়ের সন্নিকটে যাওয়া একরূপ অসম্ভব। নাইল ও কোপেনহেগেনে নেলসনের মত বিজয় গৌরব লাভ করা বিংশ শতাব্দীতে অসম্ভব।

ফরাসী বিপ্লব ও নেপোলিয়ন যুগীয় যুদ্ধের মত নিকটঅবরোধ এখন আর সম্ভব নয়। বিগতযুদ্ধে জার্মাণীর ভরসা ছিল বৃটেন হেলিগোল্যাণ্ডে নিকটঅবরোধ (close blockade) স্থাপন করিলে সেই সুযোগে অব্যর্থ জার্মাণ টরপেডো বৃটেনের নৌশক্তির শ্রেষ্ঠতা খর্ব করিবে। বৃটেন ইংলিশ চ্যানেলের সংকীর্ণতম স্থান রুদ্ধ করিয়া এবং স্কটল্যাণ্ড ও নরওয়ের মধ্যবর্তি ১৯০ মাইল ফাঁকা যায়গায় 'গ্র্যাণ্ড ফ্লিট' (বৃহত্তম নৌবহর) স্থাপন করিয়া জার্মাণীকে নিরাশ করে। ভৌগোলিক অবস্থিতির আশাতীত অনুকূলতায় বৃটিশের পক্ষে উত্তর ও বাল্টিক সাগরের উপকূলস্থিত রাষ্ট্রগুলির বহির্পথে এইরূপ আধিপত্য করা সম্ভব হইয়াছে। ঠিক মধ্যপথে নৌ-বহর সংস্থাপন করিয়া বৃটিশ নিরাপদে নিকটঅবরোধের সমস্ত সুবিধা ভোগ করিয়াছে। বর্তমান যুদ্ধেও এই নীতির ব্যতিক্রম হইবে না বলিয়া বিশ্বাস করা যায়। কোন জার্মাণ যুদ্ধ জাহাজ এই অবরোধ অতিক্রম করিয়া বহিঃসমুদ্রে প্রবেশ করিলেও অনতিকালে ধ্বংস হইবে।

ইহা পূর্বেই অনুমিত হইয়াছিল যে জার্মাণী এই জাতীয় অবরোধের প্রত্যুত্তরে বিমানাক্রমণ করিবে। জার্মাণ বিমান সচিব গবের সহিত-ই বলিয়াছিলেন যে ভবিষ্যৎ যুদ্ধে দূর-প্রক্ষেপী বোমারু জাহাজ এই অবরোধ নিষ্ক্রিয় করিবে।

এই বৎসর গত এপ্রিল মাসের Brassey's Naval Annualএ জনৈক লেখক লিখিয়াছেন—

'With the present development of air-craft even the farthest bases from which such a long-range blockade could be conducted lie well within the range cf enemy bombers. Thus the question, whether the bomber by making them untenable may indirectly bring down the whole system of naval defence thro the impossibility of maintaining blockade, is likely to prove infinitely more important for the future development of Sea Power than the question of its capabilities for direct attack

either upon battleship or trade, which hitherto have almost exclusively received attention.'

বর্তমান যুদ্ধে এই ভয়ের ভিত্তিহীনতা প্রমাণিত হইতেছে, কারণ বিমানাক্রমণ দ্বারা নৌ-বহর বিধ্বস্ত করার কোন সম্ভাবনা থাকিলে তাহা এতদিনে সুরু হইত। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই প্রকার কোন প্রচেষ্টা হয় নাই। কাজেই বিমান শক্তির প্রভাবে নৌ-যুদ্ধের মৌলিক রীতিনীতিতে কোন গুরুতর পরিবর্তন হইবে না।

বৃটিশ নৌ-শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব বিলোপ করিতে হইলে জার্মাণীকে নৌ-বলের সাহায্যই নিতে হইবে। জার্মাণ সমরজ্ঞগণ নৌ-বলে নির্ভর করিলেও তাহাদের প্রচেষ্টার মূল ভিত্তি পরিবর্তন করিয়াছেন। যুদ্ধ অথবা অবরোধ দ্বারা সমুদ্রে প্রাধান্য লাভ করাই 'continental' নৌ-যুদ্ধের আদর্শ। জার্মাণী ইহা পরিত্যাগ করিয়া 'maritime' নীতি গ্রহণ করিয়াছে। শত্রুপক্ষের অর্থনৈতিক কাঠামো এবং বিশেষ করিয়া বাণিজ্য বিনষ্ট করিবার উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া পণ্যবাহী জাহাজ চলাচলের পথ আক্রমণ করা—'maritime' নীতির ইহাই মূল সূত্র।

আজ পর্যন্ত যে জলযুদ্ধ হইয়াছে তাহাতে জার্মাণী উক্ত নীতিই অবলম্বন করিয়াছে। কিন্তু এই নীতির গোড়াতে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে। যুদ্ধ অথবা অবরোধ দ্বারা সমুদ্রে একাধিপত্য লাভ করিলেই জলপথের বাণিজ্যে বিপক্ষের খণ্ড আক্রমণ প্রতিহত হইবে। জার্মাণী ক্ষমতার স্বল্পতা হেতু অবরোধ করিতে অথবা বৃটিশের উপর সাত সমুদ্রে আক্রমণ চালাইতে সক্ষম হইবে না। জার্মাণীর ভাসমান পোতগুলি বৃটিশ অবরোধ সম্ভবতঃ এড়াইতে পারিবে না। কাজেই জার্মাণীর সাবমেরিনই একমাত্র অস্ত্র যাহা বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ হইতে পারে। কিন্তু গত যুদ্ধে ইহার অত্যধিক ব্যবহারে আশানুরূপ ফল হয় নাই। নির্মাণ ও প্রয়োগ কৌশলে দক্ষতা অর্জিত হইলে ফললাভের অনেকটা সম্ভাবনা আছে বলিয়া জার্মাণদের বিশ্বাস। সাবমেরিনের উন্নতি লাভের সঙ্গে সঙ্গে সাবমেরিন-ধ্বংসী পোতও উন্নততর হইতেছে। কাজেই সম্ভাবনার দিকে বিচার করিতে গেলে বলিতে হয় বৃটিশ নৌ-শক্তি সাবমেরিন দ্বারা বিধ্বস্ত করিতে জার্মাণীর চেষ্টা এবারও ব্যর্থ হইবে।

আশা করা যায় যে যুদ্ধের নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা যুদ্ধের প্রকৃতি বুঝিতে কিছুটা সাহায্য করিবে। বিভিন্ন রণাঙ্গনে অক্ষ-দণ্ডচারী রাষ্ট্রগুলির (Axis-Powers) সর্বমুখীন যুদ্ধের কথা শ্রুত হইলেও প্রকৃত পক্ষে বর্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও প্রয়োগ ক্ষেত্র একান্ত সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্র ও সমর নীতিতে রোম-বার্লিন অক্ষ-দণ্ডের সুখস্বপ্ন এখনও সফল হয় নাই। অন্যদিকে মিত্রশক্তি এখনও পূর্ণোদ্যম প্রয়োগ করে নাই। ইহার কারণ খুবই সুস্পষ্ট। তাহারা শক্তি সংহত করিয়া যুদ্ধের ব্যাপকতার সহিত নিজেদের আক্রমণ বেগও বৃদ্ধি করিবে। যুদ্ধের বর্তমান অবস্থা হইতে মনে হয় জার্মাণ সীমান্তে খণ্ড খণ্ড সংঘর্ষ ভিন্ন অন্য কোন যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধের সুযোগ মিত্রশক্তি গ্রহণ করিবে, সুতরাং সহসা পশ্চিম সীমান্তে তাহারা তীব্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবে না। ইহা নিশ্চিত যে 'শান্তি অভিযান' ('peace offensive') ব্যর্থ হইলে জার্মাণী পশ্চিম সীমান্তে প্রচণ্ড আক্রমণ সুরু করিবে। এই আক্রমণের ফলাফল বিনা আতঙ্কেও অনেকটা অনুমান করা যায়। জার্মাণ অগ্রগতি প্রহত হইলে সিগফ্রিদ (siegfried) সীমান্ত অতিক্রম করা অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে। ইহার পরই বিভিন্ন দিকে ও বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে জার্মাণীকে অভিভূত করার সুযোগ আসিবে।

সাধারণ অবস্থিতিতে সিগফ্রিদ ও ম্যাজিনো লাইনকে ঠিক লাইন বলা চলে না। এগুলি দূর বিস্তৃত দুর্গ সুরক্ষিত প্রান্তদেশ। সমস্ত সুরক্ষিত অঞ্চল জুড়িয়া আছে দুর্ভেদ্য দুর্গ, পরিখা, মেসিনগান মঞ্চ, ফাঁদও নানা আকার ও প্রকারের প্রতিবন্ধক।

এই দুর্গ শ্রেণী রক্ষার্থে সৈন্য সংস্থাপনে যথেষ্ট মিতব্যয়িতা ও সম্প্রসারতা অবলম্বিত হয়। অগ্রগতিতে বাধা দিয়া শত্রুপক্ষের সময় নষ্ট করা—প্রান্তবর্তী দুর্গ শ্রেণির লক্ষ্য। যতই অন্তর্দেশে যাওয়া যায় শক্তি সমাবেশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইবে এবং ইহাদের পশ্চাদ্দেশে রিজার্ভ সৈন্য থাকে। এইরূপ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হইল প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ হইতে সৈন্যবল রক্ষা করা। রিজার্ভ বাহিনী মিকানাইসড (mechanised) ও ক্ষিপ্রগতি সম্পন্ন—যে কোন সময়ে বিপক্ষের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে তৎপর।

কাজেই জার্মাণ অথবা ফরাসী সীমান্ত কখনই আকস্মিক আক্রমণে বিধ্বস্ত করা যাইবে না। এই বিষয়ে উভয় পক্ষের সমরবিদগণই এক মত। দুর্গম পশ্চিম সীমান্ত বিনষ্ট করার জন্য 'অন্তর্ভেদ' ('Infiltration') সমর পদ্ধতির ক্রমোন্নতি সাধিত হইতেছে। সংক্ষেপে, এই পদ্ধতিতে লাইনের মাঝে মাঝে রক্ষিত স্থানগুলি উপর্য্যুপরি আক্রমণ করিয়া বিপক্ষশক্তির সুরক্ষিত প্রদেশ বিধ্বস্ত করা হয়।

বর্তমানে পশ্চিম সীমান্তে উক্ত নীতিতেই যুদ্ধ চলিতেছে। ফরাসী রণচাতুর্য সারা ইউরোপের মধ্যে যথার্থ বাস্তবদর্শী, প্রণালীবদ্ধ ও স্থিরচিন্তা প্রসূত। বর্তমান অনাক্রমণ নীতি শুধু নিষ্ক্রিয় আত্মরক্ষা নয়। আত্মশক্তি লাভ ও আক্রমণ এই আত্মরক্ষার উদ্দেশ্য। ইহা ক্রমবর্ধমান চেষ্টাও সহিষ্ণুতার রণকৌশল।

১লাঅক্টোবর, ১৩৩৯

গ্রন্থ-পরিচয়

ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন

সমাজে একটু বিশিষ্ট যাঁরা তাঁদের দরবারে সাধারণের প্রবেশ অবারিত নয়। একটা ব্যবধান তাঁরা রেখে থাকেন, হয় সেক্রেটারী, নয় চাপরাসী যারা আগন্তুকের পরিচয় বহন করে নিয়ে আসে। স্থান বিশেষে শুধু 'কার্ডে' লেখা নামধাম যথেষ্ট নয়, কোন ভদ্র পরিচয়-পত্র না থাকলে সদরে পৌঁছান কঠিন। অনেকে মনে করেন এটা বিলিতি কায়দা, কিন্তু বিদেশীরা আসবার আগেও এদেশে "প্রতিহারী" (Usher)এর চলন ছিল। এর কারণ খুঁজে দেখলে এই মনে হয় যারা আসে তাদের মধ্যে অর্থী ও প্রার্থীর ভিড়টাই বেশী--আর যাঁদের কাছে আসে তাঁদের দেখা করবার রুচি ও সময়ের অভাব এ অবস্থায় দর্শনপ্রার্থী ও দর্শনদাতার মধ্যে একটা ব্যবধান থাকা সমাজ অনুমোদন করেছে।

বইএর জগতেও আমরা এই আভিজাত্যটুকু খুব যে অপছন্দ করি তা নয়। যন্ত্রশাসিত জগতে এখন সংখ্যার আধিপত্য। ভাল মন্দ বিচার হয়, 'হাত তোলায়' বা মাথা গুনতিতে। বহু প্রসবিনী ছাপার কারখানায় প্রসূত দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বইগুলি আমাদের পরিমিত অর্থ ও সময়ের উপর একাধারে অপরিমিত দাবীই করে চলেছে। "লক্ষ লোকে এই কাগজ পড়ে," 'এটা বিশ হাজার কাট্‌তি হয়েছে', 'অমুক চিত্রশিল্পী একে সাজিয়েছে, অমুক কথাশিল্পী ভূমিকায় সার্টিফিকেট দিয়েছে'—" এ কলরব রোজই কানে আসে। এ ক্ষেত্রে পাঠক গোষ্ঠী যে মধ্যবর্ত্তী কারু আশ্রয় নেবে তার আর বিচিত্র কি? তাই সাহিত্য জগতে Reviewer বা পুস্তক পরিচয় দাতা শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আমরা কি পড়ব না পড়ব সেটা যখন নিজে বাছাই করতে না পারি তখন আমরা Review বা সমালোচকেব মুখাপেক্ষী হই। সুগৃহিণীর বাছাই করা খাদ্যের তালিকা যেমন আমরা দিনের পর দিন আদর করে নিই, তেমনি সাহিত্যেও আমরা বহুল পরিমাণে এই নির্ব্বাচক শ্রেণীর উপরেই ভরসা করে থাকি। যাদের উপর নির্ভর করি এতটা, তাদের কাছ থেকে আমরা কী প্রত্যাশা করি? তাদেরই বা পরিচয় কি?

সবাই জানেন, পত্রিকা মাত্রেরই একটা বিভাগ আছে, যেখানে বই "Review" বা সমালোচনা করা হয়। পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক বা পণ্ডিতদের কাছে পাঠিয়ে দেন বইগুলি যাচাই করতে। ছোট বড় পুস্তক-পরিচয় পত্রিকা মাত্রেরই বিশিষ্ট অঙ্গ। তারও মধ্যে

একটু বিশেষত্ব আছে। যে সব কাগজ কোন দিকে 'specialise' করে তাদের বিচারের মর্য্যাদা আমরা বেশী দিয়ে থাকি। 'সায়ান্সের' বই যদি 'Nature' পত্রিকার সুপারিশ পায়, তবে বিজ্ঞান জগতে তার একটা কদর হয়ে থাকে। Timesএর Educational Supplement যদি শিক্ষার কোন বইকে আদর করে, তবে তার আদর আরও ছড়াবে—এটা সুনিশ্চিত। রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, ধর্ম্মনৈতিক ইত্যাদির বই প্রকাশকেরা বিশিষ্ট পত্রিকার মত নিয়েই ক্ষান্ত হয় না, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের অভিমত দিয়েও বিজ্ঞাপন ছড়ায়।

বইএর আমদানি এত বেশী, ক্রেতাও অনুরূপ, ইউরোপে ও আমেরিকার বই Review নিয়ে নানা রকম ব্যবসার আয়োজন হয়েছে। একটা উদাহরণ—Book Clubগুলি। তাদের কর্ত্তব্য অভিজ্ঞ (Expert) লোক রেখে বই যাচাই করান—করে মেম্বরদের কাছে উপস্থিত করা। যদি কোন বই Club Reader বা পরীক্ষকের কাছে পাশ হল, তখন ক্লাবের অনুমোদনের ছাপ দিয়ে তা প্রকাশিত হয়। ক্লাবের মেম্বরদের হাতে এ রকম বই তো গেলই, তাছাড়া বাইরের লোকেও জানল যে এই বইগুলো ক্লাবের নির্ব্বাচনে উত্তীর্ণ হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিত স্থান নির্ণয়ের মত, ক্লাবগুলিও বই নিয়ে ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড, থার্ড করে। এ সব Book Clubএর মেম্বরের সংখ্যা প্রচুর—৫০,০০০ থেকে এক লক্ষ পর্য্যন্তও পৌঁছায়। একদিকে এই ক্লাবগুলি যেমন বাছাই করে পাঠক গোষ্ঠীর অনেক সময় বাঁচিয়ে দিল, তেমনি আবার তাদের বহু কাটতি বলে, অপেক্ষাকৃত কম দামে মেম্বররা পড়বার বই পেল। যে দামে মেম্বর বই পান, বাইরের লোককে সেই বই পেতে হলে তার চার বা পাঁচ গুণ ব্যয় করতে হয়।

লণ্ডনের সমাজতন্ত্রীদের Left Book Clubএর সঙ্গে আপনাদের পরিচয় আছে। সমাজ-তন্ত্রবাদ প্রচার করাই এর উদ্দেশ্য ;—এখানে প্রকাশিত বই হাতে পেলেই পাঠকবর্গ বুঝে নেন কোন দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে বিষয়বস্তুর অবতারণা হয়েছে—পরিচয়ের কাজ আধা পথ এগিয়ে থাকে। Left Bookএর প্রচার যখন বহুল হল, পরিপন্থীরা তোড়জোড় করে Right Book Clubএর সূচনা করলেন। এ ধরণের কেন্দ্রগুলির সুবিধা এই যে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে লেখা বইগুলি নিজ নিজ আশ্রয় সহজে পায়। পাঠক সম্প্রদায়ের বইএর জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিচয় আপনা থেকেই হয়ে আসে। ক্লাবের তক্‌মা পেলেই, বইয়ের ঠিকুজী পাওয়া গেল। প্রকাশক দিয়েই বইয়ের জাত বিচার হয়ে রইল। ব্যস্ত পাঠকেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অবসরমত বই হাতে তুলে নেয়।

এ ধরণের কেন্দ্র গড়ে ওঠায় পাঠকের সঙ্গে প্রকাশিত গ্রন্থের পরিচয় সহজ হয়ে উঠেছে। এমন এক সময় ছিল সুপরিচিত প্রকাশক যারা তাদের মতের সঙ্গে অমিল হলে, লেখকের বই ছাপানো কঠিন হত ; বহুদিন প্রতিষ্ঠিত পত্রিকাগুলির গোঁড়ামির দিকে ঝোঁক থাকে। রচনা ভঙ্গীতে বা মতবাদে যারা চিরচলিতের অনুসরণ না করে, নামকরা কাগজের দরবারে তাদের পাত

পাওয়া কষ্টসাধ্য। কবি কীটস্ এই রকম সমালোচনার তীব্রতায় যে কঠিন আঘাত পেয়েছিলেন, সেটাই তাঁর মৃত্যুর কারণ বলে অনেকে মনে করেন।

বইএর বিচারক গোষ্ঠীর একাধিক লেখকের সঙ্গে পরিচয়ের সৌভাগ্য আমার হয়েচে। বিচার পদ্ধতিতে তাঁরা কিন্তু একমত নন। যাঁরা একটু প্রবীণ ও হাতপাকা তাঁরা মনে করেন বই সম্বন্ধে তাদের ব্যক্তিগতই মতামতই পাঠক সম্প্রদায় চায়। কেউ বা ভাবেন, বইএর যথার্থ পরিচয় তার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ। সেখানে সমালোচকের ব্যক্তিগত রুচির কোন স্থান নেই। সমালোচক বিশেষের আবার বিচারের বিশেষ বিশেষ মানদণ্ড আছে। তাঁরা সেই বাঁধা নিক্তিতে সব ওজন করে দেখেন। কেবলমাত্র বিশ্লেষণ দিয়েই পরিচয় হয় না। রস বা সৌন্দর্য্যের আস্বাদ বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে গ্রহণ করা দুষ্কর। স্রষ্টা যাঁরা তাঁরাই একমাত্র সৃষ্টির আনন্দের উপলব্ধি করতে পারেন। অথচ সমালোচক সম্প্রদায়ের অভিমানের অন্ত নেই। তাঁদের ধারণা তাঁরাই শিল্পীদের গড়ে থাকেন। সাহিত্য বা শিল্পকারেরা যা সৃষ্টি করেছেন তা সমাজে প্রচলন করেন সমালোচকের ভূমিকা। এই দাবী যদি সত্য করতে হয়, তবে সমালোচক মাত্রেরই কিছু না কিছু পরিমাণে সৃষ্টি শক্তি থাকা আবশ্যক। বিশ্বস্রষ্টার সংসারে উটের মত জীবেরও স্থান হয়েছে। সমালোচক হয়ত ভ্রূকুঞ্চিত করে মাথা নেড়ে বলত "ঠাকুর ওটা তো ঠিক হল না, ওর যে অনেক খুঁত রয়ে গেল।" বিধাতার কাছে এর কী জবাবদিহি পাওয়া যেত জানি না। তবে বাঁধাগতের সমালোচনায় সৃষ্টি বৈচিত্র্য ধরা পড়ে না, এটা হয়ত সবাই স্বীকার করবেন।

আর একটা ভাববার কথা। সমালোচনার ভিতর দিয়ে আমরা কি সৃষ্ট বস্তুর রূপটী সম্যক্ পাই? সবটী না পাওয়ারই সম্ভাবনা। ভাষার পূর্ণ পরিচয় ব্যাকরণ দেয় না—ভাষা জীবন্ত, সে চলে আপন ছন্দে, আঁকা বাঁকা পথে, ব্যাকরণ আসে পাকা রাস্তায় তার পিছে পিছে। সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গী সাহিত্য ও শিল্পের চলার তালে সামঞ্জস্য রাখবে। রুচি বদলাচ্চে, নতুন সৃজনের আয়োজন প্রতিক্ষণেই আছে। সমালোচক যদি এ তালে পা ফেলে এগোতে না পারে, তবে তার পিছন থেকে পথ দেখাবার কোন সার্থকতা থাকে না।

তারপর, মানুষের ব্যক্তিগত পার্থক্য মনের পরিণতির সঙ্গে বাড়তির দিকে চলে। এই বৈষম্য সাহিত্যিক বিচারে প্রায়ই প্রকাশ পায়। কোন সমালোচকের হাতে যে বই আদর পায়, অন্য পাত্রে তার আর নিন্দার অন্ত থাকে না। বিতর্কমূলক বা controversial অনেক বই আছে, যার সমালোচনায় এত মতভেদ দেখা যায় যে, সাধারণের দৃষ্টি তাতে আরও ঝাপসা করে দেয়। কোন কোন পত্রিকা এই পথ নেয়—যে বইগুলি তারা ভালো মনে করে তারই পরিচয় তারা দেয়, অন্যগুলির কোন উল্লেখ তারা করে না। বিলেতের কোন বিখ্যাত ত্রৈমাসিকের সম্পাদককে দেখেছি রাশিকৃত নতুন বই Second hand পুস্তক বিক্রেতাকে দিয়ে দিতে। আমার ঔৎসুক্য দেখে তিনি বল্লেন যে—যা বই তাঁর কাছে আসে তার অল্পই তাঁর পত্রিকায় Review করা সম্ভব। সুতরাং প্রাথমিক নির্ব্বাচনে অনেক বই ফেলে দিতে হয়। যেগুলো

সেযাত্রা রক্ষা পেল, তারও অনেক, পরে নানা কারণে চাপা পড়ে। এইজন্যই বোধ হয় Book-Reviewতে আর একটী নতুন পদ্ধতি দেখা দিয়েছে। সমালোচক তিন চারখানা বই এক সঙ্গে বিচার করেন। প্রথম দেন তাদের সমষ্টিগত বিষয়বস্তু—বলা বাহুল্য বইগুলি এক শ্রেণীর হওয়া চাই। তারপর দেখান আধুনিক সমস্যাসমূহের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক—তাদের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। এই ধরণের প্রবন্ধ থেকে যে সমস্যা নিয়ে বইগুলি প্রকাশিত হয় তারই সঙ্গে বিশদ পরিচয় ঘটে থাকে।

আমেরিকার "Book Digest" Monthly অনেকে দেখে থাকবেন—অর্থাৎ এই পত্রিকাটীতে থাকে প্রকাশিত পুস্তকাবলীর মাসিক সংক্ষিপ্ত বিবরণী। এতে পিপাসু পাঠকের তৃষ্ণা কতটুকু মেটে জানি না। তবে অনেক লাইব্রেরিয়ান এই পত্রিকাটী পছন্দ করেন বলে জানি।

Psychological Review বা মনস্তাত্বিক সমালোচনা সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলে আমি বক্তব্য শেষ করব। এ ধরণের বিশ্লেষণ, উপন্যাস, নাটক ও জীবনীর বেলাতেই ঘটে বেশী। লেখক যাদের সৃষ্টি করেছেন, তাদের হাবভাব, কথাবার্ত্তা চালচলন কী পরিমাণে psychological হয়েছে, তাই দেখান হল বিচারের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই শতাব্দীতে psychlog'র চর্চ্চা যখন জাঁকিয়ে উঠ্‌ল, তখন সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক মনস্তত্বঘটিত উপন্যাস ও নাটক রচনায় বিশেষ করে প্রবৃত্ত হলেন—psychological criticismও ফ্যাসান হয়ে দাঁড়ালো। একদল বল্লেন—সাহিত্যে এই একমাত্র সাচ্চা জিনিষ—কেননা এটা "natural"। এ মতে সুস্থ মনের মত মেলান কঠিন। Nerve Hospital বা পাগলা গারদই তো পৃথিবীর সবটি জুড়ে নেই। মনীষী যাঁরা তাঁদের সৃষ্টি বিচিত্র, চিরন্তন প্রাণের পরিচয় তাতে—মানুষের তা চিরদিনের আনন্দের ভাণ্ডার। কেবলমাত্র psychology দিয়েই তো তার সমগ্র পরিচয় হয় না। এ ধরণের সমালোচনা প্রায়ই পাণ্ডিত্য ভারগ্রস্ত হয়—তার অত্যুক্তির আতিশয্যে জিজ্ঞাসু মন বিরূপ হয়ে ওটে। যথার্থ পরিচয় সেখানে পাওয়া যায়, যেখানে পরিচয়ের বস্তুতে কোন মত বা অভিমান আড়াল করে না রাখে। *

* All India Radio, Calcutta, পঠিত।

অভিযান

অভ্যর্থনা
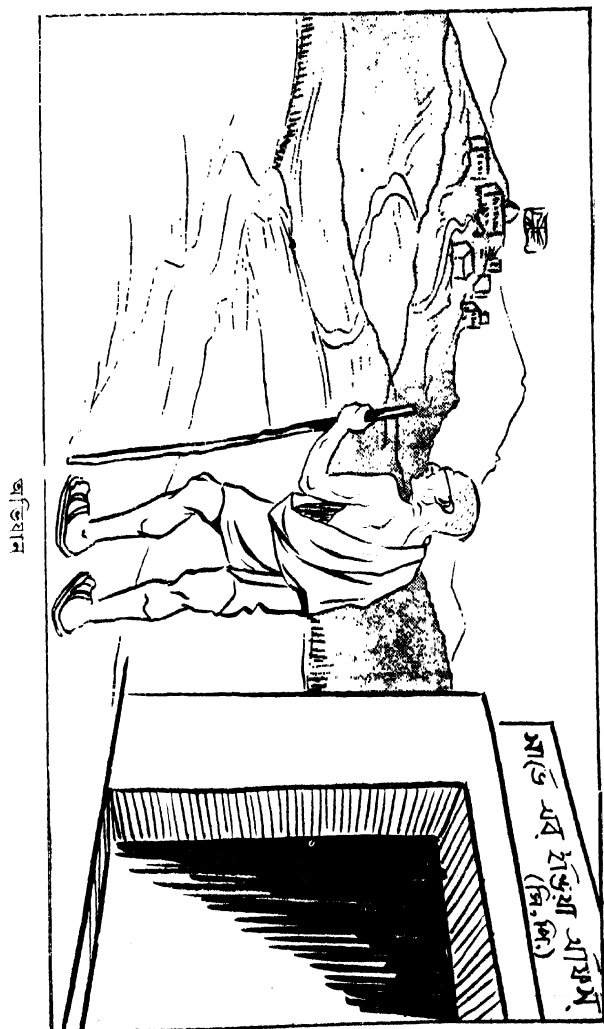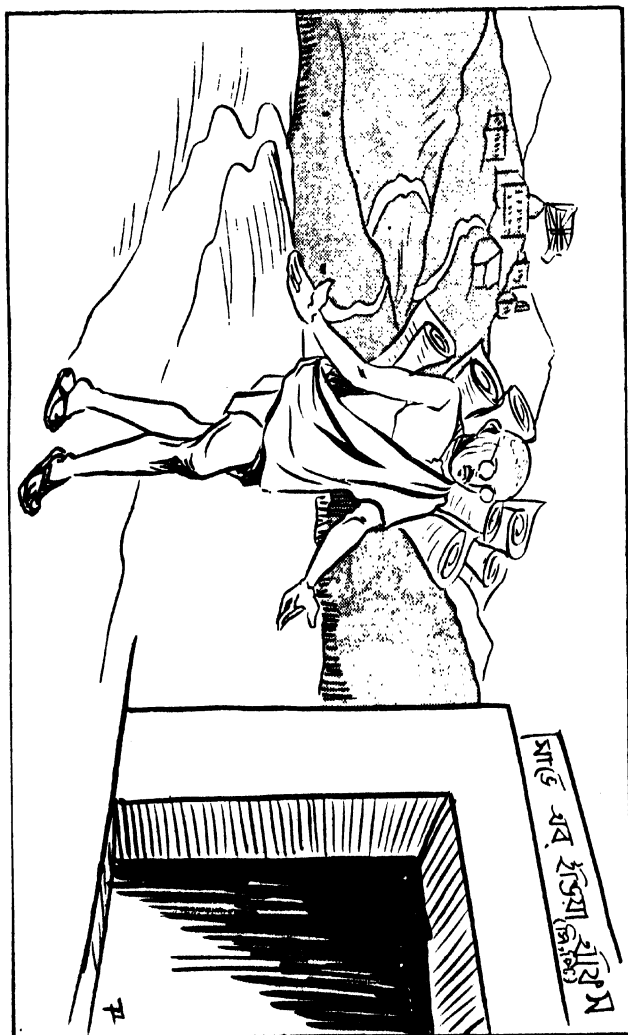
যুদ্ধ-পঞ্জি

কল্পনা মিত্র

পূর্বসূচনা

সেপটেম্বর—১৯৩৮ মিউনিক চুক্তি, সুদেতেনল্যাণ্ড জার্মেনীর কুক্ষিগত। চতুঃশক্তির চুক্তি পত্র স্বাক্ষর।

নভেম্বর—১৯৩৮ পোল্যাণ্ড ও রাশিয়ার অনাক্রমণ চুক্তি।

ডিসেম্বর—১৯৩৮ ফ্রান্স ও জার্মেনী নিজেদের মধ্যে তৎকালীন সীমান্তরেখা, এবং বিপদ উপস্থিত হলে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করা স্বীকার করে নেয়। এ সঙ্গে জার্মেনী নৌ ও বিমান শক্তিতে বৃটেনের সমকক্ষতা দাবী করে।

ফেব্রুয়ারী—১৯৩৯ বৃটন ও অন্যান্য শক্তি নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বনে স্পেনের জাতীয় গভর্ণমেণ্টএর পরাজয় ও স্পেনের পতন।

মার্চ—১৯৩৯ জার্মেন সৈন্যের প্রাগ অধিকার। চেকোশ্লোভাকিয়ার অস্তিত্ব লোপ।

মুসোলিনী

এপ্রিল—১৯৩৯ ইতালীর আলবেনিয়া আক্রমণ। কমিণ্টার্ণ বিরোধী চুক্তিতে স্পেনের যোগদান।

মধ্য ইউরোপ

এপ্রিল—১৯৩৯ জার্ম্মেনী বৃটনের সাথে নৌ-চুক্তি ও পোল্যাণ্ডের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি বাতিল করে।

মে—১৯৩৯ ইঙ্গ-রুশ চুক্তির আলোচনা সুরু হয়।

জুন—১৯৩৯ ইঙ্গ-রুশ চুক্তি বন্ধনে বৃটনের উদাসীনতা। বৃটিশ প্রতিনিধি মিঃ ষ্ট্রাঙএর চুক্তি করার কোন ক্ষমতা না নিয়ে মস্কোতে গমন।

জুলাই—১৯৩৯ রাশিয়ার সাথে কোনরূপ চুক্তি বদ্ধ হতে বৃটনের তখনও অনিচ্ছা।

অগাষ্ট—১৯৩৯ জার্ম্মেনীর পলিশ করিডরের দাবী।

অগাষ্ট—১৯৩৯ সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের জার্ম্মেনীর সাথে অনাক্রমণ চুক্তি বদ্ধ হতে স্বীকার।

অগাষ্ট—২৪, ১৯৩৯ রিবেনট্রপের বিমান যোগে মস্কো গমন জার্ম্মেনীর সোভিয়েটের সাথে অনাক্রমণ চুক্তি স্বীকার।
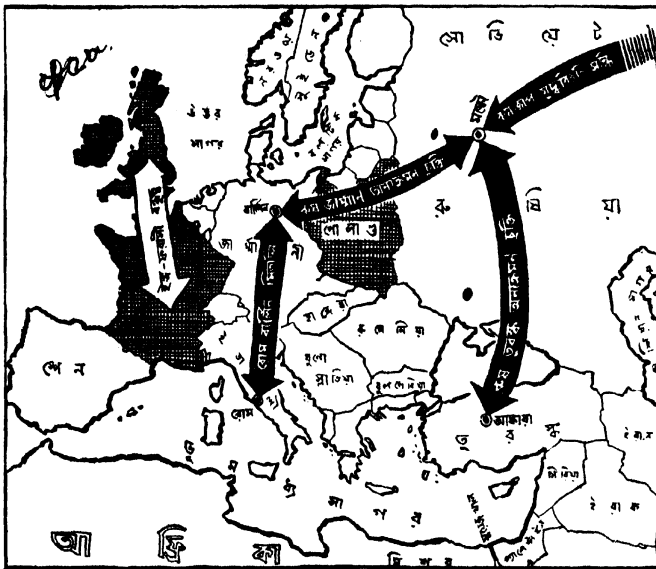
মৈত্রী-বন্ধন—একদিকে পোল্যাণ্ড, গ্রেট-ব্রিটেন ও ফ্রান্স অন্যদিকে জার্মেনী, রুশিয়া ইটালী, জাপান ও তুরস্ক।

সেপ্টেম্বর—১ জার্ম্মেন বাহিনীর সম্মুখে হের হিটলারের ঘোষণা—পোল্যাণ্ডের উন্মত্ততার অবসান শক্তির বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ ভিন্ন হবে না। পোলিশ সীমান্তে সংঘর্ষ সুরু।

নাৎসী নেতা হের ফষ্টার ডানৎসিক জার্ম্মেনীর অন্তর্ভুক্ত বলে ঘোষণা। বৃটনের সৈন্য-সজ্জা সুরু।

সেপ্টেম্বর—২ পোল্যাণ্ড হতে অবিলম্বে সৈন্য অপসারণের দাবী দিয়ে জার্ম্মেনের নিকট বৃটনের চরম পত্র। পোল্যাণ্ড ইঙ্গ-ফরাসীর সাহায্য প্রার্থনা—বৃটিশ মন্ত্রীসভার পদত্যাগ—ফ্রান্সে ব্যাপক সৈন্য-সজ্জার আদেশ।

সেপ্টেম্বর—৩ বৃটেন জার্মেনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে ফ্রান্স ও বৃটেনের সাথে যোগদান। ইংলণ্ডে সমরকালীন মন্ত্রিসভা গঠন—মিঃ চার্চ্চিলকে গ্রহণ। বৃটিশ চরম-পত্রের জার্মেন কর্তৃক প্রত্যাখ্যান শক্তির উত্তরে শক্তি প্রয়োগ হবে বলে বার্লিনের ঘোষণা।

,,—৪ বৃটিশ জাহাজ এথেনিয়া টর্পেডোর আঘাতে জলমগ্ন। পশ্চিম সীমান্তে ফ্রান্সের আক্রমণ সুরু।

,,—৫ বৃটিশ বিমানের কিয়েল খালস্থিত জার্মেন রণপোত আক্রমণ।

,,—৬ ওয়ারস হতে কেন্দ্রীয় শাসন বিভাগ স্থানান্তরিত। ইংলণ্ডে জার্মেন বিমান পোত। বার্লিনের উপর পোলিশ বিমান আক্রমণ। ম্যাজিনো লাইন ও সিগফ্রিড লাইনের উভয় পক্ষের গোলন্দাজ বাহিনীরমধ্যে তুমুল সংগ্রাম। জার্মেনীকে অর্থ নৈতিক অবরোধ করার জন্য সমিতি সংগঠন।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমর শক্তি

নভেম্বর—১৯৩৮

দেশ	স্থল সৈন্য		বিমান শক্তি		মোট স্থল ও বিমান শক্তি	শতকরা জনবলের কত সমর বিষয়ে অভিজ্ঞ
	সামরিক কাজে নিযুক্ত	সামরিক শিক্ষা প্রাপ্ত	সামরিক কাজে নিযুক্ত	সামরিক শিক্ষা প্রাপ্ত		
রাশিয়া	১,৫০০,০০০	১৬,৫০০,০০০	৮০,০০	...	১৮,১০০,০০০	৯.৪
ইটালী	৯১৭,৯৯১	৬,৪৯৪,১৭৭	১০৩,৫৫৫	৩৩১,৪২৮	৭,৮৪৭,১৫১	১৭.৬৩
জাপান	১,৫০০,০০০	৪,৭৭৮,০০০	২১,৫০০	২৬,১০০	৬,২৪৮,০০০	৮..
ফ্রান্স	৫২৫,৬৫৯	৫,৫০০,০০০	৬৪,৬৫০	৬,২২০	৬,০৯৬,৬২৯	১৪.২
জার্মেনী	৭৫০,০০০	৩,১৫০,০০০	২০৬,০০০	২০,০০০	৪,১২৬,০০০	৫.২
চীন	২,০০০,০০০	...	৭,৫০০	...	২,০০০,০০০	০.৪
বৃটিশ সাম্রাজ্য	৩৮২,৭৭০	৬২৪,৮০০	৮৭,৯৫০	২৬,১৭৫০	১,১২১,৬৯৫	০.২৫
গ্রেট বৃটেন	২০৮,৫০০	৩৬৫,০০০	৮৩,০০০	২৫,০০	৬৮১,১৪৩	১.৪৩
তুরস্ক	১৫২,৩৭৫	৫২৯,৪২০	৩,৩৭৫	...	৬০১,৮০০	৪.
আমেরিকা	১৮৩,৪৪৭	৩১৫,৪৮৪	২০,৩৪১	৫,৫৫৪	৪৯৩,৯৩১	.৫৮

সেপ্টেম্বর—৭ জার্মেন কর্তৃক পোলিশ করিডোর অধিকার দাবী, ডানৎসিক বন্দরের প্রবেশ পথে পোলিশবাহিনীর আত্মসমর্পণ। ওয়ারস সহরে বোমা বর্ষণ। জার্ম্মেন ব্যূহভেদ করে ফরাসীবাহিনীর সার অঞ্চল আক্রমণ--যুগোশ্লাভিয়ার সৈন্য সমাবেশ।

হিটলার

,,—৮ ফরাসীবাহিনা কর্তৃক সুরক্ষিত জার্ম্মেন সহর অধিকার—জার্ম্মেন সৈন্যের পুনঃ সমাবেশ --জার্ম্মেন অধিবাসীর রাইন অঞ্চল ত্যাগ। জার্ম্মেন সৈন্যের ওয়ারস প্রবেশ—কলিকাতা-গামী জাহাজ টর্পেডো ও গোলাবর্ষণে বিধ্বস্ত।

,,—৯ পশ্চিম সীমান্তে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর জয়। সিগফ্রিড লাইনে আক্রমণ, জার্ম্মেনীর উত্তর ওয়ারশ দখলের দাবী, পোলিশদের সে দাবী অস্বীকার, মস্কোতে রিজার্ভ সৈন্যদের আহ্বান, সিগফ্রিড লাইনের ত্রুটি অনুসন্ধান, পশ্চিম সীমান্তে জার্ম্মেন সৈন্য সমাবেশ, সারব্রুকেনে সংগ্রামের আশঙ্কা। পোলিশ—করিডার হতে জার্ম্মেন সৈন্যদল স্থানান্তরিত, ডেনমার্ক সীমান্তে বিমান যুদ্ধ।
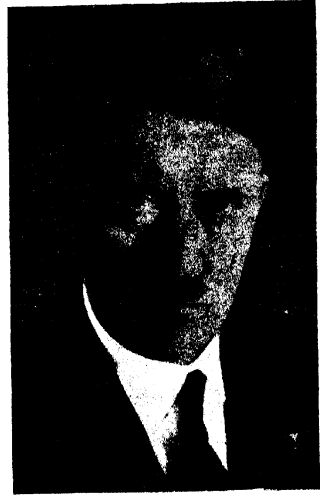
,,—১০ ফ্রান্স সৈন্যবাহিনীর জার্ম্মেন অঞ্চলে প্রবেশ, সিগফ্রিড লাইনের পাশে ফরাসী-জার্ম্মেন যুদ্ধ। বৃটিশ জাহাজ গুডউড আক্রান্ত ও নিমজ্জিত।

,,—১১ ওয়ারশ এখনও পোলদের অধিকারে। করিডারে জার্ম্মেন অধিকার স্থাপনের দাবী। মডলিন দুর্গ অধিকারের জন্য জার্ম্মেনদর প্রচণ্ড সংগ্রাম।

,,—১২ ওয়ারশতে বোমা বৃষ্টি, পিলসুডস্কি-মিউজিয়ম ধ্বংস। বিমান-সচিবের পদে সমর-নায়ক গোয়েরিংএর সীমান্তে গমন। ওয়ারশ হতে বৃটিশ দূতের প্রত্যাবর্তন।

,,—১৩ পশ্চিম সীমান্তে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অগ্রগতি পোলিশবাহিনী কর্তৃক লোজ পুনরাধিকার, পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার সংযোগ বিচ্ছিন্নের চেষ্টা।

,,—১৪ জার্ম্মেনবাহিনীর ডিনিয়া অধিকারের দাবী, মডলিন দুর্গ অধিকারের জন্য জার্ম্মেনদের প্রচণ্ড সংগ্রাম, সারব্রুকেন ও হর্ণবাকের মধ্যবর্ত্তী স্থানে ফরাসী অগ্রগতি।

,,—১৫ সিগফ্রিড লাইনের সন্নিকটবর্ত্তী লাকেসমবার্গ প্রভৃতি কয়েকটি সহর জার্ম্মেন কর্তৃক পরিত্যাগ, পার্ল ও সিডলি সহরে ফরাসী সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণ, জার্ম্মেন বোমাবর্ষনের ফলে লুবলিন সহরে দাবানল। ওয়ারস'র পূর্ব্বাঞ্চলে পোলিশবাহিনীর প্রচণ্ড সংগ্রাম। বৃটিশ ষ্টীমার ভেঙ্কোভার নিমজ্জন।

,,—১৬ পোলিশ কর্তৃক জার্ম্মেন বিমান ঘাঁটি ধ্বংস। সোয়াওতে জার্ম্মেন আক্রমণ প্রতিহত। বিমান যোগে হিটলারের পূর্ব্বসীমান্তে গমন। ওয়ারস এখনও জার্ম্মেন আক্রমণ প্রতিহত করছে। সিগফ্রিড লাইনে ফরাসী সৈন্যের চাপ, সারব্রুকেনের পতন আসন্ন।

,,—১৭ সোভিয়েট বাহিনীর পোল্যাণ্ড অভিযান হোয়াইট রাশিয়ান ও সংখ্যা লঘু ইক্রেউানিয়ানদের স্বার্থরক্ষার জন্য সোভিয়েটের নিরপেক্ষতা নীতি একাজেও অক্ষুন্ন থাকার দাবী, পাঁচ শতাধিক মাইল ব্যাপী সীমান্তে সোভিয়েট বাহিনীর ব্যাপক অভিযান—পোলিশবাহিনী কর্তৃক লাল-ফৌজের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান—জার্ম্মেন কর্তৃক ওয়ারসর প্রতি ১২ ঘণ্টার মধ্যে আত্মসমর্পনের চরম পত্র প্রদান, পোল্যাণ্ড কর্তৃক তা'র প্রত্যাখ্যান—রাশিয়া যুদ্ধে যোগ দেওয়ায় ইউরোপীয় পরিস্থিতির চাঞ্চল্যকর রূপান্তর।

ষ্টালিন

,,—১৮ পোলিশ গবর্ণমেণ্ট কুটিতে স্থানান্তরিত, সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক পোল্যাণ্ড ভাগ—বাঁটোয়ারার ব্যবস্থা ও জার্ম্মেনী রুশিয়ার মধ্যে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র (Buffer state) গঠনের পরিকল্পনা—পোল্যাণ্ড অন্তর্বিপ্লবের আশঙ্কা –সামরিক ডিক্টেটরী শাসন নীতি প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ চেষ্টা—ফ্রান্স গোলাবর্ষণের ফলে সিগফ্রিড লাইনে ভাঙ্গন সুরু।

,,—১৯ ডানৎসিকে হের হিটলারের সদম্ভ আস্ফালন—বোমার পরিবর্ত্তে বোমা, চোখের পরিবর্ত্তে চোখ—ওয়ারশ'র চারিদিকে প্রচণ্ড সংগ্রাম—মার্শেল ভরসিলভ সোভিয়েটবাহিনীর অধিনায়করূপে পোল্যাণ্ডে আগমন।

,,—২০ কমন্স সভায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেনের ঘোষণা—নাৎসী বর্ব্বরতা হতে ইউরোপকে রক্ষা করার সঙ্কল্প প্রকাশ—যুদ্ধাবসানের জন্য হের হিটলারের ব্যগ্রতা—পোলবাসীর উচ্ছেদ কামনায় ওয়ারশর পশ্চিমে প্রচণ্ড সংগ্রাম।

,,—২১ জার্ম্মেনীতে প্রেরিত সমরোপকরণ নির্ম্মানের মাল-মশলা আটক—নাৎসী সরকারের বিরুদ্ধে জার্ম্মেনীতে ব্যাপক অসন্তোষ—নাৎসী নায়কদের বিপুল সঞ্চিত অর্থ বিদেশী ব্যাঙ্কে প্রেরণ—ওয়ারশতে এখনও জার্ম্মেন আক্রমণ প্রতিহত।

সেপ্টেম্বর—২২ পোল্যাণ্ড ভাগাভাগির সীমা-রেখা নির্দ্ধারণ—সোভিয়েটের হস্তে সমগ্র পোল—রুমানিয়া ও পোল-রুথেনিয়া সীমান্ত—ওয়ারশস্থিত পোলিশবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি—পশ্চিম সীমান্তে ফরাসী বাহিনীর অগ্রগতি। সিগফ্রিড লাইনের সুরক্ষিত সারব্রুকেন অঞ্চলে সংগ্রাম—রুমানিয়ার তিনজন সমর নায়ক ও অন্যান্য নিয়ে নূতন মন্ত্রী সভা সংগঠন—মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের যুদ্ধে নিরপেক্ষ নীতি সম্বন্ধে তথাকার কংগ্রেসে আলোচনা।

,,—২৩ সারব্রুকেন ও সোয়েইব্রুকেনের মধ্যে সারারাত্রি ব্যাপী তুমুল সংগ্রাম—হের হিটলার কর্ত্তৃক ওয়ারশর রণক্ষেত্র পরিদর্শন—লোয়া ও নগরী আত্মসমর্পণ—যুদ্ধ সম্পর্কে বৃটিশ ও ফরাসী সমর নায়কদের বৈঠক।

,,—২৪ ওয়ারশতে নাৎসী বাহিনীর নৃশংস আক্রমণ—গীর্জ্জা ও হাঁসপাতালের উপর গোলাবর্ষণ—২৪ ঘণ্টায় সহস্রাধিক
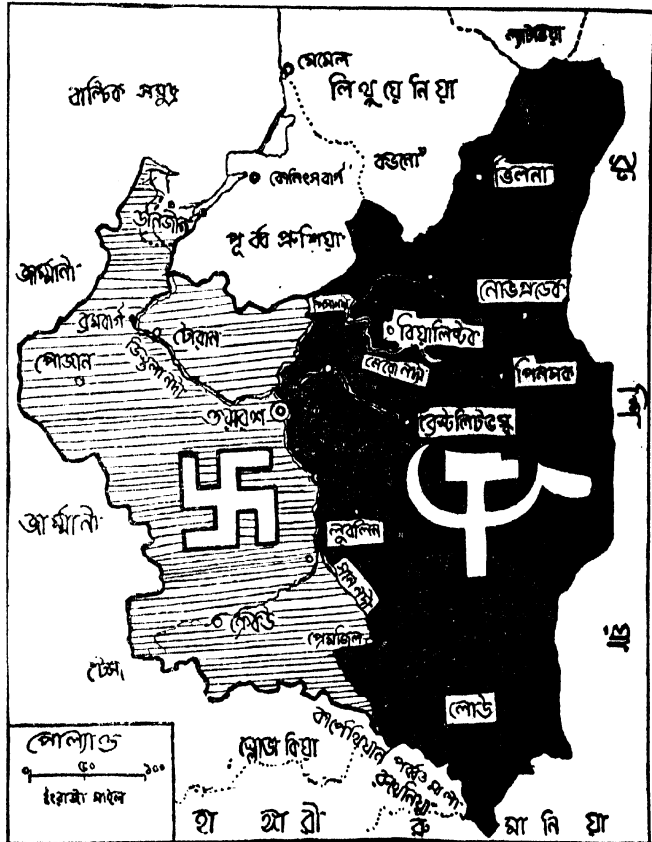
জার্মেণী ও রুশিয়া কর্ত্তৃক পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ার সীমা নির্দেশ।

নাগরিক নিহত—মডলিনে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড সংগ্রাম রুশ-বুলগেরিয়া বাণিজ্য চুক্তি—পশ্চিম সীমান্তে জার্ম্মেন আক্রমণ প্রতিহত

,,—২৫ পোল্যাণ্ডে সোভিয়েট বাহিনীর অপ্রতিহত অগ্রগতি—পশ্চিম সীমান্তে ফরাসী ও জার্ম্মেন বাহিনীর সংঘর্ষ—হের হিটলারের পশ্চিম সীমান্তে যাওয়ার সম্ভাবনা—দশ লক্ষ পোল বন্দী—ওয়ারশ'তে জার্ম্মেন বাহিনীর পৈশাচিক লীলা নাৎসীবাদ ধ্বংসের জন্য শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইবার বৃটনের দৃঢ় সঙ্কল্প।
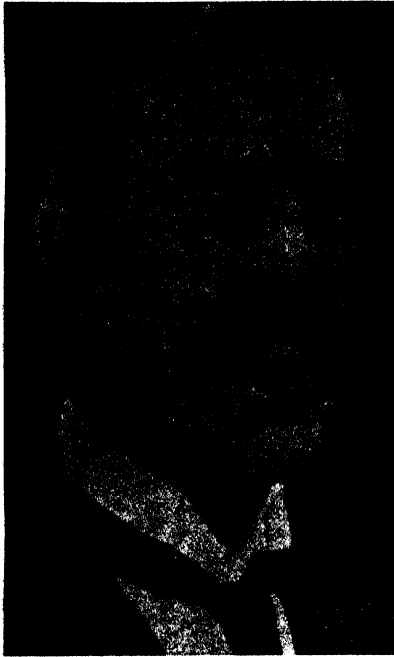
চেম্বারলেন

সেপ্টেম্বর—২৬ পশ্চিম রণাঙ্গণে ফরাসী ও জার্ম্মেন সৈন্যবাহিনীর প্রচণ্ড সংঘর্ষ —সিগফ্রিড দুর্গ শ্রেণী পতনের সম্ভাবনা—বৃটন ও ফ্রান্স কর্ত্তৃক সম্মিলিতভাবে সমর পন্থা নির্দ্ধারণ —কমন্স সভায় প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেনের বিবৃতি—রুমানীয়ান গভর্ণমেন্টের প্রতি বৃটনের সহানুভূতি প্রকাশ—প্রেসিডেন্ট মোসিকি ও মার্শাল স্মিগলি রীজের অন্তরীণ।

„—২৭ ওয়ারশ নগরীর আত্মসমর্পনের সিদ্ধান্ত—ওয়ারশ'তে জার্ম্মেন বিমান বাহিনীর পৈশাচিক ধ্বংসলীলা—হের ভন রিবেনট্রপের মস্কো যাত্রা—রুশ-ইতালী বল্কান মৈত্রী—ফরাসী সাম্যবাদীদলের বিলোপ—জার্ম্মেন প্রচার সচিব গোয়েবলসের পতন—বাল্টিক ও বল্কানে সোভিয়েট প্রাধান্য বিস্তারের প্রয়াস

সেপ্টেম্বর ২৮ ক্রেমলিনে প্রাসাদে মলোটোভ-রিবেনট্রপআত্ম আলোচনা—ওয়ারশ নগরীর বিনাসর্ত্তে সমর্পণ—জার্ম্মেন অধিকৃত পোল্যাণ্ডে সামরিক আইন জারী—রাশিয়া কর্ত্তৃক এষ্টোনিয়ার দু'টি নৌ-ঘাঁটি দাবী—উত্তর সমুদ্রে যুদ্ধ—সিগফ্রিডলাইন ক্ষতিগ্রস্ত—পোল্যাণ্ড ভাগাভাগী সম্পর্কে জার্ম্মেনী ও রুশিয়ার মধ্যে নূতন চুক্তি।

„—২৯ যুদ্ধাবসানের জন্য রাশিয়া ও জার্ম্মেনীর আকাঙ্খা জ্ঞাপন—ডিক্টেটরি প্রথায় জার্ম্মেনী, ইতালী, রাশিয়া, হাঙ্গারী, স্পেন, শ্লোভাকিয়া, বল্কানব্লক, বাল্টিকব্লক ও ডেনমার্ক, সুইডেন, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড ও আইসল্যাণ্ডের স্ক্যান্ডিনেভিয়ান—রাষ্ট্রগুলি নিয়ে নূতন রাষ্ট্র সঙ্ঘ গঠনের পরিকল্পনা—মস্কোতে রিবেনট্রপ—মলোটোভ আলোচনার পরিসমাপ্তি—৩০হাজার সৈন্যসহ মডলিন দুর্গের আত্মসমর্পণ।

দালাদিয়ের

„—৩০ ফরাসীবাহিনীর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের ফলে সারব্রুকেনের পতন আসন্ন—প্যান-শ্লাভ আন্দোলন ও পোল্যাণ্ডে সোভিয়েট ব্যবস্থা প্রবর্তনে ইতালীর আশঙ্কা—জার্ম্মেন গবর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে ইতালীর পররাষ্ট্র-সচিব সিয়ানোর বার্লিন যাত্রা।

এম, বি, সরকার এণ্ড সন্স
সন এণ্ড গ্র্যাণ্ড সন্স অব লেট বি, সরকার
ম্যানুফ্যাকচারিং জুয়েলার্স
V26/39.
আমাদের নিজ কারখানায় প্রস্তুত এক মাত্র গিণি স্বর্ণের নানাবিধ হাল ফ্যাসনের অলঙ্কার ও রৌপ্যের বাসনাদি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে এবং পছন্দমত যে কোন ডিজাইন অনুসারে তৈয়ার করিয়া দেওয়া হয়।
আমাদের তৈয়ারী গহনা ব্যবহারান্তে ফেরৎ দিলে গিণি সোনার বাজার দরে খরিদ করি। আমাদের নূতন বি ৪নং ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।
মজুরী পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট সুলভ করা হইয়াছে।
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।
১২৪-১২৪-১, বহুবাজার ষ্ট্রীট
কলিকাতা
ফোন বি, বি ১৭৬১
টেলি রেলিয়্যান্টস্

সম্পাদকীয়

মনীষী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড—

মনোবিকলন তত্ত্বের উদ্ভাবয়িতা বিশ্ববিশ্রুত মনীষী সিগমুণ্ড ফ্রয়েড ৮৩ বছর বয়সে লণ্ডনের কোন বাসভবনে চিরকালের জন্য ইহলোক হোতে বিদায় নিয়েছেন। তাঁর মতো চিন্তাবীরের গৌরবময় জীবনের অবসানে পৃথিবীর বিদ্বৎ-মণ্ডল হোতে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্খলন হয়েছে নিঃসন্দেহ। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে তাঁর অলোকসামান্য পাণ্ডিত্য, ও যুগান্তরকারী প্রতিভার দান অতুলনীয়। চিন্তারাজ্যে নবযুগপ্রবর্তক হিসাবে তাঁর স্থান উনবিংশ শতাব্দীর বিশেষভাবে বিংশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষিগণের সাথেই থাকবে। জ্ঞানোন্নতির সাধনায় তাঁর মতো এমন একনিষ্ঠ, আত্মসমাহিত সাধক বর্তমানকালে একান্তই দুর্লভ। নাৎসী বর্বরতার আক্রমণ হোতে আত্মরক্ষার জন্য জীবনের সায়াহ্নে তাঁকে তাঁর মাতৃভূমি অষ্ট্রীয়া ত্যাগ করে ইংলণ্ডে চলে আসতে হয়। নাৎসী জার্মেণী মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির বুকে যে সব কলঙ্ক কালিমা লেপন করেছে, ঋষিতুল্য ফ্রয়েডের নির্বাসন তার মধ্যে চিরকালের জন্য দুরপনেয় হয়ে থাকবে।

মনোবিজ্ঞানে তাঁর আবিষ্কৃত মূলতত্ত্ব হলো মানব সভ্যতা, সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিল্পকলা, ধর্ম সব কিছুর মূলেই আছে মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি। এ প্রবৃত্তির উদগতি (sublimation)তেই মঞ্জুরিত হয়ে উঠেছে মানব সভ্যতা ও সমাজের যত সব আনুষঙ্গিক। মানুষের প্রকাশমান চেতনমনের নিম্নতর স্তর আছে আদিম আবিল কামনার পরস্পর বিরোধী স্রোতধারা। মনের বিভিন্ন স্তর উত্তীর্ণ হয়ে সে সকল গুপ্ত, অবাঞ্ছিত কামনা শুচিশুদ্ধ, শুভ্রবেশে উপস্থিত হয় মানুষের চেতনলোকে এবং নিয়ন্ত্রিত করে তার চরিত্র, প্রকৃতি, রুচি, বুদ্ধি—এক কথায় তার সর্বসত্তা। এ রূপান্তরিত কামনা শুধু ব্যষ্টি জীবন নিয়ন্ত্রন করে না, সমষ্টি জীবন বা বৃহত্তর মানব সমাজও তার প্রভাবে প্রভাবান্বিত। ফ্রয়েডই প্রথম মানুষের অনাবিষ্কৃত অন্তর্লোক বিজ্ঞানের আলোক সম্পাতে কিছুটা সুগম করেন। তিনিই প্রথম মানবচিত্ত বৈজ্ঞানিকভাবে বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষা করেন। তাঁর গবেষণা ও মতবাদের ফলে এডলার, ইয়ুং প্রভৃতি মনস্তাত্ত্বিকগণ নূতন দৃষ্টি ভঙ্গীতে মানবচিত্ত বিশ্লেষণ করতে সুরু করেন। ফলে মানব চরিত্রের অনেক অভিনব, বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে এবং মনোবিকলনতত্ত্ব নব-বিজ্ঞানের পর্যায়ে উঠেছে।

বিজ্ঞানের কষ্ঠি-পাথরে ফ্রয়েডের মতবাদ পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য কি না সন্দেহ, তবে চিন্তারাজ্যে নূতন পথপ্রদর্শক হিসাবে তাঁর নাম চিরকাল আইনষ্টাইন্ ও মার্কসের সাথে থাকবে।

নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি—

গত ১৪ই সেপ্টেম্বর যুদ্ধ সম্পর্কে ওয়ার্কিং কমিটি যে বিবৃতি দিয়েছিল নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি তদনুসারে নিম্ন প্রস্তাব ১৮৮-৫৮ ভোটে অনুমোদন করেছে—

যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের মত বক্তব্য প্রকাশ করা সত্ত্বেও বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীদের সম্মতি না নিয়ে ভারতকে বিবদমান দেশ বলে ঘোষণা করেছেন এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতা বিশেষভাবে হ্রাস করে কেন্দ্রীয় পরিষদ দ্বারা কতিপয় ব্যাপক ফলপ্রসূ ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন।

যা হ'ক, যুদ্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং তার সহিত ভারতের সম্পর্ক বিষয়ে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে পরিষ্কারভাবে বলবার সুযোগ না দিয়ে, নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চায় না। নাৎসী ও ফ্যাসিষ্ট আক্রমণ নিন্দা করলেও রাষ্ট্রীয় সমিতির দৃঢ় বিশ্বাস যে, শান্তি ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে ও অব্যাহত রাখতে হলে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের অধীনস্থ দেশসমূহে গণতন্ত্র স্থাপন করতে হবে, বিশেষ করে ভারতবর্ষকে স্বাধীন জাতি বলে ঘোষনা করতে হবে এবং অবিলম্বে যতদূর সম্ভব অধিক পরিমাণে তাহা কার্য্যে পরিণত করতে হবে।

নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতির দৃঢ় বিশ্বাস যে, যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে কোন বিবৃতির মধ্যে এই ঘোষণা করা হবে।

নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতি পুনরায় ঘোষণা করেছে যে, গণতন্ত্র ও ঐক্য এবং সমস্ত সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থের নিরাপত্তার ভিত্তিতেই ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে কংগ্রেস তার জন্য বরাবরই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছে।

ভারতের দাবী ও বিলাতী সংবাদ পত্র—

ভারতের দাবী সম্বন্ধে প্রথম সহানুভূতি সূচক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে 'নিউ ষ্টেট্‌স্‌ম্যান এণ্ড নেশন'এর সম্পাদকীয় স্তম্ভে। এ প্রবন্ধে বলা হয়েছে 'বর্ত্তমান জরুরী অবস্থায় ভারতীয় জনমত উপেক্ষিত হয়েছে; কংগ্রেসের ইস্তাহার এ দেশীয় সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয় নি'। গত মহাযুদ্ধে ভারতের সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে বলছে 'কংগ্রেস এখন আর দায়িত্বহীন বিরুদ্ধবাদী একটা দল মাত্র নয়। আজ জগৎ সমক্ষে ভারতবর্ষের নিকট আমদের এ প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে, এ যুদ্ধ গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার জন্য, না সাম্রাজ্য ও বর্ত্তমান ব্যবস্থা কায়েম রাখিবার জন্য? ভারতবর্ষকে আপন ভাগ্য নিয়ন্তা জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রতিশ্রুতি আমাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে নামে না হোক কার্যতঃ ভারতীয় রাষ্ট্রের সভাপতি করলে আমরা ভারতবর্ষকে স্বপক্ষে পাব এবং সভ্য-জগৎ আমাদের আন্তরিকতায় বিশ্বাসী হবে। ওয়াশিংটন হতে মস্কো পর্যন্ত সকলে জিজ্ঞাসা করছে—আমরা কি জন্য এ যুদ্ধ করছি? আমরা যদি ভারতকে স্বাধীনতা দান করি, তা হলে একটা স্বাধীন জাতির নেতৃত্ব আমরা লাভ করব। আর যদি আমরা ভারতকে দমিয়ে রাখি, তা হ'লে ইউরোপ বা আমেরিকায় কেহ কি ভুল করে ভাববে, আমরা গণতন্ত্রের সমর্থক?'

ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান—

'আমাদের সম্মুখে যে সংগ্রামের দিন প্রতীক্ষা করছে তাতে ভারতীয় জনগণের আন্তরিক সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজন। বাস্তবের দিক দিয়ে যেমন তার জনবল ও অর্থবল আমাদের সাহায্যে আসবে, তেমনি নৈতিক দিক দিয়ে বৃটেন যে নিজের সাম্রাজ্যে দাসত্ব কায়েম করে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছেনা তার প্রমাণ করার জন্য বৃটেনের প্রয়োজন আছে। বৃটেন যে কারণে সংগ্রাম করছে তৎপ্রতি ভারতের প্রতিস্তরের নেতৃবৃন্দের নিকট হতে স্বতঃস্ফূর্ত সহানুভূতি দেখে ভারতের সাহায্য নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। কারণ এ পর্যন্ত ভারতবর্ষ হতে যে সকল সহানুভূতি সূচক বাণী এসেছে সেইগুলি পুরোপুরি পাঠ করলে জানা যায় যে, প্রতি ক্ষেত্রেই ভারতীয় নেতারা বৃটেনকে ভারতের সমর্থন লাভের সুযোগ দিয়েছেন মাত্র, তার বেশী কিছু করেন নি।

বৃটেন যদি গণতন্ত্রের রক্ষা ও বিশ্বে নববিধান প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করে থাকে তা হোলে ভারত আনন্দের সহিত তাতে যোগদান করবে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ শক্তির রক্ষাই যদি যুদ্ধের উদ্দেশ্য হয়, তা হলে, ভারতবর্ষ তাতে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করতে পারে না।

এইজন্যই কংগ্রেস বৃটিশ সরকারকে গণতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে এর নীতি ঘোষণা করতে এবং ভারতবর্ষে এ কি ভাবে প্রজোয্য হবে তা জানাতে আহ্বান করেছে। ভারতের সাহায্য প্রস্তাব একটি ঐতিহাসিক সুযোগ। এ সম্পর্কে লর্ড সভায় লর্ড জেটল্যাণ্ডের কয়েকটি মন্তব্য ছাড়া প্রকাশ্যে আর কেহ কিছু বলেন নি। গবর্ণমেণ্টের পূর্ব নির্ধারিত জরুরী কাজের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সরল আবেদনের উত্তর দেওয়ার সময় পায় না এ কথা বিশ্বাস করা অসম্ভব। এ প্রতিষ্ঠানই ভারতকে পৃথিবীতে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনে অংশ গ্রহণ করাতে কিম্বা তা বন্ধ করাতে সমর্থ'।

ষ্টার—

'ভারতবর্ষ আরও গণতান্ত্রিক অধিকার দাবী করছে। আমরাও তা চাই এবং সেজন্য আমাদের সংগ্রাম। এ দেশে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যক্তিবর্গ ভারতের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ব্যাক্তিবর্গের সহিত সহানুভূতি প্রদর্শন করছে এবং আশা করি যে যুদ্ধের ফলে ভারতের গণতান্ত্রিক অধিকার বৃদ্ধি পাবে, নিশ্চয়ই হ্রাস প্রাপ্ত হবে না।'

ডেলি হেরাল্ড—

ডেলি হেরাল্ডের একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে জানতে চেয়েছে যে বৃটেন কি গণতন্ত্রের জন্যই করছে না এ সাম্রাজ্যবাদ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা? যদি বৃটেন কংগ্রেস নেতৃবর্গকে বুঝাতে পারে যে, আমরা গণতন্ত্রের জন্যই যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছ এবং গণতন্ত্রের উপর আমাদের সত্যিকার শ্রদ্ধা আছে, তা হ'লে আমরা ত্রিশকোটি লোকের পূর্ণ সাহায্য লাভ করব। কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচিত ভারতীয় সদস্যের হস্তে যথাসম্ভব দায়িত্ব অর্পণ করতে সম্মত হওয়া উচিত। বিগত মহাযুদ্ধে

ভারতবর্ষ মিত্রশক্তির জন্য যে ত্যাগ স্বীকার করেছিল অদ্য পর্যন্ত আমরা তার যথোচিত প্রত্যুপকার করি নি'।

নিউজ ক্রনিকল—

ভারতবর্ষ গত ক বছরের স্বায়ত্ত শাসনের দিকে দৃঢ়পদে অগ্রসর হয়েছে; কিন্তু এখনও বহু বাধা অপসারিত করতে হবে। যে দৃঢ়তার সহিত আমরা এ দায়িত্ব পালন করব, তাহা দ্বারাই ভারতে এবং অন্যান্য স্থানে বর্ত্তমান সংগ্রামে আমাদের আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যাবে। বড় বড় সমস্যাগুলি সম্বন্ধে কংগ্রেসের সহিত উদারতার সহিত আপোষ করতে আর সময় নষ্ট করা উচিত নয়।

ভারতের দাবী সম্বন্ধে ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড-এর নৈরাশ্যপূর্ণ বক্তৃতার পর অনেকের ক্ষীণ আশা ছিল যে, বৃটিশ-মন্ত্রীসভার এরূপ মত নয়। সরকারী মুখপত্র 'টাইম্‌স্‌' 'ভারতবর্ষ ও যুদ্ধ-শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রবন্ধে যা লিখেছে তাতে একান্ত আশাবাদীদেরও ক্ষীণ আশা অন্তর্হিত হবে মনে হয়। 'টাইম্‌স্‌' লিখছে:---

'কংগ্রেসের সাধারণ সদস্য এবং অপর সকলে নাৎসীবাদের ঘোরতর বিরোধী এবং সাধারণ সমস্যার প্রতি তারা সকলেই আনুগত্য প্রদর্শন করেছে, এ সত্য কংগ্রেস যদি এখন চাপা দিতে চায়, তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হবে। মহাত্মা গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ন'ন্, ভারত-সরকারকে বিনাসর্ত্তে সাহায্য করবার জন্য তিনি যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, ওয়ার্কিং কমিটির নেতারা তা মেনে নেয় নি। শাসনসংস্কার পরিবর্ত্তন করে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্টের নিকট হতে আরও নিয়মতান্ত্রিক সুবিধা আদায় করবার জন্য এ অবস্থা হতে রাজনৈতিক লাভ করবার আশা তারা করছে বেশ বোঝা যায়।

যদিও পোল্যাণ্ড এবং অন্যান্য দেশ আক্রমণে ভারতের সম্মিলিত জনমত নিন্দা করছে, যদিও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ওয়ারসতে বাণী পাঠিয়ে সাহসী পোলদের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করেছেন, তথাপি নাৎসী-প্রচারকারীরা ওয়ার্কিং কমিটির মনোভাবকে জার্ম্মাণীর অনুকূল বলে যে প্রচারকার্য্য করছে তা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। দেশীয় রাজাদের এবং মুসলমান-প্রদেশ পাঞ্জাব, বাঙ্গলা ও সিন্ধুর প্রধান মন্ত্রিগণের নিকট হতে ভারত-সরকার যে সহযোগিতার প্রস্তাব পেয়েছে তার সহিত এর নিশ্চয়ই পার্থক্য রয়েছে। অপরপক্ষে, ওয়ার্কিং কমিটির বিবৃতি উপেক্ষা করাও ন্যায়সঙ্গত বা রাজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক হবে না। বড়লাট এরূপ কোন ভ্রম করেন নি।

সমস্যা কঠিন সন্দেহ নেই কিন্তু অনেকেই উহা সমাধানে তাঁর ক্ষমতা আছে বলে মনে করেন। কেবলমাত্র ওয়ার্কিং কমিটির অভিমত মেনে নিলেই সমস্যার সমাধান হবে না। ভারতীয় রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করবার একচেটিয়া অধিকার বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট কংগ্রেসের হাতে তুলে দিতে পারেন না। এরূপ করলে অন্যান্য প্রধান ভারতীয় স্বার্থের প্রতি অবিচার করা হবে। তন্মধ্যে

মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থও নড়বে। গবর্ণমেন্টের উপর যে চাপ দেওয়া হয়েছে নিয়মতান্ত্রিক দিক্ দিয়ে তার আরও অধিক সমালোচনা হবে।

১৯১৮ সালের পর হতে ভারতে অকস্মাৎ অতিরিক্ত পরিবর্ত্তন না করে দেশকে ধাপে ধাপে স্বায়ত্তশাসন দানের নীতি অনুসৃত হচ্ছে। বিশ বৎসর যাবৎ অবিচলভাবে ভারতীয় জননায়কগণের সহিত আলোচনাদ্বারা যে নীতি অনুসরণ করা হয়েছে তারই অনুসরণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করা ছাড়া বৃটিশ-গবর্ণমেন্ট কংগ্রেসকে আর কি বলতে পারে, তা বোঝা কঠিন।

ভারতের অপূর্ব্ব আনুগত্য স্বীকার করবার সুযোগ গ্রহণ করা উচিত এবং তার একটি উপায়ের কথা বলা যেতে পারে। এ দেশের ভারতীয় ও য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান অধিবাসিগণকে ডোমিনিয়ন স্বেচ্ছাসেবকগণকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি হওয়ার যে অধিকার দেওয়া হয়, সে অধিকার দেওয়া যেতে পারে এবং জানা যায়, যে-সব বিদেশী এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে, তাদেরও কতককে দেওয়া হবে। বৃটিশ কৃতজ্ঞতা ও সদিচ্ছার এই প্রকার প্রমাণকে বন্ধুভাবাপন্ন ভারতীয়েরা সাদরে গ্রহণ করবে।

বিলাতের লর্ড-সভা ও ভারতের দাবী—

ভারত সম্বন্ধে লর্ড-সভায় বিতর্ক উঠলে লর্ড স্নেল্ বলেন 'যখন সময় আসবে তখন আমরা তাদের কথা ভুলব না' কিন্তু সে সময় কখন আসবে এ সম্বন্ধে তিনি কোন কথা বলেন নি। গত মহাযুদ্ধের পর 'সময় আসিলে' ভারত সচিব মণ্টেগু যে শাসন-সংস্কার প্রবর্তন করেন তা দেশবাসীর নিকট অত্যন্ত অসন্তোষজনক ছিল। আবার 'সময় আসিলে' ভারতের তদানীন্তন বড়লাট আরউইন (বর্তমানে লর্ড হ্যালিফাক্স) ভারতে 'Dominion Status' (স্বায়ত্ত শাসন) প্রবর্তনের কথা বলেন, কিন্তু গোল টেবিল বৈঠকে যে শাসনতন্ত্র ভারতের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তাতে 'Dominion Status' কথাটা পর্যন্ত উল্লেখ করা হয় নি। এবার সময় আসলে লর্ডমহোদয় ভারতের কথা ভুলবেন না খুবই ভাল কিন্তু তার পূর্বে ভারত সম্বন্ধে বৃটিশনীতির পুরানো ভুল ভাঙ্গা দরকার।

উক্তসভায় ভারত সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ডও বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন কংগ্রেসের দাবী সময়োচিত হয়নি। 'আমাদের জীবন মরণ সংগ্রামের সময় আমাদিগকে বিব্রত করবার উদ্দেশ্যে কিছু করবার জন্য যদি বর্তমান সুযোগ বাছিয়া লওয়া হয়, তা হলে আমরা ও সকল দাবীতে যতটা কর্ণপাত করতে রাজী হব, তার অপেক্ষা অনেক বেশী রাজী হব, যখন উপযুক্ত সময় আসবে'।

কংগ্রেসের দাবীতে ভারতসচিবের অভিযোগ বা অসন্তোষ প্রকাশের কিছু নেই, কারণ ভারতের এ দাবী ইংরেজ সরকারের নিকট নূতন নয়, বহু আগে, বহুবার উত্থাপিত হয়েছে। কাজেই দাবী যদি 'স্বাভাবিক' হয়ে থাকে তবে সময়ের দিক দিয়ে উচিত অনুচিতের প্রশ্ন আসে না। এ অভিযোগের উত্তর গান্ধীজী অন্যভাবে দিয়েছেন, 'আমার মতে কংগ্রেস এ ঘোষণার দাবী করে কোন অভূতপূর্ব অথবা মর্যাদা হানিকর দাবী করেনি। কেবলমাত্র স্বাধীন ভারতের সাহায্যেরই মূল্য

আছে, যাতে সে জনসাধারণকে গিয়ে বলতে পারে যে যুদ্ধের পর স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ভারতের মর্যাদা গ্রেটবৃটেনের অনুরূপই হবে' !

ভারত সচিবের এ আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা উল্লেখ করে পণ্ডিত জওহরলাল বলেছেন, 'পণ্যবীথিকা-সুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে আমরা কোন দাবী করিনি ; এ আমি দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করছি। দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ভারতবাসী হিসাবে ভারতের স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির কথা চিন্তা করা আমাদের কর্তব্য। এ যে কংগ্রেসের মুখ্য কর্মধারা তা কংগ্রেস কখনও ভুলতে পারে না। তথাপি আমরা বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এ সমস্যা বিবেচনা করতে চেয়েছি ; ......পৃথিবীর স্বাধীনতা ও সুখসম্পদের জন্য প্রয়োজন হলে ভারত কোন কোন জাতীয় সুবিধা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কেননা, আমাদের বিশ্বাস, ও মূল্যে জাতীয় স্বাধীনতা ক্রয় করলে, তা দীর্ঘকাল স্থায়ী হবে। কিন্তু আমরা পৃথিবীতে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাই এবং পৃথিবীর স্বাধীনতার চিত্রে যে স্বাধীন ভারতের স্থান হবে, তৎসম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতে চাই।'

পণ্ডিতজীর এ উক্তিতে লর্ড জেটল্যাণ্ডের বোঝা উচিত ভারত ইউরোপীয় সঙ্কটকে একটা সুযোগ হিসাবে নেয়নি, একটা বিরাট বিশ্বসমস্যা হিসাবে নিয়েছে এবং নব্য ভারতের দৃষ্টিভঙ্গী আমলাতান্ত্রিক পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গী নয়।

যুদ্ধ ও ভারতীয় শিল্পের সম্ভাবনা

বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের জন্য বিদেশ থেকে আমদানী পণ্যের পরিমাণ হ্রাস অপরিহার্য। তাই সরকারী রসদ সরবরাহকারী বিভাগ যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারত সরকারের বিভিন্ন খরিদ বিভাগের সুবিধার জন্য দেশীয় কাঁচামাল ও কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্যাদি কি পরিমাণ পাবার সম্ভাবনা আছে সে সম্বন্ধে তদন্ত করবেন বলে খবর প্রকাশিত হ'য়েছে। এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যে খবর পাওয়া গেছে তাতে দেশীয় শিল্প প্রচেষ্টার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎসাহিত হ'বার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। শিল্পকার্যে ব্যবহৃত মূল রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের—যেমন কষ্টিক সোডা, ব্লিচিং পাউডার, সোডা এ্যাস্ ইত্যাদির কারখানা ইতিমধ্যেই পাঞ্জাবে প্রসারলাভ করেছে। বোম্বাই ও বিহারের সাইকেলের কারখানায় তৈরী মাল শীঘ্রই বাজারে বেরোবে। কাপড়ের কলসংক্রান্ত মেসিন পার্ট প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের প্রচেষ্টা চলেছে। শ্বেতসারের আমদানী বন্ধ হওয়ায় আমদানী শুল্কের মুখাপেক্ষী শিল্পটীকে আর গবর্ণমেণ্টের দয়ার উপর নির্ভর করতে হ'বে না। প্রতিযোগীর অভাবে মাদ্রাজের ষ্টিল রোলিং মিল্‌সের শ্রীবৃদ্ধির পথ সুগম হ'লো। রেলগাড়ী ও টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের যাবতীয় সরঞ্জাম যাতে করে দেশের ভিতরেই তৈরী হ'তে পারে তার জন্য ভারপ্রাপ্ত বিভাগ পূর্বাহ্নেই অবহিত হ'য়েছে। বিভিন্ন প্রকার কাগজ প্রস্তুতের জন্য চারিদিক হ'তে তোড়জোড় আরম্ভ হ'য়েছে। চ্যাটফিল্ড কমিটীর অনুমোদন অনুযায়ী সৈন্য বিভাগের প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র যথাসম্ভব ভারতে প্রস্তুতের বিরাট কল্পনাকেও আংশিকভাবে রূপ দেওয়া হচ্ছে। মোট কথা, কার্পাস, পাট, রাসায়নিক দ্রব্য, পশম, চামড়া, লোহালক্কর প্রভৃতি শিল্পের সমৃদ্ধির প্রভূত সুযোগ

শুধু যে দেশের প্রয়োজনের চাহিদা মেটাবার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে তাই নয়, যুদ্ধ-সম্পর্ক-বিরহিত নিরপেক্ষ বাজারে ও ভারতে উৎপন্ন পণ্য দ্রব্যের যোগান চলবে।

কৃষক-দরদী মিঃ ম্যাকডোনাল্ড

ইণ্ডিয়ান জুট মিল্‌স্ এসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ম্যাকডোনাল্ড সেদিন কার্যনির্বাহক সমিতির সভায় বলেছেন যে শীঘ্রই পাট ক্রয় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হ'বে এবং গবর্ণমেণ্ট প্রয়োজনীয় পাট চট ও থলের অর্ডার সমস্ত এই প্রতিষ্ঠানের মারফত দেবেন। ফাট্‌কা বাজারের উঠ্‌তি পড়্‌তি লক্ষ্য করে তিনি বলেন যে পাট ব্যবসায়কে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করার উদ্দেশ্যে নিম্নতম ও উচ্চতম দর নির্ধারিত করে দেওয়া হ'বে এবং এর বেশী দিয়ে মিল মালিকেরা পাট কিন্‌বেন না। রায়তদের পাট উৎপাদন ব্যয় মিঃ ম্যাক্‌ডোনাল্ডের মতে ৩৷৩৷৷৹ টাকা সুতরাং ৭৷৷৹ টাকার মত দাম বেঁধে দিলে আপত্তির কারণ থাক্‌তে পারে না এবং এ মূল্যে মিলসমূহের প্রয়োজনীয় পাট আগামী দু'মাসের মধ্যেই পাওয়া যেতে পারে।

মিঃ ম্যাকডোনাল্ডের বক্তৃতা আগাগোড়া ভ্রান্তিপূর্ণ। যথাসম্ভব স্বল্প মূল্যে পাট ক্রয় করবার অত্যুগ্র লোভ তিনি কথার মারপ্যাঁচে ঢেকে রাখ্‌বার চেষ্টা করেছেন মাত্র। ফাট্‌কা বাজারে বর্ধিত চাহিদার অনুপাতে স্বাভাবিক নিয়মেই মূল্য বৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল কিন্তু পরদিনই ষড়যন্ত্রকারী মিল মালিকদের কারসাজিতে অন্যায়ভাবে তাহাকে দাবানো হ'য়েছে। আসল কথাটা গোপন রেখে মিঃ ম্যাকডোনাল্ড ফাট্‌কা বাজারের কেনা-বেচার উপর অযথা কটাক্ষপাত করেছেন। উদারহৃদয় ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব ৭৷৷৹ টাকা পর্যন্ত পাটের দাম দিতে রাজী আছেন কারণ তাতে করে চাষীরা প্রচুর লাভবান হ'বার অবকাশ পাবে যেহেতু পাটের উৎপাদন মূল্য তাঁর মতে মণ প্রতি ৩৲ টাকা মাত্র। ব্যাঙ্কিং তদন্ত কমিটীর মতে উৎপাদন ব্যয় আমরা ৫৲ টাকা বলেই জানি। তাছাড়া, জীবনযাত্রার ব্যয় সেকাল থেকে এখন শতকরা ২০।২৫ ভাগ বেড়েও গেছে। তাই ৩৲ টাকা উৎপাদন ব্যয় হিসেব করে প্রজা-দরদী ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেব মস্ত ভুল করেছেন সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় কথা, গবর্ণমেণ্টের প্রয়োজনীয় ২।৩ লক্ষ গাঁইট সস্তা দরে কিন্‌বার অছিলায় বিশ্বের বাজারে বাংলার উৎপন্ন ৯৫ লক্ষ গাঁইটের চাহিদা-মাফিক বর্ধিত মূল্য থেকে বঞ্চিত করবার মধ্যে যুক্তি কোথায়? ম্যাক্‌ডোনাল্ডী বক্তৃতায় substituteএর ভূতকে ও নূতন করে আমদানী করা হ'য়েছে। আজকের দিনে আতঙ্কিত বিশ্ববাসীর পক্ষে যথা মূল্যে পাট ক্রয় করা যতটা স্বাভাবিক তন্তুশিল্পের গবেষণা দ্বারা পাটের তুল্য তন্তু আবিষ্কারের চেষ্টা ততটা স্বাভাবিক নয়। আসল কথা, যে জেগে ঘুমোয় তাকে জাগাবে কে?

জনসংখ্যা ও জনস্বাস্থ্য (১৯৩৭)

১৯৩৭ সালের ভারত সরকারের সাধারণ স্বাস্থ্য বিভাগীয় কমিশনারের বার্ষিক কার্যবিবরণী প্রকাশিত হ'য়েছে। দেখা যায়, মোট মৃত্যু সংখ্যার শতকরা ৫৫ ভাগ (অর্থাৎ ৩০ লক্ষেরও

অধিক লোক) শুধুমাত্র জ্বররোগেই মারা গিয়েছে। আবার এই নানাবিধ জ্বরের মধ্যে একমাত্র ম্যালেরিয়ার বেদীতেই ১০ লক্ষ প্রাণ বলি পড়েছে। এ থেকে জনস্বাস্থ্যের একটা দিক সম্বন্ধে আমদের দৃঢ়ীভূত ধারণার ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়, কলেরা, বসন্ত ও প্লেগের আকস্মিকতা ও দ্রুত সংক্রমণের সম্ভাবনা দ্বারা আতঙ্কিত জনসাধারন মারাত্মক হিসেবে জ্বররোগকে উপেক্ষা করেই চলে আস্ছে, অথচ গত ১৯২৫ থেকে ১৯৩৭ সালের বিবরণ বিচার করে দেখা যায় এই তিন ব্যাধির একত্রিত মোট মৃত্যু সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগের অতিরিক্ত হয় নাই। এ সমস্ত ব্যাধির গুরুত্বের তারতম্যের হিসাব জাতীয় স্বাস্থ্যবিদ্দের বিচার্য সন্দেহ নেই, কিন্তু আমাদের দিক থেকে যা দিনের আলোর মতন সুস্পষ্ট দেখ্তে পাচ্ছি তা এই যে, প্রথমতঃ এ সকল ব্যাধির অধিকাংশই প্রতিষেধক ; এবং স্বাস্থ্য বিভাগীয় কমিশনারের সহিত একমত হয়ে আমরাও বলি যে প্রতিষেধক সমস্যা কেবল চিকিৎসা বিষয়কই নহে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্র ব্যবস্থামূলক প্রশ্নগুলিও ইহার সমাধানের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত।

ব্যাপকভাবে জন্মমৃত্যুর হার বিবেচনা করে দেখা যায় ১৯১১ সাল থেকে মৃত্যুহার কমে আস্ছে। ১৯২১ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে গড়পরতা এক হাজারে জন্ম ও মৃত্যুর হার ছিলো যথাক্রমে ৩৪.৫ ও ২২.৪। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ঐ হার যথাক্রমে ৩১ ও ২২এ দাঁড়িয়েছে। এ থেকে হিসেব করলে দেখা যাবে যে ১৯৩১—৪১ সালের দশ বৎসরে ভারতের লোক সংখ্যা সম্ভবতঃ ৪৷৷০ কোটী থেকে ৫ কোটীর মত বাড়্বে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় খাদ্য শস্যের উৎপাদন অনুরূপ বৃদ্ধি পায়নি, পেতে পারে না। জনসংখ্যার দ্রুত প্রসার ও জীবনযাত্রার ক্রমিক অবনতি এই দুইটী কঠিন সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনস্বাস্থ্য-সমস্যাকে বিচার করতে হ'বে। স্যার জন মিগর বলেছেন যে সুপরিকল্পিত জীবন সম্পর্কে সমস্ত জাতিকে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন, কি ভাবে প্রকৃতিদত্ত শক্তিসমূহকে কাজে লাগানো যায় জনসাধারণকে সে কৌশল আয়ত্ত করতে হ'বে। কৃষি, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতি ও শিল্প বিশারদ্দের সম্মিলিত কর্মপন্থা উদ্ভাবনের উপরই এ সমস্যার সমাধান নির্ভর করে।

সমর ও সোভিয়েট গ্রন্থি

গত একমাস পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েট ক্রিয়াকলাপ শত্রু-মিত্র উভয়েরই বিমূঢ় বিস্ময়ের কারণ হোয়ে দাঁড়িয়েছে। 'আইডিওলজি' বা মতাবাদের চক্রদ্বয়ে ইউরোপের রাজনৈতিক পরিবেশ রচিত—বিগত বৎসর গুলিতে এই নিশ্চিত ধারণা আগামী সংগ্রামের প্রতিপক্ষ অধিকাংশের মনেই নির্ধারিত কোরে রেখেছিল। সোভিয়েট-জার্মাণ চুক্তি ইউরোপীয় সমাবেশের কল্পচিত্রের এই গোঁড়ামিকে রূঢ় আঘাত দিয়েছে। অভ্যস্ত চিন্তাধারায় অতর্কিত আক্রমণ সামলে উঠতে না উঠতেই রুশিয়ার পোল্যাণ্ডে সৈন্যচালনা ও জার্মাণীর সহিত পোল্যাণ্ড বাঁটোয়ারা, বল্টিক সাগরের উপকূলে,—এষ্টোনিয়া, ল্যাটভিয়, লিথুয়ানিয়ার ওপর—সোভিয়েট প্রভাব বিস্তার ও কৃষ্ণসাগরে (Black Sea) অনুরূপ আচরণ অভিজ্ঞ কূটরাজনীতিকেও ধাঁধাঁ লাগিয়ে দিয়েছে।

পোল্যাণ্ডে সৈন্যচালনা করে রুশিয়া ইঙ্গ-ফরাসী-পোলিশ চুক্তির স্থূল ব্যাখ্যা অনুযায়ী পোল্যাণ্ড আক্রমণের দায়ে—কোন কোন স্থানে-ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির শত্রু প্রতিপাদিত হোলেও, ইঙ্গ-ফরাসী শক্তি সোভিয়েটকে শত্রু আখ্যায়িত না কোরে রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। সোভিয়েট রুশিয়া পোল্যাণ্ডে সৈন্য-চালনা করার পূর্বেই পোলিশ গভর্ণমেণ্ট পোল্যাণ্ডের সীমান্ত অতিক্রম করে রুমানিয়ায় প্রবেশ করে। সোভিয়েট অভিযানের ফলে হোয়াইট রুশিয়া ও ইউক্রাইনের সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় জার্মাণীর কুক্ষিগত হয় নাই, বরং সোভিয়েটে স্বীয় পরিমণ্ডলে স্থান পেয়েছে। সোভিয়েট অভিযানের এ কয়টা দিক মনে রাখা দরকার। হিটলারের অভিযান সোভিয়েট সীমান্তে উপস্থিত হোলে সমগ্র পোল্যাণ্ড জার্মাণ রাইখের অন্তর্ভূক্ত হোয়ে পড়ত। একবার সোভিয়েট সীমান্তে জার্মাণ সৈন্য স্থাপিত হোলে সোভিয়েট-জার্মাণ সংঘর্ষ অনিবার্য হোত। সোভিয়েট অভিযান তা সম্ভব হোতে দেয় নাই।

এদিকে সোভিয়েট সীমান্তে নাৎসী প্রভাবের ছোঁয়াচ বলটিক ও বলকান রাজ্যগুলিকে রেহাই দিত না। বলটিক ষ্টেটের কয়েকটি এবং বলকানে মোটামুটি নাৎসী প্রভাব বর্তমান ছিল। হিটলারের ডানৎসিক নীতির পরিপূর্ণতার পথে বলটিক, সোভিয়েট ইউক্রাইন ও বলকানের ডাক পড়তো। সোভিয়েটের অমোঘ চাল হিটলারের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ করেছে, আর দুনিয়ার সমক্ষে হিটলার হোয়ে দাঁড়িয়েছে সোভিয়েটের অনুগ।

এষ্টোনিয়ার সাথে চুক্তি করে ও ফিনল্যাণ্ড, ল্যাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়াকে চুক্তির পাকচক্রে স্থান দিয়ে বলটিক বন্দরগুলির সাথে চলাচলের পথ সুগম করার ব্যবস্থা সোভিয়েট করছে। বলকানেও তুর্কির সহিত দৃঢ় মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হোয়ে বালটিকের মোহানায় ডারডানেলেসে-এর মুখে সোভিয়েট নজর রাখতে চায়। পূর্ব ইউরোপে সোভিয়েটকাস্তের নিরঙ্কুশ ক্ষিপ্রতা সমগ্র ইউরোপের ক্ষমতা মস্কোতে কেন্দ্রীভূত কোরে 'বৃহত্তর জার্মাণীর' (Greater Germany) স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে 'মাত্র একটি দেশে সোস্যালিজম'এর (socialism in one country)গ্লানিকর গঞ্জনার অবসান ঘটাবার সম্ভাবনা এগিয়ে এনেছে।

সোভিয়েট-জার্মান নূতন চুক্তিতে পোল্যাণ্ড ভাগের একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা এবং পাশ্চাত্য শক্তিদ্বয়কে শান্তিস্থাপন করতে বলা হোয়েছে জার্মান ও সোভিয়েট সীমান্তের মধ্যে নিরীহ ও নিরপেক্ষ (Buffer State) এক গণতান্ত্রিক পোলিশ রাজ্য দাঁড় করিয়ে নাৎসী-সোভিয়েট সংঘর্ষ পিছিয়ে দেওয়া এই চুক্তির মর্মে নিহিত আছে। দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধে জার্মাণীর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটবে এ সংশয় নাৎসীনেতাদের স্থির থাকতে দিচ্ছে না। অপর পক্ষে, হিটলারকে আয়ত্তে রেখে ইউরোপে প্রাধান্য লাভ করার সুযোগও ষ্টালিন হারাতে চায় না। হিটলারের শান্তির আকাঙ্খা ও ষ্টালিনের শান্তি প্রচেষ্টা—এ দুয়ের কারণ এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে। মিত্রশক্তিদের যুদ্ধ স্থগিত রাখবার তাগিদ নেই. সোভিয়েটও সম্ভবতঃ বর্তমানে যুদ্ধে লিপ্ত হোতে রাজী নয়। সুতরাং, সোভিয়েট

জার্মান মৈত্রী সত্ত্বেও জার্মাণীর ভাগ্য বিপর্যয় ঘটলে কোন বিস্ময়ের সৃষ্টি হবে না। জার্মান সোভিয়েট 'শান্তি অভিযান' শান্তির অনাবিল প্রেরণা নিয়ে জন্মায় নাই ।

এখানে কয়েকটি বিদেশী সংবাদপত্রের অভিমত উদ্ধৃত করলে সোভিয়েট (peace offensive) জার্মান চুক্তির প্রতিক্রিয়ার পরিচয় পাওয়া যাবে। 'টাইমস' পত্রিকা এই চুক্তির 'উদ্ধত্য ও অন্যায়ের' কথা উল্লেখ করে বলেছে " বহুপ্রতিশ্রুত 'শান্তি অভিযান' একটা চাল ছাড়া আর কিছু নয়।

রাশিয়া সম্বন্ধে 'টাইমস' লিখেছে—'কার্যক্ষেত্রের ঘটনাবলী হইতে যখন ষ্টালিনের অভিপ্রায় বুঝা যাইবে, তখন তাহার সহিত বৃটেনের সম্পর্ক ঠিক করা যাইবে। এখনও তাহার অভিপ্রায় স্পষ্ট নয় '।

'ডেলী টেলিগ্রাফ'—'রাশিয়াকে কাজে লাগাইয়া জার্মাণীর সন্ধি ডিক্টেট করিবার আশা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।'

'নিউজ ক্রনিকল'—"যদি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট অবশ্যই তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। শান্তির এমন প্রস্তাব হইতে পারে যাহা আগামী কল্যই বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই প্রস্তাব এমন হইবে—যাহার ফলে সমগ্র জগৎ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে এবং অগ্রগতির পথে নূতন যাত্রা সূচনা করিবে। আক্রমণের নিকট আত্মসমপর্ণের কোন সর্ত ইহাতে থাকিবে না। এই দেশের জন সাধারণ জানে যে, স্বাধীনতার জন্যই আমরা অস্ত্রধারণ করিয়াছি এবং যতদিন বল প্রয়োগ কিম্বা বল প্রয়োগের ভীতি অব্যাহত থাকিবে ততদিন আমরা ফিরিব না"।

যুদ্ধ চল্‌লে রুশ-জার্মাণ চুক্তিতে 'প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা' অবলম্বনের জন্য যে আলোচনার কথা বলা হোয়েছে 'ইভিনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড' এর মতে তার অর্থ—১। রাশিয়া এবং জার্মাণীর পূর্ণ সামরিক সহযোগিতা অথবা ২। রাশিয়ার মৌখিক আশ্বাস ও তার নিরপেক্ষতা। এই পত্রিকার মতে প্রথম অর্থ সত্য হোলে যুদ্ধ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে ; আর দ্বিতীয়টি সত্য হোলে হিটলার ও ষ্টালিন পরস্পকে অবিশ্বাসের চোখে দেখতে থাকবে।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সোভিয়েট নীতির সহিত স্বার্থের বন্ধন (community of interest) খুঁজে পেয়েছে। বৃটিশ নৌ-সচিব উইনষ্টন চার্চিল ১লা অক্টোবর বেতার বক্তৃতায় সে কথা স্বীকার করেছেন—

'যুদ্ধের এই প্রথম মাসের দ্বিতীয় ঘটনা রাশিয়ার শক্তি প্রকাশ। রাশিয়া আত্মস্বার্থের নীতি অনুসরণ করিয়াছে। রুশ সৈন্য যদি আক্রমণকারীর পরিবর্তে পোল্যাণ্ডের মিত্র হিসাবে বর্তমান সীমা রেখায় আসিয়া দাঁড়াইত তাহা হইলে আমরা খুসি হইতাম। তবে নাৎসী বিপদ প্রতিরোধের জন্য রুশ বাহিনীর পক্ষে বর্তমান সীমারেখায় আসিয়া দাঁড়ান স্পষ্টতঃই প্রয়োজন ছিল।............ গত সপ্তাহে হের ফন রিবেনট্রপকে মস্কোতে ডাকিয়া পাঠান হয় এই বাস্তব সত্যটি জানিয়া ও

মানিয়া লইবার জন্য যে, বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ ও ইউক্রেণের বিরুদ্ধে নাৎসী অভিযানের মতলব চিরকালের মত ছাড়িয়া দিতে হইবে।

জার্মাণী কৃষ্ণ সাগরের তীরে ঘাটী করিবে বা বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহকে পদানত করিবে বা দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের শ্লাভ জাতিগুলিকে কবলিত করিবে, এরূপ ঘটনা রাশিয়ার স্বার্থ বা নিরাপত্তার বিরোধী। উহা রাশিয়ার ঐতিহাসিক ধারা বা স্বার্থের পরিপন্থী। এইখানেই রাশিয়ার স্বার্থ ও বৃটেন-ফ্রান্সের স্বার্থ একত্র মিলিত হইয়াছে। এই তিন শক্তির কেহই যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া এবং বিশেষ করিয়া তুরস্ককে জার্মাণীর গ্রাসে যাইতে দিতে পারে না। বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে আমরা পরিষ্কার দেখিতে পাই ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া এই একই স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ--তাহারা নাৎসীগণকে বলকানে ও তুরস্কে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইতে দিতে পারে না। প্রথম মাসের যুদ্ধের সবচেয়ে বড় ঘটনা এই যে, হিটলারকে এবং যাহা কিছু হিটলার সমর্থন করেন সমস্তকেই দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ হইতে তফাৎ করিয়া দেওয়া হইতেছে।'

মিঃ চার্চিলের এই দিব্যজ্ঞান ঠিক সময়ে উদিত হোলে শান্তির কায়েমী ভিৎ আজ ইউরোপে অনড় হোয়ে উঠ্‌তো। রুশ-জার্মাণ চুক্তি সম্পর্কে বার্ণাড'শ তাঁর ক্ষুরধার মননার পরিচয় দিয়েছেন কয়েকটী কথায় "হিটলার শান্তিকামী ষ্টালিনের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে"। ("Hitler would be now under the powerful thumb of Stalin whose interest in peace is overwhelming.") ষ্টালিনের পোলিশ অভিযানকে লক্ষ্য করে বার্ণাড'শ বলেন "Stalin has no objection to using Hitler as his cat's paw." কিন্তু বার্ণাড'শর বুদ্ধির দীপ্তি রাজনীতিক কুয়াশা দূর করে নাই।

মার্কিণ নিরপেক্ষতা

আমেরিকান সিনেটের পররাষ্ট্র বিভাগীয় কমিটীর চেয়ারম্যান সিনেটর পিটম্যান মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা সম্পর্কিত বিলের খসড়া প্রস্তুত করেছেন। প্রচলিত নিরপেক্ষ নীতির পরিবর্তন এই বিলের উদ্দেশ্য। প্রচলিত নীতি অনুসারে দুইটী রাষ্ট্রে বিরোধ বাধলে আমেরিকা নিরপেক্ষ থাকবে এবং এবং যুযুধান কোন পক্ষের নিকটই অস্ত্র পর্যন্ত বিক্রয় করবে না। আমেরিকার এই নীতি দুর্বল শক্তিগুলির কাছে শস্ত্র সম্পদের বাজার বন্ধ করে দিয়ে তাদের পরাজয় ঘটিয়েছে---স্পেন ও আবিসিনিয়া এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

সম্প্রতি নিরপেক্ষ আইনে কয়েকটী নূতন ধারা সংযোগ করে এই বৈষম্য দূর করবার চেষ্টা হয়েছে—(১) মার্কিণ জাহাজে কোন যুদ্ধপরায়ণ দেশে যাত্রী অথবা মাল যিয়ে যাওয়া চলবে না। (২) যুযুধান শক্তিগুলির সমরোপকরণ কিনে জাহাজে তুলবার পূর্বেই মালের দায়িত্ব নিতে হবে। (৩) কোন বিবদমান রাষ্ট্র ৯০ দিনের বেশী সময়ের জন্য বাণিজ্যগত ঋণ পাবে না। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট নূতন খসড়া পেশ করবার জন্য আহূত বিশেষ সভায় বলেন---"আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কংগ্রেসে এই আইন পাশ হয় এবং আমি উহাতে নাম স্বাক্ষর

করি। আমি এক্ষণে ঐ আইনের যে ধারায় বিদেশে মাল রপ্তানি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা জারীর ব্যবস্থা আছে, সেই ধারা সম্পর্কে আপনাদিগকে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আইনের ঐ অংশের সহিত আন্তর্জাতিক আইনের সু-প্রাচীন নীতির কোন সামঞ্জস্য নাই।"

এই সংশোধনে নিরপেক্ষতা প্রতিশ্রুত হোলেও বাস্তবক্ষেত্রে মিত্রশক্তির সহায়তা করবে। জার্মাণীর এমন অর্থ নাই যে নগদ দাম দিয়ে আমেরিকা থেকে যুদ্ধোপকরণ ক্রয় করবে। কিছু কিছু ক্রয় করলেও সেই পণ্য জার্মাণ জাহাজে নিরাপদে বন্দরে এসে পৌঁছবে—সে সুযোগও জার্মাণীর নাই। কানাডার সান্নিধ্য ও বৃটেনের সঙ্গে ঐতিহাসিক সম্পর্ক আমেরিকার নিরপেক্ষতার অবসান ঘটাবে—'নিরপেক্ষতা আইনের' সংশোধন তারই সূচনা। গত মহাযুদ্ধে আমেরিকা লিপ্ত হয় গণতন্ত্রের নিরাপত্তাকল্পে। আমেরিকার যোগদানে মিত্রশক্তি জয়লাভ করে। গণতন্ত্র আর একবার প্রাণ পেল—এই ভেবে বিশ্বের লোক স্বস্তি পায়। গণতন্ত্র স্বাস্থ্য ফিরে পায় নাই, পুনরায় গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ হয়েছে। যুগে যুগে 'ধর্মরক্ষার' জন্য আমেরিকা নিরপেক্ষতা ত্যাগ করে আসছে, এবার ও তার ব্যতিক্রম হবে মনে হয় না।

দয়ারাম

সাড়ীর বাজারে দয়ারামের নূতন পরিচয় প্রয়োজন হবে না। বর্ণ বৈচিত্রে ও আধুনিকতায় সাড়ী, ব্লাউজ ইত্যাদির মনোরম আয়োজন দয়ারামের বৈশিষ্ট্য। দয়ারাম এবারকার পূজার বাজারেও আয়োজনের ত্রুটি রাখে নাই। তাদের পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

এম বি সরকার এণ্ড সন্স

সুপরিচিত এম, বি, সরকার অলঙ্কার নির্মাণে আধুনিক রুচিকে যথাযথ রূপ দিয়ে সর্বজনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এম, বি, সরকারের অলঙ্কার বিভিন্ন রুচির অনুমোদন লাভ করবে—এটা বলাই বাহুল্য।

জবাকুসুম

সি, কে, সেন এণ্ড কোম্পানীর জবাকুসুম বাঙালীর ঘরে সুপরিচিত। এবার পূজার বাজারে নূতন পরিচ্ছদে জবাকুসুম বের হোয়েছে। সুশ্রী ও শোভন কাস্কেটে আমরা জবাকুসুম পেয়েছি। নূতন শিশি, নূতন ছিপি ও নূতন মোড়কে জবাকুসুম আরও আদরণীয় হয়ে উঠবে।

গ্রাহিকা-গ্রাহকদের প্রতি

১। জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে বাহির হইয়া থাকে। আষাঢ় হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। ইহার সডাক বার্ষিক মূল্য ৪॥০ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য।৵০ আনা।

৩। কোন মাসের কাগজ যথাসময়ে না পাইলে সেই মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে স্থানীয় পোষ্ট মাষ্টারের **স্বাক্ষর সহ** জানাইবেন, নচেৎ কোন হারানো সংখ্যার প্রতিকার সম্ভব হইবে না।

। জয়শ্রী বাংলা, ভারতবর্ষ ও জগতের চিন্তাধারার সহিত আপনাদের পরিচিত করিবার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে। আপনাদের নিকট আমাদের নিবেদন, আপনারা গ্রাহক-গ্রাহিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া জয়শ্রীর কার্যে সহায়তা করুন।

লেখিকা ও লেখকদের প্রতি

১। রাষ্ট্রসম্বন্ধীয়, অর্থনৈতিক, সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতা গ্রহণ করা হইবে।

২। এক রঙের চিত্র, Fresco, Linedrawing, সাদরে গৃহীত হইবে।

৩। প্রবন্ধাদি **এক পৃষ্ঠায়** পরিষ্কার করিয়া লিখিতে হইবে।

৪। অমনোনীত প্রবন্ধাদি ফেরত দেওয়া হইবে না। কপি রাখিয়া পাঠাইবেন।

৫। প্রবন্ধ ও চিত্রাদি সমস্তই পরিচালিকার নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন।

শ্রীরেণু সেন এম. এ

পরিচালিকা

১২০।১ রাসবিহারী এভিনিউ, পোঃ বালিগঞ্জ, কলিকাতা।
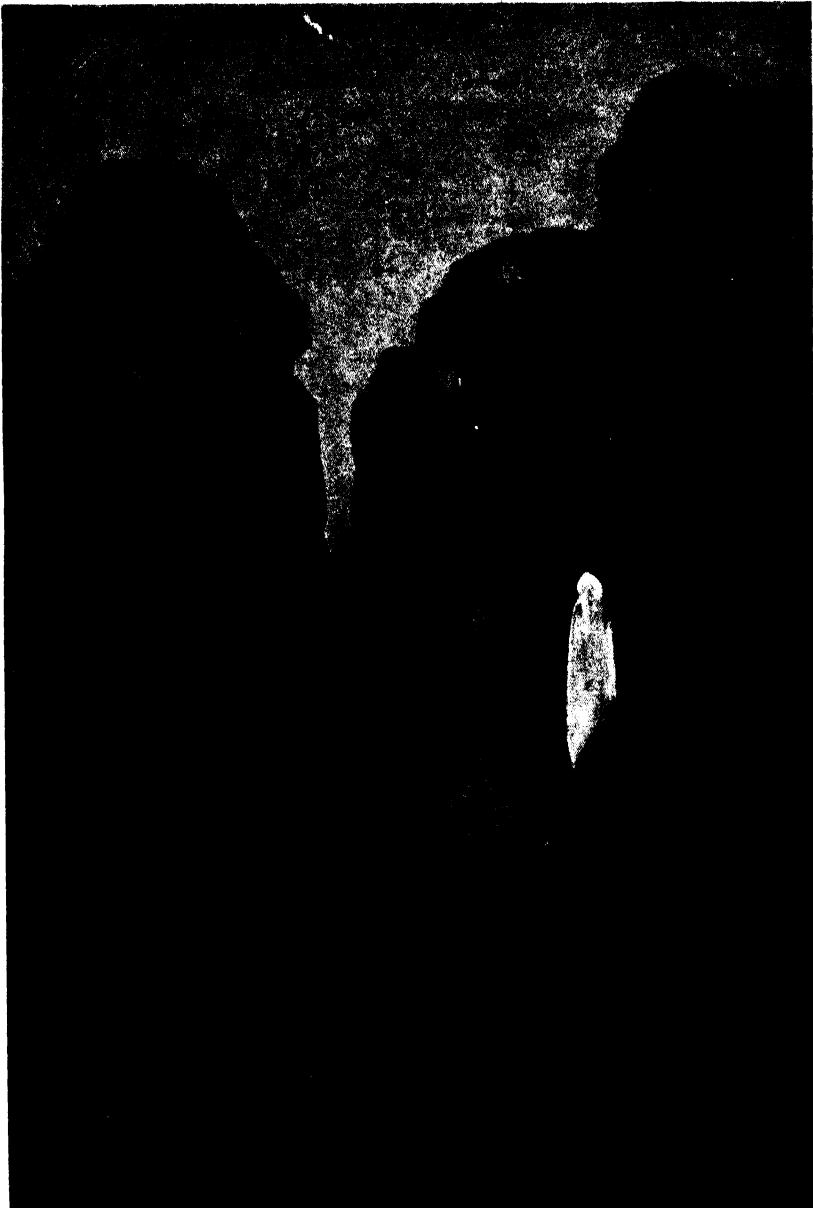
স্বপ্ন-ভঙ্গ

শিল্পী—সুধীরকুমার রায়ের সৌজন্যে

অষ্টম বর্ষ | অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ | ষষ্ঠ সংখ্যা

গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হায় মোর নাহি যে বাণী
আকাশে হৃদয় শুধু বিছাতে জানি।
আমি অমাবিভাবরী আলোকহারা
মেলিয়া তারা
চাহি নিঃশেষ পথ পানে
নিষ্ফল আশা নিয়ে প্রাণে।
বহুদূরে বাজে তব বাঁশি
সকরুণ সুর আসে ভাসি
বিহ্বল বায়ে
নিদ্রাসমুদ্র পারায়ে।
তোমারি সুরের প্রতিধ্বনি
দিই যে ফিরায়ে,
সে কি তব স্বপ্নের তীরে
ভাঁটার স্রোতের মতো
লাগে ধীরে অতি ধীরে ধীরে॥

জাতি, জাতীয়তা, ও স্বদেশপ্রেমের জন্ম কথা

শরৎ চন্দ্র রায় (রাঁচি)

আমার জন্ম-পত্রিকায় জ্যোতির্বী ঠাকুর লিখে রেখেছিলেন—"ভক্তি বিষয়ে অল্পতা। জ্ঞান প্রধানঃ। ধর্ম্মচিন্তাকালে চিত্তস্য নিশ্চলত্বং। পরন্তু ধ্যেয়বস্তুনঃ ধ্যানাভাবঃ।" ইত্যাদি।

সেদিন ছিল গৃহে ৺শ্যামা পূজা। যখন ভক্ত-সাধক ঠাকুর-মহাশয় ভক্তি-গদ্গদ-কণ্ঠে প্রেতাসনারূঢ়া, করালবদনা মুণ্ডমালা-বিভূষিতা মহাকালীর—

"কর্ণাবতংসতানীত শবযুগ্ম ভয়ানকাম্।
ঘোর দংস্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নত-পয়োধরাম্॥
শবানাং করসংঘাতৈ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়-গলদ্রক্তধারা-বিস্ফুরিতাননাম্॥

ইত্যাকার ধ্যানমন্ত্র আবৃত্তি ক'রছিলেন, তখন আমার কোষ্ঠির ফলানুযায়ী "ধ্যেয়বস্তুনঃ ধ্যানাভাবঃ-বশাৎ" মনে আচম্বিতে উদিত হ'ল ইউরোপের বর্ত্তমান ও বিগত মহাসমরের তাণ্ডবলীলার ভৈরব চিত্র। তা' হ'তে স্বতঃই মন চ'ললো সমরের মূলীভূত কারণের খোঁজে। অনুভব ক'রলাম যে উহার প্রকাশ্য কারণ একপক্ষে জাতীয় বিস্তার ও একীকরণ (national expansion and consolidation) এবং অপর পক্ষে ক্ষুদ্রায়তন হীনবল জাতিদের স্বাতন্ত্র্যরক্ষা বা স্বাধীনতা প্রদান,—আর আসল কারণ হ'চ্ছে একপক্ষে ক্ষমতা-লোলুপতা, জাত্যহঙ্কার, জাতি-প্রতিযোগিতা ও জাতি-বিদ্বেষ, এবং অপরপক্ষে স্বদেশ-প্রেম এবং স্বার্থরক্ষা। আর নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে আমার মানস-পটে প্রতিভাত হ'ল এই সমরের চিত্র, মানবের আদিম-প্রকৃতির নগ্ন মুর্ত্তিরূপে, ও প্রকৃতি-দেবীর আদিম—জাতি-গঠন-পদ্ধতির পুনরভিনয়রূপে।

প্রথমে প্রতিভাত হ'ল সেই প্রাকৃতিক আদিম জাতি-গঠন-পদ্ধতির অস্পষ্ট চিত্র-রেখা অতীতের কুহেলিকাময় প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রকৃতির কর্ম্মশালা বা পরীক্ষাগারে (laboratoryতে)। দে'খলাম বহু-লক্ষ বৎসরের মানব সৃষ্টির ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও পরীক্ষার (experimentsএর) ফলে পিথিকানথ্রোপাস (Pithecanthropus), ইয়ানথ্রোপাস (Eanthropus), হোমোনিয়ানডারথালেনসিস (Homo Neanderthalensis), হোমোপেকিনেনসিস (Homo Pekinensis) প্রভৃতি বহু মানবীয় জাতির উদ্ভব, বৃদ্ধি ও বিলয় হ'ল। আর দে'খলাম প্রাকৃতিক ও ঐন্দ্রিয়িক নির্ব্বাচনের (Natural and organic selectionএর) সাহায্যে বাহ্য-প্রকৃতির কঠোর প্রভাব ও পরিবর্ত্তনশীল পারিপার্শ্বিক নৈসর্গিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চ'লবার উপযোগী দৈহিক ও

জৈবিক ক্রমিক অনুকূল পরিবর্ত্তন (successive favourable germinal variations) সাধন অর্জ্জন ক'রে, আধুনিক ক'রে যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তনের (survival of the fittestএর) নিয়ম অনুসারে, অসাধারণ বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন ক'রে, আধুনিক মানবজাতি (Homo recens বা Homo sapiens) উদ্ভূত হ'ল। তখন বুঝ'লাম যে প্রকৃতির নগ্ন মূর্ত্তি হ'চ্ছে জীবন-সংগ্রামের পেষণে দুর্ব্বলের বা অযোগ্যের লয় এবং যোগ্যতমের উদ্বর্ত্তন; আর নব নব জাতি-সংগঠন হ'চ্ছে প্রকৃতির শাশ্বত নিয়ম ও ক্রমোন্নতির স্বাভাবিক ও সনাতন পন্থা।

আবার দে'খলাম জীবন সংগ্রামের অবিশ্রান্ত তাড়নায় এই আধুনিক মানবজাতি বিভিন্ন দেশে পরিব্যাপ্ত হ'ল ও বিভিন্ন মানব গোষ্ঠি নদী-সমুদ্র-মরু পর্ব্বতাদি প্রাকৃতিক প্রাচীর দ্বারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হ'য়ে বিভিন্নদেশে সুদীর্ঘকাল অবস্থানপ্রযুক্ত তা'দের শারীর যন্ত্র (Physiological machinery), বিশেষতঃ কয়েকটি সরন্ধ্র মাংস-গ্রন্থির (Glands), ও মানসিক যন্ত্রের (Psychological machineryর) উপর বিভিন্ন আবহাওয়া বা পারিপার্শ্বিক অবস্থার নির্ব্বাচন শক্তির (selective machinery of the environmentএর) ক্রিয়ার ফলে, তা'রা উপযোগী বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন ক'রে শ্বেত, পীত, কৃষ্ণ ও ধূসর (White, Yellow, Black, ও Brown) এই চারিটি মৌলিক বা প্রাথমিক জাতিতে (Primary racesএ) পরিণত হ'ল।

আবার মানসপটে দে'খলাম এই প্রাথমিক জাতিগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে বিভিন্ন দল স্ব স্ব শারীর যন্ত্র, মানসিক যন্ত্র ও আবেষ্টনের শক্তিতে প্রণোদিত হ'য়ে স্ব স্ব বাসস্থান মনোনীত ক'রল এবং বাসস্থান ভেদে কালক্রমে বিভিন্নপ্রকার বিশিষ্ট দৈহিক ও বৈজিক পরিবর্ত্তন হাঁসিল ক'রে আবার কয়েকটি উপজাতিতে বিভক্ত হ'ল, যেমন ইউরোপের শ্বেতাঙ্গ ককেসীয় জাতির তিনটি প্রধান উপজাতি (Sub-races) হ'লঃ—(১) উত্তর ইউরোপের Norwegian, British প্রভৃতি নর্ডিক (Nordic) জাতি, যারা হ'চ্ছে ভারতের নর্ডিক আর্য্য জাতির ঘনিষ্ট জ্ঞাতি; (২) মধ্য ইউরোপের সুইস (Swiss), ইতালীয় (Italian), আলবেনিয়ান প্রভৃতি আল্পাইন (Alpine) জাতি যারা হ'চ্ছে ভারতের বাঙ্গালী, গুজরাটি ও মাহরাট্টি প্রভৃতি জাতির জ্ঞাতি; এবং (৩) দক্ষিণ ইউরোপের স্পানিয়ার্ড (Spanish), গ্রীক প্রভৃতি মেডিটেরানিয়ান জাতি, যারা হ'চ্ছে দক্ষিণ ভারতের তেলুগু, মালায়ালি প্রভৃতি দ্রাবিড়ী জাতিদের জ্ঞাতি।

যখন দে'খলাম যে দুর্গম পর্ব্বতাদি ভেদ ক'রে দেশান্তর গমনকালে অনেক জাতিই অধিক-সংখ্যক স্ত্রীলোক সঙ্গে নিচ্ছে না কারণ তাহা কৃতসাধ্য নয়, আর দেশান্তরে উপবিষ্ট হয়ে অনেকেই স্থানীয় রমণীদের পাণিগ্রহণ ক'রছে তখন বুঝলাম যে বর্ত্তমানকালে অমিশ্র জাতি পৃথিবীতে বিরল। বুঝলাম যে কেবল মৌলিক জাতীয় উপাদান (radical racial element) লক্ষ্য ক'রেই "নর্ডিক আর্য্য" বা "ইন্দো-আল্পাইন" বা "দ্রাবিড়ী-মেডিটারনিয়ান" বা "প্রোটোঅষ্ট্রালয়েড" প্রভৃতি নাম আমাদের বর্ত্তমান জাতিদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়।

আবার দে'খলাম মূলজাতিদের মধ্যে এক একটি ক্ষুদ্র আদিম-সংঘ খাদ্য সংগ্রহের উপযোগী

সুনির্দ্দিষ্ট স্থান মনোনীত ক'রে অধিকার ক'রেছে। আর নৈসর্গিক আবেষ্টনের নির্ব্বাচন শক্তির দ্বারা তাঁদের দেহ মন ও কর্ম্মোদ্যম প্রভাবান্বিত হ'য়ে এক একটি বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত উপ-জাতি (tribe) গ'ড়ে তু'লেছে। আরও দে'খলাম যে দীর্ঘকাল সংযোগের (associationএর) ফলে ও অন্যান্য কারণে এই সব আদিম সংঘের প্রত্যেক ব্যক্তি জন্মভূমির প্রতি প্রগাঢ়ভাবে অনুরক্ত হ'য়ে প'ড়েছে; দে'খলাম যখন তা'দের মধ্যে কোন ব্যক্তি বা গোত্র জন্মভূমি হ'তে বিতাড়িত হয় বা অন্যত্র গমনে বাধ্য হয় তখন জন্মভূমিতে প্রত্যাগমন ক'রবার আকাঙ্খা ত'দের প্রবল হ'য়ে ওঠে; আর জন্মভূমি বিপদাপন্ন হ'লে তা'দের মধ্যে যে মানসিক প্রতিক্রিয়া জাগ্রত হয় তাহাই স্বজাতীয়তা বা স্বজাতি-প্রেম নামে আধুনিক সভ্যজগতে সমাদৃত হয়। যতক্ষণ এরা স্বদলের মধ্যে বাস করে ততক্ষণ এই স্বজাতি-চেতনা মগ্নচৈতন্যে থেকে যায়; কিন্তু স্বজাতির গণ্ডীর বাহিরে বা বিদেশে গেলেই তাদের জাতীয় সংস্কারের গভীর অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি স্বতঃই জেগে ওঠে, এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এত উগ্র বা প্রদীপ্ত হয় যে দমন করা তুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে। দেখলাম প্রত্যেকের স্বভাবের তুটো দিক,—একটি স্বজাতীয় বা স্বশ্রেণীর সম্বন্ধে একজাতিত্ববোধ ও প্রীতি, ও অপরটি বিজাতীয়দের প্রতি সন্দেহ মিশ্রিত বিরুদ্ধতা বা ঘৃণা। বু'ঝলাম এই হ'ল জাতীয়তার (nationalism এর) ও স্বদেশ প্রেমের (patriotism এর) জন্ম-রহস্য। বু'ঝলাম স্বজাতি-চেতনা ও স্বজাতি-প্রেম ক্রমোন্নতির প্রাকৃতিক নিয়মের অঙ্গস্বরূপ,—ক্রমবিকাশ সাধন-যন্ত্রের অংশবিশেষ।

তারপর দে'খলাম যতদিন মানুষ কৃষিকার্য্য উদ্ভাবন ক'রতে পারে নি ততদিন প্রকৃতির এই জাতি-গঠনের নিয়মের বশবর্ত্তী হ'য়ে তাকে চ'লতে হ'চ্ছে। আর দে'খলাম কৃষিকার্য্য উদ্ভাবনের পর বিভিন্নজাতি অর্থনৈতিক প্রয়োজনে যখন পরস্পরের সংস্পর্শে একত্রিত হ'চ্ছে ও অল্পবিস্তর সংমিশ্রিত হ'চ্ছে তখন প্রাকৃতিক জাতি-গঠন পদ্ধতির অন্তরায় উপস্থিত হ'ল; কিন্তু দেখলাম মানবের মানসিক গঠন এমনি যে মানুষ প্রকৃতির জাতিগঠনকারী নিয়মের বশে চ'লতে অভ্যস্ত; শ্রেণী ও জাতিগঠন প্রবৃত্তি মানবের প্রকৃতিগত; আর তা' কখন কখন মানবের বিচার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। যখন মানবের ক্রমবর্দ্ধমান সভ্যতা প্রকৃতির ক্রমবিকাশের প্রচেষ্টাকে আংশিকভাবে ব্যর্থ ক'রে দিতে লা'গলো তখন দে'খলাম আরম্ভ হ'ল কোথায়ও রাষ্ট্রাশ্রিত জাতি গঠন যেমন পাশ্চাত্যে; আর কোথায়ও ধর্ম্মাশ্রিত রাষ্ট্রগঠন যেমন প্রাচ্যে, বিশেষতঃ ভারতে। দে'খলাম বিভিন্ন পূর্ব্বতন জাতিদের সংমিশ্রণে গঠিত নবোদ্ভূত রাষ্ট্রীয় জাতিগুলি (nations) বিভেদসম্পন্ন অসম্পূর্ণ জাতি হ'লেও কালক্রমে biological racesএ পরিণত হ'তে চ'লেছে। মনে প্রশ্ন উ'ঠল যে নাৎসি জারমানি যেমন বর্ত্তমানে স্বীয় আর্য্যত্বের গৌরব পুনরুদ্ধারের অছিলায় নূতন জাত্যাভিমানে স্পর্দ্ধিত হ'য়ে প্রকৃতির পুরাতন নীতিতে সমরে প্রবৃত্ত হ'চ্ছে তাহাই শ্রেয়? না জাতীয় পৃথকত্ব একেবারে অবসান ক'রে সমগ্র মানবজাতিকে এক ভাষা-ভাষী এক জাতিতে—"A single race, a single tongue"এ পরিণত ক'রে জগতে চিরশান্তি স্থাপন প্রচেষ্টাই কর্ত্তব্য? ইংরেজ কবি টেনিসনের এই স্বপ্ন কি বাস্তবে পরিণত হওয়া সম্ভব?

তখন দৃষ্টি গেল ভারতের দিকে। মন খুঁজতে লা'গল আর্য্যঋষিরা এই প্রশ্নের কিরূপ সমাধান ক'রেছেন। মানসপটে প্রতিফলিত হ'ল ভারতের আধুনিক জাতিদের উদ্ভব, পরিণতি, ও গতিবিধির চিত্র।

(১) প্রথম অস্পষ্ট চিত্র-রেখা দে'খলাম প্রস্তর যুগে একটি কৃষ্ণকায়, খর্ব্বাকৃতি, অনুন্নতনাশা, উর্ণাসদৃশ কেশযুক্ত (woolly-haired) নিগ্রিটো জাতির এক বা একাধিক শাখা বন্যজাত ফলমূল ও মৃগয়ালব্ধ পশুমাংস ও মৎস্যাদি সংগ্রহ ক'রে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ ক'রছে। পরে তাহা বিলুপ্ত হ'য়ে গেল কয়েক সহস্র বর্ষপূর্ব্বে, কেবল দুই চারিটি গিরি-গাত্রে খোদিত মৃগয়াদির কয়েকটি গুহাচিত্র রেখে; আর সম্ভবতঃ ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের কাড়ার, উয়ালি প্রভৃতি এবং আসাম-বর্ম্মা সীমান্তের কোনিয়াক নাগা প্রভৃতি দুই চারিটি জাতির মধ্যে তাদের সামান্য শোনিত ধারা রেখে।

(২) তারপর চিত্রে, নব প্রস্তর যুগের শেষ ভাগেই দে'খতে পেলাম বর্ত্তমান অষ্ট্রিক ভাষা-ভাষী মুণ্ডা, হো, সাঁওতাল, ভীল প্রভৃতি (Proto-Australoid বা Pre-Dravidian) জাতিদের পূর্ব্বজেরা উত্তর-পশ্চিম দিক হতে আবির্ভাব হ'য়ে পূর্ব্বতন নেগ্রিটো জাতিদিগকে কতকাংশ নাশ ও কতক গ্রাস ক'রে ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে একাধিপত্য স্থাপন ক'রলো। এদের কোন কোন শাখা কৃষিবৃত্তি অবলম্বন ও স্থায়ী গ্রাম স্থাপন ক'রে গ্রামবাসীদের ও স্বজাতির পরস্পরের সহযোগিতায় ধীরে ধীরে প্রকৃতির উপর ক্রমিক আধিপত্য বিস্তার ক'রতে লা'গল এবং পারিবারিক ব্যবস্থা, সংঘবদ্ধ সমাজ সংগঠন, খাদ্য উৎপাদন, পশুপালন ও শ্রমসম্বন্ধীয় ব্যবস্থাপন, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক বিপত্তি-খণ্ডন-কল্পে আচার অনুষ্ঠান ও বিধি-নিষেধ প্রচলন, এবং নৃত্য-গীত-চিত্রকলাদির অনুশীলন, পিতৃপুরুষদের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে বলি প্রদান এবং প্রথমে স্ব স্ব জন্মস্থানীয় পাহাড়ের এবং পরে ফল-ফুল-প্রসূ ধরিত্রীর পূজাও ইহারা ভারতে প্রবর্ত্তন ক'রলো।

(৩) পরবর্ত্তী চিত্রে দে'লাম বর্ত্তমান তেলুগু, তামিল, মালায়ালি প্রভৃতি জাতিদের পূর্ব্বজ প্রত্নদ্রাবিড় (Proto-Dravidian বা Indo-Mediterranean) জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত হ'তে এদেশে উপস্থিত হ'ল। এদের কোন কোন দল জলপথেও আগমন ক'রল। উত্তর ভারতের অধিকাংশ নদী উপত্যকায় দ্রাবিড়-পূর্ব্ব মুণ্ডা ভীল প্রভৃতি জাতিদের অবিসংবাদী আধিপত্য দে'খে নবাগত প্রত্নদ্রাবিড় জাতির অধিকাংশ দল বিন্ধ্যাগিরি অতিক্রম ক'রে দক্ষিণ ভারতে প্রবেশ ক'রল ও ক্রমে তথায় নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার ক'রল। আর তথাকার অপেক্ষাকৃত হীনবল দ্রাবিড়-পূর্ব্ব অধিবাসীদের কতকাংশ আগন্তুকদের মধ্যে বিলীন হ'য়ে গেল; কতকাংশ আগন্তুকদের দাসত্ব বা অধীনতা স্বীকার ক'রল; আর যারা বশ্যতা স্বীকারে পরাঙ্মুখ হ'ল তারা পাহাড়জঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ ক'রে স্ব স্ব স্বাধীনতা রক্ষা ক'রল। প্রত্নদ্রাবিড়দের যে দলগুলি উত্তর ভারতে থেকে গেল, তা'দের প্রভাবে উত্তর-ভারতের সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হ'তে লা'গল।

দে'খলাম এই প্রত্নদ্রাবিড় ও তা'দের বংশধর দ্রাবিড়ী জাতি কৃত্রিম উপায়ে শস্যক্ষেত্রে জলসেচন দ্বারা যব ও গোধূম উৎপাদন, মৃৎপাত্র-নির্ম্মাণ, খনি হ'তে তাম্রাদি ধাতু নিস্কাশন ও তদ্দ্বারা তৈজসপত্র ও অস্ত্র-অলঙ্কারাদি গঠন, অর্ণবপোত গঠন ও চালন, প্রস্তর দ্বারা মৃতের সমাধি ও স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মাণ, নগর স্থাপন, মূর্ত্তি নির্ম্মাণ, ও মূর্ত্তি পূজা, লিঙ্গপূজা, ও জলদেবতা পূজা এবং সম্ভবতঃ সর্পপূজা ও দেবোদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান, প্রভৃতি প্রবর্ত্তন ক'রে ভারতকে সভ্যতায় সমুন্নত ক'রলো। আরও দে'খলাম স্ত্রী-প্রাধান্য ও জননীর কর্ত্তৃত্ব (matriarchy), বহুপতি গ্রহণ (polyandry) ও মাতৃকাপূজাও ইহাদের মধ্যেই প্রচলিত। মানসনেত্রে উদিত হ'ল ছোট-নাগপুরের ও আসামের কিম্বদন্তী-বিশ্রুত 'অসুর'দের কথা; আর সিন্ধু নদের উপত্যকার অধিষ্ঠিত "অসুর" বা "প্রত্নদ্রাবিড়" শাখাটির কথা, যারা স্থলপথ ও জলপথে বিভিন্নদেশে গমনাগমনের ও বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়ে তদানীন্তন সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরূঢ় হ'য়েছিল। কিন্তু মানসপটের চলচ্চিত্রে আবার দে'খলাম যে তাদের গগনচুম্বি সভ্যতার সৌধ তা'র নির্ম্মাতাদের নিয়ে ভূমিসাৎ হ'লো।

(৪) পরবর্ত্তী চিত্রে দে'খলাম শ্বেতাঙ্গ আল্পাইন জাতির একটি শাখা পামীর গিরিবর্ত্ম দিয়ে একাধিক দলে ভারতে আবির্ভূত হ'ল। তখন উত্তর ভারতের উর্ব্বর নদী উপত্যকাগুলিতে দ্রাবিড়-পূর্ব্ব ও কোন কোন স্থলে প্রত্ন-দ্রাবিড়দের আধিপত্য ছিল; আর দক্ষিণ ভারতে ছিল দ্রাবিড়দের অপ্রতিহত প্রভুত্ব। সুতরাং এই আল্পাইন আগন্তুকেরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম উপকূল হ'য়ে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা ক'রলো। কোন দল গুজরাটে, কোন দল মহারাষ্ট্রে, কোন দল কন্নাদে উপনিবিষ্ট হ'ল; অপর কোন কোন দল মধ্যপ্রদেশ অতিক্রম ক'রে বর্ত্তমান ছোটনাগপুরের ধলভূম পরগণা হ'য়ে তাম্রলিপ্তি বা বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলায় পৌঁছিল ও তথা হ'তে পূর্ব্বে বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ হয়ে বঙ্গোপসাগরের তটস্থল পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হ'ল; এবং উত্তরে ছোট নাগপুরের মানভূম জেলায় ও বাঙ্গলা প্রদেশের বর্ত্তমান বর্দ্ধমান বিভাগ ও রাজসাহী বিভাগ হয়ে হিমালয়ের দক্ষিণপাদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হ'ল। আর দে'খলাম এই ইন্দো-আল্পাইন জনপ্লাবনের কোন কোন উচ্ছলিত অংশ উত্তর-পশ্চিমে বর্ত্তমান ভাগলপুর, সাঁওতাল-পরগণা ও পুর্ণিয়া জেলায় এবং উত্তর-পূর্ব্বে কামরূপ বা আসামে ও দক্ষিণে বর্ত্তমান উড়িষ্যার কিয়দংশে উৎক্ষিপ্ত হ'ল ও বৃহত্তর বঙ্গ গ'ড়ে তুললো। আর বহুকাল যাবৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে এই প্রতিভান্বিত জাতি সভ্যতা ও প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র গ'ড়ে তু'লতে লা'গলো। দ্রাবিড়দের ন্যায় এরাও অর্ণবপোতাদি নির্ম্মাণ করে বাণিজ্য-ব্যাপদেশে দ্বীপময় ভারতে অভিযান ক'রত।

(৫) তারপর দেখলাম ধীরে ধীরে অলক্ষিতে কয়েকটি পীতাভ মঙ্গোলীয় ভোটচীন (Tibeto-Chinese) জাতি ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে হিমালয়ের দক্ষিণ পাদদেশে ও ব্রহ্মপুত্রের উপত্যকায় উপনিবিষ্ট হয়েছে। ভারত সভ্যতায় এদের কোনও উল্লেখযোগ্য দান দে'খতে পেলাম না।

(৬) পরবর্ত্তী চিত্রে উদ্ভাষিত হ'ল ন্যুনাধিক পঞ্চ সহস্রবর্ষ পূর্ব্বে আর্য্য ভাষা-ভাষী নর্ডিক জাতির একটি শাখা। দে'খলাম তা'রা ভারতের ভাগ্য-বিধাতা কর্ত্তৃক চালিত হ'য়ে উত্তরপশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম ক'রে ভারত রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হ'ল। আর ক্রমে এই প্রতিভাশালী, কল্পনাশীল আদর্শপ্রবণ, দূরদর্শী, উদারচেত-জাতিরা নেতৃত্বে দ্রাবিড়-পূর্ব্ব, দ্রাবিড় ও আল্পাইন সভ্যতার "টানা"র (warpএর) উপর আর্য্য সভ্যতার ও আর্য্য-আদর্শের "পড়েন" (woof) সংযোগে এক বিরাট মহান হিন্দুসভ্যতা ও হিন্দুসমাজ গড়ে উঠল।

মানসপটে মৌল জাতি ও উপজাতি (Biological races and subraces) গঠনের এই স্থূল চিত্র-রেখা দে'খে উপলব্ধি ক'রলাম যে মানবের শারীর-যন্ত্র, মানস-যন্ত্র, ও প্রাকৃতিক আবেষ্টন,—এই শক্তি-ত্রয়ই ছিল মানব-জাতির মৌলিক জাতি-বিভেদের (race-differentiationএর) এবং বিভিন্ন মূলজাতির বাসস্থান মনোয়নের প্রবর্ত্তক, আর মানবের স্বদেশ-প্রেমেরও মূলীভূত কারণ। আর বুঝলাম জৈবিক জীবন-সংগ্রামের ফলে উদ্ভূত এই মৌলিক জাতি-বিভেদই হ'ল মানবের ক্রমোন্নতির প্রথম সোপান।

তার পরবর্ত্তী সোপানের অনুসন্ধান-কল্পে মন আবার উপনীত হ'ল আধুনিক মানব-জাতির উদ্বর্ত্তনের সেই আদিম যুগে। দে'খলাম আপৎ-সঙ্কুল আদিম অরণ্যে বিভিন্ন বয়সের সমভাবাপন্ন পুরুষ-ও-রমণীর অসংখ্য দলগুলি তা'দের সন্তান সন্ততি নিয়ে আত্মসংরক্ষণ ও আত্মপ্রসারের স্বাভাবিক প্রণোদনে গোষ্ঠি-বদ্ধভাবে কোনগতিকে আবেষ্টনের সঙ্গে নিজেদের ব্যবহার ও কর্ম্মপদ্ধতির কাজ-চালানো সামঞ্জস্য (practical adjustment) সাধন ক'রে জীবিকা অর্জ্জন ও বংশ-বিস্তার ক'রছে, যদিও তখন পর্য্যন্ত নিয়মিত বিবাহ-প্রথা ও একনিষ্ঠ যৌনসম্বন্ধের নিদর্শন দৃষ্টি-গোচর হ'ল না! দে'খলাম কিছুকাল পরে তা'দের অনেক সংঘ জঙ্গল হ'তে বহির্গত হ'য়ে বনপ্রান্তে তৃণ-বহুল প্রান্তরে (grass-landsএ) এসে বাস ক'রতে লা'গলো এবং ফলমূল আহরণ ছাড়াও মৃগয়া দ্বারা খাদ্য সংগ্রহ ক'রতে প্রবৃত্ত হ'ল; ক্রমে প্রস্তরাস্ত্রের নির্ম্মাণ ও ব্যবহার ক'রতে লা'গলো; এবং পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময়ের উপযোগী ভাষা উদ্ভাবন ক'রলো: বজ্রাগ্নি বা দাবাগ্নি সংগ্রহ ক'রলো ও পরে নিজেরাই কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণের দ্বারা অগ্নি উৎপাদন ক'রতে শিখলো; ও ক্বচিৎ দৈবক্রমে দগ্ধ বা অর্দ্ধ দগ্ধ ফল মূল বা মাংসাদি আস্বাদন ক'রে যখন বুঝলো যে, যে সমস্ত দ্রব্য কাঁচা অবস্থায় অখাদ্য বা দুষ্পাচ্য তা'ও অগ্নি সংযোগে সুস্বাদু ও সুপাচ্য হয়, তখন ক্রমে রন্ধন-বিদ্যা আয়ত্ত ক'রতে লা'গলো।

আর দে'খলাম বন্য-ফল-মূল-আহরণকালীন আদিম স্ত্রীজাতিই বীজ হ'তে অঙ্কুরোদ্গম লক্ষ্য ক'রে প্রথমে হস্ত দ্বারা ও পরে সুচাগ্র কাষ্ঠ খণ্ড (pointed stick) দ্বারা বীজবপন ক'রে আদিম কৃষি কার্য্যের প্রবর্ত্তন ক'রলো; খাদ্য-সংগ্রহের অপেক্ষা খাদ্য-উৎপাদনের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি হওয়ায় খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি হ'ল; পণ্য বিনিময় (barter) ও পরে ক্রয়-বিক্রয় বাণিজ্যাদি প্রবর্ত্তিত হ'ল; প্রথমে সমষ্টি-গত ও পরে ব্যক্তিগত স্বত্ব-বোধের উদ্ভব হ'ল; আর ব্যক্তি-গত পারিবারিক

জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল, এবং নানাদিকে মানব-সভ্যতার বেগ সমধিক বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হ'তে লাগলো।

এইরূপে দে'খলাম এই উৎপাদন শক্তিকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন স্থায়ী সমাজ গ'ড়ে উ'ঠলো এবং উৎপাদন শক্তির উপর আধিপত্যের প্রকার ও পরিমাণ ভেদে একই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর উৎপত্তি হ'ল। আর মনে হ'ল এই এক একটি শ্রেণী হয়তো এক একটি অনদ্ভুত (potential) জাতি।

তখন অনুভব ক'রলাম বিভিন্ন শ্রেণীর প্রত্যেক মানুষেরই অবচেতন-মনের আছে দু'টি দিক,—একটি স্ব-শ্রেণীর বা দলের প্রতি মমত্ব-বোধ ও আকর্ষণ এবং অপরটি হ'ল অন্য শ্রেণীর উপর বিরুদ্ধতা ও বিরূপতা। মনে হ'ল এই শ্রেণী-বিরোধ সম্ভবতঃ বিশ্বের নিয়ম এবং মানবকে ক্রমোন্নতির পথে চালাবার অন্যতম যন্ত্র বা অঙ্কুশ-স্বরূপ; আর সম্ভবতঃ প্রাণীতত্ত্বের (biological) জাতি-বিভেদের ন্যায় মানবের অর্থনৈতিক শ্রেণী-বিভেদ, ও সামাজিক জাতি-বিভাগ এবং সাংস্কৃতিক বর্ণ-বিভাগ মানব সমাজের ক্রমোন্নতির উদ্দেশে বিভিন্ন পরীক্ষণ (experiment)। পাশ্চাত্যে দে'খলাম এক এক দেশে বিভিন্ন বৈজিক জাতি ও উপজাতি উপনিবিষ্ট হ'য়ে এক রাষ্ট্রে-যুক্ত হ'য়ে মৌলিক জাতিভেদ ভুলে রাষ্ট্রীয় জাতি (Nation) গড়ে তুলেছে।

তখন এই পরীক্ষণের (experimentএর) ফল ভারতবর্ষে ক্রমে কিরূপ দাঁড়িয়েছে তার ধারাবাহিক চিত্র মানসপটে প্রতিভাত হ'তে লাগালো।

প্রথমে দে'খলাম প্রত্নদ্রাবিড়দের ভারতে আগমনের কিছুকাল পরেই বিজিত দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতিদের সঙ্গে আগন্তুক প্রত্নদ্রাবিড়দের সংমিশ্রণে বহু বর্ণ-সঙ্কর উৎপন্ন হ'ল। দে'খলাম প্রথমে দ্রাবিড়-পূর্ব্ব সাঁওতাল-ভীল-মুণ্ডা প্রভৃতি জাতির অপর জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ-সম্পর্কে যুক্ত হওয়ার পক্ষে অপরিচিতের আপৎ-সঙ্কুল নিগূঢ় রহস্যময় শক্তি ("mana") সম্বন্ধে কুসংস্কারাত্মক ভীতি স্বেচ্ছাকৃত আন্তর্জ্জাতিক যৌন-সম্বন্ধের অন্তরায় হ'লেও, বিজেতাদের সম্বন্ধে এ বাধা অনেক স্থলে কার্য্যকরী হ'তে পা'রলো না; আর অমিশ্র প্রত্নদ্রাবিড়দের সঙ্গে এই প্রথম পর্য্যায়ের (degreeর) বর্ণ-সঙ্করদের বহুল যৌন-সম্বন্ধ সংঘটিত হওয়ায় নানা শ্রেণীর (degreeর) বর্ণ-সঙ্কর উৎপন্ন হ'ল; রক্ত-সংমিশ্রণের পরিমাণ অনুসারে গায়ের রংএর ও মুখাবয়ব ও আকৃতির প্রভেদ দেখা দিল।

তারপর দে'খলাম ক্রমে সভ্যতর বিজেতা দ্রাবিড়দের জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় অপেক্ষাকৃত অমিশ্র দাবিড় পরিবারগুলির বংশ-মর্য্যাদাবোধ জাগ্রত হ'ল, এবং তা'রা দ্রাবিড়-পূর্ব্বদের ও বিভিন্ন পর্য্যায়ের সঙ্কর-পরিবারদের সহিত অবাধ সংমিশ্রণ বর্জ্জন ক'রলো; আর তা'দের সঙ্গে ব্যবহারেও আভিজাত্যের অভিমান প্রকট ক'রলো। আর দে'খলাম এই জাত্যাভিমানী দ্রাবিড় পরিবারদের অনুকরণে বিভিন্ন আদিম দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতিদের মধ্যেও বিভিন্ন পর্য্যায়ের মিশ্র-জাতির পরস্পরের সংমিশ্রণের ক্রম বা পরিমাণ অনুসারে সামাজিক উচ্চ-নীচ-শ্রেণী-ভেদ সূচিত হ'তে লা'গলো—পরস্পরের প্রতি ব্যবহারের তারতম্যে ও আদান প্রদান ব্যপদেশে।

এইরূপ সাঙ্কর্য্যের পর্য্যায়ের বা পরিমাণের বিভিন্নতার ফলে বৈজিক জাতিগত (racial) বহুতর পার্থক্যের সৃষ্টি হওয়া ছাড়াও, দে'খলাম ক্রমবর্দ্ধমান সভ্যতার আনুষঙ্গিক বৃত্তিভেদে ও ব্যবসায়ভেদে আবার বহুতর সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগ উৎপন্ন হ'ল, আর সেগুলির মধ্যেও আভিজাত্যিক ভেদ-বোধ সংক্রামিত হ'লো ; ও কর্ম্মগত শ্রেণীবিভাগ অনেক স্থলে কালক্রমে বংশগত হ'য়ে প'ড়তে লা'গলো। এর ওপর এসে জু'টলো প্রতিবেশী আদিম দ্রাবিড়-পূর্ব্ব জাতিদের কল্পিত নিগূঢ় "মানা" শক্তির ধারণার ছোঁয়াচ, যে দুর্ব্বোধ্য শক্তির (occult psychic forceএর) ভয়ে বর্ত্তমান ওঁরাও খাড়িয়া প্রভৃতি আদিম জাতিরা অপরাপর জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ বর্জ্জন করে, বিশেষতঃ যৌন সম্পর্কে ও পানাহার সম্পর্কে। এদের সাহায্যে অমিশ্র দ্রাবিড়দের মধ্যে ও সংক্রামিত হ'ল ঐরূপ ধারণা—যার প্রভাবে আর্য্য-পূর্ব্ব-ভারতে বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক শ্রেণীর পরস্পরের মধ্যে ভেদজ্ঞান আরও বর্দ্ধিত হ'তে লা'গলো।

আরও দে'খলাম যখন দ্রাবিড়ীরা পুলিয়াঁ, উরুলা প্রভৃতি হীন প্রত্নদ্রাবিড় জাতি ও নিম্ন শ্রেণীর মিশ্র জাতিগুলির প্রতি তা'দের অশুচি ও নোংরা আচার ও রীতি নীতির জন্য ঘৃণা প্রদর্শন ক'রতে লা'গলো, দ্রাবিড়দের প্রদর্শিত এই অবজ্ঞা ও আত্মম্ভরিতার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া স্বরূপ অবজ্ঞাত ও লাঞ্ছিত দ্রাবিড়-পূর্ব্ব-জাতিদের মনে হীনতার-চেতনা (inferiority complex) ও তজ্জনিত ক্রোধ এবং বিদ্বেষের সঞ্চার হ'ল ; কিন্তু এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার বাহ্যপ্রকাশ নির্য্যাতন ও স্বার্থহানির ভয়ে ব্যাহত হওয়ায় বহুকাল যাবৎ গোপন প্রতিক্রিয়া (concealment reaction) চ'লতে লা'গলো ; গোপন আত্ম-রক্ষার যন্ত্র (defence mechanism) স্বরূপ অপ্রতিক্রিয় বশ্যতার (unresponsive submissive adjustmentএর) অন্তরালে বিজাতি-বিদ্বেষ ক্রমে বংশগত হ'য়ে দাঁড়াল। জাত্যভিমানী দ্রাবিড়দের শ্রেষ্ঠতা-বোধের (superiority complexএর) তীব্রতা 'অস্পৃশ্যতাবোধে' পরিণত হ'ল ; ও ক্রমে 'স্পর্শদোষ' হ'তে 'দর্শন-দোষের' সংস্কার উৎপন্ন হ'ল। এই জাত্যভিমানের চরম প্রকাশ দে'খলাম যখন কেরলদেশে জনসাধারণের ব্যবহার্য্য একটি প্রমোদকাননে (parkএ) কোন উচ্চ রাজবংশীয় ব্যক্তির প্রবেশের সাড়া পাওয়া মাত্র কতকগুলি 'অস্পৃশ্য' জাতীয় ব্যক্তি ঝোপের আড়ালে আত্ম-গোপন ক'রলো, নীচ-জাতি-দর্শন দোষে উচ্চ বংশীয়ের অশুচিত্ব উৎপাদনের ভয়ে। আর দে'খলাম কেরলের (Malabarএর) উচ্চ বংশীয়া রমণীরা পথে গমনাগমনকালে ছাতা দিয়ে মুখ আড়াল ক'রে চলে অশুচি-জাতির দিকে নেত্রপাত প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্য। অপরপক্ষে দে'খলাম অপরোক্ষ প্রতিক্রিয়া (indirect reaction) স্বরূপ দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়-পূর্ব্ব কোন কোন "অস্পৃশ্য" জাতিও তাদের গ্রামে বা পল্লীতে কোনও উচ্চ জাতির লোক প্রবেশ ক'রবামাত্র সম্মার্জ্জনী ও গোময় হস্তে ধাবিত হয় এবং তাহাকে বিতাড়িত ক'রে গোময়-জল চতুর্দ্দিকে লেপন বা প্রক্ষেপ ক'রে 'উচ্চ' জাতির স্পর্শদোষ দূরীভূত ক'রলো,—অবশ্য দ্রাবিড়-পূর্ব্ব-জাতির চিরাভ্যস্ত বিদেশীয়ের 'মানা'-জনিত আপৎ-নিবারণের ওজরে।

এইরূপে দে'খলাম, যে একত্র-সংশ্লিষ্ট কারণ পরম্পরার সমবায়ে আর্য্যপূর্ব ভারতে মৌলিক

জাতিগত (racial), ও বিশেষতঃ আর্থিক বৈষম্য-গত (economic), এবং সামাজিক আচার-ব্যবহার-গত ও সংস্কৃতিগত বিভিন্নতার ফলে ও বাসস্থান ভেদে, শ্রেণীগত বৈষম্যজনিত রেষারেষি ও দলাদলির ও বিরোধের প্রাদুর্ভাব হ'ল ও ক্রমে বর্দ্ধিত হ'তে লা'গলো।

আবার দে'খলাম বহুকাল পরে যখন প্রকৃতি-পূজক উদার-চেতা বেদবাহী আর্য্যজাতি সমগ্র ভারতের ভবিষ্যৎ দীক্ষাগুরুরূপে অবশেষে গঙ্গা-যমুনা-উপত্যকায় পৌঁছিলেন তখন তাঁরা আর্য্য-পূর্ব্ব জাতিদিগকে বিভিন্ন শ্রেণী, সমাজ, সংস্কৃতি, ও সম্প্রদায়ে বিযুক্ত, বিচ্ছিন্ন, ও বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত দে'খে, এই সঙ্কীর্ণতা ও ভেদ-প্রবণতার আতিশয্যে ব্যথিত হ'য়ে বিভিন্ন জাতি, শ্রেণী ও সমাজের মধ্যে নির্ব্বাচিত মিশ্রন ও সমন্বয় (selective fusion and synthesis) সাধনে তৎপর হ'লেন। বু'ঝলাম সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে অবস্থিত এই সব বিভিন্ন সংঘ ও শ্রেণীগুলির বৈশিষ্ট্য যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রে'খে সমগ্র ভারতবাসীকে একটি মৌলিক একত্বে পরিণত করা হ'ল আর্য্য ঋষিদের পরিকল্পিত সামাজিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্য। শু'নলাম পুরুষ-সূক্ত-দ্রষ্টা ঋষি নারায়ণ উদ্গীত বেদ-গাথায় গগন ধ্বনিত ক'রে ঘোষণা ক'রছেন যে "সহস্র-শীর্ষ সহস্রাক্ষ সহস্র-পাৎ বিশ্বরূপী বিরাট-পুরুষের আত্মাহুতি-প্রদত্ত যজ্ঞে মহামানবরূপী শ্রীভগবানের বিভিন্ন অংশ হ'তেই হয়েছে বিভিন্ন বর্ণের মানবের উৎপত্তি; অতএব হে মানব! পরস্পরের মধ্যে অযথা ভেদজ্ঞান রহিত কর।" দে'খলাম আদর্শ-প্রবণ ও সম্মিলন-প্রবণ, সমীকরণশীল আর্য্যঋষিরা যত্নবান হ'লেন প্রথমে আর্য্যবর্ত্তের এবং ক্রমে সমগ্র ভারতের সামাজিক দৃষ্টি-ভঙ্গি আধ্যাত্মিক আদর্শে অনুপ্রাণিত ক'রে অযথা স্বাতন্ত্র্যবোধ ও সঙ্কীর্ণতা দূরীভূত ক'রতে; এবং তদানীন্তন ভারত-সমাজের অসংখ্য বৃত্তিগত ও বংশগত শ্রেণী বিভাগকে মনস্তত্ত্বমূলক চাতুর্ব্বর্ণ্যের কাঠামোতে অনুপ্রবিষ্ট করাতে। তাঁরা বল্লেন যে দেহ-তত্ত্বাশ্রিত জাতি ও উপজাতি (biological races and sub-races), অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদ (economic classes), এবং রাষ্ট্রগত জাতি (nation)—এগুলির কোনটিই উপেক্ষনীয় নয়; কিন্তু ইহাদিগকে উচ্চতর মনস্তাত্বিক ও সাংস্কৃতিক গুণগত বর্ণ-বিভাগের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে পারলেই মানবের অন্তর্নিহিত উচ্চতম সম্ভাবনার (potentialityর)—মানবে দেবত্বের—স্ফুরণ ও পরিপোষণ হতে পারে: সাধারণতঃ, যে সামাজিক স্তরবিনিবেশ বৈশ্যশক্তির কিম্বা ক্ষাত্রশক্তির তারতম্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাও ব্রাহ্মণ্যশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেই মানব বিধিনির্দ্দিষ্ট তার উচ্চতম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারবে,—নচেৎ নয়। তাঁরা মানবের জাতিগত সংস্কার রীতিনীতি, প্রবৃত্তি উপযোগিতা ও ধীশক্তির (inherited traditions and aptitudesএর) প্রভাব একেবারে উপেক্ষা করেন নি; কিন্তু সমস্ত জাতি ও সমাজকেই একই মানব-সমাজের অন্তর্ভূক্ত পরস্পরের সহায়ক একত্র-সংলগ্ন শাখা-রূপে পরিগণিত ক'রলেন।

আরও দেখলাম যে বিভিন্ন দেশে ও কালে স্বতঃই সামাজিক শক্তির প্রভাবে এই প্রকার

চারিটি স্বাভাবিক মূল বর্ণ বা সাংস্কৃতিক শ্রেণী উদ্ভূত হয়েছে, যেমন প্রাচীন পারস্যে, রোমে, ও মিশরে।

আবার শুনলাম পরবর্ত্তীকালে সংহিতাকার ঘোষণা করলেন,—"যবন, শক, পারদ, চীনা, কাম্বোজ, দ্রাবিড়, ওড্র প্রভৃতি জাতিরা আদিতে ক্ষত্রিয় ছিল, কিন্তু পরে ক্ষত্রিয়জনোচিত্ কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা প্রযুক্ত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে।" (মনুসংহিতা, দশম অধ্যায়, ৪৩।৪৪ শ্লোক); মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে ও অহিন্দু "যবন, কিরাত, দরদ, চীন, শক, পহ্লব, এমনকি দ্রাবিড়-পূর্ব্ব শবর" প্রভৃতি জাতি সম্বন্ধেও ঐরূপ উক্ত হ'ল। আর "ব্রহ্ম-পুরাণ" রচয়িতা জ্ঞাপন করলেন যে—"সপ্তদ্বীপেই—অর্থাৎ পৃথিবী যে সাতটি ভূখণ্ডে বিভক্ত তাহাতে,—ঐ চারিটি 'বর্ণ' পরিব্যপ্ত হ'য়েছে"। এইরূপ আরও অনেক উক্তি শাস্ত্রকারদের মুখে শুনলাম।

দেখলাম বিশ্বামিত্র, অজামীঢ়, পুরামীঢ় প্রভৃতি প্রথিতকীর্ত্তি ক্ষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণবর্ণে উন্নীত হলেন; দাসীপুত্র সত্যকাম জবল সত্যনিষ্ঠা ও ব্রাহ্মণ্য গুণের প্রভাবে ব্রাহ্মণত্বে বৃত হলেন; দাসী ইলুষার পুত্র ঋষি কবশ ঋগ্বেদীয় সুক্ত রচনা করলেন। ধৃষ্ট নামক ক্ষত্রিয়কুল ব্রাহ্মনোচিত সদ্‌গুণের জন্য ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হল; দ্রাবিড়-পূর্ব্ব বহু সম্প্রদায় এই বর্ণ-ব্যবস্থায় উচ্চস্থান লাভ করলো।

এই ভাবে বহুকাল যাবৎ বর্ণ-ব্যবস্থা ও বৃত্তিগতশ্রেণী বিভাগের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে গতিশীলতা (mobility) ও স্থিতি-স্থাপকতা (flexibility) বর্ত্তমান থাকলো; গুণকর্ম্মানুযায়ী সদ্‌গুণসম্পন্ন গোষ্ঠির ও ব্যক্তি বিশেষের উচ্চবর্ণে উন্নয়ন ও সদ্‌গুণের ন্যূনতায় বা অভাবে নিম্নতর বর্ণে অবনয়ন চলতে লাগলো।

দেখলাম যতদিন পর্যান্ত হিন্দুসমাজ প্রাণবন্ত ও সজাগ ছিল, সতেজ সাবলীল গতিভঙ্গী ও বর্ণধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ অক্ষুন্ন রাখতে পারলো ততদিন সমাজে একটি অনুপম শৃঙ্খলা এ একতান বর্ত্তমান ছিল।

পরে দে'খলাম বৈদিক ঋষিদের পরবর্ত্তীযুগে আনুষ্ঠানিক বাহ্যাড়ম্বরের বৃদ্ধি হ'তে লা'গলো ও ধর্ম্ম ও সমাজ প্রাণ-হীন হ'য়ে প'ড়তে লা'গলো; চাতুর্ব্বণ্যের মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হ'তে লা'গল; হিন্দু সমাজে বর্ণ সাঙ্কর্য্যের ভ্রমাত্মক অর্থ প্রচলিত হ'ল; গুণ ও কর্ম্মকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ক'রলো, অর্থাৎ কর্ম্মে ব্যক্তি বিশেষের উপযোগিতার অভাব যে তাকে তবুও বংশানুক্রম অনুসারে সেই কর্ম্ম বা বৃত্তি অবলম্বন ক'রতে দিল; কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের দোহাই দিয়ে বংশগত জাতিভেদ সমর্থিত হ'তে আরম্ভ হ'ল। "পুরুষকারের" কথা বিস্মৃত হ'য়ে সকল আপদ "নিয়তির" স্কন্ধেই চাপানো হ'ল।

পরে দে'খলাম প্রতিক্রিয়া স্বরূপ খৃষ্ট-পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে জৈন ধর্ম্ম ও বিশেষতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হ'ল। এঁদের বিশ্বজনীন প্রেম ও ভ্রাতৃভাবের আদর্শে ভারতবাসীর হৃদয় ও মন আবার জাগ্রত ও উদ্দীপিত হ'ল। এমন কি দ্রাবিড়-পূর্ব্ব ও অপরাপর অবজ্ঞাত জাতিরাও বুঝলে যে তারাও মানুষ এবং সুযোগ পে'লে তারাও মানসিক ও আধ্যাত্মিক

উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠতে পারে। এই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ ক'রবার জন্য ভারত-সমাজে বিশেষ সাড়া পড়ে গেল

'অচ্যুত' ও নিম্নশ্রেণীর সহস্র সহস্র নরনারী এই নবধর্ম্ম গ্রহণ করলো ও অনেকে আশ্রম-জীবন (monastic life) যাপন করতে লাগলো। আর তাদের মধ্যে কেহ কেহ, যেমন ক্ষৌরকার উপালি ও ঝাড়ুদার সুনীত, স্ব স্ব চরিত্রের পবিত্রতার প্রভাবে ঋষিতুল্য সম্মান লাভ করলো।

আর দেখলাম বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে হিন্দুসমাজও অল্পবিস্তর উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলে বৈদিক মতের সারাংশ উপনিষদের বেদান্তবাদের রূপগ্রহণ করলো। আন্তর্জ্জাতিক বিবাহ এবং পানাহার ও বৃত্তি ব্যবসায় সম্বন্ধেও যথেষ্ট উদারতা আবার হিন্দুসমাজে দেখা গেল। দেখলাম কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ভারতে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুবর্ণ-যুগ চলিল।

আবার দেখলাম বুদ্ধদেবের তিরোধানের কয়েক শতাব্দী পরে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অবনতি আরম্ভ হ'ল; উহার সতেজ প্রাণশক্তি নষ্ট হ'য়ে গেল, হীনযান ও মহাযানের পরিবর্ত্তে অনেক স্থলে মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, সহজিয়া প্রভৃতি মতের আবির্ভাব ও প্রাদুর্ভাব হ'ল; এবং অবশেষে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে বিলুপ্ত-প্রায় হ'ল।

আর দেখলাম ইতিপূর্ব্বেই খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত আর একটি প্রাণবন্ত ধর্ম্মমতের আবির্ভাব হ'য়ে পুরুষসূক্তের আদর্শ আবার জাগরূক হ'ল; ইহার প্রবর্ত্তক শ্রীমং শঙ্করাচার্য্য হিন্দুধর্ম্মে বাহ্যাড়ম্বর ও সঙ্কীর্ণ জাতিভেদকে তীব্রভাবে আক্রমণ করলেন। তাঁর শিক্ষার প্রভাবে আবার কিছুদিন চাতুর্ব্বণ্যে আদর্শ সজীব ও সতেজ হ'ল; ধর্ম্মের নিগূঢ় সত্তার অনুভূতির জন্য অনেকে যত্নবান হ'লেন।

কিন্তু কিছুকাল পরেই, আবার দেখলাম, নৈষ্ঠিকতা ও আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের সূচনা হ'ল, ক্রমে বর্ণ-বিভাগগুলি কতকগুলি সঙ্কীর্ণ বদ্ধ-দলে পরিণত হ'ল। তখন কতকটা ইসলামের নব-রাজশক্তির প্রভাবে ও কতকটা ব্রাহ্মণের জাতিগত গোঁড়ামি ও কুসংস্কারজনিত অত্যাচারের ফলে দলে দলে শূদ্র ও আন্ত্যজেরা ইস্লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করল। বাহ্য-আনুষ্ঠানিক সূচিতার উপর অধিকাংশ ব্রাহ্মণের দৃষ্টি-ভঙ্গীর সংকীর্ণতা-বৃদ্ধি এবং আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থপর ক্ষমতাকাঙ্ক্ষার ফলে অস্পৃশ্যতার হীন ধারণার সৃষ্টি হ'ল। এর ফলে পরবর্ত্তী হিন্দুসমাজের কলঙ্ক-স্বরূপ কতকগুলি ঘৃণ্য নিষ্ঠুর রীতিনীতির প্রচলন হ'ল। হিন্দু সমাজের প্রাণ-শক্তি ক্ষীণ হ'তে ক্ষীণতর হ'য়ে পড়ল।

তখন দেখলাম স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ার ফলে ভারতের বিভিন্ন স্থানে রামানুজ, রামানন্দ, ও চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাত্মারা আবির্ভূত হ'য়ে আবার সার্ব্বজনীন সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রচার করলেন। গোঁড়া হিন্দুয়ানীর গণ্ডীর বহির্ভূত শূদ্রবংশজাতীয় কতিপয় ভক্ত-সাধক ও সংস্কারকের আবির্ভাব হ'ল। দাদু, নামদেব প্রভৃতি সংস্কারকগণ জাতিবিভাগ মানলেও তীব্র ভাষায় উহার কুফলগুলির নিন্দা করলেন। সংস্কারক ও সাধক-শ্রেষ্ঠ কবীর মুসলমান জোলহা ব'লে পরিচিত ছিলেন। নানক ও অন্যান্য শিখগুরুরাও সার্ব্বজনীন সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববাদ প্রচার করলেন।

আবার দেখলাম খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জাতিগত স্বাতন্ত্র্য-বোধ পুনরায় মাথা তুলে দাঁড়ালো এবং জাতিগত কঠোরতা ও সঙ্কীর্ণতা হিন্দুসমাজকে দ্বিগুণ তীব্রতার সহিত পীড়া দিতে লাগলো। ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা, এবং প্রাণহীন বাহ্যাড়ম্বরের প্রতি অধিকতর মনোযোগ হিন্দুসমাজে পুনরায় উদগ্র হ'য়ে উঠলো। শূদ্র ও 'পঞ্চম' সম্প্রদায়ের জীবনেতিহাসের গাঢ়তম দুর্দ্দিন দেখা দিল।

অনতিবিলম্বে দেখলাম বিধাতার বিধানে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে হিন্দুসমাজ তার পৌনঃপুনিক নির্জ্জীবতা ও জড়তা কাটিয়ে উঠলো। অর্দ্ধশতকের মধ্যেই নূতন পরিবর্ত্তনের পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে উঠলো। রাজা রামমোহন রায়, স্বামী দয়ানন্দ, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শ্রীমৎ রামকৃষ্ণ পরমহংস, স্বামী বিবেকানন্দ, কেশবচন্দ্র সেন, শ্রীঅরবিন্দ, মহাত্মা গান্ধী ও অন্যান্য শক্তিমান সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টার ফলে হিন্দু সমাজের দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত কতকগুলি সামাজিক আবর্জ্জনা, ত্রুটি ও কুসংস্কার ক্রমে অপনোদিত হচ্ছে দেখলাম। ক্রমে দেখলাম বর্ত্তমানে জাতিগত ও সম্প্রদায়গত পংক্তি-ভোজন ও বিবাহ-সম্বন্ধীয় কোন কোন বিধিনিয়মের সময়োপযোগী পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়েছে; আর উচ্চবর্ণগুলিও অনুন্নত শ্রেণীগুলির মধ্যে পরস্পর ঘৃণা-বিদ্বেষ-উৎপাদক বিভেদ-বুদ্ধি দূরীভূত করবার জন্য যে আন্দোলন চলেছে তাও দিন দিন তীব্র হয়ে উঠছে। অব্রাহ্মণদের পক্ষে বেদপাঠ ও যজ্ঞাদিতে অংশগ্রহণের যে বাধানিষেধ অতীতে ছিল তা বর্ত্তমানে লুপ্ত হচ্ছে; আজ জার্ম্মানদের নর্ডিক আর্য্যত্বের মহিমাকীর্ত্তনের মতন আধুনিক হিন্দুর পক্ষে ব্রাহ্মণ-ভক্তি একটা বদ্ধমূল সংস্কার হয়ে নেই।

শেষে দেখলাম বর্ত্তমানকালে শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে আদিম জাতিদের (Aborigines) ও অন্ত্যজ জাতিদের (Exterior-Casts) মধ্যেও কতকগুলি অপেক্ষাকৃত সৌভাগ্যবান ব্যক্তি পূর্ব্বতন চিরাভ্যস্থ গোপন প্রতিক্রিয়ার (concealment reactionএর) প্রশ্রয় দিতে পরাঙ্মুখ হয়ে প্রত্যেক আচরণ ও মনোভাবকে নূতন মানদণ্ডে (standard) ওজন করে নূতন মূল্য (new-values) দিতে শিখেছে, ও গোপন প্রতিক্রিয়াজনিত ক্রোধ, লজ্জা ও ঘৃণাকে স্বাস্থ্যবান প্রতিযোগিতার খাতে প্রবাহিত ক'রে সেগুলি স্ব স্ব সমাজের উন্নতির প্রচেষ্টার আকারে প্রকাশ করছে। এই দৃশ্যে আমার মন স্বতঃই উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

তখন শঙ্খ পূজা-সমাপ্তির ঘণ্টা ধ্বনিতে আমার জাগ্রত স্বপ্ন ভাঙ্গলো—আর উপলব্ধি করলাম যে বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য-গত সমস্যার সমাধান ও বিরোধ নিবারণ ক'রে জাত্যহঙ্কার, জাতি-বিদ্বেষ প্রভৃতি অসুরদল নিপাতের ও ভারতে ও জগতে সামাজিক শান্তি আনবার প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে শ্রেণীগত ও জাতিগত পূর্ব্ব-সংস্কার ও প্রবৃত্তিকে বিচারবুদ্ধি ও ধর্ম্মবুদ্ধি-রূপ সারথীদ্বয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত ক'রে প্রত্যেক সমাজের বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখে, একতান সাধনের যে মহান পরিকল্পনা বৈদিক ঋষিরা করেছিলেন তাহাই। আর ইহাই ক্রমোন্নতির বিজ্ঞান-সম্মত পন্থা।

তখন আশাবাণীরূপ কর্ণে ধ্বনিত হল ৺শ্যামাপূজার উপসংহার-স্বরূপ চণ্ডী-পাঠের উদ্গীত প্রার্থনা—

"দেবী ! প্রসীদ, পরিপালয় নোঽরিভীতে—
নিত্যং যথাসুরবধাদধুনৈব সদ্যঃ।
পাপানি সর্ব্বজগতাঞ্চ শমং নয়াশু
উৎপাত-পাপজনিতাংশ্চ মহোসর্গান্ ॥

বর্তমান ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্বন্ধ ও ইহার ঐতিহাসিক প্রেক্ষা *

বর্তমান ভারতে হিন্দু-মুসলিম সম্বন্ধ আলোচনা করিতে গেলে তাহার ঐতিহাসিক পৃষ্ঠ-পট অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্দ্ধের মাঝামাঝিই পাওয়া যায়। হিন্দু-মুসলিম সমস্যা এই শতাব্দীর পূর্বেও ছিল কিন্তু ইহার স্বভাব ও স্বরূপ সেই সময় সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। এই সমস্যার বর্তমান পরিণতির জন্য বৃটিশ-শক্তির সংহতি ও মুসলিম শাসনের অবসান সর্বাংশে দায়ী। মুসলিম রাজত্বের সময় হিন্দু-মুসলেম সম্বন্ধ শাসক শ্রেণীর উদার বা বৈরী ভাবাপন্নতার উপর নির্ভর করিত। মুসলিম শাসনের পতন ও বৃটিশ শক্তির অভ্যুত্থানে হিন্দু-মুসলিম সম্বন্ধে তৃতীয় পক্ষ প্রবেশলাভ করে। হিন্দু-মুসলিম সম্বন্ধ বহির্ভূত কিন্তু তদুপরি অল্পবিস্তর স্থিত-স্বার্থ তৃতীয় পক্ষের অবস্থান এবং ইহার সংঘাত-জাত শক্তিগুলিই বর্তমান সমস্যার মর্মকোষ। যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের হাতে রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা অথবা তাহা লাভের জন্য পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল অথবা পুনরায় রাষ্ট্র সংগঠনের আকাঙ্খা বিশেষ করিয়া মুসলমানদের মধ্যে নিঃশেষে অন্তর্হিত হয় নাই ততদিন পর্যন্ত এই সমস্যার ও উদ্ভব হয় নাই। ইহা সে সময়ই সম্ভব হয় যখন হিন্দু-মুসলমান আপনাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ও তৃতীয় শক্তির প্রভুত্ব অম্লান বদনে স্বীকার করিয়া লয়। ইহা হইতেই প্রতীয়মান হইবে যে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা একই সময়ে ভারতে সর্বত্র উপস্থিত হয় নাই। বৃটিশ প্রভুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে ইহার প্রভাব ও দূর-বিস্তৃত হয়। বৃটিশ-প্রভাব-বিমুক্ত ভারতের অবশিষ্টাংশে হিন্দু-মুসলিম সম্বন্ধ অতীতের ন্যায়ই বিদ্যমান ছিল। আজকালও মুসলমান শাসকাধীন দেশীয় রাজ্যে হিন্দু-মুসলিম সম্বন্ধ বৃটিশ-ভারতের অনুরূপ নয়। বৃটিশ ভারত যতদূর সম্পর্কিত তাহাতে সিপাহী বিদ্রোহ দমন একটি বিশেষ ঘটনা। ইহা মুসলিম শক্তির পুনরুত্থানের স্বপ্ন চিরতরে বিনষ্ট করিয়া দেয় এবং মুসলমানদের হিন্দু-বৃটিশ সম্বন্ধের অন্তর্ভূত করে।

এই উপলক্ষে আরেকটি বিষয় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। যদিও হিন্দু-মুসলিম সমস্যা উদ্ভবের প্রথম সোপান মুসলমানদের রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা বিলোপ, তবুও ইহা উক্ত শক্তির অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই উপস্থিত হয় নাই। বাঙ্গলা দেশে মুসলিম প্রাধান্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অবসান হয়; কিন্তু হিন্দু-মুসলিম সমস্যা একশ বা ততোধিক বৎসর পরে উদ্ভব হয়। ইহার কারণ খুঁজিতে খুব বেশী দূর যাইতে হয় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে বর্তমান হিন্দু মুসলিম সমস্যা দুইটী অবস্থার উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির অবসান, দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই বৃটিশ প্রাধান্য স্বীকার করতঃ তদনুসারে আপনাদের সমাজ জীবন সংগঠন। ইহা ইতিহাসেই পাওয়া যায় যে হিন্দু ও মুসলমানগণ একই সময়ে বৃটিশ প্রভুত্ব স্বীকার করে নাই। সদ্য ক্ষমতা বিলোপে মুসলমানগণ সহজে বৃটিশ শাসনে নৈতিক আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই। গত শতাব্দীর সপ্তদশ ভাগের সমর বিভাগীয় কোন রিপোর্টে যুক্তপ্রদেশের তদানীন্তন মুসলমানদের মনোভাব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে 'নিষ্ক্রিয় অসন্তোষে' পরিপূর্ণ। ভারতীয় মুসলমানদের এরূপ অবস্থা প্রায় সর্বত্রই ছিল যদিও তাহাদের হৃত গৌরব উদ্ধারের কোন সম্ভাবনা ছিল না। বৃটিশের নিকট পরাজয় ইহাদের কিছুদিন বিমূঢ় ও নিষ্ক্রিয় করিয়া রাখে। উত্তরাধিকারী সূত্রে কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের আকাঙ্খা বর্জিত ও অতীতের মোহমুক্ত থাকায় তদানীন্তন বাঙ্গালী ও অন্যান্য প্রদেশের হিন্দু শিক্ষিত সম্প্রদায় নূতন শাসকদের মধ্যে অভিযোজিত হইল। কিন্তু মুসলমানগণ তখনও তাহাদের অতীত গৌরব ভুলিতে না পারায় এবং পরাজয় জনিত অবসাদ ও গ্লানির ফলে তখনও অনেক আত্ম-সন্ধান ও আত্ম-অবলোকন করিতে থাকে। মুসলমানদের রাষ্ট্রিয় ক্ষমতার বিলোপ ও ভারতীয় রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাহাদের আবির্ভাব পর্যন্ত যে মধ্যবর্তীযুগ তাহা নিষ্ক্রিয়তার যুগই বলা যায়। অবশেষে মুসলমানদের আত্মচেতনা সুরু হইলে গত যুগের ক্ষতিপূরণে তাহারা ব্যস্ত হইয়া ওঠে। হিন্দুরা এই সময়ের মধ্যে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। কাজেই মুসলমানদের কিছুদিন অয়োজন ও শিক্ষানবিশিতে কাটাইতে হয়। মুসলমানদের এই বিবর্তন যুগে হিন্দু-মুসলিম সমস্যা আরো সম্ভাব্যতা পুর্ণ হয়।

অভিন্ন অতীত (Common Heritage)

অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধে যে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধ ছিল তাহারই বিকাশ ও পরিণতি লাভ করিয়াছে বর্তমান সমস্যায়। প্রাথমিক অবস্থার আজও অনেক ভাবোচ্ছাস দেখা যায়। বর্তমান ভারতীয় মুসলমানদের বিশেষত্ব যে তাহাদের বিজাতীয়, বিশেষতঃ, হিন্দু আদর্শ ও প্রভাবের উপর একটা ব্যাক্তিগত বিরাগ জন্মিয়াছে। ফলে জনপ্রিয় ব্যাখ্যা দ্বারা ইসলামকে একান্তই ইসলাম রাখার জন্য অনেকের আগ্রহাতিশয্য দেখা দিয়াছে। যাহারা হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনের চেষ্টা করেন সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচারে তাহাদের নিরস্ত করা হয়। তাহাদের এই উদ্দেশ্যের জন্য ভারতীয় হিন্দুমুসলমানের অভিন্ন অতীত, জাতিগত সাদৃশ্য, ভাষাগত ঐক্য, সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, পারস্পরিক প্রভাবজাত সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ও ধর্মের কথা উল্লেখ

করা হয়। তাহারা বিশ্বাস করেন যে এই সার্বভৌমিক আদর্শের উপরই শুধু হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্ভপর হইবে।

ইহা স্বীকার করা ন্যায়সঙ্গত যে ভারতীয় ঐতিহ্য দুই সম্প্রদায়ের প্রচেষ্টার ফল। কার্যতঃ, দেখিতে গেলেও ইহার অভ্রান্ততা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখিলে মনে হয় এক ঐতিহ্যই স্থাপনের প্রচেষ্টা ও তার প্রভাব বেশী দূর যায় নাই। ১৯ শতক শেষ হওয়ার পূর্বে হিন্দু-মুসলমানগণ সাতশত বৎসরের অধিক এক সঙ্গে বসবাস করিয়া আসিয়াছে। অধিকাংশ ভারতীয় মুসলমানই এই দেশের আদিম অধিবাসী। খাঁটি বিদেশাগতগণের বৃহত্তর ইসলাম ও আদিভূমির আকর্ষণ স্বীকার করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের ভারতীয় বলা যায়। এই অবস্থায় হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে কতকগুলি রীতিনীতি প্রচলিত হইবে আশা করা যায়। ইহার মধ্যে বিশেষ আশ্চর্যের বিষয় এই যে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সাংস্কৃতিক ভিত্তি কখনই সুদৃঢ় হয় নাই, কারণ যে সামান্য আঘাতে ইহা বিনষ্ট হইয়াছে তাহাতে স্বতঃই মনে হয় যে ইহাতে অন্তর্নিহিত কোন ত্রুটি ছিল।

প্রথমেই বলা যায় সাংস্কৃতিক ভিত্তি পরস্পরের সংমিশ্রনে উদ্ভব হয় নাই। আপাতদৃষ্টিতে দেখিলেও মনে হইবে যে সমাজে শাসক, মধ্য ও নিম্ন শ্রেণীর ন্যায় সভ্যতায়ও উপর্যুপরি তিনটি স্তরের সমাবেশ আছে।

এই তিনটি স্তরের ভিতর ও বাহির পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহারা পরস্পর হইতে বিভিন্ন। তাহারা এক বা সমজাতিক পারিপার্শ্বিক হইতে উদ্ভূত হয় নাই অথবা তাহাদের একই পর্যায়ে ফেলা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, তাহারা অল্পবিস্তর অস্থায়ী। স্তরগুলি ভিন্ন ভাবে আলোচনা করিলে এই উক্তির যথার্থতা সহজেই প্রমাণিত হইবে।

মুসলমান রাজদরবারে যে সভ্যতার উদ্ভব হয় তাহাতে হিন্দু ও ইসলাম প্রভাবের সংমিশ্রণ দেখা যায় এবং ইহা সাংস্কৃতিক ভিত্তির প্রথম স্তর হইলেও অত্যন্ত অস্থিত; কারণ ইহা একান্ত ব্যক্তি-নির্ভর। আকবরের ন্যায় উদার সমদর্শীর নিকট ইহার বিকাশ পথ মুক্ত কিন্তু ঔরঙ্গজিবের মত কাহারও আবির্ভাবে ইহার তিরোধান অনিবার্য। মুসলিম রাজত্বের প্রায় সব সময়ই দেখা যায় অল্পসংখ্যক ধর্ম্মপ্রচারক ও উলেমাগণ ঐসলামিক নিষ্ঠার প্রতি অতিরিক্ত ঝোঁক দিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

* 'Current Thought' এর October & December সংখ্যায় শ্রীনীরদ চৌধুরীর "Hindu Muslim relations in India" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে অনূদিত।

অকাল-বোধন

দেবাদি শর্ম্মা

অবাধ আকাশে স্বেচ্ছাচারের ঘূর্ণীহাওয়া
উধাও ছুটাও হে বৈশাখী স্বেচ্ছাচারী
অলস আকাশে উপপ্লবের ঘূর্ণীপাখা
উড়াও উড়াও
উধাও উড়াও ঝড়-সোয়ারী হে বৈশাখী

•

স্বপ্ন ভাঙো
মূর্চ্ছাহত এই পৃথিবীর স্বপ্ন ভাঙো
সবুজ সুরার আত্মরতির চৈতীঋতু
অলসবিলাসী কর্ম্মভীরুর
স্বপ্ন ভাঙো হে বৈশাখী মূর্চ্ছাত্রাণ

অগ্নি জ্বালো
অলসমনের আবেশ-বনে
ফুলের বাসরে অগ্নি জ্বালো—
জ্বালাও শোভার সবুজ পাতা
নরম প্রাণের অজস্রতা
মৌতাতী ক্লীব সবুজ পাতা
জ্বালিয়ে দাও—হে বৈশাখী জ্যোতিষ্মান

আকাশের বুকে আঘাত হানো
বন্যা আনো

ঝড়ের বন্যা—মেঘের বন্যা
কালো মেঘ ভরা কুলীশ বন্যা
বুকের আকাশে অবাধ ঢালো
বন্যা আনো—হে বৈশাখী

মনের আকাশে উধাও উড়াও ঝড়ের পাখা
ঘুরাও ঘুরাও মেঘের চাকা
ঘুরাও তোমার বিদ্যুৎ তরোয়ার———
হে বৈশাখী———ঝড়ের নিশান উড়িয়ে দাও
বল্গাবিহীন রথ চালাও
—শঙ্কাহীন
চাকায় চাকায় মেঘ উড়াও
পৃথিবীর গায় ঝড় দোলাও

ননীর পুতুল মনের মাটির আল্লাভিং
ধ্বংস করো—
নতুন গড়ো—
শক্ত করো—
হে বৈশাখী শক্তিমান————

———

ধূমায়িত

মন্মথকুমার চৌধুরী

পাড়ায় পাড়ায়, বাড়ীতে বাড়ীতে, রাস্তার মোড়ে, চায়ের ষ্টলে অস্ফুট, অর্থহীন, অলস কল্পনার গুঞ্জন। কখন কী হ'বে, ঠিক করে কেউ বলতে পারে না। সবাই সন্ত্রস্ত ভয়াতুর। সারা সহরের বুকে অনিশ্চিত দুর্য্যোগের কালোছায়া।

সহরে জোর গুজব—যে কোন মুহূর্ত্তে ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটতে পারে। সব নির্ভর করে গবর্ণমেন্টের নির্ভীকতা এবং কোম্পানীর বিচক্ষণতার পর। সন্ধ্যার পর লোক চলাচল প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। দু'দিন থেকে মণি-অর্ডার বিলি বন্ধ। ছেলেমেয়েরা স্কুল কামাই করে ঘরে বসে আছে। সন্ত্রাস মুভ্‌মেন্টের পর এই ধরণের আতঙ্ক সৃষ্টি এই সহরে কখনো হয় নি। সবারই চোখে সেই জিজ্ঞাসু দৃষ্টি—"ডিরেক্টর বোর্ডের ফাইনাল্ ডিসিশন বেরুল ?"

সবাই ভাসা ভাসা জবাব দেয়। সঠিক খবর কেউ জানে না।

বুড়োরা জট্‌লা করে হোমিওপ্যাথ ডাক্তারের বৈঠকখানায় অথবা বেকার উকীলের বাড়ীতে।

বলে—"হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা দেখলুম, স্বদেশীওয়ালাদের খুনখারাপী দেখতে বেঁচে রইলেম, কিন্তু এমনটি হবে, ভাবতে পারিনি বিভূতি।"

প্রৌঢ় ডাক্তার অথবা ছোকরা উকীলের ভয়-বিবর্ণ ঠোঁটে ক্লিষ্ট হাসির রেখা ফুটে উঠলো—"বেঁচে থাকলে আরও আরও অনেক কিছু দেখতে হবে বৈ কি শশিকাকা।"

আগামী বিপদটা কল্পনা করতেও তাদের বুকটা কাঁপে। কখন কি যে হ'বে, কেউ বলতে পারে না। গলিতে ঘুঁপিতে ছুরি মারার দু'একটা উড়ো খবর সহরবাসীদের মৃত্যু-জল্পনা তীব্রতর করে দেয়।

......খুব সকালে, প্রায় অন্ধকার থাকতেই নলিন গ্যারাজে এসে হাজির হয়েচে। তার আশঙ্কা ছিল, পিকেটারদের ফাঁকি দিয়ে পালাবে। এত সকালে পিকেট করবার কারই বা এত গরজ পড়েচে।

ম্যানেজারের স্ত্রীর কিন্তু ভুলচুক নেই। ষ্ট্রাইক্ সুরু হওয়ার পর থেকেই তিনি নোতুন লোকগুলোর উপর ভারী দয়ালু হয়ে উঠেচেন। আগে ন'টায় তা'র ঘুম ভাঙতো কিনা সন্দেহ, এখন কিন্তু সবার আগে এসে তিনি গাড়ী বেরুবার অপেক্ষা করেন।

ম্যানেজারের স্ত্রীর পরিবর্ত্তন ধর্ম্মঘটের চেয়ে কিছুমাত্র আকস্মিক নয়। তা'র ঘন গম্ভীর মুখে এসেচে হাসির অবিশ্রান্ত জোয়ার। নলিন ভাবে—"এদের আমলে নির্বোধ ড্রাইভারগুলো ষ্টাইক্ করলে কোন আক্কেলে ?"

মোলায়েম সুরে ম্যানেজার গিন্নী বলেন—"চট্‌পট্ গাড়ীটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ো নলিন। পিকেটাররা দেখলে আবার গোল বাধাবে।"

নলিন চাবিটা নিয়ে গ্যারেজের দিকে এগিয়ে গেলো। শুধু পেছন ফিরে ম্যানেজারের স্ত্রীর জরীর, দামী গাউনটার দিকে তাকালে। মুহূর্ত্তে ছায়ার কথা তা'র মনে পড়লো। এই দুরন্ত শীতে মেয়েটা হস্‌পিটেলের কাম্‌রায় হয়তো কাঁপচে।

ম্যানেজারের স্ত্রীর পশুর লোমের দামী অলেস্‌টার না হোক্, কমদরের একটা ফ্লানেলের ব্লাউজও সে কিনে দিতে পারলে না। ছেলে দুটো ক্ষিধের জ্বালায় হয়তো নিস্তেজ, নিষ্প্রভ হয়ে আস্‌চে।

নলিনের রক্তে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠে। আভিজাত্যের ঠাঁট বজায় রাখবার জন্যে অনর্থক, অনাবশ্যক ওদের অর্থের অপচয়। অথচ তা'র ছেলে আর বউ এক টুকরো রুটির অভাবে ন্যাড়া কুকুরের মতো দুয়ারে দুয়ারে মরচে,...কিন্তু এসব বলে ওদের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা বৃথা।

ম্যানেজারের স্ত্রী তার দেরী দেখে এদিকে এগিয়ে আস্‌চেন। পিকেটাররাও জড় হতে সুরু করেচে। চাকরী করে বলেই হতভাগ্য লোকগুলার বুকের ওপর দিয়ে মটর চালিয়ে নেবে সে কোন মুখে? বউকে যদি তা'র হস্‌পিটেলে না পাঠাতে হ'তো, তাইলে কর্ম্মচ্যুত ড্রাইভারদের স্থান সে কী জুড়ে বসতো? ওরা বিশ্বাসঘাতক, দেশদ্রোহী বলে তাকে গালাগাল দিচ্ছে, কিন্তু ওরা যদি জানতো প্রসব বেদনায় তা'র স্ত্রী চ্যারিটেবল্ ডিস্‌পেন্‌সারিতে, রোজগার না করলে ছেলে দুটো ঠাঁই উপোস করে মরবে,...থাক ওসব ঘরোয়া কথা সবাইকে জানিয়ে লাভ কী?

নলিনের বরাত ভালো। পিকেটাররা তক্ষুণি গ্যারেজের সাম্‌নে না এসে অদূরে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করছিল। তারা হয়তো ভেবেছিল—এতো সকালে কেই বা গাড়ী নিয়ে ভাড়ায় বেরুবে।

শুধু সেই সুযোগে, ঈশ্বরকে প্রণাম জানিয়ে, নলিন ভোঁ করে গাড়ী নিয়ে ছুটে পালালে। কর্পোরেশনের স্পীড্-লিমিট্ গোল্লায় যাক্। সে যে পিকেটারদের চোখ এড়িয়ে খোলারাস্তায় আস্‌তে পেরেচে, তা' শুধু কপাল জোরে।

সকাল ছ'টা হবে। এই সকালে কেউ ভাড়াটে গাড়ী ডাকবে নাকি? নলিন তা' জানে। তবু বেলা হ'বার আগেই ছুটে পালাতে হয়। অল্পের জন্যে পিকেটারদের হাত থেকে খুব বেঁচে গেচে নলিন।

কুয়াশার অস্পষ্ট, ধূসর বন্যা নেমে এসেচে নিঝুমপুরীর ঘুমন্ত অট্টালিকার 'পর।

নলিনের মনে নিশ্চল, নির্জ্জন অট্টালিকার রহস্য জাগিয়ে তোলে বিলাসিতার মোহ। সত্যি নলিন কল্পনা করে, স্তূপ হয়ে যারা উত্তাপঘেরা অজস্র, অফুরন্ত আরামে, স্বাচ্ছন্দ্যে দুর্দান্ত শীতের সকালবেলাটা ঘুমোতে পারে, অথবা লেপের তলা থেকে অর্দ্ধনিমীলিত চক্ষু দিয়ে স্ক্রীনের ফাঁকে নাঁওড়ে পড়া সোনালী রোদের কচি হাতছানি নিয়ে মনে মনে স্বপ্ন বোনে, তা'রা কত সুখী!

কিন্তু পরমুহূর্তে নলিনের নেশা কাটে। সে সামান্য ঠিকে গাড়োয়ান বৈ ত নয়।...

...মেয়েটির সরু গলার আহ্বানে চমক ভাঙলো নলিনের।

—"কী ভাব্‌চ? ভাড়াতে যাবে না? আমার যে বড্ড তাড়াতাড়ি।"

নলিন সজোরে ষ্টীয়ারিং হুইলটা চেপে ধরলো। গোল্লায় যাক্‌ কর্পোরেশনের স্পীড্‌-লিমিট।

ফুরফুরে হাওয়ায় মেয়েটির রেশমী চুল অবিন্যস্ত করে দিলে। সে চুলের ফাঁকে ক্ষণিকের জন্যে নলিন দেখলে—হয়ত স্বপ্ন দেখ্‌লে—মেয়েটির তনু ঘিরে স্বপ্নের ইন্দ্রজাল।

—"তুমি খুব এক্‌স্‌পার্ট ড্রাইভার, না? নইলে এতো স্পীডে কেউ সহরের রাস্তায় গাড়ী চালাতে সাহস করে। ঠিক সময়ে পৌঁছে দিতে পারলে পুরো তিনটাকাই দোব।"

কৃতজ্ঞতায়, বিস্ময়ে নলিনের কথা ফুটে না।

মেয়েটি আবার বলে—'ট্যাক্সি ষ্ট্রাইকের খবর রাখো?'

নলিন কুন্ঠিত, মুমূর্ষু গলায় বলে—ধর্মঘট এখন চলছে।'

মেয়েটি উৎসাহিত হয়ে উঠলো—"ঠিক্‌ সময়ে বাস্‌ না পাওয়ায় আমাদের একটু অসুবিধে হচ্ছে বৈ কি। তবু তোমরা যদি মালীকদের সায়েস্তা করতে পার, তবে আমরা সুখী হই। ওরা হচ্ছে রক্তচোষী সাপ। শুধু কাজ, কাজ—এ ছাড়া কিছু বুঝতে চায় না। এই ধরনা আমার কথা। সেলুলয়েড্‌ ওয়ার্কে কাজ করি। বেতন যা দেয়, তা'ত লজ্জায় উচ্চারণ করিনে।

কিন্তু পান থেকে চুন খসলেই ম্যানেজারের হম্বি তম্বি দেখে কে! বেটা যেন লাট।"

মেয়েটি নিজকে আন্তরিক করে আনলে—"সবারই জীবনে উপসর্গ আছে, কি বলো?" মেয়েটি রক্তিম হয়ে উঠলো।

—'সেকেণ্ড শো' সিনেমাতেও নিয়ে গেলো। তাই সময়ে ঘুম থেকে উঠতে পারি নি।"

...গাড়ী থামলো। টাকাগুলো হাতে গুঁজে দিয়ে মেয়েটি শুভেচ্ছা জানালো—পিকেটাররা শক্ত থাক্‌লে, মালীকরা নুয়ে পড়তে বাধ্য।

নলিন একটি ধন্যবাদের কথাও উচ্চারণ করতে পারলে না। এইটুকু রাস্তার জন্যে সত্যি সত্যিই মেয়েটি তিনটাকা দিয়ে দিলে।

* * *

নলিন বেপরোয়া ভাবে গাড়ী ছুটিয়েচে। পিকেটাররা দেখতে পেলে আর রক্ষে নেই। আজ তা'র কপাল ভালো। চট্‌ করে ভাড়াটে জুটে যাচ্ছে।

...নোতুন বিয়ে হয়েচে বোধ হয়। নলিন বক্র দৃষ্টিতে পেছনের সীটে তাকালে।

দু'জন জড়াজড়ি করে বসেচে।

পুরুষ বলে—"ট্রেন ধরবার আগে রাস্তায় এ্যাক্‌সিডেন্ট না হয়।"

মেয়েটি আরও ঘনতর হয়ে আসে—"তোমার যতসব অলক্ষুণে কল্পনা। পীচ্‌মোড়া রাস্তায় আবার য়্যাক্‌সিডেন্ট হ'তে যাবে কেন!"

পুরুষ হাসে।

বলে—ছেলের কী নাম রাখ্‌বে ঠিক করলে। লজ্জায় মেয়েটি রাঙা হয়ে উঠে।

—তোমাকে নিয়ে আর পারিনে বাপু। রাস্তায়, ঘাটে, বাসে কী সব ছেলেমানুষী। ছেলে কী মেয়ে হবে তা'র নেই ঠিক।

—তোমার কি আন্দাজ হয়। ছেলে না মেয়ে।

কৃত্রিম রোষে মেয়েটি ঝাপ্‌টা দেয়—'জানিনে।'

ধরো যদি ছেলে হয়!...

নলিন পেছনে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকাবার লোভ সাম্‌লাতে পারলে না। তার চোখে ভেসে উঠলো ছায়ার রোগ-জীর্ণ, নীরক্ত চেহারা। ছেলে হ'বে বলে এদের কত জল্পনা, অভ্যর্থনার কতো বিচিত্র আয়োজন।

তাদের জীবনে কিন্তু উৎসব নেই, সমারোহ নেই; সন্তান প্রসবটা স্থূল দেহকামনার অনিবার্য্য পরিণতি। নলিন সাধারণ সোফেয়ার মাত্র। তার পক্ষে স্বপ্ন দেখা মূঢ়তা। তবু এমন সুন্দর, স্নিগ্ধ প্রভাতে নলিন কী নিজকে বিস্তীর্ণ করে দিতে চায়?

* * * তক্ষুণি আর একজন ভাড়াটে পাওয়া গেল।

......স্কোয়ারের মোড়ে এসে থামতে হ'লো নলিনকে।

একজন মানা করলে—ওদিকের খবর রাখো? গাড়ীগুলো সব ভেঙে চূরমার করে দিচ্ছে। পেট্রোলের ডিপোতে আগুন ধরিয়ে দিয়েচে। আস্ত রাখবে নাকি ওদিকে পা মাড়ালে! ওরা আজ ভীষণ ক্ষেপেচে।"

এমন সময় উত্তেজিত জনতার কোলাহল শুনা গেলো। পথচারীরা প্রাণভয়ে পালালে। শুধু রইলে নলিন।

পিকেটারদের মধ্যে থেকে কে চেঁচিয়ে বল্লে—শালাকে মেরে গুঁড়ো করে দোব। আর একজন বল্‌লে—"ওকে বেঁধে ফেল নীরু। জ্যান্ত পুড়িয়ে দোব।"

দলের সর্দার কিন্তু এগিয়ে এলো। নলিনের অবস্থা সে জানতো। কানে কানে এসে শুধু বলে—ফুল্‌স্পীডে গাড়ী ছুটিয়ে সোজা গ্যারেজে চলে যা নলু। অবাধ্য হস্‌নে। দেখ্‌চিস্ না—ওরা কী ভয়ানক ক্ষেপেচে।"

* * *

মাতালের মতো টল্‌তে টল্‌তে 'পাইস্' হোটেলের ডাইনিং রুমে গিয়ে বসলে নলিন।

ক্ষুধায় নাড়ীগুলো পুড়ে যাচ্ছে মনে হ'লো। সকালে এক টুকরো রুটি মুখে দিয়েও আসে নি—মানে ঘরে কিছু ছিল না।

'বয়' খাবার আর চা রাখলে। পাশের টেবিলের লোকগুলো এমন বিশ্রী ভঙ্গীতে

তাকাচ্ছে কেন? ওরা নলিন কে চিনতে পেরেচে নাকি? মরুক্ গে। নলিন আহারে ভেঙে পড়লে। কিন্তু খাওয়া হ'লো না। একটি লোক বলচে—পিকেটারও হ'তে পারে?

টেবিল চাপ্‌ড়ে দ্বিতীয় লোকটি চাপা উত্তেজনায় বল্‌লে—আমি বাজী রেখে বলতে পারি—ও ড্রাইভার। Blackleg সকালে ওকে গ্যারেজ থেকে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে আস্‌তে দেখেচি।

রূঢ় মন্তব্য কানে এলো নলিনের—কুকুরটা খাচ্চে কোন লজ্জায়? এতোগুলো ড্রাইভার ষ্ট্রাইক্ করে পথে বসেচে, দু'দিন দশদিনে কিছু পেটে পড়চে কিনা তার নেই ঠিক...।"

আর একজন জুড়ে দিলো—শালা চা খাচ্চে না—খাচ্চে ওর জাত ভাইদের রক্ত।'

নলিনের চায়ের কাপে চুমুক দেয়া হ'লো না। নিঃশব্দে, নিরুত্তরে নলিন স্খলিত পদে সাজানো খাবার রেখে বাইরে বেরিয়ে গেলো।

* * *

ম্যানেজারের স্ত্রী ক্ষোভে, মনস্তাপে চেঁচিয়ে উঠলেন—ওই শূয়োরগুলোর বুঝি গাড়ীর এই অবস্থা করেচে।"

নিঃশব্দে, প্রায় বিধ্বস্ত গাড়ীখানাকে কোনও রকমে গ্যারেজে ঢুকিয়ে চলে যায় নলিন।

* * *

নলিন একমুঠো টাকা পয়সা বিছানায় রাখ্‌লে। আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠলো ছায়া—অনেক রোজগার হ'লো দেখচি।

নলিন সব ঘটনা খুলে বল্‌লে। এমন কি হোটেলে তা'র খাওয়া হয় নি কেন, তাও বাদ দিলে না।

ছায়া ব্যস্ত হয়ে উঠে—কিছু মুখে দাও নি। ঐ গ্লাসে নার্স গরম দুধ রেখে গেছে। চটপট্ চুমুক দিয়ে নাও।

নলিন স্নিগ্ধ হাসির স্পর্শে আচ্ছন্ন করে বলে—ব্যস্ত হ'তে হবে না। কাল থেকে ঠিক সময়ে খেতে পাব। রাউণ্ডে বেরুতে হবে না কি না।

ছায়া উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করে—কেন গো? গোলমাল্ মিট্‌মাট হয়ে গেছে বুঝি। তাই তোমাকে জবাব দিলে।

—তা নয়। গাড়ীর 'বডি'টা ভেঙে চুরমার করে দিয়েচে।

—কারা? ড্রাইভাররা বুঝি।

—নিজেই ইচ্ছে করে ভেঙে দিলুম। ষ্ট্রাইক্ যদ্দিন চলে—যাতে আর কেউ গাড়ী না চালায়।

ছায়া ক্রমশঃ শিথিল হয়ে এলো। নলিন বলে—না খেয়ে, না পরে, জুলুমের বিরুদ্ধে যারা আন্দোলন চালাচ্ছে, আমাদের এমন কিছু করা উচিত নয়, যাতে ওদের সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়। গাড়োয়ান বলে, আত্মসম্মান হারাই নি ছায়া।"

আধুনিক প্রেমের কথা

শান্তিসুধা ঘোষ

প্রিয়বরাসু,

তোমার চিঠি পেয়ে ব্যথিত হয়েছি। কি ব'লে সান্ত্বনা দেব জানি না। যাঁকে একান্ত বিশ্বাসে ভালোবেসেছিলে, তিনি সে বিশ্বাস রাখলেন না—এর চেয়ে বড় বেদনা আর কিছু নেই।

কিন্তু যদি অনুমতি কর তবে একটা কথা বলি। তাঁর এ অবিশ্বস্ততা অথবা লঘু-চিত্ততা তোমার কাছে যেমন অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত ঠেক্‌ছে, অত্যন্ত বেদনাদায়ক হলেও কিন্তু ততটা অপ্রত্যাশিত আমার কাছে লাগেনি। বন্ধু বলে আমার কাছে এই ব্যথার দিনে তুমি বল চেয়েছ, তাই এ'বিষয়ে কয়েকটা স্পষ্টকথাকে স্পষ্টতর করে লিখ্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। মন যখন শান্ত কর্ত্তে পারবে, তখন সেগুলো ভেবে দেখো। হয়তো বা খানিকটা সান্ত্বনা পেতেও পারো।

তুমি লিখেছ তোমার সব চেয়ে বড় দুঃখ ও বড় বিস্ময় এই—নিজে থেকে এমন করে অযাচিত ভালোবাসা দিয়ে কেন তিনি অকস্মাৎ অকারণে সরে দাঁড়ালেন। এই পলায়ন তোমাকে মর্ম্মান্তিক পীড়া দিচ্ছে বুঝতে পারি; কিন্তু আমি বলি ভাই, আজকের দিনে পুরুষের পক্ষে এই পলায়ন যে খুব স্বাভাবিক!

কেন?—বলি।

একটি কথা গোড়াতে মনে রেখো আমাদের বর্ত্তমান সমাজে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে-সব মেশামেশি ও ভালোবাসা-বাসি দেখতে পাও, তার সবগুলোকেই সত্যিকারের ভালোবাসা বলে ভুল করে বোসো না। শস্তা ছাপাখানার কল্যাণে আজকাল বাংলার মাটি ফুঁড়ে আনাচে কানাচে নানাবিধ প্রেমসাহিত্য গজিয়ে উঠেছে, সিনেমার হ'ল শুধু কলকাতার সহরে নয়, প্রত্যেক মফঃস্বল সহরেরও পল্লীতে পল্লীতে চক্ষুকর্ণকে সুলভে প্রেমায়িত করবার অধিকার পেয়েছে, এই সব কারণে ছোঁয়াচের গুণে আজকালকার ছেলেমেয়েদের প্রেমে পড়া একটা ফ্যাশান। যে প্রেমে পড়ে না, সে বড় সেকেলে। তুমি রাগ কোরো না,—তোমার কথা বলছি না, যাঁকে ভালোবেসেছ তাঁর কথাও হয়তো নয়, কারণ তাঁর সম্বন্ধে আমার সবিশেষ কিছুই জানা নেই। কিন্তু একথা জোরের সঙ্গেই বল্‌ছি যে, দু'চারটি মহানুভব ব্যতিক্রম ব্যতীত আর যত পুরুষের ভালোবাসার কথা ও কাহিনী শুন্‌তে পাও, তার শতকরা নব্বইজন আসলে একেবারেই ভালোবাসে না, ভালোবাসা ভালোবাসা খেলা করে মাত্র। বিশেষভাবে পুরুষের সম্বন্ধেই একথা বলছি, কারণ মেয়েরা যারা খেলায় যোগ দেয়, তারা বেশীর ভাগই বাস্তব

মনে করে নামে, খেলা ভেবে নয়। তাই অবশেষে পলায়নের তামাসাটা বুঝ্‌তে প্যারে না, না বুঝে কাঁদে। যেমন আজ তুমি কাঁদছ।

নব্য শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে দুটি শ্রেণী মোট্টামুটি দেখতে পেয়েছি,—এক, যারা কিছুকাল কলেজে পড়েছে, ও ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের উপন্যাসাদি গ্রোগ্রাসে গিল্‌ছে, এবং পণ্ডিত না হলেও পণ্ডিতম্মন্য হয়েছে, তারা; দ্বিতীয়, যারা যথার্থই চিন্তাশীল, এবং এত বেশী চিন্তাশীল যে চিন্তার নেশা ভূতের মত জীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। প্রথম দলের কথাই আগে একটু বিশদ ভাবে বলি। এরা নানাবিধ তথ্য শুনেছে ও পড়েছে, কিন্তু আয়ত্ত কর্ত্তে পারে নি কোনটাই, কারণ সে ধীরতা, গভীরতা বা মনস্বিতা নেই। তারা ফ্রয়েড্‌ শিখেছে, জেনেছে,—ভালোবাসা অর্থ সম্ভোগ প্রবৃত্তি এবং এ প্রবৃত্তিকে বাধা দেওয়া বড়ই অন্যায়, সুতরাং তরুণী মেয়ে পথে পড়লেই একটুখানি প্রেম না করা ক্লীবত্ব। অতএব যাকে-তাকে কাছে পেলেই যখন তখন একটু ভালোবেসে ফেলে। জানিনা তোমার প্রিয়তম যিনি, তিনি এই শ্রেণীভুক্ত কিনা। তুমি হয়তো বল্‌বে—না। না হলেই মঙ্গল।

দ্বিতীয় শ্রেণী যাঁরা ইন্‌টেলেকচুয়াল নামে সম্মানিত, তাঁদের এর চেয়ে একটু তফাৎ আছে। এদের মধ্যে সম্ভোগলিপ্সা উৎকট নয়, উচ্ছৃঙ্খলতার আমোদের জন্যে এঁরা উচ্ছৃঙ্খলতা করেন না, চিত্তের লঘুতা কম। অথচ প্রেমের বেলায় সমানই অস্থির ও অবিশ্বস্ত—এঁদের প্রেমে কবলিত হবার দুর্ভাগ্য যে মেয়ের হয়, তার জীবনের ট্র্যাজেডি সামান্য নয়। হয়তো আরও বেশী, কারণ যারা লঘু ও প্রবৃত্তিসেবী, তাদের অন্ততঃ নিন্দাবাদ করেও খানিকটে হাল্কা হওয়া চলে, কিন্তু এঁদের যে তাও চলে না। (তোমার তিনি কি এই শ্রেণীর?) এঁরা অন্যায় কর্ত্তে চান না, কিন্তু চিন্তাশীলতার গোলক ধাঁধায় এত বেশী জড়িয়ে পড়েছেন যে ন্যায় অন্যায়র দিশা হারিয়ে ফেলছেন। এঁরা ভালোবাসা কামনা করেন, কিন্তু ভালোবাসতে জানেন না—অত্যধিক মননশীলতায় হৃদয় শুকিয়ে এসেছে। ভালোবাসা যখন পান, তখন তাকে সরল আনন্দে গ্রহণ 'করবার' কৌশল জানেন না তাকে বিজ্ঞানের কোঠায় নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ কর্ত্তে কর্ত্তে অকস্মাৎ হয়তো আবিষ্কার করে বসেন—ভালোবাসার অস্তিত্বও নেই, মূল্যও নেই, প্রয়োজনও নেই। সুতরাং প্রেমবন্ধন শিথিল হয়ে আসে, প্রেমিকার মুখখানি ছায়ামূর্ত্তি হয়ে মিলিয়ে যায়। কিন্তু মস্তিস্কের রাজত্ব কায়েম হয় না, প্রয়োজন আসে, দেহপ্রাণের প্রেরণা আবার একদিন কবে অজান্তে খোঁচা দিতে থাকে, ভালোবাসা পাওয়ার জন্যে মনস্বী আবার উন্মুখ হয়ে ওঠেন, আবার একজনকে আলিঙ্গনে বাঁধবার আয়োজন করেন। কিন্তু সে বাহুবন্ধনও স্থায়ী হয় না, আবার খসে পড়ে যায়। কারণ, ভালোবাসা পরিপুষ্ট হওয়ার অনুকূল মৃত্তিকাই তাঁদের জীবনে নেই, ইন্‌টেলেকচুয়ালিজমের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে সমস্ত রস শুকিয়ে আকাশের শূন্যতায় মিশে গেছে। বাস্তবিক এই আলেয়া-বিলাসীদের দেখে আমার ক্ষণে ক্ষণে একান্ত করুণা জেগে ওঠে। এঁরা যে মেয়েদের জীবনে আবির্ভূত হন, তাদেরই যে শুধু অসহায় রিক্ত করে দিয়ে যান তাই নয়, এঁদের নিজেদেরই জীবন

এক একটি মহাশূন্য, বিরাট্ ট্রাজেডি। ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালিজম বর্ত্তমান সভ্যতার কঠিনতম ব্যাধি; এবং তারই একদিক্‌কার পরিণতি এই এঁরা। ইন্‌টেলেক্‌টের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাইরেকার বিপুল পরিসরের মধ্যে যার স্থিতি ও গতি সেই প্রেম ও পূর্ণতাকে আয়ত্ত করবার দুরাশায় এই সুধীজনের ইন্‌টেলেক্‌টেরই দেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরছেন। কিন্তু তা তো সফল হবার নয়! ফলে দাঁড়িয়েছে, একটা সর্ব্বব্যাপী নৈরাশ্যবাদিতা ও শ্রদ্ধাহীনতা—যার ছাপ আজকাল পৃথিবীর সব তথাকথিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের পাতায় পাতায় দেখতে পাচ্ছি।

বল্‌তে বল্‌তে হয়তো অন্যদিকে চলে যাচ্ছি। তবু একটু ধৈর্য্য ধর, আরও একটি কথা বলে নিই। আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যে একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ কিনা জানি না,—এর সমস্তটাই নারীপুরুষের প্রেম কাহিনীতে ছাওয়া, কিন্তু নারীর প্রেমের সম্বন্ধে কী এক বিস্ময়কর অশ্রদ্ধার ভঙ্গী! নব্য সাহিত্যিকদের রচনা থেকে তুমি বোধহয় একটি লেখাও বার কর্ত্তে পারবে না, যাতে মেয়েদের ভালোবাসা অথবা মেয়েদের জীবনের প্রতি একটি গভীরতর ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি-ভঙ্গীর আভাস পাওয়া যায়। প্রাচীন পুরুষের যে মনোভাব নারীকে নরকের দ্বাররূপে অপমান করে এসেছে, সভ্যযুগের নব্য পুরুষের মনও তার থেকে এক ধাপ এগোয় নি। বাইরের বহু ঘষামাজাতেও কয়লা হীরে হতে পারলো না। অথচ কি আশ্চর্য্য, আমাদের শিক্ষিত মেয়েরা বিনা বাক্যব্যয়ে শুধু এগুলো হজম করে যাচ্ছে তা নয়, পুরুষদের দেখাদেখি এই সাহিত্যের তারিফ্‌ও করে, এবং এইসব সাহিত্যিক ও সিউডো-সাহিত্যিকদের সঙ্গেই প্রেম কর্ত্তেও দ্বিধাবোধ করে না!

যাক্, হয়তো এসব অবান্তর কথা। কিন্তু এর ফলে আমাদের চার পাশে অসংখ্য মেয়ের জীবনে যে নিষ্করুণ ব্যর্থতা এসে হানা দিচ্ছে, সেগুলো তো অবান্তর নয়! কেন এমনতর হতে পারছে। পুরুষ তার প্রেমে নিষ্ঠা আন্‌বার চেষ্টামাত্র করে না, অথচ পুরুষের খেয়াল অনুযায়ীই প্রেমের পরিণতি হবে, এমন হয় কেন বল দেখি? নিজের মনকে পরখ করে একেবারে তলিয়ে ভেবে বল।

আমার মনে হয়, এর জন্যে আংশিকভাবে দায়ী মেয়েরা নিজেরা। মেয়েদের মধ্যে এমন একদল আছে—(পক্ষপাত করব না)—যাদের পুরুষদেরই মত ভোগী মন, প্রজাপতিবৃত্তি কর্ত্তে যারা হর্ষ-উপভোগ করে। তারা তো ইন্ধন যোগাচ্ছেই। তাদের কথা ছেড়ে দিলাম (আশা করি, তারা মুষ্টিমেয়) কিন্তু যারা তোমার মত ভালো মেয়ে, দোষ তাদেরও আছে। নিজের অগোচরে, অজান্তে আধুনিক পুরুষদের হাল্কা প্রেমলীলার প্রশ্রয় তারাও সতত দিয়ে আস্‌ছে। আজকাল পথে, ঘাটে বাজারে পুরুষের হাতের কাছে মেয়ে বড় সুলভে মেলে, বিশেষতঃ, শিক্ষিত মেয়ে—যাদের সঙ্গে দুদণ্ড ইংরাজী উপন্যাসের আলোচনা চলে, একত্র সিনেমা উপভোগ করে আরাম পাওয়া যায়;—এবং একটু হাসির ইঙ্গিতে, গায়ে পড়া একটুখানি আত্মীয়তায় তাদের প্রেমও মেলে। (আমরা ভাই, বড় বেশী প্রেমলোভাতুর, ছেলেবেলা থেকে শুধুই প্রেম

সর্ব্বস্বতার শিক্ষা পেয়ে আসি কিনা তাই)। সুতরাং পুরুষের পক্ষে ভাবনা করবার আছেই বা কি? প্রেমে নিষ্ঠা বজায় রাখবার জন্যে তারা মনকে শৃঙ্খলিত কর্ত্তে যাবে কেন? একথাটি শুধু ঘুস্তরের ছেলেদের সম্বন্ধেই নয়, যাঁরা ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্ বলে উচ্চস্তরের সম্মান পাচ্ছেন, তাঁদের সম্বন্ধেও বল্‌ছি। কেন না, তাঁরা যে প্রেমের ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালাইজেশন ও ভাববিলাসিতা করে থাকেন, প্রেম সম্বন্ধে তাঁদের যে ফ্যাসটিডিয়াস্‌নেস্ দেখতে পাই তা এতখানি সম্ভব হত না, যদি নারীর প্রেম দুর্লভ হত। তাঁরা জানেন আজ যাকে ভালোবাসলেন তাকে বিবাহ করবার কিংবা তার প্রতি নিষ্ঠাযুক্ত দায়িত্ব রাখবার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই, কারণ, উপেক্ষায় অনাদরে আজকের প্রেমিকাটি যদি বা আলগা হয়ে যান, তবু আবার যখন অবসর বিনোদনের জন্য একটি নারীর সান্নিধ্য দরকার হয়ে উঠ্‌বে, তখন অনায়াসেই হাতের কাছে যে-কেউ একজনকে পাবেন। এই নিশ্চিন্ততা আছে বলেই তাঁরা খেয়াল স্থখে প্রেমকে শিথিল করে দিতে সাহস হন; প্রিয়াকে পত্নীত্বের গৌরবে বহন করবার পরিবর্ত্তে 'বান্ধবী'র দলে ঠেলে দিয়ে দায়মুক্ত। আজ আমাদের প্রেম লাভ করবার জন্যে ওদের কোনও সাধনার প্রয়োজন হয় না, তাই তার মূল্যও নেই কিছু। যা দুষ্প্রাপ্য, তারই দাম বেশী।

ওরা যে আমাদের শ্রদ্ধা করে না, তার কারণও এই। আমরা এত সস্তায় দু'হাতে প্রেম বিকীর্ণ করছি, যে তার প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে সচেতন হবার কোনও অবকাশই ওদের দিই নি। এযে জীবন রত্নাকরের অতল-তলা থেকে আহরণ-করা কৌস্তুভমণি, সেকথা ওরা জানে না; ওরা ভাবে,—পথ চল্‌তে ঘাসের ফুল, খুসী মত তুলে নিলেও চলে, দলে গেলেও চলে।

সত্যি, আমাদের মেয়েরা এত বেশী প্রেমাকুল যে তার ফেনায় সমস্ত বুদ্ধি বিচার আচ্ছন্ন করে ফেলে, যাচাই করে পরখ করে দেখবার ধৈর্য্য নেই। কিন্তু বন্ধু, এমন করে আর কতদিন চল্‌বে? দেখে শিখতে পারলে না, এখন ঠেকে শিখবার সময় এসেছে। তুমি জিজ্ঞাসা করেছিলে, তোমার বেদনার প্রতীকার কি নেই? আছে বৈকি? নিজের অন্তরের দিকে চোখ খোল, আর নিজের মেরুদণ্ডকে একটু খাড়া করে তোল। আমরা যাবতীয় শিক্ষা দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য এযাবৎ পুরুষের কাছ থেকে শুনে শুনে শিখে এসেছি। কিন্তু ওই পর্য্যন্তই থাক্। প্রেম সম্বন্ধে ও নিজের জীবন সম্বন্ধে পুরুষের কাছ থেকে শিক্ষা মুখস্থ করার দরকার নেই। বরঞ্চ অনুরোধ করি, পুরুষের উক্তিতে, যুক্তিতে, সাহিত্যে, শিল্পে নারীর প্রতি যে অশ্রদ্ধাময় কামনার ইঙ্গিত তোমাকে নিজের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও নিজের কাছে দুর্ব্বল করে রেখেছে, সেগুলো একবার ভুলে যেতে পারো? নারীর ভালোবাসা সম্বন্ধে পুরুষের লেখা থীসিস্ থেকে বিদ্যা ধার করে নিজেকে পরের চোখে দেখো না। তাহ'লে তোমার নিজের আসল রূপ দেখতেই পাবে না। আমি বলি, ওদের বাক্যের ইন্দ্রজাল দিয়ে মনকে আবৃত না করে, তার চেয়ে নিজেকে সত্যভাবে জেনে নিয়ে সবলভাবে সেই সত্যটি তাদের জানিয়ে দাও। নারীর জীবন সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্তই নির্ভুল, এবং প্রেম সম্বন্ধে আমাদের বাণীই চরমবাণী, কারণ প্রেমের রাজ্যে নারীর একটি বিশেষ

শক্তি ও অধিকার আছে যা পুরুষের নেই। কিন্তু আমাদের মেয়েরা বোবা, কথা বলে না, কেবল শুনে যায়। তারা বড় ভীরু, যাকে সত্য বলে জান্‌ছে তাকে প্রতিষ্ঠিত করে না, অন্যের খেয়াল মেনে নেয়।

তুমি হয়তো এ দীর্ঘ পত্রখানি পড়ে অধৈর্য্য হয়ে উঠছ, ভাবছ, এ কেবল কতগুলো থিওরেটিক্যাল জল্পনা, তোমার বাস্তব বেদনার প্রতীকারের কোনও সন্ধান মিল্‌লো না। কিন্তু আমি জানি, যদি নারীর ভালোবাসার অমর্য্যাদা ও ব্যর্থতার প্রতীকার কখনও হয়, তবে এই পথেই হবে, পুরুষকে অনুনয় করে নয়। খোসামোদে ভালোবাসা মেলে না, উচ্ছিষ্ট রুটির কণা মিল্‌তে পারে। নিজের প্রেমের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও শক্তির আস্বাদ যদি পাই, পুরুষের অবজ্ঞা, লঘুতা ও উন্মত্ত চপলতার হাত থেকে অব্যাহতি তখন পাবই।

জানি, সেদিন আস্‌বে। অনাগত ভবিষ্যতের সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রইলাম।

তোমার অনুমতি নিয়ে চিঠিখানা ছাপতে দিলাম। তুমি তো একা নও, তোমার মত প্রবঞ্চিত ভালো মেয়ে আমাদের চারপাশে আজ আরও কত যে আছে—হয়তো এ চিঠি তাদেরও একটুখানি কাজে লাগ্‌তে বা পারে।

আমার ভালোবাসা নিও। ইতি

রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীনিকেতন

ডাঃ ধীরেন্দ্র মোহন সেন

যে বড় তাকে আরও বড় করে দেখাবার একটা প্রবৃত্তি আমাদের মধ্যে আছে। যখন যে দেবতার আরাধনায় বসি, তিনি যেই হউন না কেন, তাঁকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের আসনে বসাতে আমাদের কোন দ্বিধা হয় না। আজ যে আলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেছে, তাতে শ্রোতা বিশেষের কাছে এ কথাটা অত্যুক্তি বলে মনে হতে পারে। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের গুরু যিনি, ভারতের কলাশিল্পের পুনরুজ্জীবনে যাঁর প্রতিভা মৃতসঞ্জীবনী এবং জাতীয় চিন্তার ধারাকে যাঁর মনীষা আত্মপ্রতিষ্ঠ করেচে, তাঁকে কৃষিক্ষেত্রে টেনে আনা, আবার অনেকেই হয়ত একটা বড় anti-climax মনে করবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও কাজের ধারার সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে, তাঁরা আশা করি এ ক্ষেত্রে বিস্মিত হবেন না। দেশের অখণ্ড সমগ্র মূর্ত্তি তাঁর ধ্যানে, সঙ্কল্প তাঁর তারই সাধনা। যেখানে খণ্ডতা, যেখানে বিচ্ছেদের অঙ্কুর ছোট স্বার্থের প্রশ্রয়ে লালিত, দেশ-বাসীকে সেখানে বার বার তিনি সচেতন করতে প্রয়াস পেয়েচেন—এমন কি কঠিন আঘাত করতেও কুণ্ঠিত হন নি। আমাদের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলী ও জনসাধারণের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছে। ভদ্রতা ও শিক্ষার বিলাশ বশতই, চিন্তায়, ভাষায়, ভাবে, আচারে, কর্ম্মে উভয়ের মধ্যে দূরত্ব বেড়েই চলেচে। এ সামাজিক অসামঞ্জস্যের ভয়ঙ্কর বিপদ হতে, দেশের ভবিষ্যৎকে রক্ষা করবার প্রয়োজন, সুদূর অতীতে, স্বদেশী-যুগে, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। যারা স্বভাবত এক অঙ্গ, তাদের সহজ প্রাণ প্রবাহে বাধা পড়ে যদি, এক রক্ত, এক প্রাণ অবাধে সঞ্চারিত হতে না পারে, তবে যে সাংঘাতিক ব্যাধি জন্মায়, সেই ব্যাধির আশঙ্কা সেই সময় তার মনে জাগে। বাংলার কৃষি বা কৃষকের উন্নয়নে তাঁর প্রচেষ্টার মূলে ছিল এই বিচ্ছেদ-বেদনার অনুভূতি।

দুর্ব্বল ও অক্ষমকে বাইরে থেকে কেউ বাঁচাতে পারে না। গরীব যে সে তার সর্ব্বস্ব দিয়ে মামলায় জিততে পারে, কিন্তু প্রবলের চক্রান্ত একদিন না একদিন তাকে ভিটে ছাড়া করে। ক্ষীণ-স্বাস্থ্য রুগ্ন চিকিৎসার দায়েই প্রাণ দেয়। একটী গল্প কবি বলে থাকেন—"ছাগ শিশু একবার ব্রহ্মার কাছে গিয়ে কেঁদে বলেছিল, "ভগবান, তোমার পৃথিবীতে আমাকে সকলেই খেতে চায় কেন? তাতে ব্রহ্মা উত্তর করেছিলেন,—বাপু অন্যকে দোষ দেব কি, তোমার চেহারা দেখলে আমারই লোভ হয়।" পৃথিবীতে অশক্ত বিচার পাবে, রক্ষা পাবে এমন ব্যবস্থা বিধাতা ও করতে পারেন নি। সৃষ্টির মূলসূত্রই দুর্ব্বল হনন। তাই বাংলার কৃষকের কথা রবীন্দ্রনাথ যখন ভেবেচেন, কৃষি-উন্নয়নে প্রবৃত্ত কর্ম্মীদের এ কথাই তিনি বার বার স্মরণ করিয়েচেন—'আর কোন দানই দান নয়, শক্তিদানই একমাত্র দান।'

কৃষি-উৎকর্ষের জন্য কবির আগ্রহের পরিচয় তাঁর জীবনের আরম্ভেই পাওয়া যায়। এই

সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভাব, তিনি নানাভাবে পূরণ করবার প্রয়াস পেয়েচেন। তাঁর অনমনীয় সঙ্কল্পই তাঁকে নানাভুল ও নিরাশা অতিক্রম করবার বল দিয়েচে। এ প্রসঙ্গে তাঁর জীবনের কয়েকটি ঘটনায় আপনাদের কৌতুহল হ'তে পারে।

রবীন্দ্রনাথের তখন মধ্য বয়স। তিনি অনেক সময়, তাঁদের জমিদারির সিলাইদহ পরগণায় থাকতেন। কৃষক প্রজারা নতুন নতুন চাষের পরীক্ষা করবে, এই আশায় তিনি নিজেই পরীক্ষাক্ষেত্রে অগ্রণী হন। বিলিতি কৃষি ডিগ্রীধারী জনৈক রাজকর্ম্মচারী হলেন তাঁর মন্ত্রণাদাতা। পরগণায় আলুর চাষ ছিল না। সুতরাং সেই চাষ প্রবর্ত্তন করা স্থির হ'ল। বিলিতি কায়দা মাফিক রাসায়নিক সার আনা হল, ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'ল। প্রেসক্রিপসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হল। সমারোহের খবর প্রজাদের অগোচর রইল না। একজন চাষী এসে কিছু বীজও নিয়ে গেল—কিন্তু চাষের পদ্ধতি নিতে সে সম্মত হল না। পরীক্ষান্তে সযত্নে হিসাবের পর, ফল যখন ঘোষণা করা হল, দেখা গেল বিশেজ্ঞের "ফি" বাদেই ফসলের দর যা পড়েচে, তাতে লোকসমাজের হিত হবার সম্ভাবনা কম। তবে গরীব প্রজার ক্ষেতে আলু নাকি পর্য্যাপ্ত হয়েছিল--দর পড়েছিল দেশের মাত্রামতেই। আর একদফায় আখের চাষ হয়েছিল। মাঝামাঝি সময়ে আখে পোকা লাগে। পোকা মারতে বিলিতি Spray ও রাসায়নিক প্রতিক্রিয়ায় ফসল আর ফলল না—অকালে শুকিয়ে গেল। পরিণামে আয়ব্যয়ের কোন Scientific data রাখা সম্ভব হয় নি। আর একবার তিনি একজন বিদেশী গৃহশিক্ষককে রেশমের চাষের উৎসাহ দিয়েছিলেন; ফলে গুটিপোকার উৎপাতে প্রায় গৃহত্যাগ করতে বাধ্য হতে হয়েছিল—কারণ বসতবাটীই ছিল Experimental Station. নিজব্যয়ে তিনি কয়েকজন বাঙালী যুবককে আমেরিকায় কৃষিবিজ্ঞান শিখ্তে পাঠান। বাংলার কৃষকদের বাঁচাতে হলে আধুনিক প্রণালী আমাদের দেশে যে প্রবর্ত্তিত করতে হবে সে বিষয়ে তিনি নিসংশয় ছিলেন। কিন্তু তখনকার বিদেশী শিক্ষা নিয়ে যারাই ফিরেছিল, তারাই অভিশপ্ত কচের মত শুধু শিখেই এল, গরীব দেশের মাটিতে তার আর কোন প্রয়োগ হল না। বৈদেশিক জ্ঞান বিদেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থার অভাবে দেশের কাজে এলো না।

বিবিধ দৈব দুর্ব্বিপাকেও কবির আগ্রহ চেপে রইল। যখনই বিদেশে গেছেন তখনই খোঁজ করতেন কোন সুযোগ্য কৃষিতত্ত্ববিদ্ তিনি পান কিনা, যাঁকে দিয়ে পল্লী-কৃষি-উন্নতির কোন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে পারেন। তিনি চেয়েছিলেন এমন লোক, যে কেবলমাত্র বিশেষজ্ঞ নয়, জ্ঞান কর্ম্মে প্রয়োগ করবে—এমন দক্ষতাও তার থাকা আবশ্যক। ১৯২১ সনে Cornell বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ইংরেজ যুবকের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন, যাঁর সাহচর্য্যে বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠান শ্রীনিকেতনের সূচনা হল।

'স্বদেশী সমাজে' রবীন্দ্রনাথ যে চিন্তার ধারা প্রকাশ করেচেন, শ্রীনিকেতন সেই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কৃষির গোড়ার কথা কৃষকেরা। তাদের চাই স্বাস্থ্য ও শিক্ষা—এই উভয়ের সমন্বয়ে যে শক্তি তারা লাভ করবে, তার বলেই তারা নিত্য নূতন জ্ঞান গ্রহণ করতে পারবে, তার

প্রয়োগে পটু হবে। কি প্রণালীতে আমাদের কৃষকেরা শক্তি আবার ফিরে পেতে পারে, তার আভাস রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী সমাজে দিয়েচেন। তাঁর কথাতেই বলতে হয়—"যতদিন জোতদার ও চাষা রায়ত প্রত্যেকে স্বতন্ত্র থেকে চাষবাস করবে, ততদিন তাদের অস্বচ্ছল অবস্থা কিছুতেই ঘুচবে না। পৃথিবীতে চারিদিকে সকলেই জোট বেঁধে প্রবল হয়ে উঠ্‌চে; এমন অবস্থায় যারা বিচ্ছিন্ন এককভাবে থাকবে তাদের চিরদিনই অন্যের গোলামী ও মজুরী করে মরতে হবে। আজকার দিনে যার যতটুকু ক্ষমতা আছে সমস্ত একত্র মিশিয়ে বাঁধ বাঁধবার সময় এসেচে। এ না হলে ঢালু পথ দিয়ে আমাদের ছোট ছোট সামর্থ্য ও সম্বলের ধারা বের হয়ে অন্যের জলাশয় পূর্ণ করবে। অন্ন থাকতেও আমরা অন্ন পাব না এবং আমরা কি কারণে কেমন করে মরচি তা জানতেও পারব না। আজ যাদের বাঁচাতে চাই তাদের মিলাতে হবে। য়ুরোপে আমেরিকায় কৃষির নানা প্রকার মিতশ্রমিক যন্ত্র বের হয়েচে—নিতান্ত দারিদ্র্য বশত সে সমস্ত আমাদের কোন কাজেই লাগচে না,—অল্প জমি ও অল্প শক্তি নিয়ে সে সমস্ত যন্ত্রের ব্যবহার সম্ভব নয়। যদি এক একটি মণ্ডলীর অথবা এক একটি গ্রামের সকলে সমবেত হয়ে নিজেদের সমস্ত জমি একত্র মিশিয়ে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তবে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্য অনেক খরচ বেঁচে ও কাজের সুবিধা হয়ে তারা লাভবান হতে পারে। যদি গ্রামের উৎপন্ন সমস্ত আখ তারা এক কলে মাড়াই করে নেয় তবে দামী কল কিনে নিলে তাদের লাভ বই লোকসান হয় না—পাটের ক্ষেত সমস্ত এক করে নিলে 'প্রেসের' সাহায্যে তারা নিজেরাই পাট বাঁধাই করে নিতে পারে—গোয়ালরা একত্র হয়ে জোট করলে গোপালন ও মাখন ঘৃত প্রভৃতি প্রস্তুত করা সস্তায় ও ভাল মতে সম্পন্ন হয়।" শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠার মূলে নিহিত আছে এই উদ্দেশ্য—পল্লীগ্রামগুলি নূতন করে ব্যবস্থাবদ্ধ করা; শিল্পী, কৃষিশিল্প ও পল্লীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অবহিত হওয়া—পল্লী-সমাজ সমবেত ভাবে গ্রামের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পন্ন করবে সেইরূপ বিধির উদ্ভাবনা।

বিজ্ঞানের গবেষণা মানুষের মহতী চেষ্টার অন্যতম। কিন্তু অপেক্ষাকৃত মহত্তর সাধনা এই জ্ঞানের ভাণ্ডার মানব সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করা। কৃষি বিজ্ঞানে কত তথ্য আজ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে—কিন্তু বাংলার গরীব চাষীর সাধ থাকলেও সাধ্য নাই যে ল্যাবরেটরি প্রসুত অভিজাত সামগ্রী সে ব্যবহারে আনে। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য নবযুগের আবিষ্কৃত তথ্য সমূহ যাতে আয়ত্তাধীনে আনা সম্ভব হয় সেভাবে পল্লীবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করা। কৃষক সম্প্রদায়কে চিরন্তন চাষের সীমায় আটকে রাখতে হবে এমনটি যেন না হয়। বহুদিন ধরে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে, অন্ধকারে সে বদ্ধ। তার প্রয়োজন সকল খর্ব্বতার প্রাচীর ভেঙে বাইরে বেরিয়ে আসা—মুক্ত হলে আপন পথ সে আপনি বেছে নিতে পারবে। তার শিক্ষা পদ্ধতিতে "পল্লীর নেশা" বা Rural Bias মিশিয়ে দিয়ে মানুষের বাসের অযোগ্য পল্লী-জীবন আঁকড়ে বসিয়ে রাখার চেষ্টা বৃথা। সকলের সমবেত সাধনায় দেশের মাটী যখন সুজলা সুফলা হবে—বাসযোগ্য হবে, নেশা আপনি লাগবে, তখন মাটির টানে মানুষ সহর থেকে আপনি ফিরবে। এ যতদিন না হয় ততদিন কোন 'bias'ই,

যাঁরা বেঁচে থাকতে চায়, তাদের রোগ-বহুল মৃত্যুসঙ্কুল নিরানন্দ গ্রাম-অভিমুখী করবে না।

তাই রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লোক সমাজে আবার সহজ হয়ে মিলতে আহ্বান করেছেন। এ মিলন তখনই সম্ভব, যখন যারা পল্লীতে পলে পলে মরে সহরের অন্ন ও বিলাস-ব্যসনের যোগদান দিচ্ছে, তাদের মধ্যে নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হবে, তাদের মধ্যে বাঁচবার ইচ্ছাশক্তি জাগাবে। এর মধ্যে ত্যাগ বা দান নাই—এ আমাদের জাতীয় জীবনের একান্ত প্রয়োজন। দেহের কোন অবয়ব যদি রক্ত-সঞ্চারণের অভাবে শীর্ণ হয়ে যায়, সেই দুষিত প্রত্যঙ্গ সমস্ত দেহকে বিষাক্ত করে তোলে। আমাদের সমাজ দেহের পরিপুষ্টি যে অংশের উপর নির্ভর করে, সে যদি মুমূর্ষু হয়, তবে আজ দেশের ভরসা কোথায় ?

কৃষি উন্নয়নে রবীন্দ্রনাথের সাধনা আংশিক ভাবে শ্রীনিকেতনে মূর্ত্ত হবার প্রয়াস পেয়েছে। এই প্রকাশ, তাঁর সম্বল ও কর্ম্মীবৃন্দের শক্তি-সংযম সাপেক্ষ। কর্ম্মধারার যে প্রকৃতি তিনি পরিকল্পনা করেছেন, তার মধ্যে খ্যাতির আশা নাই ; এমন কি গ্রামবাসীর কাছে কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে বাধা ও অবিশ্বাস স্বীকার করতে হতে পারে। এতে কোন উত্তেজনা নাই, কোন বিরোধ নাই কোন ঘোষণা নাই কেবল ধৈর্য্য এবং প্রেম এবং নিভৃতে তপস্যা—মনের মধ্যে কেবল এই একটি মাত্র পণ যে দেশের মধ্যে সকলের চেয়ে যারা দুঃখী তাদের দুঃখের ভাগ নিয়ে সেই দুঃখের মূলগত প্রতিকার সাধন করতে হবে। আমাদের দেশের কৃষি উন্নয়নের কাজ নেশার কাজ নয়, তাহা সংযমী দ্বারাই সাধ্য। *

* All India Radio. Calcutta.—'প্রদত্ত'

ইহা-ই ট্র্যাজেডি

ইন্দ্রাণী রায়

বনগাঁ আর রামসোনাপুরের মধ্যে হাবসীর খাল। হাবসীর খাল বড় গভীর, জলের বর্ণ ঘোর কালো। আজিকার বর্ষার দিনে ওর বিস্তীর্ণ পরিধি ভয়ঙ্কর সুন্দর। রামসোনাপুর হইতে আজ আর বনগাঁয়ের সবুজ শ্রীটুকু চোখে পড়ে না। এ পারের লোকেরা বলাবলি করে। বন্যায় সব গ্রাস করিল নাকি!

পণ্য সম্ভারে পূর্ণ হইয়া ব্যবসায়ীর নৌকা চলিয়াছে, কর্ম্মব্যস্ত লোকেরা নৌকায় নৌকায় যাওয়া আসা করিয়া ফিরিতেছে। রামসোনাপুর আর বনগাঁ একরত্তি গ্রাম, তবু ইহারই মজুরেরা সমবেত হইয়া একদিন কাজে যোগ না দিলে চটকলের কাজ রীতিমত বন্ধ হইবার কথা। এই বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা মজুরদের মধ্যে বহু গোলযোগ, অশান্তি অভিযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল কয়েকমাস আগে। আজ শৃঙ্খলা আসিয়াছে, আসে নাই শান্তি; অথচ শান্তি ছাড়া কতকাল বাঁচিয়া থাকা চলে! রামসোনাপুরে চাষীর চেয়ে অচাষীর সংখ্যাধিক্য---আর বনগাঁয়ে তার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাই রামসোনাপুরের শ্রমিকরা অনেকেই ছুটির দিনগুলা অনেক সময় বনগাঁয়ে যাইয়া কাটাইয়া আসে।

আজ অবশ্য ছুটি নয়, তবু প্রয়োজন আছে বলিয়াই কাজের শেষে নিজের ঘরে না ফিরিয়া অনেক মজুরকেই দেখা গেল নৌকা ভর্ত্তি হইয়া সন্ধ্যার আঁধারে হাবসীর খাল পাড়ি দিয়া চলিয়াছে---বনগাঁর দিকে। দুরন্ত জলরাশির উপর কৃষ্ণ মেঘের করাল ছায়া, উষ্ণ বাতাস ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, বারিধারা সুরু হইতে আর দেরী নাই। কিন্তু ঝড় যদি ওঠে---তা এ প্রশ্ন শ্রমিকদের নয়। নৌকা যাত্রায় অনভ্যস্ত সহরে মেয়ে শান্তা চৌধুরীর। সন্ত্রস্তভাবে প্রশ্ন করে---ওপারে পৌঁছানোর আগেই যদি ঝড় ওঠে, তাহলে কী হবে জটাধর?

জটাধরের দৃষ্টি ছিল একখানা কোলাহলপূর্ণ চলমান নৌকার পানে। শান্তার কথায় হাতের বৈঠা জোড়ে চালাইয়া নির্লিপ্তের মত জবাব দেয়,---তা উঠ্‌লোইবা ঝড়, এমন তো হামেসাই হয় বর্ষাকাল যে!

শান্তা উষ্ণ হইয়া উঠে, জলরাশির পানে চাহিয়া বলে, বর্ষাকাল---সে তো আমিও জানি। নির্ব্বোধের মত বলে গেলে ওতো হামেসাই হয়,---নৌকো যদি উল্টে যায়, শুধু প্রাণ নয় তার চেয়েও বড়ো জিনিষ আজ জলে ডুবে যাবে---তা ভেবেছো? আকাশের কালো মেঘের পানে দৃষ্টিপাত করিয়া জটাধর কহিল, জটাধর কৈবর্ত্তকে তুমি চেন না দিদি। তোমরা যে একাতেই একশো, আমাদের একশো জন গিয়েও তোমাদের সোনার প্রাণ যদি না রাখতে পারে---তবে কোন্ মুখ নিয়ে আজ যাবো জয়ন্ত মাষ্টারের কাছে?

—উঃ খুব বক্তৃতে হচ্চে জটাধর, আর নয়, হঠাৎ হাসিয়া বলে শান্তা, ঠিকই বলেছিলেন নিখিলবাবু, আমাদের জটাধরকে মজুরদের লিডার করে দেওয়া চলবে অনায়াসে, তার যা মুখের জোর...শুধু কম্‌রেড্‌ জটাধর দাস, এইটুকু শব্দ সংযোগ তো অনেকের নামের সঙ্গেই রয়েছে! কানাই সর্দ্দারের পরেই কিন্তু তোমার নাম—

জটাধর এতক্ষণ হাসিতেছিল। এইবার গম্ভীর হইয়া বলে, কানাই সর্দ্দারকে তোমরা এবার বাতিল করে দাও দিদি। খুনখারাপি করি যা-ই করি, মাথা না হয় আমাদের যাবে, সেজন্যে একটা বুড়ো মুখের দিকে চেয়ে থাকবো? ওর রক্তের জোর গেছে থেমে, সাহস বলে কিচ্ছু নেই, খালি ভগবান—ভগবান।

নিঃশব্দে একটু হাসিল শান্তা। জটাধর দেখিল না সে হাসিটুকু দুঃখেরই অভিব্যক্তি মাত্র। সংক্ষেপে শান্তা কহিল, কানাই সর্দ্দারকে তোমরা জান না, স্বেচ্ছায় সে তোমাদের মধ্যে নেমে এসেছে, একলার জীবনের জন্যে চাষী মজুরের সামিল হয়ে পেট চালানো—সে এসব না করলেও পারতো।

তর্‌ তর্‌ করিয়া জল কাটিয়া কালো আকাশের নীচে নৌকা চলিয়াছে বনগাঁয়ে। শিশুর মত কৌতূহল ঝলমল করিয়া ওঠে জটাধরের চোখে মুখে, নিজকে সে সম্বরণ করিতে পারে না। সোজা ও প্রশ্ন করিয়া বসে, কানাই সর্দ্দার সম্বন্ধে কি যেন একটু আছে, মাষ্টারবাবুদের কাউকেই জিজ্ঞেস করতে সাহস হয়নি,—তুমি কি আমাকে বিশ্বেস কর না দিদি? আমার ভয়ানক জানতে ইচ্ছে করে ওই দুর্ব্বল রোগা সর্দ্দারের সঙ্গেই কেন মাষ্টারবাবুরা এত শলা পরামর্শ করেন।

তোমাকে অবিশ্বাস করার কথা নয় তো, শান্ত কণ্ঠে শান্তা বলে, একজনের জীবনে ভয়ানক অবিচার ও অত্যাচারের কথা। তোমাদের মধ্যে সংযমের বড় অভাব, অল্পেতে তোমরা জ্ঞান হারিয়ে ফেল, কানাইর কথা শুনে হঠাৎ তোমরা ক্ষেপে উঠ্‌বে, কোন প্রতীকার তো হবে না। অথচ কোন বিষয়েই অবিচার যেন আর না ঘট্‌তে পারে, দুঃস্থ চাষী মজুরেরাও যে সত্যি মানুষ তাদেরই জন্যে লড়তে সর্দ্দার আজ তোমাদের দলে এসে ধুঁকছে। সত্যিই তো ও মজুর ছিল না—!

—মজুর ছিল না? বিস্মিতভাবে জটাধর বলে, ওকি ভদ্দর লোক?

—ভদ্র অভদ্রের বিচার জানি নে, শান্তা কহিল, এ ধারার দুঃখের জীবন যাত্রা ওর ছিল না। আজ ওর কী সহ্য—আশ্চর্য্য লাগে। ঘটনাটা কিন্তু সত্য বুঝলে জটাধর, কোন্‌ এক গাঁয়ে কানাই সর্দ্দারের চায়ের দোকান ছিল, সকাল সন্ধ্যায় চাষী অচাষী অনেকে ওর দোকানে চা খেতে যেত। ও সব লোকদের মধ্যে দু'চারজন যেত সন্ধ্যার অনেক পর লোকের ভীড় কমলে। তারা কাগজ পড়্‌তো, তর্ক করতো, কানাই এক মনে বসে সে সব শুনতো, তার বউটিও বাদ যেত না। দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রথম শুনতো, অবশেষে—কানাইর উৎসাহে বউটি ওদের কাছে গিয়েই বস্‌তো। এই চেনা শুনা ও আলাপ আলোচনার জের নিয়ে একদিন অনেক রাতে একটি ছেলে

এসে ওদের ঘরে চাইলে থাকতে, মানে সেদিন দরকার ছিল ছেলেটির এমন একটা আশ্রয়ের। কানাই গিয়েছিল অন্য পাড়ায় হরি সভার নিমন্ত্রণে। বৌটি দ্বিধা না করে ছেলেটিকে আশ্রয় দিলে। পুলিশ এল অল্পক্ষণ পরেই, কিন্তু ছেলেটিকে পাওয়া গেল না। অবশেষে সে রাতে বউটির কি দিয়ে যে কী হয়েছিল, কেউ চোখে দেখেনি। কেবল দু'জন মুসলমান চাষী কান্না শুনেছিল অনেক্ষণ—এই শুধু ওর সম্বন্ধে জানা যায়। রাত্রি শেষে কানাই বাড়ি ফিরে এসে দেখ্‌লে দরজা খোলা, জিনিষ পত্র ভাঙ্গাচোড়া, আর ঘরের চালের বাতার সঙ্গে শাড়ি বেঁধে ওর বউ ঝুলছে, একেবারে সব শেষ। প্রমাণ অভাবে এর কোন বিচার হলোনা, টাকার জোরও ছিল না—কী আর করবে। কানাই সর্দ্দার হঠাৎ পশুর মত ক্ষিপ্ত হয়ে একজন পুলিশকে জখম করে এল, তারপর জেল খাট্‌লে অনেক বছর। সেখান থেকে ছাড়া পেতেই তোমাদের জয়ন্ত মাষ্টারের সঙ্গে দেখা। ওকে ঠাণ্ডা করে রেখেছে জয়ন্ত মাষ্টার, তা নইলে...শান্তা অকস্মাৎ থামিয়া বলিল এসে পড়েছি আমরা জটাধর। জটাধরের যেন এতক্ষণ হুঁস্ ছিল না, মন্ত্র চালিতের মত নৌকা বাহিয়া চলিয়াছে, শান্তার কথায় ও সচেতন হইয়া ওঠে। দুর্ব্বল—ভয়ানক দুর্ব্বল বোধ করিল জটাধর নিজকে। ওর হঠাৎ মনে হইল কেহ ওকে নৌকা হইতে হাত ধরিয়া পারে নামাইয়া দিলে ভাল হয়। কিন্তু শান্তার কথায়—আবার ও সম্পূর্ণ নিজ প্রকৃতিতে ফিরিয়া আসে। মজুরেরা সব নৌকা হইতে পারে নামিয়া ঘরে ফিরিবার পথে হল্লা করিয়া চলিয়াছে। জটাধরের নৌকা থামিলে শান্তা কহিল, ওরা চলে যাক্, একটু পর আমরা যাব জটাধর শান্তার কথায় জটাধরের পৌরুষে যেন আঘাত লাগে. ওকি সত্যই ওদের ভিতর দিয়া ওর এই দিদিটিকে নিরাপদে নিয়া যাইতে অসমর্থ! তবে তো বৃথাই মাষ্টার-বাবুরা ওর পায়ের জোরের তারিফ করিয়া থাকেন! লাফ্ মারিয়া জটাধর নৌকা হইতে নামিয়াই দড়ি টানিয়া খুঁটির সঙ্গে বাঁধিয়া ফেলে। তারপর শান্তার পানে চাহিয়া হাত বাড়াইয়া বলে, বড্ড পেছল, আমার হাত ধরে নেমে এসো দিদি। শান্তা নামিয়া পড়ে কিন্তু ইতস্ততঃ করে পথ চলিতে। জটাধর কহিল বুদ্ধি আমার কম দিদি, কিন্তু শক্তির কথাতো আর অবিশ্বেস কর না। পথ চলার পথে শান্তার ভ্রান্তি ঘুচিল, দেখা গেল সম্ভ্রমের সহিত অনেকেই পথ ছাড়িয়া দিল, দুই একজন নেশাখোর হাঁ করিয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল শান্তার চলার পানে।

সন্ধ্যা রাত্রিতে শ্রমিকদের কেন্দ্র করিয়া একটা সভার অনুষ্ঠান হইয়া গেল। সভা তেমন জমে নাই, বক্তৃতা শেষ হইবার আগে জোড়ে বৃষ্টি নামিয়া আসে। শান্তা বক্তৃতায় একেবারে অনভ্যস্ত, তবু জয়ন্তের আদেশে আজ ওকে কাগজে লেখা কতগুলি কথা সকলকে উপলক্ষ্য করিয়া পড়িয়া যাইতে হইল। ও যখন বক্তার আসন হইতে নামিয়া আসিল, ছুটিয়া আসিয়া জটাধর কহিল, আমি তো বলেছি দিদি, তোমরা একাই যে একশো। এমন সহজ কথায় সব লেখা, ওরা সবাই বুঝতে পেরেছে, কী ভক্তি যে ওদের হয়ে গেল সে তুমি জাননা। ভীড় ঠেলিয়া শান্তা ফাঁকা যায়গায় আসিয়া দাঁড়াইল. মুখ ওর ভয়ানক লাল হইয়া উঠিয়াছে। লণ্ঠন হাতে একটি ছেলে কাছে আসিতেই শান্তা কহিল, চলতো আমার সঙ্গে চন্দ্র সরকারের বাড়ি। ছেলেটি ছাতা মেলিয়া

ধরিয়া কহিল, আসুন। কে তখন বক্তৃতা সুরু করিয়াছিল, বৃষ্টিতে সব পণ্ড হইয়া গেল, সভার এইখানেই শেষ।

রাত্রি হয়ত অনেক। বনগাঁয়ের গৃহস্থ ঘরগুলার শুধু আলোই নিভে নাই, ক্ষুদ্র প্রাণটুকু অন্ধকারের আস্তরণে দেহ ঢাকিয়া নিঃসাড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। একমাত্র চন্দ্র সরকারের ঘরেই আলো জ্বলিতেছে, কথা বার্ত্তারও বিরাম নাই নূতন রং করা একটা ইজিচেয়ারে পরিশ্রান্ত দেহ নিয়া জয়ন্ত সিংহ পড়িয়া আছে। মনের শ্রান্তি তার কোন দিনই নাই ; তাই সারাদিনেয় পরিশ্রমের পর এই নিশীথ রাত্রিতেও প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তায় তার আগ্রহের সীমা নাই। মেঝের উপর একটা শত রঞ্জিতে বসিয়া আছে শান্তা চৌধুরী, প্রতুল নাগ, আর ধীরেন বাগ্‌চী। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা চলার পর শান্তা টাকায় ভর্ত্তি একটি থলে ওদের সম্মুখে রাখিয়া কহিল, আপাততঃ এই আমার সম্বল। আজ ঘরের সিন্ধুক খুলে রীতিমতো চুরি করতে হয়েছে। বাবার এক মেয়ে কিনা, আমার হাতে চাবিটা রেখে যেন তাদের অনেক তৃপ্তি। কথাটা কহিয়া ম্লান হাসে শান্তা। প্রতুল কহিল, তোমার যদি মনে অশান্তি আর উদ্বেগ জেগে থাকে শান্তা, ঘরের খেয়ে বনের মোষ তুমি তাড়িও না। শুনছি তোমার বিয়ের কথাবার্ত্তা চলছে, এসব ব্যাপারে প্রাণের যোগ না থাকলে এদিকে এসো না ও পথেই যেও, যেমন পাঁচজনে যায়। শান্তার মুখের উপর অকস্মাৎ কে যেন চাবুক মারিয়া গেল। চমকিত হইয়া ও জয়ন্তর মুখ পানে চাহিল, সে মুখে স্নিগ্ধ চন্দ্রলেখার মত একটু হাসির ঝিলিক, স্বল্পভাষিনী শান্তা মাথা নীচু করিয়া ভাবে এর চেয়ে মানে এই রকম কৃপার হাসির চেয়ে প্রতুলের সরল শাসন অনেক সহনীয়।

জয়ন্তর কণ্ঠস্বরে নূতন কথা। একটা সামান্য ব্যাপার উপলক্ষ্য করিয়া, জয়ন্ত সিংহ কহিল, শান্তাকে সড়িয়ে দেয়া মানে গাছে চড়ে পায়ের তলায় ডালটাকেই কেটে ফেলা। শান্তার আজ পর্য্যন্ত জেল খাটতে হয়নি বলে প্রতুলের যেন শান্তি নেই। সবাই কিছু আর জেলে যায় না, আর যায় না বলেই যে তারা দেশকে ভালোবাসেনা একথাও ঠিক নয়। জেলে না গিয়ে কাজ করে যাওয়া—সেটাই চাতুর্য্যের কথা। শান্তা সঙ্গোপনে থেকে এতকাল যে সাহায্য আমাদের করে এসেছে তার তুলনা কম। তার উপর আমাদের জোড় আছে, দাবী আছে, দেশের ছেলে শুধু আমরাই নয়, সেও তো এ দেশেরই মেয়ে।

লক্ষপতির ছেলে মেয়ে আমাদের দেশে আরো আছে, তাদের কাছে আজ একটি পয়সা গিয়ে আমরা চাইতে পারিনে, তারা যেন অনেক পর—বিদেশীর মত মনে হয়।

প্রতুলের মেজাজ শান্তার অজানা নয়। প্রতুলের বহু অপ্রিয় কথা বহুদিন নিঃশব্দে ও সহিয়া গিয়াছে। আজিকার এই আসন্ন বিদায় রাত্রিতেও প্রতুলের পরিবর্ত্তন নাই, আবাল্যের পরিচিত বলিয়া কি এমন করিয়া অপদস্থ করিতে আছে। বিশেষ ওই—নূতন সভ্য ধীরেন বাগচীর সম্মুখে। জয়ন্তর কথায় শান্তার বুকের ভিতরটা যেন জুড়াইয়া গেল, একটু গর্ব্ব মিশ্রিত দৃষ্টি লইয়াই ও প্রতুলের পানে চাহিল। হ্যারিকেনের ঘোলাটে আলোর মধ্যে প্রতুলের আনত

মুখে স্তব্ধ বেদনার কী সুস্পষ্ট প্রকাশ। এমন তো ছিল না, এ যে হইবার কথা নয়, প্রতুল সেতো চিরকাল অমন বলিয়াই আসিল,—শাসনের আভাষও তার উপর নূতন নয়—কিন্তু আজ অকস্মাৎ এতটুকু ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া প্রতুলের এ পরিবর্ত্তন সত্যই যে বিস্ময়কর। শান্তার সহিত প্রতুলের চোখা-চোখি হইল, বুকের ভিতরটা অকস্মাৎ ওর মোচড় খাইয়া টন্ টন্ করিয়া উঠিল, প্রতুল যে বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে। কিছুক্ষণ আগে জয়ন্তর উচ্চারিত প্রশংসাধ্বনিটুকু—গম্ভীর লজ্জায় শান্তাকে এতটুকু করিয়া দিল—তবু অভিমানও ঝাড়িতে পারে না,—নীরবে জয়ন্তর কথাটাকেই খুশী মনে গ্রহণ করার মত বসিয়া রহিল।

একটা অস্বস্তিকর মুহূর্ত্ত কাটিয়া গেল চন্দ্র সরকারের আবির্ভাবে। চন্দ্র সরকারের চেহারাটা মনে রাখিবার মত বটে। তৈল-মসৃণ অতি সুস্থ দেহ, বড় বেশী নিরীহ ধরণের চোখ মুখ। কোমরের গামছায় হাতের তেলো মুছিয়া সকলকে সে বিনীত আহ্বান করিল—মাষ্টারবাবু, রান্না একেবারে রেডী, বারান্দায় ঠাঁই করেছি। চকিতে আহারের জন্য সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল, উঠিল না কেবল শান্তা। এভাব লক্ষ্য করিয়া সরকার কহিল, উনি পরে বসলেই সুবিধে, সকলে আবার এক সঙ্গে বসে খেতে পারে না কি না। প্রতিবাদ করিয়া শান্তা কহিল, না-না—সেসব কিছু নয়, আমার মোটে ক্ষিদেই পায় নি সরকার মশাই। বিনা প্রতিবাদে সবাই চলিয়া গেল আহারে। অনুজ্জ্বল বাতিটার সম্মুখে বসিয়া শান্তা। এতক্ষণে নিজের মনটাকে নিয়া ও ভাবিবার সুযোগ পাইল যেন। অত্যন্ত সচেতন হইয়া তীব্র অভিযোগের বেদনা ওর সমস্ত মনটাকে তোলপাড় করিয়া দিল। এতদিন ওকি শুধু নামের জন্য বাহবার জন্য ওদের অর্থ যোগাইয়া আসিয়াছে নাকি! আর কি কিছু ছিল না? ছিল, আজও আছে—এ চিরকাল থাকিয়াই যাইবে, এ যে কাহাকেও বঝাইবার নয়। কী বুঝিবে অতি শিক্ষিত চিন্তাশীল জয়ন্ত সিংহ, কেন ধনী পিতার একমাত্র মেয়ে শান্তা চৌধুরী ওদের সুখ দুঃখে, ওদের ভাল মন্দে এমন করিয়া ছুটিয়া আসে। হইতে পারে ওর অর্থদান, ওর আকুল চিন্তা ব্যক্তি বিশেষকে কেন্দ্র করিয়া সঙ্কীর্ণ মনোভাবের পরিচয়, কিন্তু বিশ্বাস করে শান্তা, এ সঙ্কীর্ণতা বৃহৎ উদ্দেশ্যর কল্যাণকে কখনও পরিম্লান করিয়া দিবে না। সূর্য্যের প্রখর আলোর নীচে ওর আকুল অনুরাগ কুঁড়ির ভিতরে অসূর্য্যাম্পশ্যরূপা গন্ধটুকুর মতই, ইহা লোক চক্ষুর অন্তরাল হইয়াই থাকিবে।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জয়ন্ত ওকে বিবর্ণ-শুষ্ক করিয়া না দেয় এই ওর মস্ত আশঙ্কা। তা নইলে কেন কথায় কথায় ওকে দাতার আসনে বসাইয়া বাহবা দিয়া জয়ন্ত ওকে ছোট করিতে যায়? আজও জানিল না সে শান্তাকে—হয়ত জানিবার প্রয়োজন নাই। সে শুধু জানে কাজ আদায় করিতে, ইহাতে কাহারও যদি প্রাণান্ত ঘটে তবু ইহার পরিবর্ত্তন নাই—আশ্চর্য্য। তা নইলে কেন শান্তার বিবাহ সম্বন্ধে কোন কথা উঠিলে সে এতটুকু অমতও প্রকাশ করে না? শান্তাকে সে আর পাঁচজনের সামিলই জ্ঞান করে, কেন শান্তার উপর অর্থের দাবী আছে—আর কিছু নয়! শান্তা সহিতে পারে না, এ বেদনা এ অপমান শেষ পর্য্যন্ত ওকে বিকৃত করিয়া দিবে, হয়ত সেদিনই হইবে

জয়ন্তর চৈতন্য, যখন সময় আর থাকিবে না। শান্তার উত্তেজিত মন তিক্ত-রুক্ষতায় দপ্ দপ্ করিতে থাকে।

হাত মুখ মুছিতে মুছিতে ওরা ঘরে প্রবেশ করিল, আহার শেষ হইয়াছে। কয়েকটা লবঙ্গ মুখে ফেলিয়া দিয়া জয়ন্ত কহিল, এ রাতের মধ্যেই তোমাদের খাল পাড়ি দেওয়া উচিত প্রতুল। আমি চাইনে আর এ ভাবে থাকতে। পশুর মধ্যেই সদরে গিয়ে তোমরা হাজির হবে তাহলে মিথ্যা চাজ্জসিট্ দাখিল করার সম্ভাবনা থাকবে না, আর অনিল নিখিলদের পক্ষেও সুবিধে হবে। যাবার মুহূর্ত্তে প্রতুল কহিল যেখানে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছি—দুদিন আগে পরে হলেও জয়ন্তদাকে সেখানে দেখতে পাব আশা করছি। কিন্তু তোমার সঙ্গে দেখা আর নাও হতে পারে শান্তা। রাগ করে অমন আমি কত কথাই বলে থাকি, আর খুব ছোট বেলা থেকে তোমার সঙ্গে পরিচয় তাই হয়ত মুখে কিছু আটকায় না। এই তো বনগাঁয়ে চলে আসার আগের দিনও মার সঙ্গে কী রাগা রাগি। আজ মনে হচ্চে পুলিশের হাত থেকে যদি বা কোন দিন ফিরে আসি মা সেদিন নাও বেঁচে থাকতে পারেন।

শান্তার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠে। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বকার উত্তপ্ত মনটা বেদনায় আর্দ্র হইয়া গেল। ব্যথিত দৃষ্টি মেলিয়া প্রতুলের পানে চাহিয়া কহিল, তোমার মেজাজ আমার অজানা নয় প্রতুল। তবে বড্ড কষ্ট হয় ভাবলে যে তোমরা মেয়েদের মনের বিচার করোনা, হয়ত তোমাদের সময় নেই সে বিচারের। তবে মেয়েদের ছাড়া যখন তোমাদের চলছেনা, তাদের মনের দিকও একটু দেখতে হবে বৈকি !

স্বল্পভাষিণী শান্তা অমন করিয়া শান্ত অভিযোগ করিয়া বসিবে, প্রতুলের জানা ছিল না, মাথা নীচু করিয়া সে ভাবিতে লাগিল। জবাব দিল জয়ন্ত।—ছেলেরা সব ব্যাপারেই, নিশ্চিন্ত সুরে জয়ন্ত বলে, মেয়েদের তুলনায় কম বেশী অসংযমী শান্তা। তাই যত রাগ যত হুমকী ঝড় ঝাপটা তারা অনায়াসে তোমাদের উপর চাপিয়ে নিশ্চিন্ত। তোমরা সয়ে যাও, আবার স্নেহের শাসনে শোধরাবার ভারও কিন্তু তোমাদেরই হাতে——তাই তো তোমরা মা, যার তুলনা অতুল। এইতো প্রতুলের ব্যবহারে তুমি না খেয়ে রইলে, পারলুমনা আমরা জোর করে তোমাকে খাওয়াতে, মানে এই দিক দিয়ে আমরা ভয়ানক আনাড়ি। অথচ প্রতুল যদি আজ বুদ্ধি করে তোমাকে অনুসরণ করতো, তাহলে শুধু প্রতুলেরই নয় তোমারও খাওয়া হতো। কারণ অভুক্ত প্রতুলের পানে চেয়ে অক্ষুধায়ও ক্ষুধাবোধ তোমার একটু হতোই। আর এই খানেই তোমাদের মানে মেয়েদের বিশেষত্ব শান্তা।

এত দুঃখের মধ্যেও শান্তা এবার হাসিয়া ফেলিল। বিমর্ষ প্রতুলের অবনত মুখের উপরও হঠাৎ হাসি খেলিয়া গেল।

—ওঃ কথাও জানেন আপনারা, তরলকণ্ঠে শান্তা কহিল, কথাতো নয় রঙীন আতসবাজি। রীতিমতো চোক কাণ ধাঁধিয়ে দেয়। আর সবাইও যদি আপনার মত 'মিষ্টিমুখো' হতো তাহলে

নারীসঙ্ঘের কাজ কিন্তু আরও দ্রুত এগিয়ে যেত। এমন কি অভয়াদি উৎপল্লা সোমের মত ব্যক্তিদেরও সম্মোহন করা চলতো, বলিয়া জোরে শান্তা হাসিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বের গুমোট অন্ধকার এই হাসিটুকুর সহজ সরলতায় বিমল শান্তিতে ঢাকা পড়িয়া গেল। সরল কুণ্ঠাহীন চোখ তুলিয়া মৃদু হাসি মুখে প্রতুল কহিল, আমাদের যাবার মুহূর্ত্তে তুমি উপবাসী রইলে শান্তা, আমাদের যদি কোন অকল্যাণ ঘটে সেদিন—

—না—না, ব্যগ্র ব্যাকুল স্বরে শান্তা বলে ওসব উচ্চারণ করতে নেই প্রতুল। এই তো এক্ষুণে আমি খেতে বস্‌ছি ভাই। প্রতুল জবাব দিয়া দুষ্টামির হাসি হাসে, তার স্বভাবই এমন। অন্ধকার বারান্দাটার উপর গিয়া সকলে দাঁড়াইল, প্রতুলেরা বিদায় নিয়া পথে নামিল, নিতান্ত ছেলে মানুষ ধীরেন টর্চ্চ হাতে নিঃশব্দে চলিতে থাকে।

ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া ওদের পরিত্যক্ত শতরঞ্জিটার উপর বসিয়া পড়িল শান্তা আর জয়ন্ত।

একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া শান্তার মুখ পানে চাহিয়া জয়ন্ত কহিল, মজাই হলো, তোমাদের নারী সঙ্ঘের কেউ কিন্তু আজ এলনা বনগাঁয়ে, অথচ সবাইর আশা করেই তো তুমি এসেছিলে নয়?

—আপনি বরাবরই আমায় ওই রকম ভেবে এলেন, নিঃশ্বাস চাপিয়া শান্তা কহিল, অথচ একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারেন পাঁচজনের দেখাদেখি অথবা হুজুগে মেতে কিছু করতে যাওয়া আমার স্বভাব নয়।

ক্লান্ত হাসি হাসে জয়ন্ত। তুমি যে আর সবাইর মত নয় শান্তা, গাঢ়স্বরে জয়ন্ত বলে, তোমার দেওয়া টাকা পয়সা দিয়ে কত দুঃসাধ্য কাজ সফল করেছি শান্তা—ফিরে এসেও যেন তোমাকে বর্ত্তমানের মত উদার ও দয়ালু দেখতে পাই।

শান্তার দুই চোখ অকস্মাৎ অশ্রুভারে টলমল করিয়া উঠিল, কতক্ষণ ও জবাব দিতে পারিল না, কারণ জয়ন্তর মুখ হইতে এ ধারার কথা আজই নূতন, হঠাৎ যেন বিশ্বাস করিতে কেমন লাগে। মাটির উপর দুই চোখের দৃষ্টি নত করিয়া ভারাক্রান্তস্বরে শান্তা কহিল, চিরকাল কারুর মনের গতি এক থাকে না, পরিবর্ত্তন যখন তখন হতে পারে—

অতি বিস্ময়ে যেন জয়ন্ত চমকিয়া উঠিয়া বলে, সেকি শান্তা—কী এমন পরিবর্ত্তন হতে পারে যে তোমার সহযোগিতা—ওঃ বিয়ের ব্যাপার হয় তো, তা হলোইবা, তাতে আমাদের ক্ষতি নেই, আমরা তোমার আজগের মনটা পেলেই—'

—তা হয় না,—কোন দিন হতে পারে না। জল ভরা চোখ তুলিয়া শান্তা জয়ন্তর মুখ পানে চাহিয়া কহিল, বিবাহ ছেলে খেলা নয়, যাকে আমি স্বামী বলে গ্রহণ করবো, তার মতামত তার ভালো মন্দ সেইটেই বড়ো করে দেখতে হবে প্রথম, কাউকে সাহায্য করা না করা সেটা শুধু আমারই নয় তার ইচ্ছারও একটা মূল্য থাকবে।

জয়ন্ত মৌন হইয়া রহিল, গম্ভীর ম্লান মুখ। ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তুমি এতটা ভেবে রেখেছো শান্তা আমি জানতেম না। যাক্, তবে আমাকে ভুল বুঝনা—

—আপনিই আমার সম্বন্ধে মারাত্মক ভুল করছেন, আপনাকে আমি ঠিকই বুঝেছি।

হাসিবার চেষ্টা করিয়া জয়ন্ত বলে, হবেও বা। তবু যেন বিশ্বাস করতে পারছিনে যে শান্তা চৌধুরী বিয়েই করুক যা-ই করুক,—তার ব্যক্তিত্বের বিসর্জ্জন সে দেবে।

শান্তা করুণ হাসিয়া বলে, কারুর সম্বন্ধেই কিছু জোর দিয়ে বলা চলে না।

আমার কিন্তু সে বিশ্বাসই ছিল শান্তা, জয়ন্ত কহিল, শান্তা শ্লেষের সুরে কহিল, হাঁ, সে শুধু আমার টাকা দেওয়া সম্বন্ধে, আর কিছুতেই নয়।

জয়ন্ত এইবার হাসিয়া উঠিল। ওঃ বুঝতেই পারিনি এতক্ষণ, প্রসন্ন কণ্ঠে জয়ন্ত বলে, তুমি রাগ করেছো শান্তা? কেন বলতো?

—কৈ রাগতো করিনি, মনে দুঃখ হয়েছিল। ওঃ—এই? জয়ন্ত স্নিগ্ধ হাসি হাসিয়া বলে, ছেলেরা ভয়ানক অবুঝ শান্তা, তারা কেবল আঘাতই দেয়, কিন্তু তুমি জাননা জয়ন্ত সিংহ শান্তাকে ভয়ানক ভালোবাসে। সে বিয়ে করে সুখে থাক এ আশীর্ব্বাদই জয়ন্ত করে। তুমি কি বুঝতে পারনা শান্তা,—

—আপনি কি ভাতই খাবেন? সরকার আসিয়া দুয়ার সম্মুখে দাঁড়াইল। শান্তা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, ভাত নয়, শুধু একটু চা। ব্যস্ত হইয়া চন্দ্র সরকার বলে এইখানেই নিয়ে আস্‌ছি। শান্তা বাধা দিয়া বলে, না—না দরকার নেই আমিই আসছি বলিয়া সরকারের অনুগমন করে। শান্তা যখন চা পান করিয়া ফিরিয়া আসিল, জয়ন্ত তখন রওনা হইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ঘরময় পায়চারি করিয়া ফিরিতেছে।

জয়ন্ত কহিল, রাত কিন্তু আর খুব বেশী নেই শান্তা। ভোরের মধ্যেই তোমাকে রাম-সোনাপুর পৌঁছে দিতে চাই, তবেই আমার ছুটি। সত্যি হাসিও পায় দুঃখও লাগে, আগামীকাল তোমার মা বাবার কাছে গিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কত কথাই তো বলতে হবে। রামসোনাপুরে মাসী বাড়ি বেড়াতে এলে, সেখান থেকে বনগাঁয়ে গেলে থিয়েটার দেখ্‌তে, বৃষ্টির জন্য থিয়েটার গেল ভেঙ্গে, তবু বন্যাপীড়িতদের জন্যে সাহায্য রজনী,—বন্ধুবান্ধবীদের অনুরোধ...এসব শুনে তোমার বাবা কিন্তু সত্যিই চুপ করে থাকবেন না?

হাসিবার চেষ্টা করিয়া শান্তা কহিল, আপনাদের কাছেই তো জেনেছি, দেশের কল্যাণের জন্যে আমরা যা কিছু করছি বা ভবিষ্যতে করতে হবে—তাতে অধর্ম্ম বা অন্যায় বলে কিছু নেই, দেশকে বাঁচিয়ে রাখাই ধর্ম্ম—

জয়ন্ত হাসিয়া কহিল, এইতো কথার মত কথা। এই যে সরকার, আমাদের সময় কিন্তু হয়ে এল, নৌকো ঠিক আছে তো?

সরকার আসিয়া কাছে দাঁড়াইল, শান্তার দেওয়া টাকা হইতে কিছু লইয়া জয়ন্ত চন্দ্র

সরকারের হাতে গুজিয়া দিল। এবার সরকারের নিরীহ মুখ করুণ বিষণ্ণতায় ভরিয়া গেল। ভূমিতে কপাল ঠুকিয়া প্রণাম করিয়া সে হয়ত অনেক কথাই কহিত, কিন্তু জয়ন্ত তাকে এতটুকু সুযোগও যে দিল না! ছোট একটা পুঁটুলী বাঁধিতে বাঁধিতে জয়ন্ত কহিল, আবার ভবিষ্যতে দেখা হবার আশা রাখি সরকার। এইখানে এই রকম মন নিয়ে তুমি বেঁচে থাকলে অনেকে বেঁচে যাবে। তোমার দোকানখানার দীর্ঘায়ু কামনা করি। জয়ন্ত ঘর ছাড়িবার সময় দেখিল সরকার গামছার প্রান্তে চোখের জল মুছিতেছে।—রাত এখন কত? জুতা পরিতে পরিতে শান্তা জিজ্ঞাসা করে। জয়ন্ত কহিল—তিনটে।

নৌকায় গিয়া দুই জনে উঠিয়া বসিল, জয়ন্ত আর শান্তা। পারে বিদায় দিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে চন্দ্র সরকার, হাতের লণ্ঠনটায় পুরু কালী পড়িয়া বাদামী ঘোলাটে আলোর বিবর্ণ দেখাইতেছে। আকাশে তারা আছে, মেঘও আছে, চাঁদের বৈশিষ্ট্য নাই—ধূসর মেঘে ভাঙ্গা ভাঙ্গা। নিদ্রিত জলরাশি অকস্মাৎ লগির আঘাতে ছলাৎ ছল্ শব্দে সাড়া দিয়া উঠিল। জয়ন্ত সিংহ তখন নৌকা ছাড়িয়া দিয়াছে।

রামসোনাপুর—শ্রমিকেরা কাজের শেষে ঘরে ফিরিয়াছে, তাই ওদের বস্তী অঞ্চলটা কলরব কোলাহলে পরিপূর্ণ। সন্ধ্যার শেষে রাত্রি নামিয়া আসিল। কানাই সর্দ্দার একটা হ্যারিকেন জ্বালাইয়া হলুদ কাগজে মলাট দেওয়া একখানা বই খুলিয়া বসিল। সম্মুখে বসিয়া জটাধর এবং আরও দুই চারিজন ঠাশাঠাশি আড়াআড়ি হইয়া কানাইয়ের ঘরের সঙ্কীর্ণ স্থানটুকু ভরিয়া ফেলিয়াছে। হউক বইর কথাগুলো সত্য এবং শুনিবার মতই উপযুক্ত, তথাপি ভরসা করিয়া আরও পাঁচজনকে ওরা এ ঘরের মধ্যে টানিয়া আনে না। কেবল বক্তৃতা শুনিয়া যাহারা আরও কিছু নূতন তথ্য জানিতে ব্যাকুল, কানাই তাহাদের কেন্দ্র করিয়াই বই পড়িয়া শুনায়। নেশা খোরের মত মদের আশায় প্রতিদিন তারা এস্থানে হাজিরা দিবেই। যারা এখানে আসে না তারাও নেশা খোর; ধেনো মদের নেশায় কেহ বিহ্বল কেহ উগ্র হইয়া ঘরে ফিরে। ছেলের কান্না স্ত্রীর বকাবকির মধ্যে একমুঠা উদারন্নে ওরা তিক্ত-অভ্যস্ত। ওরা যখন অসহ্য বোধ করে সম্মুখস্থ ছেলে-মেয়ে টান মারিয়া বাইরের উঠানে ফেলিয়া দেয়, স্ত্রীর জীর্ণ দেহের উপর কীল ঘুসি মারিয়া ছিন্ন মলিন শয্যায় গিয়া নিদ্রা দেয়। ওরা জানেনা কল্যাণ এবং শান্তির চাবি কাঠি ওদেরই হাতে; আর জানেনা বলিয়াই তো হাহাকারের বেদনা দিনের পর দিন এমন পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিতেছে।

জলচৌকীর উপরে রাখা হ্যারিকেন লণ্ঠনটার পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল কানাই সর্দ্দার, কোলের উপর খোলা বই পড়িয়া আছে। ঘরের মধ্যে কাহারও মুখে কথা নাই, সকলেই স্তব্ধ বিষণ্ণ। সহর হইতে এইতো কিছুক্ষণ আগে জটাধর খবর নিয়া আসিয়াছে, খবর ভাল নয়। প্রায় দুইমাস জেল হাজতে বিচারাধীন থাকিবার পর আজ বিচারের রায় বাহির হইয়াছে। মাষ্টারেরা কেহই মুক্তি পাইয়া ঘরে ফিরিতে পারিল না। কেবল কিছু সময়ের জন্য ছাড়া পাইয়াছিল নিখিল বসু আর ধীরেন বাগচী। কিন্তু নূতন একটা আইনের কথা জানাইয়া তাহাদের পুনরায় জেলের

গাড়ীতেই তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাহারও সঙ্গেই জটাধরের দেখা হয় নাই, সকল বিবরণ সে শাস্তার কাছ হইতে শুনিয়া আসিয়াছে।

মানুষের স্বাভাবিক বিচার বোধ নিয়া ওরা, মানে ঘরের মধ্যকার অশিক্ষিত দীন মজুরেরা প্রথমতঃ অভিভূত পরে উত্তেজিত হইয়া নিজেদের মনের কাছে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কেন—কেন এমন হইল, কী করিয়াছে তাহারা? পশু আর মানুষ এক নয়, মানুষ—মানুষই; আর মানুষ বলিয়াই মানুষের মত বাঁচিতে হইবে--এত বড় সত্য এবং ন্যায়ের কথা তাহারাই যে জানাইয়া দিয়া গিয়াছে,—তবে এত বড় শাস্তি কেন হইল তাদের? বিশেষ ওই জয়ন্তমাষ্টার—সাধারণ কয়েদীর মত নাকি চলিবে তার জীবন যাত্রা। অথচ সে যে আপন ভাণ্ডার শূন্য করিয়া দুঃখীদের খালি দিয়াই গেল, অপহরণের কলঙ্ক তো তার নাই!

ঠোঁটের উপর দাঁত চাপিয়া বসিয়াছিল জটাধর। কপালের শিরাগুলা ওর ফুলিয়া উঠিয়াছে অস্বাভাবিক ভাবে। চাপা ক্রুদ্ধস্বরেও কহিল, ভগবান ভগবান করে তো এ্যাদ্দিন কাটালে সর্দ্দার, কী ফয়দা করে দিলে তোমার ভগবান? মাটির সঙ্গে তো গুষ্টিশুদ্ধ সেদিয়ে চলেছি সব. আজ এই যে সব দুঃখী লোকের দেবতাদের বেঁধে নিয়ে গেল—

অর্জ্জুন আর সহিতে পারে না। উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ওর জটাধরকে ছাড়াইয়া ওঠে। আমরা মানে এই মজুরেরা সব দলবদ্ধ হয়ে হঠাৎ একরাতে গিয়ে পারিনে কি প্রতিশোধ তুলে তাদের সব ছিনিয়ে আনতে?

শীর্ণ হাত দুখানি উঁচু করিয়া নিষেধের ভঙ্গীতে কানাই চাহিল উহাদের পানে। শ্রান্ত সংযত কণ্ঠে কানাই কহিল, তোদের বলবারইবা দোষ দেব কি, জীবনে শিক্ষা দীক্ষা তো পাস্‌নি, তবু এইটুকু তো বুঝতে পারিস যে তোরা পশু নস্ যে একরত্তি খাবারের জন্যে '—' রক্তারক্তি করে সে সময়ের জন্যে পেটটা ভর্ত্তি করে নিশ্চিন্ত হতে পারলি। গায়ের জোরে কিছু হয়নারে, ওটা সাময়িক উত্তেজনা। চাই মনের শক্তি আর একাগ্র নিষ্ঠা। আমাদের দুঃখ দৈন্য একদিনে বা এক মুহূর্ত্তে সৃষ্টি হয়নি—বহুকাল থেকে বেড়ে বেড়েই চলেছে; কাজেই এসবের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে রীতিমত কঠোর সংগ্রাম করতে হবে মন আর বুদ্ধির সাহায্যে।

আজ সর্দ্দারের কথায় কেহ আর প্রতিবাদ করিল না। একটা গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া জটাধর কহিল, তুমি পড়তে সুরু করো সর্দ্দার। কানাই পড়া সুরু করিল, কিন্তু নিত্যকার কণ্ঠস্বর আজ অবরুদ্ধ বেদনায় ভারাক্রান্ত। হেতুটা সকলেই বুঝিল, তবু 'আজ তবে থাক্' একথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হইল না।

আশ্চর্য্য যদিও, তবু এমনই বুঝি হয়। নারী সঙ্ঘে একদিন পুলিশ দিল হানা। দুই চারিজন সভ্যাকে সাময়িক ভাবে থানায় হাজির করাইয়া জবানবন্দী লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইল। সঙ্ঘ উঠিল, দল ভাঙ্গিল। পুলিশ সাহেব অভিভাবকদের ডাকাইয়া রীতিমত শাসাইয়া দিলেন মেয়েদের যেন যত শীঘ্র সম্ভব বিবাহ দেওয়া হয়। অভিভাবকেরা জবাবে জানাইল টাকা কোথায়।

সাহেব সে কথার জবাব দিলেন না। কিন্তু সুফল ফলিতে সুরু করিল। সঙ্গতিপন্ন অভিভাবকেরা সন্ত্রস্ত হইয়া বিবাহের যেন একটা এপিডেমিক লাগাইয়া দিল, ইহাদের মধ্যে শান্তা চৌধুরীর পিতাও একজন। এ সময়ে শান্তার বিবাহ ব্যাপারটা বিস্ময়ের হইলেও স্বাভাবিক, কারণ শান্তার সুপ্ত অভিমান তাকে প্রত্যাঘাতী করিয়া তুলিল। শান্তার জীবনে বিবাহটা আকস্মিক কিন্তু তার অসম্মতিতে হয় নাই। এই সম্মতির মূলে ছিল ওর সুপ্ত অভিমান ; আর এই সর্ব্বনাশা অভিমানই ওকে ওর জীবনের মস্ত সঙ্কল্প হইতে টানিয়া ফেলিয়া দিল। ঐশ্বর্য্যবান স্বামীগৃহে ওর দিন কাটিতে লাগিল নির্ব্বিঘ্ন নিশ্চিন্তে। ও সুখী, সর্ব্বতোভাবে সুখী, এই বার্ত্তাটুকু জয়ন্তর কাণে পৌছাইবার জন্য ওর একটা নিষ্ঠুর জেদ চাপিয়া গেল। দিনের পর দিন গেল, জয়ন্ত সম্বন্ধে কোন খবরা-খবরই ওর কাণে আসিলনা। অবশেষে ওর উষ্ণ জেদী মনটা ক্রমশঃ শীতল হইয়া বর্ত্তমান জীবন যাত্রার মধ্যে মিশ খাইয়া গেল। সভা, সমিতি, চাঁদা সংগ্রহ, বনভোজনের অছিলায় গ্রামান্তরে যাওয়া, কর্ম্মের কী বহুমুখী প্রেরণা.,....আজ একখানা বিচিত্র রঙীন্ আচ্ছাদনে যেন ঢাকা পড়িয়া গেছে। তবু মাঝে মাঝে সংবাদ পত্র পড়িবার সময় ঘটনা বিশেষের উপর চোখের দৃষ্টি ওর স্থির হইয়া থাকে, আর সেই মুহূর্ত্তে অতি অনায়াসে কাহারা যেন রঙীন্ আচ্ছাদনটা টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে চায়। উষ্ণ উত্তেজনায় শিরা উপশিরা ওর ঝিম্ ঝিম্ করিয়া উঠে, অবশেষে সংবাদ পত্র পড়াও ছাড়িয়া দিল। বিগত দিনের কোন কিছুর অস্তিত্বই আজ ও মনে রাখিতে চায় না, তাই সম্পূর্ণ অভিজাত মনোবৃত্তি সম্পন্ন স্বামীর হাতে নিজের ব্যক্তিত্বের বিসর্জ্জন দিয়া দিল। সিনেমা, লেক, টিপার্টি, ছুটির দিনে শৈলবিহার ওর মধ্যে অনাস্বাদিত নূতন অনুভূতি আনিয়া দিল। এমনি করিয়া একদিন নয়, দুই দিন নয় - সুদীর্ঘ সাতটি বৎসর স্বপ্নের মত কাটিয়া গেল। শান্তার জীবনে ইহা স্বপ্নছাড়া আর কি! নতুবা এমন করিয়া সেদিন সে চমকিয়া হাসিয়া উঠিল কেন।

তীব্র হুচোট্ খাইয়া যেন শান্তা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, তুমি—তুমি এখানে—তুমি কি ধীরেন নও?

অপরাহ্নের লাল আলো আসিয়া পড়িয়াছে শান্তার ড্রইং রুমের সজ্জিত আসবাব পত্রে, দরজার বিচিত্র পর্দ্দায় ; ওই পর্দ্দারই প্রান্ত ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল একটি যুবক। ছিপছিপে ছেলেটির কিশোর বয়সের কচি লাবণ্য আজ আর নাই, চোখে মুখে গাম্ভীর্য্যের গাঢ়তা, হঠাৎ চিনিতে কষ্ট হয় তবু নিঃসন্দেহে শান্তা বুঝিল এ ধীরেন বাগ্‌চী।

শান্তার বিস্মিত মুখের পানে চাহিয়া মৃদু হাসিমুখে ধীরেন কহিল, ভয়ানক মোটা হয়ে পড়েছি নয়? তবু যে চিনতে পেরেছেন—বলিয়া সন্মুখস্থ সোফার উপর গিয়া বসিল। সেটা কিছু আশ্চর্য্য নয় ধীরেন, শান্তা কহিল, আশ্চর্য্য এই যে তুমি কলকাতায় এসে কী করে আমায় খুঁজে বার করলে। আজ সাত বছর বাপের বাড়ী ছেড়ে এসেছি, এ ঠিকানা তো তোমার জানবার কথা নয়।

ধীরেন হাসিল। শেষে কহিল, এতো পুলিশের পলাতক আসামীকে খোঁজা নয় যে হয়রাণ হতে হবে। গিয়েছিলেম গত পর্শু রামসোনাপুর আর বনগাঁ পুরানো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে, কানাই সর্দ্দার দিলে আপনার ঠিকানা। চারিদিকেই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখছি। অপরিসীম লজ্জায় যেন শান্তার চোখ মুখ উষ্ণতায় ঝাঁ ঝাঁ করিয়া উঠিল। বনগাঁ আর রামসোনাপুর—এ দুটি নাম বড় বেদনায় শান্তাকে অভিভূত করিয়া আনিল। অকস্মাৎ রং করা বর্ত্তমানের ছবিখানা খসিয়া পড়িল, বিগতদিনের বিসর্জ্জিত সাধনার মূর্ত্তি কাঙ্গালের বেশে আসিয়া ওকে আৎকাইয়া দিল। ব্যগ্র ব্যাকুল হইয়া কহিয়া উঠিল শান্তা, আর সব—আমাদের আর সব গেল কোথায় ধীরেন? কানাই সর্দ্দার আজও বেঁচে? কোথায় আছে জটাধর? আমি—আমি কারুর সম্বন্ধেই যে কিছু জানিনে! নতমুখে দামী কার্পেটের উপর দৃষ্টি রাখিয়া ধীরেন কহিল, আপনি ইচ্ছে করলে সবই জানতে পারতেন, আমাদের অবর্ত্তমানে কী না করতে পারতেন আপনি? কানাই মৃত্যু শয্যায় শুয়ে, হাতের পয়সা গেছে ফুরিয়ে, পথ্যের কী অভাব। জটাধর দাঙ্গা হাঙ্গামায় জড়িত হয়ে জেলে গিয়ে পচে মরছে, ওকে শাসন করবার কেউ ছিল না, অথচ আপনি একাই এই দূরে থেকেও ওদের অনেক করতে পারতেন, যদি আপনার ইচ্ছে থাকতো। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শান্তার ভাঙ্গিয়া পড়ে—তুমি কী বুঝবে ধীরেন, তোমাকে এসব বোঝানো যায়না,—আমি ইচ্ছে করে নিষ্ঠুরের মত সকল কাজ থেকে কেন পালিয়ে এলাম! আসবেন যেদিন তোমাদের জয়ন্ত মাষ্টার, সেদিন তাঁকে বোঝাতে হবেনা, তিনি আমার পানে চেয়ে তখনই বুঝবেন কী তাঁর ছিল আর কী হলো। আর প্রতুল,—হাঁ সেও এসে দেখতে পাবে দাতা কর্ণ সেজে তাদের পথ পানে চেয়ে কেউ বসে নেই।

স্তব্ধ বিস্ময়ে নির্ব্বাক ধীরেন শুধু চাহিয়াই রহিল জবাব দিতে পারিলনা। ঠোঁটের কোণে নিষ্ঠুর হাসি টানিয়া শান্তা কহিল—কবে আসছে তারা?

ধীরেন যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। যাক্ এবার তবে কথা বলা চলবে। আলোর স্যুইচ্ টিপিয়া দিয়া শান্তা নিজের আসনে ফিরিয়া গেল, দেহ ঘেরিয়া ঐশ্বর্য্যের কী সুস্পষ্ট প্রকাশ, বিদ্যুৎ আলোকে ধীরেনের দুই চক্ষু যেন ধাঁধাইয়া দিল। ধীরেন বলিল নিখিল বসু আর অনিল মিত্র ছাড়া পাবে বোধহয় দুচার মাসের মধ্যেই। আর জয়ন্তদা, তিনি তো এখন ভারতে নেই, আন্দামানে। তাঁর থাইসিস—শুনেছি শেষ অবস্থা। আর প্রতুল—তার খবর তো দুমাস আগে খবরের কাগজেই জেনেছেন।

বিতাড়িত কাঙ্গালের মত শান্তা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—আমার তো খবরের কাগজ আসেনা ধীরেন।

বিমূঢ় হইয়া ধীরেন কহিল, আপনার কথার মানেই বুঝতে পারছিনে আমি। কেন শুনেননি ক্যাম্পে থাকতেই প্রতুলের মাথা কেমন খারাপ মতো হয়ে যায়। অবশেষে বাংলা-

দেশের বাইরের ক্যাম্পে ওকে ট্রান্সফার করা হয়, কী যে ওর খেয়াল চাপলো, একদিন সবাইর অজ্ঞাতে 'স্যুইসাইড' করে বস্‌লো।

এ কাহিনীর এইখানেই শেষ হওয়া উচিত ছিল কারণ ধীরেন বিদায় নমস্কার সারিয়া বাহির হইয়া গেছে, আর শান্তা শূন্য ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া আকুল হইয়া কাঁদিয়া মরিতেছে। কিন্তু সময় বিশেষে এমনই এক একটা ঘটনা ঘটে যে তার একটু জের না টানিয়া আর উপায় থাকে না। ঘন ঘন টেলিফোন বাজিতে লাগিল, স্খলিত পদে অগ্রসর হইয়া কম্পিত হাতখানি বাড়াইয়া শান্তা রীসিভার তুলিয়া লয়। মেট্রো সিনেমা হল হইতে ওর স্বামী জানাইতেছে— এইমাত্র বন্ধুবান্ধবের অনুরোধে পড়িয়া তাকে সিনেমায় যাইতে হইয়াছে। খুব ভাল ছবি, শান্তা যেন এখনই সোফারকে নিয়া রওনা হইয়া পড়ে, শান্তা ব্যতীত তার ছবি দেখা নিরর্থক।

জাতীয় পরিকল্পনায় নারীর স্থান

প্রভা দত্ত

ভবিষ্যৎ-সমাজ-গঠনে নারীর স্থান সম্বন্ধে National Planning Committee-র questionare বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। জানি বিষয়টি অত্যন্ত দুরূহ এবং আমাদের মত সাধারণ লোকের পক্ষে ইহার আলোচনা করা দুঃসাহসের কাজ। তবু এরূপ প্রয়োজনীয় বিষয়ে নারী হিসাবে মত প্রকাশ করিবার অধিকার আমাদের আছে, এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া লিখিতেছি।

প্রশ্নগুলিকে সাতটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। প্রথম ভাগের প্রশ্নের বিষয়—নারীর আর্থিক, সামাজিক ও আইনগত অধিকার।

প্রথম ভাগ

আমাদের বাংলাদেশে হিন্দুসমাজে দায়ভাগ আইন প্রচলিত। ইহা অনুসারে নারীরা নিজের অধিকারে সম্পত্তির ভোগদখল করিতে, উত্তরাধিকার লাভ করিতে বা দান-বিক্রয় করিতে পারে না। কন্যা হিসাবে নারীর পিতৃ-সম্পত্তিতে কোনই অধিকার নাই, তবে যদি একান্নবর্ত্তী পরিবার না হয় এবং পিতার পুত্রসন্তান না থাকে, কন্যা সম্পত্তি পায় বটে তাও নিরঙ্কুশ ভাবে নহে। কন্যার পুত্রসন্তান না থাকিলে সে শুধু যাবজ্জীবন সম্পত্তি ভোগ দখল করিতে পারে, দান-বিক্রয়ের অধিকারী হয় না। পত্নী হিসাবে নারী স্বামীর সম্পত্তি লাভ করে শুধু নাবালক সন্তানের অভিভাবকরূপে। পুত্র সাবালক হইলে সেই সম্পত্তি পায়, নারীর ভরণপোষণের দাবী ছাড়া আর কিছুই প্রাপ্য থাকে না। পত্নী নিঃসন্তান হইলে যাবজ্জীবন শুধু স্বামীর সম্পত্তির ভোগ-দখল করিতে পারে, দান-বিক্রয়ের অধিকারী হয় না। মাতা হিসাবেও নারী ভরণপোষণের অধিক পুত্রের নিকট দাবী করিতে পারে না।

এত সব বিধিনিষেধের বেড়া ডিঙ্গাইয়া যেখানে বা নারী সম্পত্তি লাভ করে, তাহাও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নামে মাত্র পর্য্যবসিত হয়। অশিক্ষিতা ও সংসার-জ্ঞান-হীনা নারীর সম্পত্তি চালাইবার যোগ্যতা থাকে না। প্রায়ই কোন আত্মীয় পুরুষের হস্তে সম্পত্তির ভার ন্যস্ত থাকে। কার্য্যতঃ সেই পুরুষই নিজের ইচ্ছামত সব চালনা করে এবং "ভক্ষক" হইয়া দাঁড়ায়।

নারীকে সম্পত্তিতে আইনতঃ অধিকার দিবার জন্য দেশে কিছু কিছু আন্দোলন হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও এরূপ কোন আইন বা প্রথা গড়িয়া উঠে নাই। এরূপ আইন ও প্রথা না থাকিলে নারীর স্বাধীনতা-লাভ অসম্ভব।

এতদিন আমাদের ভদ্রঘরের হিন্দুসমাজের মেয়েরা গৃহেই আবদ্ধ রহিয়াছে এবং গৃহকর্ম্মে

আত্ম-নিয়োজন করিয়াছে। আজকাল অনেকেই বাহিরে অর্থোপার্জ্জন করিতেছে। সব ক্ষেত্রে উপার্জ্জিত অর্থ ইচ্ছামত মেয়েরা খরচ করিতে পারে না, অভিভাবকের ইচ্ছানুসারে উহা ব্যয়িত হয়।

নারীর উপার্জ্জনের ক্ষেত্র এখনও খুবই সীমাবদ্ধ। বড় বড় চাকুরীতে প্রবেশাধিকার আইনতঃ মেয়েদের নাই। ডাক্তার, ব্যবহারজীবী ইত্যাদি মেয়েরা হইতে পারে, তবু এ পথে এখনও যাত্রী খুব কম। ব্যবসায়ী হইবার কোন আইনগত বাধা নাই, কিন্তু প্রচলিত-প্রথা-বিরুদ্ধ বলিয়া এ পথও বড় কেহ মাড়ায় না। ইঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি যে সব কাজে বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন, শিক্ষালাভের সুযোগ না থাকায় সে সব দ্বার মেয়েদের নিকট রুদ্ধ। বাহিরে অবাধভাবে চলাফিরা করিতে না পারার দরুণ অনেক কাজ মেয়েরা করিতে পারে না। অবরোধ-প্রথা পূর্ব্বাপেক্ষা শিথিল হওয়ায় মেয়েদের কর্ম্মক্ষেত্র কিছুটা প্রসারিত হইয়াছে। ভবিষ্যৎ-সমাজ-গঠনে এই বাধা সম্পূর্ণ অপসারিত হওয়া দরকার।

সমাজে পুরুষ-নারীর অধিকার সমান, এই দাবী আমরা করিলেও উভয়ের দৈহিক ও প্রকৃতিগত বিভিন্নতা স্বীকার করি। এই বিভিন্নতার দরুণ কতগুলি কার্য্য বিশেষভাবে মেয়েদের উপযোগী—যথা শুশ্রূষা, সূচীকর্ম্ম প্রভৃতি। এ সব কাজ মেয়েদের একচেটিয়া থাকা উচিত, তাহাতে সমাজ ও জাতি বেশী লাভবান্ হইবে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান-কার্য্য মেয়েদের হস্তে ন্যাস্ত থাকা সঙ্গত—ছোট ছোট শিশুকে সাম্‌লাইতে মেয়েরা মায়ের জাতি-হিসাবে যে ভাবে পারিবে, পুরুষের পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে। স্বাস্থ্য-পরিদর্শন, নৃত্য, সঙ্গীত, দোকানের সহকারিতা, গৃহপরিচর্য্যা, কেরাণীগিরি প্রভৃতি কার্য্য পুরুষ নারী উভয়েরই করণীয়।

যুদ্ধের কাজ, অস্ত্রশস্ত্রনির্ম্মাণকার্য্য প্রভৃতি মেয়েদের অনুপযোগী এবং এ সবে তাহার যোগ না দেওয়াই উচিত। সংবাদপত্র অফিসে রাত্রির কাজ সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়। খনিতে মাটীর নীচে মেয়েরা যাহাতে কাজ করিতে না পারে, এরূপ আইন থাকা দরকার। সিনেমা, থিয়েটারে অভিনয় মেয়েদের পক্ষে কিছু বিপজ্জনক, এসব কাজে ভদ্রঘরের মেয়েরা আজকাল নামিতেছে। তাহারা যাহাতে সম্মান রক্ষা করিয়া কাজ করিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা দরকার।

আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট এক শিক্ষা বিভাগ ছাড়া অন্য কোন বিভাগে নারীর নিয়োগ করে না। মিউনিসিপ্যালিটি, লোকেল বোর্ড, কর্পোরেশনও এই নিয়ম অনুসরণ করে। কয়েকজন মহিলা ডাক্তার ধাত্রী নার্স স্বাস্থ্য-পরিদর্শক শুধু এই নিয়মের ব্যতিক্রম। ইহাদেরও সর্ব্বত্র আরো অধিকসংখ্যায় নিযুক্ত করা দরকার। সরকারী চাকুরী লোকসংখ্যার তুলনায় মুষ্টিমেয়। ইহা ত আজকাল bone of contention হইয়া দাড়াইয়াছে, ইহা নিয়া হিন্দু, মুসলমান, অনুন্নত শ্রেণী সকলের মধ্যেই মারামারি। মেয়েদের ইহা নিয়া কাড়াকাড়ি করিতে, না যাওয়াই উচিত। তবে এসব কাজে মেয়েদের আইনগত

বাধা না থাকাই সঙ্গত। যদি কোন মেয়ে নিজের বিশেষ যোগ্যতা দ্বারা কাজ লাভ করিতে পারে, মেয়ে বলিয়া যেন সে বাধা প্রাপ্ত না হয়।

ইঞ্জিনীয়রিং কমার্সিয়েল ইণ্ডাষ্ট্রি প্রভৃতি যে সব বিষয়ে নারীরা শিক্ষালাভের সুযোগ নাই বলিয়া আত্মনিয়োগ করিতে পারে না, ঐ সবের শিক্ষায়তনে মেয়েদের প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত। এসব ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা একই শিক্ষায়তনে শিক্ষালাভ করিতে পারে। মেয়েদের জন্য আলাদা শিক্ষায়তন স্থাপিত করা বহু ব্যয় সাপেক্ষ, তাছাড়া যতদূর অনুমান করা যায় এসব বিষয়ে শিক্ষার্থিনী এমন বেশী সংখ্যক হইবে না যাহাতে আলাদা শিক্ষায়তনের প্রয়োজন হইবে।

নার্সিং প্রভৃতি যে সব কাজ বিশেষভাবে মেদের উপযুক্ত, সে সবে শিক্ষাদানের নিমিত্ত মেয়েদের আলাদা শিক্ষায়তন থাকা দরকার। মেয়েরা রুচিভেদে ও শক্তিভেদে বিভিন্নক্ষেত্রে শিক্ষালাভ করিবে ও বিভিন্ন কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করিবে।

সমান কাজের জন্য স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সমান মাহিনা পাওয়া উচিত।

মহিলা-কর্ম্মীদের মধ্যে এমন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা সম্ভবপর যাহা তাহাদিগকে সংঘ-বদ্ধ করিবে, তাহারা যাহাতে উপযুক্ত পারিশ্রমিকে এবং সসম্মানে আত্মরক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে পারে, সেই ব্যবস্থা করিবে। এরূপ মহিলা-প্রতিষ্ঠান আমাদের জানা নাই। "একতাই বল" এই নীতি অনুসারে ইহার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। দুর্ব্বলা নারীকে রক্ষা করিবার ইহা একটি প্রধান যন্ত্র। মেয়েদের মধ্যে এরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রধান বাধা হইল দারিদ্র্য, অজ্ঞতা এবং অবরোধ প্রথা। দেশে শিক্ষার প্রসার দ্বারা এই বাধা ক্রমে দূরীভূত হইবে আশা করা যায়। মেয়েরা এরূপ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিলে আপনিই ইহা গড়িয়া উঠিবে।

মেয়েদের এমন অনেক কাজই আছে যাহা তাহারা অভাবে পড়িয়া করিতে বাধ্য হয়, অথচ যাহা সম্মান রক্ষা করিয়া করা কষ্টসাধ্য। অনেক অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত ভদ্রঘরের মেয়েকে অবস্থা বিপর্য্যয়ে অপরের বাড়ীতে রাঁধুনীগিরি বা এইজাতীয় কাজ করিতে হয়। অনেক শিক্ষিতা মেয়ে মফঃস্বলে বেসরকারী স্কুলে কাজ করিতে গিয়া দেখে যে সেক্রেটারীর স্কুল কমিটির মনোরঞ্জন করাই তাহার প্রধান কার্য্য, শিক্ষাদান নহে। জীবিকা-অর্জ্জন এবং আত্ম-সম্মানের মধ্যে যেখানে এমন বিরোধ ঘটে, সেখানে কর্ত্তব্য কি? অন্নচিন্তা চরিত্র ও সম্মান-রক্ষার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে প্রথমতঃ, নারীকে দেহে ও মনে বলিষ্ঠ হইতে হইবে। নিজেরা তেজস্বী এবং আত্মরক্ষায় সক্ষম হইলে কাহার সাধ্য আমাদের অপমান করে? আর আমরা নিজেরাই যদি দেহে মনে দুর্ব্বল হই, আইন বা বাহিরের অন্য কোন ব্যবস্থাই আমাদিগকে পুরুষের লুব্ধ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইবে না। মেয়েদের শিক্ষা-ব্যবস্থা এমন হওয়া দরকার যাহাতে তাহারা অন্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে আত্মরক্ষার উপযোগী দৈহিক ও মানসিক শিক্ষাও লাভ করে। দ্বিতীয়তঃ, অপরাধী পুরুষের

শাস্তি অত্যন্ত কঠোর করিতে হইবে। তৃতীয়তঃ, অপরাধী বা অপরাধ-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে কর্তৃপক্ষ যাহাতে কর্ম্মচ্যুত করেন, এমন নিয়ম করিতে হইবে। চতুর্থতঃ, সামাজিক অনুশাসন এমন হওয়া দরকার যাহাতে সামাজিক চাপের ভয়ে লোকেরা অপরাধ হইতে বিরত থাকে। পঞ্চমতঃ, নারী কর্ম্মীদের মধ্যে সংঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়িতে হইবে যাহা নারীর অধিকার রক্ষা করিতে সচেষ্ট থাকিবে এবং তাহার প্রতি অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়িবে।

অবরোধ প্রথা প্রভৃতি যে সমস্ত দেশাচার নারীর স্বাধীনতা লাভের অন্তরায় তাহা দূরীকরণের চেষ্টা করা সঙ্গত।

এসব অনিষ্টকর প্রথা জোর করিয়া আইনের সাহায্যে রদ করা যায় না। শিক্ষা, প্রচার প্রভৃতির সাহায্যে জনমতকেই এভাবে ক্রমে ক্রমে পরিবর্ত্তিত করিতে হয় যেন এসব প্রথা আপনিই সমাজ হইতে লোপ পায়। অবরোধ প্রথা এভাবেই আজকাল শিথিল হইয়াছে। অবশ্য বাল্য-বিবাহ বা এই জাতীয় অনিষ্টকর প্রথা দূর করিতে আইনের সাহায্য দরকার। মোট কথা প্রচার কার্য্য বা আইন যাহাই অবলম্বন করা হউক না কেন, এদিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে সমাজ সংস্কারের উৎসাহে যেন আমরা সমাজে প্রতিক্রিয়া (reaction) না ঘটাই। প্রতিক্রিয়া সব আন্দোলনকেই পশ্চাদগামী করিয়া দেয়।

স্ত্রীপুরুষ একত্রে কাজ করিলে নানারকম সমস্যার উদ্ভব হইবে। আমাদের দেশে কর্ম্মক্ষেত্র আরো প্রশস্ত না হইলে স্ত্রীপুরুষের প্রতিযোগিতার ফলে বেকার-সমস্যা আরো ভীষণ আকার ধারণ করিবে। National Planningএর ফলে চারিদিকে নানারকম কর্ম্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হইলে অবশ্য এই সমস্যার সমাধান হইবে।

অবাধ মেলামেশার ফলে নানাবিধ জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে, বিবাহ বিচ্ছেদ বেশী হইবে এবং অনেক স্থলে গৃহের শান্তি ক্ষুন্ন হইবে।

পুরুষ নারী সমান অধিকার লাভ করিলে প্রশ্ন উঠিতে পারে বিবাহের পর মেয়েরা স্ব-গোত্র ও পদবী ত্যাগ করিয়া স্বামীর গোত্র ও পদবী গ্রহণ করিবে কেন এবং কেনই বা স্বামীর নামে পরিচিতা হইবে। যদি মেয়েরা স্বগোত্র ও পদবী ত্যাগ না করে, তবে আবার প্রশ্ন উঠিবে সন্তান পিতৃ বা মাতৃ কাহার নামে পরিচয় দিবে। এসব সমস্যা সমাধান করিবেন যুগে যুগে যাহারা সমাজে বিপ্লব আনয়ন করেন, সে সব স্থিত-ধী ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরাই।

পারিবারিক জীবন ও সম্বন্ধ

আমাদের হিন্দু পরিবারে মাতা, পত্নী, কন্যা কোন হিসাবেই মেয়েরা সম্পত্তি বা ব্যবসায়ে নির্ব্যূঢ় সত্ত্ব লাভ করিতে পারে না। যিনি গৃহকর্ত্রী, তিনিই পরিবারের ছেলেমেয়ে, দাস দাসীকে চালনা করিয়া থাকেন। সংসারের খরচপত্র সাধারণতঃ তিনিই করেন, এবং কাহার কি লাগে এসব তত্ত্বাবধান করেন। বাহিরে গিয়া মেয়েদের অর্থোপার্জ্জন করার রীতি এখনও তেমন প্রচলিত

হয় নাই। পুরুষের উপার্জ্জিত অর্থে সংসার খরচ নির্ব্বাহ হয়, মেয়েরা গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, সংসারে আর্থিক সাহায্য করেন না। পরিবারের ছেলেমেয়েরা ছেলে বেলায় গৃহে এবং বড় হইলে স্কুল কলেজে শিক্ষালাভ করে। তাঁহাদের জীবন যাত্রা প্রণালী অনেকটা গৃহকর্ত্রীর নির্দ্দেশানুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়। ছেলেরা বড় হইলে অভিভাবকের ইচ্ছা ও আর্থিক সামর্থ্যানুসারে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। মেয়েদেরও অভিভাবকের ইচ্ছা ও সামর্থ্যানুসারে বিয়ে দেওয়া হয়।

আজকালের একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথায় বিপদে আপদে পরস্পরের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া যায় কিন্তু জীবনের সবক্ষেত্রে পরস্পরের সহযোগিতা নাই। সকলেই স্বোপার্জ্জিত অর্থ নিজের রুচি ও প্রয়োজনানুসারে ব্যয় করে। যে বেশী উপার্জ্জন করে, সে এই সুবিধা নিজেই ভোগ করে, সাধারণতঃ অপরকে ইহার অংশ দেয় না। পরিবারকে social unit ধরিলে সমাজের নিরাপত্তা বাড়িবে সন্দেহ নাই।

একান্নবর্ত্তী পরিবারের বিবাহিত নারীরা নিজের ব্যক্তিগত সত্ত্বা ভুলিয়া দশজনের সেবা করিয়া থাকেন। তাহারা নিজের সন্তান ও অপর শিশুদের একইভাবে দেখাশুনা করেন। ইহাতে মনে সঙ্কীর্ণতা আসিতে পারে না। কিন্তু যে পরিবার শুধু স্বামী স্ত্রী ও সন্তান লইয়া গঠিত, সেখানে নারীর মন সঙ্কীর্ণ হওয়ার আশঙ্কা আছে। শিক্ষার সাহায্যে এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করা যাইতে পারে। এরূপ গৃহের গৃহিনী আত্মীয় স্বজন অতিথি অভ্যাগতকে উপযুক্ত আদর যত্ন করিয়া হৃদয়কে প্রসারিত রাখিতে পারেন।

অনেক উপকারিতা থাকিলেও পূর্ব্ব-প্রচলিত একান্নবর্ত্তী-পরিবার প্রথা এযুগে অচল। ইহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া যুগোপযোগী করিয়া নিলে তবে হয়তো ইহা চলিতে পারে। পূর্ব্বের একান্নবর্ত্তী পরিবারে গৃহকর্ত্রীই সর্ব্বে সর্ব্বা ছিলেন। বাড়ীর অন্যসব মেয়েরা তাঁহারই ইচ্ছানুসারে চালিত হইত, স্বাধীন ইচ্ছা চালনা করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। কালের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আজকাল গৃহকর্ত্তা ও গৃহকর্ত্রীর একাধিপত্য অনেকটা লোপ পাইয়াছে, তাহারা বাধ্য হইয়াই শাসন রজ্জু শিথিল করিয়া দিয়াছেন, পরিবারের পরিণত বয়স্ক স্ত্রী পুরুষ সকলেই আজকাল অনেকটা স্বাধীন ইচ্ছা চালনা করিতে পারে। আজকাল ছেলে বড় হইলে তাহার স্বাধীন ইচ্ছাকে যেরূপ সকলে মান্য করে এবং তাহাকে নিজের জীবন নিজে নিয়ন্ত্রিত করার অধিকার দেওয়া হয়, প্রত্যেক মেয়েকেও সেরূপ উপযুক্ত বয়স হওয়ার পর স্বাধীন ইচ্ছা চালনা করিবার সুযোগ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা যে চির জীবনই পুরুষের অধীন ও গলগ্রহ হইয়া থাকিব—এ অবস্থার পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়।

আধুনিক শিক্ষা, পাশ্চাত্য রীতি নীতির প্রচলন যাতায়াতের সুবিধা ইত্যাদি কারণে পূর্ব্বের একান্নবর্ত্তী পরিবার প্রথা ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে: আজকাল ছেলেরা নানাস্থানে নানা কাজে লিপ্ত থাকে, এবং বিদেশে কর্ম্মস্থলে স্ত্রীপুত্রকে লইয়া বাস করে। এই ভাবে একই পরিবারের পাঁচ ছেলে হয়তো পাঁচ স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে থাকে, শুধু উৎসব ইত্যাদি উপলক্ষ্যে সকলে একত্র

মিলিত হয়। এভাবে বরাবর একা থাকার দরুণ নারীরা অনেকটা স্বাধীনভাবে চলিবার ও স্বাধীন ইচ্ছা চালনা করিবার সুযোগ লাভ করে। ইহাতে তাহাদের ব্যক্তিত্ব অনেকটা বিকাশিত হয়, একান্নবর্ত্তী পরিবারে দশজনের মন রাখিয়া চলিতে আর তাহারা পারে না। এই ব্যক্তিত্ববোধ সহর ছাড়িয়া গ্রামেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং একান্নবর্ত্তী পরিবারকে বিছিন্ন করিয়া দিতেছে। ইহার ফলে স্ত্রীর অধিকার পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত হইয়াছে, স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্ত্রীর আয়ত্তে আসিয়াছে।

অনেকের ধারণা গৃহকর্ম্ম মেয়েদের অবশ্য করণীয় এবং নারী তাহা করিয়া যথা কর্ত্তব্য পালন করে মাত্র, বৈশিষ্ট্য বা প্রশংসনীয় কিছু নাই। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গী আপত্তিজনক। পুরুষরা তাহাদের কর্ম্মের বিনিময়ে অর্থ আনে, আমাদের গৃহকর্ম্ম অর্থের মাপকাঠিতে মাপা যায় না বলিয়াই কি মূল্যহীন হইবে? মেয়েদের গৃহকর্ম্মও আজ সমাজের নিকট উপযুক্ত মর্য্যাদা লাভ করুক্, ইহা আমরা চাই।

স্বামী স্ত্রী উভয়ে উপার্জ্জন করিলে উভয়ের সম্মিলিত আয়ে সংসার-নির্ব্বাহ হওয়া উচিত এবং সম্পত্তিতে উভয়ের সমান অধিকার থাকা দরকার।

আইনের সাহায্যে ছেলেমেয়ের সম্পত্তিতে সমান অধিকার স্থাপিত করিতে হইবে। অবশ্য মেয়েরা যাহাতে শিক্ষিত ও সম্পত্তি চালাইবার উপযুক্ত হয়, ইহাও দেখা দরকার। কন্যাকে সম্পত্তিতে অধিকার দিলে সম্পত্তি বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা আছে। এরূপ ক্ষেত্রে কন্যাদের প্রাপ্য যতটা সম্ভব নগদ টাকায় বা জিনিষপত্রে মিটাইলে ভাল। নগদ টাকা না থাকিলে খানিকটা সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াও এই দাবী মিটান যাইতে পারে।

শিশুদের যথোপযুক্ত বিকাশের পক্ষে দৈহিক ও মানসিক খাদ্য সমান প্রয়োজনীয়। মানসিক খাদ্যের মধ্যে মাতৃ-স্নেহই প্রধান। এই কারণেই শিশুর পরিবারের মধ্যে প্রতিপালিত হওয়া দরকার। যে সব শিশু অনাথ বা যাহাদের নানা কারণে পরিবারে প্রতিপালিত হইবার সুবিধা নাই, তাহাদের ভার stateএর নেওয়া কর্ত্তব্য। এক্ষেত্রে তত্ত্বাবধানের ভার মেয়েদের উপর ন্যস্ত করা উচিত।

একান্নবর্ত্তী পরিবারে বহু শিশু একত্র প্রতিপালিত হওয়ায় অতিরিক্ত আদরে কেহ নষ্ট হইতে পারে না। শিশুকাল হইতেই তাহারা সামাজিক হইতে ও দশজনের সঙ্গে মানাইয়া চলিতে শিখে। অবশ্য বিশৃঙ্খল পরিবারে তাহাদের অবহেলিত হইবার ও উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে নষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে। তবে আমার মনে হয় অতিরিক্ত আদর অপেক্ষা একটু অবহেলা বোধ হয় ছেলেপিলেদের পক্ষে ভাল। স্বামী স্ত্রী ও সন্তান লইয়াই যদি পরিবার গঠিত হয়, এরূপ স্থানে শিশুর যত্নের অভাব হয় না, তবে অতিরিক্ত আদর পাইয়া নষ্ট হওয়ার ভয় আছে। এ বিষয়ে পিতামাতাকে সাবধান থাকিতে হইবে। তাহারা সন্তানের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন, গ্রাস করিবেন না, তাহার নিজের initiative নষ্ট করিবেন না।

সন্তান-গঠনে মায়ের প্রভাব অপরিসীম। অন্ততঃ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত সব শিশুরই মায়ের একান্ত যত্ন ও তত্ত্বাবধান দরকার। আর একটু বড় হইলে মার এমন একাগ্র যত্নের প্রয়োজন হয় না বটে, কিন্তু তখনও মায়ের প্রভাবেই তাহাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয় এবং মায়েরই তাহাদের জীবনকে চালনা (guide) করা দরকার। এসব বিবেচনা করিয়া নারীর (সন্তানের মার) বেশী সময় গৃহে আবদ্ধ থাকা প্রয়োজন। সমাজে নর-নারীর অধিকার সমান, এ কথার অর্থ এই নয় যে উভয়কে একই ভাবে, একই প্রণালীতে জীবন-যাপন করিতে হইবে। বিধাতার বিধান মাতৃত্বকে স্বীকার করিয়া নারী আপন কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিবে। নারী বাহিরে অর্থ-উপার্জ্জন-কল্পে বা অন্য কোন কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিলে সমাজের যাহা লাভ হইবে, সন্তান-পালনে অবহেলা করিয়া ইহা করিলে সমাজের ঢের বেশী ক্ষতি হইবে। এই প্রসঙ্গে Hutchinsonএর বিখ্যাত বই This Freedom! এর কথা মনে পড়িতেছে। মা সন্তানকে ঠিক মত guide না করিলে কি করুণ ভয়াবহ পরিণামই ঘটে। শিশুদের মধ্যে যে সুন্দর সম্ভাবনা থাকে, তাহা রূপে, গন্ধে পূর্ণ বিকশিত না হইয়া অঙ্কুরেই কেমন বিনষ্ট হইয়া যায়। গৃহের বাহিরে অর্থকরী বা অন্য কোন কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করার পূর্ব্বে মেয়েদের এই কথাটা স্মরণ রাখা দরকার। আমার বিবেচনায় যত দিন সন্তান বেশা ছোট থাকে, মায়েদের এমন কোন কাজ করা উচিত নহে যাহার দরুণ অধিকক্ষণ গৃহের বাহিরে থাকিতে হয়। হাল্কা ও part-time কাজ ছোট শিশুর মায়ের জন্য "সংরক্ষণ" করিলে হয়তো এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হইতে পারে।

শিশুদের অধিকার সম্বন্ধে চার্টার থাকা দরকার। তাহাদের প্রাথমিক বিদ্যা-শিক্ষা বাধ্যতা-মূলক করিতে হইবে এবং অন্ততঃ ১৬ বৎসরের পূর্ব্বে তাহাদিগকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইতে পারিবে না। বর্ত্তমানে ১২ বৎসর কম-বয়স্ক শিশুকে কারখানা প্রভৃতিতে কাজে নিযুক্ত করা আইন-বিরুদ্ধ। ইহা পরিবর্ত্তন করিয়া ১৬ বৎসর করা উচিত।

বিবাহ, মাতৃত্ব ও বংশরক্ষা

হিন্দুসমাজে বিবাহ ধর্ম্মেরই অনুশাসন (religious sacrament). ধর্ম্মতঃ স্বামী স্ত্রীকে প্রতিপালন করিতে এবং উভয়ে পরস্পরের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করিতে বাধ্য। ইহার মধ্যে চুক্তি (civil contract) নাই। কোন কারণেই হিন্দু-বিবাহ বিচ্ছেদ হইতে পারে না। সচরাচর স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আর্থিক সহযোগিতা নাই। স্বামী উপার্জ্জন করে এবং স্ত্রী গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে--এই ভাবে পরস্পরের সহযোগিতায় সংসার চলে।

বিবাহের ফলে নারীর জীবনেই বেশী ব্যাপক ভাবে পরিবর্ত্তন ঘটে, কারণ সন্তান-ধারণ ও শাসন পালনের ভার তাহার উপরেই। ইহার দরুণ তাহার দেহে মনে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে এবং গৃহে তাহাকে বেশী সময় আবদ্ধ থাকিতে হয়।

হিন্দুসমাজে বিবাহ-বিচ্ছেদ আইনতঃ হইতে না পারিলেও স্বামী যে কোন কারণে এক স্ত্রী

ত্যাগ করিয়া পুনরায় বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু স্ত্রী স্বামীত্যাগ করিতে বা পুনরায় বিবাহ করিতে পারে না। এই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিরা এমন আইন করা দরকার যাহাতে সঙ্গত কারণ থাকিলে উভয়েই বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে পারে।

আধুনিক যুবকদের অনেকেই গতানুগতিক বিবাহের বিরোধী। তাহারা একেবারে অপরিচিতাকে চিরজীবনের সঙ্গিনী করিতে ইতস্ততঃ করে। পরস্পর পরিচিত হইয়া বিবাহ হইলে এই আপত্তির কারণ থাকে না। এতদিন পিতামাতা বা অভিভাবকের ইচ্ছা ও নির্ব্বাচনানুসারেই আমাদের সমাজে বিবাহ হইত। এখন অনেকে ইহার বিরোধী হওয়াতে দুই ভাবেই বিবাহ হইতেছে। কেহ বা অভিভাবকের নির্ব্বাচনে, কেহ বা নিজেরা নির্ব্বাচন করিয়া বিবাহ করিতেছে।

হিন্দুসমাজে সাধারণতঃ যাবজ্জীবন বৈধব্য ভোগ করিতে হয়। বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলেও অতি অল্পসংখ্যক সন্তান-হীনা ও অল্প বয়সী বিধবারই বিবাহ হয়। বিধবার স্বামীর সম্পত্তি দান-বিক্রয়ের অধিকার নাই, পরিবারে তাহার শুধু ভরণপোষণের দাবী। সম্পত্তি না থাকিলে সে আত্মীয়স্বজনের গলগ্রহ হইয়া থাকে। আইনের সাহায্যে বিধবা-বিবাহ বাধ্যতামূলক করা সমীচীন নহে। অল্প বয়স্কা সন্তানহীন বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া আমরা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক কারণে উচিত মনে করিলেও আজকাল যেক্ষেত্রে অনেক কুমারী মেয়েরই উপযুক্ত সুযোগের অভাবে বিবাহ হইতেছে না, সেখানে বাধ্যতামূলক বিধবা-বিধাহ-দ্বারা আরও জটিল অবস্থার উদ্ভব হইবে। তা' ছাড়া পুনরায় বিবাহ করিবে কিনা ইহা বিধবা নিজের স্বাধীন ইচ্ছায় স্থির করিবে, আইনদ্বারা তাহার স্বাধীন মতামতকে খর্ব্ব করা সমর্থনযোগ্য নহে। সব নারীকেই উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া দরকার, যাহাতে তাহার জীবন পূর্ণ বিকশিত ও সফল হইতে পারে। উপযুক্ত হইয়া সে নিজের জীবন-পথ নির্ব্বাচন করিয়া লইবে, বিবাহ করিবে অথবা কুমারী-জীবন যাপন করিবে, ইহা তাহার ইচ্ছাধীন হইবে। বিধবাদের বেলায়ও এই কথাই প্রযুজ্য। আজকাল বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাওয়াতে বাল-বিধবার সমস্যা এক রকম নাই-ই।

শিক্ষকতা, শুশ্রূষা প্রভৃতি কতগুলি কাজে বিধবারা যাহাতে বিশেষভাবে নিযুক্ত হয়, এরূপ ব্যবস্থা থাকা মন্দ নহে। তবে এই ব্যবস্থা সাময়িক হওয়া দরকার। শিক্ষাদ্বারা যোগ্যতা লাভ করিলে তাহারা অপর নারীর সঙ্গে সমানে প্রতিযোগিতা করিতে পারিবে, তাহাদের জন্য "বিশেষ অধিকার" রক্ষার প্রয়োজন হইবে না।

আমাদের দেশে বহু স্বামিত্ব অচল। পুরুষের বহু বিবাহে আইনগত বাধা নাই বটে, তবে জনমত প্রতিকূল বলিয়া এক স্ত্রী বর্ত্তমানে পুনরায় বড় কেহ বিবাহ করে না। অন্য সব দেশের ন্যায় আমাদের দেশেও ব্যাভিচার অল্পবিস্তর আছে, আইনদ্বারা ইহা বন্ধ করা অসম্ভব। তবে সমাজ ইহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে, সমাজ ও লোকমতের চাপে ইহা সংযত থাকে।

সরদা আইনের ফলে দেশে বাল্য-বিবাহ খুবই কমিয়াছে। হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজে ইহা নাই-ই।

প্রসূতি ও শিশুমৃত্যু আমাদের দেশে খুব বেশী। দারিদ্র্য, স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অজ্ঞতা, ঘন ঘন সন্তান হওয়া প্রভৃতি ইহার কারণ। জন্মের হার ও মৃত্যুর হার দুই-ই বেশী বলিয়া লোকসংখ্যা বৃদ্ধি তেমন হয় না, গড় পড়তা পরিবারের লোকসংখ্যাও তেমন বেশী নয়। দেশের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর হইলে এই মৃত্যুসংখ্যা কমিবে।

বিবাহে পণ-প্রথা মেয়েদের পক্ষে অসম্মানজনক। পুরুষ-নারী উভয়েরই পরস্পরের প্রয়োজন আছে, এই প্রয়োজনের খাতিরেই উভয়ে মিলিত হয়, নতুবা তাহাদের জীবন পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। পুরুষ তাহার অন্তরের তাগিদেই নারীকে বরণ করিয়া নিবে, পণের লোভে নহে। যেখানে পণের লোভে পুরুষ নারীকে গ্রহণ করে, সেখানে নারীর মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। অনুভূতি-প্রবণ নারী ইহাতে ক্ষুব্ধ হইবেই এবং এই ক্ষোভের ছায়া তাহার দাম্পত্য-জীবনেও কিছু না কিছু প্রতিফলিত হইবে।

স্বামী বা স্ত্রী কাহারও যদি কোন সংক্রামক (Transmissible) রোগ থাকে, যাহা অপরের মধ্যে অথবা সন্তানে বর্ত্তিতে পারে, এরূপ ক্ষেত্রে হয় বিবাহ-বিচ্ছেদ করিতে হইবে অথবা সন্তানের জন্ম যাহাতে না হয় এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। পাগলামি, কুষ্ঠ প্রভৃতি পূর্ব্বপুরুষাগত (Hereditary) রোগ সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযুজ্য। উভয়ের কেহ যদি হঠাৎ পাগল হয় বা এরূপ কোন অস্বাভাবিক মানসিক রোগাক্রান্ত হয় এক্ষেত্রেও পূর্ব্ব ব্যবস্থাই অবলম্বনীয়। স্বামী বা স্ত্রী যিনি সুস্থ স্বাভাবিক, তিনি যেন এসব কারণ বর্ত্তমান থাকিলে বিবাহ বিচ্ছেদ করিতে পারেন, এমন আইন থাকা দরকার। তিনি বিবাহ বিচ্ছেদে অনিচ্ছুক হইলে তাহাকে সন্তানের জন্ম রোধ করিতে হইবে। দেহে মনে রুগ্ন সন্তানের জন্ম দিয়া সমাজ শরীরকে বিষাক্ত করা চলিবে না।

রুগ্ন ও অযোগ্য ব্যক্তির উৎপাদিকা শক্তি নষ্ট করা উচিত, abortion অনুমোদন করি না।

সঙ্গত কারণ থাকিলেও বিবাহ বিচ্ছেদ বাধ্যতামূলক করিয়া ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছাকে খর্ব্ব করা উচিত নহে। তবে যেখানে সংক্রামক বা বংশানুক্রমিক রোগ ইত্যাদি থাকে, সেখানে সুস্থ স্বামী বা স্ত্রীকে বিবাহ-বিচ্ছেদ অথবা সন্তানের জন্ম-নিরোধ এই দুই পন্থার একটি অবলম্বন করিতে বাধ্য করা দরকার।

বিবাহ-বিচ্ছেদ হইলে স্বামী বা স্ত্রী যিনি সুস্থ, স্বাভাবিক এবং অধিকতর উপযুক্ত, তিনিই সন্তানের ভার গ্রহণ করিবেন।

স্বাস্থ্য, আর্থিক সঙ্গতি ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া সন্তানের জন্ম নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিলে ভালই। এ বিষয়ে কি উপায় অবলম্বন করা উচিত, ইহার দৈহিক ও মানসিক প্রতিক্রিয়া কি, ইত্যাদি অভিজ্ঞ ডাক্তাররাই বলিবার যোগ্য। দরিদ্র ও অশিক্ষিত জনসাধারণকে জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রণালী শিক্ষা দিতে হইলে সহজ সুলভ অথচ কার্য্যকরী ব্যবস্থা উদ্ভাবন করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে প্রচার কার্য্য (Propaganda) চালাইতে হইবে। এ বিষয়ে সহযোগিতা লাভের জন্য Sub

Committee on national Health, manufacturing Industries (যাহারা জন্মনিয়ন্ত্রণের আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি তৈরী করে) প্রভৃতির নিকট আবেদন করা উচিত।

কারখানা প্রভৃতিতে নারী শ্রমিক

কলকারখানায় মেয়েদের কাজ করা খুব নিরাপদ ও মঙ্গলকর নহে। কারখানার কুলী মজুররা যে আবহাওয়ায় বাস করে, তাহা দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে নিতান্ত প্রতিকূল। সাধারণের কঠোর পরিশ্রমের পর স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলেই নীচ আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হয় এবং সমাজকে কলুষিত ও বিষাক্ত করিয়া তোলে। Slum গুলি সভ্যতার কলঙ্ক। কারখানায় স্বামী স্ত্রী মিলিয়া বেশী অর্থ উপার্জ্জন করে সত্য কিন্তু তবু তাহারা গ্রামের দরিদ্র চাষাভুষা অপেক্ষা হেয় জীবন যাপন করে। কাজেই জাতি নৈতিক বা আর্থিক কোন হিসাবেই লাভবান হয় না। ইহা অপেক্ষা গ্রামের দরিদ্র গৃহস্থ-নারীর শান্ত জীবন-যাপন প্রণালী অনেক শ্রেয়ঃ ও আমাদের সমাজের অনুকূল।

আধুনিক সভ্যতা ও কলকারখানা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মজুর শ্রেণী থাকিবেই। স্ত্রীলোকের কারখানায় কাজ করা অবাঞ্ছনীয় হইলেও তাহা বন্ধ করা অসম্ভব কাজেই তাহারা যতদূর সম্ভব উন্নত জীবন যাপন করিতে পারে, সেই চেষ্টাই করিতে হইবে। তাহাদের দৈহিক ও নৈতিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার ব্যবস্থা করা দরকার। তাহাদিগকে স্বাস্থ্যকর বাসস্থান দিতে হইবে, প্রাথমিক শিক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্যের নিয়মাবলী শিক্ষাদান করিতে হইবে, সুলভ ও নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করিতে হইবে, উপযুক্ত maternity leave দিতে হইবে এবং গর্ভবতী স্ত্রীলোক ও কচি সন্তানের মায়ের জন্য তাহাদের স্বাস্থ্যের উপযোগী হাল্‌কা কাজ "সংরক্ষণ" করিতে হইাব। এবম্বিধ বহু বিষয়ে বিবেচনা করিয়া যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে এবং প্রয়োজনমত আইনের সাহায্য নিতে হইবে।

এইরূপ নানা বিধিনিষেধ থাকিলে মেয়েদের কাজ পাওয়ার মুস্কিল হইবে সত্য, কিন্তু জাতির নৈতিক ও দৈহিক স্বাস্থ্যের জন্য এরূপ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করিতেই হইবে। কারখানার মালিকরা যদি মজুর শ্রেণীকে পশুর সামিল মনে না করিয়া মানুষ বলিয়া ভাবেন, তাহারাও এইসব ন্যায়-সঙ্গত দাবী মান্য করিবেন এবং ইহা মান্য করিতে তাহাদের বাধ্য করা হইবে। মেয়েরা তাহাদের কাজের উপযুক্ত মজুরী পাইবে, হাল্‌কা কাজ করিলে মজুরীও কম পাইবে, মালিকের ইহাতে বিশেষ লোকসান হইবার কথা না তবে কর্ম্মবিভাগ ও বণ্টন করিবার সময় বিবেচনা করিতে হইবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতির জন্য ব্যয় করিলে পরিণামে তাহা দ্বারা মালিকও লাভবান হইবেন, জাতি তো হইবেই। এই সবের জন্য ব্যয় বেশী হইলে মালিকের capital cost বেশী হইবে, উৎপাদিত জিনিষের দাম কিছু বাড়িবে এব ফলে জাতিই এই ব্যয় ultimately বহন করিবে, মালিকের লোকসান হইবে না।

আইনের সাহায্যে মেয়েরা যাহাতে খনিতে মাটীর নীচে কাজ না করে দর্জ্জির দোকানে ছাট, কাট বোতাম লাগান ইত্যাদি তাহাদের স্বাস্থ্যের উপযোগী হাল্‌কা কাজেই শুধু নিযুক্ত থাকে সংবাদ পত্র আফিসে night duty তে না থাকে, এরূপ ব্যবস্থা করা দরকার।

নারী শ্রমিক ও কর্ম্মীদের সংঘ (union) থাকা দরকার যাহা তাহাদের প্রতি অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় অনুষ্ঠিত হইলে তাহার প্রতিকার করিতে সচেষ্ট থাকিবে।

দানপ্রথা (serfdom) আজকাল নাই। চুক্তিবদ্ধ কাজ সর্ব্বত্রই অল্পবিস্তর আছে। চা-বাগান প্রভৃতিতে indentured labour যথেষ্ট আছে। দালালরা গিয়া দেশে নানারকম প্রলোভন দেখাইয়া অগ্রিম টাকা দিয়া "গিরমিট" (agreement) করিয়া অজ্ঞ কুলীদের দলে দলে নিয়া আসে। কুলীরা পরে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিলেও অর্থাভাবে এবং "গিরমিট" হইতে মুক্তি না পাওয়ার দরুণ দেশে ফিরিতে পারে না, স্ত্রীলোকদের দুর্দ্দশা আরো বেশী হয়। contract labour ও indentured labour সম্বন্ধে এরূপ আইন করা দরকার যাহাতে ঐ সব অন্যায় সর্ত্ত থাকিলে মজুররা আইনের সাহায্যে ঐ সর্ত্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে।

আমাদের দেশে এখনও হোটেল, রেষ্টরেণ্ট, দোকান প্রভৃতিতে মেয়েদের কাজ করার প্রথা নাই। বড় বড় সহরে পানের দোকান প্রভৃতি মেয়েরা চালায় বটে, কিন্তু তাহারা নিম্নশ্রেণীর এবং ভদ্র নহে। অনেক সময় গরীব মেয়েরা বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া শাখা, চুড়ি, খেলনা, মাছ তরকারী প্রভৃতি বিক্রয় করে। ইহারা প্রায়ই অবসর সময়ে এই রোজগার করে। সাধারণতঃ মেয়েরা গৃহ হইতে বেশী দূরে চাকুরী করিতে যায় না। রাঁধুনী, পরিচারিকা প্রভৃতি স্থানীয় ভদ্রলোকের গৃহে, মেস্, বোর্ডিং প্রভৃতিতে কাজ করে, বেশী মাহিনার লোভেও বড় কেহ বিদেশে যাইতে চায় না। কাজ অনুসারে তাহারা মাহিনা পায়। ঠিকমত কাজ না করিলে গৃহস্বামী যে কোন সময় তাহাদের বিদায় করিতে পারেন, তাহারও না পোষাইলে যে কোন সময় কর্ম্মত্যাগ করিতে পারে। এরূপ কাজে মেয়েদের নানা বিপদের সম্মুখীন হইতে হয়। অনেক সময়েই সম্মান ও চরিত্র রক্ষা করিয়া কাজ করা কঠিন হইয়া পড়ে। ইহার প্রতিকার কল্পে মেয়েদের দেহে মনে সবল ও সংঘবদ্ধ হওয়া দরকার।

আমাদের গ্রামের গরীব গৃহস্থ মেয়েরা অনেকে বাঁশ বেতের ঝুড়ি বুনিয়া, ঘরের উৎপন্ন তরীতরকারী, দুধ বিক্রী করিয়া, ধান ভানিয়া কিছু উপার্জ্জন করিয়া থাকে। এরূপ আরো অনেক কাজ মেয়েরা করে যাহাকে "কুটীর শিল্পের" অন্তর্ভুক্ত করা যাইতে পারে। আসামে মেয়েরা ধান বুনে, ধান কাটে, কাপড়ও বেশীর ভাগ ঘরে বুনিয়া লয়। বাংলা দেশের মেয়েরা ক্ষেতের কাজ করে না, ঘরের কাজ সবই (ধান মাড়াইয়া ঘরে তোলা, চাউল তৈরী করা, ঝাড়া প্রভৃতি) মেয়েদের করিতে হয়। এইসব কাজ দ্বারা অর্থ উপাৰ্জ্জন খুব বেশী হয় না বটে, তবে পল্লীবাসীর অল্প অভাব অনেকটা মিটে এবং স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ায় থাকিয়া মেয়েরা যতটুকু উপার্জ্জন করে, তাহাই লাভ। সহরে ও ভদ্র ঘরের মেয়েরা কেহ কেহ জামা কাপড় প্রভৃতি সেলাই করিয়া কিছু সংস্থান করে।

কুটীর শিল্পের প্রধান বাধা হইল উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিবার উপযুক্ত বন্দোবস্তের অভাব। বড় বড় সহরে বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন করা, ঘরে ঘরে ঘুরিয়া ঐ সব উৎপন্ন দ্রব্য সংগ্রহ করা ইত্যাদি উপায়ে ঐ বাধা অনেকটা দূর করা যাইতে পারে।

আমাদের দেশে কৃষকদের মধ্যে অবরোধ প্রথা প্রচলিত নাই এবং তাহাদের মেয়েদের ক্ষেতে কাজ করিতে কোন বাধা নেই। অবরোধ-প্রথা যাহারা মানে, তাহারা ক্ষেতে কাজ করিতে না পারিলেও গৃহে থাকিয়া যাহা করা যায় (ধান মাড়ান প্রভৃতি) সবই করিয়া থাকে। মেয়েদের এইসব কাজ স্বীকার করা (recognise) সমাজের কর্ত্তব্য তবে ইহার অর্থনৈতিক মূল্য নির্দ্ধারণ করা দুরূহ ব্যাপার।

সামাজিক অনিষ্টকর প্রথা

অবোরধ প্রথাই আমাদের দেশে নারীর অর্থকরী কাজে আত্মনিয়োগ করার প্রধান অন্তরায়। অবরোধ প্রথার ফলে গৃহে আবদ্ধ থাকিয়া যথেষ্ট আলো বাতাস ও অঙ্গ-চালনার অভাবে মেয়েদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। তাহারা যথোপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে পারে না। শিক্ষার অভাবে ও গৃহকোণে আবদ্ধ থাকার ফলে তাহাদের মন প্রসার লাভ করিতে পারে না, দৃষ্টি ভঙ্গী সঙ্কীর্ণ হয়। আর্থিক ও অন্য সব বিষয়েই তাহারা পুরুষের উপর নির্ভর করে এবং তাহার অধীন হইয়া চলে। আজকাল অবরোধ প্রথা ক্রমেই লোপ পাইতেছে। আধুনিক জনমত ও ইহার প্রতিকূল। নারীর মঙ্গলের জন্য ইহার সম্পূর্ণ লোপ হওয়ার আবশ্যক।

বাল্য বিবাহ ও বাল্য মাতৃত্ব আজকাল আমাদের সমাজে একরূপ নাই বলিলেই চলে; পণ প্রথার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হওয়া দরকার।

মৃত্যুর হার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ১৫ হইতে ৪৫ বৎসর বয়স্কা নারীর মৃত্যুসংখ্যাই আমাদের দেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। ১-১৫ বৎসর পর্য্যন্ত বালক বালিকার মৃত্যুসংখ্যা প্রায় সমান, ৪৫ বৎসর উর্দ্ধেও পুরুষ নারীর মৃত্যুসংখ্যায় এত তফাৎ নহে। অর্থাৎ যে বয়সে নারীরা মাতৃত্বের উপযুক্ত হয় ও মাতৃত্ব লাভ করিয়া থাকে, সেই সময়েই তাহাদের মৃত্যু ঘটে বেশী। ইহাতে বুঝা যায় সন্তান উৎপাদন ও নারী মৃত্যুর মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। বাস্তবিকই আমাদের দেশে নানা কারণে গর্ভিনী ও প্রসূতির মৃত্যু অত্যন্ত বেশী হয়। অনেকে আবার এই কারণে directly না হইলেও indirectly মারা যায়। অর্থাৎ এই কারণে তাহাদের যে শক্তিক্ষয় হয়, তাহার যথোপযুক্ত পূরণ হয় না এবং সহজেই তাহারা যে কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

দেশের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা দূর না হইলে এই শোচনীয় অবস্থার সম্যক্ প্রতিকার সম্ভবপর নহে। তবে গভর্ণমেণ্টের ও জনসাধারণের চেষ্টায় কিছুটা প্রতিকার হইতে পারে। দেশের সর্ব্বত্র শিশু-মঙ্গল-সমিতি স্থাপন, "চিত্তরঞ্জন সেবাসদনের" ন্যায় চিকিৎসালয় স্থাপন, স্বাস্থ্য-সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রচার, প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটি লোকেল বোর্ডের অধীনে ধাত্রী, মহিলা স্বাস্থ্য পরিদর্শক নিয়োগ ইত্যাদি উপায়ে মৃত্যুর হার কমান সম্ভবপর।

শিক্ষা পদ্ধতি

আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষায়তন যাহা আছে, তাহা মোটেই যথেষ্ট নহে। তাহাতেও আবার নানারূপ শিক্ষা দিবার কোন ব্যবস্থা নাই। ইহাতে মেয়েরা শুধু "লেখা-পড়াই" শিখে, নানাবিধ হাতের কাজ শিক্ষা, জীবনের নানাদিকে কত নানারকম কাজ আছে, সেসব শিক্ষা, কিছুই তাহাদের হয় না। ইহার ফলে মেয়েরা নানারূপ অর্থকরী কার্য্যের যোগ্যতা লাভ করিতে পারে না। শিক্ষিতা মেয়েরা শিক্ষকতা ছাড়া আর কোন কাজেরই যোগ্য হয় না। দেশে যে কয়জন মহিলা ডাক্তার নার্স প্রভৃতি আছেন, তাহারা অবশ্য ইহার ব্যতিক্রম।

দৈহিক উন্নতির জন্য মেয়েদের রীতিমত ব্যায়াম, খেলাধূলা, মুক্ত বায়ুতে ভ্রমণ দরকার। মেয়েরা বড় বেশী বসিয়া কাজ করে, সেজন্য তাহাদের বসা খেলা (sedentary games) অপেক্ষা দৈহিক পরিশ্রম সূচক (active) খেলাধূলা করাই সমাচীন। মোট কথা তাহাদের দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিতে হইবে।

অন্য সভ্যদেশের তুলনায় আমাদের দেশে শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত কম। পুরুষদের তুলনায় মেয়েদের শিক্ষা আরো কম। প্রাথমিক শিক্ষাই শতকরা একজনের বেশী মেয়ে পায় না। লোক সংখ্যার অনুপাতে উচ্চ শিক্ষিত মেয়ের সংখ্যা নগণ্য বলা যাইতে পারে। বিশেষ শিক্ষা প্রাপ্ত মেয়ের সংখ্যা আরো কম।

কারখানার মেয়ে মজুরদের মধ্যেই শুধু মদ্যপান, জুয়া খেলা প্রভৃতি কুরীতি আছে। যে বিষাক্ত আবহাওয়ায় তাহারা বাস করে, উহা পরিশুদ্ধ না করিলে এসব দুর্নীতি দূর হইবে না। আজকাল কোন কোন প্রদেশে সরকার Prohibition Policy অবলম্বন করিয়াছেন, ইহা দ্বারা মদ্যপান ও ইহার আনুষঙ্গিক কুফল নিবারিত হইবে আশা করা যায়।

অবরোধ-প্রথা, দারিদ্র্য, শিক্ষালয়ের অভাব, দূরত্ব, ইত্যাদি কারণে অনেকস্থলে মেয়েরা শিক্ষালাভ করিতে পারে না। আজকাল অবরোধ প্রথা ক্রমশঃ শিথিল হইতেছে এবং স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও লোকে অধিকতর উপলব্ধি করিতেছে। সর্ব্বত্র শিক্ষালয় স্থাপন, প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও সুলভ করা ইত্যাদি উপায়ে বাধা দূরীভূত হইতে পারে।

একই শিক্ষায়তনে পুরুষ ও নারী উচ্চ শিক্ষা লাভ করিতে পারে। তবে যে সব শিক্ষা বিশেষভাবে মেয়েদের উপযোগী যথা শুশ্রূষা, সূচীশিল্প, Housewifery প্রভৃতি তাহা লাভের নিমিত্ত মেয়েদের আলাদা শিক্ষায়তন স্থাপন করা দরকার। সমাজের যেসব শ্রেণী এখনও শিক্ষা দীক্ষায় অনুন্নত ও পশ্চাৎপদ রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কল্পে তাহাদের নারীদের ঐসব শিক্ষায়তনে বিশেষ বৃত্তি ও বিশেষ সুযোগ সুবিধাদান করিয়া আকর্ষণ করিতে হইবে।

দেশের শাসনভার আমাদের হাতে আসিলে বর্ত্তমান Top heavy administration

সংস্কার করিয়া আমরা অনেক ব্যয়সঙ্কোচ করিতে পারিব। নারীর জন্য বিশেষ শিক্ষায়তন স্থাপনের অর্থও ইহা হইতেই পাওয়া যাইবে।

বর্ত্তমানে স্কুল কলেজে আমরা যেভাবে শিক্ষালাভ করিতেছি আমাদের জীবন বড় একপেশে (one sided) হইয়া পড়িতেছে। "লেখাপড়াকে" এতটা প্রধান্য না দিয়া সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার কাজ কর্ম্ম, খেলা-ধূলার ও ব্যবস্থা করা দরকার। ব্যায়াম, লাঠি খেলা প্রভৃতি শিখাইতে হইবে যাহাতে মেয়েরা দরকার মত আত্মরক্ষা করিতে পারে। গৃহকর্ম্ম ও রুচি অনুসারে অন্য অর্থকরী কর্ম্মও মেয়েদের শিক্ষা দরকার। মোট কথা শিক্ষা-ব্যবস্থা সুসমঞ্জস হওয়া চাই।

আজকাল প্রায় সব কলেজেই সহ-শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। কলেজে সহ-শিক্ষা আরো ব্যাপকভাবে প্রচলিত হইলে গতানুগতিক বিবাহ প্রথার ভিত্তিমূলে ঘা পড়িবে। সহ-শিক্ষার ভাল মন্দ দুই দিকই আছে। ইহার দরুণ অনিষ্ট যদি হয়, তাহার ফল মেয়েরাই বেশী ভোগ করিবে।

বিবিধ

বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক ব্যাপার ছাড়া জাতিভেদ আজকাল বড় কেহ মানে না। সহকর্ম্মীদের সহিত মেলামেশা করিতে জাতিভেদে কোন বাধা হয় না। হিন্দু সমাজ অসবর্ণ বিবাহ অনুমোদন করে না, তাই বিবাহের বেলা ইহা বাধা স্বরূপ হয়। ইচ্ছা করিলে মেয়েরা এই বাধা অবশ্য Civil marriage আইনের সাহায্যে অতিক্রম করিতে পারে।

আজকাল জাতিভেদ অনেকটা উঠিয়া গেলেও অর্থনৈতিক ভেদ সমাজে নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি করিতেছে। জাতিগত কৌলীন্যের স্থানে কাঞ্চন কৌলীন্য আপন প্রভাব বিস্তার করিতেছে। নারীর জীবনেও ইহার প্রভাব বড় কম নহে। এরূপ ঘটনা বিরল নহে যেখানে ধনীর কন্যা দরিদ্র বলিয়া আপন বাঞ্ছিতকে বরণ করিতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রেই বরের যোগ্যতা নির্ভর করে তাহার Bank balance এর উপর, তাহার বিদ্যাবুদ্ধি বা চরিত্রের উপর নহে। এই আর্থিক শ্রেণীগত বৈষম্য নিশ্চয়ই মেয়েদের স্বাধীনতার পরিপন্থী। তবে ইহার দরুণই আবার অনেকে সমাজের নীচের স্তর হইতে অর্থের সাহায্যে উচ্চ স্তরে আরোহণ করিতে ও নিজের জীবনকে আকাঙ্খিত পরিণতির দিকে লইয়া যাইতে পারে।

বংশগত কৌলীন্যের স্থানে কাঞ্চন কৌলীন্য আমরা চাই না। আমরা চাই মানুষের যোগ্যতা নিরূপিত হইবে তাহার মনুষ্যত্বের দ্বারা, বংশ-মর্য্যাদা বা ধন মর্য্যাদা দ্বারা নহে। (মেয়েরাও স্বামী নির্ব্বাচন করিতে এই মাপকাঠিই ব্যবহার করিবে, সমাজের অন্ধ অনুশাসন তাহাদের স্বাধীনতাকে খর্ব্ব করিতে পারিবে না। মনুষ্যত্বকেই আমরা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ মর্য্যাদা দিব, তবেই সমাজের সব স্তরের লোক জীবনে পূর্ণ পরিণতি লাভের সুযোগ পাইবে।)

বৃদ্ধা, রুগ্না ও কর্ম্মের অনুপযুক্তা নারীদের তাহাদের আত্মীয় স্বজনরাই স্নেহে যত্নে পালন করিবে। যদি কাহারও তেমন আত্মজন না থাকে অথবা থাকিলেও প্রতিপালন করিতে অনিচ্ছুক

হয়, তাহাদের ভার সমাজ বহন করিবে। এরূপ নারীদের জন্য স্থানে স্থানে আশ্রম স্থাপন করিতে হইবে এবং State এই খরচ নির্ব্বাহ করিবে।

বর্ত্তমানে আমাদের সমাজের পতিতাদের নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে—

(১) অনেকে অভাবে পড়িয়া পেটের দায়ে এই বৃত্তি অবলম্বন করে।

(২) নারীর কোন স্খলন, চ্যুতি আমাদের সমাজ ক্ষমা করে না। বুদ্ধির দোষে, প্রলোভনে পড়িয়া বা যে কোন কারণে একবার কাহারও পদ-স্খলন হইলে সমাজে আর তাহার স্থান হয় না। অবশেষে সে পতিতার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কোন নারীকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করিলেও সে আর সমাজে ফিরিতে পারে না এবং তাহারও এই দশা হয়।

(৩) অনেকে অর্থ লোভে বা বিলাসিতার মোহে প্রকাশ্যে বা গোপনে এই বৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে।

(৪) কেহ কেহ এমন প্রবৃত্তি লইয়া জন্মে যে সমাজের অনুশাসন, গৃহের বন্ধন কিছুই' তাদের বাঁধিতে পারে না। উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনেই তাহাদের আনন্দ। ইহাদের দমন করা সাধ্যতীত।

সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হইলে প্রথম দুই শ্রেণীর নারীরা ভদ্রভাবে জীবন যাপন করিবার সুযোগ পাইবে এবং নিজেকে ও সমাজকে অধোগতির হাত হইতে রক্ষা করিবে। তৃতীয় শ্রেণীরও কেহ কেহ হয়তো আত্ম-সংশোধন করিতে পারে। যাহারা বাকী রহিল, তাহারা গর্হিত জীবন যাপন করিবেই, সমাজ তাহাদের বাধা দিতে কৃতকার্য্য হইবে না। এক হিসাবে তাহাদেরও সমাজে প্রয়োজনীতা আছে। তাহারা অনেকটা Safety valveএর কাজ করে। তবে গুপ্তভাবে কেহ যেন এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে না পারে, এদিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গুপ্ত পাপ বেশী মারাত্মক।

সব দেশেই পতিতা শ্রেণী বর্ত্তমান আছে। এই শ্রেণীকে লোপ করিতে বহু দেশে বহু চেষ্টাই হইয়াছে, আইনও কিছু কিছু হইয়াছে কিন্তু কোন কাজ হয় নাই। দেখা গিয়াছে যাহা সমাজে প্রকাশ্যভাবে ছিল, তাহাই ফল্গুধারার ন্যায় আত্মগোপন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে এবং সমাজ দেহকে কলুষিত করিতেছে।

সমাজে ভাল মন্দ লোক দুই-ই আছে। সমাজ গঠনের হাজার পরিবর্ত্তন করিলেও মন্দ লোকের মন্দ প্রবৃত্তি একেবারে লোপ পাইবে, এমন আশা নাই। পতিতা শ্রেণী এই প্রকার লোকের প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া সমাজ শরীরকে পরিশুদ্ধ রাখে। তাই তাহারা neceseary evil তবে তাহারা যাহাতে রোগ ছড়াইতে না পারে, এজন্য যথোপযুক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার—যথা নির্দ্দিষ্ট সময় পরে পরে সরকারী ডাক্তার তাহাদিগকে পরীক্ষা করিয়া অনুমতিপত্র দিবে, শুধু নীরোগ যাহারা, তাহারাই অনুমতি পত্র পাইবে, ইহা ছাড়া কেহ এই

ব্যবসায় চালাইতে পারিবে না, তাহারা সহরের এক নির্দ্দিষ্ট প্রান্তে থাকিবে, ভদ্র পল্লীতে বাস করিতে পারিবে না ইত্যাদি।

আজকাল আমাদের দেশে নারী-ধর্ষণের সংখ্যা খুব বাড়িয়াছে। সংবাদ পত্র খুলিলেই প্রতিদিন নূতন নূতন খবর চোখে পড়ে। আমাদের দুর্ব্বলতাই ইহার মূল কারণ। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে প্রচলিত আইন আমাদের রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট নহে। ইহার প্রতিকার আমাদের নিজেদেরই করিতে হইবে। প্রথমতঃ, আমাদের দেহে মনে সবল ও আত্মরক্ষার উপযুক্ত হইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক সহর ও গ্রামে নারী রক্ষা সমিতি স্থাপন করিতে হইবে যাহা দুর্ব্বৃত্তকে বাধা দিবে, দুর্ব্বৃত্তদের হাত হইতে নারীকে উদ্ধার করিয়া আনিবে এবং তাহাদের যথোপযুক্ত শাস্তি দিবার ব্যবস্থা করিবে। তৃতীয়তঃ, এরূপ নারীকে সমাজে পুনরায় গ্রহণ করার রীতি প্রচলিত করিতে হইবে!

আজকাল নারী আন্দোলন যাহা কিছু হইতেছে সবই বিক্ষিপ্ত ভাবে। National Planning Committeeর নির্দ্দেশে ইহা সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া সমাজের শক্তি বিপুলভাবে বর্দ্ধিত করিবে।

জাতীয় পরিকল্পনা কমিটির মহিলা উপসমিতির প্রশ্নাবলীর উত্তরে আমরা বহু লেখা পাইতেছি—তাহার দুএকটী আমরা জয়শ্রীতে প্রকাশ করিব। তাহাতে এবিষয়টি বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ হইতে আলোচিত হইয়া একটী সুচিন্তিত মতামতে আসা সম্ভব হইবে। প্রবন্ধ লেখকগণ আমাদের মতামতই প্রকাশ করিতেছেন ধরিয়া লইবার হেতু নাই, তবে এই আলোচনার পর আমাদের মতামত আমার দিতে চেষ্টা করিব। জঃ সঃ

দ্বন্দ্ব

(নাটক)

—পূর্ব্বানুবৃত্তি—

প্রভাত দেব সরকার

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বারলাইব্রেরী

[কিছুদিন পরে একদিন দুপুর বেলা। বারলাইব্রেরীটা সমরেশ্বীয় আদলত গৃহস্থলির পিছন দিকে। মাঝে একটা অশ্বত্থ-বট জড়াজড়ি করে' অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে—ডালপালা গুলো তার আদালত গৃহ এবং বার-লাইব্রেরীটার মাথা ছুঁয়ে। তলায় প্রৌঢ়া একটি পানওয়ালীর বিস্তৃত দোকান। সেই দোকানের সামনে কেরোসিন কাঠের একটা রুক্ষ, ক্ষীনা-পায়াওয়ালা বেঞ্চ। পানওয়ালী একটা পিঁড়ির ওপর উবু হ'য়ে বসে' বিশেষ একটা মুদ্রার ভঙ্গিতে ডান হাতটাকে সামনে বাড়িয়ে আছে। তার আশে-পাশে ছোট-বড়-মাঝারি, নানা রকমের কাঁনা-কড়ি গলায় কয়েকটি হুঁকো এবং কলকে কাৎ হয়ে পড়ে আছে। সামনে জল-চৌকির ওপর পেতলের রেকাবিতে কয়েকখিলি পান খয়েরী রঙের ভিজে ছেঁড়া নেকড়ার আবরণ ভেদ করে' উঁকি মারচে। সামনে দাঁড়িয়ে দু'তিনজন প্রৌঢ় উকিল কেউ হাত পেতে অতি সন্তর্পণে পানের বোঁটায় চুন নিচ্চো, কেউ কায়স্থের হুঁকোটার জন্যে তাড়া দিচ্চো, কেউ বা বাঁ হাতে এক চিমটে দোক্তা নিয়ে ডান হাতে গোটাতিনেক পানের খিলি একসঙ্গে, মুখে পুরে দিচ্চো, কেউবা তাড়াতাড়িতে বগলদাবা থেকে মাটিতে ছড়িয়ে পড়া ব্রীফ গুলো সাম্‌লাতেই ব্যস্ত। সামনে বসে কয়েকজন মক্কেল হাতেই হুঁকোর কাজ সারচে। পানওয়ালীর দৃষ্টি সজাগ সব দিকে। 'মিশির' কালো ছোপ-লাগা দাঁত গুলো সর্ব্বদাই বিকশিত। মেঘলা আকাশের নীচে পোড়া কাঠের মত তার গায়ের রঙ্‌।

খেলান' পানের দোকানটিকে বাঁয়ে রেখে হাত পাঁচেক সামনে এগুলে বারলাইব্রেরীর চৌকাঠ পর্য্যন্ত পৌছন যায়। অবশ্য চৌকাঠ তার একটি নয়, সামনে আর পেছনে ক'রে গুটি দশ। সম্পূর্ণ একতলা ঘরটি—মাটি থেকে হাত সাতেক উঁচু। সামনেই পাঁচটি রুজু রুজু দরজা, প্রত্যেক দরজার ব্যবধানে একটা কোরে লোহার গা-নল। আগাগোড়া ফ্যাকাশে লাল ইটের গাঁথুনী। একটু জোরে হাওয়া বইলেই দেখা যাবে, অশ্বত্থ-বট গাছটা অনেকগুলো হাত বার করে' লাইব্রেরীটার মাথায় হাত বুলোচ্চে।

ধরুন, ঘরটার কালি ১৬০ বর্গ হাত (দৈ: ২০ হাত × প্র: ৮ হাত)। এবার ভেতরে আসা যাক :—

বাঁ দিক থেকে তিনটে দরজার মুখ পর্য্যন্ত একটা হাত ছয়েক লম্বা টেবিল—সেই অনুপাতে নানান ধরণের চেয়ার, যথা—বেতের ছাউনি, কাঠের ছাউনি, স্প্রিং-এর ছাউনি ; হাই-ব্যাক, লো-ব্যাক্ ; উইথ আর্ম্‌ এবং উইদাউট আর্ম্‌ ; ফোল্ডিং এবং ফিক্‌স্‌ড। ঘরে ইতস্ততঃ অনেকগুলি আলমারী। আরো স্পষ্ট করে' বল্লে' : দশটা দরজার ডাইনে, বাঁয়ে দশটি আলমারী। বাইরের রোদ্দুর আর ধূলো ঠেকাবার জন্যে সব দরজা কটার পর্দ্দা আপাততঃ গোটান (হতেও পারে, ব্যবহারজীবিদের আসা-যাওয়ার উজান স্রোতকে ঠেকাবার জন্যে বয়-মণ্ডলীর এবম্বিধ উদ্ভাবনী)। প্রত্যেক দরজার মাথার ওপর মৃত, অথচ একদা-খ্যাত, এতদঞ্চলীয় ব্যবহারজীবিদের তৈলচিত্র—ফাঁকে-ফাঁকে ফ্রেমে-আঁটা কয়েকটি বিদায় প্রশস্তি।

হঠাৎ ঘরটায় ঢুকলে আদালতটার উচ্চ প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। তাকে উপযুক্ত ভাষা দেবার ক্ষমতা কেবল এই ঘরের অধিবাসীদের আছে, আর তা বুঝতে পারেন কেবল ঐ আদালত গৃহগুলির ধর্ম্মাধিকরণরা।

(ডানদিকের শেষ মাথায় জানালার নীচে মস্ত একটা রঙ্-চটা আরাম্ চেয়ারে একজন বয়স্থ ভদ্রলোক খবরের কাগজে মুখ ঢেকে শুয়ে আছেন।)

টেবিলটার চার পাশে কয়েকজন তরুণ ব্যবহারজীবি ঘরোয়া আলাপে প্রমত্ত। নীচে মাত্র চারজনের কথা-বার্ত্তার অবতারণা করা হয়েছে। কথাবার্ত্তার মাঝে কিন্তু দরজাগুলো দিয়ে অনেকে আস্‌চেন এবং যাচ্চেন, বেয়ারাগুলো জলের গ্লাস, বই, ছাতা, টুপী, লাঠি নিয়ে ছুটোছুটি ক'রচে। টেবিলটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ।]

১ম—

ওহে, বুড়োর ভিম্‌রোতীটা একবার দেখলে ?

২য়—

কার ? অবিনাশবাবুর তো ? নতুন আর কি দেখাবে !—সে-তো অনেকদিন দেখা আছে !

১ম—

ইদানিং একটু বেশী বলে' মনে হচ্চে যেন !

৩য়—

হ'বে না ? যে ভিম্‌রুল পেছনে লেগেচে, ও বুড়ো বোল্‌তা আর কদ্দিন ! ভন্‌ভনানই সার !

৪র্থ—

যা বলেচে ! দেখচি, আলীপুরে আর সুবিধে হ'লো না, তাই দক্ষিণ মুখো ছুটলো এবার !

২য়—

আঃ ! এটাও বোঝোনা, বুড়ো হ'লে খোলা হাওয়া না-হ'লে চলে না ?

৩য়—

শেষে উড়ে না যায় ! যে রোক্ চেপেচে বুড়োর !

৪র্থ—

মরণ কামড় ! শেষ চেষ্টা বুঝলে না !

২য়—

নাঃ, তোমরা দেখ্‌চি সাইকোলজি বোঝ না ! জ্বালাটা কোথায় দেখচো না ? আহা !

১ম—

খুব পাচ্চি ! সোমেশ্বর আসা থেকে সেটা চাগিয়ে উঠেচে। সেই সঙ্গে নামটা যে ওঁর ধামা চাপা পড়চে, তা কি বুড়ো আর বুঝ্‌তে পারেনি !

৪র্থ—

কিন্তু যাই বল, অবাক করলে বটে—ধন্য ধৈর্য্য ! কে-এক-তারিনী-সামন্ত তাকে নিয়ে ছুটলো কিনা সোজা দক্ষিণ মুখো ডায়মণ্ডহারবারে !

৩য়—

আমি বাজি রাখতে পারি, ও বুড়ো হেরে মরবে! কেন মিছে মিছে আর—

১ম—

ঐ জন্যেই ব'লচি, একেবারে যাকে-বলে ভিমরতী!

২য়—

But a drowning man catches at a Straw!

১ম—

Sentimental fool! সসম্মানে বিদেয় নিলে পারতেন! যত সব বাজে বাগাড়ম্বর! 'জ্বালাময়ী' আর 'আবেগময়ী'র প্রসব বেদনায় বেচারা কাহিল!

৩য়—

একেবারে বোগাস! Law Point, Law Point করে' কোর্ট ফাটায়!

২য়—

কিন্তু নামতো ছিল এক কালে! আই সিম্প্যাথাইজ্!

৩য়—

সে ভাঙ্গিয়ে আর কদ্দিন চলে? He must make room or *die*!

১ম—

Intellectualismএর কাছে কি আর Sentimentalism-এর ফাঁকি চলে হে? নতুন I.C.S. গুলো তো আর কণ্ঠিধারী বুড়ো নয়!

৪র্থ—

তার ওপর আবার উদারতা নেই। Mean minded old goose!...সোমেশ্বরের ওপর আক্রোশে দু'বছর তার সঙ্গে বাক্যালাপ নেই! পেছন ফিরিয়েই আছেন! নেই তো নেই, তাতে সোমেশ্বরের ভারি বয়েটা গেল!

২য়—

কথাই বা হয় কি করে'? সেই সেবার সোমেশ্বর কম হারনটা হারালে—নাকানি-চোবানি! আহা!

৪র্থ—

তা বলে' Sportsman Spiritও থাকবে না? নাই বা *agree* ক'রলি, মুখ বেকানটা আবার কি রে বাপু!

৩য়—

Old fool! Silly!! দেখনা সসম্মানে হেরে আসেন—আপনা হ'তে চিট্ হ'য়ে যাবে।

১ম—

হারুক তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু লোক হাসান কেন রে, বাপু! আক্কেলও খেয়ালি শেষ পর্য্যন্ত? It's a pity!

[ইজি চেয়ারের ভদ্রলোকটি একটু নড়েচড়ে উঠলেন। খবরের কাগজের খস্‌খসানি একটু শোনা গেল।]

৩য়—

অবাক হ'য়ে যাই, ওঁরা 'জিনিয়স্‌কে' কিছুতে স্বীকার করেন না কেন? আরে যে উঠবে তাকে তুই আট্‌কে রাখ্‌তে পারিস্‌?

৪র্থ—

কারণ নিজেরা তো আর 'জিনিয়স্‌' নয়, গলাবাজিটাই ওঁদের মাপ্‌কাঠি! যত সব Old Bloc!!

২য়—

Better say, Father forgive *them*.—

১ম—

For *they* do not know what *they* are!

৩য়—

আমার হাতে যদি আইনের ভার থাক্‌তো, তাহ'লে আগেই ঐ বুড়োগুলোকে Court থেকে বের করে' দেবার ব্যবস্থা করতুম! ছেলেমানুষ সব!!

৪র্থ—

সোমেশ্বরের সঙ্গে Rivalry কর'তে যায়—তার মুখের কাছে দাঁড়াতে পারে? যত সব পাগল-ছাগলের দল!

১ম—

একটা মজা দেখচো, দুনিয়ায় আর সবার পেন্‌সনের ব্যবস্থা আছে—নেই কেবল ঐ সব headstrong jealous বুড়ো উকিল গুলোর!

২য়—

Pity *them* if you would.!

৩য়—

কিন্তু সাহসটাও ধন্যি! যেখানকার Public Prosecutor সোমেশ্বরেরই ক্লাস-ফ্রেণ্ড। দেখনা, কেঁদে ফিরে আসে—,

২য়—

আঃ, Let *him* have his own *quagmire* !

[ইঞ্জিনেয়ারের ভদ্রলোকটি খাড়া হ'য়ে উঠে পড়লেন। হাত দুটোকে পেছনের দিকে বদ্ধ করে' গুরুপদক্ষেপে সামনের একটা দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন।]

১ম—

অ-অ-বিনাশ বাবু—উ !

৩য়—

বুড়ো বড্ড শুনে ফেলেচে !

৪র্থ—

চুপ্, চুপ্ !—চাপা দাও, চাপা দাও !!

২য়—

কাজটা কিন্তু ভাল হ'লো না !

[ক্রমশঃ

জাপানের দৃষ্টি কোনদিকে ?

সুধাংশু দাশগুপ্ত

জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্র আজ কূল ছাপিয়ে পড়েছে। শুধু চীনদেশের উপরই জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের দৃষ্টি নিবদ্ধ নয়, তার দৃষ্টি সুদূর প্রসারিত—১৯২৭ সালের টানাকা-পত্রই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সুদূর প্রাচ্যে জাপানের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করাই জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের লক্ষ্য। দীর্ঘদিন চীনে যুদ্ধ-রত থাকায়ও জাপান একটুও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। সুদূর প্রাচ্যের দেশসমূহে রাষ্ট্রিক ও আর্থিক আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা সে পূরো দমেই করে চলেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরস্থিত উপনিবেশসমূহে জাপানী মূলধন খাটিয়ে, সস্তায় জাপানী পণ্য বিক্রী করে এবং কাঁচামাল ক্রয় করে দেশীয় বুর্জ্জোয়াদের সঙ্গে আর্থিক ক্ষেত্রে সখ্য স্থাপনে জাপান আজ সচেষ্ট। ঐ সব দেশে দেশীয় বুর্জ্জোয়াদের ও জনগণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবকে জাপ-প্রীতিসম্পন্ন করে তুলবার জন্য জাপান শ্লোগান তুলেছে—"এশিয়ায় শুধু রাজত্ব করবে এশিয়াবাসী।" ত্রাণকর্ত্তার মুখোস প'রে জাপ-প্রচারক পাঠিয়ে ধীরে ধীরে জাপান নিজের পথ পরিষ্কারে ব্যস্ত। জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের এ নীতি নতুন কিছু নয়—উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপের কাছ থেকে বিশেষ করে গ্রেট-বৃটেনের কাছ থেকেই তার এ শিক্ষাদীক্ষা।

কিন্তু প্রচারকের পরেই আসে সেনাপতি, বাজে রণদামামা। জাপান তাও শিখে নিয়েছে, তবে সবই সময়সাপেক্ষ। ১৯৩৮ সালের মিউনিক চুক্তির অব্যবহিত পরেই জাপান ক্যান্টন ও হেইনান্ দ্বীপ অধিকার করে এবং যখন দেখল যে গ্রেটবৃটেন ও ফ্রান্স চীনে জাপানের অগ্রগতিকে বাধা দিচ্ছে না তখন ১৯৩৯ সালের মার্চ্চ মাসে ফরাসী অধিকৃত "স্প্রাট্লে" দ্বীপপুঞ্জ জাপ-সাম্রাজ্য-ভুক্ত করে নিল। "স্প্রাট্লে" দ্বীপপুঞ্জ ফরাসী ইন্দোচীন থেকে ৩০০ মাইল, সিঙ্গাপুর থেকে ৬০০ মাইল, বোর্ণিও থেকে ৩৫০ মাইল, দক্ষিণ-পশ্চিম ফিলিপাইন থেকে ৩০০ মাইল দূরে অবস্থিত।' সুতরাং প্রশান্ত মহাসাগরে ভবিষ্যৎ সমরে নৌ-ঘাটী হিসেবে ভৌগলিক অবস্থানের দিক থেকে 'স্প্রাট্লে' দ্বীপপুঞ্জের প্রয়োজনীয়তা জাপানের কাছে প্রচুর। আজ অবস্থাচক্রে এ দ্বীপমালা জাপানের কুক্ষিগত হওয়ায় হংকংএর বৃটিশ দুর্গসমূহ অকেজো, জাপান কর্ত্তৃক ফিলিপাইনস্ ও' ইন্দোচীনের অবাধ অবরোধের সম্ভাবনা, শ্যামদেশের উপর জাপানী নৌ-বাহিনীর আক্রমণের সুবিধা হয়েছে এবং সিঙ্গাপুরের বৃটিশ নৌ-ঘাটীর গুরুত্ব কমে গিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বর্ম্মা, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড অভিমুখে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসারের পথ আজ প্রশস্ত। বর্ত্তমানে ফিলিপাইন, ইন্দো-চীন, শ্যামদেশ, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিওর প্রতিই জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের শ্যেনদৃষ্টি।

আমেরিকা-অধিকৃত ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের কার্য্যকলাপ দ্রুতগতিতে চলছে। দক্ষিণ ফিলিপাইনের "ডাভাও" সহরে জাপানই প্রকৃত প্রভু—এই সহরের অধিবাসীদের

ভিতর জাপানীদের সংখ্যাই বেশী। উত্তর ফিলিপাইনে মৎস্য-ব্যবসার অছিলায় ফিলিপাইন-তীর-রক্ষীদের সাথে জাপানী নৌ-বাহিনীর সংঘর্ষ দিন দিন তীব্র হ'য়ে উঠছে। ফিলিপাইনের রাজধানী "ম্যানিলা" সহরেই জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্র। দেশের ধাতবদ্রব্যের নব্বই শতাংশ ক্রয় করে এবং জাপানের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্যের অবাধ সুবিধে দিয়ে দেশীয় বুর্জ্জোয়াদের জাপ-প্রীতিসম্পন্ন করে তুলতে জাপানী বুর্জ্জোয়া ধুরন্ধরগণের চেষ্টার ক্রটী নেই। জাপানী সমরবাদীরাও নিশ্চেষ্ট নয়। ছাত্র বিনিময়ের ব্যবস্থা ও সংস্কৃতিগত সম্বন্ধ স্থাপন করে দুই দেশের ভিতর বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে তারা ব্যস্ত। কিন্তু এই ব্যস্ততার অভ্যন্তরে জাপানী আধিপত্য বিস্তারের আকাজ্ক্ষা লুক্কায়িত। তার প্রমাণ ফিলিপাইনের ফ্যাশিষ্ট পার্টি—"সাকডালের" সাথে জাপানী সমরবাদীদের যোগাযোগ। এই "সাকডালে"র নেতৃবৃন্দ ১৯৩৫ সালে ফিলিপাইনে বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু সে পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। তখন সাকডালের প্রধান নেতা "রামোস্" উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার জন্য জাপানে চলে যান। তিন বৎসর শিক্ষান্তে গত বছর তিনি দেশে ফিরে, জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হ'য়ে ওঠেন। তাঁর মতে ফিলিপাইনের মুক্তি না-কী জাপানীদের সাহায্যেই আসবে। ফিলিপাইন কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রেসিডেন্ট "ক্রিসান্টো ইভানজেলিষ্টা" 'রামোস্'কে দেশের প্রধান শত্রু বলে ঘোষণা করে ফাশিষ্ট পার্টির বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম সুরু করে দিয়েছেন।

ফরাসী-অধিকৃত ইন্দো-চীনে এতদিন জাপানী আধিপত্য বিস্তার লাভ করতে পারে নি, কিন্তু হেইনান দ্বীপ অধিকার করার পর জাপ-নৌ-বাহিনী ইন্দো-চীন অবরোধ করে। জাপানের প্রধান দাবী ইন্দো-চীনের ভিতর দিয়ে চীনে অস্ত্র-শস্ত্র প্রেরণ বন্ধ করা। নিরুপায় হ'য়ে ফ্রান্সের এ দাবী মেনে নিতে হয়। ফ্রান্সের দুর্ব্বলতার সুযোগে জাপান আজ ইন্দো-চীনের অধিবাসিদিগকে ফ্রান্সের ও চীনের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলছে। ইন্দো-চীনের সর্ব্বত্র আজ জাপানী গুপ্তচর ও প্রচারক। দেশীয় পত্রিকাগুলোর অধিকাংশই জাপানীদের অর্থে পুষ্ট। দুর্দ্দিনকে ঠেকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্স নানা রকম সুবিধে দিয়ে জাপানীদের সন্তুষ্ট রাখতে বদ্ধপরিকর। কিন্তু অবস্থার দুর্ব্বিপাকে ফ্রান্স ভুলে গিয়েছে যে সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসারের যুগে থামা শক্ত আর এটা জাপানী-সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসারের যুগ।

শ্যামদেশে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের অবাধ প্রবেশাধিকার। সুদূর প্রাচ্যে জাপান ব্যতীত একমাত্র শ্যামদেশই স্বাধীন—ইংরেজ বা ফরাসীদের কোন প্রাধান্যই এখানে নেই। মিশর প্রবাসী শ্যামদেশের পূর্ব্বতন সম্রাট প্রজাদীপকের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ইংরেজ একবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সুফল কিছু হয় নি। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের উপর জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের অবর্ণনীয় প্রভাব। শ্যামদেশের নৌ-বাহিনীর কর্ম্মচারীরা জাপানে শিক্ষাপ্রাপ্ত, সমর-বিভাগের মন্ত্রদাতা জাপানী সমরবাদীরা, বোমাবর্ষণ করে বিধ্বস্ত করে তুলবে। জাপানী প্রচারকরা বর্ম্মায় এসে ধীরে ধীরে বর্ম্মাবাসীদের গবর্ণমেণ্টের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী থেকে সুরু করে নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারীর অধিকাংশই জাপ-প্রীতিসম্পন্ন।

শ্যামদেশের কোথাও জাপ-বিদ্বেষ লক্ষিত হয় না—স্বাধীন জাগ্রত জাপানের প্রতি ,শ্যামবাসীদের অটুট শ্রদ্ধা, আজ তারা জাপানের পূজারী। "এশিয়ায় রাজত্ব করবে এশিয়াবাসী" "শ্বেতাঙ্গ শাসকদিগকে এশিয়ার প্রান্ত থেকে বিতাড়িত করতে হবে"—জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের এমনিতর সুমধুর (!) শ্লোগানের কার্য্যকারিতা শ্যামদেশের মতন আর কোথাও দেখা যায় না। আর্থিক ক্ষেত্রেও শ্যামদেশে জাপানের প্রাধান্য বাড়তিমুখে। গত বছর পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জাপানীদের ব্যবসাবাণিজ্য সঙ্কুচিত হয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ঐ বছরই জাপানী ব্যবসাবাণিজ্যের সম্প্রাসরণ দেখা যায় শ্যামদেশে। জাপানীদের আর্থিক প্রাধান্য খর্ব্ব করবার জন্য বৃটেন চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সফলকাম হতে পারে নি। এমনিভাবে যদি শ্যামদেশে রাষ্ট্রিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয় তবে বৃটেন, ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডের সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। কারণ তা হ'লে সিঙ্গাপুর কোণঠেসা হয়ে পড়বে এবং সমগ্র দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রগতির পথ উন্মুক্ত হবে। অন্য দিকে শ্যামদেশে প্রধান সমরঘাটী করে জাপান মালায়া উপদ্বীপ, বর্ম্মা, ইন্দো-চীন প্রভৃতি দেশগুলোতে আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হবে।

বৃটিশ-অধিকৃত মালায়া দেশে দিন দিনই জাপানের ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার বেড়ে চলছে। এখানকার লৌহ-শিল্প জাপানী ধনতন্ত্রের করতলগত। অস্ত্রসজ্জার জন্য মালায়ার লৌহ জাপানের এক বৃহৎ সম্পদ। সিঙ্গাপুরের সমরঘাটীর সমস্ত তথ্যসংগ্রহে জাপানী সমরবাদীরা আগ্রহান্বিত এবং সচেষ্ট। সিঙ্গাপুর কূলে বারংবার জাপানী গুপ্তচর গ্রেপ্তারই এর প্রমাণ।

জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও পেট্রোল, রবার ও নানাবিধ খনিজপদার্থে সমৃদ্ধশালী। তাই এই দেশগুলির উপর জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের লোলুপ দৃষ্টি। জাপানী ধনতন্ত্রের বিকাশের পথে তিনটী জিনিষের দরকার খুব বেশী—পেট্রোল, কয়লা, লৌহ। এর ভিতর পেট্রোল ও কয়লারই তার অভাব। প্রয়োজনীয় নব্বই শতাংশ পেট্রোল তার বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। জাভা, সুমাত্রা বোর্ণিওর পেট্রোল-সম্পদের উপর যদি জাপান তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তবে সে নিশ্চিন্ত। জাপানীপ্রচারক ও গুপ্তচরগণ এ ক্ষুদ্র দ্বীপগুলোতে ততটা সুবিধে করে উঠতে পারে নি। কিন্তু স্প্রাট্‌লে দ্বীপমালা জাপানের কুক্ষিগত হওয়ায় এ তিনটী দেশকে জাপানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা এদের বিদেশী শাসন কর্ত্তাদের পক্ষে দুষ্কর।

সম্প্রতি বর্ম্মাদেশের উপরও জাপান ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে। ক্যাণ্টন্ জাপানের করতলগত হওয়ার পর চীনাবাসীরা বর্ম্মার ভিতর দিয়ে বিদেশ থেকে অস্ত্রসস্ত্র আমদানী করছে। জাপানের এটা মনঃপুত হয় নি—চীনকে পদানত করতে সে দৃঢ় সঙ্কল্প এবং সে পথে নতুন বাধা সৃষ্টি তার ক্রোধের উদ্রেক করা স্বাভাবিক। তাই বর্ম্মাবাসীদের সে ভয় দেখাচ্ছে যে যদি বর্ম্মার ভিতর দিয়ে চীনে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী চল্‌তে থাকে তবে নানকিং ক্যাণ্টন সহরের মতন রেঙ্গুন সহরকেও সে বৃটিশ-সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতীয়দের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুল্‌ছে। বর্ম্মাবাসীদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভকে কাজে লাগাবার চেষ্টাই জাপান করছে।

ভারতবাসীদের চীনাপ্রীতিতে জাপান শঙ্কিত। চীন-জাপান যুদ্ধ যে এসিয়াবাসীর কল্যাণের জন্য তা বুঝাবার জন্য ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলির লাইব্রেরীতে জাপ-গবর্ণমেন্ট-প্রদত্ত পুস্তিকা ও পত্রিকার ছড়াছড়ি। চীনের যুদ্ধ সম্বন্ধে জাপ-কবি নোগুচির রবীন্দ্রনাথের কাছে লিখিত পত্রাবলী, জাপ-প্রবাসী ভারতীয় ছাত্র ও প্রাক্তন বিপ্লবীদের সদম্ভ উক্তি—কিছুই ভারতবাসীকে জাপ-প্রীতি-সম্পন্ন করে তুলতে পারে নি।

জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসারের পথে আজ প্রধান অন্তরায় এশিয়াবাসীর জাপ-বিরোধী মনোভাব। চীনে জাপানী-সাম্রাজ্যতন্ত্রের নৃশংস বর্ব্বরোচিত অত্যাচার এশিয়াবাসীকে সজাগ করে তুলেছে—এশিয়াবাসীর কাছে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের গূঢ় রহস্য আজ উদ্ঘাটিত। এশিয়ায় শুধু রাজত্ব করবে এশিয়াবাসী", "কম্যুনিজমের খর্পর থেকে এশিয়াবাসীকে উদ্ধার করতে হবে" প্রাচ্যের সংস্কৃতিকে বাঁচাতে হবে—জাপানীদের এ সব শ্লোগানের মর্ম্ম এশিয়াবাসীর কাছে পরিস্ফুট। তাই তারা আজ সচেতন হয়ে নিজেদের জাপানীদের অক্টোপাস থেকে বাঁচাবার জন্য দেশে দেশে জাপ-বিরোধী আন্দোলনের সৃষ্টি করছে। জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিস্তৃতিতে যে দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা বিপন্ন হবে—এ কথাটা ফিলিপাইনবাসীরা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছে। তাই আমেরিকার প্রতি তাদের মনোভাব আজ পরিবর্ত্তিত। আমেরিকার কবল থেকে দেশের মুক্তির কথা তারা ভুলে যায় নি, কিন্তু তাদের মুক্তির প্রশ্নের সাথে সাথে এটাও তারা দেখছে যে বর্ত্তমানে ফিলিপাইনবাসীর ও ফিলিপাইনের স্বাধীনতার প্রধান শত্রু জাপানী সমরবাদী ফ্যাশিষ্টরা। এই নতুন শত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে হ'লে তাদের প্রয়োজন আমেরিকার সহায়তা। তাই তারা আমেরিকার সঙ্গে সংগ্রামের সূচনা না ক'রে, প্রগতি-পন্থী, গণতান্ত্রিক আমেরিকাবাসীদের সহায়তায় বিনাসংগ্রামে স্বাধীনতা অর্জ্জনে আজ বিশ্বাসী। ইন্দো-চীনের অধিবাসীরা তাদের সাম্রাজ্যবাদী প্রভু ফ্রান্সের জাপ-প্রীতি নীতির বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। জাপানের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য তারা চীনকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করছে। মালায়াদেশে জাপানীদের দ্বারা পরিচালিত খনিতে কর্ম্মরত শ্রমিকরা বারংবার ধর্ম্মঘট করে জাপানীদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলছে। ভারতবাসীরা তো জোর গলায় জাপানী-সাম্রাজ্যতন্ত্রকে নিন্দা করছে এবং চীনাবাসীদের প্রতিই যে তাদের সহানুভূতি তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তারা দেখিয়েছে চীনের "Medical Unit" প্রেরণ করে।

গণ-জাগরণের আবর্ত্তে জাপানী-সাম্রাজ্যতন্ত্র আজ ঘুরপাক খাচ্ছে। দীর্ঘদিন চীনের বুকে অত্যাচার উৎপীড়নের তাণ্ডব নৃত্য চালিয়েও চীনকে পদানত করতে সে অপারগ। চীনাবাসীদের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ ও দৃঢ়সঙ্কল্প সমস্ত এশিয়াবাসীর প্রাণে নব চেতনার সাড়া এনে দিয়েছে। জনগণের এই উদ্দীপনা ও চেতনার কাছে জাপানী-সাম্রাজ্যতন্ত্রের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়া অসম্ভব নয়। জাপান চীনের যুদ্ধ থেকে অনেক অভিজ্ঞতাই লাভ করেছে, কিন্তু তবুও সাম্রাজ্যতন্ত্রের রথচক্রকে থামাবার শক্তি তার নেই।—ইতিহাসের এ এক অদ্ভুত পরিহাস!—

হে মহাজীবন—

"প্রিয়দর্শী"

কোথা ছিলে অবলুপ্ত ?
হে মোর মহান,
হে আমার মহীয়ান
হে মহাজীবন ধারা
কোথায় হারায়েছিনু তোমা ?

আজ অকস্মাৎ মূর্চ্ছাহত অন্তরে আমার
তোমার বন্যার খর বেগ হোল প্রধাবিত—
বিচ্ছুরিত সুতীব্র আলোকে—আঘাতে—
তন্দ্রা মোর গেল দূরে—
তোমারে পেলাম আপনার বক্ষোপরে।

হে মোর জীবন ধারা
হে মহাজীবন ধারা
সাবলীল শক্তিমান
উত্তুঙ্গ ভয়াল
তুমুল উত্তাল দুর্ণিবার।

পৃথিবীর সীমাবচ্ছিন্নের মোহ
খণ্ডতার মরীচিকা আমারে ভুলায়েছিল ;
তারই বংশীধ্বনি—কুহকিনী—
তোমার ও স্রোতধারা হ'তে দূরে বহু দূরে—ঘন বন অন্তরালে
আমারে সরায়ে নিয়ে
তোমার ও প্রবাহের সুর লুপ্ত করেছিল
আমার শ্রবণ হ'তে ;

যে তোমার একতম রূপে, হে মহাজীবন,
পরিব্যাপ্ত করি আছে সমগ্র জগৎ
তাহারে আড়াল করেছিল,
তাই—
প্রাত্যহিক প্রকাশের সাথে
চিরন্তন জীবনের যোগসূত্র খুঁজে নাহি পেয়ে
আপনার সত্ত্বারে হারায়ে
বিস্মৃত চৈতন্য আমি তোমারে যে ভুলেছিনু।

আজ দেখি তুমি মোরে ভোল নাই
তাই—
তটপ্লাবি প্লাবনের রূপে ছুটে এলে মোর কাছে—
সংঘাতে তোমার সচকিত চিত্ত মোর—
পুনঃ দেখা পেল আপন সত্ত্বার
যে সত্ত্বা তোমারই মাঝে এক হয়ে আছে অবিচ্ছিন্নরূপে
নিরন্তর ;
যে সত্ত্বা আমারই মত অসংখ্য প্রকাশ সাথে
আমারে রেখেছে এক করে
একই অন্ধকারে গাঁথা অগণিত তারকার মত।

আজ
হে মোর জীবন
হে মহাজীবন
মোর প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ খুঁটিনাটি
নিতান্তই বিচ্ছিন্ন এ ব্যষ্টি জীবনের
দ্বিধা দ্বন্দ্ব, চিন্তা ও ভাবনা
প্রতিদিনকার সুখ দুঃখ, আশা ও নিরাশা
তোমার ও সর্ব্বপ্লাবি দুর্ব্বার স্রোতের মুখে
কোথা গেল ভেসে
উচ্চ জলোচ্ছ্বাসে ?

হে আমার প্রচণ্ড জীবন ধারা
সুন্দর ও ভয়ঙ্কর,
বৈচিত্র্যের বীচিমালা সমুজ্জ্বল,
প্রাণের কল্লোলে মুখর,
একতম—একমেব,
অবিচ্ছিন্ন, অখণ্ড ও অপরূপ
শান্ত—প্রশান্ত—বিরাট,

আমার এ স্বতন্ত্র সত্ত্বারে
নিমজ্জিত করে দিয়ে
মরে গিয়ে মুক্তি পেনু তোমার অন্তরে
মহাজীবনের মাঝে এক হয়ে!

তোমার প্রকাণ্ড ঢেউয়ে উৎক্ষেপিত হয়ে
স্পর্শ করে গগনের আমার ললাট
সূর্য্য চন্দ্র তারকার সু-উচ্চ নীলিমা দেশ;

দেখি—
বিশাল জগৎ
তার অসংখ্য বস্তুর প্রকাশ নিচয়
বালুকার তট—পড়ে আছে পদতলে
প্লাবনের একাকারে এক হয়ে মুছে যাবে
তারই স্তব্ধ প্রতীক্ষায় স্থির হয়ে।

হে মোর মহান,
হে আমার মহীয়ান
হে মহাজীবন ধারা
আমার এ কাব্য মাঝে
তোমার ও প্রবাহের,
আবর্ত্তের,
উচ্ছ্বাসের,
পরিপ্লাবনের সুর
হোক গীতিময়।

আমার কবিতা হোক
মহাজীবনের পরিচয়।

বিনয় ঘোষ

পশ্চিম সীমান্তে গ্রেট্‌বৃটেন্‌ ও ফ্রান্স বনাম জার্ম্মানির যে যুদ্ধ চলেছে, সে-যুদ্ধের আজও অবসান হয় নি। হল্যাণ্ডের রাণী উইল্‌হেল্‌মিনা ও বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্‌ড্‌ শান্তি প্রস্তাব পেশ করেছেন। যুদ্ধরত জাতিগুলি এই দুই রাজারাণীর মহত্বের প্রশংসা করে' নিজ নিজ যুক্তি অনুযায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ নির্দ্দেশ করেছেন। শান্তি স্থাপনের ইচ্ছা সকলেরই আছে, কিন্তু সে-ইচ্ছাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার মত মনোভাবের ঐক্য নেই। শান্তি সকলের কাম্য এ-কথা অবিসংবাদিত সত্য, কিন্তু কী উপায়ে শান্তি স্থাপিত হবে, যত দ্বন্দ্ব সেখানেই। ভের্সাই থেকে মিউনিক্‌ পর্য্যন্ত শান্তির ইতিহাস যাঁরা লক্ষ্য ক'রেছেন, তাঁরা বলবেন ঐ ভের্সাই-মার্কা বা মিউনিক্‌-মার্কা শান্তি না আসাই বাঞ্ছনীয়। সকলেই শান্তির জন্য বিশেষ ব্যাকুল, কিন্তু শান্তির বীজ সত্যই কি ভাবে উপ্ত হলে ভবিষ্যতে সুন্দর শ্যামল রূপে অঙ্কুরিত হয়ে উঠবে সে-সম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা কারও নেই। সেইজন্য আমরা বলি :

"......Make perfect your will.
.... take no thought of the harvest.
But only of proper sowing."

(T. S. Eliot)

শান্তির ঠিক পথটি যদি আমরা বেছে নিতে পারি, তা হলে শান্তি তার আত্মরক্ষার ভারও নিজেই নেবে। আপনার জীবনীশক্তিতে সে প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠবে। সে-পথের বিচার পরে করব।

ইতিমধ্যে যুদ্ধের ফলে যে পরিবর্ত্তন ঘটেছে বা ঘটবার সম্ভাবনা আছে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক। কিন্তু এ-আলোচনার দায়িত্ব অনেক এবং বিশেষভাবে করবারও অনেক অসুবিধা। কারণ আইনের চোখরাঙানি ততখানি নয়, যতটা আন্তর্জ্জাতিক রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে আমাদের ন্যাশানালিষ্ট প্রেসের বিকৃত বিশ্লেষণ। আমাদের ন্যাশানালিষ্ট প্রেসের আন্তর্জ্জাতিক রাজনীতির ব্যাখ্যা পড়লে সত্যই সংবাদিকদের কূটনৈতিক মগজের বাহবা দিতে হয়। একে শুধু নির্দ্দোষ অজ্ঞতা বল্‌লে অন্যায় হয়, বলতে হয় দাসত্বের ফলে নির্ব্বুদ্ধিতা ও নীচতার সংমিশ্রণ।

পোল্যাণ্ড ও সোভিয়েট্ রাশিয়া

লাল ফৌজ যখন পূর্ব্ব পোল্যাণ্ডে প্রবেশ করলে প্রতিক্রিয়াশীল প্রেস থেকে কলরব উঠলো যে রাশিয়া সাম্রাজ্যলোভী, নাৎসী জার্ম্মানির সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করে' পোল্যাণ্ডকে বখ্‌রা করে নিচ্ছে। ষ্ট্যালিনিষ্ট্ সোশ্যালিজম্ আর হিট্‌লারিজম্ একই; ষ্ট্যালিন্ Counter-revolutionary, বুরোক্রাট্ ইত্যাদি। পোলিশ গভর্ণমেণ্ট্ যখন যুদ্ধ করছে তখনই তাকে এইভাবে আক্রমণ করে' ষ্ট্যালিন্ বিশ্বাসঘাতকতায় হিট্‌লারকেও অতিক্রম করেছে। এই প্রেসের এই সব মতামতের অপূর্ব্ব প্রতিধ্বনি শুন্‌লাম আমাদে ভারতবর্ষের ন্যাশানালিষ্ট্ প্রেসে, গণতান্ত্রিক প্রেমের পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত হ'য়ে ভারতবর্ষের সাংবাদিকরা বনেদী য়ুরোপীয় গণতন্ত্রের কীর্ত্তন করলেন, কৃষ্ণপ্রেমে আত্মবিহ্বল নিমাই-এর মত। আমরা হতভম্ব হ'য়ে শুনলাম, উপায় কি, পণ্ডিতদের উক্তি, কিন্তু এই জাতীয় কেতাবী পাণ্ডিত্যকে মনে মনে দোহাই না দিয়ে পারলাম না।

প্রকৃত ব্যাপার ঠিক বিপরীত। আমরা যেটুকু তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি তাতে অন্ততঃ তাই মনে হয়। পণ্ডিতদের বিচার পণ্ডিতদের থাক্, আমাদের বিচার আমাদের।

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর রাশিয়া একটি নোট্ গ্রেট্‌বৃটেন্ ও ফ্রান্সের কাছে পাঠায় এবং সেই নোটে প্রধানতঃ পাঁচটি বক্তব্য ছিল: (১) পোলিশ গভর্ণমেন্টের অস্তিত্ব নেই অর্থাৎ পোলিশ রাষ্ট্র বলে' বর্ত্তমানে কিছু নেই; (২) এই নেতৃত্বহীন অবস্থায় পোল্যাণ্ডে অনেক প্রকারের আকস্মিক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যাতে সোভিয়েট রাশিয়ায় সমূহ বিপদের সম্ভাবনা আছে; (৩) অবিবেচক নেতৃবর্গের দ্বারা পোল্যাণ্ড যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে; (৪) এই অবস্থায় সোভিয়েট্ গভর্ণমেন্ট্ হোয়াইট্ রাশিয়ান্ ও উক্রেনিয়ান্‌দের ঔদাসীন্যের সহিত দেখতে পারে না, তাদের আত্মরক্ষার আবশ্যকতা রাশিয়া স্বীকার করে; (৫) সোভিয়েট্ গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য পোলদের এই অবাঞ্ছিত যুদ্ধের কবল থেকে উদ্ধার করা এবং তাদের শান্তিময় জীবন ফিরিয়ে দেওয়া।

প্রথম বক্তব্যটি যে মিথ্যা নয় তার প্রমাণ দিচ্ছি। ১৮ই সেপ্টেম্বর "Daily Herald" পত্রিকার সংবাদ-দাতা লিখে পাঠান: "The members of the Polish Government, now in Rumanian territory, cannot by the terms of the neutrality, function as a government." ১৭ই সেপ্টেম্বর "The Times" পত্রিকার সংবাদ-দাতা লিখে পাঠান: "The Polish front has collapsed completely" এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর ঐ পত্রিকার কূটনীতিক সংবাদ-দাতা লেখেন, "by the time that the Red Army entered Poland, Polish resistance, outside a few areas, had collapsed or was collapsing." এর পরও যদি রাশিয়ার প্রথম বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণ করতে হয় তা হলে বাধ্য হ'য়ে বলতে হয় আমরা নাচার। সমস্ত পোল্যাণ্ডটি নাৎসীদের করতলগত হলে যে তার দুর্দ্দশার সীমা থাকত না এবং রাশিয়ার বিপদ সম্মুখীন হ'ত এ বিষয় সহজেই অনুমেয়। এই হ'ল দ্বিতীয় বক্তব্য। তৃতীয় বক্তব্যও এতটুকু মিথ্যা নয়, কারণ ইঙ্গ-ফরাসী-সোভিয়েট্ চুক্তির আলোচনার সময় পোল্যাণ্ড রাশিয়ার সহযোগিতার প্রস্তাব গর্ব্বিতের মত অগ্রাহ্য করে এবং এ ঔদ্ধত্য যে নেতৃবর্গের আছে তাদের অদূরদর্শী ও অবিবেচক ভিন্ন আর কি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে? চতুর্থ বক্তব্য হচ্ছে রাশিয়া কেন হোয়াইট্ রাশিয়া ও উক্রেইন্ দখল করলে? এ-প্রশ্নের উত্তরে একথা ভুললে চলবে না যে ১৯২০ সালে বৃটেন্ Curzon Line দ্বারা নবগঠিত পোলিশ রাষ্ট্রের যে পূর্ব্ব সীমান্ত নির্দ্ধারণ করে' দিয়েছিল, মার্শাল পিলসুড্স্কি সেই নির্দ্দেশ লঙ্ঘন করে' মিত্ররাষ্ট্রদ্বয়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, যুদ্ধ করে' ঐ লাইনের পূর্ব্বাবস্থিত হোয়াইট্ রাশিয়া ও উক্রেইন্ দখল করেছিলেন। আজ বৃটেন্ ও ফ্রান্সের সে কথা স্মরণ করা উচিত। এই হোয়াইট্ রাশিয়ান্ ও উক্রেনিয়ান্ কৃষকেরা পোলিশ ভূস্বামীদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে নিপীড়িত ও শোষিত হয়েছে, সুতরাং সেখানে আজ যৌথ চাষের (Collective farming) আবেদনে এবং ভূস্বামীদের বৃহৎ সম্পত্তি বণ্টনে যদি তাদের আনন্দই হ'য়ে থাকে, তা হলে পূর্ব্ব-পোল্যাণ্ডের সোভিয়েটীকরণ রাশিয়ার দিক থেকে সাম্রাজ্যাতুর পাশবিকতার নিদর্শন নয়, স্বাধীনতা, সাম্য ও শান্তিকামী মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পঞ্চম বক্তব্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সোভিয়েট রাশিয়া পোলদের ফ্যাশিজম্-এর নাগপাশ থেকে ছিন্ন করে স্বাধীন করতে চায়। কথার অর্থ হচ্ছে এই যে পশ্চিম পোল্যাণ্ডে হিট্লারকে 'Puppet state' গড়তে ষ্ট্যালিন্ সাহায্য করবেন না। হিট্লারের সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য পশ্চিম পোল্যাণ্ডের প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাশিষ্ট-পন্থীদের নিয়ে একটি অতি-প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক ডিক্টেটরশিপ্ গড়তে হবে। এই ডিক্টেটরশিপের আয়ু যে স্বল্প তা বেশ বোঝা যায় কারণ পাশে পূর্ব্ব পোল্যাণ্ডের 'Sovietised' অবস্থা সেখানকার জনসাধারণকে উৎসাহিত করবে। তারা ভিতর ভিতর গোপনে সঙ্ঘবদ্ধ হবে এবং আন্দোলন করবে এবং এই আন্দোলন অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ চললে পশ্চিম পোল্যাণ্ডে অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি করবে। পোল্যাণ্ড সেদিন মুক্তি পাবে, স্বাধীন হবে।

বল্‌কান্‌, বল্‌টিক্‌ ও সোভিয়েট রাশিয়া

বল্‌কানে ও বল্‌টিকে যে ফ্যাশিষ্ট ষড়যন্ত্র চলছিল এতদিন, আজ সোভিয়েট রাশিয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টায় সে অশুভেচ্ছা ব্যর্থ হয়েছে। বল্‌কান্‌ ও বল্‌টিকে আজ সোভিয়েট প্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। ল্যাটভিয়া, এস্তোনিয়া ও লিথুয়্যানিয়ার সঙ্গে পারাস্পরিক সাহায্যের সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, অর্থনৈতিক চুক্তিও হয়েছে। ভিল্‌না সহর লিথুয়ানিয়াকে রাশিয়া ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। লিথুয়্যানিয়ানরা সেজন্য আনন্দোৎসব করছে। জার্ম্মান বণ্ট্‌রা পাত্তাড়ি গুটিয়ে গৃহাভিমুখে যাত্রা করেছে। এস্তোনিয়ার সামরিক কর্ম্মচারীদের মধ্যে ফ্যাশিষ্ট মনোভাবাপন্ন যারা তাদের বিতাড়িত করা হয়েছে। ল্যাটভিয়ার প্রেসিডেণ্ট ঘোষণা করেছেন যে এই চুক্তিগুলি "have given the Baltic countries security and freedom from threats of war." সোভিয়েট বন্দর লেনিনগ্রাড্‌ আজ ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের "bottle-neck" থেকে মুক্ত। বাকি রয়েছে শুধু ফিণল্যাণ্ডের সঙ্গে চুক্তি। রাশিয়া এলাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ চায় তার আত্মরক্ষার জন্য কিন্তু ফিণল্যাণ্ড আপত্তি ক'রছে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন প্রমুখ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্‌ দেশগুলির প্ররোচনাতে। স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান্‌ দেশগুলির স্বার্থ আছে, কারণ তাহ'লে তাদের বাণিজ্য স্বার্থে আঘাত লাগে। তারা চায় বল্‌টিক্‌ উন্মুক্ত থাকুক, জার্ম্মানির সঙ্গে ব্যবসা চলুক এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য যোগাযোগের পথ পরিষ্কার থাক। সেইজন্য ফিণল্যাণ্ডকে তারা উস্কানি দিয়ে চুক্তি ক'রতে দিচ্ছে না। এই চুক্তি সম্পাদিত হ'লে ফিণল্যাণ্ড উপকৃত তো হবেই, সমস্ত উত্তর-পূর্ব্ব য়ুরোপও ফ্যাশিষ্টদের আক্রমণাতঙ্ক থেকে মুক্তি পাবে।

বল্‌কানের পরিবর্ত্তনও অপ্রত্যাশিত। গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স কিছুদিন পূর্ব্বে গ্রীস ও রুমানিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি করাতে বুলগেরিয়া ও যুগোশ্লাভিয়া 'ফ্যাশিষ্ট 'অক্ষের' দিকে ঝুকেছিল, কিন্তু পূর্ব্ব পোল্যাণ্ডে রাশিয়ার কৃতকার্য্যতা লক্ষ্য করে' তারা মনোভাব পরিবর্ত্তন করেছে। বুলগেরিয়া রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা করতে ব্যস্ত, তার রপ্তানি বাণিজ্য ইতিমধ্যে মস্কোর অধীনে এসেছে। যুগোশ্লাভ গভর্ণমেণ্টেরও এখন আর ক্রেমলিনের উপর সেই বিদ্বেষভাব নেই, বিশেষ ক'রে পুরাতন সার্ব-ক্রোট দ্বন্দ্বে রমীমাংসা হ'য়ে গেছে এবং এখন কৃষক পার্টির বিখ্যাত ক্রোট নেতা ডাঃ ম্যাচেক্‌ ডেপুটি প্রধান মন্ত্রী। কোমিণ্টার্ণ-বিরোধী ব্লকের ভূতপূর্ব্ব সভ্য হাঙ্গেরীর পররাষ্ট্র-নীতি এখন সংস্কার করা হ'য়েছে। প্রায় বিশ বৎসর পূর্ব্বে বুদাপেস্তে কম্যুনিষ্ট আন্দোলন দমন করে হর্থি গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত হাঙ্গেরী ফ্যাশিষ্ট-পন্থী ছিল। আজ হাঙ্গেরী ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী এবং সোভিয়েটের বৈরীতা পছন্দ করে না। রুমানিয়া ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী ছিল এবং এখন সোভিয়েটের নির্দ্দেশে যদি একটি 'বল্‌কান্‌ ব্লক' গড়ে' ওঠে তা হ'লে রুমানিয়ার তাতে যোগদান না করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। রাশিয়ার ইচ্ছা সোভিয়েট-তুরস্ক চুক্তি করে' এই উদ্দেশ্য সফল করে। চুক্তি এখনও সম্পাদিত না হ'লেও এবং নূতন করে' ইঙ্গ-

ফরাসী-তুরস্ক চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'লেও, ক্রেমলিনের নৈরাশ্য আসে নি। সারাজোগ্লুাই বলেছেন যে আলোচনার পথ এখনও উন্মুক্ত আছে এবং কখনও তুরস্ক সোভিয়েটের শত্রুতা করবে না।

প্রাচ্যের পথে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব য়ুরোপে, পূর্ব্ব য়ুরোপে এবং উত্তর-পূর্ব্ব য়ুরোপে—বল্টিক্ সাগর থেকে কৃষ্ণ সাগর পর্য্যন্ত এইভাবে সোভিয়েট রাশিয়া ফ্যাশিজম্-এর অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে এবং অনেকখানি সক্ষম হয়েছে। তুরস্ক ও ফিণল্যাণ্ডের সঙ্গে আপোষ হ'লেই এই প্রচেষ্টা সর্ব্বাঙ্গীন সার্থক হবে।

চীনের যুদ্ধ ও সোভিয়েট রাশিয়া

পশ্চিম রণাঙ্গনের কোলাহলে চীনের সংগ্রাম আর আমাদের কানে পৌঁছায় না। একটু আধটু যা খবর আসে তাতে চীনের যুদ্ধজয়ের দৃঢ় সঙ্কল্পের কথাই মনে হয়। মার্শাল চিয়াং কাইসেক্ সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন যে সংগ্রামের তৃতীয় পর্য্যায়ে চীন যেদিন পৌঁছাবে, জাপানের দ্রুত পরাজয় সেদিন সুরু হবে। ইতিমধ্যে চীন ঠিক তেমনি অক্লান্ত ভাবে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যুদ্ধ করছে, সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি ও সৈন্যদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে নূতন করে'। সব চেয়ে আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে রাশিয়া খুব আগ্রহের সঙ্গে চীনকে অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছে এবং জাপানী সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের জন্য চীনকে উৎসাহিত করছে। জাপানের বর্ত্তমানে যে ত্রিশঙ্কু অবস্থা তাতে কোমিন্টার্ণ-বিরোধী বন্ধুদের রূপবদলে ব্যাথিত জাপানের নূতন প্রধান মন্ত্রী আবে আজ বুঝেছেন যে ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তাই জাপান বর্ত্তমান যুদ্ধে নিরপেক্ষতার কথা বলে' চীন সমস্যা সমাধানের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়েছে। কিন্তু সমস্যার সমাধান হবে চীনের সুনিশ্চিত জয়ে, জাপানী সম্রাজ্যবাদের ধ্বংসে। আবে আজ ষ্ট্যালিনের দিকে যতই কটাক্ষ করুন, হিট্লারের দিকে চেয়ে যতই দাঁত কামড়ান, তাঁর ভীত বক্ষস্পন্দনও আমরা বুঝতে পারি।

শান্তি প্রস্তাব ও সোভিয়েট রাশিয়া

শান্তি সম্বন্ধে যদি প্রশ্ন করি কবি সুইন্‌বার্ণের মত: "Statesman, what of the night?" আর যদি য়ুরোপের বর্ত্তমান শাসকশ্রেণী উত্তর দেন:

> "The night will last me my time.
> ....
> Have we not fingers to write
> Lips to swear at a need?
> Then, when danger decamps,
> Bury the word with the deed".

—তা হলে আশ্চর্য্য হবার বিশেষ কিছু নেই।

হল্যাণ্ডের রাণী ও বেলজিয়মের রাজার উদ্যম প্রশংসনীয়। তাঁদের শান্তি প্রস্তাবে যুদ্ধরত জাতিগুলি নিজ নিজ ভঙ্গিমাতে উত্তর দিয়েছে। প্রত্যেকের দাবী আছে এবং হাস্যম্পদ ব্যাপার হচ্ছে এই যে দাবীগুলি পরস্পর-বিরোধী। মতৈক্যে উপস্থিত হ'য়ে এই উপায়ে যে শান্তি স্থাপিত হবে আমাদের মনে হয় না।

শান্তির জন্য আমরাও একটি প্রস্তাব দিতে পারি। যুদ্ধরত ও শান্তি-প্রয়াসী রাষ্ট্রগুলির একটি কন্‌ফারেন্স আহ্বান করা হোক্ এবং সোভিয়েট রাশিয়া তাতে আমন্ত্রিত হোক্। মিঃ এইচ, এন, ব্রেলস্‌ফোর্ডের 'নূতন লীগের' প্রস্তাব এইদিক থেকে অগ্রাহ্যনীয় নয়। গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক ক্ষুদ্ররাষ্ট্রগুলির সহযোগিতার ভিত্তির উপর এই লীগ গঠিত হবে। শান্তির কয়টি সর্ত্ত থাকবে; (১) অষ্ট্রিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রভৃতির স্বাধীন গণতান্ত্রিক জীবন দান; (২) নূতন পোল রাষ্ট্র গঠন ও তার আত্মরক্ষার জন্য আন্তর্জ্জাতিক প্রতিশ্রুতি-হোয়াইট রাশিয়া ও উক্রেইনের কোন প্রশ্ন যে উঠতে পারে না তা পূর্ব্বেই বলেছি; (৩) উপনিবেশ-গুলিকে শাসনের অধিকার দান। কিন্তু এই কন্‌ফারেন্সের পূর্ব্বে আমরা বলি একটি International Labour Conference আহ্বান করা উচিত। Organised Labour-এর সহযোগিতা ভিন্ন কোন যুদ্ধ চলতে পারে না। এই কন্‌ফারেন্সে উপরোক্ত দাবীগুলিই নির্ণীত হবে এবং এর সার্থকতা এই যে পরে International Powers' Conference-এ এর যথেষ্ট প্রভাব পড়বে এবং মিউনিকের পুনরভিনয় হবে না।

কিন্তু জার্ম্মানির ভবিষ্যৎ কি? যুদ্ধে পরাজয়ের অর্থ সামাজিক বিপ্লব এবং সোশ্যালিষ্ট জার্ম্মানি। এই বিপ্লবের আগুন সহজেই বল্‌কানে ছড়িয়ে পড়বে, সেখানে শতকরা ৯০ জন কৃষক এবং তারা ভারতের কৃষকদের চাইতে কোন অংশেই কম নির্য্যাতিত বা শোষিত নয়। বল্‌টিকও রেহাই পাবে না, কারণ লাল ফৌজ সেখানে প্রস্তুত আছে। শান্তি কোথায়?

ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কি? সত্যমূর্ত্তির মনোবাঞ্ছাই কি পূর্ণ হবে? বিনাসর্ত্তে সহযোগিতা থেকে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার পদত্যাগ পর্য্যন্ত আমরা পৌঁছেচি। সেখান থেকে আবার সবরমতী আশ্রমের দিকে চলেছি। সেখান থেকে ওয়ার্দ্ধা, ওয়ার্দ্ধা থেকে আবার আশ্রম ঘুরে হয়ত দিল্লী যাব। চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে অহিংসা নীতি—নিষ্ক্রিয়তা থেকে নিয়মতান্ত্রিকতা, নিয়মতান্ত্রিকতা থেকে নিষ্ক্রিয়তা। সম্প্রতি ভগবানবুদ্ধের ফকির সেনাপতি বনাম নিধিরাম সর্দ্দার জিন্নার বাক্‌যুদ্ধ—হোয়াইট হল্ ও দিল্লীর 'কচে বারো'। জেটল্যাণ্ড করতালি দিচ্ছেন—শঙ্করদেও ভাবছেন 'লুৎফ নেহ্‌স্তকা'। আমরা ভাবছি আর কতদিন? মনে হয়:

> "O Lord, deliver me from the man of excellent intention
> and impure heart: for the heart is deceitful above all
> things, and desperately wicked"
>
> —(T. S. Eliot.)

২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৯, কলিকাতা

দেয়ালি ।

অমরগোপাল নন্দী

তিমির-দেউলে ওই তন্দ্রাহারা জ্বলিছে দেয়ালি,
সুপ্তির শিখরদেশে দীপ্তির জোনাকি দিল জ্বালি
অন্ধকারে নিরাতঙ্ক জাগরণ-প্রতীক-আভাস।
অনুর্ব্বর অনন্ত আকাশ
নিরুপায়ে দীর্ঘকাল ফেলিয়াছে ক্ষীণ দীর্ঘশ্বাস—
ছিদ্রহীন কালো মেঘ পুঞ্জীভূত ঢেকেছে তাহারে—
সৃজন-বিদ্যুৎ বহ্নি গগনে ছিল কি অন্ধকারে
সে বারতা জানে নাই কেহ
চকিতে মুহূর্ত্তে আজ জ্যোতির্ম্ময় কালো তার দেহ
ব্যাপ্ত করি প্রসারিত তারকার আলোকের মালা—
দুঃখের স্বপন দ্বারে সিদ্ধির ইঙ্গিত-দীপ জ্বালা।

সম্মুখে না দেখি পন্থা তবু স্থির যে বেয়েছে তরী,
উজানের বিকর্ষণে নিরন্তর যে কর্ষণ করি'
চলেছিল অসমান অশান্ত নদীর স্রোত রাশি
আজি তার বিশ্রামের বাঁশী
ধ্বনিছে কি ? পরিতৃপ্ত আজি সে কি শিথিলতা তলে
ডুবাবে সকলি তার অগ্নিভরা প্রাণের কল্লোলে ;
গগনের পটে দেখি অনাগত ভবিষ্যৎ-ছায়া
তাহারেই ভাবিবে সে কায়া ?
আলোকের পুষ্পতলে যে-সুন্দর রয়েছে লুকায়ে
স্বপন-নন্দন হতে তারে সে কি দিবেনা লুটায়ে
বন্ধন-বেদনা ক্ষীণ ধরণীতে—নূতনের ঘায়ে ?

গ্রন্থ-পরিচয়

ডেটিনিউ—

অমলেন্দু দাশগুপ্ত। প্রকাশক, সরস্বতী লাইব্রেরী, মূল্য ১৷৹

একদা বাঙ্গলাদেশের একদল ছেলে প্রায় একসঙ্গেই কারাপ্রাচীরের অন্তরালে ঢাকা পড়েছিলো। জেলে যখন জাল ফেলে তখন তার জালে রুই কাতলা থেকে আরম্ভ করে চুনোপুটী, পর্য্যন্ত সব মাছই ধরা পড়ে, সুতরাং জেলখানার জালেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। অতএব সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, কবি, লেখকের ছোট বড় সংস্করণ হতে সুরু করে ভোজনবিলাসী, শয্যাবিলাসীর অভাব যে সেখানে ছিলো না, এ বোধহয় সহজেই অনুমেয়। কর্মচঞ্চল দীপ্তযৌবনের প্রাণ কারাগারের নিষ্ঠুর পীড়নে নানা পথ দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করতে প্রয়াস পেয়েছে। শ্রদ্ধেয় লেখক সেই বহুজনপূর্ণ নিঃসঙ্গ একক জীবনের চিত্র আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। নানা-ধরণের বিচিত্র লোক সমাগমে কারাগৃহগুলি যে বিচিত্রতর রূপ ধারণ করেছিলো তারই রহস্যমধুর আভাস পাই। লেখকের গল্প বলার ভঙ্গিটী ভাল হয়েছে কাজেই জেলখানার ছোটখাট কাহিনীগুলি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। ভাষাও ঝর ঝরে, বাংলাদেশের পাঠক সমাজের নিকট ভালোই লাগবে। বিশেষত কারাজীবনে অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞ সকলের কাছেই কৌতুকপূর্ণ অথচ একটি প্রচ্ছন্ন সকরুণতার সুর মনের দ্বারে আঘাত করবে। লেখক বাঙ্গলা সাহিত্যে নূতন ব্রতী, বোধহয় সাহিত্যের দরবারে এই তার প্রথম প্রবেশ, আশা করি আমরা ভবিষ্যতে নব নব রসের আস্বাদ পাবো।

রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয়—

শচীন সেন। প্রকাশক এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স মূল্য ৩৲ টাকা

সাহিত্যের দরবারে সমালোচকদের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছে লেখক ও পাঠকদের মধ্যবর্তী দেশে। কবি কাব্য লেখেন, সেখানে প্রকাশ পায় তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও স্বকীয়তা, জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা বেদনা ও অনুভূতি সাহিত্যে রূপায়িত হয়ে উঠে, পাঠকের কানে বিচিত্র ঝংকার তোলে. কিন্তু সমালোচকদের কাজ সেই শোনবার কলটীকে তৈরী করে দেওয়া। বিশেষতঃ যে সব সাহিত্য বনেদী, যা বহুকালের ও বহু মানবের কানে কথা কইবে তা শোনবার জন্য চাই আলাদা কান। রবীন্দ্র-সাহিত্য বাঙ্গলাদেশের সেই বনেদী সাহিত্য, প্রাত্যহিক দেনা পাওনায় এর জমা

নিঃশেষিত হয়ে যাবার নয়। কোন ব্যক্তি বিশেষ বা দেশবিশেষের মধ্যে রবীন্দ্র সাহিত্য সীমাবদ্ধ নয় নানা মনের মধ্যে নিজেকে অনুভূত করা, বহু চিত্তকে অভিভূত করা, আয়ত্ব করা, দেশকালাতীত মনের মধ্যে অমরতা লাভ করা সত্যিকারের সাহিত্যের ধর্ম। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও সে প্রাণধর্মটুকু প্রকাশ পেয়েছে সুতরাং তার মধ্যে আছে সার্বজনীন সুর, বিশ্বমানবতার বিশালতা ও উদারতা। বিশেষত রবীন্দ্রনাথ যে-কালে জন্মগ্রহণ করেছেন তা হচ্ছে দুইকালের মধ্যবর্তী যুগ, বর্তমানযুগের সম্পূর্ণ আবেষ্টনী ও আবহাওয়া তখন ছিলো না। প্রাচ্যপ্রতীচ্যের সন্ধিস্থলে তিনি আবির্ভূত। একদিকে ভারতীয় দর্শন ও অপর দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের আওতায় বর্দ্ধিত হওয়াতে রবীন্দ্র-সাহিত্য হয়েছে জটিল, বহুশাখান্বিত ও বহুপল্লবিত বৃক্ষের মত। প্রাক্—রাবীন্দ্রিক যুগের সাহিত্য ও রবীন্দ্রের যুগের সাহিত্যে এই জন্যই বিস্তর প্রভেদ। ইউরোপীয় সাহিত্য-এর প্রভাব যেমন একদিকে রবীন্দ্রনাথকে আঘাত করেছে অপরদিকে ভারতীয় দর্শন ও বৈষ্ণব সাহিত্যও কম অভিভূত করে নাই সুতরাং রবীন্দ্র সাহিত্য রচিত হয়েছে এই উভয়ের সামঞ্জস্য সাধনে। জীবনের বিচিত্র গভীরতা, ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি, প্রকৃতির প্রাণ-স্পন্দনে একাত্ম-বোধ ও সহানুভূতি রবীন্দ্র সাহিত্যে অভিনব রূপরসে প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের অনুভূতি এত নিগূঢ় ও গভীর, তার প্রকাশ ভঙ্গিমায় এত মাধুর্য্য যে তার অর্থবোধ ও ভাব সম্পদ আয়ত্ব করা সাধারণ পাঠকের পক্ষে হয়ে ওঠে জটিল, দুর্বোধ্য ও হেয়ালীপূর্ণ ; যে অনির্দেশ্যতা অনির্বচনীয়তা ও অপরূপ অনন্তের আভাস রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল সে বিশেষ সুরটীকে অনুধাবন না করতে পারলে রবীন্দ্র সাহিত্যের রসাস্বাদ অসম্পূর্ণ ও অসমাপ্ত থেকে যায়। রবীন্দ্রনাথের কাব্য জীবনে যে একটী অখণ্ডতা ও সমগ্রতা বিরাজ করেছে তার বিশ্লেষণ না করলে রবীন্দ্রনাথকে সম্যক উপলব্ধি করা যায় না।

বাঙ্গলাদেশে সমালোচনা সাহিত্য বিশেষ সমৃদ্ধ নয়, এখানে কোন সাহিত্যিকেরই সম্যক বিচার বিশ্লেষণ হয় না। রবীন্দ্র সাহিত্যের সম্যক আলোচনার বোধহয় এখনো সময় হয় নাই কিন্তু খণ্ড খণ্ড ভাবে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা অনেক দিন হতে সুরু হয়েছে। এ বিষয়ে শ্রদ্ধেয় অজিত চক্রবর্তীর রবীন্দ্রনাথ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। পরে অন্যান্য সুধীজন রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা করেছেন। বর্তমান পুস্তকখানিতেও লেখক রবীন্দ্র সাহিত্যের পরিচয় দেবার প্রয়াস করেছেন। গ্রন্থের নিবেদনে লেখক জানিয়েছেন—"রবীন্দ্র সাহিত্যের নিগূঢ় মধুকোষের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে সেই পথের সন্ধান জানা আবশ্যক ; এই গ্রন্থ সেই সন্ধানই দিতে চাহিয়াছে।" লেখকও রবীন্দ্রনাথের কাব্য-জীবন, তার পূর্বাপর সম্বন্ধ, কবিতা, গান, প্রবন্ধ ও উপন্যাসাদি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন, পাঠকের কানে রবীন্দ্র-সাহিত্য সাধনার মূল সুরটী ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব, বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুপ্রেরণা, রবীন্দ্র সাহিত্যের বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য পাঠকদের চিত্তে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস করেছেন। দেশী ও বিদেশী পূর্ববর্তী সমালোচকদের মতবাদ সমর্থন ও খণ্ডন করে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রকাশ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সম্যক আলোচনা একটী পুস্তকে সত্যই অসম্ভব। বাঙ্গলা সাহিত্য রবীন্দ্র প্রভাবে সমৃদ্ধ ; ভাষায়, ভাবে ও প্রকাশ ভঙ্গিমায়, আনুপূর্বিক সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করে আলোচনার অভাব বোধ করি আমরা, কিন্তু তা সত্ত্বেও এসব আলোচনায় পাঠকেরা লাভবান হবেন। রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ করার কালে এই ধরণের বইগুলি তাদের নিকট ভূমিকাস্বরূপ হবে।

জওহরলালের চিঠি—

প্রবোধচন্দ্র দাশগুপ্ত।

উল্লিখিত পুস্তকখানি জওহরলাল লিখিত Letters from a father to his daughter এর অনুবাদ। ইংরাজী পুস্তকখানির ভূমিকাতেই পণ্ডিতজী জানিয়েছেন যে তাঁর কন্যা ইন্দিরা মুসুরীতে শৈলাবাসকালে তিনি এলাহাবাদ হতে তাকে উপরোক্ত চিঠিগুলি লিখেছেন। চিঠিগুলি ব্যক্তিগতভাবে লেখা হোলেও এতে বৃহত্তর পাঠক সমাজ উপকৃত হবে ; কারণ চিঠিগুলির ভিতর দিয়ে অতি সহজ সরল ভাষায় আমাদের এই আদিম পৃথিবীর ইতিবৃত্ত, জন্মকথা, গাছপালা ও পশুপক্ষীর জন্মরহস্য, আদিম মানব-এর কথা, সভ্যতার ইতিহাস সঙ্ক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। যাতে শিশুদের চিন্তাশক্তির প্রসারতা ও কল্পনাপ্রবণতা বৃদ্ধি পায় সেভাবেই লেখা হয়েছে। বইখানি শুধু মাত্র বিবৃতি নয় ইতিহাস ও বিজ্ঞানের ধারা গল্পচ্ছলে লেখা, যাতে ছোটদের মনহরণ হবে অতি সহজেই। শিশুরা সাধারণতঃ কৌতুহলপ্রবণ ও কল্পনাপ্রিয়। পারিপার্শ্বিক নানাবিষয়েই তাদের ঔৎসুক্য ও আগ্রহ সুতরাং এ ধরণের বই তাদের শিশুমনের প্রশ্নের উত্তর ও জ্ঞানপিপাসা বৃদ্ধি করতে পারবে। বাঙ্গলা দেশে এ ধরণের শিশুপাঠ্য পুস্তকের সংখ্যা এখনো বিরল সুতরাং ইংরাজী বইখানার অনুবাদ করায় গ্রন্থকার শিশুসমাজের ধন্যবাদার্হ।

কল্পনা মিত্র।

আধুনিক বাংলা গল্প—প্রেমেন্দ্র বিশ্বাস সম্পাদিত এবং প্রগতি সাহিত্য ভবন, ৭০, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। দাম তিন টাকা।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্য থেকে সমৃদ্ধতর, নিরপেক্ষ সুধীমাত্রই এ কথা অকুণ্ঠে স্বীকার করে থাকেন। আবার বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে বিশেষ করে ছোটগল্প এবং কবিতাতেই এই সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা-সাহিত্যে কাব্যের শ্রীবৃদ্ধি সহজেই বোধগম্য, কারণ বাঙ্গালী ভাবপ্রবণ জাতি। কিন্তু ছোটগল্পে যে অপেক্ষাকৃত ভাবলেশহীন, কঠোর, নৈর্ব্যাক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন, বাঙ্গালী কী করে তা' এতো সহজে আয়ত্ত করল, তা ভাবলে সত্যি বিস্মিত হতে হয়।

এই সঞ্চয়নে আধুনিক বাংলা গল্প লেখকদের রচনাই স্থান পেয়েছে। অর্থাৎ, শুধু প্রকাশ এবং দৃষ্টিভঙ্গীর 'আধুনিকতা'ই বিবেচিত হয় নি। বয়সের উপরও নজর রাখা হয়েছে। তাতে

সম্পাদকের সুবিধেই হয়েছে। কারণ, নতুন চিন্তা এবং নতুন গঠন-বৈশিষ্ট্য নিয়ে যাঁরা বাংলা গল্প লিখছেন, তাঁদের অনেকেরই বয়েস অপেক্ষাকৃত কম। কোন কোন স্থলে যে তাঁদের মধ্যে জীবনানুভূতি এবং রচনাভঙ্গীর তফাৎ নেই, তা নয়; যেমন বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মনোজ বসুর সঙ্গে বুদ্ধদেব এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রের আকাশ-পাতাল তফাৎ, তবু বয়েসের দিক দিয়ে তাঁরা মোটামুটি একই সময়ের বলে, একই সূত্রে তাঁদের গ্রথিত করে, এই বইয়ে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

সাহিত্যাচার্য্য থেকে আরম্ভ করে তাঁর ক্ষীণ প্রতিধ্বনিকারী, ক্ষুদে স্তাবকের দল পর্য্যন্ত যে যাই বলুন, সাহিত্য-'আধুনিকতাকে' আমি সত্য বলে মানি এবং বিশ্বাস করি। তাই এই গ্রন্থের সম্পাদক-লিখিত দীর্ঘ ভূমিকাসম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ মন্তব্য পড়ে এবং শুনেও একে নিতান্ত বাজে বলে আমি উড়িয়ে দিতে পারি নি। অবিশ্যি, অনেক কথাকে চমকপ্রদ করতে যাওয়াতে রচনাটি কোন কোন স্থানে আতিশয্য দোষে দুষ্ট হয়েছে, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত মূলকথাটির সত্যকে অস্বীকার করার জো নেই। যুগের সমস্যাগুলির ছাপ যে সাহিত্যে না পড়ে, রচনাহিসেবে আমি তাকে ব্যর্থ বলেই মনে করি। মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন, শূন্যে-ঝোলা সাহিত্যের কোন সার্থকতা নেই, 'পণ্ডিতজনের' হাজারো যুক্তি-তর্ক উপেক্ষা করেও এই সহজ সত্যকে জোর করে প্রচার করার সময় শুধু আসে নি, অতিক্রান্ত হয়েছে। আসলে, সত্যিকার সাহিত্য-স্রষ্টার উদ্ভব হয় দুটি প্রভাবের সমন্বয়ে—যুগের আবেদন এবং ব্যক্তিগত অনুভূতি এই দুয়ে মিলে তাঁর প্রেরণা জোগায়। রূপ-দানের বৈশিষ্ট্যও আছে, কারণ তা ছাড়া কোন রচনাই সাহিত্য-পদ-বাচ্য হতে পারে না। হোমার, সেক্সপিয়র, অথবা গ্যেটের নাম করতেই এখনও যাঁরা নাক-উঁচু করে উচ্ছ্বাস-বাণী নির্গত করতে থাকেন, কোন সত্যিকার আধুনিকই তাঁদের সাথে একমত হতে পারবেন বলে মনে হয় না। এই সব সাহিত্য-গুরুদের যতটুকু আকর্ষণ তা অনেকটা ঐতিহাসিক কারণে, এবং অনেকটা তাঁদের ব্যক্তিগত রচনা-ঐশ্বর্য্য এবং গঠন-চাতুর্য্যের জন্য। কিন্তু ভাবের দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে তাঁরা পুরাণো, বাসি হয়ে গেছেন। 'থিসিস' লেখকেরা তাঁদের নিয়ে উচ্ছ্বসিত হতে পারেন, কিন্তু সাধারণ জীবন-ধর্ম্মীর তা কখনো হবেন না।

এ জন্যই বাংলা গল্পের 'আধুনিকতায়' আমার কোন আপত্তি ত' নেই-ই, বরং আক্ষেপ এই যে তা কেন আরও 'আধুনিক' হয় নি। জীবনসম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, প্রচলিত প্রথা এবং আচার-বিরোধী যে নির্ভীকতা এবং সর্ব্বোপরি যে সর্ব্বব্যাপী মানবতা আধুনিক সাহিত্যের প্রাণ, তা আরও বেশী করে এলেই বরং আমি বেশী খুসী হতাম। তবুও, বাংলা গল্পে যা এসেছে, তাতে নিরুৎসাহ হবার কোন কারণ নেই, বরং আশান্বিত হবারই যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এই কারণে আমি আলোচ্য গ্রন্থখানিকে বিশেষ মূল্যবান মনে করি। আরও দু'একখানা ছোটগল্পের সঞ্চয়ন বাজারে বেরিয়েছে, কিন্তু তা থেকে এখানাকেই আমার বেশী ভালো লেগেছে। অবিশ্যি, যেখানে নির্ব্বাচনের ব্যাপার সেখানে মতভেদ থাকা স্বাভাবিক, তবু গল্পগুলি মোটের উপর সুনির্ব্বাচিত হয়েছে।

বিশেষ করে আমার নিজের মনে হয়েছে যে অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব এবং মণীন্দ্রলাল বসুর এর চেয়ে ভালো গল্প ছিল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণে তা নিয়ে আমার কোন আক্ষেপ নেই। পরবর্ত্তী সংস্করণে হয়তো গল্পের আবার বাছাই হবে, তখন এগুলি বাদ পড়ে অন্য গল্পও স্থান পেতে পারে। বইখানির ছাপা, বাঁধাই এবং বিশেষ করে প্রথম ছবিখানি ভাব-দ্যোতনায় অনবদ্য হয়েছে। বাংলা-সাহিত্যের অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রই এই পুস্তকের যথোচিত সমাদর করবেন, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

বিজন সেনগুপ্ত

গোপন হিয়া

অন্নপূর্ণা দেবী

মোর গোপন হিয়ার মাঝে
কার আগমনী বাজে
কার সরল বাঁসরী তানে
হারাই আপন মাঝে,
নিশি দিন রণ রণি এই
ব্যাকুল হিয়ার মাঝে
চির বসন্ত নিতি-জাগন্ত
পরশ কাহার রাজে।

কার পদধ্বনি মিশায় নীরবে
শয়ন শিয়রে মোর,
কাহার গোপন মৃদু পরশনে
তৃষিত হৃদয় চোর,
চকিত কাহার ঝটিত চাহনি
চমকি মরিছে বুকে
কাহার অধর তড়িৎ হাসির
মাধুরিমা জাগে সুখে।

সম্পাদকীয়

ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন

বাঙ্গলার বিশিষ্ট মনীষী ও একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবক ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেনের তিরোধানে বঙ্গভাষা ও জাতীয় জীবনের এক অপূরণীয় ক্ষতি হলো। তাঁর আজীবন কঠোর নিষ্ঠা ও গভীর অধ্যবসায়ের সহিত তথ্যানুসন্ধানের ফলে বঙ্গভাষা ও ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক মৌলিক ধারা আবিষ্কৃত হয়; এ তথ্যানুসন্ধানে তিনি পথ প্রদর্শক বললে অত্যুক্তি হয় না। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', 'বৃহৎ-বঙ্গ' ইত্যাদি গ্রন্থরাজী তাঁর অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও জ্ঞানানুরাগের নিদর্শক। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করতে গিয়ে পরবর্ত্তী জীবনে তিনি বাঙ্গলার সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা প্রদর্শনের চেষ্টা করেন। এ প্রচেষ্টায় তিনি যদিও কিছুটা 'প্রাদেশিক' ভাবের পরিচয় দিয়াছেন, তবু ঐতিহাসিকের নিকট তাঁর দান অমূল্য ও মহান। জাতীয় সংহতির প্রাণবন্ধন আমরা পেয়ে থাকি ভাষা ও সাহিত্যে। দীনেশচন্দ্রের একনিষ্ঠ সাধনায় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ভিত্তিভূমি অনেক সুদৃঢ় হয়েছে। কাজেই তাঁর দান জাতীয় জীবনে সুদূরপ্রসারী হবে নিঃসন্দেহ। গভীর শোকাক্রান্ত হৃদয়ে আমরা তাঁর কর্ম্মোজ্জ্বল জীবনের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাচ্ছি।

দিল্লীর আলোচনা

গত ৩রা সেপ্টেম্বর বৃটিশ সরকার জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার পর আন্তর্জ্জাতিক সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতির সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক পট ও প্রেক্ষা ঝাঁপতালে পরিবর্ত্তিত হচ্ছে। এ দ্রুত লয়ের মধ্যে দেশবাসীর নিকট একটি বিষয় খুব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে বৃটিশ শাসক সম্প্রদায় এখনও ভারতের 'জাতীয় দাবী' আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে বিচার করচে। গত ক'মাসের রাজনৈতিক ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করলেই এ বেশ বুঝা যাবে। কংগ্রেস, মুশলিমলীগ ও ভারত সরকারের মধ্যে বৈঠক, আলাপ আলোচনা ও চিঠির আদান-প্রদান সুরু হয় বড়লাট যখন ইউরোপে যুদ্ধ ঘোষণার পর শাসন পরিষদে সদস্য-সংখ্যা বর্দ্ধিত করার উদ্দেশ্যে গান্ধীজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও জিন্না সাহেবের নিকট প্রস্তাব পাঠান ও ঘরোয়া বৈঠকের জন্য তাঁদের ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করেন। এর পর সিমলায় মহাত্মা গান্ধীর সাথে বড়লাটের সাক্ষাৎ আলোচনা হয়। মুসলিম লীগের প্রতিনিধি মিঃ জিন্নার সাথে অনুরূপ আলোচনা হয়। এ আলোচনায় কোনরূপ ফলপ্রসূ হয় নি। মহাত্মা' 'শূন্য হাতে, কুটীর

পরিবর্তে পাথর' নিয়ে ওয়ার্দ্ধায় ফিরে এলেন। জিন্না সাহেবও ভবিষ্যৎ 'চৌদ্দ-দফা'র জন্য তৈরী হতে লাগলেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হয়। এ অধিবেশনের গৃহীত প্রস্তাবে নাৎসী আক্রমণের তীব্র নিন্দা হয়, কিন্তু যুদ্ধের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে ভারতের অবস্থা সম্বন্ধে বিশদভাবে জানবার জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্থগিত রাখা হয় এবং যুদ্ধের লক্ষ্য কি ও তা ভারতে কি ভাবে প্রযোজ্য হবে ও বর্তমানে কতটা কার্য্যে পরিণত করা হবে, তা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণার জন্য বৃটিশ গবর্ণমেন্টকে আহ্বান করা হয়।

১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখ মুশলিম লীগের প্রস্তাবে বলা হয় 'মুসলমানদের যদি পূর্ণ, কার্য্যকরী ও সম্মানজনক সহযোগিতা লাভের আকাঙ্খা (বৃটিশ গবর্ণমেন্টের) থাকে, তা হ'লে মুসলমানদের মধ্যে নিরাপত্তা ও সন্তোষের ভাব সৃষ্টি করতে হবে। কংগ্রেসী প্রদেশ-সমূহে মুসলমানদের অবস্থা সম্বন্ধে এবং বর্ত্তমান রাষ্ট্রতন্ত্রের কোন পরিবর্ত্তন সাধন করতে হলে মুসলমানদের সাথে বিশদভাবে আলোচনা ও তাদের সম্মতি ও অনুমোদন লাভের বিশেষ দরকার'।

এ ভিন্ন বড়লাট মাসাধিক নাইট, নবাব, বহু অজ্ঞাত অখ্যাত ও 'extinguished, distinguished' নেতাদের সাথে ইউরোপীয় যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

১৮ই অক্টোবর তারিখ বৃটীশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে বড়লাট এক ঘোষানাবাণী প্রচার করেন। ভারতীয় দলাদলির কথা উল্লেখ করে অস্পষ্টতা, স্তোক ও নীতিবাক্যের আড়ালে প্রকৃত উদ্দেশ্য চাপা দিয়ে উক্ত বিবৃতিতে বলা হয়।—১। ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন ষ্টেটাস দেওয়াই বৃটিশ গভর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য। ২। বর্তমান যুদ্ধ শেষ হ'লে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শক্রমে বর্ত্তমান ভারত-শাসন আইন সম্পর্কে পুনর্বিবেচনা করতে প্রস্তুত। ৩। বৃটিশ গভর্ণমেন্ট যুদ্ধ ব্যাপারে ভারতীয় জনমতের সমর্থন লাভের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তদুদ্দেশ্যে তাঁরা একটি পরামর্শ সমিতি গঠন করতে প্রস্তুত এবং নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করে উক্ত সমিতি গঠনের বিস্তৃত পরিকল্পনা স্থির করা হবে। উক্ত ঘোষণার পর ২২শে অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়—বড় লাটের বিবৃতি ওয়ার্কিং কমিটির মতে একান্ত অসন্তোষজনক এবং পুরাণ মামুলী নীতিরই পুনরাবৃত্তি। কারণ কংগ্রেস জানতে চেয়েছিল, গণতান্ত্রিক আত্ম-শাসনের অধিকার স্বীকার করে ভারতকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের অভিপ্রায় কি? যে গণতন্ত্র ও মানব স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ভারতবাসীকে যুদ্ধে বৃটনের সহযোগিতা করতে হবে, সে গণতন্ত্রও স্বাধীনতা সে পাবে কিনা এবং গণতন্ত্রের ভিত্তিতে ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র গঠিত হবে কি না?

কিন্তু বড়লাট এ সকল প্রশ্নের ধারে কাছেও জান নি। বরং বলেন ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন এবং পরিকল্পিত যুক্তরাষ্ট্রের বিধি ব্যবস্থাকে অতিক্রম করে অগ্রসর হতে বৃটিশ গবর্ণমেন্ট— অনিচ্ছুক। কারণ এ করতে গেলে সংখ্যালঘিষ্ঠদের প্রতি বৃটিশ জাতির যে নৈতিক কর্ত্তব্য ও গুরু

দায়িত্ব আছে তা পালন করা হয় না। তার উপর বড়লাটের মতে প্রধান প্রধান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে ঘোরতর মতদ্বৈধতা বর্তমান। 'ঘোরতর মতদ্বৈধতা' দূর করার জন্য তিনি প্রধান ২ দলের নেতৃবৃন্দ ও রাজন্যবর্গের সাথে পরামর্শ করেন। এ আলাপের ফল তাঁর পক্ষে 'একান্ত নৈরাশ্যজনক' হলেও 'বিভিন্ন স্বার্থ সমন্বিত শক্তিশালী শ্রেণী, সংখ্যা ও ইতিহাসের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যালঘিষ্ঠ— এ সকলের প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করে' তিনি 'তীব্র মতদ্বৈধের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের' জন্য ভবিষ্যতে সচেষ্ট থাকবেন বলে দেশবাসীকে অভয় দেন। দেশবাসী বড়লাট মহোদয়ের এ অভয়-বানী সে ভাবে গ্রহণ করতে পারল না। মহাত্মা গান্ধীজী তাই বলেছেন—বড়লাটের কথাগুলি এতই অস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থবোধক যে, এগুলির আর কোন ব্যাখ্যা করা চলে না। এর ভিতর সমস্তই অতি সুন্দর ভাবে অস্পষ্ট করে রাখা হয়েছে। ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা অর্পণের অভিপ্রায় কিম্বা আগ্রহ গ্রেটবৃটেনের যে আছে, তার কোনই প্রমাণ বড়লাটের কথাগুলির মধ্যে নেই।

যে ঐক্য সংস্থাপনের সদিচ্ছা ও অনুপ্রেরণা নিয়ে বড়লাট মহোদয় ব্রতী হয়েছেন তার আদর্শ হলো 'ভারতবাসীরা যে সম্প্রদায়ভুক্ত বা যে রাজনৈতিক দলভুক্ত হ'ক না কেন, তারা বৃটিশ-ভারত বা দেশীয় রাজ্য—যে স্থানের অধিবাসী হ'ক না কেন, সকলে একযোগে একই রাজনৈতিক পরিকল্পনা (যুক্তরাষ্ট্র ?) কার্যে পরিণত করবে।'

অর্থাৎ ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যতকে অনিশ্চিত রেখে, নিজের আদর্শবাদ বিসর্জ্জন দিয়ে কংগ্রেস যদি লীগপন্থী ও দেশীয় নৃপতিদের সাথে একযোগে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা পাকাপাকি করে তবেই জাতীয় ঐক্যরূপ বিরাট সমস্যার মীমাংসা হবে। এ মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য বড়লাট প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় শাসন ব্যাপারে মিলিতভাবে কার্য নির্বাহের জন্য শাসন পরিষদে সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করবেন। কংগ্রেস ও লীগ প্রতিনিধিরা যাতে শাসন পরিষদের সদস্য পদ গ্রহণ করেন, তদুদ্দেশ্যে প্রাদেশিক শাসন ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে একটা কার্যোপযোগী সহযোগিতা দরকার। এ ব্যবস্থা সাময়িক ভাবে করা হবে এবং যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ চলবে। অপরাপর দলেরও দু' একজন প্রতিনিধি লওয়া হবে। নূতন সদস্যদের পদমর্যাদা ও দায়িত্ব বর্তমান সদস্যদের অনুরূপ হবে। যুদ্ধশেষে শাসনসংস্কার সম্পর্কে পুনর্বিবেচনার যে প্রতিশ্রুতি বৃটিশ গবর্ণমেন্ট দিয়েছে, তার সাথে এ প্রস্তাবের কোন সংস্রব নেই। বর্তমান আইন অনুসারেই এ ব্যবস্থা করা হবে।

কংগ্রেস-সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ এ প্রস্তাবের উত্তরে বড়লাটকে জানান যে কংগ্রেসের অভিপ্রায় অনুসারে ভারত সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা না হলে বড়লাটের পূর্ব বিবৃতি অনুসারে কার্য করা অথবা বর্তমান প্রস্তাব অনুসারে গভর্ণমেন্টের সাথে সহযোগিতা করা কংগ্রেসের পক্ষে অসম্ভব। বড়লাটের উত্থাপিত সাম্প্রদায়িক অনৈক্য সম্বন্ধে রাষ্ট্রপতি বলেন যে ভারতকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করার ব্যাপরে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কোন সম্পর্ক নেই! কংগ্রেস যে গণ-পরিষদ দাবী করেছে, ব্যাপকতম ভোটাধিকারে তা আহ্বান করা হবে এবং তাতে বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও শ্রেণীর স্বাধীনতা রক্ষার ব্যবস্থাযুক্ত শাসনতন্ত্র রচিত

হবে। কংগ্রেস কোন শ্রেণী, সম্প্রদায় বা রাজনৈতিক দলের জন্য স্বাধীনতা চায় না। সমগ্র ভারতের স্বাধীনতাই তার কাম্য।

দিল্লীর আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার কারণ বড়লাট দিয়েছেন সংখ্যা লঘিষ্ঠদের স্বার্থরক্ষায় বাধা ও কংগ্রেস লীগের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মতদ্বৈধতা। ইউরোপীয় সঙ্কটে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় সে রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা করার জন্য বড়লাট দেশের নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করেছিলেন। কোন সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধান এ আমন্ত্রণের গৌণ বা মুখ্য উদ্দেশ্য বড়লাটের বিবৃতিতে দেখা যায় না। কাজেই রাজনৈতিক ব্যাপারের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সমস্যা আনা আলোচ্য-বিষয় হতে অবান্তরে যাওয়া ভিন্ন আর কিছুই নয়। বড়লাটের এ অজুহাত দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই, কারণ সাম্রাজ্যনীতির স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য রাখতে হলে 'কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লীগকে খেলান' রূপ ভেদনীতিই ব্রহ্মাস্ত্র। মণ্টেগো-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার হতে সুরু করে আজ পর্যন্ত যখনই ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে তখনই তা ব্যর্থ করার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সাম্প্রদায়িক মত ভেদের অজুহাত ব্যবহার করেনি।

বড়লাট বলেছেন 'মূল বিবেচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের মধ্যে সম্পূর্ণ মতানৈক্য বর্তমান' কিন্তু মূল বিষয় ছিল রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক নয়। রাজনৈতিক বিষয়ে যথা ভারতের রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা লাভে কংগ্রেস-লীগের কোন মতানৈক্য নেই, কারণ দু'প্রতিষ্ঠানেরই চরম লক্ষ্য জাতীয় স্বাধীনতা। কাজেই মূল বিষয় সম্বন্ধে মতানৈক্য 'কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে নয়, কংগ্রেস ও বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের মধ্যে'। কংগ্রেস বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিকট সুস্পষ্টভাবে জানতে চেয়েছিল 'বর্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও ভারতের প্রতি এ উদ্দেশ্য কিরূপ ভাবে প্রযুক্ত হবে'। এর স্পষ্ট জবাব দিতে গেলে বৃটিশ সাম্রজ্য নীতির স্বার্থের সাথে সামঞ্জস্য থাকে না। কংগ্রেস ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে এ মৌলিক বিষয়ে মত বৈষম্যের জন্যই দিল্লীর আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে।

প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকে এবং বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য রাজনৈতিক দলও গড়ে উঠে। ইংলণ্ডে রক্ষণশীল, উদারনৈতিক ও শ্রমিক প্রভৃতি বিভিন্ন দল আছে। প্রটেষ্টাণ্ট, রোমেনক্যাথলিক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরও অভাব নেই। এ সত্ত্বেও দেশের একটা অখণ্ড রাজনৈতিক সত্তা বিদ্যমান আছে এবং তদনুযায়ী শাসনতন্ত্র সংগঠিত হয়। প্রায় অধিকাংশ পাশ্চাত্যদেশে সংখ্যা লঘিষ্ঠ সম্প্রদায় আছে এবং গণতন্ত্রের ফলে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় কখনও সংখ্যালঘুদের স্বার্থহানিকর কোন কিছু করে না। কাজেই কোন স্বার্থ প্রণোদিত না হলে কেহ ভবিষ্যৎ ভারতে অন্যরূপ হবে এ ভাবতে পারে না।

দিল্লীর আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর (যদিও ব্যর্থতা সম্বন্ধে কেহই অন্যরূপ ভাবে নি) কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির এলাহাবাদ অধিবেশনে ইউরোপীয় যুদ্ধ ও ভারতবর্ষে তার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে পুনঃ প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এ প্রস্তাবের বিশেষত্ব হল বৃটিশ ও ফরাসীগণ বর্তমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা প্রভৃতি উচ্চাদর্শের কথা প্রচার করলেও প্রকৃতরূপে এ

সাম্রাজ্যবাদ স্বার্থ প্রণোদিত—এ কথা সুস্পষ্টভাবে দেশবাসীর নিকট ঘোষণা করেছে। আমরা প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করলেম।

"যুদ্ধের গতি, বৃটিশ ও ফরাসী গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক অনুসৃত নীতি এবং বিশেষ করে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ হতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে সমস্ত ঘোষণা করা হচ্ছে, তা প্রতীয়মান হয় যে ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বযুদ্ধের ন্যায় বর্ত্তমান যুদ্ধও সাম্রাজ্যবাদী উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে পরিচালনা করা হচ্ছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত থেকেই যাবে। এইরূপ কোন যুদ্ধ এবং এইরূপ কোন নীতির সহিত কংগ্রেস আপনাকে সংশ্লিষ্ট করতে পারে না এবং এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারতবর্ষের ধন-সম্পদ বিনিয়োগ করা হলে কংগ্রেস তাও সমর্থন করতে পারেন না।........."

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একথাও জানাচ্ছে যে, বৃটিশ শাসননীতি হতে সাম্রাজ্যবাদের কলঙ্ক দূর করার জন্য এবং অতঃপর সহযোগিতা করার বিষয় কংগ্রেসকে বিবেচনা ক'রতে দেবার জন্য, ভারতের স্বাধীনতা ও গণ-পরিষদের মারফত নিজেদের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ভারতবাসীর অধিকার অনুমোদন করা একান্ত প্রয়োজন। তাদের মতে স্বাধীন জাতির শাসনতন্ত্র প্রণয়নের একমাত্র গণতান্ত্রিক উপায় হ'ল এই গণ-পরিষদ এবং গণতন্ত্রে ও স্বাধীনতায় আস্থাবান কোনব্যক্তির পক্ষেই ও আপত্তি উত্থাপন করা সম্ভবপর নয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির দৃঢ় বিশ্বাস যে, সাম্প্রাদায়িক ও অন্যান্য সমস্যা সমাধানেরও একমাত্র প্রকৃষ্ট পন্থা হল এই গণপরিষদ। তা বলে এদ্বারা এ বুঝা যায় না যে, সাম্প্রাদায়িক সমস্যার সমাধানে ওয়ার্কিং কমিটির প্রচেষ্টা শিথিল করা হবে। প্রস্তাবিত গণ-পরিষদই, সংখ্যালঘিষ্ঠ বলে স্বীকৃত সম্প্রদায়সমূহের অধিকারসমূহ সন্তোষজনকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে শাসনতন্ত্র প্রণয়ণ করতে সমর্থ হবে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অধিকার সম্পর্কে কোন কোন বিষয়ে যদি কোনরূপ আপোষ মীমাংসা হওয়া সম্ভবপর না হয়, তবে তা সালিশ দ্বারা নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থা করা চলবে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিমণ্ডলী দ্বারা গণ-পরিষদ গঠিত হইবে। যে সব সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় বর্ত্তমানের পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা বজায় রাখতে ইচ্ছুক হবে, তাদের জন্য বজায় রাখা হবে। গণ-পরিষদে এই সকল সদস্যের সংখ্যা দ্বারা ঐ সব সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা প্রতিফলিত হইবে।

বৃটিশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ হতে যে ঘোষণা করা হয়, তা নিতান্ত অপর্য্যাপ্ত বলে ব্রিটেনের নীতি ও সামরিক প্রচেষ্টায় সহযোগিতা না করতে এবং অসহযোগিতায় প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে কংগ্রেসী প্রদেশসমূহের মন্ত্রিমণ্ডলীকে পদত্যাগ করতে বলতে কংগ্রেস বাধ্য হয়েছে। এ অসহযোগিতার নীতিই বজায় রাখা হবে এবং যদি বৃটিশ গভর্ণমেন্ট তাদের নীতি পরিবর্ত্তন করে কংগ্রেসের প্রস্তাবে সম্মত না হয়, তবে, অসহযোগিতার নীতিই অতি অবশ্য চালান হবে। এই সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসওয়ালাদিগকে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চায় যে,

প্রতিপক্ষের সহিত সম্মানজনক সর্ত্তে মীমাংসার জন্য সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা করা সত্যাগ্রহ মাত্রেই বুঝায়। প্রয়োজন হলে অহিংসা সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার জন্য সত্যাগ্রহী সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকবে বটে, কিন্তু শান্তি-প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টায় কখনও তার মধ্যে শৈথিল্য দেখা দিবে না—শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্ব্বদাই তাকে যত্নপর থাকতে হবে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদিও আপোষ-প্রচেষ্টার দরজা কংগ্রেসের মুখের উপরই বন্ধ করে দিয়েছে, তথাপি ওয়ার্কিং কমিটি সম্মানজনক আপোষ নিষ্পত্তির জন্য যত্নপর থাকবে।

ভারত সচিব ও কংগ্রেস

ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড অভিযোগ করেছেন ভারতে 'জাতীয় কংগ্রেস শুধু হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় শব্দটা নামেই, প্রকৃত প্রস্তাবে সাম্প্রাদায়িক।' 'জাতীয়' ও 'সাম্প্রাদায়িক একার্থবোধক নয় তা ভারত-সচিবের মত একজন সুবিজ্ঞ লোকের অবিদিত নয়। অধিকন্তু কংগ্রেসের মত একটা বিরাট গণ-প্রতিষ্ঠানকে তিনি হিন্দুপ্রতিষ্ঠান বলে সত্যের অপলাপ করতে কোন কুণ্ঠাবোধ করেন নি। প্রথম হতেই কংগ্রেস একটি জাতীয়তামূলক প্রতিষ্ঠান, এর প্রতিষ্ঠাতা একজন ইংরেজ, এর সভাপতিদের মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, ইংরেজ, খৃষ্টান, পার্শী ছিল; ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে এর সভ্য বিদ্যমান; এও তিনি ভাল করেই জানেন।

আবার বিলাতের লর্ড সভায় ভারত সম্পর্কে বক্তৃতার সময় তিনি বলেছিলেন 'ভারতের সাথে দীর্ঘকালের সম্পর্ক হেতু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের উপর ভারতের প্রতি কতগুলি গুরু দায়িত্ব এসে পড়েছে।' কংগ্রেসকে সাম্প্রাদায়িক আখ্যা দিলে ভারতে সংখ্যাল্পিষ্ঠদের অভিভাবকত্ব করার অজুহাত মেলে। সাম্রাজ্যবাদ স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই ভারত-সচিব সত্যের এরূপ অপলাপ করেছেন।

বাঙ্গলার বস্ত্রশিল্পের সমস্যা ও ভবিষ্যৎ

কমার্শিয়াল মিউজিয়মে বঙ্গীয় মিল-মালিক সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুবিনয় ভট্টাচার্য 'বাঙ্গলার বস্ত্র-শিল্পের সমস্যা ও সম্ভাবনা' সম্বন্ধে বক্তৃতা উপলক্ষে বলেন, 'বাঙ্গলায় বর্তমানে প্রতি বৎসরে ৮০ কোটি গজ কাপড়ের প্রয়োজন। কিন্তু বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলোতে এখন বৎসরে ২০ কোটি গজের বেশী কাপড় উৎপন্ন হয় না। সুতরাং বাঙ্গলায় যে আরও বহুসংখ্যক কল প্রতিষ্ঠার সুযোগ রয়েছে, তাতেও সন্দেহ নেই। এই সম্পর্কিত অন্যান্য ব্যাপারেও বাঙ্গলার অবস্থা খুব অনুকূল। কেন না বাঙ্গলাদেশ কয়লার খনিসমূহের নিকটবর্ত্তী, বাঙ্গলার আবহাওয়া কাপড়ের কল পরিকল্পনার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক এবং এ প্রদেশে শ্রমিকের কোন অভাব নেই।

এ প্রসঙ্গে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গলাদেশে বস্ত্রশিল্পের যে উন্নতি হয়েছে, বক্তা তার তথ্য-তালিকা উদ্ধৃত করে বর্তমানে বাঙ্গলায় কাপড়ের কলগুলো যে সমস্ত অসুবিধের মধ্যে কাজ করছে, তা বিশদভাবে আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, বাঙ্গলাদেশের কাপড়ের কলগুলো উপযুক্ত মূলধন পাচ্ছে না। এ জন্য গত ৫।৬ বছরের মধ্যে বাঙ্গলায় দেড় শতাধিক কাপড়ের কল রেজেষ্টারীকৃত হলেও এর মধ্যে খুব সামান্য সংখ্যক কলই কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হতে সমর্থ হয়েছে। এ কারণে বাঙ্গলায় বর্তমানে যে চব্বিশটি কল চলছে, তাও আশানুরূপভাবে উন্নতি করতে পারছে না। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গলাদেশে মিলজাত দ্রব্য বিক্রয়ের কোন সুব্যবস্থা নেই। বাঙ্গলায় যারা কাপড় বিক্রয় করে থাকে, তাদের অধিকাংশের স্বার্থ, বাঙ্গলার বস্ত্র-শিল্পের স্বার্থের বিরোধী। অথচ বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলোরও এরূপ অর্থসঙ্গতি নেই যে তারা নিজেরা নিজেদের প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে পারে। তৃতীয়তঃ, বস্ত্র-শিল্পের সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে গবেষণা করবারও বাঙ্গলায় কোন ব্যবস্থা নেই। চতুর্থতঃ, বাঙ্গলার কাপড়ের কলগুলো দেশের লোকের বিভিন্ন শ্রেণীর রুচি ও প্রয়োজন নির্ণয় করতে সচেষ্ট নয়। এর ফলে সকলেই এক শ্রেণীর জিনিষ প্রস্তুত করে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা তীব্র করে তুলেছেন।'

শ্রীযুক্ত ভট্টাচার্যের মত এই যে, বাঙ্গলায় কাপড়ের কল স্থাপন করবার সময়ে স্থান নির্বাচন, কলের পরিকল্পনা, যানবাহনের সুবিধে, আবহাওয়ার অবস্থা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ববর্তীগণের ভুল-ত্রুটি অতিক্রম করে কার্যে অগ্রসর হতে হবে। অধিকন্তু কলের খরচা অত্যধিক বৃদ্ধি না করে কাজে যাতে দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য লাভ করা যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ ভাবে কাজ করলে এবং প্রয়োজনীয় মূলধন পেলে বাঙ্গলার বস্ত্র-শিল্পের দ্রুত উন্নতি হবে।